ললিত বসন্ত

প্রেমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস সম্ভার

চিত্তরঞ্জন মাইতি

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

LALITA BASANTA
A Collection of Bengali Romantic Novels
BY CHITTA RANJAN MAITY
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৪২

প্রচ্ছদ : রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
কথামুখ কবিতা : দীপাঞ্জন বসু

ISBN : 81-7612-826-0

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-গ্রন্থন : অনুপম ঘোষ। পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ললিত বসন্ত

একদিকে কোকিলের উচ্ছ্বসিত স্বরপঞ্চম
রক্ত পলাশ আর প্রণয়মাদল
অন্যদিকে বিরহের কোমলগান্ধার
অশ্রুমেদুর মেঘ উদাসী বাতাস
নিঃসীমে
অন্তহীন ললিত বসন্ত।

একদিকে আলোর আকাশ আর সুনীল সাগর
উল্লাসে ভেঙে পড়া তরঙ্গচঞ্চল
অন্যদিকে অনিত্য বালুচরে নিত্যমুছে যাওয়া
অতলের সর্বনাশা ডাক,
দিগন্তে
অন্তহীন ললিত বসন্ত।

সদ্যফোটা গোলাপের উদ্বেল সৌরভ
মিশে যায় ঝরে পড়া বকুলের মৌন হাহাকারে
পাওয়ার আনন্দ আর না পাওয়ার বিধুর বিষাদ
পথ শেষ, হাতে হাত, পূর্ণতার শেষ সীমানায়
সামনে
অন্তহীন ললিত বসন্ত।

লেখকের অন্যান্য বই

কলাবতী
মধুমাধবী
মৃগনয়নী
অধরা মাধুরী
বীর্যবতী বীরভোগ্যা—১/২
শৈলপুরী কুমায়ুন
কলাভূমি কলিঙ্গ
অগ্নিকন্যা
অনেক বসন্ত দুটি মন
ভোরের রাগিণী
ডাঃ জনসনের ডায়েরী
রোদ বৃষ্টি ভালোবাসা
কন্যা কাশ্মীর
হিরণ্যগড়ের বধূ
আঁধার পেরিয়ে
বর্ষা বসন্ত ছুঁয়ে
রিসেপশনিস্ট
ফরেস্ট বাংলো
নির্জনে খেলা
মোহিনী
কালের কল্লোল
পরমা
আর্য অনার্য
আপন ঘর

সাইক্লোন
মহাকালের বন্দর
ত্রিবেণী
মরু মৃগয়া
বন পর্ব
মেঘ ময়ূরী
কালের রাখাল
জয়িতা
অনুরাগিণী
মন অরণ্য
শ্রেষ্ঠ গল্প
অমৃত নিকেতন
স্বপ্নশিখর
পদধ্বনি
লীলা সঙ্গম
নীলাঞ্জনা
দাহা তিসি গোংগা
মনের মধ্যে মন
তুমি রবে নীরবে
আকাশ হারিয়ে যায়
তিন্নির রোদ আর বৃষ্টি
অক্ষয় বটের কড়চা
অথ হংস মরালী কথা
নিষাদী

এতে আছে

সৃষ্টির চালচিত্র

দুটি সুবৃহৎ খণ্ডে আমার 'বীর্যবতী বীরভোগ্যা' নামে হাজার হাজার বছরের মানব-ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রচিত ষোলখানি উপন্যাস প্রকাশের পর দে'জ পাবলিশিং খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করছেন আমার রোমান্টিক উপন্যাসগুলি। ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তিনটি খণ্ড,— 'মৃগনয়নী', 'মধুমাধবী', 'অধরা মাধুরী'। সংকলিত প্রতিটি খণ্ড স্বয়ংসম্পূর্ণ।

খণ্ডগুলি পরপর প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা বইমেলা উপলক্ষে।

এবারও বইমেলাতে প্রকাশিত হল দুটি খণ্ড— 'ললিত বসন্ত' আর 'কলাবতী'।

প্রতিটি রোমান্টিক উপন্যাস সৃষ্টির পেছনে আমার ভেতর কি প্রেরণা কাজ করেছে, তা জানতে চেয়েছিল আমার কন্যা-প্রতিম এক পাঠিকা—কল্যাণীয়া রোমি সাহা।

আমি উপন্যাস রচনার পশ্চাৎ সূত্রগুলি তার কাছে বিভিন্ন সময়ে বলে গেছি, আর সে শ্রুতিধরের মতো সেগুলি তার স্মৃতিতে ধরে রেখে আমার কাছে লিখে এনে দিয়েছে। আমি সেগুলি সামান্য সংশোধনের পর প্রতিখণ্ডে প্রকাশ করেছি।

এবার কল্যাণীয়া রোমিই পরিবর্তন করেছে তার পরিকল্পনা। সে আমার উপন্যাসগুলি সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেছে আর উত্তরদাতার ভূমিকায় আমি এঁকে গেছি আমার সৃষ্টির চালচিত্রগুলি।

মাথুর

প্রঃ কিছুকাল আগে 'ঘরের বাইরে ঘর' নামে একটি সিনেমা দেখেছিলাম। কাহিনীকার কে ছিলেন সেটি আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। সেদিন পুরনো একটি শারদীয় পত্রিকায় আপনার 'মাথুর' উপন্যাসটি পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। সিনেমায় দেখা কাহিনীর সঙ্গে আপনার লেখা উপন্যাসের অদ্ভুত মিল লক্ষ্য করলাম। আজকাল শোনা যায় লেখকদের কাহিনী নিয়ে সামান্য রদবদল করে চলচ্চিত্রে ভিন্ন লোকের নামে চালানো হয়। এটাও কি সেরকমই ব্যাপার?

উঃ সিনেমা সম্বন্ধে তুমি যে অভিযোগ করেছ সেটা দু'একটি ক্ষেত্রে সত্য হলেও এক্ষেত্রে তা ঘটেনি। বিশিষ্ট পরিচালক সলিল দত্ত মহাশয় আমার 'মাথুর' কাহিনীকেই 'ঘরের বাইরে ঘর' নামে চলচ্চিত্রায়িত করেছেন।

প্রঃ সিনেমার সঙ্গে আপনার উপন্যাসের কি হুবহু মিল আছে?

উঃ কিছু কিছু পার্থক্য আছে। শেষ অংশে চলচ্চিত্রের খাতিরে পরিচালকের সঙ্গে কিছুটা কম্প্রোমাইজ করে নিতে হয়েছে।

প্রঃ এ কাহিনী কি আপনার সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত না বাস্তবের সঙ্গে এর কোনও যোগ আছে?

উঃ এবার তা হলে তোমার কাছে উপন্যাসের আসল সত্যটি প্রকাশ করতে হয়। বেশ কয়েক বছর আগে যা ঘটেছিল সে কথা দিয়েই শুরু করছি।

আমার অগ্রজ এক অধ্যাপকের সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন করেছিলেন একটি নামী সাংস্কৃতিক সংস্থা।

আমি সেখানে নিমন্ত্রিত ছিলাম এবং কিছু বলতেও হয়েছিল। সেই সভায় অনেকের ভেতর দুটি মেয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জেনেছিলাম, তারা দু-বোন। একটি বিবাহিতা, অন্যজন কুমারী কন্যা। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও সুদর্শনা দুটি বোন সেদিন গান গেয়েছিল। তারা দুজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে এবং আমার অগ্রজ অধ্যাপকের ছাত্রী।

সভা ভাঙলে সেদিনের সম্বর্ধনা প্রাপ্ত অধ্যাপক আমাকে কাছে ডেকে বললেন, এরা দু-বোন দক্ষিণ কলকাতার দিকে যাবে, তোমাকে তোমার বাড়িতে নামিয়ে দেবে।

ওরা পাশেই দাঁড়িয়েছিল। ছোট বোনটি বলল, আপনি কোথায় থাকেন স্যার?

তোমরা আমাকে গোলপার্কের কাছে নামিয়ে দিলেই হবে।

ঠিক আছে স্যার, আমরা তো গোলপার্ক ছাড়িয়েই যাচ্ছি।

গাড়িতে উঠে পথে কিছু কথা হল। জানলাম, ওরা উত্তরের বাসিন্দা কিন্তু আজকে থাকবে দক্ষিণ কলকাতার এক আত্মীয়ের বাড়িতে।

আত্মীয়টির নাম শুনে আমি বললাম, ওঁরা তো আমাদের বিশেষ পরিচিত।

বড়বোনটি অমনি বলে উঠল, তাই!

আমি হেসে বললাম, ওদের কাছে আমার নাম কোরো, সব খবর পেয়ে যাবে।

ওরা কিন্তু সেদিন আমাকে একেবারে বাড়িতেই পৌঁছে দিয়ে গেল।

কয়েকদিন পরে ঐ দুটি মেয়ের আত্মীয় ভদ্রলোকের বাড়িতে হাজির হলাম। ওঁরা স্বামী-স্ত্রীতে আমাদের বহুকালের ভ্রমণ-সঙ্গী।

আলাপ আলোচনার ভেতর ঐ দুটি বোনের কথা উঠল।

গৃহস্বামী কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে গেলেন। তাকালেন স্ত্রীর মুখের দিকে।

সেদিন ওঁরা বিবাহিতা ঐ মেয়েটি সম্বন্ধে যা বললেন তাতে আমি ওর ওপর গভীর শ্রদ্ধায় আনত হলাম।

প্রঃ আপনার উপন্যাসে ঐ বিবাহিতা মেয়েটি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয়েছেন। মূল ঘটনার সঙ্গে ঐ মেয়েটির ভূমিকা কি একেবারে অভিন্ন?

উঃ উপন্যাসের প্রয়োজনে অতি সামান্যই রদবদল ঘটানো হয়েছে। তবে যে মেয়েটিকে নিয়ে নায়ক চরিত্রের এতখানি পরিবর্তন ঘটে গেল, সে কিন্তু আসলে এক বিদেশিনী মহিলা। তার লীলার মোহে সবকিছু ভুলে গিয়েছিল ঐ কান্তিমান ধনীর দুলালটি। শেষ পর্যন্ত মাদকাসক্ত হয়ে ঐ যুবক তার সৌন্দর্য, মানসিক শক্তি, এমনকি সাময়িকভাবে স্মৃতিশক্তিও হারিয়ে বসেছিল। বেশ কিছুকাল পরে আত্মীয় এক ভদ্রলোক বেড়াতে গিয়ে লক্ষ্ণৌর রাস্তায় ওকে বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখে ওর বাড়িতে ফোন করে জানায়।

ছেলের বাবা খবর পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন, যে আমার ঘরের লক্ষ্মীকে এতখানি মানসিক যন্ত্রণা দিয়েছে, তাকে আমার ছেলে বলে স্বীকার করি না।

কিন্তু মেয়েটি তার স্বামীকে পরিত্যাগ করতে পারেনি। সে বিভিন্ন সূত্র থেকে মাঝে মাঝে খবর পেত, তার স্বামীকে একটি সুন্দরী বিদেশিনী মহিলার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে।

স্ত্রী হিসেবে নিশ্চয়ই এ-খবরটা তার হৃদয়কে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিত, কিন্তু সে আবার আশায় বুক বাঁধত তার স্বামীকে ফিরে পাবার জন্য। তাই শ্বশুরমশাই যাই বলুন, সে স্বামীকে নির্দিষ্ট কোনও একটি জায়গায় আটকে রাখার জন্য অনুরোধ জানিয়ে সেদিনই লক্ষ্ণৌ পাড়ি দেয়। সেখানে থেকে নিয়ে আসে প্রায় স্মৃতিভ্রষ্ট ওই মানুষটিকে।

প্রঃ আমার মনে হয় ঐ ভ্রষ্ট বিবেকহীন মানুষটিকে তার স্ত্রী ঘরে ফিরিয়ে না আনলেই পারত। মেয়েটির রূপ, শিক্ষাদীক্ষা, ধনদৌলত, কোন কিছুরই অভাব ছিল না। সে নিজের সম্মান বজায় রেখে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারত। এ যেন পুরনো আমালের মতো, 'পতি পরম গুরু' আর তাঁর শ্রীচরণে সেবা লাগের মতো অবস্থা।

উঃ তোমাদের বিদ্রোহী, আত্মসম্মানে উদ্দীপিত মানসিকতাকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা জানিয়েও বলছি, মেয়েটি সমস্ত ব্যাপারটিকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছে, তাকে কোনভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। সে যে স্বামীর প্রতি মোহবশে এ কাজ করছে তা আমার মনে হয় না। আসলে সে তার নারীত্বের অবমাননাকে মেনে নিতে পারেনি। ছেড়ে দেওয়া সহজ কিন্তু কাছে টেনে আনাটাই কঠিন। সেই ব্রতে সে নিঃসন্দেহে সিদ্ধিলাভ করেছে। এক পতিত, মানসিকভাবে পঙ্গু মানুষকে উদ্ধার করেছে সে।

বর্ষা বসন্ত ছুঁয়ে

প্রঃ বর্ষা বসন্ত ছুঁয়ে বইখানা আমার হাতেই রয়েছে। ঝালদার ডাকবাংলোর ঘটনাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। ডিসেম্বরের প্রচণ্ড শীতে রেলের ইঞ্জিনিয়ার মি. ভট্টাচার্য এক সন্ধ্যায় কাঁপতে কাঁপতে ডাকবাংলোতে ঢুকেছেন। আগেভাগেই রিজার্ভেশন করা, তাই রক্ষে। ফায়ার প্লেসের আগুনের ধারে জমিয়েও বসেছিলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা হল না।

সপরিবারে আই. জি. হাজির। তখন ইংরেজ আমল। মহাপ্রতাপশালী আই. জি. মি. হেয়ারের সঙ্গে এসেছেন এস. ডি. ও., দারোগা এবং দেহরক্ষীরা।

প্রায় টানতে টানতে রেলওয়ের ওই কর্মচারীটিকে বাইরে বেডিং শুদ্ধু নামিয়ে দিলেন ইংরেজের তাবড় তাবড় ওপরওয়ালারা।

হঠাৎ দেখা গেল সেই লোকটিকে। আমি বই থেকে সে অংশটুকু উদ্ধৃত করছি,—

"এমন সময় উঠোনে রাখা হ্যাজাকের আলোর সামনে এসে দাঁড়াল একটি লোক। লোকটি দাঁড়াতেই দীর্ঘ ছায়াটা এসে পড়ল আমার সামনে। আমি তার দিকে তাকালাম।

হঠাৎ সব কিছু ছাপিয়ে একটা গলা বেজে উঠল, হেথা এত হল্লা কিসের শুনছি হ্যাঁ?

লোকটি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করছেন মনে করে একটু এগিয়ে গেলাম তার দিকে। এই রাতের অন্ধকারে লোকটির গলায় শব্দে যেন একটা ক্ষীণ আশ্বাসের আলো আমি দেখতে পেলাম।

যেতে যেতে দেখলাম লম্বা কালো রোগা চেহারার একটি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। খাটো কাপড়খানা পায়ের শেষ অবধি নামতে পারেনি, থমকে থেমে গেছে। পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবির ওপর তুষের একখানা চাদর।

আমার রিজার্ভেশনের কনফারমেশন স্লিপটা তাঁর দিকে এগিয়ে ধরতেই তিনি দেখে বললেন, আপনি ভট্চাযমশাই! এত ঝামেলা কিসের?

অথৈ জলে একটুকরো খড় পেয়ে বাঁচার আশা প্রবল হয়ে উঠল।

বললাম, আই. জি. সাহেব এসেছেন, তাই আমাকে জায়গা ছেড়ে দিতে হচ্ছে। আমি সন্ধে থেকে এসে বসেছিলাম, এখন কী বিপদেই যে পড়লাম, মাথাটুকু গোঁজার ঠাঁই নেই এই দারুণ শীতের রাতে।

বেজে উঠল গলা, কেনে, ঘর ছাড়বেন কেনে মশাই, আপনি তো আগে আসছেন, চাইপ্যে বসুন।

হ্যাজাকের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা চাপরাসী বলে উঠল, হুজুরের ফ্যামিলি এসেছেন, গাড়িতে বসে আছেন। মাল নামানো হচ্ছে।

বাজের মতো এবার বেজে উঠল গলা, থাম বেটা গুলামের বাচ্চা চামচিকে, এক থাপ্পড়ে গাল উড়াই দিব। চল তোদের সাহাব কোথা আছে দেখি যাঁইয়ে একবার।

আমি ততক্ষণে হতভম্ব হয়ে গেছি। অতি সাধারণ চেহারার লোকটির কি অদ্ভুত সাহস! ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, এস. ডি. ও. এদের কাছে এমন আস্ফালন করছে আমার মতো অতি সাধারণ একটি রেলের কর্মচারীর জন্যে!

ততক্ষণে লোকটির আর এক রূপ। আবছা অন্ধকারে এখন আর তাঁকে চেনা যাচ্ছে না, কেবল একটা গ্রেহাউণ্ডের মতো গম্ভীর ভারী গলা ভেসে আসছে। আশ্চর্য চোস্ত ইংরাজিতে সাহেবদের বলছেন, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি তোমাদের আক্কেল দেখে। একটা মানুষ তার দখলের কাগজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর তোমরা তাকে রাস্তায় বার করে দিচ্ছ। এই যদি তোমাদের সরকারী বিচারের নমুনা হয় তা হলে তোমাদের বাহাদুরী আছে বলতে হবে।

এস. ডি. ও. একবার আমতা আমতা করে বলবার চেষ্টা করলেন, মানে আই. জি. সাহেব জরুরী সরকারী কাজে এসেছেন, তাঁর থাকার প্রয়োজনটা বেশি নয় কি?

আবার সেই গলা বেজে উঠল, কাকে বলতেছেন মশাই। ফ্যামিলির ছেলেপুলা সাথে লিয়ে সরকারী কাজ করে বেড়াচ্ছেন আই. জি. সাহেব।

দারোগা কি যেন বলতে চাইল, অমনি এক ধমক দিয়ে উঠলেন লোকটি, হাটিয়ে যান, দেখছেন না আমি মি. হেয়ারের সঙ্গে কথা বলছি।

লোকটি আই. জি.-কে বললেন, আমার কথা শুনুন, এস. ডি. ও. সাহেবের কোয়ার্টারে চলিয়ে যান। ওখানে আরাম করেন গিয়া। এখানে মিছা ঝুট ঝামেলার ভিতর পড়িয়ে যাবেন। ফ্যামিলি লিয়ে এ বাংলোটায় থাকবার চেষ্টা করবেন না।

অগত্য গাড়িগুলোর মুখ ফিরল। চারদিকে ইংরেজ ঠ্যাঙাবার যে হিড়িক পড়েছে তাতে ভরসা হল না আই. জি. হেয়ার সাহেবের ডাকবাংলোয় থাকার। তা ছাড়া এস. ডি. ও. হেয়ার সাহেবের কানে কানে কি যেন বললেন।

হেডলাইটের আলোগুলো ঘুরে গেল উল্টোমুখে। কিছুক্ষণের ভেতর ডাকবাংলোটা অন্ধকারে ডুবে গেল।

সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মানুষটি আমার হাত ধরে বললেন, আপনি তো মশাই কেস জিতা গেছেন বটে, এখন আর এখানে থাকবেন কেনে। আমার ডেরায় চলুন আজ্ঞা। শালা লোগদের বিশ্বাস নাই, রাতে ভিতে ঝুট ঝামেলা লাগাইতে পারে।"

এটুকু পড়লাম, যার ভেতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি সরকার টুল কোম্পানির ডিরেকটর স্যর আর. ডি. সরকারের একটি রেখাচিত্র। কালো লম্বা লোকটি ইস্পাতের মতো চেহারা আর মন নিয়ে পুরুলিয়ার টানে একটি বিস্ময়কর দৃশ্যের অবতারণা করে গেলেন। এ চরিত্রটির উপস্থাপনা আমার মনকে স্পর্শ করেছে। এখন আমার প্রশ্ন, - -এর বাস্তব ভিত্তি কতখানি?

উঃ এ চরিত্রটি আমি কল্পনা থেকে সৃষ্টি করিনি, কেবল নামটি ছাড়া সম্পূর্ণ বাস্তব।

ইংরেজ আমলে একসময়, হুবহু এই ঘটনাটি ঘটেছিল। আর তখন রেলের ওই কর্মচারীটি ছিলেন শ্রীযুক্ত অনিল হোম মশায়। তিনি ছিলেন বৃত্তিতে ইঞ্জিনিয়ার।

অনিলবাবুর সঙ্গে একসময় আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি শুধু ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন না, ছিলেন সুগায়কও। ডি. এল. রায়ের গান অপূর্ব দরদী কণ্ঠে গাইতে পারতেন। সেই সূত্রে মাঝে মাঝে আমার বাড়িতে এসে আমার শ্রীমতীকে ডি. এল. রায়ের কয়েকটি গান শিখিয়েছিলেন।

এঁর আর একটি পরিচয়, রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়পাত্র শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয়ের অন্যতম ভ্রাতা। এঁর শান্তিনিকেতনের 'বসুধারা' বাড়িটিতে একবার কয়েকদিন সস্ত্রীক আমরা উঠেছিলাম। তাঁর আতিথ্যে সেই ক'টি দিন তৃপ্ত ও মুগ্ধ হয়েছিলাম আমরা।

এই ঘটনার রূপকার স্বয়ং অনিল হোম মহাশয়। পুরুলিয়ার কথাবার্তার টানও আমি তাঁর মুখ থেকেই শুনেছিলাম।

স্যার আর. ডি.-র চরিত্র ছাড়া বাকি সব কটি চরিত্রই আমার কল্পনাপ্রসূত। কাহিনীর প্রয়োজনে তারা নিজ নিজ কেন্দ্রে আবর্তিত হয়েছে।

ভোরের রাগিণী

প্রঃ আমরা যখন কলেজে পড়ি তখন আপনার 'ভোরের রাগিণী' উপন্যাসটি লাইব্রেরি থেকে ইস্যু করে পড়েছিলাম। উপন্যাসের পরিবেশ এবং চরিত্র সে সময় আমাকে খুব স্পর্শ করেছিল। ভাললাগার কথাটা বন্ধু বান্ধবকে না বলে পারিনি। তারাও তখন আমার কাছ থেকে বইটি নিয়ে পরপর পড়েছিল এবং যথেষ্ট সাড়া জেগেছিল তাদেরও ভেতর। দারুণ রোমান্টিক পরিবেশে গড়ে উঠেছিল প্লটটি। এখন আপনাকে মুখোমুখি পেয়ে জানতে ইচ্ছে করছে, জীবনের ঠিক কোন সময়ে আপনি এটি লিখেছিলেন? সে সময় মনে হয়েছিল চরিত্রগুলোর সঙ্গে আপনার জীবনের নিশ্চয়ই নিবিড় কোনও যোগ আছে। —এ সম্বন্ধে আপনার মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই। সত্যিই কি কার্সিয়াং-এর ওই অপূর্ব পরিবেশে নায়িকার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?

উঃ পঞ্চাশের দশকে ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে আমি মেয়েদের একটি কলেজে বাংলার অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিই। মেয়েরা সে সময় খাতা নিয়ে আমাদের কাছে আসত আর আমরা যত্ন করে তাদের উত্তরগুলো দেখে দিতাম। একটি মেয়ের খাতা দেখতে গিয়ে সে সময় আমি তার ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য দেখে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হই। আমি তাকে খুব উৎসাহ দিতাম।

সেই মেয়েটিকে কলেজ সোস্যাল-এ 'রাজা' নাটকে অভিনয় করতে দেখে অনেকেই মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তারিফও করেছিলেন। পরে যে কোনও অনুষ্ঠানে তাকে বেশ দরদী গলায় রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করতে শুনেছি। কলেজের সবার কাছেই ছিল সে খুব প্রিয়পাত্রী।

শুধু তার লেখাই নয়, সে যখন কথা বলত, তার ভেতরে এমন একটি সংযত সুষমা ছিল যেটা শ্রোতাকে আকর্ষণ করত। ছোট ছোট কথার মাঝে তার, মনের গভীরতার পরিচয় পেতাম।

টেস্ট পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর কলেজ থেকে চলে যাবার সময় মেয়েরা খাতা নিয়ে এল কিছু লিখে দেবার জন্য। দু-চার ছত্র করে লিখেও দিলাম, কিন্তু সেই মেয়েটিকে তখন ওদের সঙ্গে দেখলাম না।

বেশ খানিকক্ষণ পরে সে এল। আমি একা বসেছিলাম প্রফেসর'স রুমে, সে পিরিয়ডে আমার কোনও ক্লাস ছিল না।

সে আমার সামনের টেবিলে তার খাতাখানা মেলে ধরল। মুখে কিছু বলল না।

খোলা খাতার দিকে চোখ পড়তেই আমি দেখলাম, দুটো রজনীগন্ধা রয়েছে সেখানে।

ফুল দুটো তুলে মৃদু হেসে বললাম, রজনীগন্ধা মনে হচ্ছে তোমার খুব প্রিয় ফুল?

ও বলল, এ ফুল আমার বাড়ির ছাদের টবে আমি নিজে তৈরি করেছি।

আমি বুঝলাম, ফুল দুটো ও আমারই জন্য এনেছে।

আমি ওর খাতায় চারটি ছত্র লিখে দিলাম।—

যে অশ্বত্থ ছায়া দেয়
সে অশ্বত্থ হোক তব প্রাণ
জীবনের ক্লান্ত পথচারী
পায় যেন ছায়ার সন্ধান।

এবার ও প্রণাম করে কোনও কথা না বলে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নিঃশব্দে কেটে গেল একটা বছর। ইতিমধ্যে কথাপ্রসঙ্গে কোনও অধ্যাপকের মুখ থেকে শুনেছিলাম, সেই মেয়েটি কলকাতার এক নামী কলেজে অনার্স নিয়ে পড়ছে।

মেয়েটির স্মৃতি ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছিল। হঠাৎ একদিন কুয়াশার আবরণ ভেদ করে সে এসে দাঁড়াল আমার সামনে।

তখন চলছিল পুজোর ছুটি। আমি নির্জনে কাটাব বলে কলকাতার এক বিশিষ্ট পরিবারের কাছ থেকে তাঁদের কার্সিয়াং-এর ছোট্ট কুঠিটি কয়েকদিনের জন্য চেয়ে নিলাম।

প্রঃ আমি কার্সিয়াং-এ যাইনি কিন্তু আপনার উপন্যাসে কার্সিয়াং-এর যে ছবি আপনি এঁকেছিলেন তা আজও চোখের সামনে ভাসছে। এখন ওখানে গেলে কি আমি সেই ছবি দেখতে পাব?

উঃ বহুবছর হল আমি আর কার্সিয়াং-এ যেতে পারিনি কিন্তু এখনও মনে হয় সেন্টমেরী হিল্‌স-এর কোলে ওই ছোট্ট কুঠির আঙিনায় একটি নিঃসঙ্গ পাইনের তলায় বসে, ভোরের রোদ গায়ে মেখে আমি কবিতার বই পড়ছি। পেছনে ডাও হিল জুড়ে সেই সবুজ পাইনের সমারোহ। ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘার ঝকঝকে তুষারশৃঙ্গ। নীচের উপত্যকায় শুভ্র উপবিতের মতো এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে একটা জলধারা। ঝিক্‌ঝিক্ শব্দ করতে করতে একটা টয় ট্রেন লুকোচুরির খেলা খেলছে।

প্রঃ ঠিক ওই মুহূর্তেই কি আপনার উপন্যাসের নায়িকাকে খুঁজে পেয়েছিলেন?

উঃ খুঁজে পাওয়া নয়, সেদিন সশরীরে নায়িকা এসে আমাকে একেবারে অবাক করে দিয়েছিল। সে আর কেউ নয়, আমাদের কলেজের সেই মেয়ে, সীমা চ্যাটার্জি।

আমি যেমন তাকে দেখে আনন্দ বিস্ময়ে হতবাক, সেও তেমনি তার চোখের অবাধ খুশি ধরে রাখতে পারছিল না।

আমি বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, তুমি!

দিদি, জামাইবাবুর সঙ্গে দার্জিলিং-এ বেড়াতে এসেছি কয়েকদিন। এখন ডাও হিলে রয়েছি। মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে একা একা নামতে নামতে ওই বনের পথ ধরে এলাম। সেন্ট মেরীর মূর্তি পেরিয়ে বাঁক নিতেই দেখলাম, আপনার মতো কেউ বসে আছেন। আমার বিশ্বাসই হচ্ছিল না।

আমি ওকে বললাম, দাঁড়িয়ে রইলে কেন বস, আমি এখুনি আসছি—বলে ঘরের ভেতর থেকে আর একটা চেয়ার বের করে আনলাম।

সেদিন টুকরো টুকরো কথা, পুরনো স্মৃতির অ্যালবাম উল্টে উল্টে যাওয়া, নীরবে বসে থেকে অনুভূতিগুলোকে উপভোগ করা — এমনি এলোমেলো আনন্দ বেদনায়, মেঘ রৌদ্রের ছায়ায় ভরে উঠল দুটি হৃদয়।

চার্চে ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছিল। আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে তাকিয়েছিলাম। মুখে কোনও কথা ছিল না কিন্তু নীরবতার ভেতর ফেলে আসা অতীত মুখর হয়ে উঠছিল।

কলকাতা ফিরে এসে সীমাকে নিয়েই আমি আমার প্রথম উপন্যাস লিখে ফেললাম—নাম দিলাম 'ভোরের রাগিণী'।

প্রঃ এটি কোথায়, কোন সময় প্রকাশিত হয়েছিল?

উঃ আমার যতদূর মনে পড়ছে, পাঁচের দশকের মাঝামাঝি কোনও এক সময়ে 'নবকল্লোল'-এর প্রথম শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রঃ সেসময় পাঠক-পাঠিকারা আপনার লেখাটিকে কিভাবে গ্রহণ করেছিল?

উঃ এই উপন্যাসটি প্রকাশের পর শুনেছিলাম 'নবকল্লোল'-এর সম্পাদকীয় দপ্তরে বেশ কিছু প্রশংসাসূচক চিঠি এসেছিল, যদিও সেগুলি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবে দুটি ঘটনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি।

বর্তমান 'নবকল্লোল'-এর সুযোগ্য সম্পাদক প্রবীরকুমার মজুমদার তখন একজন কিশোর ছাত্র। পরে তাঁর মুখে শুনেছিলাম, সে সময় ওই উপন্যাসটি তাঁকেও ভীষণভাবে আলোড়িত করে। আজও সেকথা তাঁর স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

তা ছাড়া উপন্যাসটি রচনার এত বছর পরেও তার আকর্ষণ যে বিন্দুমাত্র কমেনি তার প্রমাণ কয়েকমাস আগে পেয়ে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

প্রঃ কিরকম?

উঃ এক সন্ধ্যায় একটি ফোন এল। কলকাতার বাইরে থেকে এক ভদ্রলোক ফোন করেছিলেন। তিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কথা বলে বুঝলাম, তিনি অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ এক সরকারি অফিসার। তিনি একটি বই খুঁজছেন আর সেটির সন্ধান আমি নাকি দিতে পারি।

জানতে চাইলাম কি বই?

উনি যে বইটির নাম করলেন, সেটি আমারই লেখা প্রথম রোমান্টিক উপন্যাস—'ভোরের রাগিণী'।

আমি আবার প্রশ্ন করলাম, সে তো বহু বছর আগেকার কথা। এখন তো সে বই আর ছাপা নেই। তা ছাড়া এতদিন পরে আপনার সে বইয়ের কথা মনে পড়ল কেন?

ভদ্রলোক বললেন, আমি প্রথম যৌবনে ওই বইটি পড়ে মুগ্ধ হই। পরে আমি জড়িয়ে পড়ি আমার কর্মব্যস্ত জীবনে। আজও আমি সেই বইটির স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছি। অবসর জীবনে আর একবার পড়ব বলে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

খুব খুশি হলাম ওঁর কথা শুনে। আমাদের লেখক জীবনে এ একমস্ত বড় প্রাপ্তি। বললাম, আমার কাছে এখানে একটিও কপি নেই। একখানি মাত্র বই আছে আমার দেশের বাড়িতে। দেশে গেলে বইখানা নিয়ে এসে আপনাকে ফোনে জানাব।

কয়েক মাস পরে দেশ থেকে ফেরার সময় ওই বইটি সঙ্গে করে এনেছিলাম।

ফোন করতেই সস্ত্রীক আমার বাড়িতে ভদ্রলোক এসে গেলেন। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবার। স্ত্রী ইউনিভার্সিটিতে কাজ করেন।

বইখানা হাতে পেয়ে ভদ্রলোক ভারী খুশি হলেন।

চলে যাওয়ার সময় ভদ্রলোক বললেন, কিছু সময়ের জন্য হলেও আপনি আমার হারানো দিনগুলোকে ফিরিয়ে দিলেন।

আমার শুধু মনে হল, বয়স কখনও জীবন থেকে রোমান্সকে মুছে ফেলতে পারে না।

আপন ঘর

প্রঃ 'আপন ঘর' উপন্যাসটি রচনার পেছনে কোনও রকম বিশেষ প্রেরণার তাগিদ ছিল কি?

উঃ ঠিক প্রেরণা বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু লেখার আগে আমি অনুভব করিনি। তবে ধীরে ধীরে একটা যোগাযোগ আমাকে ঐ উপন্যাসটি রচনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

প্রঃ কি ধরনের যোগাযোগ তা যদি একটু স্পষ্ট করে বলেন।

উঃ নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যাই বাঙ্গালোরে।

আমার ভাষণের পর কিছু উৎসাহী শ্রোতা আমার সঙ্গে আলাপ করতে আসেন। কেউ কেউ তাঁদের সম্পাদিত পত্রিকা উপহার দেন। কেউবা স্বাক্ষর সংগ্রহের পর চলে যায়, আবার কাউকে যোগাযোগের জন্য ঠিকানাও দিতে হয়।

কলকাতা ফিরে আসার মাসখানেক পরে একটি চিঠি পাই।

খাম খুলে দেখি এক মহিলা লিখেছেন কোনও টি-গার্ডেন থেকে।

সমস্ত চিঠিটি পড়ার পর বুঝতে পারলাম, এই বিবাহিতা মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বাঙ্গালোরে। বয়স আঠাশ-তিরিশের ভেতর। শান্ত স্বভাব, বুদ্ধিদীপ্ত পরিচ্ছন্ন কথাবার্তা।

চিঠি পড়ে জানলাম, তার স্বামী টি-গার্ডেনে কাজ করেন। আরও জানলাম, পুজোর সময় সে কলকাতায় তার পিত্রালয়ে আসছে, অবশ্যই আমার সঙ্গে দেখা করবে।

শেষে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছে তাদের ঐ টি-গার্ডেনে বেড়াতে যাবার জন্য।

পুজোর আগে মেয়েটি কলকাতায় এসে দেখা করতে এলো আমার সঙ্গে। প্রণাম করে এক প্যাকেট চা উপহার দিল।

ঘণ্টাখানেক ছিল। এইটুকু সময়ের ভেতর সে বেশ স্বাভাবিক দক্ষতায় নিজেকে মেলে ধরল। তার আচরণের আন্তরিকতা সেদিন আমাদের বাড়ির সবাইকে স্পর্শ করেছিল।

ও চলে যাবার পর শ্রীমতী বলল, মেয়েটি বেশ, সবাইকে সহজেই আপন করে নিতে পারে। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ কি?

তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু তো চোখে পড়েনি আমার।

ও একেবারেই উচ্ছল নয়, কথাবার্তায় বেশ সংযত শ্রী আছে। তবে ওর মুখে চোখে আমি কেমন যেন একটা বিষণ্নতার ছায়া দেখেছি।

তাই!

হ্যাঁ, তার কারণও পরে জেনেছি।

কি রকম?

মেয়েটির দশ বছরের ওপর বিয়ে হয়েছে, কিন্তু সে মা হতে পারেনি।

বললাম, আজকাল মেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি মা হতে চায় না।

ওরা কিন্তু মনেপ্রাণে চেয়েছিল।

কোন বিশিষ্ট গাইনির কাছে গিয়েছিল কি?

সে সব চুকেবুকে গেছে। এখন সামনে দীর্ঘ ছায়াপথ। কথার ভেতর মুখখানাতে তাই করুণ ছায়া পড়ে।

মেয়েটি কি সন্তান ধারণে অক্ষম?

শ্রীমতী ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, মেয়েটির কথা তোমার আগে মনে হল, কেন ছেলেটি হতে পারে না?

নীরব হলাম, সঙ্গে সঙ্গে ইতি পড়ল প্রসঙ্গে।

মেয়েটি বেশ কয়েক বছর ধরেই যোগাযোগ রেখেছে। কলকাতা এলেই সে আসে আমার কাছে। তার মুখ থেকে মেঘ-ছায়া ধীরে ধীরে সরে যেতে দেখেছি।

আমি টি-গার্ডেনে গেছি কয়েকবার, যদিও ওদের গার্ডেন আজও আমার অদেখা। তবে চা-বাগানের মানুষজনের অনেক গল্প শুনেছি ওর মুখে।

কদিন আগে ওর একখানা চিঠি এসেছে। খুশিতে একেবারে ডগমগ।

না না, তুমি হয়তো যা ভাবছ তা নয়। নবাগতের কোনও আগমন-ধ্বনি নয়, ও একটা চাকরি পেয়েছে। সরকারি প্রাইমারি স্কুলে বাচ্চাদের পড়ানোর কাজ।

আমি আজ সকালেই ওর চিঠির উত্তর দিয়েছি। চিঠির শেষে একটি ছত্র লিখেছি, 'তুমি সন্তান চেয়েছিলে—পাওনি, এখন দেখ, না চাইতেই বিধাতা তোমাকে ঘিরে শিশুর মেলা বসিয়ে দিলেন।'

নীল অপরাজিতা

প্রঃ এবারের শারদীয় নবকল্লোলে আপনার উপন্যাসটি পড়লাম। প্রচণ্ড এক ঝড়ের রাতে দার্জিলিং-এর বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ পথে যে উপন্যাসের শুরু সেই উপন্যাসের পটভূমি প্রসারিত হয়েছে আর এক মহা দুর্যোগের ধ্বংসলীলার মাঝখানে।

এর পটভূমি এবং চরিত্র সম্বন্ধে আমার বিশেষ কৌতূহল আছে, —এ সম্বন্ধে যদি কিছু আলোকপাত করেন।

উঃ উপন্যাসের শুরুতে যে মেয়েটি দুর্যোগের রাতে বিদ্যুতের আলোয় পাহাড়ি পথ বেয়ে নীচে নেমে এসেছিল, ঠিক একবছর পরে এক সন্ধ্যায় আকস্মিকভাবে টেলিফোনে আমি তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সে

আমার একেবারেই অপরিচিতা। তার কথার ভেতর এমন একটা শান্ত মাধুর্য ছিল যা আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।

কথা অতি অল্পই—আমি আপনার অনেক বই পড়েছি, একবার মুখোমুখি কথা বলতে চাই।

বেশ, একদিন চলে এস।

কবে?

আমি তাকে সময় আর পথনির্দেশ দিয়ে বললাম, তুমি একা খুঁজে আসতে পারবে তো?

পারব।

বিকেল তিনটেয় তার আসার কথা ছিল। সে ঠিক সময়ে এসে হাজির হল।

অল্প বয়স, উজ্জ্বল সুন্দর স্বাস্থ্য। চোখেমুখে বুদ্ধির ছাপ।

মেয়েটির প্রণামের ভঙ্গিটিও ভারী সুন্দর। সে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদনের ভঙ্গিতে পা ছুঁয়ে নমস্কার জানাল।

আমি তাকে বসতে বলে জিজ্ঞেস করলাম, কি নাম তোমার?

সঞ্চারী—সঞ্চারী চ্যাটার্জি।

এরপর ও বেশ কিছুক্ষণ কোনও কথা না বলে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মনে হল, ও কিছু বলতে চাইছে আর আমার দিকে তাকিয়ে হয়তো ভাবছে, ওর কথাগুলোকে আমি কিভাবে গ্রহণ করব?

তুমি কোথায় থাক?

মধ্যমগ্রামে আমার এক দিদির বাড়িতে।

কিভাবে এলে?

ট্রেনে, তারপর বাসে।

তুমি আমার কী বই পড়েছ?

ও দু-একখানা বইয়ের নাম করল।

এবার বল, আমি তোমার জন্য কী করতে পারি?

আমাকে একটু পড়ার সুযোগ করে দিতে পারেন স্যার?

তুমি কি পড়ছ?

পড়তাম, এখন আর পড়ি না। তবে পড়ার দারুণ ইচ্ছে, কোনও সুযোগ পাচ্ছি না।

কতদূর পড়েছ?

ছেলেবেলা থেকেই কনভেন্টে পড়তাম। আর্থিক ব্যাপারে অসুবিধে থাকায় সেখান থেকে একটা ডেসটিটিউড হোমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে আমি খাপ খাওয়াতে পারিনি। তাই ওদের না বলে এক ঝড়ের রাতে পালিয়ে এসেছি।

সবিস্ময়ে বললাম, ঝড়ের রাতে পালিয়ে এসেছ, এত সাহস তোমার?

আমার কথা শুনে ও কেমন যেন সংকুচিত হয়ে গেল।

ও হয়তো ভাবল, আমি ওর হোম থেকে পালিয়ে আসাটাকে ভাল চোখে দেখছি না।

ওর ভুল ভেঙে দিয়ে বললাম, তোমার বয়সী একটি মেয়ে রাতের অন্ধকার আর ঝড়কে উপেক্ষা করে ছুটে আসছে, এ ছবিটা চোখের সামনে যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি।

ও এবার উৎসাহিত হয়ে উঠল। অজস্র কথা বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। —তখন ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, ভীষণ আওয়াজ করে বাজ পড়ছিল, ঢালু পাহাড়ি বনের গাছপালা ভেঙে ছত্রাকার। আমি ঐ পরিস্থিতিতে হোঁচট খেতে খেতে নীচের দিকে নেমে আসছিলাম।

আমার তখন মৃত্যুভয়ের চেয়েও বড় ভয় ছিল, যদি ওরা আমাকে ধরে ফেলে, আবার ফিরিয়ে নিয়ে যায় হোমের ওই খোঁয়াড়ে।

আমি এবার প্রশ্ন করলাম, কোথায় পালাচ্ছিলে তুমি, বাড়িতে?

অসহায় চোখে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, আমার কোনও বাড়ি নেই।

কথাটা কেমন যেন হাহাকারের মতো শোনাল।

সেকি! তোমার বাবা-মা কোথায় থাকেন?

আমি কিচ্ছু জানি না,—বলতে বলতেই ছলছলিয়ে উঠল তার চোখ।

আমি সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলাম। হয়তো ও শৈশবে পথের থেকে কুড়িয়ে পাওয়া কোনও মেয়ে। কারু দয়ায় পৃথিবীর বুকে এতখানি পথ চলে এসেছে।

বললাম, কনভেন্টে ছিলে, হঠাৎ ডেস্টিটিউড হোমে এলে কি করে?

এক ভদ্রলোক আমাকে ছোটবেলা কনভেন্টে রেখে যান। উনি কনভেন্টের খাতায় আমার ফাদার বলে নিজের পরিচয় লিখিয়েছিলেন। ঠিকানা ছিল, কোনও এক মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টের।

কালেভদ্রে দেখা করতে আসতেন, কিন্তু টাকা পাঠিয়ে যেতেন নিয়মিত।

এক সময় বন্ধ হয়ে গেল টাকা। কনভেন্ট থেকে ওঁর ঠিকানায় চিঠি গিয়েছিল। সে চিঠি ফেরৎ আসে। তাতে একটা নোট ছিল, উনি কোনও একটি যুদ্ধে সহযোদ্ধাকে রক্ষা করতে গিয়ে বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন।

এরপর টাকার অভাবে কনভেন্ট থেকে আমাকে একটা ডেস্টিটিউড হোমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে বেশ কিছুকাল থাকার পর ঐ ঝড়ের রাতে পালিয়ে এসেছি।

জানতে চাইলাম, তারপর কোথায় কাটালে এতদিন?

ঝড় একসময় থেমে গিয়েছিল। আমি তখন ক্ষতবিক্ষত, শীতের কামড়ে কাহিল। বনের ভেতর হঠাৎ আগুনের শিখা দেখে আমি এগিয়ে গেলাম। এক বৃদ্ধ আগুন জ্বালিয়ে গা হাত সেঁকছিল।

এরপর সঞ্চারী তার জীবনের যত কথা বলেছে, সেগুলি আমি সত্যনিষ্ঠভাবে উপন্যাসের প্রথম পর্বে রূপদান করেছি।

কলকাতায় সে যখন আমার সঙ্গে শেষ দেখা করে তখন গুজরাট বিধ্বস্ত হয়ে গেছে ভূমিকম্পে। প্রতিদিনের সংবাদ-মাধ্যম সেই বিপর্যয়ের অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে সারা ভারতের মানুষকে বিহ্বল ও ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।

আমি সেই পরিস্থিতির ভেতরেই আমার নায়িকার পরিক্রমার একটা পরিকল্পনা করি।
উপন্যাসের পটভূমি আদ্যন্ত বাস্তব সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

তুমি রবে নীরবে

প্রঃ অনেক সময় গভীর ভালবাসা তার পূর্ণতায় পৌঁছতে পারে না। না পাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে ভারী হয়ে ওঠে বাতাস। তাই কবির কণ্ঠেও শুনতে পাই সেই একই বেদনার উচ্চারণ ঃ

"ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্র নয়ান,
কে দিয়েছে হেন শাপ কেন ব্যবধান,
কেন উর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ,
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ।"

এই উপন্যাসে দেবারতি আর সুপর্ণের প্রেম সেই চিরন্তন বন্ধনহীন প্রেমের বেদনা কি বহন করছে না?

উঃ প্রেমে মিলন আকাঙ্ক্ষিত কিন্তু সমস্ত প্রেমই মিলনের সেই সুখস্বর্গে উন্নীত হতে পারে না।

সুপর্ণ এবং দেবারতিও সেই না পাওয়া প্রেমের বিরহই বয়ে বেড়িয়েছে। তবে এই কাহিনীতে দেবারতি একটা মহৎ ত্যাগের ভেতর দিয়ে তার পূর্ণতাকে খুঁজে পেয়েছে।

সে অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ, ভোগসর্বস্ব নয়। সে যদি নিজের স্বপ্নের মানুষটির সঙ্গে মিলনের বাঁধনে জড়িয়ে পড়ত তা হলে সে শুধু আত্মসুখই লাভ করত, কর্তব্য বা ত্যাগের ভেতর দিয়ে ভোগের যে আনন্দ তা কোনওদিনই পেত না।

মা বাবা চলে যাবার পর সংসারের পুরো দায়িত্ব এসে পড়ল তার ওপর। ছোট ভাইবোন দুটিকে মানুষ করার জন্য সে চাকরির সন্ধান করতে লাগল।

তার এই মানসিক সংগ্রামের দিনে বন্ধু সুপর্ণর কাছ থেকে এল বিয়ের প্রস্তাব। সুপর্ণর মা মৃত্যুপথযাত্রী তাই তিনি তার পুত্রবধূকে দেখে যেতে চান।

সুপর্ণর প্রস্তাবটি ছিল দেবারতির কাছে একান্ত কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু সে সবদিক ভেবে সেই ডাকে সাড়া দিতে পারল না।

শেষ পর্যন্ত কর্তব্যই তার কাছে বড় হয়ে দাঁড়াল। নিজের বোনটিকে সে বধূরূপে সমর্পণ করল তার প্রেমিকের হাতে।

প্রঃ দেবারতির এই গোপনীয়তাই কি অমৃতার মৃত্যুর কারণ নয়?

উঃ এখানেই ভাগ্যের কাছে হার মানতে হয়। শুভবুদ্ধিতে দেবারতি যা করতে চেয়েছিল ভাগ্যের নিষ্ঠুর আবর্তে তা কেবল দীর্ঘশ্বাসেই পরিণত হল।

যে প্রেমকে অন্তরের গভীর গহনে রেখেছিল দেবারতি সহসা তা চলে এল অমৃতার দৃষ্টির আলোতে। সে বুঝতে পারল, সুপর্ণ তার প্রতি একান্ত অনুরক্ত নয়। তার প্রথম প্রেম আজও জুড়ে রয়েছে তার হৃদয়। এই বেদনা অমৃতার কোমল হৃদয়কে ভেঙে চূর্ণ করে দিল। সে স্বেচ্ছায় নিভিয়ে দিল তার জীবনের আলো।

প্রশ্ন করেছেন : রোমি সাহা
উত্তর দিয়েছেন : লেখক

মাথুর

পেতলের চেনে বাঁধা ঝাড় লণ্ঠনটা দোল খাচ্ছে। বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ। একটা ভেজা দমকা হাওয়া মাঝে মাঝে গঙ্গার জল ছুঁয়ে বয়ে আসছে। আর সেই সঙ্গে টুংটাং আওয়াজ তুলছে ঝাড়ের প্রিজমগুলো। বেলোয়ারী কাঁচের ইন্দ্রধনু খেলা চলেছে সাদা দেওয়াল আর সাদা ফরাসের ওপর।

তেতলার খাস কামরা। নীচেই প্রবাহিনী গঙ্গা। জলোচ্ছ্বাস এলে শান বাঁধানো ঘাটের পাটে আঘাত লেগে কলধ্বনি ওঠে। তেতলা থেকে শোনা যায় সে শব্দ। গঙ্গার ধার ঘেঁষে পাঁচিল। তারপর খানিকটা বাগান এলাকা। শ্বেত পাথরের কতকগুলো আসন, পিঠের দিকে সিংহাসনের আকার। লতা পাতার সুন্দর কাজ করা। গ্রীক ভাস্কর্যের অনুকরণে ক'টি নারীমূর্তি। তাদের মাঝখানে একটি বিকশিত পদ্মের আকারে জলকুণ্ড। মাঝে ছোট্ট একটি বেদির ওপর দাঁড়িয়ে এক নগ্ন শিশু বাম পদ নাচের ভঙ্গিতে পশ্চাতে তুলে ঊর্ধ্বমুখে একটা বিষাণ বাজাচ্ছে। আর তাব ঐ বিষাণটার মুখ দিয়ে ফোয়ারার ধারায় ছড়িয়ে পড়ছে জল।

মেয়েরা নগ্নদেহে স্নানের উদ্যোগ করছিল, হঠাৎ কেউ এসে পড়ায় লজ্জা ঢাকতে বাহুর আড়ালে উদ্ধত স্তনযুগল আবৃত করে কিছুটা নত হয়েছে।

বসুমল্লিক বংশের প্রথম পুরুষ রায়বাহাদুর দিবানাথ লক্ষ্ণৌ থেকে দুটি মুসলমান ভাস্কর ও তাদের সাকরেদদের আনিয়ে এ কাজ করিয়েছিলেন। পুত্র উষানাথ বাবার মতো শৌখিন ছিলেন না, কিন্তু পিতৃধন রক্ষার কাজে তিনি অতন্দ্র প্রহরী ছিলেন। জমিদারী বেশ খানিক বাড়িয়েছিলেন তিনি। নায়েব গোমস্তাদের ওপর বিত্ত আহরণের ভার দিলে তার অর্ধাংশ যে মধ্য পথে অপহৃত হবে তা তিনি জানতেন। তাই দূর দুরান্তের মহালের কাছারীবাড়িতে বছরে একবার হলেও তাঁর পদার্পণ ঘটত। দোল দুর্গোৎসব পিতা দিবানাথের কালের মতো সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত। কিন্তু সেই উৎসব উপলক্ষে পক্ষকাল ধরে পিতার আমলের মতো বাঈজী নাচের ব্যবস্থা হত না। বড় জোর মন্দির চত্বরে কৃষ্ণযাত্রার অনুষ্ঠান হত অথবা হরিসংকীর্তনের আসর বসত।

তাঁর পুত্র উমাশঙ্কর পিতার মৃত্যুর পর বিরাট স্টেটের হাল ধরলেন। যথাযথ ব্যয়ের মাঝেই যে সঞ্চয়ের সার্থকতা তা তিনি অন্তরে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই লোক-কল্যাণমূলক বহু প্রতিষ্ঠান তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠল। তাঁর বাহির মহলের বৈঠকখানার পাশেই স্থাপিত হল পাবলিক লাইব্রেরি। প্রাচীন পুঁথিপত্র সংগ্রহের কাজে বিদ্যোৎসাহী যুবকদের লাগিয়ে দিলেন। অর্থ দিয়ে কিনে নিলেন মহাজ্ঞানী পণ্ডিতদের মহামূর্খ উত্তর পুরুষদের কাছ থেকে মূল্যবান সংগ্রহশালার দুর্লভ গ্রন্থসম্ভার। দিশি বিদেশী গ্রন্থে বিরাট লাইব্রেরি দিনে দিনে আরও বর্ধিত হতে লাগল।

এদিকে বড় বড় হাসপাতালে নতুন ওয়ার্ড স্থাপনে প্রভূত অর্থ দান করলেন। স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজেও হাত লাগালেন। দুই পুরুষের বিপুল অর্থের সঞ্চয় যখন এইভাবে ব্যয়ের ভেতর দিয়ে সার্থক হতে লাগল তখন দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল বসুমল্লিকদের নাম।

অর্থ নির্গমনের পথ খুলে দিয়েছিলেন উমাশঙ্কর কিন্তু অর্থাগমের দিকে নজর দেবার অবকাশ ছিল না তাঁর। তাই আয়ের চেয়ে ব্যয়াধিক্য দেখা দিল। দূরের কয়েকটি তালুক হাতছাড়া করতে হল আরব্ধ কিছু কিছু কল্যাণমূলক কাজ সমাপ্ত করবার জন্য।

এতে পরোক্ষ একটা মঙ্গল হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে রুদ্রশঙ্কর আবার অর্থসঞ্চয়ে মন দিলেন। এখন আর পুরনো জমিদারীর তদারকীতে যে বিপুল অর্থাগম হবে না তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই অর্থলগ্নি করতে লাগলেন বিভিন্ন ব্যবসায়ে। সুফল ফলল। বাড়ি থেকে রোজ

মহানগরীতে যাবার কোন অসুবিধাই নেই। চোখের ওপর চালালেন নিজ ব্যবসায়ের তদারকী। আবার ফেঁপে উঠল ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স। বসুমল্লিক পরিবার নাম যশের সঙ্গে সঙ্গে বিত্ত সম্পদও অটুট রাখতে পারলেন।

আশ্চর্য এই বসুমল্লিক বংশ। পঞ্চম পুরুষেও সংসারে এল একটি মাত্র পুরুষ সন্তান। রুদ্রশঙ্কর তাকে ব্যবসায়ের কাজে নামাবার কথা ভাবলেন না। প্রথম থেকেই নজর রাখলেন তার শিক্ষা দীক্ষার দিকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রের ছাপ নিয়ে যখন বেরিয়ে এল আনন্দশঙ্কর তখন রুদ্রশঙ্কর তাকে আই এ এস পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে বললেন।

আনন্দশঙ্কর বলল, ওসব আমার ভাল লাগে না বাবা, তার চেয়ে একটা রিসার্চ-টিসার্চ করলে অনেক বেশি তৃপ্তি পাব।

রুদ্রশঙ্কর মা-হারা ছেলেটিকে কোনদিনই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বলতেন না। তাই ছেলের কথা শুনে বললেন, বাবার লাইব্রেরিতে তো বইয়ের অভাব নেই, তাছাড়া বাইরের ছেলেমেয়েরা এসে রিসার্চের জন্যে পুঁথিপত্র ঘেঁটে যাচ্ছে, তুমিও না হয় তাই কর। ঘরে বসে পড়াশোনার সঙ্গে লাইব্রেরিটাও দেখাশোনা করতে পারবে।

বছরখানেক তাই চলল। আনন্দশঙ্কর লাইব্রেরি নিয়েই মত্ত হয়ে রইল। রিসার্চ যা এগোল তার চেয়ে বেশি এগোতে লাগল নানা বিষয়ে পঠন পাঠন।

অসাধারণ সুপুরুষ পুত্রটির দিকে নান ধরনের মহিলার নজর পড়ছে দেখে রুদ্রশঙ্কর ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। আনন্দশঙ্কর প্রতিবাদ করল না।

রুদ্রশঙ্কর অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ এক অধ্যাপকের একটিমাত্র মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করলেন। মেয়েটি সদ্য গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। রূপের সঙ্গে আকর্ষণীয় একটা কমনীয়তা মাখানো। তাই প্রথম দৃষ্টিতেই মেয়েটিকে বসুমল্লিক পরিবারের বধূ করে আনতে দারুণ আগ্রহ বোধ করেছিলেন রুদ্রশঙ্কর।

অধ্যাপক ভদ্রলোকের যে পরিমাণ বিদ্যা ছিল সে পরিমাণে বিত্ত ছিল না। তার ফলে এত বড় বাড়ীতে কন্যাদানের প্রস্তাবে তিনি বিব্রত আর অসহায় বোধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে অপ্রস্তুত হবার কোন সুযোগই দেননি রুদ্রশঙ্কর। বরযাত্রী পাঠিয়েছিলেন নাম-মাত্র। অন্তরালে থেকে আত্মভোলা অধ্যাপককে কোন কিছু বুঝতে না দিয়ে তিনি কন্যাপক্ষের অনেক ব্যবস্থার দায় নিজের ওপর তুলে নিয়েছিলেন। এক কথায় মেয়েটিকে পুত্রবধূ করে ঘরে আনার প্রবল ইচ্ছাতেই তিনি উপযাচক হয়ে সব কিছু করে গেলেন।

সুপর্ণা ঘরে এল, আর রুদ্রশঙ্করের মনে হল, বসুমল্লিক বংশে লক্ষ্মী সরস্বতীর যুগলবন্দী হল।

ঝাড়লণ্ঠনটা দুলে চলেছে। নীচে সাদা ফরাসের ওপর কালো পাড় সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরে হাতের ওপর মাথা রেখে একপাশ হয়ে দেহটাকে ভেঙ্গে শুয়ে পড়ে আছে আনন্দ। বিয়ের সাত আটটা দিন অনুষ্ঠান আর আত্মীয় সমাগমে হাঁপিয়ে উঠেছিল আনন্দ। আজ নিস্তব্ধ বাড়ির খাসকামরায় সে পরম নিশ্চিন্তে গড়াতে দারুণ একটা তৃপ্তি বোধ করছিল।

ঝাড়টা দুলছে, নীচের ফরাসে আলোছায়ার রেখাচিত্র আঁকা হচ্ছে। সেদিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখছে আনন্দশঙ্কর।

কে যেন দরজা পেরিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। আনন্দশঙ্কর সেদিকে তাকাল না। সে জানে রোজ সন্ধ্যায় তাকে বিরক্ত করতে আসে প্রহ্লাদদা। এই বৃদ্ধ তার পরিবারের প্রধান পরিচারক। কৈশোরে মা মারা যাবার পর প্রহ্লাদদাই ছিল তার একমাত্র সঙ্গী। স্কুলে যাওয়া এবং ফিরে আসার সময় প্রহ্লাদদাকে থাকতে হয় তার সঙ্গে। গাড়িতে ড্রাইভার থাকলেও প্রহ্লাদদা যদি কোনদিন ফেরার সময় না থাকত তাহলে ঘরে এসে অনর্থ বাধাত আনন্দ। বৃদ্ধকে অশ্বের ভূমিকা নিতে হত, আর আনন্দ লাফ দিয়ে উঠত তার পিঠের ওপর। সারা করিডোর আর হলঘরে পিঠে নিয়ে বেড়াতে হত আনন্দকে। বৃদ্ধের পিঠে আনন্দর কীল পড়ত দমাদ্দম।

কলেজে ঢুকতে চিত্রের একটু বদল হল। প্রহ্লাদদা রোজই আসত গাড়িতে আনন্দের সঙ্গে। বসে

থাকত গাড়ির ভেতর, নয়তো প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটের বাঁদিকে বটগাছের তলায়। টিফিনের সময় দু-একজন বন্ধু রোজই থাকত আনন্দের সঙ্গে। তারা আনন্দের জলখাবারে ভাগ বসাত।

কোন কোনদিন ঘরের জলখাবারে রুচি হত না আনন্দের। সে বন্ধুদের নিয়ে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে যেত কোন অভিজাত রেস্টুরেন্টে।

যদি কোনদিন কোন সহপাঠিনী গাড়িতে উঠত তাহলে ঘরে ফেরার সময় আনন্দের ওপর একহাত নিত প্রহ্লাদদা।

যদি এ নিয়ে আনন্দ ধমক দিত তার প্রহ্লাদদাকে তাহলে বৃদ্ধ কেঁদে কেটে না খেয়ে বাড়ি মাথায় করত। শেষ-মেশ আনন্দকেই বৃদ্ধর কাছে হার মেনে গোপনে 'আর হবে না' বলে কথা দিতে হত। অবশ্য দুপুরে গাছতলায় বসে বসে ঝিরঝিরে বাতাসে বুড়োর ঘুম এসে যেত। সেই ফাঁকে চুপি চুপি বন্ধু আর বান্ধবীদের নিয়ে পুরনো বইয়ের দোকানের পাশে রাখা অ্যাম্বাসাডার চেপে কোন কোনদিন পালাত আনন্দ। ফেরার সময় সঙ্গীদের নামিয়ে দিত বেকার ল্যাবরেটারীর ওদিকে। একা গাড়ি চালিয়ে আসত গেটের সামনে। বুড়ো সঙ্গীহীন আনন্দকে দেখে আর সন্দেহ করতে পারত না।

চৈতালী ভারী চালাক মেয়ে। সে সময় অসময়ে প্রহ্লাদদার কাছে এসে গল্প জুড়ে দিত। প্রহ্লাদদা ছাড়া যে আনন্দের এক পা-ও চলার সাধ্য নেই সে কথাটি উস্কে দিত অমনি কথার খৈ ফুটত প্রহ্লাদদার মুখে। তখন শৈশবের ইতিহাস এক কাহন করে বলতে বসত বুড়ো। চৈতালী গালে হাত দিয়ে, কখনো বা কোমরে হাত রেখে পরম ধৈর্যশীল শ্রোতার ভূমিকা নিত। তাই আনন্দের বান্ধবী গোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র চৈতালীরই ছিল প্রহ্লাদদার চোখের ওপর দিয়ে আনন্দের গাড়িতে ওঠার অধিকার।

কিন্তু আনন্দের প্রেমে ব্যর্থ চৈতালীকে যেদিন তার সামনে চোখের জল ফেলতে দেখল প্রহ্লাদদা, সেদিন বৃদ্ধর চোখও অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। সে বুঝতে পারল না প্রেমের আশাভঙ্গের কথা, কিন্তু ঘরে ফেরার পথে আনন্দকে অভিযুক্ত করল। আনন্দ কোন কথা বলল না দেখে বৃদ্ধ আরও ক্ষেপে উঠল এবং আনন্দের বন্ধুগোষ্ঠীর ভেতরে চৈতালীই যে অনন্যা সেকথা তারস্বরে প্রচার করল। আনন্দ গাড়ি থেকে নেমে বলল, তাহলে আর কি, ঘরে তুলে নিয়ে এস চৈতালীকে এ বাড়ির বউ করে। বড়কর্তা তোমাকে ফুল দিয়ে পুজো করবে।

তারপর থেকে বৃদ্ধ প্রহ্লাদ চৈতালীর কথা নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করেনি। চৈতালীর ওপর প্রহ্লাদদার যত অনুকম্পাই থাক না কেন তার রাঙাদাদার বউ করে নিয়ে আসবার মতো মেয়ে যে চৈতালী নয়, তা সে ভাল করেই জানে।

অবশ্য ইউনিভারসিটিতে পড়ার সময় একাই গাড়ি চালিয়ে যেত আনন্দ। প্রথম দিকে অভিমান করে বৃদ্ধকে বলতে শোনা যেত, এখন বুড়ো হয়েছি কিনা, চোখে ভাল দেখতে পাই না, তাই আমাকে তোর আর দরকার হয় না। আর তুইও তো এখন অনেক বড় হয়ে গেছিস, দে আমায় ছুটি করে। আমি গোপালের মন্দিরে সকাল সন্ধ্যে কাঁসর বাজাব, আর ওখানেই প্রসাদ পাব।

আনন্দ সবার চোখের আড়ালে বুড়োকে জড়িয়ে ধরে তার মানভঞ্জন করত। এতেই বুড়োর অভিমান উবে যেত কর্পূরের মত।

ইউনিভারসিটি থেকে ফিরতে দেরি হলে বুড়ো হানটান করত। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বসে থাকত সদর গেটের পাশে দারোয়ানের ঘরে। পরিচিত গাড়ির হর্ন বাজলে তবেই নিশ্চিন্ত হত বুড়ো।

এ হেন প্রহ্লাদদার হাতে একটা বিশেষ কাজ ছিল। সন্ধ্যায় ঘরের জিমনাসিয়ামে এক্সারসাইজ করে যখন আনন্দ তার খাস কামরায় ঢুকত তখন পেস্তার এক গ্লাস শরবত নিয়ে আসত বুড়ো। আনন্দ কয়েক চুমুকে সেটুকু নিঃশেষ করে ফেলত। বুড়ো বলত, আজ কেমন বানিয়েছি ভেইয়া?

আনন্দ অমনি বলত, বহুৎ আচ্ছা, তবিয়ৎ খুশ্ হো গিয়া।

বুড়ো খুশি হয়ে চলে যেত।

কিন্তু পাশ করার পর আর জিমনাসিয়ামে ঢোকেনি আনন্দ। রোজ একই অভ্যেস চালিয়ে যেতে ভাল লাগল না তার। যেদিন এটা মনে এল অমনি ছেড়ে দিল এতদিনের অভ্যেস। ওর স্বভাবের ভেতর এমনি একটা খামখেয়ালীপনা কাজ করত। যা একবার ধরত তার শেষ দেখে তবে ছাড়ত।

জিমনাসিয়াম ছেড়েছিল আনন্দ কিন্তু নাছোড় প্রহ্লাদদার হাত থেকে রেহাই পায়নি সে। প্রতি সন্ধ্যায় ঠিক তেমনি পেস্তার শরবত খাইয়ে ছাড়ত তাকে।

বিয়ের এই সাত আটটা দিন শুধু ঘটে গেছে ব্যতিক্রম। চিরাচরিত অভ্যেস আর অনুষ্ঠানে কিছুটা ছেদ পড়েছে।

গত সন্ধ্যায় একা পড়ে পড়ে ঘুমচ্ছিল আনন্দ। সেই সুযোগে ঘরে ঢুকে তাকে জাগিয়ে শরবত খাইয়ে গেছে সে। প্রহ্লাদদা যাবার সময় উপদেশ দিয়ে বলে গেছে, আর যা করিস এই শরবতটা ছাড়িস না। তোর শরীরের ঐ যে চেকনাই আর তাগদ তা শুধু জানবি এই শরবতের জোরেই। আজ তাই যখন ফরাসের ওপর শুয়ে দরজার কাছে পায়ের সাড়া পেল, তখন না তাকিয়েই বলল আনন্দ, ঐ টেবিলের ওপর রেখে যা প্রহ্লাদদা, আমি খাব'খন।

কিছুক্ষণ পরে মনে হল আনন্দর, প্রহ্লাদদা তো এমন কথা শোনার পাত্র নয়। না খাইয়ে কিংবা একটা কথা না বলে চলে যাবে এ যে প্রহ্লাদদার চরিত্রের বাইরে। ফরাসের ওপর পাক খেয়ে উঠে বসে দরজার দিকে তাকাল আনন্দ।

এ কি! এ যে প্রহ্লাদদার শরবতের গ্লাস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুপর্ণা!

উঠে দাঁড়াল আনন্দ। সংকোচ মেশা গলায় বলল, বুঝতে পরিনি তুমি এসেছ। সুপর্ণা তার বড় শান্ত আর সুন্দর চোখের দৃষ্টি আনন্দর মুখের ওপর ফেলে বলল, নাও, এটুকু খেয়ে নাও। প্রহ্লাদদাই আমার হাতে পাঠিয়ে দিল।

আনন্দ এগিয়ে গিয়ে বলল, খেতে পারি একটা শর্তে।

প্রশ্নবোধক চিহ্ন ফুটে উঠল সুপর্ণার মুখে।

আনন্দ বলল, তোমাকেও এতে ভাগ বসাতে হবে।

একটা আশ্চর্য সুন্দর লজ্জা লালের ছোঁয়া দিয়ে গেল সুপর্ণার মুখে। সে অসম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

আনন্দ পায়ে পায়ে ফিরে গেল ফরাসের মাঝখানে। শরীরটাকে আবার এলিয়ে দিল তার ওপর। যেমন শুয়েছিল তেমনি পাশ ফিরে শুয়ে রইল।

সুপর্ণা এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল আনন্দের দিকে। হাঁটু ভেঙে বসে বাঁ হাতের একরাশ চুড়িতে রিন্‌ঝিন্ আওয়াজ তুলে আনন্দের গায়ে হাতের ছোঁয়া দিয়ে বলল, এমন করছ কেন, খেয়ে নাও। না খেলে প্রহ্লাদদা মনে ভারী কষ্ট পাবে।

এবার শুয়ে শুয়েই জবাব দিল আনন্দ, কষ্ট পেল তো ভারী বয়েই গেল। এমন মানুষের হাত দিয়ে তাকে পাঠাতে কে বলেছিল, যে একটুও কথা শোনে না।

সুপর্ণা বলল, এমন পাগলামী করলে কে কথা শুনতে পারে বল।

আনন্দ বললল, ঐ পাগলামীই আমার বহাল রইল। যে প্রহ্লাদদার হাত থেকে শরবত এনেছে সে না খেলে আমি খাব না। আর.......।

সুপর্ণা বাধা দিয়ে বলল, না, আর কিছু বলার দরকার নেই। গ্লাসটা ধর, আমি আর একটা গ্লাস আনছি।

আনন্দ বলল, তা বইকি, এক গ্লাসে খেতে হবে। রাজী?

সুপর্ণা বলল, আচ্ছা খাও তো আগে, তারপর দেখা যাবে।

উঁহু, বিশ্বাস নেই তোমাকে, আগে তুমি খাও তারপর আমি।

কিছুতেই আগে এঁটো করে দিতে চাইল না সুপর্ণা, কিন্তু আনন্দ একহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে হাতে গ্লাস নিয়ে প্রায় জোর করেই খাওয়াল। তারপর আদ্ধেকটা নিজের মুখে তুলতে যেতেই বাধা দিল সুপর্ণা, দাও, আমি সবটুকু খেয়ে নিই, আজ আর খেতে হবে না তোমাকে।

কে শোনে কার কথা। ততক্ষণে পেস্তার শরবত পার হয়ে গেছে আনন্দের গলা দিয়ে। কাঁদো কাঁদো সুপর্ণা বলল, ইস কি বিচ্ছিরি কাজ করলে তুমি বল তো'!

আনন্দ বলল, আমার নাম আনন্দশঙ্কর। শঙ্করের মতই আমার ক্ষ্যাপামি, আর ঐ দেবতাটির মতই আমি সিদ্ধির ভক্ত। আবার ঐ সিদ্ধিটুকু যদি আমার পার্বতীরূপিনী পত্নী প্রসাদ করে দেয় তাহলে ঐ সিদ্ধিই হয়ে যায় অমৃত।

সুপর্ণা স্বভাবে শান্ত। সে বলল, দয়া করে এবার গ্লাসটা দাও, আমি যাই। পরের দিন থেকে যার কাজ সে-ই করবে।

গ্লাসটা সরিয়ে রেখে আনন্দ বলল, তাহলে আমি আর ঐ শরবতই খাব না।

সুর্পণা বলল, সে বোঝাপড়া প্রহ্লাদদার সঙ্গেই কর। দেখা যাবে কে হারে।

আনন্দ করুণ গলায় বলল, আচ্ছা, তোমার প্রাণে কি একটুও দয়ামায়া নেই, ঐ প্রহ্লাদদাকে দিয়ে আমাকে জব্দ করতে চাও।

সুপর্ণা বলল, ঐ তোমার ডাক্তার, কখন কি ওষুধ দিতে হবে তা ও জানে।

আনন্দ বলল, তুমি কি আজ থেকে কম্পাউন্ডারের কাজে বহাল হলে নাকি?

সুপর্ণা বোকার মতো মুখ করে বলল, কেন?

কেন আর কি, প্রহ্লাদ ডাক্তারের প্রেসক্রিপসান সার্ভ করছ।

ও এই কথা—বলে সুপর্ণা উঠে দাঁড়িয়ে চলে যাবার জন্যে দরজার দিকে পা বাড়াতেই শাড়ির লুটিয়ে পড়া আঁচলটা চেপে ধরল আনন্দ।

মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে সুপর্ণা চাপা গলায় বলল, আঃ ছাড়। আমি না কম্পাউন্ডার। কত রোগীর প্রেসক্রিপসান এখন আমাকে সার্ভ করতে হবে।

এবার বোকামী করে বসল আনন্দ, বলল, কি রকম, আমি ছাড়া আর রোগী আছে কে তোমার?

সুপর্ণা বলল, এখন থেকে প্রহ্লাদদা সব কাজ আমার হাতে তুলে দিয়েছে। বাবার সন্ধ্যা আহ্নিক হয়ে গেলেই দুটো সন্দেশ আর জল খাবেন। এখন প্রহ্লাদদার বদলে আমাকেই হাজিরা দিতে হবে। পুরনো মহলে পিসিমার রাতের ফলমিষ্টি দিয়ে আসা, রাধাগোবিন্দব মন্দিরে গিয়ে প্রণাম সেরে চরণ তুলসী নিয়ে আসা, এইসব হাজারো কাজ এখন থেকে আমার।

হতাশ গলায় বলল আনন্দ, তাহলে আমার ভাগে কি পড়ল? বিয়ে করলাম আমি, আর বউ হল বারোয়ারী খিদমৎগার!

সুপর্ণা বলল, ছিঃ ওকথা মুখে এনো না। এ তো আমার সৌভাগ্য। বাবার এক ছেলে তুমি। পুত্রবধূর ওপর তাঁর কতখানি দাবী ভেবে দেখত। আমি তাঁকে দেখব না তো কি ঝি চাকরে দেখবে। তাছাড়া বিধবা পিসিমা চোখে ভাল দেখেন না। কাল প্রহ্লাদদাকে দিয়ে চুপিচুপি আমাকে ডেকে বললেন, মামনি, বুড়ো হয়েছি, কেউ দু'দণ্ড কাছে এসে বসে না। সেই কবে রামায়ণের সিকিটা পড়েছিলাম। বনবাসে গেল তিনজন। তারপর চোখের মাথা খেয়ে তাদের আর খবর নিতে পারিনি। মাঝে মাঝে একটু এসে রামায়ণখানা শুনিয়ে যাবে মা?

বুড়ো মানুষ, বড় নিঃসঙ্গ। দুপুরে একবারটি ওঁর কাছে যেতে হবে।

এদিকে আবার গোদরেজের চাবি কাল থেকে আমার জিম্মায়। দরকার মত টাকা পয়সা বের করে দিতে হবে তাঁকে। ব্যবসার কাজে যখন তখন বেরিয়ে যাচ্ছেন, কখন কি চেয়ে বসেন সজাগ থাকতে হবে সারাক্ষণ।

তাছাড়া ঝি চাকরের...।

কথাটা আর শেষ করতে দিল না আনন্দ। বলল, সবার সমস্ত দাবী মিটিয়ে যদি কিছু পড়ে থাকে অবশেষে তাই দিও এ অকিঞ্চনকে।

সুপর্ণা বলল, এমন করে কথা বললে আমি আর আসব না তোমার কাছে।

আনন্দ বলল, অভিরুচি তোমার। আমি আবার তাহলে ব্যাচিলার জীবনে ফিরে যাব।

সুপর্ণা আহত হল। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। তারপর পায়ে পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আলোটা নিভিয়ে দিয়ে জানালার বড় বড় গরাদ ধরে বন্দীর মত চেয়ে রইল আনন্দ। তাল তাল মেঘের ফাঁকে চাঁদ আশ্চর্য ছবি আঁকছে। পারদের মত গঙ্গার প্রবাহ। দু'চারখানা জেলে নৌকো ঢেউয়ের ওপর জেগে উঠছে আবার হারিয়ে যাচ্ছে। নৌকার আলোগুলো গঙ্গার জলের ওপর আলোর ফুলের মত ফুটে উঠছে আবার ডুবে যাচ্ছে।

ওপারের তীরভূমি দীর্ঘ আলোকিত রাতের রেলগাড়ির মতো মনে হচ্ছে। কাল থেকে ভাদ্রের শুরু। শরতের আরম্ভ। যদিও বর্ষা বিদায়ের সময় এখনও আসেনি তবুও ধারা শ্রাবণের ঘোরটা কেটে গেছে। ভাদ্রের মাঝামাঝি শুরু হবে শুক্লপক্ষ। পূর্ণিমা আসবে আশ্বিনের সীমা ছুঁয়ে। বসুমল্লিক বংশের ধারা অনুযায়ী বিয়ের পরে যে কোন এক পূর্ণিমায় বরবধূ যাবে পুরনো দিনের বজরায় গঙ্গা বুকে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে।

বিয়ের ঠিক পরেই এসেছিল পূর্ণিমা। কিন্তু সে পূর্ণিমায় নৌবিহার সম্ভব ছিল না। শ্রাবণের আকাশ থমথমে দৃষ্টি মেলে চেয়েছিল। রুদ্রশঙ্কর তাই পিছিয়ে দিয়েছেন নবদম্পতির বজরা বিহার পরিকল্পনা। সেই আশ্বিনের নির্মল আকাশে জেগে থাকবে পূর্ণিমার চাঁদ, আর বজরার ভেতর সাজানো ঘরে বসে সে চাঁদ দেখবে বরবধূ। গান আর হাসির তরঙ্গ মিশবে গঙ্গার জলতরঙ্গের সঙ্গে। কথা গল্প কৌতুকে সাতটি দিন কাটবে জলের বুকে। তারপর ফিরে আসবে বজরা বসুমল্লিক ঘাটে।

আনন্দের মনে হল, সুপর্ণা উচ্ছল নয়। একটা শান্তশ্রী তার ভেতর রয়েছে। নারীর উচ্ছলতা সুরার মত মাদক। তা মনকে রঙে রসে বৈচিত্রে মাতিয়ে তোলে। কিন্তু চঞ্চলতায় মনোহারিত্ব থাকলেও চিরস্থায়িত্ব নেই। এক সময় এই উচ্ছলতার প্রবাহে ভাটা পড়ে আসে। তখন অবশেষ থাকে ক্লান্তি। আর শান্ত জীবনের ভেতর আছে গভীরতা। সেখানে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত স্নান করা যায়। নিরন্তর শান্তি সেখানে। জীবনের চিরদিনের আশ্রয়।

আনন্দের মনে হল সে যেন বসে আছে বিবাহ মণ্ডপে। শুরু হয়েছে পাণিগ্রহণ অনুষ্ঠান। বাম হস্তে নিহিত বধূর অঙ্গুলি দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করে সে মন্ত্র পাঠ করে চলেছে : 'ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু, মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু'।

ওগো কন্যা, তোমার হৃদয় আমার কর্মে অর্পণ কর। তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুরূপ হোক।

এরপর শুরু হল সপ্তপদী অনুষ্ঠান। প্রজ্জ্বলিত হোম শিখা। পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সপ্তমণ্ডলী। সুপর্ণার হাত ধরে আনন্দ এক একটি মণ্ডলীতে বধূর পদ চালিত করছে আর একটি করে মন্ত্র উচ্চারণ করছে। প্রতি মন্ত্রে ধনলাভ, সখ্যলাভের প্রার্থনা। সঙ্গে সঙ্গে বধূকে পতির অনুব্রতা হওয়ার এবং পুত্রাদি লাভের জন্য উপদেশ দান।

সপ্তপদী অনুষ্ঠানের শেষে সিদ্ধ হয় বিয়ে। আনন্দ পুরোহিতের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করে চলে : 'ওঁ সখা সপ্তপদী ভব, সখ্যন্তে গমেয়ং সখ্যান্তে মা যোষাঃ সখ্যান্তে মাযোষ্ঠ্যা।

হে কন্যা তুমি আমার সহচারিনী হও, আমি তোমার সখা হলাম। আমার সঙ্গে তোমার যে সখ্য হল তা যেন স্ত্রীগণ ছিন্ন করতে না পারে।

সর্বশেষে সে উচ্চারণ করেছিল সেই মহামন্ত্র : 'যদেতদ্ধৃদয়ং মম। যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।'

হে কল্যাণী বধূ, আজ থেকে তোমার ঐ হৃদয় আমার হোক আর আমার এ হৃদয় তোমাব হোক।

সমস্ত মন্ত্রগুলি স্পষ্ট উচ্চারিত হয়েছিল। শিক্ষিত পুরোহিত সমবেত দর্শকদের কাছে বাংলা ভাষায় ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যাও সঙ্গে সঙ্গে করে যাচ্ছিলেন।

এ মন্ত্র জানা ছিল আনন্দের। বিয়ের বাসরে যাবার আগেই সে পুঙ্খানুপুঙ্খ পড়েছিল মন্ত্রগুলি। বুঝে নিয়েছিল তার অর্থ। অকারণ কতকগুলো শব্দ না বুঝে উচ্চারণ করে যাবার বাসনা আদপেই ছিল না তার।

বারবার সে সুপর্ণার মুখের দিকে চেয়ে দেখেছে। প্রতিটি অনুষ্ঠানে সুপর্ণার মুখে সে দেখেছে অপূর্ব প্রশান্তি। শুধু একবার সুপর্ণাকে সে দেখেছে ভিন্ন মূর্তিতে। পুরোহিত তখন ব্যাখ্যা করছিলেন একটি মন্ত্রের : সুপর্ণার বড় বড় চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মন্ত্র ব্যাখ্যাকারের মুখের ওপর।

বর তার বধূকে বলছে, হে কল্যাণী, আমার জীবনব্রত তোমার জীবনব্রত হোক। তোমার ঐ চিত্ত আমার চিত্তের অনুগামী হোক। তুমি অনন্যমনা হয়ে পালন কর আমার বাক্য। বিশ্ব দেবগণ আমাদের উভয়ের হৃদয়কে মিলিত করুন। সমীরণ, বিধাতা ও বাগদেবী আমাদের সংযুক্ত করুন সর্বতোভাবে।

আনন্দের মনে হল সুপর্ণার বড় বড় নিষ্পলক দুটি চোখে জল টলমল করছে। তার অন্তরের গভীর অনুভূতিকে সে যেন ধরে রাখতে পারছে না। হৃদয় ছাপিয়ে গড়িয়ে আসছে সে ধারা।

সেই মুহূর্তে আনন্দের মনে হয়েছিল, সুপর্ণা অনন্যা। বাবা রুদ্রশঙ্করের নির্বাচনের ওপর সেদিন সত্যিই আনন্দ গভীর শ্রদ্ধা বোধ করেছিল।

একটা দমকা হাওয়া বয়ে এল ঘরের ভেতর। আনন্দ শুনতে পেল অন্ধকারে ঝাড়ের বেলোয়ারী কাঁচগুলো সেতারের ঝংকারের মতো বেজে উঠল। আশ্চর্য একটা মিষ্টি গন্ধ তার নাকে এসে লাগল। কেয়া, বর্ষার প্রিয় ফুল কেয়া। কিন্তু কোথায় ছিল এ ফুল। তার নীচের বাগানে তো কেতকী নেই। তবে! গন্ধের খোঁজে ফিরে দাঁড়াল আনন্দ। হ্যাঁ, গন্ধের উৎসটা তার ঘরের ভেতরেই। এগিয়ে গিয়ে আলোটা জ্বেলে দিল আনন্দ। ঐ তো, দরজার পাশে ঘরের কোণায় মেহগনির গোল টিপয়টার ওপরে কাজ করা ঝকঝকে রূপোর ঘটি। তার ওপর বসানো একটি কেয়াফুল। সবুজ পাতাগুলো ভূট্টার মত সাদা ফুলটাকে ঢেকে সরু হয়ে উঠে গেছে ওপরের দিকে। সাদা রূপোর ঘটিতে কি চমৎকার মানিয়েছে ফুলটা।

আনন্দ হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতে ফুলটাকে ধরে জোরে জোরে শ্বাস টেনে গন্ধ নিতে লাগল। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল, কে নিঃশব্দে তার অন্যমনস্কতার অবসরে রেখে গেল এই ফুল!

সঙ্গে সঙ্গে সমাধানে পৌঁছে গেল সে। এ নিঃশব্দচারিণী সুপর্ণা ছাড়া কেউ নয়। কোথা থেকে বর্ষার ফুল নিজের খুশীতে সংগ্রহ করে এনেছে সে। তারপর সাজিয়ে সন্তর্পণে রেখে গেছে যথাস্থানে। আনন্দের মনে হল, সুপর্ণা ঘর ছেড়ে সরে যায়নি, ঐ ফুলের ঋজু নিটোল রূপ আর সুগন্ধের মাঝখানে সে প্রচ্ছন্ন মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে।

রাতে শোবার ঘরে দেখা গেল সুপর্ণাকে। নাইলনের নীলাভ মশারীর ভেতর ডানলোপিলোর বালিশে মাথা রেখে শুয়ে ছিল আনন্দ। ড্রেসিং টেবিলের মুখোমুখি বসে চুলগুলো বেঁধে নিচ্ছিল সুপর্ণা। দেওয়াল থেকে একটা আলো উদ্ধত ভুজঙ্গ ভঙ্গিমায় এসে পড়েছিল তার মুখের ওপর। প্রতিবিম্ব পড়েছিল সামনের আয়নায়। আনন্দ কপালের ওপর হাত রেখে ঘুমের অভিনয়ের ফাঁকে আড়চোখে দেখছিল সুপর্ণাকে। ঠাকুর্দার আমলের আয়না। ঝকঝকে পালিশ করা মেহগনির কাঠের স্ট্যান্ডে বিরাট ওভাল শেপের বেলজিয়াম গ্লাস। নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে সুপর্ণার। আনন্দ ভাবছে, তার ঠাকুরমা যখন বধূ হয়ে এসেছিল এ পরিবারে তখন সঙ্গে যৌতুক নিয়ে এসেছিল এ আয়নাখানা। কত প্রভাত সন্ধ্যায় ঠাকুরমা তার তরুণী বধূমূর্তি দেখেছে এ আয়নার ভেতর। বিশ্বস্ত ভাবে এ দর্পণ দিনের পর দিন তাকে দেখিয়েছে তার প্রতিটি দৈহিক পরিবর্তন। যৌবনের উজ্জ্বল রূপসজ্জা প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে প্রশান্ত হয়েছে। রূপোলী কেশগুচ্ছ একটি একটি করে তুলে দেবার চেষ্টা করেছে ওরই দিকে তাকিয়ে। তারপর থেমে গেছে সকল চেষ্টা। মেনে নিয়েছে মহাকালের পরিবর্তন। শুধু সিঁথিতে সিন্দুর চিহ্ন এঁকে দেবার সময় বড় তৃপ্তি নিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখেছে নিজের এয়োতি মূর্তি।

মা এসেছে বধূ হয়ে। শাশুড়ী এই গঙ্গামুখি সেরা ঘরখানা পুত্রবধূকে ছেড়ে দিয়ে প্রস্থান করেছে পিছনের মহলে। মা নববধূর বেশ নিয়ে লক্ষ্মীর মহিমায় এসে দাঁড়িয়েছে এই দর্পণেরই সামনে। মায়ের রূপ নাকি এ বংশের বধূদের ভেতর ছিল সব থেকে সেরা। নাম ছিল কমলা। বৃদ্ধ পুরোহিত বলতেন, বসুমল্লিক বংশে যথার্থ লক্ষ্মী প্রতিমার আবির্ভাব ঘটেছে।

সুপর্ণা সুন্দর। সুপর্ণার শ্রী সংযমের শ্রী। আনন্দ দর্পণে দেখলে, সুপর্ণা কাঁধের ওপর দিয়ে বিনুনীটা বুকে টেনে নিয়ে বাঁধছে। সমস্ত চোখেমুখে কিসের যেন মগ্নতা। চোখ দুটো খোলা, কিন্তু চেয়ে আছে যেন মনের অনেক গভীরে।

কি ভাবছে সুপর্ণা! অতীত জীবনের কোন ব্যর্থ ভালবাসার কাহিনী নয় তো। কথাটা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে কি যেন এক অজানা ব্যথার ঢেউ বুক ঠেলে উঠে এল আনন্দের। পরক্ষণেই মনে হল, কি যা-তা

ভাবছে সে। বিছানার ওপর ছড়ানো মোতিয়া বেল তো সুপর্ণার সমস্ত অন্তরটাকেই প্রকাশ করে দিয়েছে। সন্ধ্যায় তার খাস কামরায় গোপনে কেয়াফুল রেখে আসা, রাতের বিছানা ভরে আমোদী মোতিয়া বেল ছড়ানো, এ কি মিথ্যা অভিনয় হতে পারে! আবার তাকাল আনন্দ সুপর্ণার দিকে। প্রসাধন শেষ করে সুপর্ণা উঠে দাঁড়িয়েছে সন্তর্পণে। শব্দ হলে পাছে ঘুম ভেঙে যায় আনন্দের, তাই সুপর্ণার সাবধানতা। সে একবার তাকালো মশারির দিকে, লাইটের সুইচটা অফ করল। ঘর অন্ধকার, তবে আলোর রেশ একেবারে মুছে যায়নি। বাইরের মেঘসজ্জা চাঁদের আলোটুকু একেবারে শুষে নিতে পারেনি। চাঁদের সেই অতি ক্ষীণ আলোর একটা ম্লান তরল প্রবাহ ঘরের ভেতর। জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সুপর্ণা। দুটো হাত জোড় করে নমস্কার করল। আনন্দ বুঝল, গঙ্গার ওপারে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী আর দ্বাদশ শিবমন্দিরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাল সুপর্ণা।

এবার পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে অতি সন্তর্পণে মশারি তুলে বিছানায় ঢুকল সে। ডানলোপিলোর গদিতে অস্বাভাবিক কোন আওয়াজ উঠল না।

কিছুক্ষণ বসে রইল সুপর্ণা বিছানার ওপর। আবছা অন্ধকারে চেয়ে রইল পাশে শুয়ে থাকা মানুষটার দিকে। মনে হল বিছানা থেকে ছড়ানো কয়েকটা ফুল কুড়িয়ে দুটো বালিশের মাঝখানটাতে জড়ো করে রাখল।

আস্তে শরীরটাকে বিছানার ওপর ঢেলে দিতে যেতেই ঘটল বিপর্যয়। অন্ধকারে মুহূর্তে বিছানার ওপর আনন্দ পেতে দিল তার হাত, আর ঠিক তারই প্রসারিত হাতের ওপর সুপর্ণা ঢেলে দিল তার দেহ।

এক পলকে আনন্দের বুকের বলিষ্ঠ বাঁধনে বাঁধা পড়ল সুপর্ণা। নিষ্ঠুর পেষণে মথিত সুপর্ণা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আনন্দের দুটি ঠোঁট তার সব কথার দ্বার রুদ্ধ করে দিল। বিহ্বল সুপর্ণা গভীর এক ধরণের বেদনা বোধ করতে লাগল। এবেদনা অসহ্য এক সুখের ভেতর থেকে জন্ম নিল তার মনে।

এই তার জীবনের প্রথম রজনী, যেদিন সে অনুভব করল সে পরিপূর্ণ নারী। এর আগের ক'টি রাত নানা বাধায় অতিক্রান্ত। আজ প্রথম সুপর্ণা পেল তার স্বামী সান্নিধ্য। দেহে মনে সে আজ কি এক অপ্রাপনীয়কে পেয়েছে। সেই অনুভূতিতে আচ্ছন্ন সুপর্ণার ঘুম এল না চোখে। টুকরো টুকরো কথায় কাটল রাতের অনেকগুলি প্রহর। এখন রাত গভীর। আনন্দ ঘুমে অচেতন। বৃষ্টি আবার শুরু হয়েছে। বৃষ্টির শব্দে কেমন যেন এক ধরনের মাদকতা আছে। এ শব্দ শুনলে ঘুম আসেনা সুপর্ণার চোখে। বিয়ের আগে কত রাত সে ধারা পতন ধ্বনির সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান ধরেছে রবীন্দ্রনাথের। পাশের ঘরে কখন ঘুমিয়ে পড়তেন সুপর্ণার বাবা। সুপর্ণা একা জাগত বৃষ্টির রাতগুলো, সঙ্গী শুধু নির্বাচিত বর্ষার ক'টি গান। আজ আর গান গাইল না সুপর্ণা। বৃষ্টির গানে যার জন্যে আকুল পথ চাওয়া, সে যে আজ তার পাশে। তাই সব গান তার থেমে গেল ঘুমন্ত ঐ মানুষটির দিকে চেয়ে।

অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না, সুপর্ণা আনন্দের একখানা হাত বুকের ভেতর ভরে নিয়ে শুয়ে রইল। এই তার ঐশ্বর্য, এই তার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়ার সুখ।

রাত শেষে ঘড়িতে পাঁচবার পাখি ডাকতেই বিছানায় উঠে বসল সুপর্ণা। তাদের শোবার ঘরের ঘড়িটা যখন বেজে ওঠে তখন একটা পাখির মিষ্টি ডাক শোনা যায়। এ বাড়িতে অনেক ঘড়ি আছে। রায়বাহাদুর দিবানাথ বড় শৌখিন ছিলেন। সাহেব-সুবোদের পার্টি দিতেন। কালা আদমি হলেও অনেক ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে তাই তাঁর ভাবসাব ছিল। ওইসব ইংরেজ পরিবারের কেউ কেউ যখন হোমে ফিরে যেত তখন অনেক শৌখিন জিনিস উপহার দিয়ে যেত রায়বাহাদুর দিবানাথ মসুমল্লিককে। দিবানাথের শখ ছিল নানা ধরনের ঘড়ি সংগ্রহের। উপহারে পাওয়া ঘড়ি আর বিদেশ থেকে আনানো ঘড়িতে ঘর প্রায় ভরে গিয়েছিল। যেহেতু কোন ঘড়ির সময় একেবারে এক নয়, সেহেতু ঘড়িগুলো একই সঙ্গে বেজে উঠত না। আর তাই প্রতিটি ঘড়ির বাজনার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যটা বোঝা যেত। কোনটাতে পাখি ডাকত, কোনটাতে পিয়ানোর গৎ বেজে তবে ঘণ্টা পড়ত। আর একটি ঘড়িতে একটা

বাজার সময় হলে একটি পুতুল নাচ দেখিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে ভেতরে ঢুকে যেত। এমনি দুটো বাজার সময়, আসত দুটি পুতুল। বারোটা বাজার সময় ঘড়ি থেকে বারোটি পুতুল নাচতে নাচতে সামনের স্টেজে বেরিয়ে আসত। তারপর হাত ধরে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে নেচে ঘণ্টাধ্বনি করে ঘড়ির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেত।

সে ঘড়ি এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে। লাইব্রেরি ঘরের দোতলার বারান্দায় এখনও সে ঘড়ি তেমনি নাচের আসর জমায়। পুরনো দিনের জিনিস মাত্রেই যেন খুব যত্নে তৈরি। বড় একটা খারাপ হতে জানে না।

পাখির ডাকে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কেশ বেশ সংযত করে নিয়ে সুপর্ণা একবার তাকাল আনন্দের দিকে। চৈতন্য ফিরে আসার কোন লক্ষণই নেই। সুপর্ণা ঘরের কোণে রাখা বর্ষার একটি পাতা সমেত কদম ফুল তুলে এনে রাখল আনন্দের বিছানার পাশে। ওর হাতটা তুলে ঠোঁটে ছুঁইয়ে আলতো করে একটা চুমু খেল। তারপর ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল।

রিসার্চের কাজে বিয়ের পর আরও বেশি আগ্রহ নিয়ে লেগে গেল আনন্দ। সকালে জলযোগের পর লাইব্রেরি ঘরে ঢোকা, পঠন পাঠনের পর মধ্যাহ্নভোজ, তারপর দুপুরের বিশ্রামের জন্যে ঘরে না ঢুকে লাইব্রেরির ইজিচেয়ারে কিছুক্ষণ এলিয়ে পড়ে থেকে আলস্য কাটানো, এই হল দিনের প্রোগ্রাম। সন্ধ্যায় গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে বন্ধুদের বাড়ি একটু আড্ডা দিয়ে ফিরতে ফিরতেই রাতের খাবারের আসনে বসা, তারপর সোজা শোবার ঘরে ঢোকা—এখন এগুলোই হল আনন্দের নিত্যদিনের রুটিন বাঁধা কাজ।

কোন কোন দিন ব্যতিক্রম না ঘটে তা নয়। বাবা রুদ্রশঙ্কর কাজকর্ম দেখে ফিরে আসার পর হঠাৎ কি মনে করে ডাক দেন আনন্দশঙ্করকে।

আনন্দ কাছে এসে আদেশ শোনার জন্যে বাধ্য ছেলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

রুদ্রশঙ্কর বলেন, তোমার নিজের গাড়ি রয়েছে, বৌমাকে নিয়ে একটু বেরিয়ে আসতে পার। সে বেচারা সারাদিন ঘরে বন্দি হয়ে থাকে, তারও তো একটু বাইরে যেতে ইচ্ছে করে।

বাবার কথায় ঐ এক আধ দিনই গাড়িতে করে বেরোয় দুজনে। যাওয়া আর ফিরে আসা—দুটো সময়েই বাবার সামনে দিয়ে যেতে হয়। কেমন যেন সংকোচ লাগে দুজনের। সুপর্ণা বলে, সন্ধ্যায় রাধাগোবিন্দের মন্দিরে আরতি আর কীর্তন শুনতে আমার ভাল লাগে। রোজ সন্ধ্যায় বেড়িয়ে কাজ নেই। তাছাড়া বাবার সামনে দিয়ে এমন করে দুজনে বেরিয়ে যাই, আমার যেন কেমন অস্বস্তি লাগে। উনি ক্লান্ত হয়ে যখন ফিরবেন তখন আমরা হাওয়া খেতে বেরোলাম!

অতএব দুজনের প্রতি সন্ধ্যায় বন্ধুদের বাড়ি আড্ডা দিতে যাওয়া, অথবা সিনেমা থিয়েটারে ঢোকা হয়ে ওঠে না।

এ বাড়ির গায়ে যেন প্রাচীন একটা গন্ধ লেগে আছে। সুপর্ণা বান্ধবীদের নিয়ে বিয়ের আগে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসত। কিন্তু এখানে এসে সে নিজেকে ধীরে ধীরে সবকিছুর বাঁধনে বন্দি করে ফেলেছে। এ যেন তার স্বেচ্ছা বন্দিত্ব।

দুপুরে কোন সময় নিজের ঘর থেকে দীর্ঘ বারান্দা পেরিয়ে যাবার সময় যদি আনন্দের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, আর আনন্দ তাকে ডাক দেয় শোবার ঘরের দিকে, অমনি চোখে শাসনের ছবি ফুটিয়ে সে আনন্দকে নিবৃত্ত করে।

হতাশ আনন্দের দিকে একবার পিছন ফিরে হয়তো বলে, অত লোভি হওয়া ভাল নয়। জান না কি এখন আমরা বনপর্বে রয়েছি। পিসিমা হা-পিত্যেশ করে আমার পথের দিকে চেয়ে রয়েছেন।

চলে যায় সুপর্ণা। আনন্দ তাকিয়ে থাকে, যতক্ষণ না করিডোর পেরিয়ে সুপর্ণা চোখের আড়াল হয়। একটি ছন্দিত রাগিণী যেন ওর পদক্ষেপে বেজে ওঠে।

শরতের পূর্ণ চাঁদ আকাশে জেগে আছে। দু-একটি জলশূন্য সাদা মেঘ থমকে দাঁড়িয়ে আকাশের গায়ে। জ্যোৎস্না কিরণে স্নান করে যেন শুভ্র শুচি হয়েছে। গঙ্গার স্রোতে ভেসে চলেছে বজরা। মাঝি ধরে আছে হাল। কুচি কুচি রূপার খেলা চলেছে জলের ওপর। বজরার ভেতর বিছানায় বসে আছে ওরা দুজনে। ছোট্ট জানালার ফাঁকে দেখা যাচ্ছে আলোয় ধোয়া চরাচর। আনন্দশঙ্করের মুখের দিকে চেয়ে আছে সুপর্ণা।

আনন্দ বলল, কেন পীড়াপীড়ি করছ সুপর্ণা, যদি আমাদের জীবনে কোনদিন কিছু ঘটেও থাকে তাহলে এ জীবনে তাকে মনে করে দুঃখ পাওয়া কেন।

সুপর্ণা বলল, সত্য যত কঠিন হোক তাকে সহ্য করার শক্তি আমার আছে।

তুমি এত শক্তি ধর তা তো জানতাম না।

জানি, তুমি শুধু কথা ঘোরাবার চেষ্টা করছ আনন্দ।

আনন্দশঙ্কর বলল, বাবার সামনে আমার নাম ধরে ডেকো তো একবার।

সুপর্ণা বলল, তোমার খেয়ালখুশি মেটাতে নামটা উচ্চারণ করছি, কিন্তু এ কথা জেনে রেখ বাড়ি গিয়ে সাধ্যসাধনা করলেও তোমার নাম আমার মুখ দিয়ে বের করতে পারবে না।

আনন্দ বলল, যখন রাতে চরাচর নিস্তব্ধ হয়ে যাবে, বসুমল্লিক বাড়ির পোষা কুকুরটিও আর জেগে থাকবে না, তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আলো নিভিয়ে অন্ধকার ঘরে বলব, তুমি কোথায়?

সঙ্গে সঙ্গে তোমার কাছ থেকে উত্তর ভেসে আসবে, এই যে আমি আনন্দ।

সুপর্ণা বলল, না মশায়, না। অভ্যেস খারাপ হয়ে গেলে গুরুজনদের সামনে মুখ ফস্কে বেরিয়ে যাবে নাম। ওতে আমি নেই।

কিন্তু তোমার চেয়ে বিপাশা এ ব্যাপারে অনেক সংস্কার মুক্ত ছিল।

বিপাশা কে?

বলেছি তো, পুরনো চিঠির ঝাঁপি খুলতে গেলে অনেক কষ্টের ঝড় বইবে।

সুপর্ণা শক্ত গলায় বলল, আমাকে শোনাতেই হবে তোমার বিপাশার কথা। না শোনালে আমি বজরা বাড়ি মুখো ফেরাতে বলব।

আনন্দ বলল, বাব্বাবা। এমন পাল্লায় তো পড়িনি কখনও।

সুপর্ণা আনন্দের হাত ধরে বলল, বিশ্বাস কর, আমি কিচ্ছু মনে করব না। একটু হয়তো দুঃখ পেতে পারি, কিন্তু তোমাকে একটুও ছোট ভাবব না।

আনন্দ বলল, আগে বল, তুমি কেন শুনতে চাইছ?

বিশ্বাস কর, কৌতূহল।

শুধু কৌতূহল? নিজের মনের দিকে চেয়ে বল।

সুপর্ণা বলল, বিয়ের সময় মন্ত্র উচ্চারণ করে বলেছি, দুজনের হৃদয় এক হোক কিন্তু কি করে তা সম্ভব হবে যদি আমাদের মনে গোপন কিছু থাকে।

আমি তোমার সঙ্গে একমত।

সুপর্ণা বলল, আরও দেখ, আমি আমার স্বামীকে বুকে ধরে আছি আর সেই মুহূর্তে আমাকে পরিপূর্ণ আলিঙ্গনে বেঁধে সে ভাবছে তার প্রেমিকার কথা, সে মৃত্যু আমি চাই না আনন্দ।

আনন্দ বলল, যদি কোনদিন তেমন ভাবনা মনে জাগে তাহলে জেনো আমি তার আগেই তোমাকে স্পর্শ না করে দূরে সরে যাব, অনেক দূরে।

সুপর্ণা আনন্দের হাতখানা চেপে ধরে বসে রইল। এই মুহূর্তে তার আবেগ-মথিত হৃদয় তার বাক্‌শক্তিতে রোধ করে দিয়েছিল। সে একসময় স্বাভাবিক হয়ে বলল, আমি আর তোমার অতীতের কথা জানতে চাই না আনন্দ।

আনন্দশঙ্কর বলল, বলতে আমার দ্বিধা নেই, ঘটনা অতি সামান্য। যদি কোন দিন সন্দেহের কীট ঢুকে পড়ে তোমার মনে তার পথ বন্ধ করে দিতে চাই।

সুপর্ণা তার মুখের দিকে চেয়ে আছে দেখে আনন্দ বলল, প্রেসিডেন্সিতে বিপাশা আমার নীচে পড়ত। সে নাচে গানে অভিনয়ে মাতিয়ে রাখত অনুষ্ঠান। স্বাভাবিকভাবে তার চারদিকে গুনগুন করে ফিরত মৌমাছিরা। বিপাশা ওদের আমলই দিত না।

একদিন কলেজের একটা ফাংশানের শেষে বৃষ্টি নেমে এল। সেদিন প্রহ্লাদদার শরীরটা ভাল ছিল না বলে আমার সঙ্গে যায়নি। আমি গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, আমার সামনে এসে বিপাশা বলল, আমাকে একটু লিফ্‌ট দেবে আনন্দ?

ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল। তুমি রূপের ডালি হতে পার, ভাল গাইয়ে নাচিয়ে হতে পার, তাহলেও তুমি পড় আমার নীচে, তুমি আমার নাম ধরে ডাকবে!

ইচ্ছে করেই বললাম, উঠে আসুন।

ও গাড়িতে ঢুকে আমার পাশেই বসল। বলল, নাচ কেমন লাগল?

বললাম, ছেলেগুলোকে নাচাবার মতই নাচ।

ও অমনি বলল তুমিও ঐ দলে নাকি?

মনে হল ঠাস ঠাস করে ক'টা চড় কসিয়ে দিই ওর গালে। কিন্তু একবার যাকে গাড়িতে তুলেছি, তাকে তো আর বলতে পারি না বেরও।

সুপর্ণা বলল, এমন কলাবতী একটি তরুণী তোমার পাশে, কোথায় দোলা লাগবে রক্তে, তা না এমন কাঠখোট্টার মতো ভাবনা তোমার।

আনন্দ বলল, শোনই না। ওর কথার উত্তরে বললাম, আনন্দশঙ্কর তো আর একটা বাঁদর নয় যে এক নাচনেওয়ালি তার গলায় দড়ি পরিয়ে নাচাবে।

'নাচনেওয়ালি' কথাটা এমন গলায় বললাম, যাতে মনে হল বিপাশা দারুণ রকম ঘা খেল। মুহূর্তে সে ডিসিসান নিয়ে ফেলল। গাড়ির দরজা খুলে ফেলে বলল, তোমার সময় নষ্ট করে দিলাম বলে কিছু মনে কর না। তুমি ভাল ছেলে হতে পার তা বলে আমিও নিশ্চয়ই ফ্যালনা নই।

বৃষ্টি তখন ঝেঁপে এসেছে। ও বেরিয়ে পড়ার জন্যে পা বাড়াতেই আমি বাঁ হাতে ওকে ধরে ফেললাম। বললাম, কি পাগলামি করছ বিপাশা, এই বৃষ্টিতে কেউ বেরোয়!

ও বলল, নাচনেওয়ালি তোমার মতো ভদ্রলোকের গাড়িতে যাবার যোগ্য নয়।

একটি মেয়েকে গাড়িতে তুলে আমার যে রূঢ় কিছু বলা উচিত হয়নি তা তখন মনে হল। তাই ওর হাতটা জোর করে ধরেই বললাম, কই, যাও তো দেখি কেমন করে যাবে।

ও বলে উঠল, তাহলে কিন্তু পৌঁছে দিতে হবে দক্ষিণেশ্বরে আমার বাড়িতে।

বললাম, আবদার আর কি।

ও অমনি বলল, তুমি তো বাপু থাক দক্ষিণেশ্বরের উল্টো দিকে। আমার জন্যে না হয় একটু কষ্ট করলে। বিবেকানন্দ ব্রিজটা পার হতে হবে, এই যা।

বললাম গ্লাসটা তোল। জলের ছাট আসছে দেখছ না।

ও দরজার কাচ ভাল করে বন্ধ করে গুছিয়ে বসল।

অমনি সুপর্ণা বলে উঠল, আর তুমি তখন গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে হয়ে গেলে চলতি হাওয়ার পন্থী

আনন্দ বলল, বাগড়া দিলে কিন্তু গল্প আর এগোবে না।

বিশ্বাস কর, বাধা দিইনি। তুমি কি কৌতুকও বোঝ না।

আনন্দ বলল, তারপরে ঐ বৃষ্টির ভেতর ওকে নিয়ে গেলাম ওর বাড়িতে। মা বাবা নেই, মামা মামীর কাছে মানুষ। টিনের শেড থেকে জল গড়িয়ে উঠোন বোঝাই। ও আগে নেমে গেল। বোধহয় মামাকে কিছু বলল। দেখি বৃদ্ধ মানুষটি জলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে এলেন আমার গাড়ির কাছে, অনুরোধ করলেন ঘরের ভেতর যেতে।

কি করি, জল ঠেলে গেলাম ভেতরে। ঘরের দাওয়ায় চৌকি পাতা। খাতির করে বসালেন তার ওপর। ভেতরে ঢুকলেন আবার। ঘর থেকে বেরিয়ে এল বিপাশা। কলেজের শাড়ি ইতিমধ্যে ছাড়া

হয়ে গেছে। আটপৌরে শাড়িতে মানিয়েছে বেশ। আমার কিন্তু মনে হল, চেহারা কিংবা চলনে-বলনে মামার সঙ্গে যেন কোন মিলই নেই বিপাশার।

বিপাশা গলা নিচু করে বলল, বড় গরিব আমার মামা, আর আমি তো একেবারে নিঃস্ব। তোমাকে খাতির করার অবস্থা আমাদের নয়।

হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, আমি কি জামাই এসেছি তোমার বাড়ি যে তোমার মামা এমন অসহায় হয়ে পড়লেন?

কথাটা বলেই আমার মনে হল, ভাল করিনি।

বিপাশা বলল, জামাই হলে তো ভাবনা ছিল না, ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে চাটাই পেতে বসাতাম, আর এই বাদলে মুড়ি তেলেভাজা খাওয়াতাম।

বললাম, চল ভেতরে যাই, মুড়ি তেলেভাজাই খাব।

বিপাশা বলল, গরিবের বাড়িতে এলে বড়লোকদের অনেক রকম খেয়াল জাগে।

তার মানে তুমি কি বলতে চাও?

বিপাশা বলল, তুমি এসেছ এই আমাদের ভাগ্যি, তার বেশি কিছু চাই না।

কি হল আমার সেদিন সুপর্ণা, ওকে বলেই বসলাম, কেন, কিছু চাইবার নেই আমার কাছে? চেয়েই দেখ না।

ও মাথা নিচু করল, তারপর পা চালিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল।

এরপর মামা এলেন, গল্প করলেন। মামি মুড়ি তেলেভাজা খাওয়ালেন অনেক সংকোচে কিন্তু আর একবারও সামনে এল না বিপাশা।

বিপাশার মামা বললেন, অসাধারণ জেদ ওর। ছেলেবেলায় ইস্কুলে ওকে কেউ টপকে যাবে, এ অসহ্য ছিল ওর কাছে। রাত জেগে পড়বে। পাড়ার শিক্ষিত বৃদ্ধ ভদ্রলোকদের দরকার মতো ফাইফরমাশ খাটবে আর পড়া বুঝিয়ে নেবে।

নাচ গানের একটা ইস্কুল আছে এই পল্লীর সামনে। আসা যাওয়ার পথে ও যেত ওখানে। এমন তন্ময় হয়ে গান শুনত আর নাচ দেখত যে আমরা পাশ দিয়ে গেলেও আমাদের লক্ষ্যই করত না। ওর এই আগ্রহ দেখে ইস্কুলের প্রোপ্রাইটার ওকে বিনি পয়সায় ভর্তি করে নেন। মেয়ের অর্থ নেই কিন্তু আত্মসম্মান জ্ঞান টনটনে। ওখানে ক্লার্কের কাজ করে দিত আর নাচ গান শিখত। তারপর ওর প্রতিভা দেখে কলকাতার এক গুণী শিল্পী ওকে কলকাতার ভাল একটা প্রতিষ্ঠানে শেখার সুযোগ করে দেন। ও এখন যতটুকু শিখেছে তাঁর দয়াতেই।

সেদিন বিপাশার সংগ্রামি জীবনের কথা শুনে ওর ওপর একটা আকর্ষণ বোধ করেছিলাম। বৃষ্টি থামলে চলে এলাম ওর ঘর থেকে। অতি সাধারণ বাড়ি, অতি সাধাবণ জীবনযাত্রা, তবু সেদিন কিছুটা অসাধারণ বলেই মনে হয়েছিল ঐ বাড়িটাকে। কলেজের অন্যতম মক্ষীরানী এই বাড়িরই বাসিন্দা, কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা সম্ভ্রম বোধ জেগেছিল মনে।

আশ্চর্য, পরের দিন থেকে ওকে আর আমার কাছে আসতে দেখিনি। দূর থেকে ওকে ক্লাসে ঢুকতে দেখতাম। মনে হত ও আমাকে এড়িয়ে চলেছে। যখন ক্লাস শেষে গেট দিয়ে বেরত তখন পাছে আমার মুখোমুখি হতে হয় তাই এক ঝাঁক বান্ধবীর সঙ্গে বকম বকম করতে করতে বেরিয়ে যেত।

একদিন টিফিনের সময় বেরিয়েছিল দোকানে কিছু কেনাকাটা করতে, আমিও রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে খাতা কিনছিলাম, দেখা হয়ে গেল। বললাম, দাঁড়াও বিপাশা, কথা আছে।

ও চমকে উঠল বলেই মনে হল। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

বললাম, আজ শেষের ক'টা ক্লাস কামাই করলে কি খুব অসুবিধেয় পড়বে?

বিপাশা বলল, কেন বলুন তো?

এই দেখলাম, বিপাশা আমাকে সম্মান দেখিয়ে কথা বলল।

বললাম, এখানে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে তো আর কেনর উত্তর দেওয়া যায় না। যদি আপত্তি না থাকে তো চল আমার গাড়িতে।

ও অমনি আমাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে বলল, ঐ যে গাছতলায় তোমার বডিগার্ড বসে আছে।

বললাম, এই তো এতক্ষণে আসল ভাষাটি বেরল মুখ দিয়ে। আজ্ঞে আপনি চালালে তোমাকে মানায় না।

ও বলল, গাড়িটা কফি হাউসের সামনে নিয়ে এস, আমি ওখানেই উঠব।

গাড়িতে ওকে তুলে নিয়ে বললাম, খাতা বই ফেলে আসনি তো।

কেন বল তো?

আমি তোমাকে গঙ্গার ধারে নিয়ে যাব।

ও হেসে বলল, গঙ্গায় ডোবাবে নাকি?

বললাম, না, জলে কেমন করে ভেসে থাকতে হয়, তাই শেখাব।

ও বলল, খাতা বই যা, সব এই ব্যাগে আছে।

গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বললাম, গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে ফেরার সময় তোমাকে মিনিবাসে তুলে দেব, এএকবারে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে যাবে।

বিপাশা বলল, মিনিবাসে যাবার মত পয়সা নেই আমার।

পয়সার জন্যে ভাবনা করছ কেন, ও আমি দিয়ে দোব'খন।

ও আমার দিকে কেমন অবাক চোখে চাইল। তারপর চুপ করে রইল কতক্ষণ।

একসময় সোজা আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, তুমি আমার রেট জান?

আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কি বলছে ও!

বললাম, পাগলামি করছ কেন বিপাশা?

বিপাশা তেমনি কঠিন গলায় বলল, একটুও পাগলামি করছি না। আমি টাকার বিনিময়েই সঙ্গ দিয়ে থাকি।

জেদ চেপে গেল আমারও। বললাম, বল, কত চাও?

ওর মুখে অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল, বলল, তুমি মালটি মিলিওনেয়ারের ছেলে বলে বেশি চেয়ে বসব না। আমার রেট সবার জন্যেই এক।

আমি জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে আছি দেখে ও বলল, ঘণ্টায় একখানা নম্বরি নোট দিতে হবে, আর ওটা আগাম দিতে হবে কিন্তু। কখন আবার পুলিশে ঝামেলা হয়, তখন তো সব ফেলে প্রাণ আর মান বাঁচাতে ভাগবে তোমরা।

পার্স খুলে একশ টাকার একখানা নোট বের করে ওর সিটের পাশে ফেলে দিলাম। ও সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে মাথায় ঠেকাল।

আমি গঙ্গার ধার পর্যন্ত ওর সঙ্গে আর কোন কথা বলিনি। শুনেছিলাম, অনেক শিক্ষিতা মেয়ে চাকরি-বাকরি না পেয়ে সংসার চালাতে এই পথে নামে। কিন্তু বিপাশাকে যেন ও ভূমিকায় কল্পনাও করতে পারছিলাম না।

গঙ্গার ধারে একটা নির্জন জায়গায় বসলাম দুজনে। আমি চেয়েছিলাম নোঙর করা একটা জাহাজের দিকে। জাহাজের গায়ে নাম লেখা ছিল 'হোপ'।

হঠাৎ ও আমার দিকে চেয়ে বলল, কি, চুপচাপ বসে রইলে যে!

বললাম, টাকা দিয়েছি, একঘণ্টা আমার কথামত কাজ করতে হবে তোমাকে। একেবারে কথা বলে চুপচাপ বসে থাক।

ও আমার কোন কথা বলল না!

ঘড়ি ধরে একঘণ্টা কাটল। আমি উঠে বললাম, বল, কোথায় ছেড়ে দেব?

ও বলল, যেখান থেকে এনেছ সেখানে পৌঁছে দিলেই কৃতজ্ঞ থাকব।

এবার ফেরার পথে ও কিন্তু আমার পাশে বসল না। পিছনের সিটের দরজা খুলে উঠে বসল। আমার গা ঘিন ঘিন করছিল। গাড়িখানা কলেজের কাছে নিয়ে গেলেই যেন বাঁচি। ও নেমে গেলে তবেই আমার শান্তি।

পিছনে বসে ও কি করছে, সেদিকে লক্ষ্য রাখার প্রবৃত্তি আমার ছিল না।

গাড়ি বেকার ল্যাবরেটারিব কাছে এনে ব্রেক কষলাম। যাতে কলেজের কেউ না দেখতে পায়। বললাম, এখানে নেমে যাও।

ও গাড়ির দরজা খুলে নেমে দাঁড়িয়ে হেসে বলল, সামনের দরজা দিয়ে বউকে নিয়ে ঢোকে মানুষ আর পিছনের দরজা দিয়ে বের করে দেয় কাকে বল তো?

খিল খিল করে হাসতে হাসতে নিজেই আবার বলল, বারাঙ্গনাকে, তাই না?

উত্তর শোনার জন্যে দাঁড়াল না বিপাশা। বলেই হন হন করে চলে গেল।

আমি প্রেসিডেন্সির সামনের গেটে এসে আর কলেজে ঢুকলাম না। প্রহ্লাদদাকে হাতের ইশারায় ডেকে নিলাম।

প্রহ্লাদদা গাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে বলল, কোথায় গিয়েছিলি রে?

বললাম, নরকে।

প্রহ্লাদদা কথাটা তলিয়ে না দেখে বলল, সেটা আবার কোথায়?

বললাম, গঙ্গার ধারে।

প্রহ্লাদদা এবার দরজাটা বন্ধ করেই চেঁচিয়ে উঠল, আরে, তোর যে দেখছি খুব টাকা হয়েছে। পিছনের সিটে লম্বরী একটা নোট পড়ে আছে। একটা লেখনও দেখছি সঙ্গে গাঁথা!

তাড়াতাড়ি প্রহ্লাদদার হাত থেকে একশ টাকার নোট আর একটুকরো কাগজেব লেখা নিয়ে নিলাম।

প্রিয় আনন্দ,

তোমার আকর্ষণ যে কোন মেয়ের কাছে অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু কোন কিছু পাওয়া না পাওয়ার সীমা কতখানি তা জানি বলেই তোমার কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি। তুমি বড় মানুষ জানি, তা বলে গরিবকে মিনিবাসের পয়সা জোগানোর উদারতাটুকু না দেখালেই পারতে।

গঙ্গার ধারে শুধু শুধু এক ঘণ্টা বসে রইলে। টাকাও দিলে শাস্তিও পেলে। এ টাকাটা কাছে রেখে দিও। যারা দুঃখের জ্বালায় নিজেদের দেহ বিকোচ্ছে তাদের জন্যে পারলে কিছু কোরো।—স্রোতের নদী।

বিপাশার চিঠিটা পড়ে লজ্জায় ক্ষোভে মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল। ও যে আদপেই ভ্রষ্টা মেয়ে নয়, বরং প্রখর আত্মসম্মানের অধিকারী, সেটুকু বোঝার সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথা আপনিই নত হল ওর উদ্দেশ্যে। মিনিবাসের পয়সা দেবার কথা বলতেই ও ভ্রষ্টা মেয়েদের ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছিল।

আমি গাড়ি নিয়ে বাড়ি এলাম। কলেজে কিংবা দক্ষিণেশ্বরে ওর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবার মুখ ছিল না আমার। বিপাশা একটি নদীর নাম। চিঠির তলাতেও ও লিখেছিল 'স্রোতের নদী'। খরস্রোতে বয়ে চলাই ওর স্বভাব। ওকে বুক পেতে বেঁধে রাখা যায় না, ও আপন বেগে সত্যিই পাগলপারা। আর কোন দাগ ফেলাও যায় না ওর অঙ্গে। সব দাগ, সব রেখাই মুছে ফেলার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে ওর ভেতর।

থামল আনন্দ। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

সুপর্ণা বলল, তোমার চেয়ে মেয়েটিকে আমার অনেক বেশি ভাল লাগল। যদিও তোমার ভেতর আপত্তি তোলার মতো কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না।

আনন্দ বলল, এ গল্পের একটা শেষ আছে।

সুপর্ণা বলল, কি রকম?

আনন্দ বলল, বিয়ের কিছুদিন আগে মনটাকে ঠিক করার জন্যে আমি জসিডিতে গিয়েছিলাম।

সুপর্ণা বলল, তার মানে বিয়ের আগে দারুণ রকম চোট খেয়েছিলে নাকি? তাই মন সারাতে জসিডির বাড়িতে যেতে হল।

আনন্দ বলল, প্রতিটি ছেলেমেয়েরই বিয়ের আগে মনটাকে তৈরি করে নেওয়া দরকার। জীবনের নতুন একটা পালা শুরু করার আগে প্রস্তুত হতে হবে না?

সুপর্ণা বলল, বেশ এখন তোমার গল্পটা শোনা যাক।

আনন্দ বলল, চার বছর পরে জসিডিতে ওকে দেখলাম।

বিপাশাকে? সুপর্ণা জিজ্ঞেস করল।

আনন্দ বলল, হ্যাঁ স্টেশনের দিক থেকে কি যেন সব বাজার করে ফিরছিল। আমি গাড়ি থামিয়ে নেমে দাঁড়ালাম। বললাম, চিনতে পার?

ও অতি সাধারণ একখানা শাড়ি পরেছিল। মাথায় দেখলাম সিঁদুরের রেখা।

বুকে ধরে রাখা কয়েকটা প্যাকেট বাঁ হাতে সামলাতে সামলাতে বলল, আমাকে যে তুমি চিনতে পেরেছ, এই আমার ভাগ্যি!

হেসে বললাম, সংসারি হয়েছ দেখছি।

ও বলল, তুমি যেমন আমার সিঁথির দিকে চেয়ে সব বুঝে ফেললে আমি তো আর সে সুযোগ পাব না। তাই প্রশ্ন করতে হচ্ছে, বউ নিয়ে এসেছ না একা?

হেসে বললাম, এখনও বউ জোটেনি।

সে কি! আজও তোমার বউ জোটেনি! একথা বিশ্বাস করতে বল?

বিশ্বাস করা না করা তোমার ব্যাপার।

ও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন ভেবে বলল, চৈতালিদি কিন্তু তোমাকে খুব ভালবাসত বেচারা আমাদের কাছে যখন তখন তোমার কথা বলে কান্নাকাটি করত। তোমার উপেক্ষা ও সহ্য করতে পারত না।

বললাম, চৈতালি আমাদের সঙ্গে পড়ত ঠিক, আর প্রায়ই কারণে অকারণে এসে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করত, কিন্তু ওকে কোনদিনই আমি আমল দিইনি।

বিপাশা, বলল, তা আমর, জানতাম। শুধু চৈতালিকে কেন, কাউকেই তুমি আমল দাওনি।

বললাম, সে অপবাদ আমাকে দিতে পার। তবে চিরদিনই তোমরা বাইরে থেকেই একটা মানুষকে বিচার করে গেলে।

কি রকম? প্রশ্ন করল বিপাশা।

বললাম, এই যেমন তোমার কথাই ধরা যাক। সেদিন সহজ মনেই আমি তোমাকে মিনিবাসের পয়সাটা দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি তার ভুল অর্থ করলে। তুমি যা নয়, সেই অভিনয় করলে।

বিপাশা বলল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ কথা বলা যায় বল। চল, দু'দণ্ড কোথাও বসা যাক।

বললাম, ঐ যে কয়েক সারি কৃষ্ণচূড়ার গাছ দেখছ, ওর লাগাও পাঁচিল ঘেরা বাড়িটা আমাদের। দু-একটা চাকর ছাড়া কেউ নেই। ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে আসতে পার।

ও একটু ভেবে বলল, দুপুরে আমার স্বামী বিশ্রাম করেন, তখন আমার অনেকখানি অবসর। সে সময় এলে তোমার কি খুব অসুবিধে হবে?

বললাম, না না, একটুও না! আমি দুপুরে কোনদিনই ঘুমোই না, বই পড়ে কাটাই। কিন্তু তোমার স্বামীকে একা ফেলে...তিনি কিছু ভাববেন না তো?

বিপাশা কৌতুকের ভঙ্গিতে চোখ নাচিয়ে বলল, সব দিকেই তোমার নজর। একটু ভাবনা টাবনাগুলো কম কর তো।

বিপাশা পায়ের কাছে ঠেকিয়ে রাখা ব্যাগটা ডান হাতে তুলে নিয়ে, বাঁ হাতে একটা প্যাকেট বুকে চেপে ধরে চলতে শুরু করল দেখে বললাম, চল, তোমাকে তোমার বাড়ি অবধি এগিয়ে দিই।

ও বলল, তাহলেই তোমার মনোবাঞ্ছাটা ষোলকলা পূর্ণ হয় আর কি। আমার স্বামীর সঙ্গে একটা কথা কাটাকাটি ধস্তাধস্তি হয়, এই তো তুমি চাও।

হেসে বললাম, কথায় তোমার সঙ্গে কোনদিনই পারিনি বিপাশা, আজও সে চেষ্টা করব না।

ও চলে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে বলল, একদিন গাড়িতে চড়লে অভ্যেস খারাপ হয়ে যাবে, তখন রোজ রোজ গাড়িতে চড়তে ইচ্ছে করবে। গরিবের ঘোড়া রোগটা খুব মারাত্মক নয় কি? বলে ও চলে গেল।

দুপুরে বসে আছি ছাদের ওপর। প্রথম বসন্তের হাওয়া দিচ্ছে। একটা নিষ্পত্র শিমুলগাছ বুক ফাটিয়ে রক্তের মতো রাঙা ফুল ফুটিয়েছে ডালে ডালে। কৃষ্ণচূড়ার ঝিরি ঝিরি নতুন পাতা হাওয়ার খেলায় মেতে উঠেছে। আমি গায়ে একখানা আলোয়ান জড়িয়ে ইজিচেয়ারে এলিয়ে বসে বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' খানার পাতা ওল্টাচ্ছি। বহুবার পড়া এ বইখানা, তবু পুরনো হয় না।

সিঁড়ি দিয়ে কখন নিঃশব্দে উঠে এসে আমার পিছনে দাঁড়িয়েছে বিপাশা। টের পেলাম একটা কোকিলের ডাকে। শিমূলের ডালে ফুলের আড়ালে বসে ডাকছে। আমি মুখ তুলে পাখিটার খোঁজ করতে গিয়ে ওকে দেখতে পেলাম।

বিপাশা বলল, বাব্বা, কি কনসেনট্রেশান! বইয়ের ওপর যতটা দিয়েছ তার আদ্দেকের আদ্দেক বউয়ের ওপর দিলে সে ভদ্রমহিলা বর্তে যাবেন।

বললাম, বস।

আমার পাশের চেয়ারে ও বসল। বসেই বলল, আমি রোজ কয়েকবার এ পথ দিয়ে যাওয়া আসা করি, চোখেও পড়েছে 'বসুমল্লিক ভিলা' লেখাটা, কিন্তু বাড়িটা যে তোমাদের হতে পারে, একথা মনে আসেনি কেন বল তো?

বললাম, আমাকে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলে বলে।

ও বলল, তা যা বলেছ, অমন বিচ্ছিরি ছেলের কথা কে মনে রাখে বল।

বললাম, সেই মিনিবাসে দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্যে যে পয়সা দিতে চেয়েছিলাম, সে কথাটা নিশ্চয়ই ঐ সঙ্গে ভুলে গেছ?

বিপাশা মুখে হাত চেপে খুব একচোট হেসে নিয়ে বলল, আমার একশ টাকা রেটের কথাটা কি এখনও মনে রেখেছ?

বললাম, ও কি ভোলার জিনিস। তুমি সেদিন যা অভিনয় করলে না, গ্রেটা গার্বো থেকে সোফিয়া লোরেন অবধি হার মেনে যায়।

বিপাশা বলল, অ্যায়, চা খাওয়াবে না আনন্দ?

নিশ্চয়, চাও তো তেলেভাজাও খাওয়াতে পারি।

বিপাশা বলল, ভাজা টাজ্জা পরে হবে।

রাঁধুনি ঠাকুরকে ওপরে ডেকে ফরমায়েস করলাম। চা, পকৌড়া, বেগুনি বানাতে বলে দিলাম।

ঠাকুর নিচে নেমে গেলে বললাম, আজ তবে আসল কথাটা বলি শোন, প্রথম দিন তুমি আমার নাম ধরে ডাকতে ভারি রাগ হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য এখন নাম ধরে ডাকলে আর কিছুই মনে হয় না।

ও শরীরটা বেঁকিয়ে দারুণ রকম হাসতে লাগল।

হাসি থামলে বলল, তুমি তো হর্ষবর্ধন মানে আনন্দবর্ধন, তোমাকে নাম ধরে ডাকব না তো কি। সারা রাজ্যের মেয়ের আনন্দ ছিলে তুমি, আবার তাদের বুকের দীর্ঘশ্বাসও পড়ত তোমার জন্যে।

বললাম, আমার এতখানি মর্যাদা মেয়েদের কাছে ছিল তা কিন্তু জানতাম না। এখন তোমার মুখে শুনে খুব ভাল লাগছে।

ও বলল, আর ভাল লেগে কাজ নেই। বউয়ের মুখে নিজের প্রশংসা শুনো।

বললাম, বউয়ের জন্যেই তো নির্জনে তপস্যা করতে এসেছি। চিরকাল পার্বতীরাই কি শিবের জন্যে তপস্যা করে যাবে, শিবেরা পার্বতীদের পাওয়ার জন্যে তপস্যা করবে না। বিশেষ করে এই নারী প্রগতির যুগে।

ও বলল, তোমার চারদিকে কি আজকাল তেমন মেয়েরা ঘুরছে না আনন্দ?

বললাম, এক সময় আমি ওদের নাকচ করেছি, এখন আমাকে ওদের নাকচ করার পালা।

বিপাশা তেড়ে উঠল, থাম, নিজের দাম আর বাড়িও না। তোমাকে নাকচ করার মতো বুকের পাটা বাংলাদেশের ক'টি মেয়ের আছে। •

অন্তত একটি মেয়ের আছে। যার কাছে আনন্দশঙ্কর নিজে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু সে মেয়েটি আমল দেয়নি তাকে।

সেই মুহূর্তে বিপাশা মুখ ফিরিয়ে কৃষ্ণচূড়ার ঝিরিঝিরি পাতার দিকে চেয়ে রইল। তারপর চোখের দৃষ্টি চলে গেল প্রান্তর পেরিয়ে দূরের টিলার দিকে।

নিচ থেকে ট্রেতে চা আর তেলেভাজা সাজিয়ে দিয়ে গেল ঠাকুর।

বললাম, আরে এস এস, ঠাণ্ডা পড়ছে, চা খেয়ে গা-টা গরম করা যাক।

ওর অন্যমনস্কতা ভাঙল। চোখে একটা কিছু পড়ার অভিনয় করে আঁচল দিয়ে চোখটা মুছে হাতে চায়ের কাপ তুলে চুমুক দিতে লাগল।

বললাম, আসরটা কিন্তু জমল না। মিস্টারকে ঘরে রেখে চলে এলে, আদ্দেকটা মন ওখানেই পড়ে রইল। একদিন এস ওঁকে নিয়ে, একসঙ্গে গল্পগুজব করা যাবে। সেদিন আর ওখানে রান্নার পাট রেখো না।

কথাটা শুনে কেমন যেন বিহ্বলের মতো চেয়ে রইল বিপাশা। হাতে কাপটা তেমনি ধরা রইল। বললাম, প্রস্তাবটা মনে ধরল না বুঝি?

ও স্বাভাবিক গলায় বলল, আনন্দ, আমার স্বামীর ভোজ খাওয়া এ জন্মের মতো ঘুচে গেছে।

ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম অবুঝের মতো। ও আবার বলল, জন্মান্তর থাকলে তোমার কথা রক্ষা করতে ও হয়তো আসতে পারে, কিন্তু এ দেহে আর নয়।

চেঁচিয়ে উঠলাম, থাম, যা তা বল না। বুঝেছি ভদ্রলোক দারুণ ডিসপেপটিক রোগী। আর পেটের রোগ সারাতেই তোমাদের জসিডির জল হাওয়ায় আসা। ও জন্যে ভাবনা কোরো না। এখন মেডিকেল সায়েন্স অনেক উন্নত। ধৈর্য ধরে চিকিৎসা করাতে পারলে অব্যর্থ সেরে যাবে।

ম্লান একটা হাসি মুখে টেনে এনে বিপাশা বলল, তোমার কাছেও কি দু-দণ্ড শান্তি পাব না আনন্দ?

বললাম, অশান্তির আবার কি কারণ ঘটল?

বিপাশা বলল, আমার স্বামী সমস্ত চিকিৎসার বাইরে আনন্দ। ধীরে ধীরে জীবনের দেনা শোধ করতে করতে প্রায় শেষ পর্বে এসে পৌঁছেছেন।

কি হয়েছে তাঁর বিপাশা?

লিভার ক্যানসার। ডাক্তার অনেক আগেই জবাব দিয়ে দিয়েছেন। আমি ওঁকে কিছু না বলে নিয়ে চলে এসেছি এখানে। পেটের গোলমাল জসিডির জল হাওয়ায় সেরে যাবে বলে আশ্বাস দিয়ে রেখেছি।

ওর হাতটা ধরে ফেলে বললাম, আমি কি তোমার কোন রকম সাহায্যে আসতে পারি না বিপাশা? এ সময়েও কি তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে রাখবে?

আমি ওর পোশাক পরিচ্ছদ দেখেই বুঝেছিলাম স্বামীর ঘরে এসেও বিপাশা দারিদ্র্যকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

বিপাশা আর একখানা হাত আমার হাতের ওপর চেপে রেখে বলল, আঙুলে গোনা দিন ওর। কোনদিন কারু কাছে ঋণ করিনি আনন্দ। শেষ সময়টা আমার সামান্য সঞ্চয় থেকেই ওকে সেবা করতে দাও।

একটু থেমে বলল, আর এক বছর আগে ভগবান কেন তোমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলেন না আনন্দ। আমি তাহলে এমন নিঃস্ব হয়ে যেতাম না। বিশ্বাস কর আনন্দ, তোমার সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে যাবার সময় ছলনা করে বারনারীর অভিনয় করে ছিলাম, কিন্তু সেদিন জানতাম না ঐ অভিনয়ই একদিন সত্য হবে। মামা বিয়ে দিয়েছিলেন, পছন্দ অপছন্দ আমার কোন কিছুই ছিল না। আমার স্কুল মাস্টার স্বামীটি বড় ভাল মানুষ ছিলেন। কিন্তু দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে একেবারে কঙ্কালসার

হয়ে গিয়েছিলেন। শেষে জন্ডিস হল। বিছানায় পড়ে রইলেন। চিকিৎসায় ভাল করতে পারলাম না। চাকরি গেল। একবছর নিঃস্ব স্বামী বিছানায় পড়ে। আমি টিউশানির চেষ্টায় বেরিয়ে ব্যর্থ হলাম। তারপর...এইটুকু বলে দু'হাতে নিজের চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল বিপাশা।

উঠে দাঁড়িয়ে ওকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। বললাম, স্বামীর রোগ সারাবার জন্যে তুমি পথে নেমেছ, এতে দুনিয়ায় যে যা-ই বলে বলুক, আমি কোনদিন তোমাকে ভুল বুঝব না।

বিপাশা কিছুক্ষণ পরে শান্ত হল। বলল, পাপের পয়সাগুলো খরচ করে ফেলতে দাও! বন্ধুর পয়সা জমা থাক। জানি দরকার হলে পাব। জানবে, সাহায্য যদি কোনদিন চাইতেই হয় তাহলে তোমার কাছেই চাইব।

বললাম, একটা কথা দেবে?

ও বলল, কথা দিলাম।

কোনদিন দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় পথে নামার দরকার বোধ করলে চলে এস আমার কাছে। কোন রকম সংকোচ বা দ্বিধা কোরো না।

ও ম্লান হেসে বলল, মনে রইল।

সন্ধ্যা নামছে দিগন্তে। ও উঠে দাঁড়াল। আমাদের চায়ের ট্রেতে খাবারগুলো তেমনি পড়ে রইল।

বিপাশা বলল, ইঞ্জেকশান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি। জেগে আমাকে দেখতে না পেলে অসহায়ের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকবে।

বললাম, তোমাকে তো সান্ত্বনা দেবার কিছু নেই বিপাশা, শান্তি আছে তোমার নিজের কাছে। আমাকে কালই চলে যেতে হবে। যদি কোন রকম দরকার মনে কর তাহলে আমার এ বাড়ির লোকজনদের কাছে সাহায্য পাবে। আমি ওদের বিশেষ করে বলে দিয়ে যাব।

বিপাশা চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে বলল, আচ্ছা।

ওকে পথের ওপর দিয়ে শেষ চলে যেতে দেখলাম। মনে হল মৃত্যু পথযাত্রী স্বামীর কথা ভেবে বিপাশা বড় দ্রুত পা চালিয়ে চলে গেল।

থামল আনন্দশঙ্কর। মাঝিরা ইতিমধ্যে তীরের কাছাকাছি একটা জায়গায় নোঙর করেছে। রাতের খাবার তৈরি করতে তারা ব্যস্ত। জলের স্রোত কলকল শব্দ তুলে বয়ে চলেছে।

সুপর্ণা শক্ত করে আনন্দের হাতখানা ধরে রইল। সে সহসা কোন কথা বলতে পারল না। এক সময় প্রকৃতিস্থ হয়ে চোখ মুছে বলল, তারপর মেয়েটির কি হল খবর রাখনি?

না।

সুপর্ণা বলল, তুমি বড় স্বার্থপর, নিজেকে নিয়েই রইলে। মেয়েটার এত বড় বিপদের পর একটা খোঁজখবর পর্যন্ত করলে না?

কি হবে খোঁজ নিয়ে, ওর পথ আর আমার পথ তো এক নয়।

তবু মানবিকতার খাতিরেও একবার ওর মামার ওখানে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসতে পারতে।

আনন্দ বলল, আগে পারলেও যেতে পারতাম, কিন্তু এখন আর হয় না।

কেন হয় না?

এখন আমি ঘোরতর সংসারী সুপর্ণা। পুরনো ভালবাসার গন্ধ যেখানে সামান্যও জড়িয়ে আছে সেখানে যাওয়া এক রকমের ব্যভিচার।

সুপর্ণা জেদ ধরল, তুমি নিষ্ঠুর হতে পার কিন্তু আমি সব শুনে চুপ করে থাকতে পারি না। তুমি আমাকে ওর মামার বাড়ির ঠিকানাটা বলে দাও। আমি দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দিরে যাই, ওখানে খোঁজ নিতে অসুবিধা হবে না।

আনন্দ বলল, এত উৎসাহ যখন তোমার, পেন আর একটুকরো কাগজ নিয়ে এস। পথের ম্যাপ এঁকে ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি।

সুপর্ণা ব্যাগ খুলে কাগজ আর পেন নিয়ে এল। আনন্দ তার ওপর পথের নিশানা এঁকে ঠিকানা লিখে দিল। তারপর কাগজখানা সুপর্ণার হাতে দিয়ে বলল, তোমার একটুও ঈর্ষা হচ্ছে না বিপাশার ওপর?

তা কেন হতে যাবে?

সে তো তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীও হতে পারে।

সুপর্ণা বলল, যদি তোমাকে আমি ধরে রাখতে না পারি সে আমারই অক্ষমতা। ওর কিংবা তোমার, কারুরই দোষ থাকবে না তাতে।

আনন্দ বলল, প্রেমের খেলা বড় কঠিন খেলা সুপর্ণা। ক্ষণে ক্ষণে হারজিৎ।

গঙ্গার স্রোতে চার পাঁচটি দিন ওরা ভেসে চলে গেল মোহনার দিকে। স্রোতে ভেসে চলা সংসার। কথায় গল্পে দুটি হৃদয়ের মধু উচ্ছ্বসিত হয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। এ যেন প্রতিদিন চলেছে গঙ্গার বুকে পিকনিকের আয়োজন।

মাঝিরা নিজেদের রান্না করে নেয়। ঠাকুর রান্না করে ওদের। মাঝে মাঝে দু-একটা পদ রাঁধে সুপর্ণা। নতুন বউরানীর প্রসাদ পায় বজরার মাঝিমাল্লা।

সেকালের বজরা। তাই বজরার সামনে উড়ন্ত একটি শুকপাখি। কাঠে খোদাই করা। বজরাটি নতুন করে রঙ করানো হয়েছে আনন্দশঙ্কর আর নতুন বউরানীর নৌযাত্রার আগে। ধবদবে সাদা রঙের দেহ। সিঁদুরে লাল আর কালোর বর্ডার দেওয়া। সামনের বড় শুকটি ওড়ার ভঙ্গিতে আটকানো। গায়ে সবুজ রঙ, গলায় হলুদের দাগ। টকটকে লাল ঠোঁট। বজরা স্রোতে ভেসে চললে মনে হয়, শুকপাখিটা উড়ছে নীলাকাশের দিকে পাখা মেলে।

বজরার পাটাতনের ওপর লাল রঙের ম্যাট বিছানো। বজরার ঘরটির চারদিক ঘিরে ডিজাইন করা কাঠের কাজ। সবটাই সাদা রঙে পেন্ট করা। একটা সী-গ্রিন রঙের ছোট্ট কাঠের সিঁড়ি ঘরের সঙ্গে লাগানো। রাতে ইচ্ছে হলে নবদম্পতি ছাদের ওপর উঠে বসতে পারে। ছাদটি আবার রেলিং দিয়ে ঘেরা। আগে ছিল কাঠের রেলিং সম্প্রতি সেটা বদলে লোহার হালকা গ্রিলের রেলিং লাগানো হয়েছে।

ঘরের ভেতরে দুজনের শোবার মতো একখানা চৌকি। পাশেই টিপয়। কাঠের দেওয়ালে ব্র্যাকেট করে একটি বড় আয়না আটকানো। উল্টোদিকের দেওয়ালে লম্বা একখানা অয়েল পেন্টিং। বিবাহের পর পার্বতীর পতিগৃহে যাত্রার ছবি। বৃষভে আরোহণ করেছেন হরপার্বতী। সামনে নন্দী ভৃঙ্গীদের একজন বিষাণ বাজিয়ে চলেছে। পিছনে ওদেরই অন্যজনের মাথায় একটি পেটিকা। পার্বতীর সখিরা বরবধূকে এগিয়ে দিতে চলেছে। কিন্তু সবচেয়ে করুণ দৃশ্য—মা মেনকা আলুথালু বেশে চলেছেন বৃষভের পাশে পাশে। মেয়ে বৃষভের ওপর স্বামীর পিছনে বসে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মায়ের দিকে। মা পার্বতীর সেই হাতখানা মুখে চেপে ধরে চুম্বন করতে করতে চলেছেন। পিছনে দেখা যাচ্ছে হিমালয়ের শুভ্র চূড়া। তার গায়ে পার্বতীর পিতৃগৃহের হিমপুরী।

সুপর্ণা ছবিখানার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একদিন চোখের জল সামলাতে পারেনি। আনন্দ বলেছিল, পিতৃগৃহ থেকে স্বামীগৃহে আসতে প্রথমে বুকে বড় বাজে, তাই না সুপর্ণা?

সুপর্ণা আনন্দের হাত ধরে বলেছিল, ছেলেরা সে ব্যথা বুঝবে না। রাগ কোরো না, এটা তোমাদের বোঝার কথাও নয়। তোমরা শুধু পাও, তোমাদের কিছুই হারাতে হয় না।

আনন্দ বলেছিল, তোমার সঙ্গে আমি একমত সুপর্ণা। তবে কিছুদিন পরে পতিগৃহ আবার পিতৃগৃহের চেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয়।

সুপর্ণা বলল, মানিয়ে নেওয়া মেয়েদেব মস্ত বড় গুণ। একেবারে অপরিচিত পরিবেশকে নিজের করে নিতে গেলে মনের অনেকখানি প্রস্তুতির দরকার।

আনন্দ বলল, হাজারবার স্বীকার করব সে কথা। সেদিক থেকে মেয়েরা মহীয়সী।

সুপর্ণা আনন্দের বুকে মুখ রেখে বলল, তোমার মত স্বামী পেয়েছি, এ যে আমার কত বড় গৌরব

তা তুমি বুঝবে না, আমি কাঁদছিলাম আমার মা নেই বলে। আনন্দ সুপর্ণাকে বুকে জড়িয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিল।

একসময় সুপর্ণা মুখ তুলে বলেছিল. তোমার মা যদি থাকতেন তাহলে আমিও অনেক সান্ত্বনা পেতাম। তাঁর কাছে থেকে মায়ের আদর কাড়তাম।

আনন্দ বলেছিল, আমার বাবা বাইরে গম্ভীর হলেও অন্তরে বড় কোমল। তিনি তোমাকে খুবই স্নেহ করেন সুপর্ণা।

তাঁকে পেয়ে আমি বাবাকে ছেড়ে আসার দুঃখ অনেকখানি ভুলেছি।

তারপরই হঠাৎ সুপর্ণাকে ছেলেমানুষিতে পেয়ে বসেছিল। সে আনন্দের হাত ধরে বলেছিল, তোমার চেয়ে বাবা আমাকে বেশি ভালবাসেন।

কি রকম? প্রশ্ন করেছিল আনন্দ।

কি রকম আর কি, তোমাকে যদি আমার চেয়ে বেশি ভালবাসতেন তাহলে টাকা পয়সায় ভরা গোদরেজের চাবি আমাকে না দিয়ে তোমাকেই দিতেন।

আনন্দের দারুণ হাসি পেয়েছিল সুপর্ণার যুক্তিতে। কৌতুক করে বলেছিল, আমাকে চাবি দিলে তুমি যদি কান্নাকাটি কর তাই ঝামেলা এড়াতে বাবা তোমাকেই চাবিটা দিয়ে দিয়েছেন, এমনও তো হতে পারে।

আহা হা-হা, মশাইয়ের কি যুক্তি, বলেছিল সুপর্ণা, শোন তাহলে বলি, বাবামশায় আমাকে কাছে বসিয়ে বললেন, মামনি, তোমার শাশুড়ি এ গৃহের লক্ষ্মী ছিলেন। তিনি আমার ব্যবসায়ের উন্নতিতে অলক্ষ্যে থেকে কাজ করে গেছেন। তাঁর অবর্তমানে তোমার হাতে তুলে দিলাম এ চাবি। আমি বিশ্বাস করি এর মর্যাদা তুমি রক্ষা করতে পারবে।

আমি বলেছিলাম, আপনি আশীর্বাদ করুন বাবামশায়।

উনি বলেছিলেন, আশীর্বাদ তো রইল সারাক্ষণ তোমাদের ঘিরে। তারপর বললেন, হাঁ, এই টাকা পয়সা, ব্যাঙ্কের চেক ইত্যাদি দেয়ানেয়া, সংসারে সবদিকে নজর রাখার সঙ্গে সঙ্গে ঐ লক্ষ্মীছাড়াটার ওপরও নজর রেখ। আমি মাথা নিচু করে সম্মতি জানিয়েছিলাম, কিন্তু মনে মনে খুশি হয়েছিলাম।

খুশি হয়েছিলে! কেন?

বাবামশায় তোমাকে লক্ষ্মীছাড়া বলেছিলেন বলে।

আমি লক্ষ্মীছাড়া?

লক্ষ্মীছাড়াই তো। যারা গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ায়। বাপ-ঠাকুর্দার টাকা ওড়ায়, নিজেরা রোজগার করে না, তারা লক্ষ্মীছাড়া নয়তো কি?

গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল সেদিন আনন্দ। গুম হয়ে বিছানার ওপর বসে শুধু গঙ্গার স্রোতের দিকে চেয়ে ছিল।

কথাটা কৌতুকের ঝোঁকেই বলেছিল সুপর্ণা, কিন্তু সে যে ঐ আকস্মিক কথায় আহত করে ফেলেছে আর একজনকে তা বুঝতে পারেনি। যখন বুঝল তখন ধনু থেকে তীরটা বেরিয়ে গিয়ে একেবারে একজনের বুকে এসে বিঁধেছে।

অনেক সাধ্য সাধনার পর সেদিন আনন্দের মান ভাঙাতে হয়েছিল।

আনন্দ শেষে বলেছিল. বাবা নিজেই আমাকে ব্যবসার কাজে ঢোকাতে চাননি। সে কথাটা তো আর তাঁর আদরের মামনিকে বলেননি। তাঁর ধারণা ব্যবসা করতে গেলেই কিছু না কিছু পাপে জড়াতে হয়, তাছাড়া লেবার ট্রাবল অক্টোপাসের মত গলায় জড়িয়ে থাকে। এ সবের ভেতর তাঁর বংশের একমাত্র সলতেটি একবার যদি ঢোকে তাহলে হাজার ফুঁ-এর ধাক্কায় নিভে যাবে।

সুপর্ণা আনন্দের চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বলেছিল. ঘরে আমার রাধাগোবিন্দের মন্দির আর অন্তঃপুরে নাড়ুগোপাল—এদের নিয়েই আমার দিন বেশ কেটে যাবে। তবে ভয় হয় আমার নাড়ুগোপালটি আবার যেন না বড় হয়ে কৃষ্ণলীলা শুরু করে দেয়।

আনন্দ বলেছিল, রাধারানী তো আমার কাছেই রইল, আর ভয়টা কি।

তুমি খুব জান, বলে উঠেছিল সুপর্ণা, রাধারানী কোনদিন কৃষ্ণের ঘরনী ছিল না।

আনন্দ বলেছিল, ঠিক ধরেছ, বুদ্ধি আছে তোমার। রাধা তো ছিলেন আয়ান ঘোষের স্ত্রী। পরকীয়া প্রণয়ে মেতে উঠেছিলেন দুজনে।

সুপর্ণা বলেছিল, আচ্ছা বল তো, কিছুদিন গেলে আমি তোমার চোখে অতি সাধারণ আর পুরনো হয়ে যাব না তো?

আনন্দ বলেছিল, পুরনো জিনিসের দাম বেশি। ওল্ড ইজ গোল্ড।

সুপর্ণা বলেছিল, তাহলে তো সাবধান হতে হয়।

কিসের সাবধানতা আবার?

পুরনো প্রেমের পাহাড় তৈরি করে ফেলেছ ইতিমধ্যে, তাতে ভালবেসে চড়তে গিয়ে আবার না হাত পা ভাঙে।

হা-হা করে হেসে উঠল আনন্দ। গঙ্গার জলের তরঙ্গে সে হাসি বোধহয় অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সে হাসির সঙ্গে হাসি মিলিয়েছিল সুপর্ণাও।

সেদিন ছবি দেখতে গিয়ে কান্না দিয়ে যার শুরু, হাসিতে হয়েছিল তার শেষ।

গঙ্গা বয়ে চলেছে। দু'তীরে জনপদ। চিমনির মুখে ধোঁয়া উঠছে, কোথাও লাল ইঁটের পাঁজা দেখা যাচ্ছে। আবার কোথাও বা চর, বটের গাছে ঝুরি নেমেছে মহেশ্বরের জটার মত। ভাঙা মন্দির, ভাঙা ঘাট, কত স্মৃতি।

দশটা নাগাদ চারদিক নিঝুম। গঙ্গার কাছাকাছি একটা জায়গায় নৌকো নোঙর করা আছে। মাঝিরা ঘুমিয়ে। কল কল করে বয়ে চলেছে প্রবাহিনী গঙ্গা। আনন্দ আর সুপর্ণা ছাদের ওপর পাশাপাশি বসে। সুপর্ণার কোলে মাথা রেখে ছড়িয়ে শুয়ে আছে আনন্দ। সুপর্ণা চেয়ে আছে পুব দিকে। কৃষ্ণা পঞ্চমীর চাঁদ উঠল। ধীরে ধীরে ঘন অন্ধকার সরিয়ে চাঁদ উঠে এল গাছ-গাছালির মাথার ওপর। গঙ্গার তরঙ্গে আলোর ঝিলিমিলি খেলা।

সেদিকে চেয়ে চেয়ে গান এল সুপর্ণার গলায়। গোমুখ থেকে বেরিয়ে কত পথ প্রান্তর পার হয়ে সাগরের দিকে ছুটে চলেছে গঙ্গা। সুপ্রাচীন জনপদের মন্দির সোপান পবিত্র করে, কত নগর-নগরী তীর্থভূমিকে স্পর্শ করে পুণ্যতরঙ্গিণী গঙ্গা বয়ে এসেছে! এর পবিত্র সলিলে অবগাহন করছে নিত্য কত পুণ্যার্থী।

সুপর্ণা তার অধ্যাপক বাবাকে কতদিন শুনিয়েছে গঙ্গার ওপর দ্বিজেন্দ্রলালের লেখা সেই আশ্চর্য গান। আজ আনন্দ শুয়ে আছে তার কোলে, চাঁদ উঠেছে আকাশে, কলকল শব্দ তুলে নিচে বয়ে চলেছে গঙ্গা কত যুগ যুগান্তর ধরে।

সুপর্ণা প্রথমে গুনগুন করে গাইল, তারপর তার উদাত্ত গলায় বাজতে লাগল গঙ্গার বন্দনা গান—'পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে।

শ্যামবিটপিঘন তটবিপ্লাবিনি
ধূসর তরঙ্গ ভঙ্গে—

সুপর্ণার গান থামল কিন্তু রেশ থামল না. গায়িকার চোখ অশ্রুতে ভেজা। আনন্দ সুপর্ণার কোল থেকে মাথা তুলে উঠে বসেছে তার পাশে। সে নির্বাক। এত দরদ দিয়ে এমন সুরেলা গলায় গাইতে পারে সুপর্ণা!

বাসরে বান্ধবীরা গান গাইতে বলেছিল সুপর্ণাকে। সুপর্ণা বিয়ের মন্ত্রোচ্চারণের পর এমন একটা গভীর অনুভূতির ভেতর বিচরণ করছিল যার ফলে সে আর গান গাইতে পারেনি। সুন্দর কিছু আস্বাদনের পর যেমন অনেকক্ষণ নতুন কিছু আস্বাদনের ইচ্ছে জাগে না, ঠিক তেমনি হয়েছিল সুপর্ণার অবস্থা।

তারপরও গানের সুযোগ এসেছিল। এ বাড়িতে ফুলশয্যার রাতে আনন্দের নিমন্ত্রিত বান্ধব-বান্ধবীরা অনুরোধ করেছিল সুপর্ণাকে গান গাইবার জন্যে। কিন্তু গান না জানার কথা জানিয়ে ক্ষমা চেয়েছিল সুপর্ণা।

তখন সবার অনুরোধে আনন্দশঙ্করের ইউনিভারসিটির এক বান্ধবী গান গেয়েছিল। বাসর ইত্যাদি অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচিত কয়েকটি ছকে বাঁধা গান। গলার পটুত্ব ছিল যতখানি প্রাণ ছিল না তত। কিন্তু সেদিন বন্ধুরা বই ইত্যাদি যা কিছু উপকরণ হাতের কাছে পেয়েছিল তাই বাজিয়ে, মাথা দুলিয়ে, বাহবা দিয়ে গায়িকার গানে মদত যুগিয়েছিল। সারাক্ষণ মেয়েটি গান গেয়েছিল আনন্দের মুখের ওপর চোখ রেখে। হয়তো সে আনন্দকে কোনদিন মনে মনে চেয়েছিল কিন্তু পায়নি। তার গানে সেই না বলা বাণীর আক্ষেপ ঘোষিত হচ্ছিল।

একটানা কয়েকখানা গান শেষ হলে গায়িকা হারমোনিয়াম বন্ধ করে সুপর্ণার দিকে চেয়ে বলেছিল, কেমন লাগল?

সুপর্ণা মিষ্টি হেসে মাথা নেড়েছিল। যার অর্থ, ভাল।

মেয়েটি নাছোড়। বলেছিল, মুখ ফুটে বলুন, একটু সান্ত্বনা পাই।

সুপর্ণা বলেছিল, আপনার গলার কাজ বেশ ভাল।

মেয়েটি তখন আনন্দের দিকে চেয়ে বলেছিল, বৌ তো সার্টিফিকেট দিলে গলার কাজ ভাল বলে, এখন গানের ভাবটা ঠিক ঠিক ফোটাতে পেরেছি কিনা তুমিই বল।

একটি বন্ধু বলে উঠেছিল, একেবারে মর্মে গেঁথে গেছে।

মেয়েটি ধমক দিয়ে উঠেছিল, তুই থাম্। যাকে জিজ্ঞেস করছি সে-ই বলুক।

আনন্দ কাব্য করে ছিল, বৃষ্টির ধ্বনির মত প্রাণের আরাম, শ্রবণের শান্তি।

মেয়েটি বলল, কাব্যের আড়ালে সবকিছু চাপা দিয়ে দিলে। যাক তবু বউয়ের মতো বলনি, গলায় গমক গিট্‌কিরি আছে।

সুপর্ণার মনে হয়েছিল, মেয়েটিকে আর ও খানিক প্রশংসা করলে মন্দ হত না।

কিন্তু গানে প্রাণ না ভরলে কি করে মিথ্যে কথাগুলি বানিয়ে বলবে।

যাহোক্ সেদিন হৈ হুল্লোড় করে বেরিয়ে গিয়েছিল বন্ধুরা।

আজ গান শেষ হলে আনন্দ বলল, তুমি এমন করে গান গাইতে পারো, অথচ একটি দিনের জন্যেও প্রকাশ করনি নিজেকে।

সুপর্ণা বলল, বিশ্বাস কর, বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে আমার গান গাইতে ইচ্ছে করে, কারো অনুরোধে কখনো নয়। অবশ্য গান শিখেছিলাম আমি যত্ন করেই। ফাংসানে হাততালি কুড়োবার কিংবা খবর কাগজে নাম দেখে ধন্য হবার মোহে আমি কোনদিনই ছুটোছুটি করিনি। সত্যিকারের গুণী সমঝদারের কাছে আমি গান গেয়েছি। তাঁদের সামান্য প্রশংসায় আমি আমার গানের পুরস্কার পেয়ে গেছি। আজ এই মুহূর্তটি প্রবাহিনী গঙ্গার, তাই গঙ্গার বুকে বসে তারই বন্দনা গাইলাম।

আনন্দ বলল, আজ এই পরিবেশে তোমার গান আমায় অভিভূত করেছে। বাবা তোমার এ গানটি শুনলে খুশি হতেন।

সুপর্ণা বলল, দোহাই তোমার, কাউকে বল না আমি গান জানি বলে। তাহলে ওঁদের শোনার ইচ্ছে হলেই আমাকে গাইতে হবে। ফরমাইসী গানের কথা ভাবলেই আমার মাথাটা কেমন ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে।

কিন্তু আমি তোমার গান কেমন করে শুনতে পাব? আমার ইচ্ছার জন্যেও কি তোমার গানের দরজা একটুখানি খোলা থাকবে না?

সুপর্ণা বলল, দেখ, সব মানুষেরই মনের ভেতর একটা গোপন জায়গা থাকে, সেখানে সে একাই ঘুরে বেড়ায়। তার সুখ দুঃখের ভাণ্ডার সেখানে। সেই নির্জন জায়াগায় সে বুক ফাটিয়ে কাঁদে, আবার

সেখানেই সে তার সান্ত্বনার পথ খুঁজে পায়। সেই নিভৃত জায়গায় সে কাউকেই ঢুকতে দিতে চায় না। তবে যত দিন যাচ্ছে মনে হচ্ছে, কেউ যেন উঁকি দিচ্ছে সেই নির্জন জায়গাটিতে।

আনন্দ বলল, কে সে?

সুপর্ণা কৌতুকের হাসি হেসে বলল, কোন ভদ্রমহিলার গোপন আস্তানায় যে উঁকি দেয় তার অভিসন্ধি খুব একটা ভাল মনে হয় না। সে সন্দেহজনক লোকদের দলেই পড়ে।

আনন্দ বলল, লোকটি আর যাইহোক, তোমার গুণগ্রাহী।

সুপর্ণা বলল, গুণগ্রাহীদের সুযোগ বুঝে কিছু কিছু পুরস্কার দেওয়া যাবে।

আনন্দ সুপর্ণার হাতটা তুলে নিয়ে তার সুন্দর আঙুলে চুমু দিয়ে বলল, অশেষ করুণা তোমার দেবী।

ওদের ভেসে চলা জীবনের কত ছবি ফুটে উঠল। কত সকাল সন্ধ্যার অপরূপ মাধুরী। কত ভেসে চলা নৌকোর জল থেকে রূপোলী মাছ তোলা। পাখিদের উড়ে উড়ে ভেসে চলা, গঞ্জের বাজারে নৌকোর মিছিল, আরও কত ছবি।

ফেরার পথে আকাশ নীল, ভেসে চলা পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। সোনালী আলোয় স্নান করছে তীরের সবুজ গাছপালা।

এ যাত্রায় ওরা তৃপ্ত। সুপর্ণা আর আনন্দের চোখে মুখে সেই তৃপ্তির ভরা জোয়ার।

একটু আড়াল পেলেই আনন্দ সুপর্ণাকে জড়িয়ে ধরতে চায় বুকের মধ্যে। সুপর্ণা ভ্রূকুটিতে শাসন হেনে তাকে বাধা দেয়। বলে, এ কি পাগলামী তোমার। সারাক্ষণ একই খেলা খেলতে কি এতই ভাল লাগে? যত বেশি খেলবে তত তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তখন খেলায় আসবে বিতৃষ্ণা। ভোগ করতে হয় ধীরে ধীরে, তবেই স্থায়ী হয় ভোগের আকাঙ্খা।

আনন্দ বলে, দেহবাদের ওপর তুমি যেভাবে লেকচার দিচ্ছ তাতে মনে হয়, ইচ্ছে করলে ঐ সাবজেক্টে একটা থিসিসই লিখে ফেলতে পারো।

পারিই তো।

আনন্দ বলে, মনে হচ্ছে দারুণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছ বিষয়টার ওপরে।

করেছিই তো।

আনন্দ সুপর্ণাকে রাগিয়ে দেবার জন্যে বলে, পূর্ব অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আছে?

স্থির হয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে সুপর্ণা, চোখ দুটো নিচের দিকে নিবদ্ধ। হঠাৎ জল এসে যায় চোখে। কাঠের পাটাতনের ওপর সে জল গড়িয়ে পড়ে।

আনন্দ হতবাক হয়ে সে ছবি দেখে।

একটু পরে বলে ওঠে, আমি তোমাকে আঘাত করার জন্যে বলিনি সুপর্ণা, শুধু কৌতুক করে বলেছি। তুমি কিছু মনে কোরো না লক্ষ্মীটি।

সুপর্ণা আনন্দের মুখের ওপর তার ভাসা ভাসা চোখের চাহনি হানে। সে চোখের ভেতর আঘাতের অশ্রু, কিন্তু মুখের রেখায় মেঘমুক্তির আভাস।

রাতে বিছানায় নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে আনন্দ সুপর্ণাকে বলে, তুমি একটুতেই বড় গভীর হয়ে যাও। তখন মনে হয় তুমি যেন আমার থেকে কতদূরে সরে গেছ।

সুপর্ণা বলে, আমি তোমার হাতের ঘুড়ি যত দূরেই যাই না কেন ফিরে আসতে হবে আবার তোমারই কাছে। ধরা দিতে হবে তোমার দুবাহুর বাঁধনে।

আনন্দ হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে, আচ্ছা সুপর্ণা, আমার মত তোমারও হয়তো অতীত একটা জীবন ছিল, সে জীবনটা কি রকম ছিল তা জানতে বড় কৌতুহল হয়। অবশ্য বাধা থাকলে বলার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে চাই না আমি।

সুপর্ণা আনন্দের বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, এই জায়গায় ব্যথার একটা ঢেউ উঠবে না, বউয়ের প্রেমিকের কথা শুনতে শুনতে?

একটুও না—জোরের সঙ্গে বলল আনন্দ। কথাটা বলল বটে কিন্তু মনটা কেমন যেন একবার কেঁপে উঠল।

আশ্চর্য মানুষের মন। নিজে মনে মনে কিংবা আচরণে একের পর এক পাপ অনুষ্ঠান করে যায় কিন্তু একান্ত প্রিয় মানুষটি যদি তেমন কোন আচরণ করে তাহলে তা সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। মানুষের মন এমনি বিচিত্র।

আনন্দের মনটা কেঁপে উঠল, কিন্তু সুপর্ণার অতীত জীবনে প্রবেশের কৌতূহল তাকে অধীর করে তুলল, সে সুপর্ণার কথা শোনার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল।

সুপর্ণা বলল, গঙ্গার বুকের ওপরে বসে মিথ্যে বলতে পারব না তোমার কাছে। আমি কৈশোর থেকে মনে মনে একজনের ওপর আকর্ষণ অনুভব করতাম। আজও তাঁকে ভুলতে পারিনি।

আনন্দ বলল, তুমি আজও তাঁকে ভালবাস?

সুপর্ণা বলল, হ্যাঁ এখনও আমি তাঁকে ভালবাসি। তবে তোমরা ভালবাসা বলতে কি বোঝ তা আমি জানি না, আমার ভালবাসার ধারণা একটু আলাদা। ভালবাসার সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধা মিশে না থাকলে সে ভালবাসা শুধু দেহকেই টানে, মনকে নয়। মনের ওপর সুরার মতো একটা দেহভোগের উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু আত্মনিবেদনের ভাবটি সেখানে থাকে না।

সে যা হোক্, আমার কাহিনীটা সোজাসুজি বলে যাই শোন।

আমার বয়স যখন দশ বছর তখন মা মারা গেলেন। প্রথম দিকে খুব কান্নাকাটি করতাম কিন্তু শিশু মনে দুঃখ বড় একটা স্থায়ী হয় না। পাড়ার সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে মেলামেশা, হাসি গান ধীরে ধীরে ভুলে যেতে লাগলাম মায়ের কথা। এ সময় যিনি আমাকে প্রায় সঙ্গের সাথী করে ঘুরে বেড়াতেন তিনি আমার চেয়ে বছর নয়েকের বড় ছিলেন। তাঁকে সুবুদা বলে ডাকতাম। নাম ছিল তাঁর সুবীর মালাকার। অতি গরীব বাড়ির ছেলে। সংসারে ধাক্কা খেতে খেতে বিধবা মা সুবুদার হাত ধরে রান্নার কাজ নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে একদিন ঢুকেছিলেন। আমার জন্মের আগের ঘটনা এটা। মা খুবই ভালবাসতেন সুবুদার মাকে। ভদ্রমহিলাকে রাঁধুনি বলে মনে হত না। দেখতে শুনতে বেশ সম্ভ্রান্তই ছিলেন। ছোটবেলা আমাকে কোলে করে থাকতেন, ছড়া বলতেন। তার মুখখানা এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। সুবুদার স্কুলে পড়ার ব্যবস্থা বাবাই করে দিয়েছিলেন।

আমি যখন পাড়ার স্কুলে যেতে শুরু করলাম তখন মাঝে মাঝে সুবুদাই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেত। কোনদিন বা স্কুল থেকে নিয়েও আসত। সেই ছোটবেলা থেকেই আমি কেন জানি না সুবুদার ভক্ত হয়ে পড়ি। ওর হাত ধরে পথ চলতে পছন্দ করতাম! সুবুদার কাছে আমি যে আবদার করতাম, সুবুদা বিনা প্রতিবাদে তা পূরণ করত। গাছ থেকে ফুল পেড়ে দেওয়া, পছন্দ মত ফিতে, গল্পের বই দোকান থেকে এনে দেওয়া, এই সব আর কি।

সুবুদার মা মারা যাবার পর আমার মা সুবুদাকে আরও বেশি করে ভালবাসতে লাগলেন। মা-মরা ছেলের যত্ন নিতেন খুব। সুবুদা লেখাপড়ায় খুবই ভাল ছিল। হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করার পর সুবুদাকে বাবা প্রি-মেডিকেলে ঢোকালেন। আমি ধীরে ধীরে বড় হচ্ছি, কিন্তু মা বাবা আমাদের মেলামেশায় কোন পার্থক্য রাখলেন না। সুবুদা চিরদিনই ধীর শান্ত, সে তুলনায় আমি বরং একটু চঞ্চল ছিলাম!

সুবুদা মেডিক্যাল কলেজে ঢোকার পর আমার মা মারা গেলেন। মা মারা যাবার প্রায় মাসখানেক আগে থেকে সুবুদা আমার মাকে যে ভাবে সেবা করেছিল, তা আজও আমার প্রতিবেশীরা সকলেই বলে থাকে। মারা যাবার দু'তিন দিন আগে মা শুয়ে আছেন ঘরের ভেতর, সুবুদা মাকে ফলের রস খাওয়াচ্ছে, আমি জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছিলাম। সুবুদা মাকে খাইয়ে বাইরে এলেই পাকড়াও করব। আমার ড্রইংখাতায় একটা ছবি এঁকে দিতে হবে।

হঠাৎ দেখি মা সুবুদার হাতটা ধরলেন। তাঁর হাত তখন কাঁপছিল। সুবুদা মায়ের কথা শোনার জন্যে মাথাটা নিচু করল।

মা বললেন, আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে আমার পর্ণাকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে কাছে রাখব বাবা। এমন কর্তব্যপরায়ণ ছেলে পাব কোথায়।

আমি বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে ছিলাম। আমার খুব ভাল লাগছিল। সুবুদা আমার বর হবে, এ কথা শুনে সেই ছোট বয়েসে নাচতে ইচ্ছে করছিল। তখন মনে হয়েছিল, খুব ভাল ছেলে সুবুদা, আমার সব কথা শোনে।

আমি দেখলাম কথাটা শুনে সুবুদা দেওয়ালের দিকে মুখ ফেরাল। কোন কথা বলল না। মায়ের মুখ একসময় তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে উঠে এল বাইরে।

মা মারা যাবার পর একদিন সুবুদা আমাকে স্কুলে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল, আমি বললাম, একটা কথা তোমাকে বলব না।

কি কথা?

সে আমি কিছুতেই বলব না—

সুবুদা অমনি বলল, তা হলে বল না—

আমার তো সেই কথাটা বলার জন্যেই প্রাণ ছটফট করছিল। তাই বললাম, একজন আমার বর হবে! কিন্তু সে যে কে তার কথা আর আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না কিন্তু।

সুবুদার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম সুবুদা কেমন যেন একটু অবাক আর গম্ভীর হয়ে গেছে। তখন আমাকে ও আর কিছু বলল না।

স্কুল ছুটির সময় দেখি সুবুদা দাঁড়িয়ে আছে। সাধারণত একাই ফিরতাম আমি, সে সময় সুবুদাকে দেখে খুশি হয়ে উঠলাম।

সুবুদা পথে আসতে আসতে নির্জন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে বলল, শোন পর্ণা, আজ যে কথা আমার কাছে বলেছ ইস্কুলে যাবার পথে, অন্য কাউকে সে কথা বোলো না! ওসব কথা বলতে নেই।

আমি বুঝলাম, ঐ বরের প্রসঙ্গটাই তুলেছে সুবুদা।

বললাম, একশোবার বলব! মা বলে গেছে না, তুমি আমার বর।

সুবুদা মনে হল খুব ঘাবড়ে গেছে। আমাকে চটালে যে সমূহ বিপদ তা সে বুঝে ফেলেছে। তাই খুব নরম গলায় বলল, তুমি যে কথা বলেছ সেটা খুব সত্যি। কিন্তু তুমি জানো না কথাটা অন্য কারো কাছে বললে ভাল হবে না।

বললাম, তাহলে আমি আর কাউকে বলব না সুবুদা।

এক সময় আমাদের বাড়িতে থেকেই সবুদা মেডিক্যাল পাশ করল। আমি তখন পনেরো ষোল বছরের মেয়ে। আমার দৈহিক গঠনের জন্যে আমাকে অনেক বড়সড় দেখাত। সুবুদা পাশ করলে আমি তো খুশিতে ডগমগ। এরপর হাউস সার্জেন হিসেবে কিছুকাল কাজ করার পর একটা গাঁয়ে যেতে হল সুবুদাকে। নতুন নিয়ম হয়েছে, সকলকেই মফস্বলে কিছুদিন আবশ্যিক চাকরি করতে হবে।

সুবুদা চলে যেতেই বাড়িটা আমার কাছে খুবই ফাঁকা ফাঁকা লাগতে লাগল। একটা ছেলে তার শান্ত নীরব উপস্থিতির ভেতর দিয়ে কি ভাবে সমস্ত ঘরটাকে ভরে রেখেছিল তার প্রমাণ পেলাম সে চলে যাওয়াতে।

মাঝে মাঝে চিঠি লিখত সুবুদা।—অতি নির্জন ফাঁকা একটা মাঠের মাঝখানে নাকি তার হেল্‌থ সেন্টারের ছোট দুটি ঘর। পিছনে কোয়ার্টার। একটি কম্পাউন্ডার আর একজন নার্স নিয়ে তাকে কাজ চালাতে হয়। দূর দূর গ্রাম থেকে রোগী আসে। প্রেসক্রিপশান নিয়ে চলে যায়। ওষুধ থাকলে হেল্‌থ সেন্টার থেকেই দেওয়া হয। এ ছাড়া ছোটখাট কাটাকুটি, জোড়াতালির কাজও করতে হয়।

নার্স আর কম্পাউন্ডারবাবু থাকেন মাইলখানেক দূরের একটা গ্রামে। অবশ্য ওখানেই নাকি চব্বিশ ঘণ্টা থাকার কথা, কিন্তু দিনের বেলা তেমন তেমন কেস না থাকলে সন্ধ্যার পর ওঁরা চলে যান। তখন একমাত্র লিলিপুট একটি বয়কে সম্বল করে সুবুদাকে রাত কাটাতে হয় ঐ নির্জন নিবাসে। ঐ বাচ্চাটি রান্না আর ফাইফরমায়েশ খাটার কাজ করে। রান্নার ব্যাপারে সুবুদাকে প্রায় সব হেল্‌পই করতে হয় তার সাকরেদকে।

চিঠি পড়তাম আর মনে হত, যেমন করেই হোক একবার চলে যাই সুবুদার কাছে। কলেজের কমনরুম থেকে দুপুরে তাকিয়ে থাকতাম পার্কের দিকে। কৃষ্ণচূড়ার গাছ ফুলে ফুলে ছেয়ে থাকত বিশেষ ঋতুতে। আমার মনে হত আমি যেন সুবুদার ঐ হেল্‌থ সেন্টারের কোয়ার্টারে বসে জানালা দিয়ে কৃষ্ণচূড়ার গাছটা দেখছি।

হঠাৎ একটা সুযোগ এসে গেল। মানুষ মনে মনে গভীরভাবে যা চায় বুঝি তা অনেক সময়েই পেয়ে যায়।

বাবা জব্বলপুরে হিস্ট্রি কংগ্রেসে যোগ দিতে গেলেন। ফিরবেন দর্শনীয় স্থানগুলোতে ঘুরে অন্তত দু'সপ্তাহ পরে। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি চাইলাম না নানা কারণ দেখিয়ে।

বাবা চলে গেলে আমি একদিন অনেক খোঁজ করে চলে এলাম সুবুদার ঐ কোয়ার্টারে। তখন শীতের সন্ধ্যা। সারা মাঠ কুয়াশার চাদরে ঢাকা।

আমাকে দেখে সুবুদার চোখে-মুখে সে কি বিস্ময়। বলল, পর্ণা, তুমি!

বললাম, ডাকলে না তো মুখ ফুটে, তাই নিজেই চলে এলাম।

তখনও সুবুদা পুরোপুরি ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। সে অবাক গলায় বলল, জ্যেঠামশায়কে কি হেল্‌থ সেন্টারে দাঁড় করিয়ে রেখে এলে নাকি?

বলতে বলতেই বেরিয়ে যাচ্ছিল সুবুদা। আমি বললাম, না, একাই এসেছি আমি। বাবা হিস্ট্রি কংগ্রেসে যোগ দিতে জব্বলপুর গেছে।

তুমি একা এলে? বিস্ময় যেন থামতেই চায় না সুবুদার গলায়।

কেন, চলে যেতে বলবে নাকি এখুনি?

সুবুদা বলল, সেকথা থাক্, তুমি একা কি করে এমন একটা পাণ্ডববর্জিত জায়গায় এলে তাই ভেবে আমি কুলকিনারা পাচ্ছি না।

বললাম, যে করেই হোক এসেছি। ধরে নাও মরে গিয়ে ভূত হয়ে এসেছি।

সুবুদা বলল, তুমি যে সাবালিকা হয়ে উঠেছ তার প্রমাণ দিলে।

ফোঁস করে উঠলাম, আমাকে কি এখনও নাবালিকা ভাবো নাকি?

সুবুদা বলল, মোটেই না। এখন হাত মুখ ধুয়ে চা খাও, তারপর কথা হবে।

তারপর চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললাম, কেমন চমকে দিলাম বল তো সুবুদা।

বলে কয়ে অন্যের কাঁধের বোঝা হয়ে আসার বদলে এই যে বেপরোয়া হুট্ করে চলে এলাম, এতে খুশি হওনি তুমি?

সুবুদা বলল, আমি খুব খুশি হয়েছি বললেও আমার খুশি যে কতখানি তা বোঝাতে পারব না। এখনও ব্যাপারটাকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

আমি সুবুদার গায়ে হাত দিয়ে বললাম, দেখ, পুরোপুরি জলজ্যান্ত পর্ণা তোমার গা ছুঁয়ে আছে।

সুবুদা খালি চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে আমার মাথা দু'হাতে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিলে। আমি আমার চায়ের কাপটা ওর কাপের পাশে রেখে বললাম, এখুনি তলানিটা পড়ে যেত তোমার বিছানায়।

ও বলল রাজশয্যাটা তাহলে বরবাদ হয়ে যেত। তারপর একটু কি ভেবে নিয়ে বলল, মহারানীর আজ কোথায় শয়ন হবে শুনি? বিছানা তো একটি।

দ্বিধা না করে বলে ফেললাম, এই বিছানায়।

সুবুদা বলল, তুমি না পারো এমন কিছুই নেই।

হেসে বললাম, অনেক কিছু আছে যা এখনও পারিনি।

কি পারনি বল?

নির্লজ্জের মত বলেই ফেললাম. তোমার মন জয় করতে পারিনি সুবুদা।

সুবুদা আর সেদিক দিয়ে গেল না। বলল, দাঁড়াও দেখছি, রোগীদের পরীক্ষার বেডখানা বের করে আনতে পারি কিনা।

সুবুদা একসময় ঘরে ফিরে এসে বলল, নাঃ, নমিতা চাবি নিয়ে চলে গেছে।

বললাম, নমিতা কে।

সুবুদা বলল, নার্স। ওর কথা তোমাকে আগেই লিখেছি।

বললাম, ঘরের চাবি-টাবি আজকাল ওর কাছে থাকে বুঝি?

সুবুদা বলল, ওরাই তো এই সেন্টারটা চালায়। আমার সব কাজই প্রায় ওরা করে দেয়। চাবিটা বোর্ডেই থাকে। মাঝে মাঝে ও ভুল করে নিয়ে যায়।

হেসে বললাম, ভুল করে ডাক্তার এস মালাকারকে কিছু বলে ফেলে না?

সুবুদা বলল, বড় ডেঁপো হয়ে গেছ তুমি। মুখে কোন কিছু আটকায় না।

বললাম, সময় বুঝে তোমার নার্স চাবিটাও নিয়ে গেছে। এখন উপায়?

সুবুদা বলল, তুমি বিছানায় শোবে, মোটা দু-খানা কম্বলের একখানা তুমি নিও, আর আমি একখানায় গা ঢেকে চেয়ারে বসেই রাত কাটিয়ে দিতে পারব।

বললাম, তোমাকে আর বিপদে ফেলতে চাই না, কালই আমি যে পথে এসেছি সেই পথে পালাব। আজকের রাতটা শুধু তোমার ঐ চেয়ারটায় বসে আমাকে রাত কাটাতে দিও। তুমি আমাকে বিছানা ছেড়ে দিয়ে চেয়ারে বসে থাকলে আমার ঘুমই আসবে না সারা রাত।

সুবুদা বলল, আমার পাশে শুতে কোন সংকোচ আসবে না তোমার?

বললাম, কিসের সংকোচ। সংকোচ ভাবলেই সংকোচ, না হলে কিছুই নয়।

এক সময় খাওয়ার পর্ব চুকল। দারুণ শীতে কাঁপতে কাঁপতে এসে দাঁড়ালাম বিছানার পাশে।

প্রথমে বিছানায় ঢুকল সুবুদা, শেষে আমি ওর পাশটিতে শুয়ে পড়লাম।

দুজনে দুটো কম্বলের তলায় এক বিছানায় শুয়ে আছি। আমি জানি না সুবুদা অন্ধকারে চেয়ে আছে কি চোখ বন্ধ করে রেখেছে। কারণ সুবুদা জানালার দিকে পাশ ফিরে শুয়েছে। আমি শিলিং-এর দিকে তাকিয়ে শুয়ে আছি চিৎ হয়ে। শিলিং দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ঘাড় ফেরালেই বাইরের আকাশ আর মাঠ জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে। একটা পাতলা কুয়াশা নগ্ন প্রকৃতি দেহে মসলিনের মত জড়ানো।

অনেক রাত অবধি জেগে রইলাম আমি। জানি না সুবুদা ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা, সেই যে জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়েছে তার আর নড়াচড়া নেই। মনে হল সুবুদা কোন মানুষ নয়, হয় যন্ত্র নয়তো অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন জীব। আমি মাঝরাতে অতি ধীরে ডাকলাম, সুবুদা ঘুমিয়ে পড়লে?

সুবুদা বলল, বল।

সুবুদা তাহলে আমারই সঙ্গে সারাটা রাত জেগে কাটাচ্ছে! এতক্ষণ কি ভাবছিল সুবুদা? নিশ্চয় আমাকে নিয়েই তার ভাবনাগুলো পাক খাচ্ছিল। আমার খামখেয়ালীপনার দৌড় কদ্দুর, তাই হয়তো কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল সুবুদা। রাগ করেই বললাম, না কিছু বলার নেই।

সুবুদা আমার অভিমানের স্বরটা বুঝল। আমার একখানা হাত ধরে বলল, পর্ণা, আমাকে তুমি সারাজীবন কি এমনি করে কষ্ট দেবে?

এ যে উল্টো বিপত্তি। আমি যার বিরুদ্ধে মনে মনে অভিযোগ খাড়া করে চলেছি সে নিজেই অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে জানাচ্ছে তার অভিযোগ।

বললাম, আমি তোমাকে কষ্ট দিয়েছি সুবুদা। যদি তাই হয় তাহলে তুমি যাতে কষ্ট না পাও সেই চেষ্টাই আমি করব।

সুবুদা কিছু না বলে আমার হাতটা নিয়ে খেলা করতে লাগল। আমার আঙুল গুলো ওর ঠোঁটে ছোঁয়াল। শেষে আমার ঐ হাতটা ওর বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে নিজের দুটো হাতে তা চেপে ধরল।

আমার সারা শরীর তখন কেঁপে কেঁপে উঠছে। সুবুদার প্রতিটি আচরণ আমি তখন উন্মুখ হয়ে লক্ষ্য করছি। পরমুহূর্তে কি ঘটে, সেই অভাবিত কিছুর জন্যে আমি প্রহর গুনছি। কিন্তু কিছুই ঘটল না।

সুবুদা একসময় বলল, পর্ণা, তোমার হাতখানা আমার বুকের ভেতর নিয়ে বড় শান্তি পাচ্ছি।

এতক্ষণ যে ঢেউগুলো বুকের মধ্যে মাথা খুঁড়ে মরছিল, সেগুলো শান্ত হয়ে গেল। এমন শান্তি আমি বোধ করি কোনদিন পাইনি।

মনে হল, পুরুষ এত নিরুত্তাপ হয়! একটি যুবতী মেয়েকে হাতের মুঠোয় পেয়েও সে কোন রকম উত্তেজনা প্রকাশ করে না! বললাম, কি কষ্ট সুবুদা?

সুবুদা হঠাৎ বিছানায় উঠে বসল। তার গা থেকে কম্পলখানা খসে পড়ে গেল, সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। বলল, কষ্টটা বুকেই থাকে, তাকে দেখানো যায় না। যদি দেখাতে পারতাম তাহলে আমার দুঃখে সহানুভূতি জানাবার ভাষাও তুমি হারিয়ে ফেলতে।

আমি আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। উঠে ওর বুকের মধ্যে মাথা ঠেকিয়ে বসলাম। ও আমাকে একটা পোষা পাখির মত দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বসে রইল। ওর থুতনিটা ছুঁয়ে রইল আমার চুলে ভরা মাথায়।

এক সময় ও বলল, তোমাকে বুকের ভেতরে পেতে চাইবে না, এমন পুরুষ বিরল পর্ণা। গুণের ছবি চোখে পড়ে না সব সময়, কিন্তু তোমার দেহের যে আকর্ষণ তাকে এড়ানও কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

সুবুদার বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম, এত দুঃখ তোমার কিসের সুবুদা? আমি কি তোমার দুঃখের একটুখানিও ভাগ নিতে পারি না?

তুমিই একমাত্র দুঃখ ঘোচাতে পারো। তাই আজ তোমাকে বুকের ভেতর নিয়ে বড় শান্তি পাচ্ছি পর্ণা। একটু চুপ করে থেকে সুবুদা আবার বলল, শোন, আজ একটা প্রশ্নের সমাধান তোমার কাছে থেকে চাইব। তুমি ছোট হলেও হয়তো একটা ভিক্ষে চেয়ে নিতে হবে তোমার কাছ থেকে।

বল কি বলবে?

সুবুদা বলল, তোমার মা আমাকে বড় ভালবাসতেন। তিনি যে এক সময় আমার হাত তোমাকে তুলে দিতে চেয়েছিলেন, তা তুমি জানো।

বললাম, মায়ের সেই ইচ্ছাই তো আমার প্রাণের এতদিনের প্রেরণা সুবুদা।

কিন্তু তুমি আমার মায়ের ইচ্ছার কথা জানো না পর্ণা।

বললাম, কি ইচ্ছা ছিল তাঁর সুবুদা?

সুবুদা বলল, একদিন স্কুল থেকে ফিরে আসার পর মা আমাকে খেতে দিলেন। খেয়ে শান্ত হলে ছাদের ওপরে নিয়ে গিয়ে তাঁর জীবনের অনেক দুঃখের কথা বলার পর বললেন, আজ আমার গা ছুঁয়ে একটা শপথ করবি সুবু?

মাকে বড় ভালবাসতাম। মায়ের পা ছুঁয়ে বললাম, বল।

মা আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, তুমি এখন বড় হচ্ছ। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে মন চঞ্চল হয়। যে কাজ করা ঠিক নয় সেই কাজগুলো করার জন্যেই মন অস্থির হয়ে ওঠে। পর্ণার সঙ্গে তুমি হুড়োহুড়ি করে খেলাধুলো কর। এরপর ও আস্তে আস্তে আরও বড় হয়ে উঠবে। তখন পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবে। তাই বলছি বাবা, আজ আমার গা ছুঁয়ে শপথ কর, কোনদিন পর্ণাকে নিজের ছোট বোন ছাড়া কিছু ভাববি না।

মায়ের পা ছুঁয়েই বললাম, ও তো আমার ছোট বোনই মা, ওকে আবার অন্য কি ভাবতে যাব।

মা তবুও বললেন, আমি যেদিন থাকব না সেদিন তুই কি করছিস দেখতেও আসব না, তবু এই শান্তি মনে নিয়ে যাব যে আমার ছেলে আমাকে কথা দিয়ে কথার খেলাপ কোনদিন করবে না।

আমি মাকে কথা দিয়েছিলাম পর্ণা, তাই মন চঞ্চল হলে মার মুখখানা মনে পড়ে।

বললাম, তুমি আমাকে সত্যি ক্ষমা কর সুবুদা। তোমাকে বরাবর আমি নিষ্ঠুর বলেই ভেবেছি। আমি যখন তোমার স্বপ্নে বুক ভরে নিয়ে তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, তখন দেখেছি তুমি আমার সঙ্গে একেবারে নিস্পৃহের মত ব্যবহার করেছ। আমি দুঃখ পেয়ে সরে এসেছি, নীরবে চোখের জল ঝরিয়ে রাতের বিছানা ভিজিয়েছি। আমি সব সইতে পারতাম সুবুদা, কিন্তু তোমার ঐ উপেক্ষা আমার বুকে

এসে বাজত। আজ আমি আর তোমাকে কিছু বলতে পারব না। মা আমাদের কারুরই নেই, তাই আমরা জানি মা আমাদের কাছে কতখানি। তুমি মায়ের সম্মানটুকু রাখছ, এতে আমার আর কি বলার থাকতে পারে সুবুদা। যদি তোমার মা আর আমার মা আজও বেঁচে থাকতেন তাহলে হয়তো তাঁরাই উদ্যোগী হয়ে আমাদের মিলনের পথ বেঁধে দিতেন।

পরের দিন থেকে আমাদের মনের ছবি বদলে গেল। আমি ওর মায়ের পেটের বোনের মতো আচরণ করতে লাগলাম। সে এক আলাদা উন্মাদনা। কি করে যে আমি মুহূর্তে আমার এতদিনের তিল তিল করে গড়ে তোলা স্বপ্নকে ধুয়ে মুছে ফেলতে পারলাম তা ভেবে আজও আশ্চর্য হই।

ছোট বোনের প্রেরণায় আমি ওর সেবা করতে লাগলাম। তখন মনে আমার এক আলাদা উন্মাদনা। সুবুদাও দেখি অন্য মানুষ, খুশিতে ঝলমল। মুখের থমথমে মেঘ দমকা হাওয়ায় উড়ে গেছে।

থামল সুপর্ণা। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ বলল, অসাধারণ চরিত্র তোমার সুবুদার। বড় শ্রদ্ধা হল তাঁর ওপর। ভদ্রলোককে তো কই বিয়ের সময় দেখলাম না।

সুবুদার বন্ধুর কাছে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, সুবুদা এখন উত্তরপ্রদেশের আলমোড়া অথবা রাণীক্ষেতের কোন এক জায়াগায় নাকি প্র্যাকটিশ করেছেন। বন্ধুদের কালেভদ্রে চিঠি দেন। সবসময় ঠিকানা দিতে চান না।

সে কি! তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই?

সুপর্ণা বলল, বড় লজ্জা আর দুঃখের ভেতর দিয়ে সুবুদাকে আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল।

কি রকম? অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল আনন্দ।

সে আর বল না। সে সব শুনলে মানুষের ওপর কানাকড়ি ভক্তি শ্রদ্ধা থাকবে না তোমার!

আনন্দ বলল, বলই না শুনি।

সুপর্ণা বলল, আমার বিয়ের আগে অন্য দু-একটা জায়গায়ও সম্বন্ধ চলছিল। এক জায়গায় প্রায় কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে এসেছিল, এমন সময় ছেলের বাবা একখানা চিঠি দিয়ে জানালেন যে—'সুবীর মালাকার নামে যে ছেলেটি আপনার বাড়িতে আছে, তার সঙ্গে আপনার মেয়ের একটা অশোভন সম্পর্ক আছে। একটি ছেলে আমাকে চিঠি দিয়ে সব কথা জানিয়েছে। যদি ছেলেটির কথা সত্য না-ও হয়, তাহলেও যে মেয়েটিকে বধূ করে ঘরে আনছি, তার দিকে তাকালেই ঐ ছেলেটার চিঠির কথা বার বার মনে পড়বে। নিজের পুত্রবধূকে সন্দেহের চোখে দেখব, তার চেয়ে মর্মান্তিক আর কি হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের যখন কোন পথ নেই তখন আপনার মেয়েকে কোন অপবাদ না দিয়েই আমি সরে আসতে চাই।'

ব্যস্, বিয়ে ভেঙে গেল। বাবা অমনি চিঠিখানা দারুণ গম্ভীর মুখে করে ধরিয়ে দিলেন সুবুদার হাতে।

আমি ভেতরের ঘর থেকে ব্যাপারটা দেখছিলাম। হঠাৎ দেখি জামা গায়ে দিয়ে বাবা হনহন করে বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

সুবুদার কাছে গিয়ে বললাম, কি ব্যাপার বল তো, বাবাকে এমন মুখ গম্ভীর করতে তো কোনদিন দেখিনি।

সুবুদার চিঠি খানা পড়া হয়ে গিয়েছিল, আমার হাতে এগিয়ে দিল।

চিঠি পড়ে তো আমি তাজ্জব। বললাম, মরে গেলেও আমি এমন লোকের বাড়িতে বউ হয়ে যেতাম না। ভগবান রক্ষে করেছেন।

কিন্তু বাবা দুপুরে খেতে এলেও সুবুদা সেই যে ঘর ছেড়ে এক পোশাকে বেরিয়ে গেল আর ফিরে এল না।

অনেকদন পরে উত্তরপ্রদেশের কোন এক জায়গা থেকে বাবাকে চিঠি লিখেছিল সুবুদা। তাতে বাবার ওপর তার কৃতজ্ঞতার কথাই শুধু জানিয়েছিল, কিন্তু কোন ঠিকানা দেয়নি। সেই থেকে আমি

ওর বন্ধুদের মুখে দু-একটা উড়ো খবর পেলেও অভিমানে তেমন করে ওর খোঁজখবর নিইনি। বাবা শুধু আমার বিয়ের দিনে একবার দুঃখ করে বলেছিলেন. সুবুটা আজ নেই, বুকখানা ভেঙে যাচ্ছে আমার। ছেলেটা আমার ওপর অভিমান করে চলে গেল।

বসুমল্লিক ভিলায় ফিরে এসেছে ওরা। পক্ষকালের ভ্রমণ শেষ করে ওদের বজরা ফিরে এসেছে ঘাটে। আবার বধূবরণ, আনন্দ অনুষ্ঠান। রাধাগোবিন্দ মন্দিরে রুদ্রশঙ্কর বধূকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তার হাত দিয়ে রাধা আর মাধবকে দিয়ে এসেছেন মূল্যবান রত্নখচিত দুটি সোনার মুকুট।

সুপর্ণা এ বাড়ির শ্রী। বধূরাই এ বাড়িতে চিরদিন লক্ষ্মীর ভূমিকা নিয়ে থাকে। বসুমল্লিক বাড়ির সঞ্চিত ধনরত্ন রক্ষার ভার তাদের ওপর। অলঙ্কার ভল্টে রাখার প্রস্তাব উঠেছিল একসময়, কিন্তু রুদ্রশঙ্কর সে প্রস্তাব কানে তোলেননি। তিনি বলেছিলেন. টাকা পয়সা ব্যাঙ্কে থাক, ব্যবসায়ের লেনদেনের জন্যে দরকার পড়বে, কিন্তু হীরে, সোনা, মুল্যবান সব রত্ন ঘর থেকে বের করে দেব কোন দুঃখে। ঘরের লক্ষ্মী ওসব আগলাবে।

শোবার ঘরে অন্য চেহারা। আনন্দ বলল, বাবা তো তোমাকে মহালক্ষ্মীরূপিণী বানিয়ে ছাড়লেন। আমি বলি কি, তুমি শক্তিরূপা মহামায়া। বসুমল্লিক পরিবারের সব শক্তিই তুমি হরণ করে বসলে।

সুপর্ণা বলল, পুরুষ-শক্তি চিরদিনই নারী হরণ করে।

আনন্দ বুকের ভেতর সুপর্ণাকে প্রবল নিষ্পেষণে জড়িয়ে ধরে বলল, পুরুষ যে এখনও অপরাজেয় তা তুমি স্বীকার কর?

নিষ্পেষিতা সুপর্ণা বলল, দোহাই তোমার ছেড়ে দাও, হার মানছি।

আনন্দ সুপর্ণাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, সে কি, এইটুকুতেই কাতর হয়ে পড়লে! তোমরা না শক্তির অংশ থেকে জন্মেছ?

সুপর্ণা বলল, আমারও সময় আসবে তখন বোঝাব শক্তি কাকে বলে।

আমি এখন থেকেই হার মানছি।

সুপর্ণা আনন্দের হাতখানা টেনে নিয়ে তার প্রতিটি আঙুলে কুটকুট করে দাঁত বসাতে লাগল।

আনন্দ আতঙ্কের ভান করে বলল, সর্বনাশ, ওরা তোমার কি করল?

বাড়াবাড়ি করলে কিন্তু ঐ অসভ্য আঙুলগুলোতে কামড়ে দেব।

আনন্দ বলল, কোনদিন হাতাখানা যদি তোমার আকর্ষণ এড়াতে না পেরে ওদিকে চলে যেতে চায়, তাহলে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলব, চপলতা যদি আজ কিছু ঘটে করিও ক্ষমা, হে নিরুপমা।

সুপর্ণা দু'হাতের পাতায় আনন্দের দুটো গাল চেপে ধরে একটা চুমু খেয়ে বলল, ওস্তাদ প্রেমিক তুমি। কতজনকে যে কবিতা বলে কাৎ করেছ তার কি লেখাজোখা আছে। আনন্দ বলতে যাচ্ছিল, বিশ্বাস কর...। সুপর্ণা ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, একটুও না।

সাড়ম্বরে দুর্গোৎসব হয়ে গেছে। বসুমল্লিক ভিলায় মন্দির চত্বরে যাত্রার আসর বসেছে। পুরাতন আর নতুন রীতির মিলনে সাজানো হয়েছে আসর।

আসরের মাঝখান থেকে ঝুলছে ঝাড়লণ্ঠন। তার ভেতর হাই পাওয়ারের বাল্ব। রূপোর তৈরি দেড় ফুট উঁচু প্রাচীন আমলের রেলিং দিয়ে ঘেরা বিশিষ্ট অতিথিদের আসর। সেখানে ফরাসের ওপর ছোট ছোট তাকিয়া ছড়ানো। আসরের মাঝে মাঝে যেখানে সামিয়ানার জন্যে কাপড় জড়ানো বাঁশের পোস্ট উঠে গেছে তার তলায় তলায় পাম বসানো বড় বড় পেতলের টব। ঠিক তারই পাশে পাশে ঝকঝকে থালার ওপর শিউলি আর টগরের ছোট ছোট মালা। অতিথিরা একটি করে মালা হাতে তুলে নিচ্ছেন। পরিচারকরা সবার কাছে পান সিগারেটের পাত্রটা তুলে তুলে ধরছে। যে যার দরকার মতো নিয়ে নিচ্ছেন। আসরের মধ্যমণি হয়ে বসে আছেন রুদ্রশঙ্কর। মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়িয়ে অথবা অর্ধ উত্থিত অবস্থায় অতিথি ভেদে অভ্যর্থনা জানিয়ে আসরে বসার অনুরোধ জানাচ্ছেন।

এদিকে মহিলামহলের ব্যবস্থা একটু স্বতন্ত্র। আগেকার আমলের হাল্কা নীল রঙের ওপর চিত্রিত অতি মিহি জাপানী চিক ফেলা। মেয়েদের বসার আসন হয়েছে প্রশস্ত শ্বেতপাথরে বাঁধানো দালানে।

তিনটি তরুণী পরিচারিকা মাজা পেতলের ডাবরে মিষ্টি মশলা দেওয়া মিঠে পান নিয়ে ঘুরেঘুরে পরিবেশন করছে। একটি পরিচারিকা মাঝে মাঝে এসে কখনো আতর, কখনো বা গোলাপ জল স্প্রে করে দিয়ে যাচ্ছে মোহিনী কুমারী আর বধূদের মাঝে। বিধবা এবং প্রবীণারা বসেছেন এক জায়গায়। তাঁদেরই একপাশে বছর ছাব্বিশ বয়সের একটি সুন্দরী মেয়ে বসে আছে। পরণে ধবধবে সাদা কাপড়। বৈষ্ণবীদের মতো চূড়া করে চুল বাঁধা। গলায় তুলসীর মালা। কপালে চন্দনের তিলক। কোলের ওপর ঝকঝকে সোনার মতো একটি হামা দেওয়া নাড়ুগোপালের মূর্তি। হাতে টগরের মালা।

এ বছরের পূজায় সুপর্ণা নববধূ। রুদ্রশঙ্কর তাকে কাছে ডেকে বার বার করে বুঝিয়েছেন, বসুমল্লিক বাড়ির মর্যাদা রাখার ভার তোমার হাতে মামণি। সামান্য একটু ছিদ্র পেলেই নিন্দের জলধারা বাঁধ ভেঙে বান ডাকিয়ে সম্ভ্রম সম্মান, সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তোমার আচরণ দিয়ে সবার মন তুমি জয় করবে, এই আমি চাই। তুমি আমার বুদ্ধিমতী মেয়ে, তোমাকে বেশি কিছু বলে দেবার দরকার নেই মা।

সুপর্ণা তাই অনলস ঘুরে চলেছে। প্রবীণাদের প্রণাম করছে পা ছুঁয়ে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটু ঘোমটা টেনে দিয়ে মুখে শান্ত ভক্তির শ্রীটুকু ফুটিয়ে সুপর্ণা গুরুজনদের সঙ্গে গলিত বিনয়ে কথা বলছে। বিশিষ্ট বাড়ির নিমন্ত্রিত বধূ আর কুমারী মেয়েদের সামনে এসে খানিক ঘোমটা সরিয়ে এক ঝলক হাসি উপহার দিয়ে যাচ্ছে। কখনো বা কারু হাতে মালা নেই দেখে একটি মালা এনে তার হাতে দিয়ে যাচ্ছে মিষ্টি হেসে। সঙ্গে সঙ্গে বলছে, যতদিন না আসল হাতের মালা পাও ততদিন এতেই সন্তুষ্ট থেকো ভাই।

কুমারী ননদিনী সম্পর্কের মেয়েরা হেসে উঠছে বধূর কথায়।

একটি বিবাহিতা মহিলার কাছে এগিয়ে গেল সুপর্ণা। সম্পর্কটা রসিকতার। বলল, আর একটু এগিয়ে বসুন রুমাদি, ভাল করে হয়তো দেখতে পাচ্ছেন না।

রুমাদি বলল, বেস দেখছি! এই 'নটী বিনোদিনী' পালা আমার পাঁচ সাতবার দেখা। এই সীনে বিনোদিনীর কাছে আসবে তার প্রাণের বাবুটি।

সুপর্ণা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, পাঁচবার তো বিনোদিনীর বাবুকে দেখেছেন, এখন নিজের বাবুটির দিকে নজর দিন। উনি যে আসরের এক কোণে বসে হাঁ করে বিনোদিনীকে গিলছেন না তা কি আপনি বলতে পারেন?

রুমাদি বলল, ঠিক কথা ভাই। উনি তো আই-বি ডিপার্টমেন্টের কর্তা ব্যক্তি, তোমার একটা চাকরির ব্যবস্থা ওঁর কাছে করে দেব। এই পি-এর কাজ-টাজ। তাহলে তুমি বাঘের ঘরে থেকে বাঘ ধরতে পারবে।

ও কাজটা আপনারই একচেটিয়া থাক রুমাদি।

কেন, কি হল, বিশ্বাস কর, আমি তোমার ঠাকুর জামাইকে বলব।

সুপর্ণা বলল, দোহাই আপনার রুমাদি, আপনি একশোবার বিনোদিনীর বাবুকে দেখুন, আমি আর কিচ্ছু বলব না।

রুমাদি ওর গলায় আলতো করে হাতটা জড়িয়ে ধরে বলল, ভাই নিমন্ত্রিত হয়ে নাটক দেখতে এসেছি, ফেরার পথে যেন কর্তার হাত ধরে ফিরতে পারি, এইটুকু ব্যবস্থা কর। ওর দিকে নজর রাখলে আর নাটক দেখা হবে না।

সুপর্ণা বলল, আমিই নজর রাখব।

রেখ, কিন্তু একটু কম করে।

সুপর্ণা উঠে দাঁড়াল, আর অমনি যাত্রার কনসার্ট শেষ হয়ে মঞ্চে ঢুকলে বিনোদিনী। দ্রুত মাথাটা নিচু করে আসর থেকে সরে গেল সুপর্ণা। একেবারে পিছনের সারিতে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কয়েকজন পরিচারিকা হাতে পেতলের ডাবর আর আতরদান নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটা অঙ্ক শেষ হয়ে কনসার্ট বাজতে আরম্ভ করলেই তারা অতিথিদের কাছে পান সরবরাহের জন্যে এগিয়ে যাবে।

তারা যখন দেখল বৌরাণী তাদের কাছে দাঁড়িয়ে পড়েছে, তখন তারা সংকোচে সরে যাচ্ছিল। সুপর্ণা একজনের হাত ধরে ফেলে চুপি চুপি বলল, এখন তো সবে একটা অঙ্ক শুরু হল, এটা শেষ হতে প্রায় ঘণ্টার কাছাকাছি। তোরা ঠাকুরের মতো দাঁড়িয়ে থাকবি কেন, চলে যা ওপরের দালানে, সেখানে থেকে দিব্যি দেখা যায়। আবার অঙ্ক শেষ হয়ে কনসার্ট শুরু হলে নেমে আসবি।

মেয়ে তিন চারটি পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করল সসংকোচে। সুপর্ণা বুঝল, ওরা সংকোচে যেতে না পারলেও ওদের সারা মন যাত্রা দেখার আগ্রহে উন্মুখ।

সুপর্ণা ওদের প্রায় সব ক'টিকে ঠেলে ঠেলে ওপরের দালানে পাঠিয়ে দিল।

ও এখন দালানের একটা প্রান্তে এসে দাঁড়াল। এখান থেকে একটা সিঁড়ি নীচে গঙ্গার দিকেব বাগানে নেমে গেছে। ঐ বাগানটা অন্তঃপুর থেকে একেবারেই দেখা যায় না।

সুপর্ণা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে মেয়েদের চিক্ দেয়ালে এসে শেষ হয়েছে। সামান্য একটু ফাঁক ছিল দেওয়াল আর চিকের মধ্যে। তার ভেতর দিয়ে সুপর্ণার চোখ চলে গিয়েছিল যাত্রার মঞ্চে। সেখানে বিনোদিনী তার হাসিতে অভিমানে গানে চঞ্চল করে তুলছিল তার প্রেমিক পুরুষটির অন্তর। সারা আসরের প্রতিটি মানুষের মনে তখন বিনোদিনীর ছায়া। মন কেড়ে নেবার মত অভিনয় করতে পারে বটে মেয়েটি। আনন্দ বলেছিল, ওর নাম নাকি শশিকণা। যাত্রাজগতের উদীয়মান তারকা। ওর মুখের হাসি, চোখের ইশারা মন কেড়ে নেবার মতো। গানের গলাখানাও ভারী মিষ্টি। যেন নাচের ছন্দে ওর চলা ফেরা! মেয়েটি গভীর হতেও জানে। তখন চঞ্চল চোখের তারা স্থির হয়ে যায়। মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে সুন্দর একটি ভাবনার ছায়া পড়ে।

সুপর্ণা দেখছিল আর ভাবছিল, হ্যাঁ, এমন মেয়েই পারে যে কোন সংসার থেকে পুরুষকে টেনে বের করে নিয়ে যেতে।

সুপর্ণার সামনে বসেছিল যে বৈষ্ণবী মেয়েটি সে মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছিল সুপর্ণাকে। হঠাৎ মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল সুপর্ণার কাছে। সুপর্ণার চোখ এখন মেয়েটির ওপর।

সুপর্ণার মুখে হাসির রেখা এঁকে বলল, আপনার কিছু দরকার?

বৈষ্ণবী হেসে মাথা নেড়ে জানাল, না ভাই। শুধু ভাল করে তোমাকে একটু দেখতে এলাম।

মিষ্টি হাসি আর সংকোচের একটা সুন্দর মিলন ঘটল সুপর্ণার মুখে।

বৈষ্ণবী সুপর্ণার প্রতিমার মতো মুখখানা তুলে ধরে বলল, আনন্দ খুব ভাগ্যবান, একেবারে কৃষ্ণজায়া রুক্মিনীকে ঘরে এনে তুলেছে। রূপে অলঙ্কারে সুশোভিতা ঐশ্বর্যমূর্তি। দ্বারকাপতির রাণী হবার যোগ্য বটে।

সুপর্ণা কোন কথা বলতে পারল না, সে বড় বড় চোখ দুটো বৈষ্ণবীর মুখের ওপর পেতে দাঁড়িয়ে রইল।

বৈষ্ণবীর সারা অবয়বে এক আশ্চর্য লীলা। এমন সুঠাম দেহ-গঠন বড় একটা চোখে পড়ে না। সুপর্ণার চোখে মুগ্ধতার একটা ছবি ফুটে উঠল।

বৈষ্ণবী একটু থেমে বলল, অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল ভাই তোমাক দেখার, আসতে পারিনি। নতুন আশ্রমের পত্তন হয়েছে। সব কাজ দেখাশোনা, আর কৃষ্ণ সেবার পর সময় করে উঠতে পারি না। তাই ইচ্ছেটুকু মনের ভেতরেই হারিয়ে যায়। এই অনুষ্ঠানে এলাম তাই দেখা হয়ে গেল। তোমাদের রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পুরোহিত মশাই ভাগ্যিস একটা নেমন্তন্ন দিলেন, তাই আসতে পারলাম।

বয়সে খুব একটা বড় না হলেও বৈষ্ণবী। তাই প্রণাম করা সঙ্গত বিবেচনা করে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিল সুপর্ণা। বৈষ্ণবী দু'হাতে জড়িয়ে ধরল তাকে। বলল, আমরা সবাই সখি ভাই, কেউ কারোর চেয়ে বড় নয়।

সুপর্ণা বলল, আপনি তো দেখছি ওঁকে চেনেন, কিন্তু আমি তো আপনার পরিচয় পেলাম না।

বৈষ্ণবী বলল, আনন্দ আমার অনেক দিনের চেনা। আমি বিশাখা। এখন আনন্দ আমাকে এ নামে আর চিনবে না। অনেক দিনের অদর্শন।

সুপর্ণার মনে হল, একটা রহস্যের চিক যেন তার সামনে দুলে দুলে উঠছে। সে হাত দিয়ে সরালেই চিকটা সরে যায়, আর সব রহস্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সুপর্ণা বলল, আপনি কি বিপাশাদি?

বিপাশা সুপর্ণার একখানা হাত নিজের হাতের ভেতর তুলে নিয়ে বলল, আনন্দ শুধু সুন্দরী বউই আনেনি, বুদ্ধিমতী একটি মেয়েকে সঙ্গিনী করে এনেছে।

সুপর্ণা বলল, যাত্রা শোনার ইচ্ছে যদি না থাকে তাহলে আসুন আমার সঙ্গে, বসে বসে গল্প করা যাবে।

বিপাশা বলল, চল, নাটক দেখার চেয়ে তোমার সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলে অনেক আনন্দ পাব।

সুপর্ণা বিপাশাকে পাশের সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিয়ে এল পিছনের বাগানে। ফোয়ারার ধারে শ্বেতপাথরের বাঁধানো বেদী। সুপর্ণা বিপাশাকে হাত ধরে বসাল বেদীর ওপর। বলল, ওর মুখে আপনার অনেক কথা শুনেছি।

বিপাশা বলল, আপনি না ছাড়লে কেউ আপনার হয় না, এখন থেকে তুমি বলে সম্বোধন করলে খুশি হব ভাই। একটু থেমে আবার বলল, হ্যাঁ, একসময় আমরা প্রেসিডেন্সিতে পড়েছিলাম, অবশ্য আনন্দ আমার ওপরের ক্লাশে পড়ত। সে সময় আমাদের খুবই জানাশোনা ছিল।

তোমাদের সব গল্প ও আমাকে শুনিয়েছে।

বিপাশা বলল, সবই যখন শুনেছ তখন মনে মনে নিশ্চয় তোমার রাগ হয়েছে আমার ওপর।

একটুও রাগ করিনি তোমার ওপর বিপাশাদি। বরং তোমার জীবনে এত বড় একটা অঘটনের পর ও কোন খোঁজ খবর নেয়নি বলে আমার খুব রাগ হয়েছিল। তোমার ঠিকানাও ওর কাছ থেকে নিয়ে রেখে ছিলাম, যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

বিপাশা বলল, ও ঠিকানায় গেলেও আর হদিস পেতে না আমার। মামা মারা গেছেন, মামী চলে গেছেন তাঁর ভাইয়ের সংসারে জায়গাটুকু বিক্রি করে দিয়ে। মামী যাবার সময় একটা সত্য জানিয়ে গেছেন, আমার মামা আমাকে দয়া করে প্রতিপালন করেছেন। একটি নার্সিং হোমে আমার কুমারী মা নাকি আমাকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান, আর ঐ নার্সিং হোমের কর্মী ছিলেন আমার মামা। তিনি দয়া করে আমাকে ঘরে এনে রেখেছিলেন।

সুপর্ণা বলল, এ দুঃখ রাখার জায়গা নেই বিপাশাদি।

কিসের দুঃখ ভাই, নিজের বুদ্ধিতে নিজে পথ চলি। এতকাল কেউ আমাকে পথ দেখিয়ে দেয়নি। পড়াশোনা, নাচগানের খরচ নিজের রোজগারে চিরদিন নিজেই চালিয়ে গেছি।

সুপর্ণা বলল, আগে তোমার মা-বাবার কথা জানতে চাওনি মামার কাছে?

চেয়েছিলাম। মামা বলতেন, পাকিস্তানের হাঙ্গামায় তাঁরা নাকি নিহত হয়েছেন। মামা আর মামীমা কোন রকমে পালিয়ে এসেছেন আমাকে নিয়ে।

সুপর্ণা বলল, তুমি এখন আশ্রমে রয়েছ বললে না, কোথায় তোমার আশ্রম? ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে যাও, সময় করে আমি যাব তোমার কাছে।

তুমি যাবে আমার কাছে! এত খুশি রাখব কোথায় ভাই।

সুপর্ণা বলল, বিশ্বাস কর, তোমার ওখানে গেলে আমি আনন্দই পাব।

বিপাশা সুপর্ণাকে তার আশ্রমের ঠিকানা আর রাস্তার নিশানাটাও বলে দিল।

সুপর্ণা বলল, এ তো খুব বেশি দূর বলে মনে হচ্ছে না।

পৃথিবীতে কোন জিনিসই দূরে নেই। দূর ভাবলেই দূর। তোমার এত কাছে বসেও আমি দূরে থাকতে পারি, আবার অনেক দূরে থেকেও তোমার মনটিকে ছুঁয়ে থাকতে পারি।

সুপর্ণা অন্য প্রসঙ্গে এল, তোমার জন্যে কিছু ফল সন্দেশ আনব বিপাশাদি?

একেবারে না। আমি বৈষ্ণব ধর্ম নিলেও আমিষ ভোজী, আবার বিধবা হলেও বৈধব্যের আচার মানি না। কারণ শ্রীকৃষ্ণ আমার স্বামী। আমার বৈধব্য নেই। আশ্রমে রান্না করে রেখে এসেছি ভাই, ফিরে গিয়ে খাব।

সুপর্ণা বলল, আমিষে যদি অরুচি না থাকে তাহলে আমাদের রান্না খেয়ে যেতে আপত্তি কি?

বিপাশা বলল, আজ ওসব হাঙ্গামা থাক, একটু গল্প করতে দাও। খেয়ে সময় নষ্ট করার চেয়ে গল্প করে সময় কাটানো অনেক লাভের।

লাভ লোকসান আমি জানি না, তবে না খাইয়ে ছেড়েছি জানলে ও দুঃখ পাবে, আমার ওপর হয়তো রাগ করবে।

বিপাশা বলল, আহা, আমার জন্যে কেউ দুঃখ পাবে, এ কথা ভাবলেও তো আনন্দ। আর আমার জন্যে যদি একটু ভাই গালমন্দও তোমাকে শুনতে হয় তাহলে আরও বেশি করে বিপাশাদিকে মনে থাকবে তোমার।

সুপর্ণা হেসে বলল, ওর মুখে তোমার চরিত্রের যে পরিচয় পেয়েছি তার সঙ্গে তোমার কথাবার্তার আশ্চর্য মিল আছে।

বিপাশা অমনি বলল, চরিত্রটা আমার নিশ্চয়ই খুব প্রশংসার যোগ্য নয়। আমি জানি না আনন্দ তাকে আবার কি রূপে তোমার কাছে মেলে ধরেছে।

ও কিন্তু কোন কিছুই আমার কাছ থেকে গোপন করেনি। তাতে তোমার ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়েছে বই কমেনি।

বিপাশা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, সে কি! তাহলে আনন্দ সত্যি কথা প্রায় একটাও বলেনি। আমার জীবনের যে সব কথা ও জানে সেগুলো কারু কাছে বললে তার ঘৃণা না হয়েই পারে না।

সুপর্ণা বলল, বিশ্বাস কর বিপাশাদি, ও সব বলেছে, কিন্তু আমি তাতে দুঃখ পাইনি। বরং তোমার ওপর আমার আকর্ষণই বেড়েছে।

তাহলে তুমি অসাধারণ।

সুপর্ণা বলল, আদপেই না। যে কেউ তোমার লাইফ হিস্ট্রি শুনবে সে-ই তোমার ওপর একটা আকর্ষণ বোধ করবে।

বিপাশা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে আমার শুধু ভাল লাগল না, বুকের ভেতর কিছু ঈর্ষাও ভরে নিয়ে গেলাম।

ঈর্ষা কেন?

বিপাশা বলল, আনন্দ জিতে গেছে সেজন্যে। তোমার মতো মেয়েকে সে পেয়েছে এতে ঈর্ষা হবে না তো কি।

সুপর্ণা বলল, বিপাশাদি, আশ্রমে ফেরার তাড়া নেই তো তোমার?

যাত্রাটার বড় নামডাক, তাই শুনব বলেই এসেছি।

তাহলে অকারণে তোমাকে টেনে আনলাম, চল যাত্রার আসরে বসিয়ে দিয়ে আসি।

তোমার যদি অসুবিধে না থাকে তাহলে আর একটু তোমার সঙ্গে গল্প করে যাব। আমি তো ভোরবেলার যাত্রা ভাঙার আগে ছাড়া গাড়ি পাব না।

সুপর্ণা বলল, আমার ওপরের ঘরে চল। ওখানে বসে ইচ্ছে হলে যাত্রাও দেখতে পারবে। জানালা খুললেই আসর।

ওরা দুজনে বাগান থেকে খিড়কির দরজা দিয়ে ওপরে উঠে গেল। প্রশস্ত সাজানো ঘর। আগেকার কালের কাজ করা সিংহের পা-ওয়ালা পালঙ্কের ওপর ধবধবে সাদা বিছানা পাতা। হাতির দাঁতের কাজ করা ছত্রীর সঙ্গে বাঁধা নেটের সাদা মশারি। বিছানায় পাশাপাশি বালিশ সাজানো। বালিশের ঢাকায় এমব্রয়ডারীর কাজ।

সুপর্ণা বলল, এই সোফাটায় তুমি বস বিপাশাদি, আমি নীচের থেকে আসছি। বুঝতে পারছ, বাড়ির বউ, সবাইকার তদারকির ভার আমার ওপর। মনে হচ্ছে একটা অঙ্ক শেষ হল। কনসার্ট বাজছে।

দরজার দিকে একটুখানি এগিয়ে গিয়ে ফিরল সুপর্ণা। বিপাশার হাত ধরে টেনে আনল বিছানার ওপর। মাথার দিকের জানালাটা খুলে একটুখানি ফাঁক করে দিয়ে বলল, এদিকে দিয়ে যাত্রার মঞ্চটা বেশ পরিষ্কার দেখা যায়, তুমি এখানে বসেই ততক্ষণ দেখ।

বিপাশা বলল, আমার অসুবিধা হবে না। তুমি তোমার কাজ চুকিয়ে এস।

সুপর্ণা এক মুখ মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল।

বিপাশা কিন্তু জানালার ফাঁক দিয়ে যাত্রার আসরের দিকে তাকাল না। সে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতরে ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ছিমছাম সাজানো ঘর। টিপয়ের ওপর একটি পোর্সিলেনের ফুলদানি। তিনটে পরী নাচের ভঙ্গিতে ধরে রেখেছে সেই ফুলদানিটি। সবুজ ডাঁটার ওপর জেগে আছে ক'টি শ্বেতপদ্ম। বিরাট ওভাল সাইজের টেবিল মিরার। ওদিকে তাকাতেই ছায়া পড়ল নিজের দেহের। চমকে উঠল বিপাশা। ফুলদানিতে রাখা শ্বেতপদ্মের মতো মনে হল নিজেকে। হাতে ধরা হরেকৃষ্ণ ছাপ দেওয়া হলুদ রঙের একটা থলে। ছোট্ট গোপাল মূর্তিটি তার ভেতর রাখা। সামান্য কিছু টাকা পয়সা তার মধ্যে। সাদা কাপড়, গলায় কণ্ঠি, চন্দনের তিলক, হরেকৃষ্ণ ছাপ দেওয়া হলুদ ব্যাগ—কিছুই কিন্তু বিপাশার উদ্ধত যৌবনের শ্রীকে ঢেকে রাখতে পারেনি। বিরাট আয়নায় নিজের পূর্ণ প্রতিকৃতির দিকে চেয়ে কেমন বিহ্বল হয়ে গেল বিপাশা। আজ তার মনে হল, সে তার সম্পূর্ণ অপরিচিত মা বাবার কাছ থেকে সব দিক দিয়ে বঞ্চিত হলেও সুঠাম দেহের আকর্ষণীয় গড়নের দিক থেকে বঞ্চিত হয়নি।

কিন্তু এই কাম্য, সবার প্রশংসিত দেহটাকে নিয়ে কি-ই বা করল সে। একটি অতি সাধারণ অক্ষম পুরুষ মানুষের সঙ্গী হয়ে কাটাতে হল তাকে কিছুকাল। কৃষ্ণদাস বাবাজীর সঙ্গে যোগাযোগ না ঘটলে আজ তার জীবন যে কোন চিহ্নিত পল্লীর নারীর চেয়ে হয়তো উন্নত হত না। কৃষ্ণদাস বাবাজী গুরু মাধবাচার্যের ডাকে যদি আমেরিকায় না চলে যেতেন তাহলে নিজের ইচ্ছা মতো এই আশ্রমটিকে গড়ে তোলার কোন অধিকারও তার থাকত না।

কৃষ্ণদাস বাবাজীর হাতে গড়া আশ্রম। দু'মাসের যাতায়াতে কি দেখলেন তিনি বিপাশার ভেতর, চলে যাবার সময় তারই হাতে উইল করে দিয়ে গেলেন গঙ্গাতীরের সাজানো আশ্রমটি।

তার বিড়ম্বিত জীবনে তখন সে একটুখানি শান্তি, একটুখানি আশ্রয়ের জন্যে আকুল হয়ে উঠেছিল ঠিক, কিন্তু এই আকুলতাই কি শুধু কৃষ্ণদাস বাবাজীর হৃদয়কে নাড়া দিয়েছিল?

আজ নিজের পূর্ণ যৌবনশ্রীকে দেখে মনে হল, শুধুমাত্র আকুলতার ছবি নয়, তার দেহসুষমাও কম দোলা দেয়নি গুরু কৃষ্ণদাসের অন্তরে। কৃষ্ণদাস তাকে গোবিন্দ নামে দীক্ষা দেবার আগে মুগ্ধ চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন কতক্ষণ। তারপর বলেছিলেন অস্ফুট গলায়, তুমি শ্রীময়ী, তুমি শ্রীমতী। দ্বাপর, কলি, সর্বযুগ পরিব্যাপ্ত হয়ে তুমি শ্রীমতী রাধারাণী।

আজ নিজের বিকশিত দেহটার দিকে তাকিয়ে তার মনে হল কৃষ্ণদাস তার এ দেহের আকর্ষণকে অতিক্রম করতে পারেননি। গুরুর ডাকে আমেরিকা চলে যাবার আগে আশ্রমের কাজের সুবিধের জন্যে দলিল রেজিস্ট্রি করে দিলেন। মাঝে মাঝে কাছে ডেকে শুধু তাকিয়ে থাকতেন। কি যেন বলি বলি করেও বলতে পারতেন না।

সাধারণ পথের মানুষগুলোর মতো বুভুক্ষ নিশ্চয়ই ছিলেন না কৃষ্ণদাস। কিন্তু এখন মনে হল বিপাশার, তিনি শেষের ক'টি দিনে নিজের পার্থিব কামনার সঙ্গে এত দিনের সাধনার একটি কঠিন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। চলে যাবার দিন দমদম এয়ারপোর্টে তিনি বহু ভক্তের সামনে থেকে তাকে একটু নিভৃতে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, মনে রেখ, তুমি শ্রীরাধার অংশ। কারো পক্ষেই তোমার আকর্ষণ এড়ানো সম্ভব নয়। নিজেকে যদ্দূর সম্ভব আড়াল করে রেখ। অর্থের জন্যে ভেব না। আমার ভক্তরা তোমার প্রয়োজনের অর্থ যোগাবে। আর অতিরিক্ত অর্থের দরকার হলে আমার ঠিকানায় পত্র

দিও। গুরু মাধবাচার্যের অর্থের অভাব নেই। বৃদ্ধ মানুষ, এখন থেকে আমাকেই হতে হবে তাঁর ভাণ্ডারী। তারপর হেসে বলেছিলেন, ফিরে এলে তুমি আমাকে আশ্রয় দেবে তো রাধারাণী?

সেদিন গুরুর সঠিক মনোভাব বুঝতে পারেনি বিপাশা। সে চোখের জলের বকুল একটি একটি করে প্রভুর পায়ে ঝরিয়ে দিয়ে বলেছিল. এ মাধবেরই আশ্রম। আমি তাঁর পরিচারিকা ছাড়া আর কিছু নয় প্রভু।

বিপাশা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, সে শুধু শ্রীমতী রাধা নয় অনন্তকাল ধরে ব্যাকুল হৃদয় প্রেমিকাদের প্রতিনিধি।

বিপাশা এবার ঘরের প্রশস্ত দেওয়ালগুলোর দিকে তাকাতে লাগল।

কয়েকখানা বাঁধানো ছবি এদিক ওদিকের দেওয়ালে সংলগ্ন হয়ে আছে।

কাছে গিয়ে দেখতে লাগল সে। সব কটিই রঙীন ছবি। একটি চিত্রে বর বধূকে বেষ্টন করে ধরে রয়েছে। বিয়ের লগ্নে তোলা। লাল বেনারসীর ওপর জড়োয়ার সেটে ইন্দ্রাণীর মতো মনে হচ্ছে সুপর্ণাকে। গরদের পাঞ্জাবীর ওপর সাদা ফুলের গোড়ে মালাতে সুপুরুষ আনন্দকে দারুণ মানিয়েছে। কলেজের মেয়েরা আনন্দশঙ্করকে দেখতে পেলেই নিজেদের ভেতর বলাবলি করত, গ্রীক মিথলজি থেকে নেমে আসা আশ্চর্য পুরুষ।

বিপাশা ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ তার মনে হল, সুপর্ণার মুখখানা যেন অস্পষ্ট হয়ে উঠল। একটা পাতলা কুয়াশার মতো মসলিন ঢেকে ফেলল তার চন্দনচর্চিত মুখখানা। কতক্ষণ পরে একটা মৃদু হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে উড়ে গেল সেই মসলিনের উত্তরীয়। যেন কোন যাদুকর আড়ালে থেকে খেলা শুরু করেছে। এ কি দেখছে বিপাশা! এ যেন অন্য কারো মুখ। আনন্দশঙ্কর বেষ্টন করে আছে বধূকে। কোথায় সুপর্ণা! এ যে বিপাশার মুখ! লাল বেনারসী আর জড়োয়ার অলঙ্কারে সেজে মোহিনী লীলায় আনন্দশঙ্করের বাহুবেষ্টনে দাঁড়িয়ে আছে বিপাশা।

না না না—দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল বিপাশা।

পিছন থেকে কে যেন বিপাশার গায়ে হাত রেখে বলল, তুমি কাঁদছ বিপাশা!

চমকে সংকোচে সরে গিয়ে চোখ মুছে ফিরে দাঁড়াল সে। মুখে মৃদু হাসি ফোটানোর চেষ্টা করে বলল, তুমি আনন্দ।

আনন্দশঙ্কর বলল, সুপর্ণাই আমাকে তোমার আসার খবরটা দিলে। সে-ই ঠেলে ওপরে পাঠালে অতিথি আপ্যায়নের জন্যে।

বিপাশা বলল, গেল কোথায় সেই দুষ্টু বুদ্ধির শিরোমণিটি?

আনন্দ বলল, প্রথমে তো ও বলতেই চায়নি তুমি এসেছ বলে। বললে, তোমার এক বন্ধু এসেছে। বিশেষ দরকার আছে তার। ওকে ওপরে বসিয়ে রেখে এসেছি।

বললাম, আমার কোন বন্ধু?

সুপর্ণা ভেবে পেল না কার নাম করবে। শেষে ওকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছি দেখে ও ভয় পেয়ে চট করে তোমার নামটা বলে ফেললে।

বিপাশা বলল, তোমার বউয়ের সঙ্গে আধঘণ্টার বেশি পরিচয় হয়নি কিন্তু ও এইটুকু সময়ের ভেতরে মনের ওপর গভীর দাগ রেখে গেছে।

আনন্দ বলল, তোমার মুখ থেকে যখন সার্টিফিকেট পেলাম তখন বুঝতে পারছি নির্বাচনে আমি হারিনি।

শুধু জয়ী হওনি, অনেক ভোটে জিতেছ।

সে যাক, কিন্তু, এতদিন পরে, এ কি রূপে দিলে দরশন!

কেন, আগের মত আর ভাল লাগছে না বুঝি?

আনন্দ বলল, ভাল লাগছে না মানে! তুমি আরও বেশি সুন্দর হয়েছ।

যাক গে, অ্যাপোলোর মুখে প্রশংসার কথা শোনাও সৌভাগ্যের। কিন্তু বৈষ্ণবীদের প্রশংসা করার অধিকার শুধু বৈষ্ণবের। তোমার মুখে প্রশংসার কথা শুনলে পাপ হয়।

আনন্দ বলল, রাধাগোবিন্দের সেবক আমরা, তাই বৈষ্ণবীদের রূপ-কীর্তনের কিছু, অধিকার আমাদেরও রয়েছে।

বউকে নীচে রেখে এলে কেন, তার সামনে বৈষ্ণবীর প্রশংসা করতে, তাহলে বুঝতাম, আনন্দশঙ্করের বুকের পাটা আছে।

আনন্দ বলল, এখনও চেননি আমাকে, আমি কোন দিনই অন্যের ইচ্ছায় চলি না। বউয়ের সামনে তোমার মুখখানা দু'হাতে ধরে প্রশংসা করতে পারি।

ভাগ্যিস বলনি যে, চুমু খেতে পারি, ওতেই কৃতার্থ আমি!

আনন্দ হেসে বলল, এতক্ষণে তোমাকে ঠিক ঠিক তোমার স্বভাবে পেলাম। বৈষ্ণবীর ভেকটা কবে ধরলে? কিন্তু আসাধারণ সুন্দর মানিয়েছে তোমাকে।

আমার অঙ্গে বৈধব্য আর বৈষ্ণবীর বেশ একাকার হয়ে গেছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ কথা বলবে, চল বসে কথা বলি।

বিপাশা মাথা নেড়ে অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে বলল, তাহলে রাধাকৃষ্ণর যুগল মিলনটা হয়ে যায়। খবর পাঠাও যাত্রা আসরের লোকজনদের কাছে। তারা এসে দেখে যাক কুঞ্জ শয্যায় রাধামাধবের লীলারঙ্গ।

আনন্দ বলল, তুমি সত্যি নটী বিপাশা। নাচে অভিনয়ে কলেজে যেমন মাতিয়ে রাখতে, এখনও তাতে এক ফোঁটা ভাটা পড়েনি। কিন্তু একটা কথা বুঝে উঠতে পারছি না কিছুতেই, তুমি বৈষ্ণবী সাজলে কেন?

বিপাশা গভীর হল এবার। চোখের দৃষ্টিতে ব্যথার ছবি ফুটে উঠল তার। বলল, তুমি কি চাও আনন্দ একটা মেয়ে গরীব বলে, সংসারে শক্ত জমিতে পা ফেলে দাঁড়াতে পারছে না বলে, তাকে কয়েকটা ক্ষুধার্ত নেকড়ের ভোগ্য হয়ে পৃথিবী থেকে সরে যেতে হবে?

আনন্দ বলল, আজ তুমি আমার অতিথি না হলে মুখোমুখি ঝগড়া করতাম এ নিয়ে, কিন্তু আজ তুমি এ বাড়ির নববধূর মহাসম্মানীয়া অতিথি। তোমাকে অভ্যর্থনা জানাতে হবে তাই অনেক সমাদরে।

বিপাশা বলল, ডাক এবার বউকে, দেখা করে যাই।

কেন, আমি তোমাকে ঠিক মতো খাতির করতে পারছি না?

আঃ বড় জ্বালাতন করতে পারো তুমি আনন্দ। আমাকে আশ্রমে ফিরতে হবে না? যাবার আগে দেখা করে যাই।

আনন্দ হাতঘড়িটার দিকে চেয়ে বলল, এখনও ভোর হতে কয়েকটা ঘণ্টা বাকি, তুমি কি আশ্রমের গাড়িতে এসেছ?

বিপাশা বলল, আমার আশ্রম ভক্তদের প্রদত্ত ভিক্ষার ধনে চলে। গাড়ি কেনার সংগতি বা ইচ্ছা কোনটাই নেই।

তাহলে এত রাতে ফিরবে কি করে?

বিপাশা রসিকতা করে বলল, পায়ে হেঁটে।

আনন্দ বলল, তাহলে আর দেখতে হবে না। আশ্রমের বৈষ্ণবী তখন কোন রাজা বাহাদুরের পাটবিবির পদে আসীন হয়ে যাবে।

এতই যদি আশঙ্কা, তোমার গণ্ডাকয়েক গাড়ির একটাতে করে পৌঁছে দিয়ে এস না।

আনন্দ বলল, আশঙ্কা থাক বা না থাক, তুমি যখন আমার এখানে স্বেচ্ছায় এসেছ তখন পৌঁছে দেবার ভার যে আমার, সে কথা না বললেও চলে।

বিপাশা বলল, তুমিই কি গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে নাকি?

ক্ষতি কি?

বিপাশা বলল, না ক্ষতি কিছু নয়, সকলে তখন আর নটী বিনোদিনী না দেখে, সুভদ্রা-হরণ পালা শুনবে।

সিঁড়িতে কার যেন দ্রুত পায়ের সাড়া পাওয়া গেল। ইচ্ছে করেই যেন শ্বেত পাথরের সিঁড়িতে জোরে জোরে পায়ের আওয়াজ তুলে আসছে।

আনন্দ অস্ফুট গলায় বলল, তোমার সতীন আসছে।

চোখ দুটো বড় বড় করে শাসনের ভঙ্গিতে বিপাশা বলল, কি বললে!

ঘরের দরজায় ঠিক সেই মুহূর্তে একমুখ হাসি ছড়িয়ে এসে দাঁড়াল সুপর্ণা।

বিপাশা বলল, এমন কাঁচা কাজও করে কেউ। কোথায় পা টিপে টিপে এসে পুরনো বন্ধুদের কথা শুনবে তা না বাড়ি কাঁপিয়ে ঘরে ঢুকলে।

সুপর্ণা বলল, কথা বলার এত সুযোগ দিলাম, তাতেও আশ মেটেনি? বল তো আবার নীচে নেমে যাই।

বিপাশা এগিয়ে গিয়ে সুপর্ণার হাত ধরে বলল, সে কথা আমি বলেছি বুঝি? আমি বলছিলাম, তুমি আর আনন্দ যদি পুরনো বন্ধু হতে আর আমি যদি তুমি হতাম, তাহলে আড়ি পেতে তোমাদের কথা শুনতাম।

এই মুহূর্তে কেন জানি না সুপর্ণার বুকের ভেতর একটা ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠল। বিপাশার একটি কথা যেন তীরের মত এসে বিঁধল তার হৃদপিণ্ডের ঠিক মাঝখানে। 'আমি যদি তুমি হতাম'—এই অসমাপ্ত বাক্যটুকুর কি অসামান্য আহত করার ক্ষমতা।

সুপর্ণা নিজেকে সামলে নিল। বলল, শশিকণার অভিনয় দেখতে এসে ফালতু তোমার সময়টা নষ্ট হল। সত্যি বিনোদিনীর প্রেমের অভিনয় শশিকণার মতো আর কেউ ফোটাতে পারবে কিনা জানি না!

বিপাশা বলল, শশিকণার জীবন যৌবন যেন দীর্ঘদিন অটুট থাকে, তাহলে আবার অন্য আসরে নটী বিনোদিনী দেখা যাবে, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে এই অল্প সময়ের দেখা, এর মূল্য আমার কাছে অনেক।

আনন্দ বলল, পর্ণা, বিপাশাকে কিছু খেতে দিলে না?

সুপর্ণা বলল, তোমার তো পুরনো বন্ধু, সাধ্যসাধনা করে খাওয়াও না কেন।

বিপাশা আনন্দের দিকে চেয়ে বলল, তোমার চেয়ে তোমার বউ অনেক ভালভাবেই অতিথি আপ্যায়ন করতে জানে। এতক্ষণ কথার ভেতর তুমি একবারও আমার খাবার কথা তোলনি, কিন্তু পর্ণা অনেক আগেই আমাকে বারবার খাবার কথা বলেছে।

আনন্দ বলল, বিয়ের পর থেকে প্রায় প্রতিটি ব্যাপারে আমাকে পর্ণার কাছে হার মানতে হয়েছে।

বিপাশা বলল, তুমি শুধু আজ নয়, চিরদিনের হেরো। কেবল একবার জিতে গেছ তুমি। সে জয়টা মোক্ষম জয়। সুপর্ণাকে জয় করাতে তোমার হেরো নামের দুর্ণামটা ঘুচেছে।

বিপাশার শেষের কথাতে সুপর্ণার মনটা অনেক হালকা হয়ে গেল।

আনন্দ বলল, একটা কাজ করা যাক, যখন যাত্রা দেখা কারোরই হল না তখন চল, আমি আর পর্ণা গাড়ি করে তোমাকে আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বিপাশা বলল, ছি ছি, তা কি হয়। তোমাদের বাড়ির অনুষ্ঠান ছেড়ে তোমরা পালাবে! আমি বরং যেখানে বসেছিলাম, সেখানেই বসে থাকি। ভোর হলে প্রথম বাসেই ফিরে যাব।

সুপর্ণা আনন্দের দিকে চেয়ে বলল, আমি তো রয়েছি, তুমি বিপাশাদিকে পৌঁছে দিয়ে এস না, বেশি দূর তো নয়।

আনন্দ বলল, এর পরে যে অঙ্ক শুরু হবে, তা শেষ হতে লাগবে ঘণ্টাখানেক। বাবা তার বন্ধুবান্ধব নিয়ে নাটক দেখায় মশগুল হয়ে আছেন। আমার খোঁজই করবেন না। তোমার অতিথি আপ্যায়ণ তো নাটকের ভেতর চলবে না। তাই বলি কি, চল দুজনেই পৌঁছে দিয়ে আসি, বেশ মজা হবে। তাছাড়া বিশাখা সখির আশ্রমটাও দেখে আসা যাবে।

বিপাশা বলল, আশ্রম ভক্তদের কাছে আমি বিশাখা সখি হলেও তোমাদের কাছে আমি সেই বিপাশাই রয়েছি। আমাকে অন্তত তোমার দুজনে বিপাশা বলেই ডেকো। বুঝব আমার পূর্বজন্মটা এখনও লোপ পায়নি।

সুপর্ণা বলল, তোমরা সদরে বেরিয়ে যাও, আমি কাজের মেয়েদের একটু বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। সুপর্ণা তরতর করে নেমে গেল নীচে।

সেদিকে চেয়ে থেকে বিপাশা বলল, যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি সুন্দরী, আবার তেমনি ভদ্র। ভাগ্যবান তুমি আনন্দ। তোমার বউকেও ঐ একই কথা বলেছি, আনন্দ তোমার মতো মেয়েকে পেয়ে জিতে গেছে, সেজন্যে ঈর্ষা হচ্ছে আমার।

ওরা দুজনে কথা বলতে বলতে এসে দাঁড়াল বাইরের মহলে।

বিপাশা বলল, শুধু আজ ছেড়ে দিয়েই চলে আসা নয়, কথা দাও সময় পেলে আমার আশ্রমে চলে আসবে। এই তো এত কাছে। আর পর্ণাকে সঙ্গে নিয়ে আসবে অবশ্যই। আনন্দ বলল, কেন, একা একা গেলে আশ্রমে প্রবেশ নিষেধের নোটিশ টাঙানো থাকবে বুঝি?

বউয়ের পারমিশান নিয়ে যদি আশ্রমে যাও তাহলে নোটিশটা খুলে ফেলব আর যদি চুরি করে ঢোক তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বের করে দেব।

পারবে বের করে দিতে? বুকে হাত দিয়ে বল তো দেখি।

থাক, আর উত্তর শুনে কাজ নেই, পর্ণা আসছে।

দূর থেকে পর্ণাকে দেখে গাড়ি বের করতে চলে গেল আনন্দ। বিপাশা দাঁড়িয়ে রইল পর্ণার দিকে চেয়ে। মেয়েটির পদক্ষেপও সুন্দর। বিপাশার মনে পড়ল, এক সমালোচক তাকে একটি নাচের ফাংশানের শেষে একান্তে পেয়ে বলেছিলেন, তোমার নাচের মুদ্রা যেমন সুন্দর, তোমার পদক্ষেপও তেমনি চোখকে টেনে রাখে!

বিপাশা বলল, আমার খুব খারাপ লাগছে এমনি করে একটা জমজমাট অনুষ্ঠান-বাড়ি ছেড়ে তোমাদের চলে যেতে হচ্ছে।

সুপর্ণা বলল, এমন করে পালিয়ে বেড়ানোতেই তো মজা। তুমি অত সব ভাবছ কেন বিপাশাদি। এই শোন না, যেদিন দুজনে ঘর থেকে গাড়ি করে বাইরে বেরোই, সেদিন ও বলে, কোথায় যাবে? আমি বলি, আগে থেকে কিছু ভেবে দরকার নেই। ডাইনে বাঁয়ে যে পথ পাবে, মনকে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করে তার যে কোন একটা ধরে নেবে। আমরা তো নির্দিষ্ট কোন জায়গায় নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি না। কোথাও একটা পৌঁছে যাবই যাব।

বিপাশা বলল, তুমি খুব খেয়ালি আছ পর্ণা।

সুপর্ণা কোন জবাব দেবার আগেই আনন্দ গাড়ি নিয়ে হাজির হল।

ওরা দুজনে পেছনে বসল আর আনন্দ স্বল্পালোকিত রাস্তার ওপর দিয়ে বেশ স্পিডেই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চলল।

মিনিট কুড়ির ভিতরেই ওরা এসে পৌঁছল গঙ্গাতীরের একটা ফাঁকা চরের মতো জায়গায়। ওখানে যেতে হলে মেন রাস্তা থেকে পাকা রাস্তা ধরে কিছুটা যেতে হয়। আশ্রমের গেটের কাছে একটা স্বল্প পাওয়ারের বাল্ব দেওয়া আছে। ওতে দেখা যাচ্ছে আশ্রমের একটা সাইনবোর্ড। 'রাধামাধব কুঞ্জ'।

গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকল গাড়ি। চমৎকার খোয়া পেটানো একটা রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়ি আশ্রমের প্রাঙ্গণ পেরিয়ে এল। দ্বাদশীর চাঁদ ডুবে গেছে। গাড়ির ছড়িয়ে পড়া আলোর দু'ধারে যতটুকু দেখা গেল তাতে রঙন, শিউলি, টগর, গন্ধরাজ ফুলের গাছ থেকে আম, জাম, বকুল সব রকম বড় গাছ-গাছালি।

গাড়ি এসে দাঁড়াল একটি চমৎকার খড়ে ছাওয়া ঘরের সামনে। দূর থেকে গাড়ির আলোয় খড়ের চালটা দেখা যাচ্ছিল। এখন শুধু বাঁশের বেড়া দেওয়া মাটির দেওয়ালটা দেখা গেল।

গাড়ি থেকে নেমে বিপাশা বলল, এটি আমার আস্তানা, গুরু কৃষ্ণদাস বাবাজীর দান। ওদিকে অতিথিশালা, আর গঙ্গার একেবারে ধার ঘেঁষে পাঁচিলের গায়ে গোশালা। একটি দরিদ্র পরিবারের আশ্রয় ওখানে। স্বামী-স্ত্রী। ওরা গরুগুলোর দেখাশোনা আর আশ্রমের প্রায় সব রকম কাজ করে।

আনন্দ বলল, গাড়ির আলোয় যতটুকু দেখা যাচ্ছে, আশ্রমটি বেশ নির্জন আর সুন্দর করে সাজানো। কতগুলো পাকাবাড়ি ওঠেনি এই রক্ষে। অন্য একদিন আমরা বেলা থাকতে এসে তোমার আশ্রমকে দু'চোখ ভরে দেখে যাব।

সুপর্ণা বলল, বিপাশাদি, এইটুকুতেই আমার এত সুন্দর লাগছে যে তোমাকে ঈর্ষা করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

তাহলে নিশ্চয়ই আসবে, এই আশা নিয়ে থাকব।

নিশ্চয়ই।

ওরা গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে বাড়ির দিকে ফিরে চলল।

আশ্রমের প্রবেশ পথে তোরণ সাজানো হয়েছে। ফুল লতাপাতায় মনোরম তোরণ। তোরণের মাথায় হলুদ সাটিনের কাপড়ের ওপর ব্রাউন রঙে লেখা শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত একটি সংস্কৃত উক্তি।

'সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ।
ন হি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ।।'

যদিও আমার বহু মনোহারিণী লীলাই রয়েছে, তবু রাসলীলার মনোহারিত্বের কথা স্মৃতিতে উদিত হলেই আমার চিত্ত যে কিরূপ হয়ে ওঠে তা আমি প্রকাশ করতে পারি না।

রাসের দিন সকাল থেকে ভক্ত ও জনতার ভিড় রাধামাধব কুঞ্জে।

আশ্রমের প্রধান গৃহটি একটি বকুল গাছের তলায়। বিশাল বকুল বৃক্ষটি ঘিরে কালো রঙের বেদি। এইখানেই আসল রাসমঞ্চ। কিশোরী গোপিনীরা নৃত্যলীলার মণ্ডলী রচনা করে বকুল বেদিকার ওপরে তৈরি স্টেজে ঘুরে চলেছে। আসলে সারা স্টেজটিকে ঘোরানো হচ্ছে আড়াল থেকে। নীচে বসে কীর্তনিয়ার দল গান গাইছে। বৈষ্ণবীদের কণ্ঠে গানের মাতন লেগেছে। রাসলীলার গান। গান ধীরে শুরু হচ্ছে, ক্রমে লয় বাড়ছে, শেষে দ্রুতলয়ে মাতন। স্টেজটিকে গানের লয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীর থেকে দ্রুত ঘোরানো হচ্ছে। স্টেজের ওপরের মূর্তিগুলি মনে হচ্ছে গানের লয়ের সঙ্গে সমতা রেখে ঘুরে চলেছে। একটি গোপিনী এক কৃষ্ণ। এমনি শত গোপিনী শত কৃষ্ণ। এক গোপিনীর কণ্ঠ এক হাতে বেষ্টন করে আর এক হাতে গোপিনীর হাত ধরে আছেন কৃষ্ণ। ঠিক এমনি ভঙ্গিতে বাঁধা পড়েছে কৃষ্ণ-গোপিনীকুল। আবার এমনি বাহুবন্ধনে বদ্ধ হয়ে তারা নৃত্যলীলায় প্রমত্ত।

স্টেজের ঠিক ওপরে বকুল গাছে সংলগ্ন একটি অপূর্ব সিংহাসন। কাঠের ওপর ফুল পাতা দিয়ে মনোরম করে সাজানো। তারই ওপর বসে আছে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। আলিঙ্গনে আবদ্ধ। রাসেশ্বরী রাধা ছাড়া স্বয়ং কৃষ্ণও যে হতে পারেন না রাসেশ্বর। শ্রীকৃষ্ণ রাসবিহারী মাত্র। রাসের উৎসারিত পরম রসকদম্বের উৎস তো কৃষ্ণ কিংবা অন্য গোপিনীরা নয়। রাস রসের উৎস একমাত্র পরম রসকদম্বময়ী শ্রীরাধা। তাই শ্রীমতী ছাড়া রাস যে অসম্পূর্ণ।

আসরে বহু জনসমাবেশ। একদিকে মহিলারা বসেছেন, অন্যদিকে পুরুষ ভক্তের দল। সুপর্ণা আর আনন্দও ক'দিন ধরে নিজেদের যুক্ত করে রেখেছে আশ্রমের সঙ্গে। কাজকর্মের তদারকি করেছে বিপাশার সঙ্গে সমানে ঘুরে ঘুরে। আমেরিকা থেকে গুরু কৃষ্ণদাস বাবাজীর চিঠি এসেছে। উৎসব পালনের নির্দেশ-লিপি। সঙ্গে সঙ্গে উৎসব উদ্‌যাপনের জন্যে কিছু অর্থ পাঠানোর কথা লিখেছেন, কিন্তু সে অর্থ যথাকালে এসে পৌঁছয়নি। খবরটা পেয়েই আনন্দ সুপর্ণার সঙ্গে পরামর্শ করে তিন হাজার টাকা দিয়েছে বিপাশার হাতে। আরও দু'হাজার হাতে রেখেছে। দরিদ্রনারায়ণ সেবার পুরো খরচটাই দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে সুপর্ণা। বিপাশা বাধা দিতে গিয়েছিল, কিন্তু সুপর্ণা শোনেনি। সে বলেছে, রাধামাধবের সেবার অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করছ কেন বিপাশাদি। আমি কি নরনারায়ণের

সেবার যোগ্য নই। এরপর বিপাশা আর কিছু বলতে পারেনি। আজ আসরে মুখ্য গায়িকা বিপাশা। গানের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে লীলাকথা। বিপাশার গলায় কথকতাও সুর হয়ে বাজছে।

অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে আনন্দ। সুপর্ণা বিপাশার গানে বিভোর। সে নিজে গায়িকা, তাই যথার্থ গানের গলা সে চেনে। কীর্তনের প্রতিটি কথা ভাবের কোরকে বাঁধা। সুরের হাওয়া ঘুরে ঘুরে তাকে বারে বারে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে, আর অমনি এক একটি করে পাপড়ি খুলে খুলে আসছে কোরকের বাঁধন থেকে। শেষে সব ক'টি পাপড়িই খুলে গেল। অমনি মাতন লাগল হাওয়ায় আর ফুলে। লুট হতে লাগল সুবাস।

সুপর্ণার মনে হল, বিপাশাদি গানে ফুল ফোটাতে জানে।

পরদিন সাড়ম্বরে দরিদ্রনারায়ণ সেবা শেষ হল। প্রথমে বালভোজন, পরে সমবেত জনতার প্রসাদ গ্রহণ। এখানে ধনী দরিদ্র নির্বিচারে একই পংক্তিতে প্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা।

রাস উৎসবের সমাপ্তি ঘটল তিনদিন পরে। পনেরো দিনের আয়োজন সমাপ্ত হল তিনদিনে। প্রতিমা তৈরির কথা ধরলে প্রায় দু'মাস আগে থেকেই আয়োজন শুরু।

এখন আশ্রম নিঝুম। দোল উৎসবের আগে আর কোন বড় অনুষ্ঠান নেই। বিপাশা বসে বসে রাধামাধবের মূর্তি চন্দনে চর্চিত করে। আশ্রমের গাছ থেকে ফুল তুলে এনে মালা গাঁথে। ঠাকুরের সেবা করে, নিজের হাতে রান্না করে ভোগ। ঠাকুরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে প্রসাদ পায়। আশ্রমের গরুগুলি যারা তদারক করে তারাও কোন কোনদিন ভোগের অংশ পায়।

বিরাট আশ্রমের নিশ্চিন্ত শান্তির জীবন। মাঝে মাঝে ভক্তদের আগমন আর আশ্রম সেবায় সাধ্যমত দান। এতেই দিনগুলো চলে যাচ্ছে নির্ভাবনায়।

কিন্তু তবুও কোথায় যেন শূন্যতা হাহাকার করে ওঠে। ভক্তদের সামনে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলা বিলাসের গান করতে গিয়ে দু চোখ ভেসে যায় চোখের জলে। ভক্তরা ভাবে, বিশাখা সখির এ হল মহাভাব। কিন্তু ভক্তরা চলে গেলে বিপাশা শয্যায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে। তার যৌবন-বাসনা পীড়িত হয়। কোথায় তার সেই প্রেমিক যার জন্যে সে সাজবে অভিসারিকা। শ্রীমতী রাধার মতো সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে সে যাবে অভিসারে। দূর দুর্গম পথ, লোক-লজ্জার ভয়, অন্ধকার বর্ষাধারা প্লাবিত রাত্রি, সবকিছুকে সে পার হয়ে যাবে, শুধু তার প্রেমিক পুরুষের চিন্তা করতে করতে।

আজ ক'দিন বড় চিন্তিত হয়ে আছে সে। টাকা এসেছে আমেরিকার আশ্রম থেকে। টাকাটা ব্যাঙ্ক থেকে তুলেও এনেছে সে, কিন্তু আশ্রমে আসবে বলে কই আসছে না কেন আনন্দ। রাস উৎসবের প্রায় সব অর্থ জুগিয়েছে আনন্দ আর সুপর্ণা। তাদের পরিশোধ করতে হবে সে টাকা। আনন্দ ঋণ শোধের কথা উত্থাপন না করলেও সে তো ঋণের কথা ভুলে যেতে পারে না।

এদিকে হয়েছে অন্য এক বিপত্তি। আনন্দদের সঙ্গে সংযোগের ফলে তার সমস্ত চিত্ত আনন্দময় হয়ে আছে সারাক্ষণ। দু-চার দিনের অদর্শন তার মনকে চঞ্চল করে তুলছে। ভক্তদের সামনে রাধামাধবের লীলা রসকথা ব্যাখ্যা করতে গেলেই নিজে রাধা ভাবে ভাবিত হয়ে পড়ে। তখন তার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় আনন্দ। সে আনন্দরূপী মাধবের কাছে তখন গানে গানে রাধা হৃদয়ের আকুতি ব্যক্ত করতে থাকে।

সেদিন বেলাশেষের রোদটুকু এসে পড়েছে আশ্রমের মাধবী বিতানে। বিপাশা বেশ পরিবর্তন করে, চন্দনচিত্র ললাটে এঁকে ঘুরে ফিরছে আনমনে। বাসক-সজ্জার একটা গান গুনগুনিয়ে উঠছে তার গলায়। হঠাৎ পিছনে পায়ের সাড়া পেয়ে ফিরে তাকাল সে। এ কি! কখন এলে তুমি আনন্দ? কই গাড়ির সাড়া পাইনি তো? পর্ণা কোথায়? গাড়ি কি রাস্তায় রেখে এলে নাকি?

আনন্দ বলল, সে আসেনি, আর গাড়িও আসেনি।

সে কি! পর্ণা রাগ করল নাকি।

আনন্দ বলল, রাগের কারণ?

বিপাশা বলল, খুব বড় রকমের কারণই যে একটা থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই। শ্রীকৃষ্ণজায়া রুক্মিনীর ছিল ক্ষণে ক্ষণে অভিমান।

আনন্দ বলল, রুক্মিনী পিতৃগৃহে গমন করেছেন, সেই অবসরে রাধামাধব কুঞ্জে এ অভাজন সময় কাটাতে এসে গেল।

বেশ করেছ, কিন্তু গাড়ি? বসুমল্লিক বাড়ির ছেলে বাসে চেপে অথবা পায়ে হেঁটে এসেছে, একথা ভাবতেই যেন কেমন লাগছে।

আনন্দ বলল, রাধার কুঞ্জে কৃষ্ণ কি কোনদিন তার ঐশ্বর্য-রূপ রাজবেশ নিয়ে এসেছে বিপাশা? তুমি তো বাংলার ছাত্রী ছিলে, বলই না?

বিপাশা নিজের আনন্দকে যেন ধরে রাখতে পারছিল না। সে নিজের মনের ভাবটুকু গোপন করতে আনন্দকে দাঁড়াতে বলে ঢুকল গিয়ে পুজোর ঘরে।

খুশিতে গড়িয়ে পড়া চোখের জলে অর্চনা করল প্রেমের দেবতা মাধবের। নিজেকে শান্ত করে একসময় বেরিয়ে এল বাইরে।

আনন্দ তখন মাধবীবিতানের বাঁধানো বেদীতে বসে চেয়ে আছে সামনে পলাশ গাছটির দিকে। একটি মধুমালতীলতা অজস্র সাদা লাল ফুল ফুটিয়ে ঐ গাছটাকে পাকে পাকে বেষ্টন করে উঠে গেছে।

বিপাশা বলল, কি দেখছ? পলাশের ফুল নেই এখন, তাই মধুমালতী ওকে জড়িয়ে উৎসব শুরু করে দিয়েছে!

ঠিক তাই। বউ গেছে বাপের বাড়ি, রিক্ত মনকে ভরে দিতে মধুমালতী এসে দাঁড়িয়েছে সামনে।

বিপাশা বলল, মুখে তোমার কি কোন বাঁধন থাকবে না আনন্দ। আগে তো কোনদিন তুমি এমন ছিলে না।

আনন্দ বলল, বিয়ের পর জ্ঞানী হয়েছি। আগে অনেক কিছুই জানতাম না, এখন নারীসাহচর্যে এসে বহু কিছু জেনে ফেলেছি।

বিপাশা আর ওদিক দিয়ে গেল না। বলল, তোমার আজকে গাড়িটা আনলে বড় দরকার ছিল।

কেন, গাড়িতে করে বেড়াতে যেতে নাকি?

বিপাশা বলল, না। ক'দিন ধরে তোমার টাকাটা আগলে আমি বসে আছি। আজ সঙ্গে গাড়ি থাকলে নিয়ে যেতে পারতে। বাসে চলার অভ্যেস যাদের নেই তারা নিজেদের সামলাবে না টাকা সামলাবে।

আনন্দ বলল, কিসের টাকা? আমি তো মহাজনী কারবার করি না।

তোমার অনেক টাকা থাকতে পারে তা বলে আমাকে ঋণী করে রাখার অধিকার তোমার নেই।

আনন্দ বলল, উৎসবের টাকার কথা বলছ—ওটা যদি বলি রাধামাধবের কাছে আমাদের প্রণামী?

বিপাশা বলল, ভালবাসাবাসির সঙ্গে অর্থকে জড়িও না আনন্দ। এখন আমার হাতে টাকা এসেছে, তুমি নিয়ে যাও, যদি অভাবে পড়ি কোনদিন তখন তো হাত পাততেই হবে।

আনন্দ উত্তেজিত গলায় বলল, জসিডিতে তুমি না কথা দিয়েছিলে, দরকার হলে আমার কাছ থেকে নেবে, কিন্তু কই, প্রতিজ্ঞা রাখতে তো পারলে না?

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বিপাশা বলল, পরে ভেবেছিলাম, ভালবাসার জনের কাছ থেকে ভিক্ষে নিতে নেই।

আনন্দ বলল, তোমার ফিলজফির সঙ্গে আমার ফিলজফি মিলবে না বিপাশা। মিথ্যে তর্ক করে কি লাভ। একটু থামল আনন্দ, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আচ্ছা দাও টাকাগুলো, রাত্তির হয়ে যাবার আগে বাড়ি পালাই।

বিপাশা বলল, তুমি টাকা নেবার জন্যে এসেছিলে আনন্দ যে আসতে না আসতেই যাই যাই করছ। আর তাছাড়া এই সন্ধেবেলা তোমার হাতে টাকাগুলো তুলে দিয়ে সারারাত আমি ভাবনায় মরি আর কি।

আনন্দ আবার বেদীর ওপর বসল। তারপর হেসে বলল, টাকা তুমি দেবেই অথচ চাইলেও পাওয়া যাবে না, এর সমাধান তো আমার মাথায় আসছে না।

বিপাশা বলল, বসে বসে ধাঁধার উত্তর ভাব, আমি চায়ের জল চড়াইগে।

চায়ের জন্যেই কি আমি বাস ঠেঙিয়ে এতটা পথ ছুটে এলাম?

বিপাশা বলল, আরে আমার জন্যেও তো চা বসাতে হবে। হেমন্তের শিরশিরে হিমেল সন্ধ্যায় একটু চা খেতেও দেবে না। তাছাড়া চা খেতে খেতে গল্প জমেও ভাল। এস এস, এখান থেকে উঠে আমার ঘরের ভেতর চল।

আনন্দ বলল, বেশ লাগছে জায়গাটা, সন্ধ্যার অন্ধকার একেবারে মুছে যাবার আগে আমাকে একটু ভাল করে দেখে নিতে দাও।

বিপাশা পায়ে পায়ে চলে গেল মাধবীবিতান ছেড়ে। আনন্দ কিন্তু মধুমালতী লতার ওপর তার চোখের দৃষ্টি ফেলে রাখল না, সে বিপাশার ছন্দিত দেহের শ্রীটুকু উপভোগ করতে লাগল।

বিপাশা চোখের সামনে থেকে মুছে গেলে নিজেকে প্রশ্ন করল আনন্দ, কেন তুমি এই সন্ধ্যায় এমন একটা নির্জন জায়গায় চলে এলে আনন্দ? সুপর্ণা বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এলে তাকে সঙ্গে নিয়েই তো আসতে পারতে? ক'দিন তো তাই এসেছিলে। কিন্তু কি হল তোমার, সুপর্ণা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বিপাশা তোমার সমস্ত অন্তরকে অধিকার করে বসল, গাড়িখানাও আনলে না সঙ্গে। পাছে পথের কৌতূহলী লোক জানতে পারে যে এক বাবুমশাই ঢুকেছে রাধামাধব কুঞ্জে। এত সন্তর্পণে কাকে একান্তে পাবার জন্যে তোমার আসা আনন্দ?

কতক্ষণ এমনি নিজের মনকে নিয়ে খেলা করল আনন্দ। এক সময় সবকিছু অন্ধকারে ঢেকে গেল।

বিপাশার আবছায়া মূর্তি কাছে এসে দাঁড়াতেই আনন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এরই ভেতর অন্ধকার খুব তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে উঠল।

বিপাশা বলল, অন্ধকার ঠিক তার নিয়মেই ঘনিয়েছে আনন্দ, আমার হাত ধর।

আনন্দ বিপাশার হাত ধরে তাকে অনুসরণ করে চলতে চলতে বলল, তুমি একটা আলো আনতে পারতে বিপাশা।

তাহলেই ষোলকলা পূর্ণ হত। পথের লোক দূর থেকে দুটি মূর্তিকে একসঙ্গে চলতে দেখে ভাবত, আশ্রমে নাগর-নাগরী লীলা শুরু হয়েছে।

আনন্দ বলল, ভয় বলে তোমার কিছু ছিল একথা জানতাম না তো বিপাশা।

একদিন ছিল না বলে যে কোনদিন থাকবে না সে কথা কি কেউ বলতে পারে। আর তাছাড়া হরি মধু রাম শ্যামকে তো আর আমি নিয়ে যাচ্ছি না, সঙ্গে আমার হীরের আংটিওয়ালাবাবু। বাইরের ছোঁড়াগুলো এ দৃশ্য দেখলে একদিনেই বারোটা বাজিয়ে দেবে আশ্রমের।

আনন্দ বলল, আমি বড় ভুল করে সন্ধ্যেবেলা এসে পড়েছি বিপাশা।

বিপাশা আনন্দের হাতে আস্তে একটা চাপ দিয়ে বলল, সকালেই আস আর সন্ধ্যেতেই আস, তোমাকে আমি লুকবো কোথায়? কোহিনূর হীরে দিনেও ঝলকাবে, রাতেও জ্বলবে।

ওরা কথা বলতে বলতে এসে পৌঁছল অতিথিশালার প্রাঙ্গণে। ভেতরে আলো জ্বলছিল। তার ক্ষীণ একটা আভাস আমাজা পেতলের মতো পড়েছিল উঠোনে। ঐ ক্ষীণ আলোয় ওরা প্রাঙ্গণ পেরিয়ে অতিথিশালায় ঢুকে এল।

অতিথিশালায় উঁচু সিমেন্টের মেঝে। বড় একখানা হলঘর জুড়ে সতরঞ্চ পাতা। উৎসবে দূরের অতিথি সমাগম হলে ঐ সতরঞ্চের ওপর যে যার সঙ্গে বয়ে আনা হালকা বিছানা পেতে শোয়। বিশিষ্ট দু চারজন অতিথির জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে। হলঘর পেরিয়ে গেলেই দু'পাশে গঙ্গামুখী দু'খানা ঘর। তক্তপোষের ওপর আশ্রমের ধবধবে সাদা বিছানা পাতা। প্রতি ঘরেই এমনি দুটি করে শয্যা। অতিথিশালার পাশেই যশোদা ভবন। সেখানে উৎসবে আগত মহিলাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

বিপাশা আনন্দকে অতিথিশালার ভেতরের একটি ঘরে নিয়ে এসে বিছানার ওপর বসতে বলে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

ঘরে টিম টিম করে একটা হেরিকেন জ্বলছে। হেরিকেনটা পরিষ্কার বিদ্যুতের আলোয় অভ্যস্ত চোখে বড় ম্লান মনে হচ্ছে। ঘরের দেওয়ালে সংলগ্ন রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলনের একটি ছবি। আলোছায়ার রহস্যে লীলারত।

সামনের জানালা খোলা। সংলগ্ন চরের জায়গাটা আশ্রমের। কিছু কিছু ফুলের গাছ আছে। তারপরেই মাটির ওপর পলির স্তর। গঙ্গায় জোয়ার এলে ঐ পলির ওপর খানিক সময় জল খেলা করে যায়।

এখন ওসব কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে আনন্দ। গঙ্গার ওপারে আলোর মালায় সাজানো মহানগরীর উপকণ্ঠ। লাল নীল হলুদে যেন মেশামেশি। এ আলোকসজ্জা তাদের বসুমল্লিক ভিলা থেকেও দেখা যায়। অবসর মুহূর্তে সে জানালার গরাদ ধরে এ দৃশ্য দেখে।

বিপাশা আর একটা হেরিকেন ঘরের বাইরে রেখে ভেতরে ঢুকল। খাটের ওপর একটা ট্রে বসাল। দু'কাপ চা আর এক প্লেট চিঁড়ে। চিঁড়েগুলো ঘিয়ে ছেঁকে নেওয়া হয়েছে। বাদাম মেশানো হয়েছে তাতে।

নিচের হেরিকেনটা উস্কে দিয়ে বিপাশা আলোটা জোর করে নিল। তারপর খাটের এক কোণায় বসে বলল, নাও একটুখানি চা খাও। গরিব আশ্রম-বাসিনীর দীন আয়োজন বলে যেন দূরে সরিয়ে দিও না।

আনন্দ বলল, তুমি যে হারে বিনয় শুরু করলে তাতে তুমি ধীরে ধীরে যথার্থ বৈষ্ণব হচ্ছ বলেই মনে হচ্ছে।

এখনও কি তাতে সন্দেহ আছে নাকি?

আনন্দ বলল, সত্যি কথা বলি, এ তোমার জীবন নয় বিপাশা।

তাহলে ভেসে চলাই আমার জীবন, তাই না আনন্দ? খড়কুটোর মতো তোমাদের ঘাটে ঘাটে লাগব আর তোমরা আবর্জনা ভেবে দূরে ঠেলে সরিয়ে দেবে, এর চেয়ে বেশি কি হতে পারে।

আনন্দ বলল, তুমি কি আমাকে চা-টুকুও খেতে দেবে না? তার চেয়ে সোজাসুজি বল, চলে যাও আনন্দ।

তুমি আজ আমার একমাত্র অতিথি আনন্দ, আমার প্রিয় কৃষ্ণনারায়ণ। তোমাকে চলে যেতে বলব, এমন জোর আমার কই!

আনন্দ সহজ হল। কথার মোড় একেবারে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, তোমার এই জলযোগের ব্যবস্থাটা বেশ মুখরোচক হয়েছে বিপাশা। চিঁড়ের সঙ্গে কাজুবাদাম ভাজা, বেশ উপাদেয়।

বিপাশা মুচকি হেসে বলল, কথা ঘোরাতে তুমি ওস্তাদ। আচ্ছা আনন্দ, সত্যি করে একটা কথা বলবে? তুমি আমাকে ভালবাস?

সোজাসুজি কথাটা যখন জিজ্ঞেস করে বসলে তখন সোজাসুজিই উত্তরটা দিই। আমি তোমাকে ভালবাসি কিনা জানি না, তবে আজকাল আমার অবসরের ভাবনাগুলো বার বার তোমাকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে।

বিপাশা বলল, এতে আমি একটুও খুশি হতে পারছি না আনন্দ। সুপর্ণার ওপর তুমি অবিচার করছ।

আনন্দ বলল, বিশ্বাস কর বিপাশা, সুপর্ণাকে আমি ভালবাসি। তবে মন থেকে তোমাকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছি না।

আচ্ছা আনন্দ, কলেজ জীবনে সেই যে আমাকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গেলে, আর যাবার সময় বললে, কথা আছে, আজও কিন্তু জানা হল না, কি সে কথা—

সে কথা শুনে আর কি হবে আজ।

তবু শুনতে ইচ্ছে করে আনন্দ।

তুমি আমার জীবনে আসবে কিনা সেদিন সেই কথাই জানতে চেয়েছিলাম।

ওদের চা পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল। বিপাশা হঠাৎ কথার মাঝখানেই ট্রেটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। উদ্যত একটা দীর্ঘশ্বাস আর উদ্‌গত দু'ফোটা চোখের জল চেপে সে সরে গেল আনন্দের চোখের সামনে থেকে।

বেশ কিছু সময় নিভৃতে ফুলে ফুলে কাঁদল বিপাশা। একটা সুখী সংসার সে চেয়েছিল। চাঁপা ফুলের মতো দু-একটি শিশু তার কোলের ওপর ঝরে পড়বে। তার মুখে নরম কচি মুখ দিয়ে মায়ের আদর কেড়ে নেবে। সন্ধ্যায় সুন্দর করে সেজে সে প্রতীক্ষা করবে তার আপন মানুষটির পথ চেয়ে। তারপর রাতের বিছানায় দুটি বলিষ্ঠ বাহুর বাঁধনে ভীরু পাখিটি হয়ে যাওয়া, আর আশ্চর্য এক উত্তাপে নিজেকে গলিয়ে ঝরিয়ে দেওয়া, এর বেশি সে কিছু চায়নি।

কিন্তু কেন এমন হল। সব সম্ভাবনা থেকেও সব হারানোর রিক্ততা বুকে নিয়ে তাকে আজ এমন করে দিন কাটাতে হচ্ছে কেন?

কে!

পেছন থেকে নিঃশব্দে কখন এসে দাঁড়িয়েছে আনন্দ।

আমি চলে যাচ্ছি বিপাশা। তোমার মনকে অশান্ত করে দিয়ে গেলে আমার মনেও তো ঝড় থামবে না।

ঘুরে দাঁড়িয়েছে বিপাশা। আঁচল দিয়ে নিজের চোখ দুটো মুছে নিয়ে ম্লান হেসে বলল, তোমার কাছে হেরে গেলাম আনন্দ। আশ্রমে এসেও আমি আমার দুর্বলতাটুকু কাটিয়ে উঠতে পারলাম না।

আনন্দ বলল, একে তুমি দুর্বলতা বলছ কেন বিপাশা, এ তো জীবনের ধর্ম। কাউকে ভালবাসা পাপ বলে আমি মনে করি না। বরং মনের ভেতর ভালাবাসার আগুন জ্বালিয়ে রেখে বাইরের সমাজের ভয়ে দরজা জানালা সব বন্ধ করে দিলাম, এতেই মনটা দূষিত হয়ে ওঠে।

বিপাশা ঐ স্বল্পান্ধকারে আনন্দের হাত দুটো ধরে নাড়া দিয়ে বলল, খুব সাহস হয়েছে তোমার দেখছি, এখন চল যাই বসার ঘরে।

রাত গভীর হয়েছে। দূরে আশ্রমের শেষ প্রান্তে একমাত্র আশ্রম-সেবকের ঘরের বাতিটি নিভে গেছে। অতিথিশালার অন্ধকার নির্জনে আনন্দের বুকের ভেতর মুখ লুকিয়ে কেঁদে চলেছে বিপাশা।

তুমি কেন, কেন এলে আনন্দ? আমি কেন আমার সর্বস্ব তোমাকে সঁপে দিলাম। এ আগুন একবার জ্বললে তাকে তো আর নেভানো যাবে না। এ আগুনে দেহ, মন, আত্মা, সংসার, সমাজ, সবকিছু নিঃশেষে পুড়ে যাবে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বিপাশা আনন্দের হাত ধরে টেনে তুলল। পাগলের মত বলতে লাগল, পালাও, পালাও আনন্দ এখান থেকে। আমার নিশ্বাসে বিষ। আর কোনদিন এমুখো হোয়ো না। মনে কর, বিপাশা বলে তোমার জীবনে কোনদিন কোন মেয়ে ছিল না, নেই, থাকবেও না।

পায়ের কাছে নত হয়ে বসে পড়ে দুটো পা জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল বিপাশা, আমি পাপ করেছি, আনন্দ, মহাপাপ। সুপর্ণার মতো মেয়েকে প্রতারণা করেছি। যতদিন এ জীবন থাকবে ততদিন অনুশোচনায় তিল তিল করে দগ্ধ হতে হবে আমাকে। একটি নিষ্পাপ হৃদয়কে বঞ্চনার পাপ আমাকে মুক্তি দেবে না আনন্দ।

আনন্দ কোন কথা বলল না। অনিবার্য এক উত্তেজনার ঝড় বয়ে যাবার পর সে দেহে মনে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার আগে শুধু বলল, আমাকে ক্ষমা কর বিপাশা। আজ পথের লোভী মানুষগুলোর সঙ্গে আমার আর কোন পার্থক্য রইল না।

আশ্রম থেকে বেরিয়ে গেল আনন্দ। মলিন আকাশের ম্লান জ্যোৎস্নার মতো সারারাত অতিথিশালার কণ্টকিত স্মৃতির বিছানায় লুটিয়ে পড়ে রইল বিপাশা।

আনন্দ ঘরে ফিরে এল। ওপরের প্রতিটা সিঁড়ি পার হতে হতে তার মনে হচ্ছিল সে যেন দুর্গম কোন খাড়া পাহাড়ের চড়াই ভেঙে উঠছে।

দরজার কাছাকাছি এসে সে চমকে উঠল। তার মনে হল, কে যেন আধখোলা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আনন্দ থমকে দাঁড়াল। সুপর্ণা যেন তাকে স্থির চোখ মেলে দেখছে। ভর্ৎসনার অনুচ্চারিত প্রবাহ যেন তার চোখে।

হাওয়ায় দরজাটা খুলে গেল। আলো জ্বলছে ঘরে। মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকল আনন্দ। কেউ কোথাও নেই। টুং টাং শব্দ করে উঠল ঝড়ের বেলোয়ারি কাঁচগুলো। আনন্দ চেয়ে দেখল সেদিকে। আজ যেন তার পরিচিত আলো, শব্দ, ঘরের আসবাবপত্র, সবকিছু অপরিচিত বলে মনে হচ্ছে। সে যেন এ বাড়ির কেউ নয়। একজন ভ্রষ্টাচারী অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথি।

আলনায় সুপর্ণার ভাঙা শাড়িগুলো থরে থরে সাজানো। ব্লু রঙের শাড়ি আর ব্লাউজখানা শেষ ছেড়ে রেখে গেছে সে। ঐ শাড়ি ব্লাউজে আশ্চর্য ময়ূরের মতো মনে হয় সুপর্ণাকে। যাবার সময় শাড়িখানা বাক্সে নিয়ে যেতে চেয়েছিল সুপর্ণা। আনন্দ বলেছিল, এ পোশাকে শুধু তুমি আমার কাছে সেজে এসে দাঁড়াবে। কেবল আমার সঙ্গে বাইরে যাবার সময় তুমি ইচ্ছে হলে পরতে পার এ পোশাক।

সুপর্ণা বুকে আনন্দ আর মুকে কপট ক্রোধ নিয়ে বলেছিল, সবতাতেই তোমার জেদ। আচ্ছা, তুমি এমন হিংসুক কেন বল তো। আমি কেবল তোমার নয়নের মনি হয়ে থাকব, আমার অ্যাডমায়ারার আর কেউ থাকবে না?

আনন্দ বলেছিল, না, আমি ছাড়া তোমার ঐ অসামান্য রূপের আর কোন অ্যাডমায়ারার থাকবে না।

বেশ, তাহলে মনে রেখ, কথাটা উভয়ত।

আজ শাড়িখানার দিকে তাকিয়ে মনে হল আনন্দের, আলনাতে সেই ব্লু রঙের শাড়ি ব্লাউজ নেই। সে দ্রুত চোখ ফেরাল ড্রেসিং মীরারের দিকে।

দাঁড়িয়ে আছে সুপর্ণা। তার সাজসজ্জা, প্রসাধন সব কিছু শেষ। মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। শাড়িটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে পাকে পাকে জড়িয়েছে শরীর।

চেয়ে আছে সুপর্ণা তীক্ষ্ণ চোখে। তার ঠোঁট ময়ূরের ঠোঁট হয়ে গেছে। সামনে একখানা পা আর পিছনে একখানা পা। সারা শরীরটা ঝুঁকিয়ে দেখছে।

হঠাৎ আনন্দ এঁকেবেঁকে সাপের মতো পালাতে গিয়ে দেয়ালে ধাক্কা খেল।

সাময়িক একটা অচেতনতা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেললেও ধীরে ধীরে তার ঘোর কেটে এলে সে দেখল, ঘরের কোণে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে আছে সে। দেয়াল ঘড়িটা বারান্দায় টকটক করছে, ঘরের আলোটা গঙ্গার হাওয়ায় দুলছে। উঠে বসে টিপয়ের ওপর রাখা ফোনটাকে তুলে নিল সে। ডায়েল করল কাঁপা কাঁপা আঙুল চালিয়ে। টাইমপিসের দিকে চেয়ে দেখল, রাত্রি দুটো।

ওপার থেকে ঘুম জড়ানো চোখে ফোন ধরল সুপর্ণা, হ্যালো।

আনন্দ এ প্রান্ত থেকে বলল, আমি সুপর্ণা।

এ রকম ভাঙা ভাঙা গলায় কথা বলছ কেন তুমি! আমি একটুও বুঝতে পারিনি প্রথমে। কিন্তু তুমি এত রাতে!

আমার ঘুম আসছে না সুপর্ণা, সমস্ত শরীর কেমন অস্থির হয়ে আছে।

গায়ে কোন তাপ-টাপ নেই তো?

না, তবু ঘুমুতে পারছি না। হয় তুমি এস নয়তো আমি যাব তোমার কাছে।

ছিঃ এত রাতে পাগলামি করে না লক্ষ্মীটি। আমার যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, আর তুমি এত রাতে এ বাড়ি এলে আমি লজ্জায় মরে যাব। শোন, তুমি আমার বালিশটাতে আজ মাথা রেখে শোও, আমার কথা ভাবতে থাক। আমিও যতক্ষণ না ঘুম আসে তোমার কথা এক মনে ভাবব। দেখো দুজনের

একই সঙ্গে ঘুম এসে যাবে। ভোরবেলা দেখবে অলরাইট। শরীর মন ঝরঝরে। রাখছি এবার, কেমন?

আনন্দ ফোন ছেড়ে দিয়ে বিছানায় উঠে এল। সুপর্ণার বালিশে মাথা রেখে পাশবালিশখানা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল। সে ভাবতে লাগল বিয়ের দিনের কথা। সপ্তপদী অনুষ্ঠানের কথা। এই নারী তার চিরজীবনের সঙ্গিনী হবে। তার সংসারকে ধনশ্রীতে পূর্ণ করবে। তার জন্যে নিয়ে আসবে বংশরক্ষাকারী সন্তান। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুম এসে গেল আনন্দের চোখে।

চার পাঁচ মাস কেটে গেছে। এবার দোল উৎসব বন্ধ রাখা হয়েছে রাধামাধব কুঞ্জে। পরিচালিকা বিশাখা সখি অসুস্থ। চিঠি পাঠিয়ে ভক্ত সমাগমও বন্ধ করা হয়েছে। চিঠিতেই কেবল চলেছে ভক্তদের সঙ্গে কুশল আদান প্রদান।

অনেক দিন আনন্দকে অনুরোধ করেছে সুপর্ণা, চল, একবার রাধামাধব কুঞ্জে বিপাশাদিকে দেখে আসি। রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পুরোহিত মশায় তার অসুখের কথা বলেছিলেন।

কথাটা গায়ে মাখেনি আনন্দ। নানা কাজের অজুহাতে উড়িয়ে দিয়েছিল।

সেদিন দুপুরবেলায় খাওয়া হয়েছে। আনন্দ শোবার ঘরে ঢুকে কৌটো থেকে মুখশুদ্ধি বের করে চিবুতে চিবুতে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে। গঙ্গা থেকে মধ্য বসন্তের হাওয়া বয়ে আসছে ঘরের ভেতর। বিছানায় মসলন্দ পাতা। ফাল্গুন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ির দ্বিপ্রাহরিক শয্যায় অতি মিহি কাঠিতে বোনা নানা ধরনের ডিজাইন তোলা মসলন্দ মাদুর ব্যবহার করা হয়।

আনন্দ অন্যমনস্কভাবে দেওয়ালের দিকে চেয়েছিল, হঠাৎ তার চোখ দুটো আটকে গেল বিয়ের একখানা ছবিতে। সে সুপর্ণাকে পিছন থেকে বেষ্টন করে ধরে যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিচ্ছে।

ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গে আর একখানা ছবি ফুটে উঠল তার চোখের ওপর। বিপাশা নটী বিনোদিনী যাত্রা দেখতে এসে সে রাতে একা ঘরে তাকিয়ে ছিল ঐ ছবিখানার দিকে। কান্নায় ফুলে ফুলে উঠেছিল তার সারা শরীর। পেছন থেকে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিল আনন্দ।

সেদিন কেন কাঁদছিল বিপাশা? নিশ্চয়ই তার মনে হয়েছিল এমনি এক বিবাহবাসরে আনন্দের সঙ্গে হয়তো সে যুক্ত হতে পারত। কিন্তু নির্মম ভাগ্য তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

এই মুহূর্তে বিপাশার জন্যে আনন্দের মনটা হু হু করে উঠল। সেই কবে এক রাতের অন্ধকারে বিপাশা নামের একটি মেয়েকে সে পেয়েছিল তার দেহের মধ্যে। তারপর বিপাশাই তাকে মানা করেছিল আশ্রমে যেতে, কারণ সুপর্ণার মতো স্ত্রী যার ঘরে, সে সংসার সে ভেঙে দেবে কেমন করে। এত পাপ মা জাহ্নবীও যে ধুয়ে মুছে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

আজ কিন্তু দেয়াল সংলগ্ন ছবি ও বিপাশার এক রাতের কান্না যেন একাকার হয়ে গেল। হঠাৎ ভেঙে ভেসে গেল আনন্দের সংযমের বাঁধ। এই মুহূর্তে তার মনে হল, অসুস্থ বিপাশাকে দেখতে সে আশ্রমের ভেতর ঢুকবে। শুধু চোখের দেখা দেখে চলে আসবে সে।

ঘরে এসে ঢুকল সুপর্ণা। কখন উত্তেজনায় বিছানার ওপর উঠে বসেছিল আনন্দ। সুপর্ণা পাশে এসে বলল। আনন্দের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি একটু গড়িয়ে নিলে না? আবার কখন বেরিয়ে যাও তার তো ঠিক নেই।

আনন্দ একটু হাসল। হেসে বলল, তুমি চেয়েছিলে আমি কাজের ভেতর জড়িয়ে থাকি, তাই আজকাল তোমার কথামত কাজের মানুষ হয়ে উঠছি আমি। তালুক-মুলুক বিক্রি ব্যবস্থায় মেতে আছি।

সুপর্ণা আনন্দের একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে বলল, সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরে ঘুরে আজকাল তোমার রঙটা অনেকখানি ম্লান হয়ে গেছে।

আনন্দ বলল, মেয়েরা হবে সোনা, আর পুরুষ হবে লোহা, তবেই তো মানাবে।

সুপর্ণা আনন্দের হাতে চুমু দিয়ে বলল, সোনা ছিলে আগে, এখন তামাটে হয়েছ। লোহার মতো রঙ হলে তোমার গেছি আর কি।

সে কি! তখন তো সবাই তোমার স্বামীকে লৌহ-মানব বলবে।

হঠাৎ সুপর্ণার একটা কথা মনে পড়ে গেল। সে আনন্দের হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, দারুণ একটা ঘটনা ঘটেছে। তোমাকে বলাই হয়নি এতক্ষণ।

কি ঘটনা সুপর্ণা?

সুপর্ণা বলল, তোমাকে বারবার আমি রাধামাধব কুঞ্জে যাবার জন্যে বলেছি, এখন আর আমাদের কোনদিন ওখানে যেতে হবে না।

প্রায় আর্তনাদ করে উঠল আনন্দ, কি হয়েছে বিপাশার? সে কি নেই?

সুপর্ণা বলল, এমন চেঁচিয়ে উঠলে যে? ব্যাপারটা আসলে তা নয়। আমাদের বুড়ো পুরোহিত মশায় রাধামাধব কুঞ্জে মাঝে মাঝে যাতায়াত করেন। তাঁর কাছেই শুনেছিলাম বিপাশাদির অসুখের খবর। তখন মনটা চঞ্চলও হয়ে উঠেছিল। তোমাকে যাবার জন্যে তাগাদাও দিয়েছি। কিন্তু আজ পুরোহিতমশায় এসে আমাকে বললেন, কুঞ্জে আর গিয়ে কাজ নেই মামনি।

কেন?

সুপর্ণা বলল, পুরোহিতমশায়ই একমাত্র খবরটা জানেন। তিনি আমাকে কথাটা কোথাও প্রকাশ করতে বারণ করেছেন। কিন্তু তোমাকে না বলেও তো পারব না। সুপর্ণা এবার গলার স্বর ছোট করে আনন্দের কানের কাছে প্রায় মুখ এনে বলল, বিপাশাদি গর্ভবতী। প্রায় পাঁচমাস হতে চলল।

ভয়ে বিস্ময়ে ভেঙে পড়ল আনন্দ, কি বলল!

সুপর্ণা বলল, পুরোহিত মশায়কে খুব ভক্তি করে বিপাশাদি, তাই তাঁর কাছে কেঁদেকেটে সব কথা খুলে বলেছে।

শঙ্কিত গলায় প্রশ্ন করে আনন্দ, কি বলেছে বিপাশা?

বললাম তো তার পদস্খলনের কথা।

পুরোহিতমশায় আর কিছু বলেননি?

সব কথাই নাকি বিপাশাদি তাঁকে বলেছে, শুধু জানায়নি কে সেই লোকটা।

এই মুহূর্তে একটা ঘূর্ণির তোড়ে পড়ে যাওয়া নৌকা যেন ভরাডুবির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। আনন্দ একটা উদ্‌গত শ্বাস বুকে চেপে নিল অতি কষ্টে।

সুপর্ণা মন্তব্য করে বলল, জান, আমার মনে হয় ওর রক্তের ভেতর ব্যভিচারের একটা দোষ আছে।

প্রায় অন্যমনস্ক আনন্দ শুধু বলল, নির্জন আশ্রম পেয়ে কোন স্কাউন্ড্রেল নিশ্চয়ই এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

সুপর্ণা বলল, মেয়ের সম্মতি না থাকলে কেউ পারে এ কাজ করতে?

উত্তেজিত হয়ে উঠল আনন্দ, বুঝছ না কেন, একটা অরক্ষিত আশ্রমে যদি ঢুকে পড়ে একটা লম্পট, তাহলে একটা অসহায় মেয়ে কতক্ষণ যুঝবে তার সঙ্গে।

সুপর্ণা বলল, যোঝাযুঝির প্রশ্ন নয়, আমি বিপাশাদির স্বভাবের কথা বলছি।

আনন্দ বলল, আমি যদ্দুর জানি, বিপাশা ইদানিং অনেক সংযত হয়ে গিয়েছিল। তার স্বভাবের প্রশংসা তুমিও তো করেছ।

কি জানি বাবা, কার মতি যে কখন কি হয়।

আনন্দ হঠাৎ বলল, সত্যিই তাই। একেবারে পাশের মানুষটিকে পর্যন্ত আমরা কতটুকু চিনতে পারি।

এখন রাত গভীর। আনন্দ বেলা চারটের সময় বেরিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে। বলে এসেছে, বেগমপুরের বাগানবাড়িখানা দেখতে আসবে খদ্দের। যদি পছন্দ হয় তাহলে বায়নাও করে যেতে পারে। কাজের ব্যাপার, ফিরতে রাত হতে পারে। আবার নাও ফিরতে পারে দেরি হয়ে গেলে। ভাবনার কিছু নেই, রাতটা বাগানবাড়িতেই কাটিয়ে দেবে।

নিশ্চিন্ত সুপর্ণা। মালি আছে ওখানে, অসুবিধে হবে না রান্নাবান্নার।

গভীর রাতে অতি ধীরে গাড়িখানা আশ্রমের ভেতর চালিয়ে নিয়ে এসে একটা গাছের তলায় রাখল আনন্দ। চেয়ে দেখল, আশ্রমের এলাকার ভেতর কোথাও আলো জ্বলছে না। রাস্তার ওপারে দূরে কাছেও কেউ জেগে আছে বলে মনে হল না।

আনন্দ পায়ে পায়ে অতি সন্তর্পণে এসে দাঁড়াল বিপাশার ঘরের সামনে। গঙ্গার দিকটাতে নির্জন। সে ঘুরে গেল ঐদিকে। এদিকটায় শুধু একখানা জানালা খোলা। চাঁদ উঠেছে, সম্ভবত কৃষ্ণা সপ্তমীর চাঁদ। তার অস্পষ্ট আলো জানালার ভেতর দিয়ে সাদাটে কুয়াশার মতো ঘরে ঢুকে পড়েছে।

আনন্দ দেখল, অস্পষ্ট একটি মূর্তি বিছানার ওপর বসে। দুটো হাত কোলের ওপর জড়ো করে দেয়ালের কোন ছবির দিকে স্থির হয়ে চেয়ে আছে। চেয়ে আছে কি চোখ দুটো বন্ধ তা অস্পষ্ট আলোয় ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

বিপাশা, বি-পা-শা, চাপা গলায় জানালার ধার থেকে ডাকল আনন্দ।

ছায়ামূর্তি নড়ে উঠল। বিছানা থেকে নেমে ধীরে এগিয়ে এল জানালার কাছে। জানালার গরাদে মুখখানা চেপে ধরে চেয়ে রইল বাইরে।

আমি আনন্দ বিপাশা, দরজা খোল।

বিপাশা কোন কথা বলল না, শুধু চেয়ে রইল আনন্দের দিকে।

কি, আমাকে চিনতে পারছ না?

এবারও বিপাশার মুখ থেকে কোন কথা উচ্চারিত হল না। সে ধীরে ধীরে জানালার কাছ থেকে দরজার দিকে চলে গেল।

আনন্দ এবার ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল দরজার সামনে। দরজা খুলে দিয়েছে বিপাশা, কিন্তু প্রবেশ পথে প্রসারিত করে রেখেছে দুটো হাত।

আনন্দ সক্ষোভে বলে উঠল, তুমি কি আমাকে ঘরের বাইরে থেকে ফিরিয়ে দেবে বিপাশা?

হাত দুটো নামিয়ে বিপাশা সরে দাঁড়াল। আনন্দ ঢুকল ঘরের ভেতর। আশ্রমের এদিকে বড় বড় গাছগাছালির অবরোধ ভেদ করে তখনও চাঁদের আলো এসে পড়েনি। তবু দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে আনন্দ দাঁড়াল বিপাশার মুখোমুখি।

তুমি আমাকে একদিন আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে বলেছিলে, কিন্তু আজ আমি তোমার বারণ না শুনে চলে এসেছি বিপাশা। তুমি মা হতে চলেছ, কিন্তু আমি তো জানি, তোমার গর্ভের সন্তানের জন্মদাতা আনন্দশঙ্কর। তাই তোমার বারণ থাকলেও আমাকে তো আসতেই হবে আমার সন্তান আর তার মায়ের কাছে।

এই মুহূর্তে আর বিপাশা নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারল না। সে প্রায় ঝাঁপিয়ে আনন্দের বুকের ওপর পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল। শেষে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

আনন্দ মেঝের ওপর বসে বিপাশার মাথাটা তুলে নিল নিজের কোলে। তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলল, আমাকে একবার এ খবরটা বসুমল্লিক ভিলাতে গিয়ে দিয়ে আসতে পারলে না বিপাশা! শেষে পুরোহিতের কাছ থেকে সুপর্ণাকে জানতে হল!

বিপাশা উত্তেজনায় উঠে বসে বলল, আমি তো তোমার নাম উচ্চারণ করিনি আনন্দ, বিশ্বাস কর আমাকে। আমি শুধু আমার অবস্থার কথা বলেছি।

আনন্দ বলল, না, তা তুমি করনি। তবে দুঃখ আমার এই যে তুমি আমাকে আগে ঘটনাটা জানাওনি, তাহলে হয়তো অন্য কোন পথ বেছে নেওয়া যেত, অন্য কিছু ভেবে বের করার সময় পাওয়া যেত।

বিপাশা বলল, এ ব্যাপারে আমি তোমাকে জড়াতে চাইনি আনন্দ। আমার ভুলের শাস্তি আমি নিজেই পেতে চেয়েছি।

ভুল কিসের বিপাশা?

ভুল নয়? একটি মানুষ সংসারি জেনেও তাকে আমি দেহ দান করেছি। তার মনকে তার স্ত্রীর কাছ থেকে আমি বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছি।

আনন্দ বলল, যদি ভুলই হয়ে থাকে তাহলে আমরা দুজনেই তার জন্যে দায়ী, একা কেউ নয়। তাই সে ভুলের শাস্তি দুজনকেই ভাগ করে নিতে হবে, নয়তো তার সমাধানের পথ দুজনকেই খুঁজে বার করতে হবে।

বিপাশা এবার আনন্দের দুটো হাত জড়িয়ে ধরে কাতর গলায় বলল, আনন্দ, রক্ষা কর আমাকে, পাপের ওপর পাপ আর আমার বাড়িও না। তুমি এর ভেতর জড়িয়ে পড়লে তোমার শান্তির সংসার ভেসে যাবে। আমি পারব না, পারব না তেমন কাজ করতে আনন্দ। তুমি আমাকে দয়া কর। নিজেকে কোন রকমেই জড়াতে চেও না এর মধ্যে।—কাঁদতে লাগল বিপাশা।

আনন্দ বলল, স্থির হও। সেন্টিমেন্টাল হয়ো না। আচ্ছা বল, তুমি এতদিন বসে বসে এর সমাধানের কি পথ ভেবেছ?

বিপাশা স্থির হয়ে কিছু সময় চুপচাপ বসে রইল। পরে মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, এর কোন সমাধান নেই আনন্দ, শুধু গঙ্গার অতলে ডুবে যাবার আগে খড়কুটো ধরে বেঁচে ওঠার মিথ্য লড়াই।—কিছু সময় থামল বিপাশা। তারপর আবার বলল, আমি সব কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম গুরু কৃষ্ণদাসকে। গতকাল বিকেলের ডাকে তাঁর চিঠি এসেছে।

উৎসুক আনন্দ বলল, কি লিখেছেন তিনি?

আমাকে পাসপোর্ট ইত্যাদির ব্যবস্থা করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমেরিকার আশ্রমে চলে যেতে বলেছেন। তাঁর একটি ভক্ত অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ হলে তিনি নাকি সব ব্যবস্থাই করে দিতে পারবেন। তাছাড়া গুরুজি তাঁর কাছেও চিঠি দিয়েছেন। তিনি দু-একদিনের ভেতর আশা করি আশ্রমে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন যাবার ব্যবস্থাপত্র সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে।

আনন্দ বলল, সব ব্যবস্থাই দেখছি পাকা করে ফেলেছ। কিন্তু একটা কথা ভুলে যাচ্ছ বিপাশা, আজ তুমি আর একা নও। আরও দুটো মানুষের সুখ দুঃখ তোমার সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

কি বলতে চাইছ তুমি আনন্দ?

আনন্দ গভীর গলায় বলল, তুমি কি এ দেশ থেকে পালিয়ে তোমার গর্ভের সন্তানকে নষ্ট করে ফেলতে চাও?

বিপাশা দু'হাতে চোখ ঢাকল। ধীরে ধীরে এক সময় বলব, তা যদি করতে চাইতাম আনন্দ তাহলে অনেক আগেই ব্যবস্থা নিতাম। কলকাতায় আর যা হোক, নার্সিং হোমের অভাব নেই।

তবে?

ওকে বাঁচাতে চাই বলেই পরিচিতদের চোখ এড়িয়ে পালাতে চাই। আর যাবার আগে সবাই জানবে, আমি প্রধান আশ্রমের ডাকেই অসুস্থ শরীরটাকে সারাতে আমেরিকা যাচ্ছি।

আনন্দ কঠিন গলায় বলে উঠল, না, তোমার আমেরিকা যাওয়া হবে না।

কথাটা বিপাশার কানের ভেতর দিয়ে একেবারে বুকে এসে বাজল। সে কোন কথা বলতে পারল না। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

আনন্দ আবার বলল, এখন সব দায়িত্ব আমার। আমি আমার সন্তানকে বাইরে নিয়ে যেতে দেব না। তুমি প্রচার কর, বৃন্দাবনে দেবদর্শনে যাবে তুমি। ফিরে এসে দেখা করবে ভক্তদের সঙ্গে।

বিপাশা কাতর গলায় বলল, এ অবস্থায় কে আমাকে আশ্রয় দেবে আনন্দ? আমি তো বৃন্দাবনের কিছুই জানি না।

হাসল আনন্দ। বলল, পাপই করি আর পুণ্যই করি, আমার প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে দাও। তারপর একটু থেমে বলল, শোন, আগামী পরশু হাওড়া স্টেশনে রাত আটটায় অপেক্ষা করবে এনকোয়ারীর সামনে। তারপর যা করার আমি করব।

কিন্তু গুরুদেবের পাঠানো সেই অফিসারটি যদি এসে পড়েন ইতিমধ্যে?

তাঁকে বলবে তুমি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছ, দু-চারদিনের ভেতর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তাঁর নিজের থেকে খোঁজ নিতে আসার দরকার নেই।

আনন্দ চলে গেল। বিপাশা জীবনের পরবর্তী পরিণতি সম্বন্ধে কিছু ভাবতে পারল না। কিন্তু বুকে যেন কিসের একটা বল পেল।

দীর্ঘ পাঁচ মাস যে উদ্বিগ্ন মানসিক অবস্থার ভেতর কাটিয়েছিল, তার কিছুটা অবসানে সে নিজেকে অনেক বেশি হাল্কা আর ভারমুক্ত মনে করতে লাগল।

বিপাশা দীর্ঘদিন পরে অঘোরে ঘুমুতে লাগল তার শয্যায়।

প্রবল একটা ঝড় এইমাত্র বয়ে গেল বসুমল্লিক ভিলায়।

কেউ কোথাও নেই। রাত বারোটার কাছাকাছি সুপর্ণা বালিশের তলায় পেল একটি খাম। মাথাটি সরাবার সময়ে একটা অপরিচিত শব্দে সে বেডসুইচ টিপে আলো জ্বালাল। বালিশ সরাতেই চোখে পড়ল একখানা খাম।

আজ বাগান থেকে ফিরে আসবে না বলেই গিয়েছিল আনন্দ। তাই কোন চিন্তা ছিল না সুপর্ণার মনে। সে খামখানা তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে ফেলে চিঠিখানা বার করল। বুক টিপ্ টিপ্ করছিল তার। একটা অজানা আশঙ্কায় হাত কাঁপতে লাগল। কয়েক ছত্র চিঠি, লিখেছে আনন্দ।

পর্ণা,

জীবনের পথে সবাইকে ছেড়ে এমন করে ভাসতে হবে তা আমি নিজেও কি জানতাম। একটা অঘটনের নায়ক হয়ে আজ সব দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিতে হল। রাধামাধব আশ্রমে বিপাশার পরিণতির জন্যে আমিই দায়ী। তাই তার রক্ষার দায়িত্বকে কোন রকমে এড়িয়ে যেতে পারলাম না।

জীবনের একটার পর একটা পাপ করে চলেছি, জানি না কোথায় গিয়ে আমি আমার চরম শান্তি পাব--

চিঠিখানায় চোখ বুলিয়েই জ্ঞান হারিয়েছিল সুপর্ণা। যখন জ্ঞান হল, তখন তার মনে হল, সে স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু তাকিয়ে দেখল বিছানার পড়ে সেই মর্মান্তিক চিঠি। হাত বাড়িয়ে সে ডায়েল করল বাইরের মহলে শ্বশুর রুদ্রশঙ্করকে। রুদ্রশঙ্করের অনেক রাত অব্দি ঘুম আসে না। তিনি ফোনে শুধু শুনলেন, বাবামাশায়—বলে সুপর্ণা কান্নায় ভেঙে পড়ে ফোনটা ছেড়ে দিল।

রুদ্রশঙ্কর ওপরের বারান্দা দিয়ে প্রায় দৌড়ে এলেন ভেতর মহলে। আনন্দের শোবার ঘরের দরজায় টোকা দিতে লাগলেন। দরজা খুলে দিল সুপর্ণা। তারপর দরজা বন্ধ করে বিস্মিত রুদ্রশঙ্করের হাতে তুলে দিল আনন্দশঙ্করের চিঠি।

চিঠিখানা পড়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন তিনি। এ ক্রোধ না আঘাতের প্রতিক্রিয়া তা বোঝা গেল না। তিনি শুধু বললেন, তোমার শাশুড়ী মাবা যাবার পর এই দ্বিতীয়বার আমাকে মৃত্যুশোক সহ্য করতে হল মা।

কথাটা শুনেই প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় শ্বশুরের বুকে ঝাঁপিযে পড়েছিল সুপর্ণা। রুদ্রশঙ্করও তাকে ধরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে শুধু বলে চললেন, মা-মণি, মা-মণি, মা-মণি আমার।

ভোরবেলা রুদ্রশঙ্করই গাড়ি পাঠিয়ে বেয়াইকে আনালেন। বৃদ্ধ অধ্যাপককে নিজের ঘরে ডেকে সব কথা অকপটে জানালেন। বিস্মিত স্তম্ভিত অধ্যাপক।

বিয়ের পর মেয়েকে বারে বারে তিনি জিজ্ঞেসা করেছেন, কি মা, বড় বাড়িতে গিয়ে কোন অসুবিধে বোধ করছ না তো? কোন ক্ষোভ, কোন দুঃখ নেই তো?

সুপর্ণা বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছে, আমার কোন দুঃখ নেই বাবা। আমি ওখানে খুব যত্নে আছি। তুমি বিশ্বাস কর, শ্বশুরমশাই আমার হাতে তাঁর সব ক'টি আলমারীর চাবিই তুলে দিয়েছেন। বলেছেন, এখন থেকে বসুমল্লিক পরিবারে লক্ষ্মীর আসনে তুমি বসলে।

আজ তিনি রুদ্রশঙ্করের মুখে এই অবিশ্বাস্য প্রায় কথা শুনে বিহ্বল হয়ে গেলেন। ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে রইলেন বৈবাহিকের দিকে।

রুদ্রশঙ্কর বললেন, আপনি আজ শুধু জেনে রাখুন বেয়াইমশাই, বসুমল্লিক পরিবারের একমাত্র বংশধরের মৃত্যু হয়েছে।

রুদ্রশঙ্কর বললেন, মা-মণি, এখন তুমি তোমার বাবার সঙ্গে ক'দিন ও বাড়িতে গিয়ে থাক, আমি তোমাদের সঙ্গে ওখানে গিয়েই দেখা করব। তবে মা একটা কথা বলি, সে স্কাউন্ড্রেল যেখানেই থাক এ বসুমল্লিক পরিবারে আর কোনদিন ঠাঁই হবে না তার।

রুদ্রশঙ্কর গাড়ি করে সুপর্ণা আর তার বাবাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। রুদ্রশঙ্কর ভাবলেন, এখানে থাকলে আনন্দের স্মৃতিগুলো কাঁটার মত বিঁধবে সুপর্ণার বুকে। তার চেয়ে বাবা আর মেয়েতে কিছুকাল থাক একসঙ্গে। পূর্বজীবনে ফিরে গিয়ে সুপর্ণা খানিকটা সান্ত্বনা খুঁজে নিক।

কয়েকদিন যেতে না যেতে এক সন্ধ্যায় নিজেই ফিরে এল সুপর্ণা বসুমল্লিক ভিলায়। ভেতরের মহলে আসার আগে ঢুকল গিয়ে রুদ্রশঙ্করের ঘরে। রুদ্রশঙ্কর একখানা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসেছিলেন জানালার ধারে। তাকিয়ে ছিলেন রাধাগোবিন্দের মন্দিরের দিকে।

ঘরে আলো জ্বালেননি তিনি। অফিস থেকে ফিরে আজকাল অন্ধকার ঘরেই বসে থাকেন। সন্ধ্যায় জনসমাগম আর আলোর মালায় জমজমাট হয়ে থাকত, যে ঘর, আজ সেখানে সূঁচ পড়লেও আওয়াজ শোনা যায়।

প্রহ্লাদদার সঙ্গে ইতিমধ্যে ফোনে যোগাযোগ হয়েছিল সুপর্ণার। প্রহ্লাদদার কাছে থেকেই রুদ্রশঙ্করের দৈনন্দিন রুটিনের আমূল পরিবর্তনের কথা সে শুনেছিল। তাই স্থির থাকতে পারেনি। চলে এসেছে বসু মল্লিক ভিলায়।

রুদ্রশঙ্করের পিছনে দাঁড়িয়ে সুপর্ণা তাঁর মাথার চুলে হাত রাখতেই তিনি চমকে উঠে বললেন, কে? পরক্ষণেই বধূর হাতটা নিজের হাতে ধরে বললেন, মা-মণি তুমি এসেছ বুড়ো ছেলের কাছে। তুমি কি মা থাকতে পারবে এ অভিশপ্ত বাড়িতে?

পারব বাবা। আর তাছাড়া আপনাকে একা ফেলে আমি কোথায় যাব।

রুদ্রশঙ্কর চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, আলোটা জ্বালতো মা-মণি।

সুপর্ণা আলো জ্বালল।

রুদ্রশঙ্কর ডেস্কের ড্রয়ারটা টেনে খুললেন। একটি লাল রঙের ফাইল টেনে বের করে নিয়ে সুপর্ণার হাতে দিয়ে বললেন, এ তোমার মা-মণি। আমি নিজেই যেতাম এটি তোমার হাতে তুলে দিয়ে আসতে।

সুপর্ণা বলল, এতে কি আছে বাবামশায়?

তুমি লেখাপড়া শিখেছ মা, তোমার ঘরে গিয়ে পড়ে নিও।

সুপর্ণা ফাইল নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

ঘর খুলতেই বুকখানা ভেঙে দুমড়ে গেল সুপর্ণার। সে আলো জ্বালতে সাহস পেল না। হাজার স্মৃতি বৃশ্চিকের মতো বিষেয় জ্বালা ছাড়িয়ে দেবে তার দেহে। আর সেই বিষ রক্তের স্রোতে বয়ে এসে আঘাত দেবে বুকে। সে আঘাত প্রবল গতিতে গিয়ে আছড়ে পড়বে স্নায়ুকোষে।

সুপর্ণা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল জানালার গরাদ ধরে।

দুটো নৌকো ভেসে চলেছে গঙ্গার বুকের ওপর দিয়ে।

নৌকোর দিকে তাকাতে তাকাতে বসুমল্লিক পরিবারের বজরার কথা মনে পড়ে গেল সুপর্ণার। চোখ গিয়ে আটকে গেল বজরার ওপর। গঙ্গা থেকে বসুমল্লিক ভিলার দক্ষিণ সীমানায় একটা খালের মত খুঁড়ে আনা হয়েছে। সেখানে ছোট একটা জেটির মত করা হয়েছে বজরায় ওঠার জন্যে। তার গায়েই বজরাটা বাঁধা থাকে সামনে একটা পোস্টে সারারাত আলো জ্বলে।

গরাদ ধরে থাকতে থাকতে সুপর্ণার মনে হল, সে যেন বজরায় ভেসে চলেছে। চাঁদনী রাত। আকাশ থেকে নামছে শীতল জলের ঝর্ণা। সে গান গাইছে আর তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে, কে? কে? কে? সুবুদা, আনন্দ, সুবুদা, আনন্দ—কেন চেনা যাচ্ছে না মুখটা! যেন একটা অস্পষ্ট কুয়াশার চাদর পড়ে আছে মুখখানার ওপর।

মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে সুপর্ণা গরাদ ছেড়ে দিল। বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে আলোর সুইচটা টিপল। রুদ্রশঙ্করের দেওয়া ফাইলটা খুলে বসল।

রুদ্রশঙ্কর একটা ডিড করে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি, ধনসম্পদ সুপর্ণার নামে দিয়েছেন। সে উইলে পুত্র আনন্দশঙ্করের কোন উল্লেখ নেই।

সুপর্ণার কোলের ওপর উইলটা পড়ে রইল। মুখে ফুটে উঠল গভীর ব্যথার একটা হাসি। জীবনের রিক্ততাকে কি বিত্ত দিয়ে পূরণ করা সম্ভব?

সে উইলখানা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল রুদ্রশঙ্করের সামনে। রুদ্রশঙ্কর তাকালেন সুপর্ণার মুখের দিকে। কিছু যেন পড়ে নেবার চেষ্টা করল সে মুখের রেখায় রুদ্রশঙ্করের অভিজ্ঞ চোখ।

বাবামশায়, আমি তো বিত্ত চাইনি। আপনার স্নেহই আমার সম্বল। বিত্তের বোঝা বইবার ক্ষমতা নেই আমার।

রুদ্রশঙ্কর ঘড়ি দেখে বললেন, আমি এমনি একটা অনুমান করেছিলাম মামণি। একটু অপেক্ষা কর, এখুনি তোমার বাবা এসে যাবেন। তুমি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁকে ফোন করে গাড়ি পাঠিয়েছি। প্রায় দু'ঘন্টা পার হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। তিনি এলে আমি আমার একটা প্রস্তাব রাখব তোমাদের সামনে। বলতে পারো। এই আমার শেষ বক্তব্য।

সুপর্ণা আলোর সুইচটা অফ করে দিয়ে বলল, বাবামশায়, আপনি চেয়ারে একটু মাথাটা হেলান দিয়ে বসুন, আমি আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। বাবা এতে খুব আরাম পান, আপনার কেমন লাগে দেখুন।

বাধ্য শিশুর মতো রুদ্রশঙ্কর মাথা হেলান দিয়ে বসলেন, আর সুপর্ণা হাত কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সারা মাথায় ম্যাসেজ করতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বাইরের মহলে গাড়ি ঢোকার আওয়াজ পাওয়া গেল। রুদ্রশঙ্কর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ঐ বেয়াই মশায় এসে গেলেন। সুপর্ণা আলো জ্বালতেই রুদ্রশঙ্কর চটির শব্দ তুলে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

সিঁড়ির মুখ থেকে বেয়াইকে হাত ধরে নিয়ে এলেন ঘরের ভেতর। তারপর বেয়াইকে বিছানার ওপর বসিয়ে ডাক দিলেন সুপর্ণাকে। সুপর্ণা এল তাকেও নিজের বিছানার একপাশে বসালেন। তারপর দলিলখানা নিয়ে এসে বেয়াইমশায়ের হাতে দিয়ে বললেন, আগে এখানা পড়ে দেখুন।

সুপর্ণার বাবার দলিলখানা পড়া শেষ হয়ে গেলে রুদ্রশঙ্কর বললেন, আপনার কি অভিমত বলুন?

অধ্যাপক বললেন, এ আপনার পারিবারিক ব্যাপার, এতে আমার কি বলার থাকতে পারে। সুপর্ণা এখন আপনারই মেয়ে। ওকে পুত্রবধূ ভাবলে ভাববেন, আবার আপনার কন্যা ভাবলেও ভাববেন।

সুপর্ণাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন রুদ্রশঙ্কর, আমার কোন সন্তান নেই মা, তুমি আমার একমাত্র কন্যা। মনে কর, তুমি আমার অবিবাহিতা মেয়ে, পিতৃগৃহে রয়েছ।

তারপর রুদ্রশঙ্কর বেয়াইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি আমার কন্যার বিয়ে দিতে চাই অধ্যাপক। আমি আমার সমস্ত সম্পদ আমার কন্যা জামাতাকে যৌতুক রূপে দিতে চাই।

চোখে কাপড় জড়িয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল সুপর্ণা। বৃদ্ধ অধ্যাপক বিহ্বলের মতো চেয়ে রইলেন দুজনের দিকে।

সুপর্ণার কান্না থামলে সে চোখ মুছে বলল, শুধু একটি শর্তে বাবামশায় আমি আপনার দলিল নিতে পারি।

বল মা।

আমি পুনর্বিবাহে বিশ্বাসী নই। একে প্রাচীন হিন্দু মেয়েদের কুসংস্কার বলে মনে করলে আমার ওপর অবিচার করবেন। আমি শুধু বলতে চাই, কোন মানুষকেই ঠিক মত চেনা যায় না। আপনি আপনার ছেলেকে কাছে রেখেও চিনতে পারেননি। আমি আমার স্বামীর সঙ্গ পেয়েও চিনতে পারিনি। তাই দ্বিতীয়বার কোন অপরিচিত পুরুষের কাছে প্রতারিত হতে আমি চাই না।

একটুখানি থেমে আবার বলল, আপনি যদি আমাকে মেয়ে বলেই মনে করেন, তাহলে আমার ইচ্ছার ওপর সবকিছু ছেড়ে দিন। আমি আমার বুড়ো দুটি বাবার সেবা করব সারাদিন। লাইব্রেরীর বই পড়ব আর রাধাগোবিন্দ মন্দিরের ঠাকুর সেবার ব্যবস্থা করব। এতেই কেটে যাবে আমার দিনগুলো।

রুদ্রশঙ্কর বললেন, তাই হবে মা।

অধ্যাপক বললেন, সেই তো ভাল।

এক প্রশান্ত গাম্ভীর্য সারাদিন বসুমল্লিক ভিলায় বিরাজ করছে। ভোরে উঠে স্নান সেরে নিয়ে পূজার ফুল নিজের হাতে তুলে আনে সুপর্ণা। সাজি ভরে সে ফুল রেখে আসে মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের সামনে। পুরোহিত এসেই পেয়ে যান ফুল। মনে মনে আশীর্বাদ করেন কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীকে।

সংসারের সারাদিনের কাজ সুপর্ণার কাছ থেকে বুঝে নিয়ে যায় ঠাকুর চাকর কর্মচারীর দল। ভুল করলে ক্ষমা আছে, উদ্ধত শাসন নেই, তাই সব কর্মচারীই সুপর্ণার ব্যবহারে বশীভূত। রুদ্রশঙ্কর অফিসে যাবার আগে পর্যন্ত শিশুর মতো সেবা উপভোগ করেন সুপর্ণার। ফিরে এলেও সেই একই পরিচর্যা।

উৎসব অনুষ্ঠান, পূজা পার্বন চলে পূর্বের মতই সাড়ম্বরে। আত্মীয়রা জেনেছেন, ব্যবসায়িক একটি প্রতিষ্ঠান নতুন করে গড়ে তোলার জন্যে আনন্দশঙ্কর চলে গেছে বাংলা দেশের বাইরে। এই মিথ্যা প্রচারে সায় ছিল না সুপর্ণার, তবু প্রথম প্রচারিত এই মিথ্যাই চালু হয়ে আছে। তাই মাঝে মাঝে বসুমল্লিক ভিলা ছেড়ে বাইরে চলে যেতে হয় সুপর্ণাকে। পক্ষকাল কোন সমুদ্রতীরে অথবা পার্বত্য এলাকায় কাটিয়ে ফিরে আসতে হয় আবার নিজের কর্মস্থলে।

এই মিথ্যার খেলা ভাল লাগে না সুপর্ণার। সত্য নির্মমভাবে আত্মপ্রকাশ করুক, কোন গ্লানি, কোন ক্ষোভ নেই তাতে।

শুধু প্রহ্লাদদা এসে যখন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাঁড়ায় সামনে তখন সুপর্ণা আর নিজেকে স্থির রাখতে পারে না। তার বাইরের কঠিন আত্মসংযমের বরফ ধীরে ধীরে গলে যায়। সে প্রহ্লাদদার সামনে আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে থাকে। প্রহ্লাদদা বলে, বউরাণী, আমি সব বুঝতে পারি। ঐ হতভাগাটা ঠিক আমার ঘরের লক্ষ্মীরাণীকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে।

সুপর্ণা শুধু বলে, ভাগ্য প্রহ্লাদদা, তোমার দাদাভাই তো এমনটি ছিল না।

প্রহ্লাদদা চোখ মুছতে মুছতে একখানা ঝাড়ন হাতে নিয়ে দরজা জানালা ঝাড়তে থাকে। সুপর্ণার মনে হয় বাড়ির ভেতর যদি কেউ সবচেয়ে আঘাত পেয়ে থাকে তাহলে সে এই বুড়ো মানুষটি শিশুকাল থেকে যাকে সে কোলে পিঠে করে মানুষ করল, স্কুল কলেজ জীবনে আগলে বেড়াল, আর বিয়ের পর থেকে বাইরে বেরুলেই যে সারাক্ষণ চোখ পেতে পেতে থাকত তার ফেরার পথের ওপর, সেই প্রহ্লাদদা কেমন করে সইবে এ দুঃখ।

সুপর্ণা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর ভাবে, যেভাবে বুড়ো প্রহ্লাদদা নুয়ে নুয়ে হাঁটা চলা শুরু করেছে তাতে ওর পাঁজর ক'খানাই যেন ভেঙে গেছে।

সেদিন ছিল আশ্বিনের প্রথম দিন। প্রায় তিনমাস ধরে অঝোর কান্নার পর শান্ত হয়েছে প্রকৃতি। বৃষ্টির জলে ধোয়া গাছপালা ঝলমল করছে। ঝকঝক করছে পথঘাট। গঙ্গার বুক যেন উথলে উঠছে জলসম্ভারে। আকাশ নীল।

সুপর্ণা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল দুর্গামণ্ডপের সামনে। প্রতিমা-শিল্পী বাঁধছিল খড়ের ভোর। প্রতিমা রচনার সূত্রপাত। তাই প্রথম মূর্তি রচনার কাজটুকু দেখছিল সে বিশেষ আগ্রহে।

একটি পরিচারিকা এসে তার তন্ময়তা ভেঙে দিয়ে বলল, বৌরাণী আপনার একখানা চিঠি এসেছে। বার মহলে পিয়ন দাঁড়িয়ে আছে আপনার সই নেবার জন্যে। রেজেস্টিরি চিঠি না কি যেন বললে। সই ছাড়া দেবে না।

সুপর্ণা বাইরে গেল চিঠি আনার জন্যে, সঙ্গে দাসী। সই করে চিঠি নিয়ে ওপরের বারান্দায় উঠে দাসীকে বলল, তুই কাজে যা।

ওপরের বারান্দা পার হয়ে ভেতরের মহলে আসা যায়। সুপর্ণা চিঠিখানা হাতে নিয়ে ঘরের দিকে এগোচ্ছিল, হঠাৎ তার চোখ গিয়ে পড়ল, পিছনের বাগানের পাশে বাঁধানো জেটির ওপর। ধবধবে সাদা বজরাখানা গঙ্গার জোয়ারে দুলে দুলে উঠছে। ঠিক এমনি দিনে সে আনন্দের হাত ধরে উঠেছিল বজরায়।

পায়ে পায়ে এক সময় নিজের ঘরে এসে ঢুকল সুপর্ণা। গঙ্গার দিকে খোলা জানালার বীটের ওপর বসে ধীরে ধীরে খুলল চিঠিখানা। সব কাজেই সুপর্ণা ধীর স্থির। তাই চিঠি খোলার অস্থিরতা বা তাড়া ছিল না তার।

খামের ওপর অনেক ক'টি পোস্ট অফিসের স্ট্যাম্প পড়েছে।

চিঠিখানা বের করে সুপর্ণা নীচে নামটা দেখে দারুণ রকম চমকে উঠল। বুক থেকে তার যেন একটা তরঙ্গ বইতে লাগল। এটা কান্নার না আনন্দের ঢেউ তা সে বুঝতে পারল না। নীচে নাম লেখা—তোমার সুবুদা।

চিঠি পড়ার আগে সে চিঠিখানাকে আবেগে চুম্বন করল। তার চোখ হঠাৎ ঝাপসা হয়ে ওঠায় সে কতক্ষণ চিঠির অক্ষরগুলো দেখতে পেল না।

এক সময় চোখ মুছে নিয়ে চিঠি পড়তে শুরু করল সুপর্ণা।

চিঠির মাথায় লেখা আছে জরুরী।

পর্ণা, আমি কোথা থেকে কি ভাবে তোমার ঠিকানা পেলাম তার বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তবে কলকাতার কোন বন্ধুর কাছ থেকে তোমাদের খবর মাঝে মাঝে পেতাম।

সম্প্রতি একটি বিশেষ ঘটনার খবর আলমোড়ার একটি আঞ্চলিক পত্রিকায় বেরোয়। আমি কৌতূহলী হয়ে ঘটনাটি সম্বন্ধে খোঁজ খবর করতে থাকি। যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে ঘটনার সঙ্গে তোমার স্বামীর নামের সাদৃশ্যযুক্ত একটি মানুষ জড়িত। ও ধরনের নাম এবং পদবীর একসঙ্গে মিলন সচরাচর ঘটে না বলে উনি যে তোমার স্বামীই এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছি। তোমাকে আমার ঠিকানা ও পথের নিশানা এই চিঠির পিছনের পৃষ্ঠায় দিয়ে দিলাম। কাউকে সঙ্গে নিয়ে যতটা সত্বর সম্ভব চলে এলেই মঙ্গল। চিঠিতে সব কথা বিস্তারিত লেখা সম্ভব নয়। ইতি—তোমার সুবুদা।

তৃতীয় দিনে আলমোড়ায় এসে হাজির হল সুপর্ণা। আসার সময় বিস্মিত দুই বৃদ্ধকে শুধু বলে এসেছিল, কোথায় যাচ্ছি প্রশ্ন করবেন না বাবামশায়। আমার ওপর শুধু বিশ্বাস রাখুন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি আপনাদের কাছে ফিরে আসব।

সুবুদার নাম এখানে প্রায় সকলেই জানে। ডাক্তার মালাকারের নাম এখানে গরীব দুঃখী ব্যবসায়ী দোকানদার, সব মহলেই ছড়িয়ে পড়েছে। বাজারের কাছে বাস থেকে নেমে একটি দোকানদারকে সুপর্ণা নামটা জিজ্ঞেস করেছে। খদ্দের থেকে পাশাপাশি জনাপাঁচেক মানুষ নামটা শুনেই ওকে ডাক্তার সাহেবের ডেরা সম্বন্ধে নির্দেশ দিতে লাগল। একটি ছেঁড়া ময়লা পাতলুন কুর্তা পরা বছর তেরো বয়সের ছেলে দোকান থেকে লাফ মেরে নীচে নেমে ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ব্রাইটন কর্ণারের দিকে।

পাহাড়ের খাঁজে একটি ছবির মতো কাঠের বাড়ি। সামনে এক চিলতে বাগানে অজস্র গোলাপ ফুল ফুটে আছে। ছেলেটি বাড়ি খানা দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল।

বুকে কেন জানি না একটা যন্ত্রণার ঢেউ উঠে আসছে সুপর্ণার। এখুনি সে মুখোমুখি হবে সুবুদার। কত যুগ যুগান্তর পারের হারিয়ে যাওয়া একখানা মুখ এই মুহূর্তে ফুটে উঠবে তার চোখের সামনে।

দরজা ভেজানো ছিল, ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। সুবুদা কি বিয়ে করেছে। জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখল, ঘরের দুপাশে দুটো খাটিয়ার ওপর বিছানা পাতা। আলনায় শুধু পুরুষ মানুষেরই ক'টা পোশাক।

ঘরে ঢুকল সুপর্ণা। পিছনের দরজার খোলা। একটুখানি উঁকি দিতেই মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করল। স্থির হয়ে নিয়ে আবার উঁকি দিল।

সুবুদা আর আনন্দ পিছনের বাগানে পাশাপাশি দুটো বেতের চেয়ার বসে চা খাচ্ছে। চারদিকে উঁচু করে তারের জাল দিয়ে ঘেরা কম্পাউণ্ড। বাইরে ছোট একটি দেওদার গাছের সংসার। তারপরেই ভ্যালি আর পাহাড়।

একটা খাটিয়ার ওপর বসে পড়ে উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগল সুপর্ণা।

কতক্ষণ এই ভাবে কেটে গেছে তার খেয়াল নেই। হঠাৎ পায়ের সাড়ায় চমকে সামনে চেয়ে দেখে সুবুদা তার সামনে দাঁড়িয়ে।

মুখে আঙুল দিয়ে সুবুদা তাকে কথা বলতে বারণ করল। তারপর ইঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করতে বলে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। আসার সময় শেকলটা তুলে দিল দরজায়।

সামানের বাগান ঘুরে দক্ষিণ প্রান্তে দু'খানা ঘর। বাইরে থেকে চোখে পড়ে না, কিন্তু চারদিকে থেকে কাচ ঘেরা এই ঘর দু'খানা বেশ মনোরম। সামনে কাঠের টবে অর্কিড ঝুলছে। ফুল ফুটেছে দুটো অর্কিডে।

ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতর ঢুকল সুবুদা, পিছনে ছায়ার মত অনুসরণকারিণী সুপর্ণা। ওরা এসে বসল একটা সাজানো ঘরে। সুবুদাই প্রথমে কথা বলল, তুমি কি একা এসেছ? সঙ্গে কাউকে দেখছি না কেন?

সুপর্ণা বলল, আমি একাই এসেছি।

সুবুদা বলল, পাশেই বাথরুম আছে, যাও হাত মুখ ধুয়ে এস। গীজারে গরম জল করে নিও।

সুপর্ণা কোন কথা না বলে সুটকেসের ভেতর থেকে কাপড় জামা বের করে নিয়ে ঢুকল গিয়ে বাথরুমে।

বেশ কিছু সময় পরে কাপড় চোপড় ছেড়ে বেরিয়ে এল বাইরে। ঘরে ঢুকে দেখে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। প্লেটে অমলেট রাখা। টিকোজীর ভেতর চায়ের পট। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ভেতরে ঢুকল সুবুদা। ছেলেটি বেরিয়ে গেল।

সুবীর বলল, নাও নাও খেয়ে নাও, আমরা এখুনি চা খেয়েছি। ওকে ইনজেক্সন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে এলাম। এখন আমরা কথাবার্তা বলতে পাবব।

একটা দুর্ভেদ্য রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়েছে সুপর্ণা। সাধ্য নেই তার সে জাল ছিন্ন করে রহস্যের সমাধান করে।

অমলেট খাওয়া হয়ে গেলে চা খেতে লাগল সুপর্ণা। সঙ্গে সঙ্গে কথা শুরু করল সুবীর, কি ব্যাপার বল তো পর্ণা, আনন্দশঙ্কর তোমাকে ছেড়ে একটি মেয়ের সঙ্গে চলে এল কেন?

সুপর্ণা বলল, আগে বল, কি করে তুমি এ খবরটা পেলে?

ঘটনাই আমাকে বলে দিয়েছে। কলকাতা থেকে এ ব্যাপারে কোন খবরই আমি পাইনি, কিংবা আনন্দশঙ্করের কাছ থেকেও কোন কিছু জানা যায়নি।

সুপর্ণা বলল, তোমার অনুমান ঠিক। আনন্দ একটি মেয়ের সঙ্গে কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে এসেছে।

সুবীর বলল, আমি একদিন সকালে লোকাল পেপারে খবরটা পড়লাম। খবরটা এই ভাবে বেরিয়েছিল ঃ একটি ভ্রাম্যমান বাঙালী পরিবার ঘুরতে ঘুরতে আলমোড়া এসে পড়ে স্ত্রী আসন্নপ্রসবা থাকায় তাকে ভর্তি করা হয় একটি নার্সিং হোমে। ওখানে মহিলা একটি সুস্থ সন্তান প্রসব করেন, কিন্তু জন্মদানের পর বহু চেষ্টাতেও প্রসূতিকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। আর সবচেয়ে দুঃখের ঘটনা এই যে মহিলার স্বামী স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নার্সিং হোমের মেঝেতে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান। মাথায় আঘাত লাগার ফলে পরে জ্ঞান ফিরে এলেও তিনি কোন কথা স্মরণ করতে পারেন না। এখনও তিনি সেই অবস্থাতেই আছেন। পূর্বস্মৃতি ফিরে আসেনি।

নার্সিং হোমটি আমার চেনা। ডাক্তার আরোরা আমার পার্সোনাল ফ্রেন্ড। আমি সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম। ডেলিভারীর আগে নার্সিং হোমের এন্ট্রি বুকে সই করা আছে প্রসূতি আর তার স্বামীর নাম।

বিপাশা আর আনন্দশঙ্কর বসুমল্লিক নাম শুনে আমি স্তম্ভিত। ঠিকানা দেওয়া আছে কলকাতায় তোমাদের বাড়ির।

আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে গিয়ে আনন্দকে নিজের কাছে নিয়ে চলে এলাম। বলে এলাম, এ আমার পূর্ব পরিচিত। তার পরের ঘটনা তোমার জানা।

সুপর্ণা বলল, আমার ভাগ্য সুবুদা। ঐ মেয়েটির সঙ্গে ওর কলেজ জীবনে পরিচয় ছিল। কিন্তু আনন্দ তাকে উপেক্ষাই করেছে। শেষে আমাদের বিয়ের পর একটা আশ্রমেরর পবিচালিকা হিসেবে মেয়েটির সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ হয়। মেয়েটিকে আমার ভাল বলেই মনে হয়েছিল কিন্তু শেষ অব্দি আমি হেরে গেলাম সুবুদা।

সুপর্ণার চোখে জল এসে গেল।

সুবীর বলল, কেঁদে কোন লাভ নেই সুপর্ণা, বোল্ডলি সব কিছুকে ফেস করতে হবে। আশ্চর্য ভাবে ওরা এখানে আত্মগোপন করে ঘুরতে ঘুরতে এসে গিয়েছিল, না হলে কি যে ঘটত তাই ভাবছি।

সুপর্ণা বলল, এখনও আমাদের ওপর তোমার রাগ আছে সুবুদা? বিশ্বাস কর তোমার চলে আসার পর বাবা তোমার নাম করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন আর কেঁদেছেন।

সুবীর বলল, উনি যে আমাকে কত ভালবাসতেন তা আমি জানি পর্ণা। তাই সামান্য কারণেই ওঁর ওপর অভিমান করে আমি চলে এলাম।

আমার কথা কলকাতা ছেড়ে চলে আসার সময় তুমি একটুও ভাবলে না?

আমি যে তোমাকে ভুলিনি পর্ণা, যত দূরেই থাকি না কেন, তোমার খোঁজ যে সব সময়েই আমি নিয়ে চলেছি, তা কি এর থেকে প্রমাণ হয়নি।

সুপর্ণা বলল, এত দূরে এসে তুমি ডাক্তার হিসাবে খুব নাম করেছ, মানুষের অজস্র ভালবাসা পেয়েছ, পথে আসতে আসতে একথা শুনে গর্বে আমার বুকটা ফুলে উঠল।

সুবীর বলল, এখানকার মানুষ জন বড় ভাল পর্ণা।

সুপর্ণা অমনি বলল, ভাল না ছাই, একে তো আমার সুবুদাকে আমার কাছ থেকে টেনে নিয়েছে, তার ওপর ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে একটা কুমায়ুন সুন্দরীর বিয়ের ব্যবস্থাও করে দিতে পারেনি।

হা-হা-হা-হা করে হাসতে লাগল ডাক্তার সুবীর মালাকার।

রাতে খাবার পর বিছানা পাতা হয়েছে।

সুপর্ণা বলল, দেখছি দুটি তো বিছানা। একটি রোগী ঘুমুচ্ছে সেই বিকেল থেকে, বাকী আর একটি। তুমি কোথায় শোবে, আমিই বা কোথায় শোব?

সুবীর বলল, মনে আছে, এক নির্জন ফাঁকা মাঠের ভেতর ডাক্তারের কোয়ার্টারে শীতের রাতে একই খাটে শোবার জন্যে বায়না ধরেছিলে—

মনে আছে সুবুদা। আজও তোমার কাছে শুতে কোন সংকোচ নেই।

সুবীর হেসে বলল, না রে পাগলী, ডিসপেন্সারীতে শোবার খুব ভাল ব্যবস্থা আছে আমার। তোরা দুজনে এই ঘরে থাক। বেলার দিকে ওর ঘুম ভাঙবে। কোন ভাবনা নেই।

সুবীর চলে গেল। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় উঠে বসল সুপর্ণা। বেডসুইচটা অফ করে দিল। আবার কি মনে করে সুইচটা জ্বালল। জানালা দরজা সব বন্ধ। ধীরে ধীরে খাট থেকে নেমে এল সুপর্ণা। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল আনন্দশঙ্করের খাটের দিকে।

আনন্দ চিৎ হয়ে বুকের ওপর আড়াআড়ি দুটো হাত রেখে ঘুমুচ্ছে। সুপর্ণা হাঁটু ভেঙে বিছানার ওপর বসে দেখতে লাগল। একটি অবোধ শিশুর মত ঘুমিয়ে আছে আনন্দ। হঠাৎ কেমন যেন মায়া হল মানুষটার ওপর। সব ক্রোধ, সব ঘৃণা কোথায় যেন ভেসে চলে গেল। সে আনন্দের হাত দুটো ধীরে ধীরে বুক থেকে তুলে পাশে নামিয়ে রাখল। ঘরে এমনি করে শুতো আনন্দ, তার ফলে বুকে

চাপ পড়লে নিশ্বাসের কষ্টে একটা কাতর ধ্বনি তুলে পাশ ফিরত। তাই মাঝে মাঝে ঘুমের ভেতর জেগে উঠে সুপর্ণা আনন্দের বুক থেকে হাত দুটো সরিয়ে দিত।

আনন্দের দিকে চেয়ে কেন জানি না সুপর্ণার দু'চোখ জলে ভরে উঠল।

রুদ্রশঙ্কর চেঁচিয়ে উঠলেন, এ কে? একে আমি চিনি না। আমার একমাত্র সন্তান অনেক আগেই মারা গেছে। শেষের কথাটা উচ্চারণের সময় গলার আওয়াজ বুজে এল তাঁর।

সুপর্ণা বলল, বাবা, আপনি কার কাছে আক্ষেপ করছেন, ও যে অসুস্থ, স্মৃতিভ্রষ্ট। শুধু আমার মুখের দিকে চেয়ে আপনি আপনার ছেলেকে ক্ষমা করুন।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন রুদ্রশঙ্কর।

সুপর্ণা এবার চাদরের ভেতর থেকে একটি ঘুমন্ত শিশুকে রুদ্রশঙ্করের পায়ের তলায় নামিয়ে রেখে বলল, এ আমার সন্তান বাবামশায়, আপনার বংশের রক্ত এর দেহে বইছে। বসুমল্লিক বংশের এই নিষ্পাপ শিশুটিকে আপনার চরণে স্থান দিন।

শিশুটিকে বুকে তুলে নিয়ে সুপর্ণাকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন রুদ্রশঙ্কর। কাঁদতে কাঁদতেই বলে চললেন, আমি তোর কাছে হেরে গেলাম মা।

গঙ্গার প্রবাহের দিকে চেয়ে থাকে সুপর্ণা। ধীর স্থির। যেন পরিচয়ের পৃথিবীটা দেখার দ্বার বন্ধ করে সে বসে থাকে নিভৃত ঘরের নির্জনে।

বিপাশার সন্তানকে বুকে তুলে নিয়েছে সে। তার আনন্দের রক্ত এর দেহে বইছে। একটা বিরাট শিশু নিকেতনের পরিচালিকা যেন সুপর্ণা। দুই বৃদ্ধ শিশু, এক স্মৃতিভ্রষ্ট অবোধ, আর দুগ্ধপোষ্য শিশুটি। সারাটা সংসার জুড়ে যেন তার শিশুর মেলা। পরিচর্যায়, সান্ত্বনায়, সেবায় কেটে যায় তার সময়।

একদিন সন্ধ্যায় রাধাগোবিন্দের মন্দিরে আরতির শেষে প্রসাদী চরণ তুলসী নিয়ে ফিরছিল সে। প্রতি সন্ধ্যায় আনন্দর কপালে সেই তুলসী সে ছুঁইয়ে দেয়। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে আসতে সে যেন আনন্দের গলা পেল। একটা নিশ্চুপ পাষাণ মূর্তি যেন সহসা কথা বলে উঠেছে। থমকে দাঁড়িয়ে গেল সুপর্ণা। সে দেখতে পেল গভীর ভাবে তাদের বিয়ের ছবিটিকে দেখছে আনন্দ। যজ্ঞের সামনে বধূকে বেষ্টন করে ধরে আছে বর।

আনন্দের গলা ক্রমশ উচ্চ হতে লাগল। স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হল—

আনন্দ উচ্চারণ করছে সেই অনির্বাণ অমৃত মন্ত্র ঃ

যদিদং হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।।

সুপর্ণার চোখ জলে ভরে উঠেছে। সে দেখতে পাচ্ছে না পথ। তবু অন্ধের মতো সিঁড়ি বেয়ে ঘরে ঢুকে সে বলতে লাগল, আনন্দ, আমার আনন্দ—

ততক্ষণে আনন্দের বাহুপাশে বন্দী হয়ে গেছে রোরুদ্যমানা সুপর্ণা।

বর্ষা বসন্ত ছুঁয়ে

প্রীতিভাজনেষু,

একত্রিশটা বছর কোথা দিয়ে পার হয়ে গেল তুমি আর একটিবারও ঝালদায় এলে না। অনেক অপরাধ আমি করেছি তোমার কাছে, কিন্তু সেজন্যে এতখানি শাস্তি পাব তা কোনদিন ভাবিনি তোমাকে আমি পাথর ভাই বলে ডাকতাম। তোমার কালো নিটোল পাথরের শরীরখানা দেখে প্রথমদিনই ঐ নামটা আমার মনে এসেছিল। কিছুটা পরিচয় এগিয়ে যাবার পর ঐ নামেই যখন তোমাকে ডাকলাম, তুমি প্রথমটা কেমন একটু চমকে উঠেছিলে, তারপর একমুখ হেসে বলেছিলে, যে নামেই ডাকো কাঞ্চীদি, এমন কঠিন পাথর তুমি আর কোথাও পাবে না।

আজ এতগুলো বছর পরে যখন জীবনের হিসেব মেলাতে বসেছি তখন তোমার মুখখানা যে ভাই চোখের ওপর বার বার ভেসে উঠছে।

সেই শেষ দেখা তোমার আর গোপার সঙ্গে ঝালদা স্টেশনের অদূরে শিরিষ গাছটার তলায় সেদিন তুমি গাড়ি ধরবে বলে এসে দাঁড়িয়েছিলে ঐ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে।

আমার বেশ মনে আছে, তুমি আমাকে সেখানে ঐ অবস্থায় দেখবে একেবারেই আশা করনি তোমার চোখে মুখে সেই ছবিই ফুটে উঠেছিল।

আমি গোপার হাত ধরে ঐ গাছটার তলায় বসেছিলাম। তারপর কি যে বলে গিয়েছিলাম ঝড়ের মত তা আজ আর গুছিয়ে মনে করতে পারছি না।

শুধু মনে আছে আমার ভেতর তখন বইছিল একটা ঝড়। আমার অনেক দুঃখের গড়ে তোল ঘরখানা ঝড়ের ঝাপটায় ছিঁড়ে খুঁড়ে উড়ে গেছে। আমি অসহায়ের মত ঘুরছি পথে পথে।

তুমি আমাকে সেদিন সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিলে, সঙ্গে সঙ্গে এ অনুরোধও জানিয়েছিলে, আমি যেন বাবার কছে ফিরে যাই। কিন্তু তোমার অন্তরের উত্তাপভরা কথাগুলো আমার মনকে স্প করলেও আমি সেদিন তোমার কথার মর্যাদা রাখিনি। আমার অভিমানী মন সেদিন সবার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে দুঃখের ভেতর শান্তি পেতে চেয়েছিল।

আজ সব দুঃখ ভুলে গেলেও একটি দুঃখের স্মৃতিকে ভুলি কেমন করে বল। এক হতভাগ্য বা পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে দেখে যেতে পেল না তার সন্তানের মুখ। তার সেই সন্তানকে বুকে ভেতর আগলে ধরে আমি বড় করে তুলেছি।

আজ সে দুঃখের কথা থাক। আর একটি খবরে তুমি নিশ্চয়ই আহত হবে।

গত ডিসেম্বরে তোমার পরম শ্রদ্ধেয় স্যার আর. ডি. সরকার মারা গেছেন। মৃত্যুর সময়ে আ তাঁর পাশেই ছিলাম। তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পার তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে শুধু বিবেকের তাড়না আমাকে তাঁর কাছে থাকতে হয়েছিল। একটি মাত্র মেয়ে তার মহান বাবাকে মৃত্যুর মাঝে তলিয়ে যে দেখছে। বাবা একটি ইসারাতেও তাকে কাছে ডাকছেন না। কি অভিমান বুকে নিয়ে আমি সে তোমার স্যারের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম, তা নিশ্চয়ই তুমি অনুমান করতে পারছ। শেষ মুহূর্তে তি ইংগিতে কারো কাছে যেন জল চাইলেন। আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর মুখে চামচে করে জল দিলা তিনি মুখে জল রেখে আমার দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তাঁর সন্ধানী চোখের চাহনি থেকে ম হল, আমি তাঁর কাছে এক অপরিচিতা। এক সময় বুঝলাম, তিনি আমাকে চিনতে পেরেছেন, ত ঠিক সেই মুহূর্তে চোখ দুটো তাঁর স্থির হয়ে গেল। কি এক অব্যক্ত যন্ত্রনায় বেঁকে গেল তাঁর মুখখান কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল জল। আমার এত স্নেহশীল অথচ এমন কঠিন পিতার মৃত্যুর মুহূর্তে অ

কাঁদতে পারলাম না। শেষ মুহূর্তে তাঁর ক্ষমা পাবার ক্ষীণ একটা আশা আমার মনের ভেতর জেগেছিল, কিন্তু তা নির্মম উপেক্ষার আঘাতে নিভে গেল।

শোন, এইখানেই ঘটনার শেষ নয় ভাই, সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনাটি আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল। বাবার উকিল এসে সকলের সামনে বাবার উইল পড়লেন। ভাবতে পার, যিনি তিরিশটা বছরের উপর মেয়েকে দেখতে চাননি, মৃত্যুর মুহূর্তেও তার হাতের দেওয়া জল গ্রহণ করেননি, তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি সরকার টুল কোম্পানির সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁর নাতি অর্থাৎ আমার ছেলেকে দিয়ে গেছেন।

আমার ছেলে দীপশঙ্করের মুখ তিনি কোনদিনই দেখেননি। মেকানিক্যাল ইন্‌জিনিয়ারিং-এ উচ্চশিক্ষার জন্যে সে লন্ডনে গেছে, এ খবর কি করে তিনি পেয়েছিলেন। পাঁচ সাত লাখ টাকা তার নামে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি লিখেছিলেন, আমার ইচ্ছে যে সব ছাত্রেরা বিদেশে ইন্‌জিনিয়ারিং পড়তে গিয়ে আর্থিক অসুবিধেয় পড়ে তাদের জন্যে এই টাকাটা ব্যয় করা হোক।

দীপশঙ্করের আত্মসম্মানে আঘাত করতে চাননি বাবা, তাই এইভাবে কথাগুলো লিখেছিলেন। দীপশঙ্কর স্যার আর. ডি. সরকারের নামে একটি চিঠি ফেরত ডাকে পাঠিয়েছিল। দাদু আর নাতির ভেতর এই চিঠি আদান-প্রদানের ব্যাপারটা আমি বাবার মৃত্যুর পরে জেনেছিলাম। দীপশঙ্কর তার দাদুর কাছে কেবল অভাবগ্রস্ত ছেলেদের একটি নামের তালিকা পাঠিয়ে লিখেছিল, আমার বিবেচনায় এরা আপনার প্রদত্ত আর্থিক সাহায্য পেলে লাভবান হবে। ঐ তালিকায় যেসব শিক্ষার্থীর নাম ছিল, তার পাশে আর্থিক সাহায্যের পরিমাণটাও সে ঠিক করে দিয়েছিল।

দীপশঙ্কর নিজে অতিকষ্টে চাকরীর টাকায় পাড়াশোনা চালালেও অভাবগ্রস্তদের তালিকায় তার নাম ছিল না।

বাবা যখন দীপশঙ্করের নামে এতগুলো টাকা পাঠিয়েছিলেন তখন নিশ্চয়ই গোপনসূত্রে খবর রেখেছিলেন, দীপশঙ্কর দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

তারপর আর কোন চিঠি নাতির কাছে তিনি পাঠাননি। তিনি বোধহয় বুঝেছিলেন, যে ইস্পাতে বিধাতা-পুরুষ তাঁকে তৈরী করেছেন, তারই একটা টুকরোতে সৃষ্টি করেছেন দৌহিত্র দীপশঙ্করকে।

তোমার স্যারের মৃত্যুর পর সব কিছু বিরোধের শেষ হয়ে গেছে। দীপশঙ্কর আসছে মাসে এখানে এসে পৌঁছবে। চিঠিতে সে জানিয়েছে সরকার টুল কোম্পানীর ভার সে নেবে, তবে তার সমস্ত আয় ব্যয়িত হবে ঐ অঞ্চলের উন্নয়নের কাজে।

দীপশঙ্করকে দেখলে তুমি হয়ত খুশি হবে। অবিকল তোমার স্যারের মত জেদী আর একরোখা হয়েছে ছেলেটা।

একত্রিশটা বছরের কাহিনী একত্রিশটা শব্দে কেমন করে লিখে জানাই বল। আমার দুর্যোগের রাতে দীপশঙ্কর একটু আলোর রেখা ফুটিয়ে তুলেছে, তাই দেখতে একবারটি তোমাকে ডাকছি ঝালদায়। আমার ওপর যত দুঃখ যত অভিমান অনুযোগ তোমার থাক, আশা করব একদিন এসে তুমি তোমার শ্রদ্ধেয় স্যার আর. ডি. সরকারের নাতিকে আশীর্বাদ করে যাবে।

তোমার ভালবাসা ও দুঃখের কাঞ্চনদি।

চিঠির শব্দগুলো শীতের দিনের ঝরে পড়া পাতার মত আমার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে পড়তে লাগল। কিছুক্ষণ আমি তাকিয়ে রইলাম অসহায় গাছটার দিকে। তারপর শীতের হাওয়ায় দেখলাম কান্নার আওয়াজ তুলে পাতাগুলো কতক্ষণ উড়ে বেড়াল। এক সময় দুরন্ত এক ঝলক হাওয়া তাদের উড়িয়ে নিয়ে গেল। উড়িয়ে নিয়ে গেল আমার মনটাকেও।

প্রায় একত্রিশ বছর আগের এক ডিসেম্বর-সন্ধ্যা। পুরুলিয়া থেকে বাসে চেপে এসে পৌঁছলাম ঝালদার পি. ডব্লু ডি-র ডাকবাংলোয়। যথেষ্ট গরম পোশাক ছিল গায়ে, কিন্তু পাহাড়ী শীত এই বাঙালী শীতকাতুরে বাবুটিকে একেবারে পেড়ে ফেলেছিল। উত্তুরে হাওয়ায় হাড়ে লেগেছে তখন বাঁশবনের মোচড়। ডাকবাংলোর আর্দালী কাম কুক সেলাম জানিয়ে আমার বেডিং আর সুটকেশখানা

ভেতরে বয়ে নিয়ে গেল। বাইরের হাওয়া থেকে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়তেই মনে হল যেন কয়েক ঘা নির্মম চাবুক খাওয়ার পর ছাড়া পেয়ে গেছি। আধঘণ্টার ভেতরে বিছানাটি পেতে গুছিয়ে বসলাম। ইতিমধ্যে একটা হ্যারিকেন এসে গেছে ঘরে। এক কাপ চায়ে চুমুক দিতেই মনে হ'ল আমি আমার হৃত সাম্রাজ্য ফিরে পেয়েছি।

চা খাওয়া শেষ হলে হ্যারিকেনের বাতিটা উস্কে দিয়ে আমার ফাইলপত্রে একটু চোখ বুলিয়ে নিলাম। ফাইলের ভেতর ডাকবাংলোর স্লিপটাতে নজর পড়ল। ভাগ্যিস রিজার্ভেশন কনফার্ম করে এসেছি না হলে পাহাড়ঘেরা এই ডিসেম্বরের শীতে রেল বাবুটিকে কি আতান্তরেই না পড়তে হত। আজ এই শীতের রাতে কোথায় খুঁজে পেতাম রামদাস সরকারের কারখানা। ঐ কারখানা খুঁজতে খুঁজতে শীতের হাওয়া আমার কবরখানাই খুঁড়ে দিত।

কুলদীপচাঁদের কথাটা আমার মনে পড়ল। আমার ইমিডিয়েট বস কুলদীপচাঁদ। বলে দিয়েছিলেন, সরকার থেকে সাবধান, ভারী সাংঘাতিক লোক এই সরকার। খুব ভাল করে মালের নমুনা পরীক্ষা করে নেবে। এতটুকু ফাঁক পেলেই চেপে ধরবে। তবে ধরা খুব সহজ নয়, সূক্ষ্ম তারের ওপর দিয়ে লোকটা ভেল্‌কি দেখিয়ে হেঁটে বেড়াতে জানে। দেখবে হয়ত, যে তাকে ধরতে গেছে তাকেই কোন ফাঁকে চেপে ধরেছে ঐ ওস্তাদ লোকটা।

ট্রেনের আসা সময় মনে হয়েছিল কুলদীপচাঁদ ইচ্ছে করেই যেন আমাকে এই বিপদের ভেতর ঠেলে দিলেন। এমন একটা সাংঘাতিক লোকের পাল্লায় এই ডিসেম্বরের হাড় কাঁপানো শীতের দিনে না ঠেলে দিলেই কি চলত না। সাংঘাতিক শীত তার ঐ সাংঘাতিক লোক, দুটোকে একই সঙ্গে সামলাই কি করে।

বাংলোর পুরু কম্বলের ভেতর নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে মনে হল, রাতটা তো কাটুক। ভোরের আলো ফুটলে সবকিছু সহজ হয়ে যাবে। তখন সবকারের কারখানা খুঁজে পেতে কষ্ট হবে না। লোকটাকেও দিনের আলোয় দেখা যাবে কতখানি ভয়ঙ্কর।

সারাদিনের জার্নির ক্লান্তিতে বোধকরি একটুখানি ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। ওদিকে রসুইখানা থেকে ভেসে আসছিল তোফা কিছু একটা রান্নার গন্ধ, ফায়ার প্লেসের আগুনটা বেশ আরামদায়ক ছিল, কাঠপোড়ার চিড়্ চিড়্ একটা আওয়াজ উঠছিল। সবকিছুর ভেতর আমি যেন কেমন এক ধরনের নিশ্চিন্ত আরামে তলিয়ে যাচ্ছিলাম। দারুণ জোরে বাইরে হর্ন বেজে উঠল। হঠাৎ চমকে উঠে বসলাম বিছানায়। ঘন ঘন তীব্র তীক্ষ্ণ হর্নটা যেন শীতের রাতের বুকে ছুরি চালাচ্ছিল। পথের দিকের জানালাটা বন্ধ করে রেখেছিলাম। খড়খড়ি সামান্য তুলতেই মোটরের জোর আলোটা তলোয়ারের মত ঝিলিক দিয়ে গেল ঘরের ভেতর।

কিছুক্ষণের ভেতরেই বাংলোর কুককে সঙ্গে নিয়ে আমার ঘরে এসে ঢুকল দুটো লোক। একটি কনস্টেবল, অন্যটি চাপরাসী জাতীয়। কুক বলল, হুজুর এখুনি বাংলো ছেড়ে দিতে হবে, বড় সাহাব এসে গেছেন।

পাশে দাড়িয়ে থাকা লোক দুটো আমার আদেশের অপেক্ষা না করে সুটকেশটা ততক্ষণে তুলে নিয়েছে। একজন এগিয়ে এল আমার বিছানাটাকে তাড়াতাড়ি তুলে নেবার কাজে সাহায্য করতে আমি এ অবস্থায় কি করব ভেবে না পেয়ে বেরিয়ে এলাম। সামনে একটি কেয়ার টেকার জাতীয় লোক দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে ফাইলপত্র। সে বলছিল, রেলের এই বাবুটি রিজার্ভেশন করেই এসেছেন। তবে হুজুরদের ব্যবস্থা সে এখুনি করে দিচ্ছে। খাকি পোশাকে দারোগা নেমে এলেন গাড়ি থেকে। আমাকে দেখেই বললেন, ইমার্জেন্সি, এখুনি বাংলো ছেড়ে দিতে হবে। আই. জি. হেয়ার সাহেব সপরিবারে গাড়িতে বসে আছেন। এস. ডি. ও. সাহেব এসেছেন ওঁর থাকার ব্যবস্থা তদারবি করতে। আপনাকে বাইরে কোথাও যেতে হবে এখন, আর খুব তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিতে হবে জিনিসপত্র। এখনো গেলে মাইলখানেক দূরে বাজারের ভেতর চটি মিলতে পারে।

আমি সবিনয়ে বললাম, সম্পূর্ণ অচেনা জায়গা, পথঘাট কিছুই চিনি না, এ অবস্থায় পথে বেরোলে শীতে মারা পড়তে হবে। তাছাড়া আমি তো আগেভাগে রিজার্ভেশন করেই এসেছি।

দারোগা বিচ্ছিরিভাবে 'রিজর্ভেশন করে এসেছেন' কথাটা জোর দিয়ে উচ্চারণ করে এস. ডি. ও সাহেবের গাড়ীর দিকে বুট বাজাতে বাজাতে চলে গেলেন।

পরবর্তী আক্রমণ আরও জোরালো হবে আমি জানি। এতগুলো লোক আমাকে পাশের মাঠে টেনে ফেলে দিয়ে এলে আমার কিছুই করার থাকবে না।

এই ভয়াবহ শীত আর দুর্ভাবনার ভেতর আমি ঘামতে লাগলাম।

এস. ডি. ও-কে নিয়ে ঐ দারোগাবাবুটি ফিরে এলেন। সঙ্গে আরও দুটি কনস্টেবল। আমার বিছানা ততক্ষণে ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসা হয়েছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি ঘামছি আর ভাবছি, এই রাতে অনিবার্য মৃত্যুর সঙ্গে লড়ব কি করে।

এস. ডি. ও. এসে বললেন, দুঃখিত এবং নিরুপায়, বাংলোতে মাত্র দুখানি ঘর। মিঃ হেয়ারের ফ্যামিলিকে এ্যাকোমোডেশন দেওয়াই প্রবলেম হয়ে উঠবে। বারান্দায় থাকবে আর্দালী আর সিকিউরিটির লোকেরা। আপনি যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব জিনিসপত্রগুলো সরিয়ে নিন।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কনস্টেবল বলল, হুজুর, ঘর থেকে মালপত্র সব বার করে নিয়ে এসেছি।

দারোগা অমনি হেঁকে বললেন, দাঁড়িয়ে আছ কেন সব উজবুকের মত. সাহেবের বেডিং, মালপত্র গাড়ি থেকে নামিয়ে আনো।

দারোগা নিজেই এবার ছুটলেন গাড়ির দিকে। কয়েকটা কনস্টেবল তাঁর পিছু পিছু ছুটল। রাতের বাংলো ভারী বুটের শব্দে, আলোয়, হাঁকডাকে সরগরম হয়ে উঠল।

ততক্ষণ হ্যাজাকের আলো জ্বলে উঠেছে। সামনের কিছুটা পথ আলোকিত হয়েছে। একটা পাথরের পরিত্যক্ত মূর্তির মত উঠোনের একধারে আমি দাঁড়িয়ে আছি, পাশে পড়ে আছে আমার বেডিং আর সুটকেশ। কেউ আর এখন আমার দিকে তাকাচ্ছে না। তারা আই. জি. হেয়ার সাহেব ও তাঁর পরিবারের লোকদের মালপত্র নিয়ে মহা ব্যস্ত।

এমন সময় উঠোনে রাখা হ্যাজাকের আলোর সামনে এসে দাঁড়াল একটি লোক। লোকটি দাঁড়াতেই দীর্ঘ ছায়াটা এস পড়ল আমার সামনে। আমি তার দিকে তাকালাম।

হঠাৎ সবকিছু ছাপিয়ে একটা গলা বেজে উঠল. হেথা এত হল্লা কিসের শুনছি হ্যাঁ?

লোকটি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করছেন মনে করে একটু এগিয়ে গেলাম তাঁর দিকে। এই রাতের অন্ধকারে লোকটির গলার শব্দে যেন একটা ক্ষীণ আশ্বাসের আলো আমি দেখতে পেলাম।

যেতে যেতে দেখলাম লম্বা কালো রোগা চেহারার একটি মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। খাটো কাপড়খানা পায়ের শেষ অবধি নামতে পারেনি, থমকে থেমে গেছে। পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি. গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবীর ওপর তুষের একখানা চাদর।

আমার রিজার্ভেশনের কনফারমেশন স্লিপটা তাঁর দিকে এগিয়ে ধরতেই তিনি দেখে বললেন. আপনি তো ভট্চায মশাই! এত ঝামেলা কিসের?

অথৈ জলে এক টুকরো খড় পেয়ে বাঁচার আশা প্রবল হয়ে উঠল।

বললাম, আই. জি সাহেব এসেছেন, তাই আমাকে জায়গা ছেড়ে দিতে হচ্ছে। আমি সন্ধ্যে থেকে এসে বসেছিলাম, এখন কি বিপদেই যে পড়লাম, মাথাটুকু গোঁজার ঠাঁই নেই এই দারুণ শীতের রাতে।

বেজে উঠল গলা, কেনে, ঘর ছাড়বেন কেনে মশাই. আপনি তো আগে আসছেন, চাইপ্যে বসুন।

হ্যাজাকের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা চাপরাসী বলে উঠল, হুজুরের ফ্যামিলি এসেছেন, গাড়িতে বসে আছেন। মাল নামান হচ্ছে।

বাজের মত এবার বেজে উঠল গলা, থাম ব্যাটা গুলামের বাচ্চা চামচিকে, এক থাপ্পড়ে গাল উড়াই দিব। চল তোদের সাহাব কোথা আছে দেখি যাঁইয়ে একবার।

আমি ততক্ষণে হতভম্ব হয়ে গেছি। অতি সাধারণ চেহারার লোকটির কি অদ্ভুত সাহস। ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, এস. ডি. ও এদের কাছে এমন আস্ফালন করছে আমার মত অতি সাধারণ একটি রেলের কর্মচারীর জন্যে।

ততক্ষণে লোকটির আর এক রূপ। আবছা অন্ধকারে এখন আর তাঁকে চেনা যাচ্ছে না, কেবল একটা গ্রে হাউন্ডের মত গম্ভীর ভারী গলা ভেসে আসছে। আশ্চর্য চোস্ত ইংরাজীতে সাহেবদের বলছেন, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি তোমাদের আক্কেল দেখে। একটা মানুষ তার দখলের কাগজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর তোমরা তাকে রাস্তায় বার করে দিচ্ছ। এই যদি তোমাদের সরকারী বিচারের নমুনা হয় তাহলে তোমাদের বাহাদুরী আছে বলতে হবে।

এস. ডি. ও একবার আমতা আমতা করে বলবার চেষ্টা করলেন, মানে আই. জি. সাহেব জরুরী সরকারী কাজে এসেছেন, তাঁর থাকার প্রয়োজনটা বেশি নয় কি?

আবার সেই গলা বেজে উঠল, কাকে বলতেছেন মশাই। ফ্যামিলির ছেলেপুলা সাথে লিয়ে সরকারী কাজ করে বেড়াচ্ছেন আই. জি. সাহেব।

দারোগা কি যেন বলতে চাইল, অমনি এক ধমক দিয়ে উঠলেন লোকটি, হাটিয়ে যান, দেখছেন না আমি মিঃ হেয়ারের সঙ্গে কথা বলছি।

লোকটি আই. জিকে বললেন, আমার কথা শুনুন, এস. ডি. ও সাহেবের কোয়ার্টারে চলিয়ে যান। ওখানে আরাম করেন গিয়া। এখানে মিছা ঝুটঝামেলার ভিতর পড়িয়ে যাবেন। ফ্যামিলি লিয়ে এ বাংলোটায় থাকবার চেষ্টা করবেন না।

অগত্যা গাড়িগুলোর মুখ ফিরল। চারদিকে ইংরাজ ঠ্যাঙাবার যে হিড়িক পড়েছে তাতে ভরসা হল না আই. জি, হেয়ার সাহেবের ডাকবাংলোয় থাকার। তাছাড়া এস. ডি. ও হেয়ার সাহেবের কানে কানে কি যেন বললেন।

হেড লাইটের আলোগুলো ঘুরে গেল উল্টো মুখে। কিছুক্ষণের ভেতর ডাকবাংলোটা অন্ধকারে ডুবে গেল।

সেই অন্ধকারে দাড়িয়ে মানুষটি আমার হাত ধরে বললেন, আপনি তো মশাই কেস জিতা গেছেন বটে, এখন আর এখানে থাকবেন কেনে। আমার ডেরায় চলুন আজ্ঞা। শালা লোগদের বিশ্বাস নাই, রাতে ভিতে ঝুট ঝামেলা লাগাইতে পারে।

আমি সেদিন সেই অন্ধকার রাতে সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকটির সঙ্গে ঝালদার পথে হেঁটে চললাম। তিনি আমার হাতের বেডিংটা নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কিছুতেই ওটা ঐ মানুষটির হাতে দিতে পারলাম না। শেষে আমার সুটকেশটা তাঁকে দিয়ে নিষ্কৃতি পেলাম।

পথ চলতে চলতে কথা হচ্ছিল। শীতের দাপটে দাঁতে দাঁত লেগে যাবার যোগাড়। একসময় বললাম, যে হারে কোল্ড ওয়েভ বইতে শুরু করেছে, তাতে প্রাণ রাখাই দায়। তবে ডাকবাংলোয় রাতেভিতে পুলিশের চোরাগোপ্তায় প্রাণ হারানোর চেয়ে এ অনেক ভাল।

ঠা ঠা ঠা ঠা করে সে কি হাসি ভদ্রলোকের। হাসি আর থামতেই চায় না।

হাসি থামলে বললেন, এ যে হল আপনার সেই বেহাঁই এর গল্পের মতো।

বললাম, কি রকম?

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, এক বেহাঁয়ের শ্রাদ্দে আর এক বেহাঁই খেতে গিয়ে বহুৎ মদ গিলেছে তারপর চারদিকে ভেলে দেখে বলতে লাগল,—বেহাঁইকে তো দেখছি না বটে।

পাশের লোকটা বলল, আরে বেহাঁই তো মারা গেছে গো, তার লাগে শ্রাদ লাগছে?

বেহাঁই মারা গেল তো কিসে মারা গেল গো?

মা মনসা দংশিয়েছিল।

হিলা (হেলে) না হুলা (কেউটে) বটে?

ফুলা বটে।

কোথা দংশিয়েছিল গো?

কপালে।

ভাগ্যে চক্ষে দংশায় নাই, তাহলে বেহাঁই আমার অন্ধা হইয়া যেত বটে।

সেই শীতের রাতে আমিও আর হাসি সামলাতে পারলাম না।

এক সময় প্রসঙ্গ পালটে নিয়ে বললাম, আচ্ছা দেখুন, এখানে সরকার টুল কোম্পানিটা কোথায় বলুন তো?

ভদ্রলোক বললেন, কেনে কি দরকার আছে মশাই?

ওখানকার আর. ডি. সরকার বলে এক কনট্রাক্টর আমাদের রেলে কিছু মাল সাপ্লাই করেন।

ভদ্রলোক বললেন, সরকার লোকটা মন্দ আছে, আপনি তো ইন্সপেক্টর ভটচায আছেন, মালগুলান বাজারে দেখিয়ে লিবেন।

কুলদীপচাঁদের কথাটা আবার মনে পড়ল। সরকার লোকটার থেকে হুঁসিয়ার হয়ে থাকতে বলেছিলেন। এ ভদ্রলোকের ধারণার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে দেখে মনে মনে বিশেষ সজাগ হয়ে রইলাম।

পথ চলছি, পায়ের জুতোর মশ মশ ফটফট আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। কয়েকটা খাপড়ার ঘর জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে ভাল বোঝা যাচ্ছে না। পেরিয়ে এলাম ঘরগুলো।

ভদ্রলোক কথা বললেন, আপনি সরকারের আগরগুলান যাচাই করে লিবেন।

প্রথমে একটু চমকে উঠলাম, এ ভদ্রলোক আগর সাপ্লাই-এর ব্যাপারটা জানল কি করে!

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল যাঁরা সরকারকে জানেন তাঁদের পক্ষে আগর সাপ্লাই-এর ব্যাপারটা জানা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়।

ভদ্রলোকের কথার উত্তরে বললাম, ঐ লোকটি সম্বন্ধে আমার বস-ও আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন। সাধ্যমত দেখেশুনে নেব।

ভদ্রলোক বললেন, একটা কথা বললে কিছু মনে করবেন না তো মশাই?

কি বলুন?

আপনি আগরগুলান ভাল কি খারাপ যাচাই করবেন কি করে?

সত্যি কথা বলতে কি আমার পরীক্ষার জ্ঞান পুঁথিপাঠ পর্যন্ত। ব্যবহারিক জ্ঞান আমার প্রায় কিছুই ছিল না।

আমার অজ্ঞানতার কথাটা এই উপকারী ভদ্রলোকটিকে অকপটে বলে ফেললাম। আমি জানি, সরকারের কাছে এমন ভাব দেখাব যেন আমি সবজান্তা।

ভদ্রলোক বললেন, পুঁথিপাঠ করে শিখেছেন, তাহলে তো কিছুই শিখেন নাই মশাই, আর তাহলেই কিছু শিখতে পারবেন। আমি আপনাকে কারখানা ঘুরায়ে সব শিখায়ে দিব।

একটা বিরাট টিনের ছাউনির পাশে এসে আমরা ততক্ষণে দাঁড়িয়েছি।

ভদ্রলোক বললেন, এই হল আপনার সরকার টুলের কারখানা। আজ খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ুন মশাই। কাল সকালে আমি সব বুঝায়ে দিব।

আমি অবাক হয়ে অন্ধকারে লোকটির দিকে চেয়ে রইলাম।

ভদ্রলোক কারখানা সংলগ্ন কোয়ার্টারে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, আমি সেই পাজি বদমায়েস সরকারটাকে একদম জব্দ করেই দিব। এমন করে আপনাকে শিখায় দিব যে ঐ লোকটা খারাপ মাল চালাবার কোনই ফাঁক পাবেক নাই।

আমি তাঁর হাতটা পেছন থেকে ধরে বললাম, মিঃ সরকার, আমাকে মাপ করবেন, সত্যিই আমি আপনাকে এতক্ষণ চিনতে পারিনি।

একমুখ হেসে রামদাস সরকার বললেন, চোর ডাকাইতের উপর যদি ভরসা রাখেন তাহলে সে

আপনাকে কখনো ঠকাবেক নাই, আপনাকে সে-ই আগলাবেক। ভদ্দরলোকই আসল ডাকু, ছ্যাঁচড় আছে।

আমরা যে ঘরটিতে ঢুকলাম সে ঘরে হ্যারিকেন জ্বলছিল। দেয়ালের আবছায়ায় একটা বেঞ্চ পড়ে আছে বলে মনে হল। তার ঠিক উল্টোদিকে একটা তক্তপোষ। বিছানা পাতা রয়েছে। তক্তপোষের সামনে টেবিলের ওপর আলোটা জ্বলছিল ; একটা টুলের ওপর একটি মেয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে টেবিলে রাখা ফাইলে কি যেন লিখছিল।

মিঃ সরকার ঘরে ঢুকেই বললেন, ভদ্দরলোককে আজ রাইতে তোমার হাতে মুর্গি খাওয়াবার লেগে হেথা অ্যানেছি।

সেই আমার প্রথম কাঞ্চীদিকে দেখা।

কাঞ্চীদি টুল থেকে উঠে এল আমাদের পাশে। এসেই বলল, বাবার পাল্লায় পড়েছেন তো, দুর্ভোগ আছে।

কাঞ্চীদির কথায় আমি মিঃ সরকারের মত পুরুলিয়ার টান পেলাম না। পরে জেনেছিলাম কাঞ্চীদি বহুদিন পাটনায় এক বাঙালি ভদ্রলোকের বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করেছিল। তাঁরা ছিলেন খাস নদীয়া জেলার লোক। তাই কাঞ্চীদি ঘরের মানুষদের সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলুক না কেন বাইরের লোকের সঙ্গে বিশুদ্ধ ভাগীরথীতীরের ভাষাতেই কথা বলত।

কাঞ্চীদিকে দেখে তার বয়সটা আন্দাজ করতে পারলাম না। বিশ থেকে তিরিশের ভেতর নিশ্চয়ই কোন একটা অঙ্ক ছুঁয়ে আছে। মেয়েদের বয়স অনুমান করা কঠিন, কাঞ্চীদির বেলায় সেটা আরও বেশি সত্য বলে মনে হয়েছিল।

কাঞ্চীদি তার প্রথম কথাটি এমন সহজ গলায় বলল যে আমি তাকে প্রথম দেখায় ভাল না বেসে পারলাম না।

হেসে বললাম, একটা দুর্যোগ থেকে তিনি আমাকে বাঁচিয়েছেন, নিশ্চয়ই এখানকার দুর্ভোগটা তার চেয়ে বড় হবে না।

কাঞ্চীদি ঘটনাটা জানত না, তাই মিষ্টি হাসি হেসে বাবার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকাল।

মিঃ সরকার বললেন, সাদা শুয়ারগুলান ভটচায সাহেবকে ঘিরে ধরে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছিল, তাদের খেদড়াই আলি।

কাঞ্চীদি বাবার হেঁয়ালির অর্থ ভেদ করার চেষ্টা আর করল না. মিঃ সরকারের হাত থেকে আমার সুটকেশটা নিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল।

একটু পরে ফিরে এসে আমার পাশে রাখা বেডিংটা তুলতে গেলে আমি বাধা দিয়ে বললাম, কোথায় রাখবেন চলুন, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

কাঞ্চীদি বলল, না, না, সে কি একটা কথা হল. আপনি আমাদেব অতিথি, এটুকু আমাদের করতে হবে বই কি।

বললাম, তাহলে আর কাউকে ভেতর থেকে পাঠিয়ে দিন।

মিঃ সরকার হেসে বললেন, তাহলে ওকেই ঘরে ঢুকতে হবেক, আবার ওকেই ভিতর থেকে বাহিরাই আসতে হবেক বটে। কাঞ্চী এ ঘরের বেহারা, কুক, সেক্রেটারি কাম অল ইন অল।

ততক্ষণে কাঞ্চীদি আমার বেডিংটা অবলীলায় তুলে নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

ফিরে এল দুহাতে দুকাপ গরম চা নিয়ে। ততক্ষণে মিঃ সরকারের ব্যবস্থাপনায় আমরা তোশক পাতা তক্তপোষের ওপর একখানা বড় কম্বল পা থেকে কোমর অবধি টেনে বসে আছি।

কাঞ্চীদি আমার হাতে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলল, শীত পড়লেই বাবা আর চাকে চা বলেন না। বলেন মৃতসঞ্জীবনী।

মিঃ সরকার অমনি বললেন, আচার্য রায় বলতেন, চা পান না বিষপান। কিন্তু রায় মশাই নিজে

একজন চা-পায়ী ছিলেন। আমি তো বলি,

গরম জব্দ বায়ে
শীত জব্দ চায়ে।

টুকরো টুকরো কথা হচ্ছিল। বন্ধ দরজা জানালার বাইরে শীতের রাত হায়েনার মত ওৎ পেতে বসেছিল। মিঃ সরকার আমার ডাকবাংলোর দুর্ঘটনার ব্যাপারটা কাঞ্চীদির কাছে সবিস্তারে বললেন। কাঞ্চীদি সব শুনে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, বাবা না থাকলে আজ রাতে ডাকবাংলোর অতিথি সৎকারটা কেমন হত তাই ভাবছি।

আমি অমনি বললাম, শব সৎকারের চেয়ে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বেশিদূর আর গড়াত না। পুলিশের গরল পান করে শিব সেজে ঘুরে বেড়াতে হত, তারপর ডিসেম্বরের শীতে ঝালদার পথে শব হয়ে পড়ে থাকতাম।

কাঞ্চীদি বলল, ও কথা বলছেন কেন ভাই, বিধাতার রাজ্যে সবারই জন্যে একটা আস্তানা নির্দিষ্ট হয়ে আছে। আজ রাতে আপনি আমাদের অতিথি এটা পূর্ব নির্দিষ্ট।

কাঞ্চীদি সম্ভবতঃ বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড়ই হবে। তার মুখে ভাই ডাকটা আমার বেশ ভালই লাগল।

বললাম, আমি আবার বিধাতা পুরুষে ঠিক আপনার মত অতখানি বিশ্বাসী নই।

কাঞ্চীদি বলল, বাবার সঙ্গে আপনার ভীষণ রকম মিল দেখতে পাচ্ছি। বাবা বলেন, কাজ করবে পুরুষের মত, আর যখন কাজ করবে তখন ভগবানের মুখের দিকে তাকাবে না।

মিঃ সরকার বললেন, তা কথাটা বলেছি আজ্ঞা। আমার মতটা হল বিধাতাকে খুশি করব্বার লেগে কুন কাজ করব নাই, আপনার খুশি হবার লেগে কাজ করব। তাহলে সব কাজ সহজ হয়ে যাবে আজ্ঞা।

বললাম, আপনার সঙ্গে আমার মতের কোন ফারাক নেই। কাজে গলদ থাকলে আমরা ভগবানের দিকে তাকাই। কখনও ভয় পাই, আবার কখনও ভগবানের নামে কিছু ঘুষ মানত করে অশুদ্ধ কাজগুলোকে শুদ্ধ করে নেবার পথ খুঁজি।

কাঞ্চীদি বলল, কত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধর ছেলেকে দেখেছি, যারা অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী, পরিশ্রমও করে যাচ্ছে, কিন্তু তার পুরস্কার পাচ্ছে কই। তাদের চেয়ে কম দরের ছেলেরা লাফিয়ে উঠছে ওপরে। একেই বলে ভাগ্য।

হেসে বললাম, দিদি, ধরাধরির ব্যাপারটাও তো ক্ষমতার ব্যাপার। ওদের সে ক্ষমতাটুকু নেই। তাই ভাগ্যের দিকে না তাকিয়ে ঐ ক্ষমতাটুকু অর্জন করতে পারলে অনেক অসাধ্যসাধন করতে পারে মানুষ।

মিঃ সরকার বললেন, খুব ভাল কথা বলেছেন মশাই। ঐ বিদ্যেটা থাকলে সব গাধায় ঘোড়া হয়ে যায়, সব গিরগিটিতে কুম্ভীর আর সব বেড়ালের বাচ্চায় সোঁদর বনের বাঘ বনে যায়।

মিঃ সরকারের বলার ভঙ্গিতে আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

রাত বাড়ছিল। বাইরের শীত বন্ধ ঘরের রন্ধ্র পথে ঢুকে পড়ে দংশন চালাবার চেষ্টা করছিল।

বললাম, এ অঞ্চলে শীত কিন্তু খুবই বেশি।

কাঞ্চীদি বলল, আপনার পক্ষে যতটা এখানকার লোকেদের পক্ষে ঠিক ততটা নয়।

বললাম, সে কথা মেনে নিলেও আপনাদের পুরুলিয়া জেলার শীতের বিক্রমকে তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কাঞ্চীদি আবার বলল, কাল ভোরে উঠে দেখবেন, পাহাড়ের জঙ্গলে যারা কাঠ কাটতে চলেছে, যারা ক্ষেত খামারে কাজ করতে চলেছে তাদের গায়ে কতটুকু শীতের কাপড় আছে।

মিঃ সরকার বললেন, সব সয়ে যায় মশাই। বিলাইতে যখন পড়বার লেগে ছিলাম, তখন বাইরে যাবার জন্যে ছিল একখান মাত্র স্যুট। ঘরের ভিতর পরতাম ধুতি, কুর্তা, আর গায়ে চড়াইতাম এই তুষের চাদরখান। ব্যাস, বিলাইতি শীত জব্দ।

মিঃ সরকারের কথায় আমি একটু চমকে উঠেছিলাম বৈকি। একজন কনট্রাক্টর, রেল বিভাগে যিনি আগর সাপ্লাই করেন তিনি বিলাত গিয়েছিলেন পড়তে! তাছাড়া চেহারায়, আচার আচরণে কোথাও মিঃ সরকারের এতটুকু বিলিতি ছাপ ছিল না। খাঁটি দিশি মানুষের একটা ছবি ফুটে উঠেছিল তাঁর চোখে মুখে, চলনে বলনে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল আই জি হেয়ার সাহেবের সঙ্গে মিঃ সরকারের বাকবিনিময়ের দৃশ্যটা। তখন মিঃ সরকার যেন ভিন্ন এক মূর্তির মানুষ। খাঁটি সাহেবি উচ্চারণ তাঁর কথায়। পুরুলিয়ার পাহাড়ি গাঁয়ের মানুষটি যেন ভেলকিতে খাঁটি ইংরাজে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন।

মানুষটির চরিত্রের ভেতর এমন একটা স্পষ্টতা আছে যা সহজেই সবার দৃষ্টিকে টেনে নেয়। আমার মনে হয়েছিল, মিঃ সরকারের জয়ের হাতিয়ার ওইখানেই।

মিঃ সরকারের কথার সূত্র ধরে হেসে বললাম, আপনার ল্যান্ড-লেডি কোনদিন আপনাকে ঐ দিশি পোশাকে দেখে ফেলেনি?

একবার ধরা পড়ে গিয়াছিলাম আজ্ঞা। ঐ পোশাকটায় আমাকে দেখে ল্যান্ড-লেডির তো ভিরমি লাগে বটে। শেষটায় আমাকে চিনতে পেরে বললেক, আমার ঘর ছেড়ে চলিয়ে যাও। আমি আরও গলা চড়ায়ে বললাম, চলিয়ে যাবার লেগে আসছি বটে! বেশি ফ্যাচ ফ্যাচ করলে তোমার ঐ বাইরের বাগানটায় আমি পোশাকখানা পরে ঘুরে বেড়াব।

শেষে আর কুন কথা আমাকে পোশাক লিয়ে বলে নাই।

একটু থেমে আবার মিঃ সরকার বললেন, সেই যেবার বিলাইত গেলাম, স্যুট পরা লিয়ে সে কি ঝকমারি মশাই। জাহাজে হলধর পাকড়াশি আমাকে টাই বাঁধা শিখাইল আজ্ঞা। কত টানটোন কত প্যাঁচ! শেষকালটায় বললাম, আমি ধুতি পরে, চাদর গায়ে চড়ায়ে যাব। পাকড়াশি তো হেসে কুটিপাটি মশাই। বলল, তাহলে সেফিল্ডে বি এসসি করা তোমার হবেক নাই, কলেজের গেটে দরোয়ান ঢুকতে দিবেক নাই।

কত ভাবলাম। মনে হল, শালা বৃটিশের গুলামি করব না, দেশে ফিরে যাই। আবার ভাবলাম, হারপার সাহেব কত ভালবেসে স্কলারশিপটা ব্যবস্থা করে দিল, আর আমি কিনা টাই বাঁধার ভয়ে পিছায়ে এলাম। শেষকালে শিখে নিলাম মশাই।

বললাম, আপনি কি স্যার মেটালারজিতে বি এসসি করার জন্য বিলাত গিয়েছিলেন?

হাঁ, ঠিক ধরেছেন আজ্ঞা। এখানে পুরুলিয়া কলেজ থেকে বি এসসি-তে কেমিস্ট্রি অনার্সে ইউনিভার্সিটির রেকর্ড নম্বর পেয়ে ফার্স্ট হলাম। কি করব ভাল চাকরি নাই। একটা ইস্কুলে অঙ্কের মাস্টারি করতে লাগলাম। সেই ইস্কুলটাতে এক বছর প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশানের লেগে বিহারের ডাইরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রিজ হারপার সাহেব এসেছিলেন। আমি ছেলেদের দিয়ে সেক্সপিয়রের একটা নাটক করাইছিলাম। সাহেব তো মহাখুশি মশাই। আমাকে ডাক দিয়া বললেন, মিঃ সরকার, পাটনায় তুমি আমার সাথে দেখা করবে।

পাটনায় সাহেবের সাথে দেখা করতে গিয়া কি ফ্যাসাদ মশাই। দরোয়ান শালা আমার ধুতি আর ফতুয়া দেখে তো ঢুকতে দিবেক নাই, শেষে মেমসাহেব আমাকে দেখতে পেয়ে হাত ধরে লিয়ে গেলেন। সাহেব ডিনার খাওয়ালেন আর বললেন, মিঃ সরকার, আমি তো তোমার জন্যে স্কলারশিপের ব্যবস্থা করেছি, তুমি সেফিল্ডে গিয়া বি এসসি পড়।

চলেই গেলাম। যাবার আগে বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে বলল, যাচ্ছ যাও, তবে এই দেশে ঘুরে আসতে হবেক। এখানকার লোকের ভাল করতে হবেক।

ওখানে গিয়া বি এসসি পড়লাম। ফার্স্ট হলাম। স্কলারশিপ মিলল। ঐ টাকায় আরও দু'বছর স্মল টুলস-এর ব্যাপারে স্পেশাল ট্রেনিং নিলাম।

মিঃ সরকারের কথার ভেতর বাধা দিয়ে কাঞ্চীদি বলল, তুমি কিন্তু দেশে ফিরে তোমার বাবার কথা শোননি।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন মিঃ সরকার। আপন মনে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করছি আজ্ঞা। আমার কারখানা পুরুলিয়ার সব মানুষের লেগে।

হাঁ, তবে কাঞ্চী ঠিক কথা বলছে। বিলাত থেকে ঘুরে আসে টাটা কোম্পানির অফার মিলল। স্মল টুলস সেক্সন খুলে ওরা আমাকে তার ইনচার্য বানাইল। চারদিকে তখন লাল মুখগুলান থিকথিক করছে, তার মাঝখানে কালা চামড়া আমি বসে আছি।

মাঝে মাঝে খিটমিট লাগত। কারও খবরদারি আমি সইতাম না মশাই। এমন করে বছরখানেক চাকরি করলাম। তখনকার দিনে পাঁচশ টাকা মাহিনার চাকরি, ফ্রি কোয়ার্টার, এমন উঠতে বসতে সেলাম, মাথাটা ঘুরতে লাগছিল বইকি।

একদিন কোয়ার্টারে বসে লাঞ্চ খাচ্ছি, এমন সময় বাইরে একটা কথা কাটাকাটির আওয়াজ পেলাম। বাইর হয়ে দেখি বগলে পোঁটলা লিয়ে আমার বাবা দাঁড়াই আছে, আমার দরোয়ান ব্যাটা তাঁকে ভিতরে ঢুকতে দিবেক নাই বলছে।

ছুটে গিয়া এক ধমক লাগাইলাম শালাকে।

বাবার পায়ে হাত লাগাতেই তিনি বলে উঠলেন, তুই আমার ব্যাটা হইয়ে কিনা গুলামি করতে লাগছিস! তোর পয়সা কড়ি হইল কিছু বটে তবে দেশের তো কিছুই হইল ন। সব ছ্যাড়া দে, দিয়ে ঘর চল। যে কাজ শিখে এলি সব দেশের ছেলেপিলেগুলানকে শিখাই দে।

বাবা আর ঘরে ঢুকলেন নাই। আমি কোয়ার্টারে ফিরে চাকরি ইস্তফার দরখাস্ত দিলাম, তারপর চলে এলাম বাবার সাথে আপনার গাঁয়ে। সেই থিকে মশাই দেশে ছেলেদের লিয়ে এই কারখানা গড়ে তুলছি।

রাতের অন্ধকারে স্বল্প হ্যারিকেনের আলোয় সেদিন রামদাস সরকারের যে ছবি আমার মনে আঁকা হয়ে গেল তা আর কোনদিন মুছল না। রাতে লুচি ডাল মাংস যত্ন করে খাইয়েছিল কাঞ্চীদি। তার রান্নার হাতের তারিফও করেছিলাম, কিন্তু সবকিছুর ভেতর রামদাসের ইস্পাতের মত কঠিন চরিত্র আমার মনটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল।

পরেব দিন ন'টা বাজল, সঙ্গে সঙ্গে বাঁশি বেজে উঠল কারখানার।

মিঃ সরকার বললেন, ভটচায মশাই, জরুরি কাজের লেগে আমাকে বাইরে যেতে হচ্ছে, দিন সাতেকের মাথায় ফিরব। ফিরে আপনার সাথে দেখা হবেক আজ্ঞা। এ কটা দিন আমার গরিবখানায় একটু কষ্ট করে থাকবেন। আপনার সঙ্গে রইল কাঞ্চী, ও আপনাকে সব বুঝাই দিবেক।

মিঃ সরকার চলে গেলে আমাকে কাঞ্চীদি কারখানা দেখাতে নিয়ে গেলেন।

বিরাট লম্বা টানা ছাউনি চলে গেছে, ভেতর থেকে উঠে আসছে নানা ধরনের মিশ্রিত শব্দ। নেহাই-এর ওপর গরম লোহা পেটাই-এর ঠং ঠং আওয়াজ, হাপরের প্রাণফাটা দীর্ঘশ্বাস, ঘুরন্ত চাকার গর গর ছর ছর শব্দ।

কারখানার দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে ডানদিকে দেখলাম একটি ছোট সুন্দর রুম। দেয়ালে নেম প্লেটে লেখা আছে, অরিন্দম সরকার, ম্যানেজার।

কাঞ্চীদি স্যুইং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই একটি পুরুষ গলা বেজে উঠল, কি ব্যাপার, অসময়ে কি মনে করে কাঞ্চী?

আমি দরজার বাইরে থাকলেও সামান্য ফাঁকে চোখ পড়তেই দেখলাম, কাঞ্চীদি চোখ দুটো বড় বড় করে মুখে তর্জনি রেখে ভদ্রলোককে কথা বলতে বারণ করল।

তারপর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে দাঁড়িয়ে স্যুইং ডোরটা ঠেলে ধরে আমাকে ভেতরে ডাক দিয়ে বলল, আসুন মিঃ ভটচায।

ভেতরে ঢুকেই দেখলাম তরুণ একটি যুবক তার সিট ছেড়ে উঠে দুটি হাত জোড় করে আমাকে নমস্কার জানাল।

আমি প্রতি নমস্কার জানালাম। কাঞ্চীদি আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল। আমরা তিনজন ঘরের ভেতর বসলাম।

আমার মনে হল বয়েসে কাঞ্চীদির সঙ্গে আমার বিশেষ একটা তফাৎ নেই, কিন্তু তরুণ যুবকটি যে কাঞ্চীদির চেয়ে অন্তত তিন চার বছরের ছোট তা বেশ অনুমান করতে পারা যাচ্ছিল।

আমার কারখানায় আসার উদ্দেশ্য যখন তরুণ ম্যানেজারটিকে কাঞ্চীদি বুঝিয়ে বলল তখন ম্যানেজার উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে কারখানার ভেতরে যাবার অনুরোধ জানাল।

কাঞ্চীদি বলল, তোমার হয়তো অসুবিধে হবে অরিন্দম, তুমি ততক্ষণে তোমার জরুরি ফাইলগুলো সেরে ফেল, আমি মিঃ ভটচাযকে কারখানা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি।

ম্যানেজার অরিন্দম মুখে সামান্য হাসি ফুটিয়ে পরক্ষণেই নিজের ফাইল পত্রের ভেতব চোখ ডোবাল।

আমরা কারখানার ভেতর ঘুরে ঘুরে সবকিছু দেখতে লাগলাম।

ছুরি, কাঁচি থেকে উন্নতমানের ছেনি, বাটালি প্রভৃতি তৈরি হয় এ কারখানায়। সবচেয়ে মূল্যবান প্রোডাক্ট হচ্ছে আগর। গভর্নমেন্টের রেলওয়ে বিভাগে শক্ত কঠিন কাঠ ছেঁদা করার জন্য আগরের দরকার। আগে এই আগর আসত বিদেশ থেকে। মিঃ সরকার কনট্রাক্ট ধরার জন্য কোটেশান দিলেন। হইচই পড়ে গেল ইংরাজ কনট্রাক্টর মহলে। এ হতে পারে না। তাদের ফলাও ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। মিঃ সরকারের কোটেশান বিদেশি কনট্রাক্টরদের প্রায় আদ্ধেক অঙ্কের। তারা প্রতিবাদ তুলে বলল, সরকারের আগর নিশ্চয়ই অনেক নীচু মানের।

মিঃ সরকারও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি তাঁর আগরে কাঠ ছেঁদা করে দেখিয়ে দিলেন যে বিলেত থেকে আমদানি করা আগরের চেয়ে তাঁর তৈরি আগর অনেক বেশি কার্যকরি। যেখানে বিলিতি আগরে কাঠ ছেঁদা করা যায় পঞ্চাশ থেকে ষাট, সেখানে মিঃ সরকারের তৈরি আগরে দেড়শো কাঠের কম ছেঁদা হয় না। রামদাস সরকার বলতে গেলে লড়াই করে কাজটা আদায় করে নিলেন।

রাগ গেল না বিদেশি প্রভুদের। তাঁরা পদে পদে পাতলেন পরীক্ষার বেড়াজাল। ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হল, ভাল নমুনা দেখিয়ে খারাপ মাল চালাচ্ছে কিনা দেখার জন্য। স্যাম্পল সংগ্রহ করে পাঠান হতে লাগল মেটালারজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে টেস্টের জন্য। কার্বন, সালফার, ম্যাঙ্গানিজ ফসফরাসে ফাঁকি আছে কিনা ধরার জন্য টেস্ট হাউস সহস্র চোখ মেলে বসে রইল। একবার ধরতে পারলেই হয়, ফড়িং-এর পাখি হওয়ার সাধ চিরদিনের মত ঘুচিয়ে দেওয়া হবে।

বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখাতে দেখাতে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে কারখানার প্রথম যুগের গল্প করছিল কাঞ্চীদি। বাবার ওপর গভীর ভালবাসার স্পর্শ ছিল সে সব কথায়।

একসময় কাঞ্চীদি বলল, এই দেখুন তো আপনাকে কেবল নিজেদের কারখানার বাহাদুরির কথাগুলোই বলে যাচ্ছি, আপনার আসল কাজ কিন্তু একটুও এগোচ্ছে না।

বললাম, খুব ভাল লাগছে আপনার মুখে এই গল্পগুলো শুনতে। গোলামি আমরা করছি ঠিক, কিন্তু এমনি একটি খাঁটি দিশি কারখানা আমাদের গৌরব বই কি। সাদা চামড়াদের একদিন সরিয়ে দিতে পারলে এই ধরনের কারখানাই হবে আমাদের জাতীয় সম্পত্তি।

আমার কথার ধরন দেখে কাঞ্চীদির চোখ দুটিতে হঠাৎ যেন একটা আলো জ্বলে উঠল।

জানেন, এই কারখানার গোড়াপত্তন করে গেছেন আমার ঠাকুরদাদা। অতি সাধারণ একখানা খাপরার ঘরে শুরু হয়েছিল তাঁর ছুরি কাঁচি গড়ার কারখানা। যে সব ছেলেরা কোন রকম কাজকর্ম পেত না, তিনি তাদের ধরে আনতেন কারখানায়। হাতে কলমে শেখাতেন, কতখানি গরম অবস্থায় লোহাকে জলে বা তেলে 'পান চড়ালে' তবে কাজের উপযোগী মজবুত লোহা পাওয়া যায়। তাদের হাতে তৈরি ছুরি কাঁচি দিয়ে বাজারে বাজারে পাঠাতেন। বলে দিতেন, বিলিতি ছুরি কাঁচির চেয়ে রুইদাস সরকারের তৈরি জিনিস ভাল না হলে দাম ফেরৎ দেওয়া হবে।

বললাম, আপনার ঠাকুরদার একটি কাহিনী শুনেছি কাল রাতে আপনার বাবার মুখে। আপনার ঠাকুরদাদার মুখের একটি কথায় আপনার বাবা টাটা কোম্পানির এত বড় চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে গাঁয়ে ফিরে এলেন।

গভীর তৃপ্তির একটা আলো ফুটে উঠল কাঞ্চীদির চোখে মুখে।

বলল, ছোটবেলায় ঠিক আমারই মত বাবারও মা মারা যান। ঠাকুরদাদা বাবাকে মায়ের অভাব বুঝতে দেননি। ঠাকুরদাদা খুব তেজি আর জেদি লোক ছিলেন, কখনও অন্যায় বরদাস্ত করতে পারতেন না। আমার বাবা তাঁর কাছ থেকে এইসব গুণ পেয়েছেন।

আমি হেসে বললাম, তৃতীয় পুরুষেও নিশ্চয়ই সে গুণগুলি বর্তেছে।

হঠাৎ দেখলাম কাঞ্চীদির মুখখানায় ছায়া ঘনিয়ে উঠল। আমার দিক থেকে মনের ভাব লুকোবার জন্যে মুখ ফেরাল।

সামান্য সময় মাত্র। তারপর আমার দৃষ্টি একটি কর্মীর দিকে আকর্ষণ করে বলল, দেখুন, গরম লোহার ছড় ঘুরন্ত চাকার কোণায় রেখে কেমন আগরের প্যাঁচ তৈরি হচ্ছে।

এরপর দেখুন ওদিকে আগরের মাথার মণিকে তেলে ডুবিয়ে টেম্পার করা হচ্ছে। এই টেম্পার বা পান চড়ানোর ব্যাপারটাতে আসল ওস্তাদি। ওখানেই মজবুত লোহার গোড়াপত্তন হচ্ছে।

বললাম, কিন্তু কোন লোহাতে কতখানি কার্বন আছে তা বোঝা যাবে কি করে?

কাঞ্চীদি বলল, ওটা যেমন আপনাদের ল্যাবরেটারিতে ধরা পড়ে তেমনি আমাদের এই সাদা চোখে ধরা পড়ে যায়। আমি অবশ্য লোহা ভেঙে বলতে পারি কত পার্সেন্ট কার্বন আছে, কিন্তু বাবা লোহার রড হাতে নিয়েই বলে দেন, কার্বন কম কি বেশি আছে। ওটা শিক্ষিত অভিজ্ঞ চোখের কাজ।

বললাম, আমার মত পুঁথি পড়া বিদ্যেতে ও জিনিস ধরা পড়বে না।

কাঞ্চীদি একপাশে পড়ে থাকা একটি আগর তুলে নিয়ে মাথার মণিটা দেখাল।

দেখুন, কার্বনের ভাগ লোহাতে বেশি হবার জন্যে মণির শেষ বিন্দুটা ভেঙে গেছে।

আবার ঐ পড়ে থাকা আগরের থেকে বেছে বেছে একটি তুলে এনে আমাকে দেখিয়ে বলল, এটাতে দেখুন কার্বনের ভাগ কম পড়েছে, তাই পরীক্ষার সময় কাঠ ছেঁদা করতে গিয়ে মণিটা বেঁকে গেছে।

এরপর কাঞ্চীদি আমাকে নিয়ে গেল একটা গুদাম ঘরে। সেখানে রেলে সাপ্লাইয়ের জন্যে আগর মজুত রাখা হয়েছে। পাশে পড়ে আছে কতকগুলো রেলের শক্ত স্লিপারের কাঠ।

কাঞ্চীদির ডাকে কারখানা থেকে দুটি লোক এসে দাঁড়াল। তারা আমার সামনে আগর দিয়ে কাঠ ছেঁদা করে দেখাতে লাগল।

কয়েকটা এমনি করার পরে আমি হেসে বললাম, এর কিছু দরকার আছে কি দিদি?

কাঞ্চীদি হেসে বলল, আপনি আমাদের সম্মানীয় ক্রেতা, আপনাকে সবকিছু পরীক্ষার ভেতর দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়াই আমাদের কাজ। তবে যখন দিদি বলে ডেকেছেন তখন নির্ভয়ে থাকতে পারেন। কষ্ট করে আর না দেখলেও চলবে।

বললাম, দেখলেন তো কেমন মন্ত্র জানি। এক ডাকেই কাজ উদ্ধার করে নিলাম।

কাঞ্চীদি বলল, এমন আগরও তৈরি করা যায় যাতে পাঁচশ কাঠ ছেঁদা করা যেতে পারে। কিন্তু তাহলে যে ভাই ব্যবসা অচল। তাই বিলিতি কোম্পানির পাঠানো মালের চেয়ে উৎকৃষ্ট মানের আগর দিয়েই আমদের থামতে হবে। অতি উৎকৃষ্ট দিতে গেলেই ব্যবসার গতি বন্ধ হয়ে যাবে।

হেসে বললাম, চলুন কাঞ্চীদি এখন ফেরা যাক। এখানে কারখানার শব্দে কানে তালা লাগার যোগাড়। তার চেয়ে ঘরে বসে জ্ঞান আহরণ করি।

কাঞ্চীদির গলায় অমনি সলজ্জ একটা সুর বেজে উঠল, কি যে বলেন ভাই। আপনারা হলেন এ বিষয়ে পণ্ডিত মানুষ, আর আমরা একেবারে হাতুড়ে। এই বাবার কাছে কাছে থেকে যতটুকু শেখা আর কি।

বললাম, বিনয় রাখুন কাঞ্চীদি, আমার মত পুঁথি পড়ে শেখা অনেক পণ্ডিতের জন্যে আপনি বেশ লাভের একখানা পাঠশালা খুলতে পারেন।

হাসতে হাসতে আমরা বেরিয়ে এলাম কারখানা থেকে।

দরজার বাইরে আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে কাঞ্চীদি ঢুকল অরিন্দমবাবুর ঘরে।

হঠাৎ আমার মনে একটা সন্দেহের ছায়া পড়ল। অরিন্দমবাবু আমাদের চেয়ে বয়সে ছোট কিন্তু কাঞ্চীদি কিছু আগে যখন ওঁর ঘরে একা ঢুকেছিল তখন উনি কাঞ্চীদিকে নাম ধরেই ডেকেছিলেন। কাঞ্চীদিও মুখে তর্জনি রেখে তাঁকে বারন করেছিল।

আমার কেবলই মনে হতে লাগল কোথায় যেন একটা রহস্য থমকে থেমে আছে। অথচ কাঞ্চীদির মুখের মধ্যে এমন একটা গভীরতা আর কমনীয়তার মিশ্রণ ঘটেছে যা একই সঙ্গে মানুষের শ্রদ্ধা আর ভালবাসা কেড়ে নিতে পারে।

এখন ভেতর থেকে কথাগুলো ভেসে এল।

কাঞ্চীদি বলল, তুমি আজ আমার কাছে খাবে অরিন্দম।

না।

কেন, কি হল তোমার? চাপা গলায় কাঞ্চীদি জিজ্ঞেস করল অরিন্দমকে।

কিছু নয়, এমনি।

বাবা যে সাতদিনের জন্যে বাইরে চলে গেলেন সে কথা কি তুমি জান?

জানি, তিনি আমাকে বলেছিলেন।

আজ তুমি আমার হাতে না খেলে কিন্তু ভারি কষ্ট পাব।

তোমার রান্না খেতে পেলে নতুন অতিথি খুশি হবেন।

কাঞ্চীদি মুখে সাবধান সূচক একটা শব্দ তুলে চুপি চুপি কি যেন বলল।

আমার দুটো কান তখন গরম হয়ে উঠেছে। বাইরের দরজা থেকে আমি পায়ে পায়ে কিছুটা দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ালাম। কাঞ্চীদি যেন কোন রকমেই ভাবতে না পারে যে আমি তাদের ব্যক্তিগত কথায় কান দিয়েছি।

তবু দুটো শব্দ অস্পষ্টভাবে আমার কানে ভেসে এল। প্রথমটা কাঞ্চীদির আর দ্বিতীয়টা অরিন্দমের।

গোঁয়ার।

জানই তো।

কিছু পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল কাঞ্চীদি। মুখখানা গম্ভীর। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ভারি অভদ্রের মত ব্যবহার করছি কিন্তু আপনার সঙ্গে। অতিথিকে একা রেখে চলে যাওয়া খুবই অন্যায় হয়েছে।

বললাম, অন্যায় হলেই তো হবে না, তার জন্যে শাস্তিরও একটা ব্যবস্থা আছে।

বলুন কি শাস্তি আমার প্রাপ্য?

বললাম, যদিও মনে হচ্ছে আমরা সমবয়সী তাহলেও আজ থেকে আপনি আমার কাঞ্চীদিই হয়ে রইলেন।

মনে হল, হয়ত বা আমার দেখার ভুলও হতে পারে, কাঞ্চীদি কথাটা শুনল, তারপর কেমন যেন তার ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল।

সামান্য সময় মাত্র। হঠাৎ মুখে হাসি টেনে বলল, আজ থেকে তাহলে আপনি আমার পাথর ভাই।

একটু চমক যে না লেগেছিল তা নয়। কিন্তু নতুন নামকরণের কারণটা আমাকে আর খুঁজতে হল না। কাঞ্চীদি বলল, নিটোল কালো পাথরে গড়া শরীর আপনার, তাই নামটা আপনি মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

বললাম, এই নামে ডেকে আপনি যদি খুশি হন, তাহলে আমিও খুশি। তবে একটি শর্ত!

জিজ্ঞাসু চোখের দৃষ্টি এবার কাঞ্চীদি আমার ওপর ফেলল।

বললাম, দিদি আর ভাইয়ের সম্পর্কে আপনিটা অবাঞ্ছিত।

কাঞ্চীদি বলল, ঠিক বলেছ, ওটা অচল।

বললাম, দেখলে তো কেমন বেঁধে ফেললাম তোমাকে। আর মাল বিক্রির ব্যাপারে ঠকাতে পারবে না কোনদিন।

হেসে বলল কাঞ্চীদি, ভয়ানক পাল্লায় পড়েছি যা হোক। এমন অভিসন্ধি আছে আগে জানলে কথাই বলতাম না তোমার সঙ্গে।

বললাম, কিছুতেই তুমি চুপ করে থাকতে পারতে না কাঞ্চীদি। তোমার স্বভাবের ভেতর চেপে থাকার ধর্মটা নেই। মেলে দেওয়াটাই তোমার স্বভাব।

ঘরে এসেও আমাদের গল্প থামল না।

এক একটি মুখ আছে যা মানুষকে কাছে টানে। সে মুখে ভালবাসার ছবিই যে কেবল ফোটে তা নয়, ভাললাগার মধুটুকু মাখানো থাকে। কাঞ্চীদির মুখখানা সেই গোত্রের। অনুজ্জ্বল রঙ কাঞ্চীদির, কিন্তু লাবণ্যের এতটুকু ঘাটতি নেই। নিটোল গড়নে কাজের মানুষের ভাবটা যেন উপচে পড়ছে! চোখের চাহনি গভীর, তবে তাতে লেগে আছে কেমন যেন একটা বিষণ্ণ ব্যথার ভাব।

কাঞ্চীদি গল্প করছিল তার ঠাকুরদাদার।

জান ভাই, এক সময় এই ঝালদার এক সম্পন্ন বাড়িতে ডাকাতি করতে আসে একদল সশস্ত্র লোক। ঠাকুরদাদা জানতে পেরেই তাঁর বিশ্বাসী কয়েকজন লোক আর হাতিয়ার নিয়ে ছুটে যান। শেষে ঐ ডাকাতের দলটি বিশেষ কিছু না নিয়ে পালাতে বাধ্য হয়।

শেষ রাতে চাঁদ উঠলে ঠাকুরদাদা তাঁর ঐ সঙ্গীদের নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলতে থাকেন। উদ্দেশ্য হল, ডাকাতদের যদি ঐ পাহাড়ি জঙ্গলে নাগাল পাওয়া যায়।

হলও তাই। ওঁরা চুপি চুপি গিয়ে দেখেন পাহাড়ের কোলে গভীর জঙ্গলে ডাকাতরা ঘুমিয়ে পড়েছে।

এ কেমন ব্যাপার! ডাকাতরা পালাবার পথে ঘুমে কাতর!

ঠাকুরদাদা গাছের আড়াল থেকে দেখলেন, যারা ঘুমোচ্ছে তাদের কারও বয়সই আঠার থেকে বিশ বাইশের বেশি নয়। চাঁদের আলোয় মনে হল, মুখের ওপর ভদ্রঘরের ছেলেদের ছাপ।

ওঁরা ওই দলটিকে ঘিরে ফেললেন। ধমকের সুরে বললেন, পালাবার কিংবা অস্ত্র হাতে নেবার চেষ্টা করলেই মাথা ফাটিয়ে দেব। চুপচাপ যে যেখানে আছ বসে থাক।

ঠাকুরদাদার ইঙ্গিতে একটা লোক ওদের ধারাল অস্ত্রগুলো কেড়ে নিল।

শেষে প্রশ্ন করে জানা গেল ওদের অধিকাংশই স্কুল কলেজের ছাত্র। সন্ত্রাসবাদীদের দলে নাম লিখিয়ে ডাকাতি করতে এসেছে।

একটি সতের আঠার বছরের ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমরা ডাকাতি করছি আমাদের মায়ের পায়ের বেড়ি ভেঙে সোনার চরণপদ্ম গড়ে দেব বলে। এ কাজে আমাদের কোন লজ্জা নেই। প্রাণ যাবে ভেবে নিয়েই আমরা এ কাজে নেমেছি। তবে তোমরা আমাদের হয়তো ধরতে পারতে না, যদি আমাদের দুটি বন্ধু মাথায় চোট লেগে কাহিল হয়ে না পড়ত।

তারপর ছেলের দল ধরা পড়েছে ভেবে চেঁচিয়ে উঠল, জয় ভারত মাতাকি জয়।

ওরা তো ব্যাপার স্যাপার দেখে তাজ্জব বনে গেছে ততক্ষণে।

ঠাকুরদাদা আর তার সঙ্গীরা ধরাধরি করে দুটি আহত ছেলেকে গোপনে নিয়ে এল ঘরে। অন্য ছেলেদের চলে যেতে বলল। কারণ ভিড় বাড়লে সবার নজরে পড়ে যেতে হবে।

বেশ কিছুদিন সেবা শুশ্রূষা করার পর ছেলে দুটি সুস্থ হল। ইতিমধ্যে ডাকাতদের ধাওয়া

করেছিলেন বলে সরকার ঠাকুরদাদাকে দু'শ টাকার পুরস্কার দিলে। ঠাকুরদাদা ঐ টাকায় ছেলে দুটির টিকিট কিনে দিলেন। বাকি টাকাটা সঙ্গে দিয়ে বললেন, নিয়ে যাও, ওটা তোমাদের দলের কাজে লাগবে।

পরে শুনেছি, ঠাকুরদাদার সঙ্গে ওদের গোপন যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। ঠাকুরদাদা নাকি ওদের বোমা তৈরির খোল, কিংবা পাইপ গান প্রভৃতি তৈরি করে দিতেন।

এই পরিবারটি সম্বন্ধে যতই জানতে পারছি, মন ততই নত হচ্ছে শ্রদ্ধায়। একটি পরিবার দু'পুরুষ একই মনের বৃত্তিগুলোকে লালন করে চলেছে একথা ভাবলেও মন সম্ভ্রমে ভরে ওঠে।

কাঞ্চীদি কথা বলছিল, আর আমি তাকিয়েছিলাম তার দিকে। তার কথা বলার ভঙ্গির ভেতর আড়ষ্টতা ছিল না, অথচ অকারণ উচ্ছ্বাসে অতিরিক্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখিনি তাকে।

ভাবছিলাম, মানুষের সঙ্গে পরিচয় কত সহজেই হতে পারে। কাল থেকে আজ, মাত্র এই কটি ঘণ্টার ভেতর একেবারে অপরিচিত দুটি মন কত কাছাকাছি এসেছে। মনে হচ্ছে পরস্পরের পরিচয়ের জন্য বিশেষ কোন প্রস্তাবনার দরকার হয় না। সহজ হতে পারলে যে কোন মনকে সহজেই ছুঁতে পারা যায়।

কথার ভেতর কাঞ্চীদি হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।

এই দেখ, কথায় কথায় রান্নার ব্যাপারটা একেবারে ভুলে বসে আছি। হ্যাঁ, শোন ভাই, আজ কি রান্না করব তোমার জন্যে?

একটু ভেবে বললাম, আজ না হয় বৌদ্ধ মতে হোক, কাল রাতে তো শাক্ত মতে হয়েছে। ঘন ঘন জীব বধ নাই বা করলে।

হেসে বলল কাঞ্চীদি, শাক্ত মতেই সুবিধা বেশি, বৌদ্ধ মতে করতে গেলে পদের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

বললাম, তোমার যেটাতে সুবিধে, আমার দুটোতেই অভ্যেস আছে। আমি পরম শাক্ত বাড়ির ছেলে। আমিষে অরুচি আমার কোনদিনই নেই।

এবার একটু সংকোচের ছবি চোখে ফুটিয়ে কাঞ্চীদি বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কোন দ্বিধা না রেখে জবাব দেবে তো?

অবশ্য, অবশ্য।

তুমি ভাই বামুনের ছেলে, কাল রাতে লুচি মাংসে সেরেছি, আজ দুপুরেও কি ময়দা চলবে?

হো হো করে হেসে উঠে বললাম, আমার বাবা ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ, আর মামা ছিলেন ম্লেচ্ছ। এ অবস্থায় বুঝে নাও আমার মতটা কি হতে পারে।

বড় গোলে পড়লাম ভাই।

বললাম, সংস্কৃত তো পড়নি, পড়লে জানতে, নরাণাং মাতুলক্রমঃ। মামার পথই উপযুক্ত ভাগ্নেরা অনুসরণ করে।

কাঞ্চীদি বলল, যাক কাল থেকে যে অসোয়াস্তিটা মনের মধ্যে ছিল তা ঘুচে গেল।

বললাম, দেখ কাঞ্চীদি আরও বলি, আমার গুরু বল আর ঠাকুরই বল একমাত্র রবিঠাকুর। যাঁর বাক্য আমার কাছে বেদবাক্য। তিনি বলে গেছেন, 'বামুন কি হয় পৈতে দিলে গলায়'। যেদিন থেকে এই বেদবাক্য পাঠ করেছি সেদিন থেকে পৈতে ছিঁড়ে গঙ্গায় ফেলে এসেছি।

কাঞ্চীদি বলল, বাহাদুর ছেলে সন্দেহ নেই, একালের কালাপাহাড়—বলে কাঞ্চীদি ভেতরে চলে গেল, আর আমি বাইরের দাওয়ায় বসে দূরের পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইলাম। রদ্দুরটা বেশ মিঠে লাগছিল। হাওয়ার ধার কমে আসছে। হাঁটুর ওপর পর্যন্ত রোদ এসে পড়েছে। আকাশটা বড় বেশি নীল মনে হচ্ছে। দুটো পাখি কোথা থেকে উড়ে এসে পাশের একটা শিরিষ গাছের পাতার ঘন সবুজে

ডুবে গেল। কাজ নিয়ে এসেছি, কিন্তু কোন কাজ নেই। এমন অবসর যাপন বড় একটা হয়ে ওঠে না।

কিছুক্ষণ পরে হলুদ মাখা হাতে বেরিয়ে এসে কাঞ্চীদি বলল, দুটো উনুনে রান্না চড়েছে, স্নান সেরে আসতে আসতেই আমার তৈরি হয়ে যাবে সব। কুয়োতলায় তেল সাবান রেডি।

বললাম, দারুণ কুড়েমিতে পেয়েছে কাঞ্চীদি, আমার হয়ে আর কেউ যদি স্নানটা সেরে নিত তাহলে বেঁচে যেতাম।

কাঞ্চীদি একমুখ হেসে বলল, এরপর বলবে না তো আমার হয়ে কেউ যদি খাওয়ার কাজটা সেরে নিত।

নৈব নৈব চ। এই ভোজনের ব্যাপারটাই কেবল আমার ব্রাহ্মণত্বকে আজও টিকিয়ে রেখেছে।

খেতে বসেছি, প্রায় আদ্দেক খাওয়া হয়ে গেছে, পাশে বসে পরিবেশন করছে কাঞ্চীদি, এমন সময় বাইরে কড়া নাড়ার আওয়াজ।

তাড়াতাড়ি উঠে গেল কাঞ্চীদি। দরজা খোলার শব্দ পেলাম। একটু পরে কথা ভেসে এল। অরিন্দমের গলা।

কই খেতে দাও।

তুমি আসবে আমি একেবারেই ভাবতে পারিনি।

আমি কিন্তু সত্যি না খেয়ে এসেছি।

তুমি যদি না খেয়ে এসে থাক তাহলে খাওয়াবার ভার আমি নিলাম। ঠকাতে পারবে না, এখনও আমার খাওয়া বাকি।

অরিন্দম বলল, কাউকে ঠকানো আমার কাজ নয়। তবে এটা জেনে রেখ, কাউকে বঞ্চিত করে আমি কিছু নিই না।

কাঞ্চীদি বলল, নিজে খেয়ে যতটুকু আনন্দ তার চেয়ে তোমাকে খাইয়ে আমার বেশি তৃপ্তিও তো হতে পারে।

অরিন্দম বলল, চল, ক্ষিদে পেয়ে গেছে।

ভেতরে আসতে আসতে চাপা গলায় বলে উঠল কাঞ্চীদি, না এলেও তো পারতে।

অরিন্দম বলল, চলে যাবার পথ থাকলে এ পথে আসতাম না।

আমার ঠিক সামনের দরজায় এসে কথা থেমে গেল অরিন্দমের।

আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, আসুন অরিন্দমবাবু। আমি কিন্তু আপনার অপেক্ষা না করেই বসে গেছি। কাঞ্চীদির পাকশালে আজ ভোজ্যবস্তুর অভাব নেই।

'কাঞ্চীদি' কথাটা বেশ জোর দিয়েই উচ্চারণ করেছিলাম। অরিন্দমের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, প্রথমে সেখানে একটা চমক লাগল আর ঠিক তার পরেই ফুটে উঠল কেমন এক ধরনের প্রসন্ন ভাব।

কাঞ্চীদি বলল, অরিন্দম, উনি আমাকে প্রথমেই দিদি বলে ডাক দিয়েছেন, সুতরাং আজ থেকে উনি আমার ভাই।

অরিন্দম অমনি বলে উঠল, তাহলে আজ থেকে উনি আমার বন্ধু।

আমি বললাম, খুব রাজি। বন্ধু পাওয়া দারুণ ভাগ্যের ব্যাপার।

খাওয়া দাওয়ার পাট আমার প্রায় চুকেই গিয়েছিল, বাইরের ঘরে এসে বসলাম।

ভেতরে কাঞ্চীদি আর অরিন্দম খেতে বসেছে।

ওদের দুজনের কথাবার্তাগুলো আজ সকাল থেকেই আমার কাছে বড় হেঁয়ালি ভরা বলে মনে হয়েছে। কি ওদের আসল সম্পর্ক তা আমার পক্ষে তখন অনুমান করা সম্ভব ছিল না।

ওরা ভেতরে খাচ্ছিল, আর খেতে খেতে কথা বলছিল। সে কথাগুলো অনুচ্চ ছিল, তাই বাইরের ঘরে কেবল একটা অর্থহীন মিশ্রিত ধ্বনি এসে পৌঁছচ্ছিল।

কতক্ষণ পরে সামনে এসে দাঁড়াল অরিন্দম। বলল, খুব কি ক্লান্ত আছেন?

বললাম, একটুও না।

পরের প্রশ্ন, দুপুরে আপনার বিশ্রামের অভ্যেস আছে?

হেসে বললাম, কেন বলুন তো, কিছু করতে হবে আমাকে? দিবা নিদ্রার ঘোরতর বিরোধী না হলেও শীতের দুপুরে ঘুমোবার একেবারেই দরকার হয় না।

অরিন্দম বলল, তাহলে চলুন, কোথাও বসে একটু গল্প করা যাক।

মনে মনে বললাম, এ জায়গাটা গল্প করার পক্ষে নিতান্ত অনভিপ্রেত নয়, মুখে বিশেষ উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, নিশ্চয় নিশ্চয়, কোথায় যেতে হবে চলুন।

অরিন্দমের সঙ্গে পথে এসে নামলাম।

পেছন থেকে কাঞ্চীদির ডাক শোনা গেল, এই যে আমি আসছি, একটু দাঁড়াও।

আমরা দাঁড়িয়ে কাঞ্চীদির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মনে মনে ভাবলাম, কাঞ্চীদি থাকলে মন্দ জমবে না।

একটু পরেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল কাঞ্চীদি, হাতে একখানা তুষের চাদর। আমার হাতে সেখানা ধরিয়ে দিয়ে বলল, এটা সঙ্গে নিয়ে যাও ভাই।

বললাম, এখন একটুও শীত করছে না। গায়ে তো আমার সোয়েটার রয়েছে।

যখন ফিরবে তখন দেখবে ঐ সোয়েটার অকেজো হয়ে গেছে।

কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে কাঞ্চীদির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হেসে বলল কাঞ্চীদি, যার পাল্লায় পড়েছ তার সঙ্গে ফিরতে গেলে রাত ভোর না হয়ে যায়। ওর সঙ্গে নির্ভয়ে হিসেব করে চলা অসম্ভব। তাই চাদরটা সঙ্গে দিয়ে দিলাম। সময়ে কাজে লাগতে পারে।

বললাম, এত ভয় পাইয়ে দিচ্ছ কেন? অরিন্দমবাবু নিশ্চয় ভয়ঙ্কর কিছু নয়।

অরিন্দম বলল, যে ভয় পায় তাকেই তো সবাই ভয় দেখায়। তুমি আমাকে ভয় পাও কাঞ্চী, তাই তোমাকে দেখাই যত ভয়ের খেলা।

মুহূর্তে কাঞ্চীদির মুখখানা ম্লান হয়ে গেল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম আমার সামনে নাম ধরে ডাকাতে কাঞ্চীদি খুবই বিব্রত হয়েছে।

পরিস্থিতিটাকে লঘু করে দেবার জন্য বললাম, বন্ধু অরিন্দম নিশ্চয়ই একজন যাদুকর, আর ভয়ের খেলা দেখানোতে ও সিদ্ধহস্ত। তোমার ওপর দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে এক্সপেরিমেন্টগুলো।

কাঞ্চীদি কোনকিছু মন্তব্য করল না। শুধু ফিরে যাবার সময় বলল, একা একা থাকতে ভাল লাগবে না, তোমরা তাড়াতাড়ি ফিরে এস।

অরিন্দম ডাক দিল, এস ভটচায।

আমি অরিন্দমের সঙ্গে ঝালদার পথ দিয়ে চলতে লাগলাম। পাহাড়ে ঘেরা এই অঞ্চলটি যে কোন নবাগতের চোখকে টেনে নেয়। মাঝে মাঝে পাহাড়ের তলায় ক্ষেতি। সবুজের সমারোহ। দূরে পাহাড়ের সবুজ বনরেখা নীল আকাশের সঙ্গে মিশেছে।

খাপরার ঘরগুলো উঠোনে দু একটা পেঁপে, পেয়ারার গাছ আর ইঁদারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দোতলা ঘর বড় একটা চোখে পড়ল না।

অনেকখানি পথ হেঁটে এসে কয়েকটা দোকান ঘর পাওয়া গেল। চা আর অনভিজাত কোম্পানির কিছু বিস্কুট নিয়ে এইসব দোকান। একটি দোকানে পান বিড়ির ব্যবস্থা রয়েছে দেখলাম।

অরিন্দমকে বললাম, তুমি পান খাও?

না ভটচায, কোনরকম পান দোষ আমার নেই। তবে তুমি খেতে পার।

বললাম, পানের ওপর আমার আসক্তি থাকলেও বিশেষ পানীয়ের ওপর নয়।

দুটো পান কিনে মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে চললাম।

অরিন্দম চলতে চলতে বলল, এই ঝালদা জায়গাটার প্রেমে পড়ে গেছি ভটচায।

বললাম, সত্যি জায়গাটাকে সুন্দর বললেও যেন সবটুকু বলা হয় না। এর ভেতর আশ্চর্য এক আকর্ষণ আছে।

অরিন্দম বলল, ঐ একটি কথা একেবারে খাঁটি বলেছ, আকর্ষণ, দুর্বার আকর্ষণ।

বললাম, তুমি নিশ্চয়ই এখানকার আদি বাসিন্দা নও।

কি করে বুঝলে!

বললাম, তোমার ভাষাই তোমাকে পুরুলিয়া থেকে পৃথক করে দিচ্ছে।

অরিন্দম বলল, আমরা বহুকাল পাটনার বাসিন্দা, তবে আদি বাড়ি ছিল নদীয়ায়।

বললাম, কিছু যদি মনে না কর তাহলে একটা কথা জিজ্ঞেস করি।

অরিন্দম বলল, বন্ধুর কাছে সংকোচের কিছু নেই।

বললাম, তুমি কিসের আকর্ষণে এখানে এসেছ? সরকার টুল কোম্পানির চাকরির জন্যে বলে তো আমার মনে হয় না।

হাসল অরিন্দম। বলল, সে অনেক কথা। পথে দাঁড়িয়ে বলা যাবে না। চল আমার আস্তানায়, সেখানে বসে বসে সব কথা হবে।

ঝালদার প্রায় একটা প্রান্তে ওর ডেরা। ঘরে আসবাবের মধ্যে একটি খাটিয়া আর তোরঙ্গ জাতীয় কিছু একটা। কাল রাতে ও যে শুয়েছিল তার সব প্রমাণ বর্তমান। মশারি পড়ে আছে, তোলা পর্যন্ত হয়নি।

আমরা ঢুকলাম, আর ও কাজ শুরু করে দিল। মশারি তোলা হল, ছড়ান লেপখানা স্তূপাকার করে একপাশে সরান হল।

বস ভটচায, আমার অবস্থাটা বরাবরই একরকম।

বললাম, যথার্থ আইবুড়োদের আস্তানা। আর তুমি তাদের সম্রাট সন্দেহ নেই।

বলল অরিন্দম, সংসার করা টরা আমার দ্বারা আর হবে না ভট্চায। তবে পাশে একটি বিশেষ মহিলা না থাকলেও জীবন অচল।

বললাম, তোমার শেষ কথাটা একশোবার সত্যি। প্রকৃতি ছাড়া পুরুষ, একেবারে ভাবাই যায় না।

ও হাসল। তারপর বলল, ঐ যে দূরের পাহাড়টা, ভট্চায ওটা ঠিক যেন আমারই প্রতিমূর্তি। দূর দিগন্তের ধূসর আকাশটা যদি ধর একখানা আয়না, তাহলে ঐ ন্যাড়া পাহাড়টা আমার অবিকল প্রতিবিম্ব।

একটু থেমে বলল অরিন্দম, ঐ একা পাহাড়টা ঝাঁ ঝাঁ রোদে যেন চৌচির হয়ে ফেটে যায়। আবার অসহ্য শীতের হাওয়া নির্মম চাবুক চালায় ওর উলঙ্গ শরীরটার ওপর। ভট্চায, ঐ ন্যাড়া পাহাড়টাও স্বপ্ন দেখে। হয়ত একদিন পৃথিবীর গভীর থেকে একটা জলের উৎস ওর বুক চিরে বেরিয়ে আসবে। সেদিন ওর সব কষ্ট, সব চাওয়া সার্থক হবে। ও সেদিন স্বপ্ন দেখবে সবুজ একটা জীবনের। ভাবতেও রোমাঞ্চ লাগে, তাই না ভট্চায!

আমি একটু নিবিষ্টভাবে তাকিয়ে বললাম, পাহাড়টার ওপর কালো দু'চারটে ডাল ছড়িয়ে ঐ পলাশ গাছটা নিশ্চয় ফুল ফোটায়।

আমি জানি ভট্চায ওটা ফুল নয়, আগুন। ওর অতৃপ্ত বাসনাগুলো রাঙা আগুন হয়ে জ্বলে।

তুমি একেবারে কবি অরিন্দম, কারখানায় তোমাকে একটুও মানায় না।

অরিন্দম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সব মানুষই অন্তরে কবি ভট্চায। প্রেম আর দুঃখ মানুষকে কবি করে তোলে।

বললাম, কথাটা মিথ্যে নয়। যে এমনিতে ভাষা লিখতে পারে না, প্রেমের চিঠি কিন্তু তার কলমেও আশ্চর্য সুন্দর হয়ে ফোটে।

আবার বললাম, অরিন্দম, মনে হয় কোন একটা দুঃখকে তুমি মনের ভেতর চেপে রেখেছ, তাই আজ তোমার কথাগুলো এমন সুরে বাজছে।

অরিন্দম বলল, অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে কিন্তু তেমন শোনবার লোক পাই কোথা। অনেক সময় নিজের ভেতরের চাপা কথাগুলো এত ভারী বলে মনে হয় যে বইতে পারি না।

সোজাসুজি একটা প্রশ্ন করে বসলাম অরিন্দমকে, তুমি কি কাউকে ভালবাস অরিন্দম?

অত্যন্ত স্পষ্ট উত্তর অরিন্দমের, ভালবাসি না বললে মিথ্যে বলা হয়। আর ধরে নিতে পার ঐ ভালবাসার টানেই পাটনা থেকে পুরুলিয়ার এই অঞ্চলে এসে পড়েছি।

বললাম, সে ভালবাসা কি সম্পূর্ণ করে পেয়েছ অরিন্দম?

এখনও পাইনি, আর এই কথাটুকু তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই ভট্চায।

একটুও দ্বিধা না করে বললাম, আমার জীবনেও ভালবাসা এসেছে অরিন্দম, তাই ভাল যারা বাসে তাদের মুখগুলো আমার চেনা।

অরিন্দমের চোখ জানালার বাইরে দিগন্ত ছুঁয়ে আছে। আমি জানি ও চোখ দিগন্তের কোথাও নেই, ওর মনের অতলে ডুবে আছে।

কতক্ষণ পরে ও যেন অনেক দূরের একটা জগৎ থেকে সামনে এসে দাঁড়াল। ভট্চায, ভালবাসার যে পথটা ধরে চিরকাল সকলে চলে আমার চলার পথটা তার থেকে অনেক দূরে। শুধু দূরে নয়, বোধকরি দুর্গমও।

এবার সোজাসুজি বললাম, পাটনাতেই কি আলাপ তোমার কাঞ্চীদির সঙ্গে?

অরিন্দম কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি খুবই বুদ্ধিমান ভট্চায।

হেসে বললাম, এ জন্যে বিশেষ বুদ্ধির দরকার পড়ে না অরিন্দম। যেভাবেই ডাকো না কেন প্রেমের ভাষার উচ্চারণ এক।

অরিন্দম বলল, কাঞ্চীকে আমি ভালবাসি।

বললাম, তোমাদের বিয়েতে বাধা কোথায়?

অরিন্দম বলল, দুটো সমান্তরাল রেখার মিলনে যতটা বাধা। একান্ত পাশাপাশি থেকে দুটি রেখা অনন্তকাল ধরে মিলনের আশা নিয়ে ছুটে চলবে, কিন্তু মিলন কি তাদের সম্ভব ভট্চায?

কতক্ষণ কিছু বলতে পারলাম না। একসময় ও নিজেই শুরু করল, পাটনায় আমাদের বাড়িতে থেকেই কাঞ্চী পড়াশুনা করেছে। সরকার কাকা আর আমার বাবা ছিলেন বিলেতে সহপাঠী। সেই সুবাদে কাঞ্চী কলেজে পড়ার সময় পাটনায় আমাদের বাড়িতেই ওঠে। আমি তখন স্কুলের ওপর ক্লাশের ছাত্র। মাঝে মাঝে ওর কাছে পড়া বুঝিয়ে নিতে মা পাঠাতেন। আমার কিন্তু আত্মসম্মানে কেমন বাধত। একে কাঞ্চী মেয়ে, তার ওপর আমি আবার স্কুলের সেরা ছেলে। আমি ওর কাছে না গিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতাম।

কাঞ্চী একদিন আমাকে ডেকে বলল, অরিন্দম, তুমি পালিয়ে বেড়াও কেন?। জেঠাইমা ভাববেন আমি ইচ্ছে করে তোমাকে পড়া বুঝিয়ে দিই না।

স্পষ্ট বললাম, তোমার কাছে পড়তে আমার একটুও ইচ্ছে করে না।

ও ঠিক এ ধরনের কথা শোনার জন্যে তৈরি ছিল না। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে কি ভাবল, তারপর নিজের ঘরে চলে গেল।

—এরপর আমি ওর সঙ্গে কথা বলাই প্রায় ছেড়ে দিলাম। আমি বেশ বুঝতে পারতাম, কাঞ্চী দূর থেকে আমাকে লক্ষ্য করছে।

ভট্চায, আজ যখন সেদিনের কথাগুলো ভেবে দেখি তখন মনে হয়, আমার অবচেতন মন ওকে প্রথম থেকেই চাইত, তাই ওর কাছে কোন দিক থেকেই যে আমি ছোট তা বুঝতে দিতে চাইতাম না।

স্কুলের শেষ পরীক্ষায় আমি স্কলারশিপ পেলাম। সারা বাড়িতে যেন শীতের পর প্রথম দক্ষিণের

বাতাস বয়ে গেল। বাবা মা সকলের মনেই একটা তৃপ্তির ভাব। আমি তখন প্রায়ই কাঞ্চীর মুখের দিকে তাকাই। ও কিন্তু চোখাচোখি হলেই মুখ নামিয়ে নিত।

একদিন আমার স্কলারশিপ পাবার উপলক্ষে বাড়িতে বড় রকমের একটা আনন্দ উৎসব হল। সারাদিন চলল আয়োজন। সন্ধ্যায় এলেন শহরের মান্যগণ্য লোকেরা। সপরিবারে এলেন বহু বাঙালী। অনেক রাত অবধি খাওয়া-দাওয়া হৈ হুল্লোড় চলল। আমি দেখলাম, মায়ের সঙ্গে অতিথিদের সমানে পরিবেশন করে গেল কাঞ্চী।

রাত তখন প্রায় বারোটা। সব মিটে গেছে। অতিথিরা চলে গেছেন। আমি খেয়ে বিছানা নিয়েছি। মায়ের গলা শুনতে পেলাম, সারাদিন কি খাটুনিটাই না গেল মাথার ওপর দিয়ে, মাথাটা যে ফেটে যায়নি এই যথেষ্ট, তুমি মা একমুঠো খেয়ে নেবে চল।

কাঞ্চীর গলা শুনতে পেলাম, জেঠাইমা, একটুও খাবার ইচ্ছে করছে না, গাটা ভীষণ গুলিয়ে উঠছে, আজ বরং এক গ্লাশ ঠাণ্ডা জল খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ি। কাল সকালে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যাবে।

মা কি যেন বললেন বোঝা গেল না। কিছুক্ষণ পরেই মায়ের পায়ের সাড়া সিঁড়িতে মিলিয়ে গেল।

আমার আর কাঞ্চীর পড়ার ঘর ছিল প্রায় পাশাপাশি। আমাদের যে যার পড়ার ঘরেই ছিল শোয়ার ব্যবস্থা। আমি বিছানায় শুয়ে শুয়েই দেখলাম কাঞ্চী তার ঘরের জানালার রেলিং ধরে বাইরের গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছে।

চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলাম কিছুক্ষণ। আবার চোখ খুলে দেখি কাঞ্চী তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। এক সময় রাত একটা বাজল বারান্দার ঘড়িতে।

আমি বিছানায় উঠে বসলাম। তাকালাম ওর দিকে। তারপর প্রায় নিঃশব্দে পা টিপে টিপে ওর একটু দূরে এসে দাঁড়ালাম। ও গঙ্গার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে কি ভাবছিল জানি না। এক সময় আমি বলে উঠলাম, খেলে না যে?

সাপের ছোঁয়া লাগলে মানুষ যেমন ত্রাসে লাফ দিয়ে দূরে সরে যায়, আমার কথা শুনে সে ঠিক তেমনি ছিটকে জানালা থেকে দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াল।

আবার বললাম, তুমি খাওনি কেন, আমাকে পছন্দ কর না, তাই?

ও আমার কাছাকাছি সরে এসে প্রায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, তুমি আমার কথা ভেবেছ তাতেই আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

বললাম, না, তাতে খাওয়া হয়নি। খাওয়া আর ভাবনা এক নয়।

ও বলল, খাবার ঘরে এখন চাবি পড়েছে, দয়া করে আমাকে শুতে দাও।

বললাম, শুতে তো আমি তোমাকে বারণ করিনি, বিছানা পড়ে আছে, ইচ্ছে করলে অনায়াসেই শুতে পার।

ও দাঁড়িয়ে রইল তেমনি।

বললাম, সারারাত আমি এখানে দাঁড়িয়ে রইলে তুমিও কি এমনি করে দাঁড়িয়ে থাকবে?

ও কেমন যেন চমকে উঠল বলে মনে হল। জানালা দিয়ে এক ফালি চাঁদের আলো ঘরে এসে পড়েছিল, তাতে দেখলাম ওর চোখ দুটো ছল ছল করছে।

হঠাৎ ও আমার দুটো হাত ধরে ফেলে বলল, দোহাই তোমার অরিন্দম, আমাকে একা থাকতে দাও, তোমার কাছে মিনতি জানাচ্ছি।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল আমার বুক ঠেলে।

মাথা নীচু করে পায়ে পায়ে বেরিয়ে এলাম ওর ঘর থেকে।

সে রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি একটি আশ্চর্য স্বপ্নের জাল মনে মনে বিছিয়েছিলাম। তাতে ধরা পড়েছিল একটি হরিণী। সকালে উঠে দেখি সে হরিণী পালিয়ে গেছে।

বললাম, অরিন্দম, ভালবাসা ভালবাসাই, তাকে বোধকরি বয়সের কৃত্রিম বাঁধ দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না। প্রবল ঢেউ সব বাঁধকেই বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

তারপর শোন ভট্‌চায, আমার সেই অধরা হরিণীর কথা।

কলেজ ছুটি হয়ে গেল কি একটা উপলক্ষে। দুপুর দুটো। আমি ফিরছিলাম, পথে ওর সঙ্গে দেখা।

মুখটা নামিয়ে নিয়েছিলাম, ও পাশে এসে দাঁড়াল।

কথা আছে অরিন্দম।

বললাম, কথাটা কি এই পথের ওপর বলতে চাও?

ও বলল, চল গঙ্গার দিকে যাই।

আমরা হেঁটে এলাম গঙ্গার ধারে। দুপুরে গঙ্গার তীর প্রায় নির্জন। নীচে দেখলাম, একটা নৌকো বাঁধা। এ নৌকোর মালিক আমার চেনা লোক। আমরা বন্ধুরা কতদিন মালিককে পয়সা দিয়ে এই নৌকোটায় গঙ্গা পার হয়ে ওপারের চরে গেছি।

বললাম, একটা অনুরোধ রাখবে?

বল।

ওপারে যেতে আপত্তি আছে? ভয় নেই, আমি আনাড়ী নই, নৌকো ডুববে না।

ও কিছু না বলে আমার পিছু পিছু নৌকোয় এসে উঠল।

গঙ্গার জল যেন ঝলমল করছে। সূর্যের আলো, ঢেউয়ের মাথায় মাথায় কমল হীরের মুকুট পরাচ্ছিল। দূরের চরটা এগিয়ে আসছিল ক্রমশঃ। একটা রূপোর পাতের মত ঝকমক করছিল বালির চরটা।

ও হঠাৎ বলল, তুমি আমাকে দিদি বলে ডাক না কেন অরিন্দম?

আমার হাতের বৈঠা থেমে গেল। শুধু নৌকোয় ঘা লেগে স্রোতের জলের ছলছলানির শব্দ।

একটুক্ষণ মাত্র।

বললাম, তুমি আমার দিদি নও বলে।

তবে আমি কে?

বললাম, তুমি কাঞ্চী।

বিশ্বাস কর ভট্‌চায, কাঞ্চীর এমন রূপ আমি কোনদিন দেখিনি। চোখের পাতা পড়ছে না। বড় বড় ডাগর দুটো চোখ আমার মুখের ওপর পেতে কতক্ষণ ও তাকিয়ে রইল। ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

মানুষের বিস্ময়ের এমন অভিব্যক্তি আর কোনদিন আমার চোখে পড়েনি।

ওর অবস্থা দেখে বললাম, মনে হচ্ছে ঐ চরে যাবার ইচ্ছে আর তোমার নেই, তা হলে ফেরাই নৌকো?

ওর মুখে কথা এল, না, যেখানে যেতে চাইছ সেখানেই চল।

বৈঠার ঘায়ে স্রোত ভেঙে ভেঙে একসময় চরে এসে পৌঁছলাম।

ওকে বললাম, আমার ব্যাগটা একটু ধরবে কি, নৌকোটা বাঁধতে হবে এখন।

ও দম দেওয়া পুতুলের মতে হাত বাড়িয়ে আমার বইগুলো ধরে নিল। আমি লাফ দিয়ে নীচে নেমে নৌকোটা বেঁধে ফেললাম। হাত বাড়িয়ে ওর কাছ থেকে ব্যাগটা নিলাম।

তারপর বললাম, আমার হাত না ধরলে তোমার পক্ষে চরে নামা কিন্তু সম্ভব হবে না।

ও হাত বাড়াল। সেই আমি প্রথম একটি রোমাঞ্চিত মুহূর্তে ওকে স্পর্শ করলাম।

চরে ওকে নামতে হল আমার ওপর আংশিক দেহের ভার রেখে।

নির্জন চর। বাঁদিকে কিছু দূরে ইজারাদারের ক্ষেতির সবুজ দেখা যাচ্ছে। ভুট্টার লম্বা লম্বা পাতাগুলো ওদিকে বাঁক নেওয়া গঙ্গাকে আড়াল করে রেখেছে। এক একবার বাতাসে পাতাগুলো নড়ে উঠছে, আর রূপোর হাঁসুলীর মত গঙ্গা ঝিকিয়ে উঠছে।

কতকগুলো পাখি মাথার ওপর দিয়ে ঝগড়া করতে করতে উড়ে গেল।

আমি পাখিগুলোর দিকে তাকিয়েছিলাম, ফিরে দেখি ও গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে আছে।

বললাম, পড়া বুঝিয়ে দেবে না?

ও চমকে ফিরে তাকাল। জিজ্ঞাসু চোখ মেলে আমার প্রশ্নটা ভাল করে জেনে নিতে চাইল।

আমি স্পষ্ট করে বললাম, একদিন তুমি অভিযোগ করেছিলে আমি কেন তোমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াই, কেন পড়া বুঝিয়ে নিই না। তাই আজ সব পড়া একসঙ্গেই বুঝে নিতে চাই।

কাঞ্চীর গলায় অত্যন্ত ধীর সংযত একটা সুর বাজল, বোস অরিন্দম আমার পাশে। আজ আমারও কিছু বলার আছে।

আমরা সম্ভাব্য দূরত্ব রেখে বসলাম। আমি তাকালাম ওর মুখের দিকে।

ও বলতে লাগল, সমাজে বাস করে যে সব মানুষ তাদের কতকগুলো আচরণ বিধি আছে। আর সেই নিয়মগুলোকে তাদের মেনে চলতে হয়।

বললাম, তুমি তোমার কথা বলছ, না আমাকে সমাজতত্ত্ব থেকে পড়া বলে দিচ্ছ, তাই আগে বল?

ও একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বলে চলল, বাধা তুমি দিতে পার অরিন্দম কিন্তু বলতে আমাকে হবেই।

চুপ করে গালে হাত দিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কাঞ্চী বলল, তোমার বাড়ীতে আমি যে স্নেহ ভালবাসা পেয়েছি, তুমি নিশ্চয়ই তা কেড়ে নিতে চাওনা অরিন্দম। তোমার বাবা মা আমাকে নিজের মেয়ের মত কাছে রেখেছেন, আমি এমন কিছু কাজ করতে পারি না যাতে তাঁরা মনে আঘাত পান, অথবা আমার বাবার মাথা হেঁট হয়ে যায়।

বললাম, আমি তোমাকে ভালবাসি, এ কথাটা ভাবতে বা উচ্চারণ করতে কি দোষ থাকতে পারে তা বুঝে উঠতে পারি না। আমি তো যতটুকু জানি, একটি মেয়ে আর একটি ছেলে উভয়কে নিবিড়ভাবে ভালবাসতে পারে। আর সেটাই তো স্বাভাবিক।

কাঞ্চী আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, তা হয়ত ঠিক তবে একথা জানো বয়েসের দিক থেকে আমি তোমার চেয়ে বড় আর পদবীটা এক হলেও জাতটা আমাদের এক নয়।

বললাম, আজ যখন বড় বড় নেতারা জাতিভেদের বিরুদ্ধে কথা বলছেন তখন আমাদের পৃথক জাতি কোন সমস্যাই নয়। এরপর বাকী থাকে বয়সের তফাতটা। আমি ঐ চিরকালের নিয়মটা মানি না কাঞ্চী।

তোমার দিদিকে নিশ্চয়ই তুমি এ ধরনের একটা অসামাজিক কথা বলতে পারতে না অরিন্দম। ভেবে নাও আমি তোমার দিদি।

বললাম, তা ভাবতে পারছি না কাঞ্চী। আর তুমি তো আমার সত্যিকারের দিদি নও।

এখন কি করতে চাও তুমি অরিন্দম স্পষ্ট করে বল?

কাঞ্চীর গলা ক্ষোভে দুঃখে কেঁপে উঠল।

বললাম, তোমার আপত্তি না থাকলে তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

যদি বলি আমার এতে সম্মতি নেই।

বললাম, তাহলে তো চুকে বুকেই গেল। এখন ওঠ তবে নৌকোয়, যেখানকার মানুষ সেখানে দিয়ে আসি।

কাঞ্চীর কাছে ফিরে যাবার প্রস্তাব দিলাম, কিন্তু ওর কাছ থেকে বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ও যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল। মনে মনে কতক্ষণ ধরে কি সব ভেবে চলল।

এক সময় বললাম, কি বসে রইলে যে, ওপারে যাবে না?

ও হাঁটুর ওপর থেকে মুখ তুলে বলল, তুমি আমাকে এই মুহূর্তে এখান থেকে কোথাও নিয়ে চলে যেতে পার? সংসার সমাজ বাড়ি ঘর সব পেছনে ফেলে?

বললাম, তুমি কি পাগল হলে কাঞ্চী। ঘর সংসার, বন্ধুবান্ধব ফেলে পালাতে যাব কোন দুঃখে, আমি তো ডাকাত বা লুঠেরা নই যে লুঠের জিনিস নিয়ে পালিয়ে বেড়াব।

কাঞ্চী বলল, তুমি তাদের চেয়েও সাংঘাতিক, তুমি খুনে, ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করতে পার।

ওর হাত ধরে টেনে তুললাম। বললাম, তাকিয়ে দেখ, আমাকে খুনি বলে মনে হচ্ছে?

আমার হাতে ওর হাত বাঁধা রইল, ও দুচোখ মেলে আমাকে দেখতে লাগল।

আমি দেখলাম, দুটো শ্বেত পদ্মের পাপড়ি জলে ভরে উঠল, তারপর একসময় টলমল করতে করতে উপচে পড়ল।

ও মাথা নেড়ে শুধু বলতে লাগল, হয় না, হয় না, এ কিছুতেই হয় না। আমি যাকে ভালবাসব, সারা সমাজ তাকে ঘৃণা করবে তা কখনো আমি সইতে পারব না অরিন্দম। ক্ষমা কর ক্ষমা কর। আমাকে এমন করে ভেঙে দুমড়ে দিও না। মনে হচ্ছে আমার এতদিনের সব জোরটুকু এই মুহূর্তে নিঃশেষ হতে চলেছে। তুমি আমার হাতখানা জোর করে ধর অরিন্দম। ফিরিয়ে নিয়ে চল আমার এতদিনের আশ্রয়ে, যেখানে আমি আমার পায়ের তলায় পুরোনো শক্তিটুকু ফিরে পাব।

ও থর থর করে কাঁপছিল। ওকে হাত ধরে নৌকোয় এনে তুললাম। নদী পার হয়ে যখন পথে উঠল তখন বললাম, নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয় পেলে তো?

ও মাথা নীচু করে হাঁটতে হাঁটতে বলল, আজ থেকে আমি ঘর ছাড়া অরিন্দম।

একটু থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, বুঝিয়ে বলবে কি?

বলল, যে ঘরের ভিত একবার ভূমিকম্পে নড়ে যায় সে কি আগের মত শক্ত থাকতে পারে অরিন্দম।

বললাম, তোমাকে কষ্ট দিয়ে থাকলে জেনো কাঞ্চী, আমিও কম কষ্ট পাইনি।

এই ঘটনার পর দুটো বছর কাঞ্চী আমাদের পাটনার বাড়িতে ছিল। তুমি শুনলে হয়তো অবাক হবে ভট্‌চায, সাকুল্যে চার পাঁচটা দিনের বেশি কথার বিনিময় হয়েছে কিনা সন্দেহ।

যেদিন নৌকোয় করে চরে গিয়েছিলাম ঠিক তার পরের দিন রাতে আমি শুয়ে আছি, চোখ দুটো বন্ধ, তবে গভীর ঘুমের ভেতর তখনও ডুবে যাইনি, হঠাৎ আমার ঘরে কার যেন পায়ের সাড়া পেলাম।

শোবার সময়ে আমার যে হাতখানা চোখের ওপর দিয়ে কপাল ছুঁয়েছিল তার আড়াল থেকে দেখলাম, কাঞ্চী পা টিপে টিপে আমার ঘরে ঢুকছে।

আমি চুপচাপ বিছানায় পড়ে রইলাম। ও আমার বিছানার পাশে এগিয়ে এল, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল আমার দিকে তাকিয়ে তারপর অতি সন্তর্পণে গিয়ে দাঁড়াল জানালার পাশে।

আমি দেখলাম, এক ফালি চাঁদের আলো ওর গা ছুঁয়ে লুটিয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। মনে হল ওর আঁচল খানাই লুটিয়ে পড়ে আছে। ইচ্ছে করছিল ওকে সেই মুহূর্তে টেনে আনি আমার নিজের কাছে, কিন্তু ও নিবিষ্ট হয়ে তাকিয়েছিল রাতের গঙ্গার দিকে। কতক্ষণ এমনি তাকিয়ে রইল ও। ওর ধ্যান ভাঙাতে চাইলাম না। মনে হল, কাঞ্চী ঐ গঙ্গার স্রোত ঠেলে নৌকোয় করে চলেছে কালকের সেই চরের খোঁজে, যেখানে ওর সামনে অভিনীত হয়েছিল অভাবনীয় এক নাটক।

কতক্ষণ পরে ওর যেন ধ্যান ভাঙল। ও ফিরে তাকাল আমার দিকে, তারপর ধীর পায়ে যেমন এসেছিল, তেমনি বেরিয়ে যেতে লাগল।

আমি পেছনে থেকে ডাক দিয়ে বললাম, কিছু না বলেই চলে যাবে?

ও চমকে পেছন ফিরে তাকাল। দেয়ালে সারা দেহের ভারটা রেখে ওপরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ।

আবার বললাম, কিছু বলবে?

মনে হল ওর মাথাটা একবার নড়ে উঠল। না কিছু বলতে চায়না ও। আবার ওর চোখদুটো কিছু না দেখার জগতে স্থির হয়ে রইল। ও কিন্তু সরে গেল না ওখান থেকে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরে টেনে আনলাম জানালার পাশে। মনে হল, ওর দেহে যেন প্রতিরোধের এতটুকু ক্ষমতা নেই। শরতের একটুকরো ভারহীন মেঘের মত ও থমকে দাঁড়াল জানালার ধারে।

বললাম, আমি কি এত অপরাধ করেছি যে তুমি আমার সঙ্গে একটিও কথা বলবে না। কালকের ঘটনা যদি তোমার মনে আঘাত দিয়ে থাকে তাহলে আমি বারে বারে তার জন্যে মাপ চেয়ে নিচ্ছি কাঞ্চী।

ওর মুখে কথা এল। আমার চোখের ওপর দুটো চোখের স্থির দৃষ্টি ফেলে ও বলল, তুমি আমার একটা কথা রাখবে অরিন্দম?

কিছু না ভেবেই বললাম, রাখব।

কাঞ্চী বলল, আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই, আর চলে গেলে তুমি দুঃখ পাবেনা বল?

আমার গলায় বেজে উঠল আকুতি। বললাম, আমি যদি তোমার চলে যাবার কারণ হয়ে থাকি তাহলে অপরাধীকেই প্রথমে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়।

কাঞ্চী বলল, দেখ অরিন্দম, কালকের ঘটনার পর দুজনে পাশাপাশি থাকব একই বাড়িতে, এ কি করে সম্ভব তা ভেবে পাচ্ছি না।

বললাম, এস আমরা কালকের দিনটাকে আমাদের জীবনের পাতা থেকে বাদ দিয়ে দিই।

কাঞ্চী অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। অন্য মনে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একসময় বলল, আচ্ছা অরিন্দম, যদি এমন হয় আমরা নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলব না। তারপর যখন তুমি জীবনে লেখাপড়ার পর প্রতিষ্ঠিত হবে, কেবল তখনই কথা বলব।

বললাম, তোমার কথাতে আমি রাজি আছি কাঞ্চী, তবে তোমাকেও একটি কথা দিতে হবে।

বল?

যেদিন আমি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হব, সেদিন তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াবে। প্রতীক্ষা করবে সে দিনটির জন্যে আজ এই মুহূর্ত থেকে।

ও প্রথম সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল। তারপর অস্ফুট গলায় বলল, সেই হবে অরিন্দম। আজ থেকে তোমার ইচ্ছাই হবে আমার ইচ্ছা।

তারপব ভট্‌চায আমরা কথা রেখেছিলাম আমাদের। দু'বছর পরে ও ওর পড়া শেষ করে পাটনা থেকে চলে এল ঝালদায়। আমি যে কি কষ্টে কাটিয়েছি ওকে ছেড়ে তা বলে শেষ করতে পারব না। ওর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ ছিল ঠিক, কিন্তু ও ছিল এতদিন আমাব চোখের ওপর। যেই চলে গেল অমনি শূন্যতার অসহনীয় অবস্থাটা বুঝতে পারলাম।

যাবার দিন একটি মুহূর্তমাত্র কাছে পেয়েছিলাম। ও রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলে গেল ক'টি কথা, আমাদের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলিনি অরিন্দম, যেখানেই থাকি না কেন আমার এ প্রতীক্ষার শেষ তুমিই ঘটাবে।

বলেছিলাম, তোমার কাছেই আমাকে যেতে হবে কাঞ্চী, তবে অযোগ্য অক্ষম হয়ে যাব না।

কাঞ্চী চলে গেল, আর আমি পড়াশোনার মাঝে ডুবে রইলাম। ইউনিভারসিটির পড়া শেষ হল এক সময়। রিসার্চের কাজ শুরু করলাম। আমার রিসার্চের বিষয় হল, প্রাচীনকালের মরিচা নিরোধক লৌহের প্রস্তুত প্রণালী।

এ বিষয়টি বেছে নিয়ে আমি সারা ভারতের প্রাচীন লৌহ স্তম্ভগুলি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। শেষে এখানে চলে এলাম সরকার কাকার কাছে। আমি জানি, সারা ভারতে এ বিষয়ে অথরিটি যদি কেউ থাকেন তাহলে একমাত্র সরকার কাকাই।

বাবাকে বলে চলে এলাম ঝালদায়। ওকে চোখের সামনে পাব এই এক তীব্র উত্তেজনা আমার মনে। সরকার কাকা আমাকে পেয়ে খুব খুশি হলেন। কিন্তু কাঞ্চীর চোখের আলো এ ক'বছরে মনে হল কেমন যেন একটু নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। এ আমার দৃষ্টির ভুল হতে পারে ভট্‌চায, আর তাই যেন হয়, কিন্তু আমি ওকে আর তেমন করে পাচ্ছি না কেন।

একটু ভেবে অরিন্দম বলল, হয়ত এমনও হতে পারে, ওর বাবার বিরাট ব্যক্তিত্ব এ ক'বছরে ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আমি জানি, এ একান্ত স্বাভাবিক। মা হারা মেয়ে কাঞ্চী, বাবার সমস্ত মনটা জুড়ে বসে আছে ও। তাছাড়া সরকার কাকার সংস্পর্শে থেকে কারো পক্ষে তাঁর প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব।

বললাম, তুমি ঠিক বলেছ অরিন্দম, পরিচয়ের আগেই মানুষটির যে পরিচয় আমি পেয়েছি তা অভিভূত করে দেবার মত। কাঞ্চীদির ওপরে তার বাবার প্রভাব পড়বে, এ তো স্বাভাবিক।

হেসে বলল অরিন্দম, মেয়েদের চরিত্র বোঝা ভার, এ কথাটা কেবল সংস্কৃত পুঁথির পাতায় বন্দী নয় ভট্চায, অনাগত ভবিষ্যৎ যুগের জন্যেও সত্য।

বললাম, তুমি অনেক বেশি ভেবেছ অরিন্দম, এতটা না ভাবলেও চলত। আমার বিশ্বাস ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা জীবন সম্বন্ধে বেশি ভাবে, তাই জীবন বোধও তাদের গভীর। হঠাৎ করে কোন কাজ তারা করে ফেলতে পারে না।

অরিন্দম বলল, তোমার অনুমান ঠিক হলে আমি সব চেয়ে খুশি হব ভট্চায, তবে ভাল যে বাসে সহস্র যুক্তি সামনে থাকলেও তার প্রাণ অস্থির।

কয়েকটা দিন আমি অরিন্দম আর কাঞ্চীদি পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালাম। জ্যোৎস্না রাতও বাদ গেল না। প্রবল শীত তখন আর শীত বলে মনে হত না আমাদের।

আমাকে কাছে পেয়ে বেশ বুঝতে পারলাম ওদের মনের দূরত্বটা কমে এসেছে। আমি ওদের কাছাকাছি থেকেও নিভৃত আলাপের সুযোগ করে দিতে লাগলাম।

ওরা যেন দীর্ঘ অদর্শনের পর পুনর্মিলনের স্বাদ পেয়েছে এমনি একটা ভাব ওদের চোখে মুখে।

আমি দুজনের মাঝ থেকে ছোটখাট গড়ে তোলা মান অভিমানের ঢেউগুলো সামলাতে লাগলাম।

বেশ বুঝতে পারলাম আমি একদিনে ওদের কাছে অপরিহার্য হয়ে পড়েছি। অবরুদ্ধ ভালবাসার পাথরখানাকে ওদের মন থেকে নিজের অজান্তেই কখন সরিয়ে দিয়েছি।

ওদের উচ্ছল কথার সুর কোন স্বনামধন্য গীতিকারের প্রেমসংগীত বলে মনে হতে লাগল।

সাতটা দিন যেন হাওয়ায় হারিয়ে গেল। মিঃ সরকার ফিরে এলেন।

আমি খুব কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম ওরা হঠাৎ বেশ গম্ভীর হয়ে গেল। অরিন্দমকে মনে হল সরকার টুল কোম্পানীর সুদক্ষ ম্যানেজার, আর কাঞ্চীদি বাবার আদর্শনিষ্ঠ সেক্রেটারী।

মিঃ সরকার আমাকে তখনও ঝালদায় দেখে খুশি হলেন।

বললেন, আপনাকে দেখে মশাই খুব ভাল লাগছে। আপনি আমাদের বন্ধুলোক আছেন বটে।

বললাম, স্যার, আপনার ম্যানেজার অরিন্দমবাবু আর কাঞ্চীদি আমাকে বন্ধুত্ব ও স্নেহে বেঁধে ফেলেছেন।

মিঃ সরকার বললেন, আপনি ভাল লোক আজ্ঞা, সেজন্য আপনাকে ওরা ভালবেসে ফেলেছে। আর ঐ যে অরিন্দমের কথাটা বলছেন, ও ম্যানেজারের কাজ করলে কি হবেক ও আমার ছেলের মত আছে। কাঞ্চীর ছোট ভাই বটে।

মনে মনে প্রমাদ গণলাম। কোনদিন মিলন ঘটলে সহজে মিঃ সরকারের অনুমতি পাওয়া যাবে বলে মনে হল না।

কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য প্রসঙ্গ পাড়লাম, স্যার আপনি সেদিন খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলেন, কোথায় গেলেন কিছু জানতে পারলাম না তো?

আর কেনে বলেন মশাই। শালা রেল কোম্পানীর যত বদমায়েসী। জি. আই. পি. রেলের বড় সাহেব কমপ্লেন পাঠাইছে, আমার মাল নাকি খারাপ আছে। কার্বণের ভাগ একদম কমতি।

গেলাম ওদের ল্যাবরেটারীতে। গিয়া দেখি আরবারী বসছে ডাইরেক্টার হঁয়ে। ঐ আরবারীটা বিলাইতে আমার সাথে পড়ত আজ্ঞা। বসত লাস্ট বেঞ্চে।

বললাম, হ্যালো আরবারী, তোমার সাহেব নাকি আমার মালে দোষ আছে বলছে, আমি নিজে এখান থেকে টেস্ট করতে চাই।

পুরা দেড় দিন টেস্ট চালায়ে দেখলাম, সরকার ভুল করে নাই, কার্বণ ঠিক আছে।

শেষ হার মানল আরবারী। বলল, তুমার লড়ায়ে হিম্মৎ আছে সরকার।

একটু থেমেই বললেন মিঃ সরকার, ইংরাজ জাতটার গুণ আছে মশাই, হার হলে হার স্বীকার করবে।

সন্ধ্যার একটু আগে আমি বেড়িয়ে ফিরছিলাম, হঠাৎ মিঃ সরকারের ঘরের ভেতর থেকে একটা ধমকানির আওয়াজ পেলাম।

বৈঠকখানায় ঢুকে দেখি একটি বছর কুড়ি বয়েসের ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে, আর মিঃ সরকার তাকে ধমকাচ্ছেন।

আমাকে দেখেই বললেন, বাবু, এ শালা লোক হারামি আছে। শালা বাটপাড়ের ব্যাটা এস. ডি. ও-র পিছু পিছু ঘুরতে আছে তিরিশ টাকার চাকরীর লেগে।

আমার কারখানায় কাম করত, বেশি পয়সা কামাত, এখন শালা খেটেখুটে কাম করবেক নাই। পিয়নের চাকরী করবেক, উপরি পাবেক। শালা লাটসাহেব হবেক লবাবের ব্যাটা। যা শালা বাপের কাছে। কাল বাকী পাওনা লিয়ে যাবি। আবার আসবি তো জুতা মেরে তাড়ায়ে দিব।

ছোকরা ছাড়া পেয়ে মাথা নীচু করে পালাল।

কাঞ্চীদির কাছে খাবার পরে শুনলাম, মিঃ সরকার এই ছেলেটাকে পথে দেখতে পান। বাজারের কোন একটা দোকান থেকে কিছু চুরি করার সময় ধরা পড়ে। তারপর যা হবার তাই হচ্ছিল। পাইকারী হারে মারতে মারতে ওকে আধমরা করে ফেলে রেখে গিয়েছিল রাস্তার ধারে। মিঃ সরকার ওকে বাড়ি নিয়ে এসে সেবা যত্ন করে সাবিয়ে তোলেন। ওকে নিজের কারখানায় কাজ দেন। কিন্তু তিন তিনবার ও কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছে, আবার মিঃ সরকারের পায়ে ধরে কাজে ঢুকেছে।

কাঞ্চীদিকে বললাম, এই চতুর্থবার ওকে বিদেয় করা হল, তারপর মিঃ সরকারই বোধকরি ওর আসার পথ চেয়ে বসে থাকবেন।

কাঞ্চীদি বলল, ঠিক বলেছ ভাই, বাবার মুখেই যে কেবল আস্ফালন তা এই ছোঁড়াটা বুঝে গেছে। চারদিকে ঘুরে ফিরে চুরি-চামারি করে আবার একদিন সন্ধ্যাবেলা ঐ বারান্দায় উঁকিঝুকি মারবে। বাবার চোখে পড়লেই ডেকে নেবেন। দু'দশবার ধমক লাগাবেন। তারপর আমাকে ডেকে বলবেন, দেখছ না মা কাঞ্চী, ব্যাটার চেহারার হাল কেমন হইছে। দু'খান রুটি খাওয়াই দাও। হাঁরে শালা, কাল থেকে কারখানায় কাম করবি তো?

ব্যাস, হয়ে গেলেন বহাল।

বলতে বলতে বলেই চলল কাঞ্চীদি বাবার কীর্তিকথা।

পুজোর সময় ছেলেরা এসে দরবার বসাবে, আপনাকে প্রেসিডেন্ট হতে হবে পূজা কমিটির।

বাবা বলবেন, আমি চাঁদা দিয়া প্রেসিডেন্ট হব নাই।

বাবাকে চাঁদা চাইলেই বাবা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠবেন। শেষে আমরা গোপনে চাঁদা দিয়ে ছেলেপিলেদের বিদেয় করব।

কিন্তু ভাই পুজোর সময় বাবার অন্য মূর্তি। ছেলেদের ডেকে এনে বলবেন, তোরা ছৌ নাচের দল লিয়ে আয়, যত টাকা লাগে আমি দিব। এ নাচ আমার জেলার আছে বটে, ওটাকে বাঁচায়ে রাখতে হবেক।

মিঃ সরকারের কথা শুনছি আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষটি আমার মনের অতলে গভীর দাগ ফেলে যাচ্ছেন। এখন বেশ বুঝতে পারছি কেন মানুষটার বিরুদ্ধে রেল কোম্পানীর এত আক্রোশ। একে সেরা মাল দিয়ে বৃটিশ কোম্পানীর নাক গলান বন্ধ করেছেন, দেশের পয়সা দেশে রাখছেন, অন্যদিকে

কুলদীপচাঁদের মত লোকদের উপরি রোজগারের পথটা বন্ধ করে দিয়েছেন। বাঁ হাতের কোন কারবারই নেই।

সেবার আমি প্রায় দশদিন কাটিয়ে এলাম ঝালদায়। আসার সময় মিঃ সরকারকে বললাম, এখন বুঝতে পারছি স্যার আমার বস্ কুলদীপচাঁদের কথা কত সত্য। তিনি আসার সময় সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, মিঃ সরকার থেকে খুব হুঁসিয়ার থাকবে। মানুষট সূক্ষ্ম তারের ওপর দিয়ে হাঁটতে জানে। হয়ত দেখবে, যে লোক ওকে ধরতে গেছে, সেই লোকটাকেই চেপে ধরেছে ওস্তাদ সরকার।

এ দশটা দিনে সত্যি স্যার আপনি আমার দশ অবস্থা করে দিয়েছেন। আপনাদের ছেড়ে যেতে হচ্ছে ঠিক কিন্তু মনটা বাঁধা রয়ে গেল এই ঝালদায়।

প্রাণ খুলে হাসলেন মিঃ সরকার। বললেন, আবার আসবেন, কাম লিয়ে নয়, খালি বেড়াইতে আসবেন। এবার আপনি আমার মাননীয় অতিথি হইয়ে আছেন, ফের যখন আসবেন তখন আপনি আমার ছেলের মতন হইয়ে আসবেন।

ওঁর কথা শুনে মনটা গভীর শ্রদ্ধায় ভরে উঠল। নত হয়ে নমস্কার করতে যেতেই তিনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

এবার ঝালদা স্টেশন দিয়েই ফিরে যেতে মনস্থ করলাম।

আমার সঙ্গে স্টেশন অবধি এসেছিল কাঞ্চীদি আর অরিন্দম। ওরা সারা পথ প্রায় নীরবেই এসেছিল। আমিও কোন হাল্কা কথা বলতে পারছিলাম না।

ট্রেন ছেড়ে দিতে কাঞ্চীদি বলল, আবার এসো, খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু।

যতদূর ট্রেনের সঙ্গে দ্রুত পায়ে আসা যায় অরিন্দম জানালার বাইরে বের করা আমার হাতখানা ছুঁয়ে চলে এল। তারপর আমি মুখ বের করে কতক্ষণ ওদের দেখলাম। কেন জানি না ওরা চোখের আড়ালে চলে যেতে একটা অব্যক্ত ব্যথার ঢেউ আছড়ে পড়ল আমার বুকে।

প্রায় আটমাস পরে আবার এলাম ঝালদায়। এ ক'মাস কলকাতার বাইরে বহু জায়গায় আমাকে ঘোরাঘুরি করতে হয়েছিল। যোগাযোগ রাখতে পারিনি ওদের সঙ্গে। আমার জীবনে ইতিমধ্যে যে এসেছে, সে আমার অনেক দিনের চেনা, অনেকগুলি বর্ষা বসন্তের সঙ্গিনী। তাকে আমি কাঞ্চীদি আর অরিন্দমের কথা বলেছিলাম। তাই ঝালদা যাবার কথা হতেই ও এগিয়ে এল। বলল, তোমার মুখে এত শুনেছি ওদের কথা, একবার চোখে দেখতে ইচ্ছে করছে।

বললাম, তোমাকে দেখলে ওরা দারুণ খুশি হবে, তবে না বলে একটা সারপ্রাইজ ভিজিট দিতে হবে।

আমরা শেষ বেলায় ঝালদা স্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটে চললাম স্যার আর. ডি. সরকারের বাড়ি।

গোপাকে বললাম, বাড়িটা একটু দূরে, হাঁটতে পারবে তো?

ও আমার দিকে চোখ তুলে দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল, কষ্ট হলে তোমার হবে, কারণ সবাই বলে তুমি নাকি মহাদেবের মত। আর কিছুতে হোক বা না হোক অন্ততঃ বপুতে।

বললাম, আমার দেহখানার ওপর যেভাবে নজর দিতে শুরু করেছ তাতে মহাদেবের চেলাচামুণ্ডা হতে বেশি বিলম্ব হবে না।

হাল্কা কথা বলতে বলতে আমরা এসে পড়লাম সরকার টুল কোম্পানির সামনে।

তখন প্রায় অন্ধকার নেমে এসেছিল। মিঃ সরকারের কোয়ার্টারের একপাশে একটা গাড়ির মত মুখওয়ালা বস্তুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছিল।

কাছে গিয়ে দেখি একখানা ভাঙা প্রাইভেট কার, তার ওপর সাজিয়ে রাখা হচ্ছে খড়ের আঁটি। একজন নীচে থেকে একা একটা খড়ের আঁটি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে, আর গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে একটি লোক সেই খড় সাজিয়ে রাখছে।

ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি এমনভাবে খড়ের আড়ালে রয়েছে যে তাকে পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ আমাকে কে যেন ডাক দিলে। প্রথমটা বুঝতে পারিনি গাড়ীর ওপর খড়ের আড়ালে. যে মানুষটি রয়েছেন তিনি স্বয়ং স্যার আর. ডি. সরকার।

ওখান থেকেই চেঁচিয়ে বললেন, হ্যালো ভট্চায, তুমি তাহলে সত্যি এলে বটে।

একটু অবাক হয়েই বললাম, আপনি ওখানে স্যার, আর এ গাড়িখানাই বা কোথায় ছিল?

ওপর থেকেই উত্তর এল, কিনেছি ভট্চায, একদম অচল গাড়িখানা কিনে ফেললাম।

বললাম, অচল গাড়িখানা কেবল খড় রাখার জন্যে কিনে ফেললেন?

এখন খড় দেখছ ভট্চায, ফিরবার যখন আসবে তখন এই গাড়ি চড়ায়ে তোমাকে স্টেশন থিকে লিয়ে আসব। আমার হাতে পড়লে শালা খোঁড়াগাড়ি উড়োজাহাজ হয়ে যাবে।

আমি বিশ্বাস করলাম মনে মনে, কারণ আর. ডি. সরকার বড় কথা বলেন ঠিক, কিন্তু সে কথাকে অক্ষরে অক্ষরে কাজে পরিণত কর'র হিম্মৎও ঐ একজনেরই আছে।

বললাম, এ যাত্রায় আমি কিন্তু একা নই, আপনার বৌমাও এসেছে।

গাড়ি থেকে প্রায় লাফিয়ে নীচে নেমে এলেন সরকার।

বললেন, কোথায়? বৌমা কোথায়?

বললাম, ওকে কারখানার পাশে রেখে এসেছি।

আরে মশাই, মেয়ে আমার দাঁড়ায়ে আছে আর আমি কথা বলে যাচ্ছি। চল চল, আজ বড় আনন্দ হচ্ছে বটে ভট্চায, আমার মেয়ে এসেছে।

একটু কণ্ঠিত হয়ে বললাম, আগে খবর দিয়ে আসতে পারিনি, আপনাদের কষ্টে ফেললাম।

কষ্টে ফেললে! এমন কষ্ট পেতে যে কি সুখ ভট্চায তা বুঝতে পারবে তোমার মেয়ে হলে।

কাছাকাছি হতেই আমি ইঙ্গিত করলাম, গোপা প্রণাম করল ওঁকে।

উনি বললেন, ভট্চায এতদিন আসে নাই বলে খুব রাগ করছিলাম ওর উপরে, কিন্তু সব রাগ চলে গেল, তোমার মুখখানা দেখে মা। ঘরে চল, আলো জ্বেলে ভাল করে দেখি।

কোয়ার্টারে আলো জ্বলছিল, মিঃ সরকার গোপাকে আগলে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আমি পেছনে পেছনে গেলাম।

বাইরের ঘরে আমাদের বসিয়ে রেখে মিঃ সরকার হাঁক ডাক শুরু করে দিলেন। একটি আদিবাসী কাজের মেয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। মিঃ সরকার তাকে আমাদের আসার কথা জানিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জলযোগ আর রান্নার ফরমায়েসও করে দেওয়া হল।

বলি বলি করেও আমি কাঞ্চীদির কথাটা আগে তুলতে পারলাম না। এই দীর্ঘ কটি মাসের ভেতর কত কিছু পরিবর্তন ঘটতে পারে। কাঞ্চীদি এখানে থাকলে তো আর কোন কথাই ছিল না, কিন্তু পরিস্থিতি এতদিনে কি দাঁড়িয়েছে তা না জেনে আমার উপযাচক হয়ে জিজ্ঞেস করতে কেমন বাধ বাধ ঠেকল।

এ কথা সে কথার পর এক সময় মিঃ সরকার বললেন, কাঞ্চী পাটনা চলে গেল আজ্ঞা, সে থাকলে আমার বৌমাকে দেখে কত খুশি হত।

এবার সাহস করে বললাম, অরিন্দম কেমন আছে স্যার? সে এখানেই আছে তো?

হ্যারিকেনের আলোয় স্যার আর. ডি. সরকারের মুখখানা কেমন যেন বিমর্ষ দেখাল।

বললেন, ছেলেটা থাকল নাই। অনেক বুঝাইলাম আজ্ঞা কিন্তু শুনল নাই। থিসিসটা শেষ করতে পারল নাই, চলে গেল।

বললাম, কাঞ্চীদি পাটনা থেকে ফিরবে কবে কিছু জানায়নি আপনাকে?

মিঃ সরকারের গলায় তেমনি বিষণ্ণতার একটা সুর বাজল, ও যে কেনে চলে গেল বুঝতে পারলাম নাই। কাজে গিয়েছিলাম, দু'দিন পরে ঘরে ফিরে দেখি, কাঞ্চীর একখান চিঠি। লিখেছে, জরুরী দরকারে পাটনা যাচ্ছি, কুন ভাবনা করবে নাই।

বললাম, হয়ত শিগ্‌গির এসে পড়বে, আপনাকে ছেড়ে বেশিদিন থাকতে পারবে না।

মিঃ সরকার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বলে মনে হল।

বললেন, আজ দু'মাস হয়ে গেল, একখান্ চিঠি পেয়েছিলাম ভট্‌চায, আমাকে বড় ভাবায়ে তুলছে। অরিন্দমের বাপ লিখেছিল, পাটনাতে পুলিশের গুলি চলছে, দিশি আন্দোলন বড় জোরদার হইছে।

শেষে লিখেছিল, অরিন্দমের দেখা নাই। সারা শহরে গান্ধী মহারাজের 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' শ্লোগান দিয়ে দল দল ছেলে মেয়ে রাস্তায় ঘুরছে। বড় ভাবনায় আছি।

চিঠি পাবার পর ভট্‌চায খালি ভাবতে আছি, এই ছেলে মেয়ে দুটা গান্ধী মহারাজের আন্দোলনের ডাকে চলে গেল নাকি। তারপর তিনখান্ চিঠি দিলাম, উত্তর নাই।

বললাম, ভাবনার কিছু নেই, ওরা অনেক বড় হয়েছে, যা কিছু করুক না কেন, বিবেচনা করেই করবে।

তাই যেন হয় ভট্‌চায। ভাই বোন দুটাকে শিক্ষা দেওয়া হইছে, দেখে শুনে পথ চলতে হবেক ওদেরকেই।

বুঝলাম, এখনও মিঃ সরকার কাঞ্চীদি আর অরিন্দমের আসল সম্পর্কটা আন্দাজ করতে পারেন নি।

তিনটি দিনের আগে আমাদের কিছুতেই ছাড়লেন না মিঃ সরকার। কেমন যেন আগলে আগলে বেড়ালেন।

ইস্পাতের মত কঠিন লোকটি মাঝে মাঝে অসহায় শিশুর মত আচরণ করলেন। বেশ বুঝতে পারলাম, তাঁর এতদিনের বলিষ্ঠ পৌরুষের সঙ্গে স্নেহ-কোমল মনটার সংঘাত লেগেছে।

আসার দিনে আমরা ওঁকে প্রণাম করলাম। উনি এবার আর বাধা দিলেন না। শুধু বললেন, তোমরা আজ হোতে আমার মেয়ে জামাই হলে। আমার বুকটা জুড়াই গেল।

বুঝলাম, মনের অবদমিত একটা দুঃখকে এইভাবে তিনি মুক্তি দিলেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কারখানা পার হতে গিয়ে একটু দাঁড়ালেন, তারপর কি ভেবে বললেন, ভট্‌চায, গান্ধী মহারাজ দেশে স্বরাজ আনবার লেগে চেষ্টা করতে আছেন, আর আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে দেশ গড়ার কাজ করছি। দেশের ছেলেগুলানকে নিজের হাতে কাজ শিখাইছি। আমার ছেলেগুলান গুলামী করবেক নাই, স্বাধীন কাজ করবেক।

বললাম, আপনার এই মহৎ চেষ্টা একদিন অনেক ফল দেবে স্যার।

মিঃ সরকার বললেন, সেই ভরসায় দিন গুনছি ভট্‌চায। সারা দেশে এমন ছোট ছোট কারখানা হলে দেশ সোনা হয়ে যাবেক। আমার দেশের মানুষগুলার কাজের অভাব হবেক নাই।

উনি স্টেশনের পথে এগিয়ে আসছিলেন। বললাম, আর আসতে হবে না স্যার, কাঞ্চীদি কাছে নেই, আপনি একা আছেন, ঘরে ফিরে যান, আমি আপনার এই মেয়েকে নিয়ে আবার আসবো।

উনি বার বার এটুকু পথ পৌঁছে দিতে চাইলেন, কিন্তু আমরা ওঁকে জোর করে নিবৃত্ত করলাম।

শেষে উনি গোপার দিকে তাকিয়ে বললেন, ছেলেকে ভুলবে না মা। আবার আসতে হবেক বটে।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভট্‌চায, আমার ভাঙা গাড়িখান্ দেখে হাসছিলে না, এবার যখন আসবে চিঠি দিও, আমি ঐ গাড়িতে করে তোমাদের স্টেশন থেকে লিয়ে আসব। আমার কারখানার ছেলেরা ভাঙা হাড় জোড়া লাগাইতে জানে।

আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুললেন স্যার আর. ডি. সরকার। আমরা চলে এলাম। কেন জানি না চোখ দুটো জলে ভরে এল।

আমি আর কোনদিন ঝালদা ফিরে যাইনি। যখনি ঝালদার কথা ভেবেছি তখনি আমার চোখের ওপর ফুটে উঠেছে একটি ইস্পাতের মত দীর্ঘদেহী পুরুষ মূর্তি, যাঁর একটি হাত আশীর্বাদের ভঙ্গীতে উত্তোলিত হয়ে আছে।

ভাগ্যিস ঝালদা স্টেশনে সেদিন আমাদের পৌঁছে দিতে আসেননি মিঃ সরকার, তাহলে হয়ত একটা বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে হত আমাদের সবাইকে।

বিকেলের শেষ আলোয় স্টেশনে পৌঁছলাম। গাড়ির অনেক দেরী। দূরে দূরে পাহাড় আর বনের ছবি ক্যানভাসে আঁকা বলে মনে হচ্ছিল। একটা মেঘ থমকে দাঁড়িয়েছিল পশ্চিমের আকাশে। তার চার দিকের কিনার দিয়ে বেরিয়ে আসছিল আড়ালে ঢাকা পড়া শেষ সূর্যের আলো। স্টেশনের একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল একটা শিরিষ গাছ। তার মাথা ভরা পাতায় সজল কোমল আলোটুকু মায়ের স্নেহের মত ছড়িয়ে পড়ছিল। আমি চোখ ফেরাতে পারছিলাম না।

হঠাৎ আমার গায়ে কার হাতের ছোঁয়া লাগল, আমি পেছন ফিরে তাকাতেই যাকে দেখলাম তাকে দেখব একেবারে আশা করিনি, শুধু তাই নয়, এভাবে দেখব এ একেবারে আমার ভাবনার বাইরে ছিল।

কাঞ্চীদি আমার হাতটা ধরে শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার হাত বেশ গরম বলে আমার মনে হল, আর সে হাত বুঝতে পারলাম মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

অবাক বিস্ময়ে বললাম, কাঞ্চীদি, এ সময় কোথা থেকে?

কাঞ্চীদি কথা বলতে পারছিল না। শুধু ইঙ্গিতে ঐ শিরিষ গাছটার কাছে যেতে বলল।

আমি বললাম, সঙ্গে আমার স্ত্রী গোপা রয়েছে।

একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল গোপা, আমি তাকে ইসারায় কাছে ডাকলাম।

গোপা এলে বললাম, ইনি কাঞ্চীদি গোপা।

কাঞ্চীদি দু'হাতে গোপাকে জড়িয়ে ধরল আর সঙ্গে সঙ্গে যেন সামনের আকাশে থমকে থাকা মেঘটা অঝোর ধারায় ভেঙে পড়ল।

ছোট স্টেশন, কাছে পিঠে কোন যাত্রী নেই। কাঞ্চীদির অবস্থা দেখে গোপা তো বিমূঢ়।•

কতক্ষণ পরে কাঞ্চীদি একটু সুস্থ হয়ে দাঁড়ালে আমরা দুজনে তার হাত ধরে নিয়ে এলাম শিরিষ গাছটার তলায়।

ওখানে বসলাম তিনজনে। কাঞ্চীদি কথা বলল, ধীর গভীর গলার স্বর।

অরিন্দম আর আমাদের মধ্যে নেই, সে আর কোনদিনও ফিরে আসবে না।

সেই মুহূর্তে সারা দেহের রক্ত প্রবাহটা যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। আমি কতক্ষণ কোন কথা উচ্চারণ করতে পারলাম না।

মিঃ সরকারের চিঠির কথা মনে পড়ল।

• বললাম, অরিন্দম কি দেশের কাজে নিজেকে সঁপে দিয়েছে কাঞ্চীদি?

কাঞ্চীদি আমার মুখের দিকে একবার তাকাল। প্রশ্ন করল না, আমি কি করে দেশের কাজে অরিন্দমের যোগাযোগের খবরটা জানলাম।

কাঞ্চীদি কথা বলল ঠিক স্বগতোক্তির মত, অনেক ইচ্ছা বুকে নিয়ে চলে গেছে আমার অরিন্দম, আমার ওপর শেষ মুহূর্তেও তার অভিমান যায়নি।

বললাম, কাঞ্চীদি, তুমি তো জান সে যেমন জেদী, তেমনি তার বড় বেশি অভিমান।

কাঞ্চীদি বলল, ভাই, তোমার অজানা তো কিছুই নেই। আমি চারদিকের পরিস্থিতির কথা ভেবে যখন ভয় পাচ্ছিলাম, তখন ও মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করছিল। আমাকে ঝালদায় থাকতে জানবার সুযোগ দেয়নি যে ভেতরে ভেতরে দেশের কাজে ও নিজেকে উৎসর্গ করেছে। ·

বললাম, তুমি কি ওর চিঠি পেয়ে পাটনা গিয়েছিলে?

হ্যাঁ, জরুরী চিঠি এসেছিল। পাটনার নতুন একটা ঠিকানা ও আমাকে দিয়ে ওখানে যেতে বলেছিল।

একটু থেমে বলল কাঞ্চীদি, জান ভাই, আমার ওপর শোধ তুলল অরিন্দম। আমাকে কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে সে নিজে সরে গেল।

বললাম, কাঞ্চীদি, তোমার আমার কাছ থেকে ও সরে গেছে ঠিক, কিন্তু ও আজ সারা দেশের মানুষের হৃদয়ের মাঝখানটিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাঞ্চীদি কতক্ষণ নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ও কিন্তু তখন তলিয়ে গিয়েছিল ওর স্মৃতির অতলে।

একসময় কথা বলতে শুরু করল কাঞ্চীদি। কথার উৎস যেন খুলে গেল।

একদিন অরিন্দমকে বললাম, তুমি আমাকে ডেকে পাঠালে কেন বলতে পার? কি এমন দিগ্বিজয়ে যাওয়ার দরকার হয়ে পড়ল যে আমার মন্ত্রণা চাই?

ছোট্ট করে ও বলল, এলে কেন?

আমিও অমনি বললাম, ইচ্ছে করল।

ঠিক আমার কথাটা ও ফিরিয়ে দিয়েই বলল, আমারও ইচ্ছে করল তাই ডাক দিলাম।

এরপর আর কথা চলে না। আমি একটু একটু করে বুঝতে পারলাম, আমার শক্তি কমে আসছে। ঝালদায় থাকতে মনের যে জোর আমাকে ওর প্রবল আকর্ষণের হাত থেকে ফিরিয়ে আনত, সে মনটা কখন তার সবটুকু শক্তি খুইয়ে বসে আছে।

কাঞ্চীদির কথার মাঝেই আমি একটি প্রশ্ন করে বসলাম, আচ্ছা অরিন্দম হঠাৎ ঝালদা ছেড়ে চলে গেল কেন?

কাঞ্চীদির গলায় একটা দুঃখের ঢেউ ভাঙল, সে অনেক ইতিহাস ভাই। ওর স্বভাবের ভেতর একটা চাপা ইচ্ছা ও পুষে রাখত। তার খবর ও কাউকেই দিত না। এমনকি আমাকেও নয়।

বললাম, ও কিন্তু আমাকে ওর মনের সব কথা একদিন বলে ফেলেছিল।

কাঞ্চীদি বলল, সে কথা আমি জানি ভাই। বড় বেশি জেদী আর খেয়ালী একটা স্বভাব ওর ভেতর লুকিয়ে থাকত। যেটা হয়ত আমাকে ও বলতে চাইবেনা সেটা সামান্য পরিচিত লোকের কাছে বলে ফেলতে ওর একটুও বাধত না।

হ্যাঁ, তোমার কথাটারই জবাব দিচ্ছি, ও কেন চলে গেল ঝালদা থেকে।

তুমি সেবার এসে সাতটা দিন কাটিয়েছিলে ঝালদায়। বাবা ছিলেন না সে সময় আমাদের কাছে। ঘুরে বেড়িয়েছি চারদিকে। মন উড়ছে হঠাৎ ছাড়া পাওয়া পাখির মত। কিন্তু বাবার ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি বদলে গেল। তুমি চলে গেলে, আর আমরা ডুবে গেলাম যে যার কাজে। বিশ্বাস কর ভাই, সে সময় মনটাকে টেনে এনে কাজে লাগাতে কি যে যুদ্ধ করেছি বলে বোঝাতে পারবনা।

ও একদিন আমাকে আড়ালে পেয়ে বলল, চল আমরা কোথাও পালাই, এমন করে থাকা একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠছে।

হেসে বললাম, সে কি, একদিন গঙ্গার চরে মনে আছে তোমাকেও আমি সব ছেড়ে চলে আসতে বলেছিলাম। তুমি সেদিন বলেছিলে, আমি কি লুঠেরা যে লুঠের মাল নিয়ে পালিয়ে বেড়াব। আজ তবে কেন সব ছেড়ে চলে যেতে আমাকে এমন করে ডাক দিচ্ছ?

ও চুপ করে গেল। কোন একটা উত্তর ওর মুখ থেকে শুনতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আর একটি কথাও ও বলল না।

একদিন সকাল থেকে বাবা গেলেন পুরুলিয়া সদরে। ফিরতে ফিরতে সেই রাত হয়ে যাবে।

অরিন্দমকে বললাম, চল তোমার ডেরায় যাই।

ও আমার মুখের ওপর চোখ রেখে বলল, ভয় করবেনা? ডেরাটা কিন্তু বাঘের।

বললাম, বাঘ বশ করার মন্ত্র আমার জানা আছে।

আমরা দুপুরে এলাম ওর ডেরায়।

দু একবার মাত্র এসেছি আগে, তাও প্রতিবারই বাবার সঙ্গে। বাবা কাছে থাকলে কাজের ছকে বাঁধা আমাদের জীবন। সেখান থেকে নড়ার উপায় নেই। তিনি যেখানে যাবেন, তাঁর ইচ্ছে হলে সঙ্গী হওয়া এইমাত্র।

আমরা নির্জন দুপুরটা সেদিন কি করে কাটিয়েছি ভাবতে পার পাথর ভাই? শুধু খেয়ালের খেলা খেলে।

ও আমাকে লিখেছে পাঁচখানা চিঠি, আর আমি সমানে দিয়ে গেছি তার উত্তর।

দুপুর কখন বিকেলে গড়িয়েছে তা জানতে পারিনি। যখন শেষ চিঠিখানা শেষ করছিলাম তখন কাগজের ওপর অক্ষরগুলো আবছা হয়ে আসছিল। চিঠি শেষ করে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি সন্ধ্যা নেমেছে। বাড়ি ফিরতে হবে।

ওকে কথাটা জানালাম। ও বলল, তোমার বাবার ঘরে ফিরতে রাত হবে, এর ভেতর আমরা ইচ্ছে করলে আরও দু'খানা করে অন্ততঃ চিঠি লিখতে পারি।

ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, না, আর অত ইচ্ছে করতে নেই।

জান ভাই, ওকে আমি কোনদিনই চিনতে পারিনি। ও যখন কথা বলে তখন এত স্পষ্ট করে বলে যে ওর মন কতখানি প্রস্তুত আর ওর বিশ্বাস কতখানি দৃঢ় তা বেশ বুঝতে পারি। আবার এক এক সময় ছেলেমানুষী আর পাগলামীতে পেয়ে বসে ওকে। তখন কোন যুক্তি, কোন বিবেচনার কথাই ও কানে তুলতে চায় না।

সেদিন আমি ওকে ইচ্ছে করেই চিঠি লেখার খেলায় মাতিয়ে রেখেছিলাম। কোন একটা কিছুর ভেতর ওকে মাতিয়ে দিলেই হল। সব ভুলে সে ওতেই মগ্ন হয়ে থাকবে।

এক সময় ওকে বললাম, চল এবার ঘরে ফেরা যাক।

ও সুবোধ ছেলের মত আমার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল।

পথে আসতে আসতে বললাম, দেখলে তো, বাঘের ডেরা থেকে কেমন বেরিয়ে এলাম।

ও বলল, যে বাঘ মানুষের রক্তের স্বাদ কোনদিন পায়নি, তার থেকে নিহত হবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে।

বললাম, কথাটা বলতে তোমার পৌরুষে বাধল না?

ও বলল, কোন একটি বিশেষ চেনা মেয়ের কাছে পৌরুষ দেখান এমন কিছু একটা ব্যাপার নয়।

কাঞ্চীদি এবার থামল।

অনেকক্ষণ কথা বলতে গিয়ে সে হাঁপাচ্ছিল।

এক সময় আবার কথা শুরু করল।

জান ভাই, সেদিন আমাদের ঐ চিঠি লেখার ব্যাপারটি থেকেই আমি নতুন কয়েকটা কথা ওর সম্বন্ধে জানতে পারলাম।

কাঞ্চীদি এবার অনেকক্ষণ থেমে চুপচাপ বসে রইল। মনে হল মনের অনেক গভীরে ডুবে কাঞ্চীদি সেদিনের চিঠির কথাগুলো কুড়োবার চেষ্টা করছে।

একসময় গোপার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি যতদূর শুনেছি অরিন্দমের কাছে, তাতে অনুমান করতে পারি বিয়েটা তোমাদের ভালবেসেই হয়েছিল?

গোপা মাথা নেড়ে জানাল যে কাঞ্চীদির অনুমানে কোন ভুল নেই।

কাঞ্চীদি বলল, তোমার স্বামী পরিচয়ের দিনগুলোতে তোমার কাছ থেকে কোন কিছু লুকিয়ে রেখেছিল বলে মনে হয় কি?

গোপা আমার মুখের দিকে একবার তাকাল। তারপর আবার মাথা নেড়ে জানাল যে কোন কিছু অজানা বোধকরি তাদের মধ্যে ছিল না।

কাঞ্চীদি বলল, তুমি বড় সুখী গোপা, আমার ভায়ের মত স্বামী পেয়েছ। এ বিষয়ে আমার কিন্তু ভাই দারুণ ভাগ্য মন্দ। অরিন্দম অনেক অনেক চিন্তা নিজের ভেতর লুকিয়ে রাখতে ভালবাসত। সে কখনো মন উজাড় করে কিছু বলত না।

শুধু সেদিনটিতেই তার মনের একটা গোপন দিকের পরিচয় খানিকটা চিঠির ভাষায় প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। বোধকরি সেদিন সে ততটা সতর্ক থাকতে পারেনি, যতটা সতর্কতা তার স্বভাবের ধর্মে ছিল।

চিঠিগুলো ভালবাসার আক্ষেপ আকুলতা নিয়ে লেখা হলেও, ওর চিঠির জায়গায় জায়গায় চলে যাবার একটা সুর বাজছিল।

একটা চিঠিতে ও লিখেছিল, যদি কোনদিন তোমার কাছ থেকে আমাকে দূরে সরে যেতে হয় তাহলে জেনো সে এমন এক ডাক যা অন্য সবকিছু ভুলিয়ে দেয়।

আর একটি চিঠিতে ও রবিঠাকুরের একটা কবিতা উদ্ধৃত করেছিল।

'বাহিরিয়া এল কারা? মা কাঁদিছে পিছে
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।
ঝড়ের গর্জন মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে।
ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল,
যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল,
উঠেছে আদেশ,
বন্দরের কাল হল শেষ।'

আমি সেদিন ওর চিঠিতে এমনি কয়েকটা ইঙ্গিত পেয়েও ঠিকমত বুঝতে পারিনি ও মনে মনে দেশের ডাকে কতটা এগিয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যায় ঝালদার পথে ঘরে ফিরতে গিয়ে পাহাড়ের চূড়োয় চাঁদটাকে লাফ দিয়ে উঠতে দেখলাম।

ওর দৃষ্টি সেদিকে ফেরাতেই ও বলে উঠল, সত্যি কাঞ্চী, কেন জানিনা অনেকদিন পরে আজকের এই চাঁদটাকে বড় ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে ওদিকের শাল বনের মায়া কাটিয়ে ও কেমন একা একা লাফ দিয়ে উঠে এসেছে পাহাড়ের চূড়োয়। তারপর আমরা সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ব তখন ও একা জেগে থেকে এই বিরাট আকাশটা পাড়ি দেবে।

ও পথ চলতে চলতে ফিরে ফিরে চাঁদটাকে দেখছিল আর কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল।

এখন মনে হচ্ছে ও সেদিন আকাশচারী নিঃসঙ্গ চাঁদটাব ভেতর নিজের ছবিই দেখতে পেয়েছিল।

আমরা অনেকটা পথ চলে এসে হঠাৎ একটা আদিবাসী পাড়ায় থমকে দাঁড়ালাম। চাঁদের আলোয় উঠোনের মধ্যে গান শুরু হয়েছে!

একটি ছেলেকে ঘিরে মাথায় কলসী নিয়ে পাঁচটা মেয়ে নেচে চলেছে। তারা গাইছে ঃ

'সইলো, সইলো, বিদেশী নাগরিয়া
'নল নিল হিয়া,
সইলো, সইলো, কে দিল ঐ রূপ গড়িয়া,
বিদেশী নাগরিয়া।
মোরা যে আহিরিণী
চিনি আর নাহি চিনি
যাবনা [illegible] ঘরে আর ফিবিয়া।'

ছেলেটি গেয়ে উঠল ঃ

'শত চাঁদ নিঙাড়িয়া
তাহে ফুল রেণু দিয়া
কে দিল কে দিল ঐ রূপ গড়িয়া।'

মেয়েরা সমস্বরে গেয়ে উঠল ঃ

'বিদেশী নাগরিয়া
নিল নিল হিয়া।'

ঘরে ফিরে এসে কিন্তু আমি অন্য মানুষ। ফাইল নিয়ে, কাজ নিয়ে নিজের দিকে চাইবার সময় নেই। একটু আগে চাঁদ ওঠা দেখেছি, মন কেমন করা গান শুনেছি, সব আবছা হয়ে মিলিয়ে গেল।

ও আমাকে এগিয়ে দিয়েই ফিরে গিয়েছিল ওর আস্তানায়।

বাবা এলেন, তখন প্রায় রাত ন'টা।

দেখে মনে হল, বড় ক্লান্ত। আমি তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলাম। বাবাকে এতটা বিষণ্ণ আমি কোনদিনই দেখিনি।

খেতে বসে বাবা বললেন, মা কাঞ্চী, কাল দুটি ভদ্রলোক আসবেন, তারা এখানে খাওয়া-দাওয়া করে তোমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে বিকেলের দিকে ফিরে যাবেন।

সমস্ত শরীরটা কেন জানিনা চমকে উঠল। আমার সঙ্গে আলাপ করবেন তাঁরা, এ কথার অর্থ তো একটিমাত্রই হয়।

বিয়ে হয়নি এতকাল। আমি অতি সাধারণ মেয়ে। বাবা বাইরের আলোর সন্ধানে ঘর ছেড়েছিলেন। তিনি আলোর খোঁজ পেয়েও ছিলেন। একটি মাত্র মেয়েকে তাই অন্ধকারের ভেতর না রেখে আলোর জগতে ঢোকার অধিকার দিয়েছিলেন।

কিন্তু সেই তীব্র আলোর দিকে চেয়ে একদিন বাবার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তিনি প্রায় অন্ধকার দেখলেন। মেয়েকে তো মনের আনন্দে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছেন, এখন সংসারী করবেন কি করে। আমাদের ভেতর আমার উপযুক্ত জানাশোনা ছেলে পাওয়া প্রায় অসম্ভবের সামিল। এদিকে মেয়ের বয়েস বেড়ে গেছে। শুধু লেখাপড়া আর কাজকর্মের ভেতর মেয়েকে ডুবিয়ে রাখতে কোন বাবা প্রাণ ধরে পারেন।

আমি জানতাম, বাবা মাঝে মাঝে বাইরে বেরিয়ে যেতেন কোন ছেলের সন্ধানে, কিন্তু ফিরে যখন আসতেন তখন একটা অসহায় পরাভবের ভাব ফুটে উঠত ওঁর চোখে মুখে।

সে সময় আমার বাবার মুখের দিকে তাকাতে বড় কষ্ট লাগত। যে মানুষ ইস্পাতের মত কঠিন, জীবনের কোন জায়গাতেই অন্যায়ের সঙ্গে, অক্ষমতার সঙ্গে আপোষ করেননি সে মানুষ এমন অসহায়ের মতে তাকাতেন যে ক্ষোভে দুঃখে আমার চোখ ফেটে জল আসত।

বাবা লোক দুটি সম্বন্ধে আমাকে বিশেষ কিছু না বললেও আমি সবই বুঝেছিলাম। কিন্তু বাবা যে অরিন্দমকে সব কিছু খুলে বলেছেন তা তখন একেবারেই আমি জানতে পারিনি।

ভদ্রলোক দুটি এলেন। দেখলাম অরিন্দমও কারখানা থেকে বাড়িতে এসে ঢুকল। বাবা অরিন্দমের সঙ্গে ভদ্রলোকদের আলাপ করিয়ে দিলেন। আড়ালে থেকে আমি অসোয়াস্তিতে ঘামছি, ওদিকে সমানে অরিন্দম ওদের সঙ্গে কথা চালিয়ে যাচ্ছে।

আমি বাবার কথা মত জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলাম। জলখাবার রেখে নমস্কারও করলাম। ওঁরা বেশ খানিক সময় আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, এ খাবারগুলো কি তুমি করেছ মা?

বললাম, বাইরের খাবার বাবা পছন্দ করেন না, তাই ঘরেই বানাই। আর বাড়ির মেয়েরা নিজেদের হাতে সব কিছু করুক, এইটাই বাবা চান।

ওঁরা বেশ বেশ বলে আমার জলখাবারের রেকাবী হাতে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে লেগে গেলেন।

ইতিমধ্যে ওর সঙ্গে আমার একবার চোখাচোখি হল। দেখলাম, ওর চোখে মুখে একটা কৌতুকের চাপা হাসি।

আমার ভীষণ রাগ হল, আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

এরপর টুকরো টুকরো কয়েকটা কথার বিনিময় হল। ভদ্রলোকেরা আমাদের কারখানা দেখতে চাইলেন! বাবা আর অরিন্দম বেরিয়ে গেল ওদের সঙ্গে।

ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া সেরে ওঁরা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গড়ি ধরতে দৌড়লেন।

কি কথা হল ওঁদের বাবার সঙ্গে তা আমি জানতে পারলাম না, আর জানার ঔৎসুক্যও আমার ছিল না।

দু'দিন পরে আমার ঘরে এল অরিন্দম। মুখখানা কি যেন এক চিন্তায় থমথম করছে। বাবা ছিলেন না।

বললাম, দু'দিন দেখা নেই, হঠাৎ কি মনে করে?

ও একটু ম্লান হেসে বলল, আমাকে কয়েক দিনের ভেতরেই পাটনা চলে যেতে হচ্ছে কাঞ্চী।

কথাটা শুনে আমি কেমন যেন হয়ে গেলাম।

বললাম, কি এমন জরুরী কাজ পড়ল তোমার?

ও অল্প কটি কথায় বলল, সে তুমি বুঝবে না।

আমি ওর দিকে শুধু চেয়ে রইলাম। কেমন যেন কান্না পাচ্ছিল আমার।

ও উঠতে যাচ্ছিল, আমি হাত ধরে ফেললাম।

আমাকে কাঁদিয়ে কি সুখ তুমি পাও অরিন্দম?

ও অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, তোমাকে কাঁদিয়ে! আমি কি এমন কিছু বলেছি যাতে তুমি আঘাত পাও?

আমার গলা বন্ধ হয়ে আসছিল, তবু বললাম, তুমি এখান থেকে যাও অরিন্দম। আর এসো না, কোনদিন এসো না আমার কাছে।

অরিন্দম কোন কথা বলল না, চুপচাপ বসে রইল কতক্ষণ। আমি ঘরের ভেতর ঢুকলাম। কান্নায় ভরে উঠছিল আমার চোখ। একটু সুস্থ হতেই মনে ভিড় করে এল সহস্র প্রশ্ন। আমি কঁদছি কেন? অরিন্দমকে আমি এমন কিছু দিতে পরিনি যাতে ও চিরদিন বাঁধা থাকে আমার কাছে। আমি ভীরু কিন্তু লোভ আমার কম নয়। প্রচলিত নিয়মকে ভেঙে ফেলার জোর আমার নেই, অথচ অরিন্দমকে কাছ ছাড়া করতে মন চাইছে না।

বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। অরিন্দম তেমনি বসে আছে।

বললাম, কবে যাচ্ছ?

ও ঠিক কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে আমাকে এতটা স্থির দেখবে আশা করেনি।

প্রথমে তাই একটু চমকে উঠে বলল, যাচ্ছি, হ্যাঁ যাচ্ছি দু'চার দিনের ভেতরেই।

বললাম, বাবার চিঠি পেয়েছ?

ও মুখে একটুখানি হাসি টেনে বলল, না না, বাড়ির ব্যাপারই নয়, আমার নিজের কাজ।

জানি, ওর কাছ থেকে স্পষ্ট উত্তর পাবনা, তবু বললাম, কোন বন্ধুর বিয়ে বুঝি?

ও এবার দুষ্টুমি করে বলল, এক বন্ধুর বিয়ের কথাবার্তা চলছে ঠিক, তবে সেজন্যে পাটনায় যাবার দরকার পড়বেনা, এই ঝালদায় থাকলেই চলবে।

বললাম, তুমি বোধহয় আসল খবরটা এখনও পাওনি। তোমার সে বন্ধুটি এক অবাধ্য ছেলেকে ভালবেসেই চির-কুমারীব্রত গ্রহণ করেছে।

অরিন্দম বলল, শেষ খবরটা দেখছি তোমারও অজানা। ছেলেটি আমার বান্ধবীটিকে মুক্তি দিয়ে চলে যাচ্ছে, সে আর তাকে জ্বালাতে আসবে না।

আবার আমার সারা মন জুড়ে মেঘ ঘনিয়ে উঠল। আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। বর্ষার ধারা নেমে এল আমার দুচোখ ভাসিয়ে।

ও উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তে বাবার পায়ের সাড়া পাওয়া গেল বাইরে।

ও থেমে গেল, আর আমি ঘরের ভেতর চলে এলাম।

বাবা ঘরে ঢুকে অরিন্দমকে দেখেই বলে উঠলেন, হবেক নাই, কাঞ্চীকে ঐ কঞ্জুস ব্যাটাদের হাতে দিতে পারব নাই। আমার কোম্পানিটা ওদের হাতে দিতে হবেক, ছেলের নামে লিখাপড়া করে দিতে হবেক, তবে দয়া করবেন স্যাঙাৎরা। আমার কাঞ্চী কি ফ্যালনা অরিন্দম। ওদের ট্রেনে তুলে দিলাম,

নিজের পয়সায় টিকিট কেটে দিলাম, ট্রেন ছাড়লে জানায়ে দিলাম, এ বিয়ে হবেক নাই। অরিন্দম, সারা পথটা মায়ের জন্যে আমার মনটা কেমন করছে বটে!

ভেতর থেকে দেখলাম, অরিন্দম মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল, কোন কথা বলল না।

সেই মুহূর্তে আমার মনে হল অরিন্দম কেন বলছে না তার নিজের কথা। সে যা চায় স্পষ্ট করে বলুক বাবার কাছে। আমি মেয়ে হয়ে যা পারব না, পুরুষ হয়ে কেন ও তা বলতে পারছে না।

কিন্তু কোন কথাই বলল না অরিন্দম। কিছুক্ষণ আসবাবপত্রের মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে বাবার আক্ষেপগুলো শুনল, তারপর একসময় বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

পরের দিন বাবার মুখ থেকে একটা কথা শুনলাম।

অরিন্দম আমার ঠাকুরদাদা রুইদাস সরকারের স্মৃতিসভা করতে চায় কারখানায়। ঠাকুরদাদার জন্মদিনে হবে সে অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যে ভেতরে ভেতরে সে সারা ঝালদায় প্রচারপত্র বিলি করেছে। সাধারণ মানুষকে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য জানিয়েছে সাদর আমন্ত্রণ।

রাতে ছৌ নাচের ব্যবস্থাও করেছে সে। করঞ্জ পুজোর সময় না হলেও ছেলেমেয়েদের দিয়ে করঞ্জ পুজোর নাচগানের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। বাবার মুখ থেকে জানা গেল, অরিন্দমের উৎসবের পরিকল্পনাটা কেবল সাধারণ মানুষকে নিয়েই। তাদের জানান দরকার যে রুইদাস সরকার তাদেরই মত অতি সাধারণ ঘরের একটি মানুষ, কিন্তু কাজের ভেতর দিয়ে তিনি দেশের মানুষের জন্য অসাধারণ কিছু করে গেছেন।

বাবার মুখ থেকে কথাটা শুনে সেই মুহূর্তে একবার দেখতে ইচ্ছে করছিল অরিন্দমকে। ঠাকুরদাদার ওপর গভীর আকর্ষণই তার ভেতর এ ধরনের পরিকল্পনার প্রেরণা জুগিয়েছে।

বাবা অরিন্দমের খুব তারিফ করলেন। এ কথাও বললেন, অরিন্দম নাকি আমার মায়ের একটি ফটোকে নিয়ে গিয়ে এনলার্জ করেছে। ঠাকুরদাদার সঙ্গে সঙ্গে মাকেও সে পরিচিত করাবে সবার সঙ্গে।

বাবার মুখে শুনেছি, মা গান্ধীজীর লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে ছিলেন আমার মা, কিন্তু অসামান্য ছিল তাঁর মনের প্রগতি।

আমার ঠাকুরদাদা তাঁর বৌমাকে নাম ধরে ডাকতেন, বড় ভালবাসতেন। নিজের মেয়ে ছিল না ঠাকুরদাদার তাই পুত্রবধূ আর মেয়ে দুধারার স্নেহই ভোগ করতেন একা আমার মা।

সভার দিন আমাদের কারখানার প্রাঙ্গনে লোকজনদের ঠাঁই দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। কাতারে কাতারে মানুষের মাথা, গুনে শেষ করা যায় না। প্রাঙ্গন ছাপিয়ে পথে গিয়ে পড়ল সে স্রোত। অভূতপূর্ব ব্যাপার! বাবার চোখ দুটো দেখলাম ছলছল করছে। খালি পায়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন।

বিকেলে সভা বসল। ঝালদার সবচেয়ে পুরোনো অতি সাধারণ ঘরের এক বৃদ্ধ মানুষকে অরিন্দম করেছে সভাপতি। তিনি বলে চললেন রুইদাস সরকারের কথা। ভাষা নেই, বলার ভঙ্গী নেই, তবু প্রাণের আবেগ আর উত্তাপে বলে চলেছেন। হাজার হাজার মানুষ শুনছে সে কথা। আরও শুনতে চায় মানুষ পুরোনো দিনের কথা। যেন এক উন্মাদনায় পেয়ে বসেছে সবাইকে।

মায়ের কথা বললেন এক মহিলা। তিনি কেমন করে আইন অমান্য আন্দোলনে সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েদের ডাক দিয়ে বের করে এনেছিলেন।

কথাগুলো শুনছিলাম, আর জলে ভরে উঠছিল দুটো চোখ!

অরিন্দম অক্লান্ত। কি এক নেশায় যেন ওকে পেয়ে বসেছে। সরকার টুল কোম্পানির ইতিহাস ও একটি ছোট্ট পুস্তিকায় ছাপিয়ে বিতরণ করেছে সবার ভেতর। দেশের কত ছেলে এই কারখানায় কাজ শিখে স্বাধীন জীবিকার পথ বেছে নিয়েছে তার তালিকা ও সংগ্রহ করে ছাপিয়েছে ঐ পুস্তিকায়।

অপরাহ্নে সর্বসাধারণকে কিছু ফল মিষ্টি বিতরণ করা হল। রাতে বাতি জ্বেলে আসর সাজিয়ে হল ছৌ নাচ। মুখোশ পরে অসুর বধের সে কি লীলা দেবীর। পরের দিন হল করঞ্জ পুজোর নাচ আর গান।

পায়ে চুট্‌কী আর মল পরে হাতে বাজু দুলিয়ে আঁচল নেড়ে নেড়ে তালে তালে মেয়েরা নেচে চলেছে। গলায় বাজছে গান। ছেলেরাও নাচছে আর উত্তর দিচ্ছে গানে গানে।

মেয়েরা গাইছে ঃ

'দাদাগো দাদা কুরাতি বুঝাতে
বৈশাল ছোট কি ননদ্।
বুঝাতে বুঝাতে ননদ্ পড়ি গেলা ঃ
লাজোহ্না গেল শ্বশুর ঘর।।'

ছেলেরা অমনি গেয়ে উঠল ঃ

'তু নাকি যাবি ডেরা মালঞ্চার দেশে'

মেয়েরা গাইল ঃ

'আনি দিত ঃ দিত ঃ শাখা বা সন্দেশ।'

ছেলেরা অমনি গানে গানে বলল ঃ

'তোর গাঁওয়ে নাকি ভৌজি বড়ে শিশির আছে।'

মেয়েরা আবার গাইল ঃ

'আনি দিত ঃ দিত ঃ শাখা বা সন্দেশ।'

দুটো দিন পাথর ভাই, সারা ঝলদার পথে ঘাটে যেন আনন্দের রঙমশাল জ্বলতে লাগল।

একটু থেমে কাঞ্চীদি বলল, তোমরা হয়ত আজ আমাকে পাগল ভাবছ পাথর ভাই। ভাবছ, আমি স্মৃতির দিনগুলোকে টেনে টেনে আনছি কথা গান আর অভিনয়ের ভেতর দিয়ে। কিন্তু আজ যে ঐ স্মৃতি ছাড়া আমার সম্বল কিছু আর নেই ভাই।

ঐ আনন্দের, উন্মাদনার দুটো দিন কাটতে না কাটতেই বিচ্ছেদের করুণ সানাইটা বেজে উঠল। অরিন্দম বিদায় নিয়ে চলে গেল পাটনায়। সে যেন ঋণশোধ করে দিয়ে চলে গেল।

ওর চলে যাবার পর এত অন্ধকার নামল যে আমি দুহাতে সরিয়ে সরিয়েও তাকে পার হতে পারলাম না।

ম্যানেজারের ঘরে আমাকে বাবা বসতে বললেন। আমি কিন্তু একটি দিন সেখানে ঢুকেই নানা অজুহাতে সেখান থেকে পালিয়ে এলাম।

অরিন্দমের স্মৃতিগুলো যে এমন করে ক্ষত বিক্ষত করতে পারে তা সেই প্রথম উপলব্ধি করলাম।

দিনগুলো সে সময় বড় দীর্ঘ বলে মনে হত আমার। রাতগুলো দুঃখের আর আঘাতের স্বপ্নে ভরা।

অরিন্দম কাছে ছিল, কিন্তু সে যে আমার বুকের এত কাছে ছিল তা ওর চলে যাবার পর বুঝতে পারলাম। দারুণ একটা কষ্ট সবসময় আমি বুকের ভেতর অনুভব করতাম। ওর যে আসনটা আমার মনের ভেতর নির্দিষ্ট ছিল সেটা শূন্য হয়ে যাবার পর আমি এমন ভারহীন হয়ে পড়লাম যে গুছিয়ে কাজকর্ম চালান আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। শূন্যতা যে এমন গুরুভার তা সেই প্রথম আমি অনুভব করলাম।

তুমি জান কিনা জানিনা পাথর ভাই যে জীবনে আমার চাহিদা বড় কম।

কিন্তু ওর চলে যাবার পর একটি চাহিদা আমার সারা মনকে উন্মুখ করে তুলল। ওর কাছ থেকে একটি চিঠির আশা আমি প্রতিদিন করতাম।

কারখানায় প্রায় দু'একদিন অন্তর পিয়ন আসত চিঠিপত্র নিয়ে। আমি এমন করে ঐ পিয়নের আসার পথের দিকে বোধ করি আর কোনদিন তাকাইনি। ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে একটা আশার উত্তেজনায় বুকটা কেঁপে উঠত, তারপর যখন চলে যেত তখন সারা মন জুড়ে নামত একটা অবসন্নতা।

আমার সেই বড় ব্যথার দিনগুলোর সঙ্গী সেদিন কেউ ছিলনা পাথর ভাই। একা একা আমি ওর বিচ্ছেদের দুঃখগুলো বয়ে বেড়িয়েছি।

বাবার সঙ্গে মুখোমুখি হলেই প্রসন্নতার একটা ভাব ফুটিয়ে তুলতে হত। আমি বেশ বুঝতে পারতাম বাবা মনে মনে আমার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু কোনদিন বাবার কথায় বা আচরণে সে ভাব প্রকাশ পেত না।

বড় জেদী আর একরোখা মানুষ আমার বাবা। তুমি জান পাথর ভাই, কতখানি মনের জোর তাঁর। কিন্তু আমার বাবা যে কত বড় একটা হৃদয় নিয়ে বাস করেন তা অনেকেই জানে না। তিনি তাঁর মেয়েকে অতি সাধারণ একটি ছেলের হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত যদি দেখেন ছেলেটি মনের দিক থেকে অন্য পাঁচ জনের চেয়ে অনেকখানি এগিয়ে আছে। শিক্ষিত ছেলের খোঁজ তিনি করেন ঠিকই, কিন্তু সম্ভ্রান্ত মন না দেখলেই তিনি মুহূর্তে তাকে বাতিল করে দিতে দ্বিধা করেন না।

বাবাকে দেখলেই কেমন আমার কষ্ট হত। মায়ের অনেক গল্প আমি শুনেছিলাম, কিন্তু বাবার কাছে থেকে মায়ের অভাব আমি কোনদিন বুঝতে পারিনি।

বাবা আমাকে মা-হারা বলে অতিরিক্ত আদর কখনো দেননি। তিনি আমাকে প্রতিটি কাজে পরিশ্রমী হতে শিখিয়েছিলেন। হিসেব করে বিবেচনা করে শিখিয়েছিলেন পথ চলতে।

কিন্তু সব হিসেবে যে আমার ভুল হয়ে গেল ভাই। ওর সঙ্গে গঙ্গার চরে যাওয়ার পর থেকে সেই যে আমার হিসেবে গরমিল শুরু হল তা দিনের পর দিন বেড়েই চলল।

বুঝি এমনিই হয় সবার। অনেক হিসেবী মনকেও এই একটি ক্ষেত্রে হার মানতে হয়। ভালবাসা জীবনের সব অঙ্ক ভুলিয়ে দেয়।

ও ঝালদা থেকে চলে গেলে আমি শুধু ভাবতাম, কেন এমন করে ও চলে গেল। যতটা উত্তাপ আমার কাছ থেকে ও পেতে চেয়েছিল তা পায়নি বলে কি অভিমান! অথবা আমাকে বাবা যেভাবে সংসারী করতে চান সেপথে ও বাধা হয়ে আর দাঁড়াতে চায়না বলেই কি এই সরে যাওয়া!

আবার একদিন আমার মনের ওপর বিদ্যুতের মত একটুকরো ভাবনা চমকে উঠল।

ওর আর আমার চিঠির খেলাতে যে কবিতা ও উদ্ধৃত করেছিল তার ভেতর কি ওর নতুন পথের ইসারা আছে!

'ঝড়ের গর্জন মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে ;
ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল,
যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল।'

সে ঝড় কি রাজনীতির ঝড়! অরিন্দম কি সেই ঝড়ের খেয়াতরীর নাবিক হতে চায়, তাই সব ছেড়ে চলে যাওয়া।

কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে সে কথা সে কেন বলল না আমাকে। এবার আমার অভিমানের পালা। যাকে ভালবেসেছি, সে কেন এমন গোপন করে রাখবে নিজেকে। যাক, যাতে ও তৃপ্তি পায় তাই করুক। আমি যেমন দূরে আছি তেমনই থাকব।

কিন্তু ভাই ভালবাসার আবেগ সব প্রতিজ্ঞাকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যারা ভালবাসার উচ্ছ্বাসকে জলো রোমান্টিকতা বলে সমালোচনা করে তারা হয় কোনদিন ভালবাসার ছোঁয়া পায়নি, না হয় মনটা তাদের এমন বুড়ো হয়ে গেছে যে ভালবাসার কথা ভাবতে গেলেই কেমন যেন বিস্বাদ লাগে।

সত্যিকারের ভালবাসা মনের সব প্রতিরোধকেই ভেঙে দেয়। আমার অভিমান অরিন্দমের কথা ভাবতে ভাবতে কোথায় ভেসে চলে গেল।

চিঠি এল অরিন্দমের, সেই দিনটিতেই বাবা চলে গেলেন রাঁচি।

অরিন্দম লিখেছে ঃ

'কাঞ্চী, এ সময় একবারটি কেন জানি না তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে। আমি জানি তোমার পক্ষে বাবার কাছ থেকে চলে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু তুমি আসবে না জেনেও কেন যে আসতে লিখছি তা জানি না।'

ও পাটনার যে ঠিকানা দিয়েছে সেটা ওর বাড়ির ঠিকানা নয়। আমার চিন্তা আরও বেড়ে গেল। কি হল অরিন্দমের. ও হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে নতুন বাসা নিতে গেল কেন?

অনেক কথা ভাবতে ভাবতে মনে হল, আর ভাবতে পারি না। যেই ভাবনার হাল ছেড়ে দিলাম, অমনি একটি ইচ্ছা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সব ফেলে আমাকে এখুনি পাটনা চলে যেতে হবে।

সামান্য দু'একটা জিনিস গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ঘরের বাইরে। যাবার আগে বাবাকে একটি চিঠি লিখলাম।

'পাটনা যাচ্ছি, তুমি কিছু ভেব না। বড় হয়েছি তোমার কাছে, ভেবে চিন্তেই পথ চলব।'

চলে এলাম পাটনা, ওর নতুন ঠিকানায়।

একটা পুরোনো, প্রায় পরিত্যক্ত মহল্লায় ঠিকানা খুঁজে খুঁজে বাসাটা পেয়ে গেলাম। ভাঙা পড়ো প্রকাণ্ড একখানা বাড়ির একতলা। ও বাড়িতে দ্বিতীয় কোন মানুষের বসতি ছিল না। আমি দরজার সামনে এসে নম্বরটা দেখতে পেলাম, আর দেখলাম, একটি তালা আমাকে হতাশ করে দিয়ে বাড়ি আগলে ঝুলে রয়েছে।

বসে রইলাম সিঁড়িতে। বিকেল গড়িয়ে রাত্তির। কারো পাত্তা নেই। চাঁদ নেই আকাশে, কাছে পিঠে আলোর চিহ্ন মাত্র নেই। ভয় আমার কোনদিনই ছিল না, না হলে অনেক সাহসীর পক্ষেও সেখানে বসে থাকা সম্ভব হত না।

কত রাত হল আন্দাজ করতে পারছিলাম না। ক্লান্তিতে কখন ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। আমি সিঁড়িতে বসে দরজায় মাথা ঠেকিয়ে ঝিমুচ্ছিলাম। এ অবস্থায় অপরিচিত পড়ো বাড়ির সামনে একটি মেয়ের বসে থাকা প্রায় অবিশ্বাস্য। আমি হয়ত অরিন্দমের বাড়ি চলে যেতে পারতাম, আর তাই যাওয়াই আমার উচিত হত, কিন্তু যেতে পারলাম না। অনেক কষ্ট করে ওর জন্যেই এসেছি, সুতরাং আমার সকল কষ্ট, সকল প্রতীক্ষা ওকে দেখেই সার্থক হোক, এই প্রবল ইচ্ছাটুকু নিয়ে আমি বসে রইলাম।

ক্লান্তিতে কখন ঝিমুতে ঝিমুতে ঘুমিয়ে পড়েছি, চাঁদ উঠেছে। কখন চুপি চুপি উঠোন পেরিয়ে আলোটুকু এসে আমাকে ছুঁয়েছে, আমি তার কিছুই জানতে পারিনি।

কার হাতের ছোঁয়ায় চমকে সোজা হয়ে বসলাম।

চোখ মেলে তাকাতে পারছিলাম না।

ও হাঁটু গেড়ে নত হয়ে বসে দুহাতে অঞ্জলি করে আমার মুখখানা তুলে ধরে দেখছে।

আমাকে তাকাতে দেখেই ও অস্পষ্ট গলায় বলল, তুমি এসেছ কাঞ্চী, সত্যি তুমি এলে!

আমাকে দেখে ওর বিস্ময়ের যেন শেষ নেই।

মনে হচ্ছিল ওর অঞ্জলির ভেতর আমার এই মুখখানা আমি অনন্তকাল ভরে রেখে দেব।

কিন্তু এক সময় ওর অঞ্জলিবদ্ধ হাতের থেকে আমার মুখখানা সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, আমাদের এই চাঁদের আলোয় কেউ দেখছে কিনা।

ও ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে ফেলেছে।

ঘরে ঢুকে জ্বালিয়ে ফেলল একটা হ্যারিকেন। আমি সেই আলোয় আবার নতুন সংসারে প্রবেশ করলাম।

ও নিজর জন্যে ঠোঙায় করে খাবার এনেছিল। হাত মুখ ধুয়ে তাই দুজনে ভাগ করে খেলাম।

সমস্যা হল শোবার সময়ে। একখানা নড়বড়ে চারপাই। বিছানা পত্র আছে কি নেই বোঝা মুশকিল।

বললাম, একখানা কম্বল থাকে তো দাও, ওতেই আমি চালিয়ে নিতে পারব। ঐ হাতলওয়ালা চেয়ারটায় বসব, আর তুমি যদি তোমার ঐ খাটিয়াখানার ওপরে একটু পা রাখার সুযোগ দাও তাহলে দিব্যি কেটে যাবে আমার রাত। না, না, ভাবনার কিছু নেই, সত্যি করে বলছি, বসে বসে ঘুমের মাঝে ডুবে যেতে সবাই না পারলেও আমি পারি। লক্ষ্মীটি, অকারণে বিব্রত হোয়োনা, তুমি আরামে তোমার রাজশয্যায় নিদ্রা যাও।

ও প্রতিবাদ করতে গিয়েও আমার প্রবল মাথা নাড়া আর চোখ মুখের মিনতি ভরা ছবি দেখে থেমে গেল। সে রাতের জন্যে আমার ব্যবস্থা বহাল রইল।

ভোর হল। রাতের নিবিড় ঘুম কাটিয়ে দিয়েছিল পথের ক্লান্তি। আমি উঠে পড়লাম। ও তখনও ঘুমুচ্ছে। ভোরে ওঠার অভ্যেস ওর বোধকরি শিশুকাল থেকেই নেই। পাটনার বাড়িতে স্কুল কলেজ জীবনে দেখেছি ও বেলা আটটার আগে কখনও উঠত না। এর আগে কোন কারণে উঠতে হলে ওর মেজাজ যেত বিগড়ে। এখানেও দেখলাম অভ্যেসের কোন ব্যতিক্রম নেই।

আমি উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম। ঝালদায় ওর ডেরার চেয়ে কোনদিকে কোন উন্নতির লক্ষণ দেখতে পেলাম না। তেমনি ছড়ানো ছিটোনো অগোছাল সবকিছু। কেন জানি না হাসি পেল মনে মনে। ভাবলাম, এ মানুষ আবার সংসার করতে চায়। এতটুকু বাস্তব সংসারের বুদ্ধি যার নেই সে স্ত্রীকে চালাবে কি করে!

কাঞ্চীদির কথার মাঝেই বললাম, কিছু মনে করোনা কাঞ্চীদি, পুরুষেরা সংসার গোছাতে পারে না বলেই বিয়ে করতে চায়। আর তাই স্ত্রী হল সংসারের শ্রী।

কাঞ্চীদি বলল, দেখ ভাই এক তরফা কিছু হবার নয়, স্ত্রী পুরুষে মিলেই সংসারের শ্রী ফেরাতে হয়। শিব একেবারে খেয়ালী আর সংসার বিবাগী বলে বেচারা পার্বতী না পারলেন সংসার গোছাতে, না পারলেন অনটন মেটাতে।

থামল কাঞ্চীদি। তারপর পুরোনো কথার খেই ধরে বলতে লাগল, আমি অগোছাল ঘরটাকে সাধ্যমত গুছিয়ে ফেললাম। দেখলাম রান্নার কোন ব্যবস্থা নেই। কুয়োতলায় গিয়ে স্নান সারলাম।

ফিরে এসে দেখি অরিন্দম কখন বিছানা থেকে নিঃশব্দে উঠে চলে গেছে।

ওর জীবনে আমি এই প্রথম নিয়ম ভঙ্গ হতে দেখলাম।

ফিরে এল অরিন্দম হাতে খাবারের ঠোঙা নিয়ে।

মুখে মিষ্টি মিষ্টি হাসি, বলল, অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে কচুরী আর জিলিপি নিয়ে এলাম।

মনে মনে বললাম, আমি তোমার অতিথিই বটে।

মুখে বললাম, জলখাবার এনেছ ভালই করেছ, কিন্তু তার চেয়েও আমার উপকার করতে যদি একটা উনুন কিনে আনতে। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন বস খাও, তারপর বাজরে গিয়ে রান্নার সরঞ্জাম আর দরকারী কিছু জিনিসপত্র কিনে নিয়ে এসো।

ও আমতা আমতা করে বলল, এত হাঙ্গামার ভেতর যাবে না হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে নেব?

এখানে কি দু'একদিন থাকবে না কিছুদিন, তাই আগে বল।

ও বলল, তা তো ভাবিনি।

হেসে ফেললাম আমি, চমৎকার সংসার। বেদেরা এক জায়গায় বেশিদিন থাকে না, তাই বলে তারা কি হোটেল আর সরাইখানায় খায়?

ও খাবার গুলো ভাঙা চেয়ারটার ওপর তাড়াতাড়ি রেখে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল বাইরে।

বললাম, এই খাবারগুলো আগে খেয়ে নাও। ফিরে আসতে আসতে জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে।

ও বাধ্য ছেলের মত মুখ হাত ধুয়ে এসে বসল। ভাঙা একটা কলাইয়ের থালা সম্বল ছিল, তাতে খাবারগুলো ঢেলে ফেললাম।

জলযোগের পাট চুকলে ওকে বললাম, হাজার বার বাজারে ছুটে কাজ নেই, আমি একটা মোটামুটি ফর্দ করে দিচ্ছি, তুমি জিনিসগুলো মুটের মাথায় চাপিয়ে একেবারে নিয়ে চলে এসো।

ও এবার হেসে বলল, তাহলে সত্যি তুমি সংসার করতেই এলে!

বললাম, তবে কি পাটলীপুত্রের পুরোনো ধ্বংসাবশেষ দেখতে এলাম বলে মনে হচ্ছে?

ভেবে ভেবে একটা ফর্দ বানালাম। ব্যাগের থেকে কিছু টাকা বের করে ওর হাতে দিতে যেতেই ও সরে দাঁড়িয়ে বলল, এখনও আমার ব্যাঙ্ক ফেল হয়নি, ঐ ফর্দটাই দাও।

ওর হাতে টাকা কটা জোর করে গুঁজে দিয়ে বললাম, এ সংসারে তোমার মত আমিও একজন পার্টনার। সুতরাং আমাকেও খরচের কিছু ভার বইতে দাও। এক তহবিল থেকে এখন খরচ চলুক, পরে অন্য তহবিলে হাত দেওয়া যাবে।

ও বলল, এ কি রকম হল কাঞ্চী, ঝালদায় তুমি মালিক আমি ম্যানেজার, আর এখানেও তুমি আমাকে বাজার সরকারের ওপরে উঠতে দিলে না।

যাও তো বাক্যবাগীশ, যা বলছি লক্ষ্মী ছেলের মত করে ফেল।

আমরা ঐ পোড়ো ভাঙা বাড়ির ভেতরেই সংসার পাতলাম।

এক সময় ওকে বললাম, বাড়ি ছাড়লে যে? ঝগড়া করলে কার সঙ্গে?

ও বলল, মোটেও না। আমি কি ঝগড়াটে বলে তোমার মনে হয়েছে?

তবে?

ও বলল, অজ্ঞাতবাসের দরকার, তাই এই কৃচ্ছ্রসাধন।

হেসে বললাম, তোমার কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য একটি সাধন-সঙ্গিনীর দরকার ছিল, তাই বুঝি আমার ডাক পড়ল?

ও শুধু হাসল, কিছু বলল না।

বললাম, আর যাই কর, ডাক যখন দিয়েছ তখন সাধন ভজনের ভেতরেও সংসারের কথাটি ভুলো না।

কুটনো কুটতে কুটতে কথা হচ্ছিল।

অরিন্দম বলল, দেখ কাঞ্চী আমাদের ভেতব একটা কথা প্রথমেই পাকাপাকি হয়ে থাকা ভাল।

মুখ তুলে ওর দিকে তাকালাম।

ও বলল, আমরা কেউ কারো কাজকর্ম কিংবা গতিবিধির ওপর নজর রাখব না। শুধু নজর রাখা নয়, ঔৎসুক্যও দেখাব না।

বললাম, এমন লক্ষ্মণেব গণ্ডী দিলে সহজেই সীতাহরণ হয়ে যাবে।

ও অমনি বলে বসল, তাহলে লঙ্কাকাণ্ড আর রাবণবধ হতে বেশি বিলম্ব ঘটবে না।

বললাম, তুমি তো জান অরিন্দম অন্যের ব্যাপারে ঔৎসুক্য আমার প্রায় শূন্যের ঘরে। তবে তোমার ব্যাপারে ঔৎসুক্য না থাকলেও উদ্বেগ যে থাকবে এ আমি অস্বীকার করি কি করে।

অরিন্দম চারপাই-এর ওপর বসেছিল, ও এপর দুলতে লাগল· ভাঙা চারপাইটা আর্তনাদ করে তার সকরুণ ব্যথা প্রকাশ করতে লাগল।

এক সময় থেমে গেল অরিন্দম। বলল, আমি কোন অন্যায় বা কোন ছোট কাজ করব এ কথা তুমি ভাবতে পার?

বললাম, এমন করে বলছ কেন অরিন্দম। তোমাকে ছোট বলে ভাবলে কি এত দূরে সব ফেলে ছুটে আসতে পারি?

অরিন্দম খাটিয়া থেকে লাফ দিয়ে নীচে নেমে আমাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে শূন্যে তোলার চেষ্টা করতেই ওকে বললাম, দোহাই তোমার অরিন্দম, ওপরে তুলে আবার নীচে ফেলে দিওনা। নিজের ভার আমাকে নিজেকেই বইতে দাও।

অরিন্দম তার বলিষ্ঠ দুটো হাতের বাঁধন শিথিল করে দিল, কিন্তু সামনে না এসে আমার চুলের ভেতর দুষ্টুমি করে গাল চেপে বসে রইল।

বললাম, এমন করে বসে থাকলে চলবে না, কাজ আছে।

ও মুখ তুলে বলল, বল কি কাজ?

ভুলে গেছি ফর্দে থালা অথবা পাতা আনার কথা লিখতে। একটি তো কলাই-এর থালা সম্বল।

ও সামনে এসে বলল, কবি বলেছেন, 'ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্ন পান।'

বললাম, অন্ন পান অবশ্যই ভাগ করে খেতে বলেছেন কিন্তু এক পাত্রে নিশ্চয়ই খেতে বলেননি।

ও অমনি বলে উঠল,

'যদি হয় সুজন
তেঁতুল পাতায় দুজন।'

বললাম, আমি একেবারেই সুজন নই, দয়া করে একবার বাজারে যাও, দুটো থালা কিনে নিয়ে এসো।

ও চলে যাচ্ছিল দেখে বললাম, টাকা নিয়ে গেলে না?

অরিন্দম পকেট থেকে কতকগুলো টাকা বের করে আমাকে দেখাল।

বললাম, শোন আমার কাছে।

ও একটুখানি এগিয়ে এল, তারপর বলল, বল কি বলতে চাইছ?

আমার একেবারে এই কাছে এসে বোস।

ও বাধ্য ছেলের মত আমার পাশটিতে এসে বসে পড়ল।

আমি ওর পকেটে হাত ঢুকিয়ে টাকা কটা বের করে নিয়ে বললাম, এখন থেকে টাকা পকেটে নিয়ে ঘুরবে না। দরকার হলে চেয়ে নেবে।

অরিন্দম বলল, বাব্বা, সেই মাস্টারি! বয়েসটা যখন কম ছিল তখনও তোমার মাস্টারি সহ্য করেছি, এখন দেখছি ডবল পীড়ন শুরু হল।

বললাম, মিছে কথা বল না অরিন্দম, কোনদিনই তুমি ছোট ছিলে না। তাছাড়া আমার মাস্টারি তুমি আদপেই বরদাস্ত করনি।

অরিন্দম বলল, অনেক না মানা এবার বহু মানা দিয়ে শোধ দেব।

বললাম, একেই বলে লক্ষ্মী ছেলে।

অরিন্দম বেরিয়ে গেল। আমার আর তরকারি তৈরি করা হল না। হাতের সব্জি হাতে ধরা রইল, আমি অন্যমনস্ক হয়ে কত কথা ভাবতে লাগলাম।

অরিন্দমের জন্যে কি গভীর আকর্ষণ আমার মনের মধ্যে ছিল যে কারণে সামান্য একটুকরো চিঠি আমাকে এতদূর পথ টেনে এনেছে। জন্মান্তর আছে কিনা জানি না, তবে যদি থাকে তাহলে ও আমাকে অনেক জন্মের ওপার থেকে টান দিয়েছে। চিরদিন ও একটি বলিষ্ঠ কিশোর, নিজের ইচ্ছা-শক্তির বলে সামনের দিকে ছুটে চলেছে। পথে যাকে দেখে ওর ভাল লেগেছে তাকেই উজাড় করে দিয়েছে কিশোর হৃদয়ের উত্তাপভরা ভালবাসা।

অরিন্দমকে কি দিতে পারি আমি। ওর ভালবাসার কতটুকু প্রতিদান আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব!

ও খেয়ালী কিশোরের মত সবকিছু মুহূর্তে চেয়ে বসে, কিন্তু ভুলিয়ে দিলে ভুলে যেতে ওর বেশি সময় লাগে না।

কি দুর্বার লোভ ওর, তবু এতটুকু পেলেই কি পরম সন্তোষ চোখে মুখে ফুটে ওঠে।

ভাবতে ভাবতে আর একটা ভাবনা মনে এল। বাবা ঘরে ফিরে আমার চিঠি পড়ে কি ভাবছেন আকাশ পাতাল। নিজেকে কেমন অকৃতজ্ঞ মনে হল। অসহায় অবস্থা থেকে যিনি আমাকে নিজের শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন সেই বাবাকে ছেড়ে চলে আসতে এতটুকু দ্বিধা হল না। ঝালদার প্রতিদিনের ঘটনা আমাকে ঘিরে যেন একের পর এক ঘটে যেতে লাগল। বাবাকে প্রতিমুহূর্তে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজকর্মের ভেতরে যেন আমি দেখতে পেলাম।

এ মানুষের আর এক ছবি। কারো ওপর নির্ভরতা নেই। নিজের কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে নিজে করে চলেছেন। অন্যের উপকার করেন সাধ্যমত, কিন্তু প্রতিদান চান না কারো কাছে। বৃদ্ধ হয়েছেন, তবু দুর্বলতাকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেননি। নিজের ভাবনাকেই মনে করেন একমাত্র সত্য, আর সেই ভাবনার পথ ধরে এগিয়ে যেতেই তাঁর সুখ।

এক সময় মনে হল, সব মিথ্যে হয়ে যায় যখন ভালবাসা হৃদয়টাকে সম্পূর্ণ দখল করে নেয়। কর্তব্য, রক্ত সম্বন্ধ সবকিছু পুরোনো পাতার মত ঝরে পড়ে যায়। বসন্ত বড় উদ্ধত ঋতু, সে অন্য কারো শক্তিকেই সহ্য করে না।

এমনি করে ভাবছিলাম কতক্ষণ মনে নেই, হাতের ওপর মাথা রেখে ভাবছিলাম, ও কখন এসে দাঁড়িয়েছে তা জানতে পারিনি।

এক সময় মাথা তুলতেই ওর সঙ্গে চোখাচোখি হল। ও আমার দিকে তাকিয়েছিল। ওর মুখে হাসি ছিল না। হয়ত আমার মনের বিপর্যয়ের কোন ছবি ও দেখে ফেলেছে।

বললাম, কি কিনলে দেখি।

ও দু'খানা কলাই-এর থালা, দুটো বাটি আর গেলাস আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, দেখ এতেই চলবে কিনা।

খুশি হয়ে বললাম, খুব সুন্দর হয়েছে, তোমার এতখানি বৈষয়িক বুদ্ধি আছে তা জানতাম না।

ও কোন কথা না বলে জানালার গরাদ ধরে বসল।

তরকারি কাটতে কাটাতে আবার বললাম, বাজারে খুব ছোটাচ্ছি তো?

আমার প্রশ্নের পাশ দিয়েই গেল না ও। শুধু বলল, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে তাই না কাঞ্চী?

এ কথা কেন অরিন্দম! যদি কষ্টই হয় তাহলে জেনো সে কষ্টের সঙ্গে আমার আনন্দও মিশে আছে।

অরিন্দম একটু নড়েচড়ে বসল, মনের কথাগুলো কেমন করে বলবে তাই বোধকরি গুছিয়ে একবার ভেবে নিল।

একসময় বলল, ঘরের কথা মনে পড়ছে নিশ্চয়ই, তাই বলছিলাম।

বললাম, মিথ্যে তোমার কাছে বলব না, বাবার কথা খুব মনে হচ্ছিল। বুড়ো মানুষ, ভাবছেন নিশ্চয়ই অনেক কিছু।

অরিন্দম জানালার বাইরে চোখ মেলে দিল। একসময় স্বগতোক্তির মত করে বলল, তোমাকে ডাক না দিলেই পারতাম কাঞ্চী। কিন্তু মানুষের মন দেখেছি আবেগের দ্বারা যেভাবে চালিত হয়, বুদ্ধির দ্বারা ততটা নয়। সে সময় কিছু না ভেবেই তোমাকে ডেকেছি।

বললাম, আমি তো এসেছি অরিন্দম, তবে আক্ষেপ কেন? আমার মনে দ্বিধা কিংবা পিছুটান থাকলে, বল, আমি কি আসতে পারতাম তোমার কাছে?

অরিন্দম বলল, তবু নিজেকে ক্ষমা করি কি করে বল? সমাজ সংসারের বাঁধন ছিঁড়ে যাকে টেনে আনলাম, সে শুধু আমারই, এ ভাবনার ভেতর অনেকখানি স্বার্থের গন্ধ যে মিশে আছে!

পরিস্থিতি গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে দেখে লঘু সুরে বললাম, রাখ তোমার ভাবনা, দেশে অনেক চিন্তাবিদ আছেন, তাঁরা কি হল আর কি হলনা তাই নিয়ে ভাবুন। আমাদের অতশত ভাবনায় কাজ নেই।

কেন জানিনা লঘু হতে পারল না অরিন্দম। ও অবশ্য আর কিছু বলল না, শুধু চুপচাপ বসে রইল।

আমি একের পর এক সংসারের কাজ করে যেতে লাগলাম, মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম ওকে।

অরিন্দম জানালা থেকে উঠে এসে বসল খাটিয়ার ওপর। ডায়েরীটা খুলে কি সব দেখতে লাগল।

কতক্ষণ পরে ওর হাতে এক কাপ চা ধরিয়ে দিতেই খুব মিষ্টি করে একটা দুষ্টুমীর হাসি হাসল।

আমি কিছু না বলেই আবার কাজে লেগে গেলাম।

রান্না করতে করতে লক্ষ্য করলাম, ওর চা খাওয়া হয়ে গেছে। খালি কাপটা হাতে ধরেই ও বাঁ হাতে ডায়েরীর পাতা উল্টিয়ে চলেছে।

উঠে গিয়ে ওর পাশে দাঁড়ালাম। হাত থেকে খালি কাপটা টেনে নিতেই ও চমকে আমার দিকে ফিরে তাকাল।

আবার সেই হাসি ওর মুখে। বলল, এই নির্জন ঘরখানা পেয়ে তুমি খুশি হওনি কাঞ্চী?

ভাল যে আমার কত লাগছিল তা ওকে কেমন করে বুঝিয়ে বলি।

তবু কপট ক্ষোভ গলায় টেনে এনে বললাম, এই নির্জন ঘরে সংসার পাতব বলেই কি এতদূর থেকে আমাকে টেনে আনা?

ওর হাসি মিলিয়ে গিয়ে মুখখানা এতটুকু হয়ে গেল।

আমি ওর মাথার চুলগুলো দু'হাতে এলোমেলো করে দিয়ে বললাম, হয়েছে, আর ভাল মানুষের মত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে হবে না। চিরদিনটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলছে তোমার মাথায়।

ও অমনি আমার হাতখানা ধরে এমন টান দিল যে আমি হুড়মুড়িয়ে পড়লাম ঐ খাটিয়ার ওপর।

ও আমার দুটো হাত চেপে ধরে আমার মুখের ওপর ওর চোখ দুটো রেখে বলল, যুদ্ধ করে আমার কাছ থেকে ছাড়া পাবেনা তুমি, এখন মুক্তির একটি মাত্র পথ খোলা আছে।

আমি তখন ওঠার জন্যে ওর হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছিলাম।

ওর কথা শুনে স্থির হয়ে রইলাম।

অরিন্দম বলল, সে পথটা হল বিকেলে স্বাগতাকে একটা গান শিখিয়ে দেওয়া। গুরুদেবের দেশাত্মবোধক গানের যে কোন একটি।

চোখে মুখে জিজ্ঞাসা চিহ্ন এঁকে তাকালাম ওর দিকে।

ও আমার হাত ছেড়ে দিয়েছে ততক্ষণে। আমি এবার উঠে বসলাম, কিন্তু যেতে পারলাম না। ওর মুখের দিকে তেমনি তাকিয়ে রইলাম।

ও বলল, কনককান্তি সেনের বোন হল স্বাগতা। কনকদা জেলে গেছেন দেশের কাজ করতে গিয়ে। স্বাগতা এখন রয়েছে বস্ত্র-ব্যবসায়ী কৈলাস প্রসাদের বাড়ি। মা বাবা নেই স্বাগতার। গলাটি ভারি মিষ্টি। স্বদেশী সভা সমিতিতে দেশাত্মবোধক গান গেয়ে বেড়ায়।

বললাম, কৈলাস প্রসাদের কাছে ও রয়েছে কেন?

অরিন্দম বলল, কৈলাস প্রসাদ ধনী ব্যবসায়ী, কিন্তু ভেতরে ভেতরে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। ওর কাছে থাকলে স্বাগতার কোন অসুবিধে হবে না।

এবার স্পষ্ট করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমার দ্বারা গান শেখান হবে না।

অরিন্দম বোধ হয় আশা করেছিল আমি স্বাগতাকে গান শেখাতে পারলে খুশি হব।

ও আমার কথা শুনে কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে গেল।

আমি বললাম, গান ছেড়ে দিয়েছি কতদিন, তাছাড়া হারমোনিয়াম না হলে খালি গলায় গান তেমন জমবে না। এদিকে গানের কথাও ভুলে বসে আছি।

ও দারুণ উৎসাহে খাটিয়ার তলা থেকে একখানা পুরোনো হারমোনিয়াম টেনে বার করল।

ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'দেখতো চেয়ে এবার তুমি চিনিতে পার কিনা?'

আমি হারমোনিয়ামখানা কাছে টেনে নিলাম। অরিন্দমের বাড়ির হারমোনিয়াম। কতদিন গান গেয়েছি এটা বাজিয়ে। কলেজের কোন ফাংশানে গান গাইতে হলে এই হারমোনিয়াম বয়ে নিয়ে গেছি।

অনেকদিন পরে হারমোনিয়ামটা দেখে মন কেমন করে উঠল। আমি ঝেড়ে ঝুড়ে বাজাতে লেগে গেলাম। রিডগুলো প্রায় ঠিকই আছে।

গাইলাম,

> আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনি লীলা তব
> ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব।

সব গানটুকু গাওয়া শেষ হল। অরিন্দম গালে হাত দিয়ে বসে শুনছিল। গান ও শুধু ভালবাসে না, গানের ও পাগল।

গান থামলে বলল, কাঞ্চী, বাড়ির কথা খুব মনে পড়ছে। তুমি কত গান গেয়েছ আমাদের গঙ্গার ধারের বৈঠকখানার ঘরে বসে। কত রাতে আর কত ভোরে শুনেছি তোমার গান। তানপুরোটা তুমি

ঝালদা চলে যাবার সময় নিয়ে যাওনি। ওটা আমি যখের ধনের মত আগলে রেখেছি কাঞ্চী।

ও উঠে গিয়ে আলনার ওপার থেকে ঢাকা পরানো তানপুরোটা বের করে আনল।

বলল, দেখ, দেখ কাঞ্চী, তোমার কোন জিনিস আমি ফেলে রেখে আসিনি। তোমার সব স্মৃতিকে আমি সঙ্গী করে এনেছি।

আমার চোখে ওর ছবি তখন আবছা হয়ে উঠেছে। চোখ ভরে জলের ছায়া।

হাতে উঠিয়ে নিলাম তানপুরো। বেঁধে নিলাম তার। অবাক হয়ে বললাম, তারগুলো এত ভাল আছে কি করে অরিন্দম?

তোমার গুরুর কৃপায়, বলল ও।

বললাম, তার মানে?

অরিন্দম বলল, আমি মাঝে মাঝে তোমার গুরু মহেশ্বরী প্রসাদের কাছে তানপুরো নিয়ে যাই। খারাপ হলে উনি বলে দেন। সারিয়ে ঠিকঠাক করে এনে রেখে দি।

মহেশ্বরী প্রসাদ আমাকে অরিন্দমের বাড়িতে এসে ক্ল্যাসিকেল গানে তালিম দিতেন। বড় ভালবাসতেন আমাকে গুরু মহেশ্বরী প্রসাদ।

জিজ্ঞেস করলাম তাঁর শরীরের কথা।

অরিন্দম বলল, বুড়ো হয়ে গেছেন। হাঁটাচলা করতে পারেন না। ঘরে বসে প্রায় সারাক্ষণই গুনগুনিয়ে গান করেন। আমি ওঁর কাছে গিয়ে মাঝে মাঝে বসে থাকি। আমাকে তাঁর পুরোনো দিনের অনেক গল্প শোনান। যেদিন যাই সেদিনই তোমার খোঁজ খবর নেন। তোমার গলার সুখ্যাতি করেন। আজও রেওয়াজ করছ কিনা জিজ্ঞেস করেন।

তানপুরোটা নিয়ে নমস্কার করলাম গুরুজীকে। মনে এল রাগ কৌশিক ধ্বনি। পরদেশী প্রিয়তমের জন্য বিরহ বেদনায় ভরা সুর।

আজহুঁ না আয়ে বালমুয়া
মোহে কলন পরতু হ্যায়
নিশিদিন বা।
বেসে পিয়া পরদেশ সিধারে
না ভেজ পাতিয়া ভই যগবা।।

গান শেষ হলে অরিন্দম বলল, আগে তোমার মুখে এ গান শুনেছি, কিন্তু এমন করে বুঝি কোনদিন শুনিনি।

তানপুরোটা মেঝেতে শুইয়ে রেখে বললাম, এটা বিরহের গান। যখন বিরহ থাকে না তখনই বিরহের গান শুনতে ভাল লাগে।

কথাটা বলে ওর মুখের দিকে তাকালাম।

ও একটু হেসে বলল, দুঃখের কপাল নিয়ে যারা জন্মায় তাদের বিরহ বুঝি কোনদিনই ঘোচে না।

কথার মোড় অন্য দিকে ঘুরিয়ে বললাম, স্বাগতার কথা বলছিলে না, কেমন গায় মেয়েটি? আমি কি শেখাতে পারব ওকে?

উৎসাহে উঠে দাঁড়াল অরিন্দম।

পারবে না মানে! তোমার নিজের ক্ষমতা তুমি নিজে বোঝ না, তাই এমন কথা বলছ।

গানের বই পাই কোথা?

অরিন্দম বলল, আছে স্বাগতার কাছেই।

দুপুর যখন বিকেলে গড়াল তখন দেখলাম পড়ো প্রাসাদের বিরাট উঠোনের ছায়া মাড়িয়ে মাড়িয়ে অরিন্দম আসছে, পেছনে একটি সতের-আঠারো বছরের মেয়ে। মুখটা নীচু করে হাঁটছে।

ওরা উঠোন পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে এসে দাঁড়াল ঘরের সামনে।

দরজাটা ভেজান ছিল, খুলে দিয়েই বললাম, এসো স্বাগতা।

ও আমাকে দেখে যেন চমকে উঠল।

অরিন্দম বলল, স্বাগতা ইনি তোমার এক দিদি। এঁর কাছ থেকে তুমি তোমার গান শিখে নিতে পারবে।

আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, অরিন্দম কি এখানে আসার আগে স্বাগতাকে আমার কথা বলেনি। আশ্চর্য, আত্মভোলা অরিন্দম! মনে মনে ভারী রাগ হল ওর ওপর।

স্বাগতা ঘরের একদিকে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, ওকে বললাম, এসো আমরা নীচেই বসি।

সতরঞ্চ পাতা ছিল, হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে বসলাম।

অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে বললাম, তুমি একটু বাজারে যাওনা লক্ষ্মীটি, চায়ের সঙ্গে কিছু খাবার দরকার।

অরিন্দম বেরিয়ে গেল।

স্বাগতাকে কাছে ডেকে নিয়ে বসলাম। ওর সঙ্গে একটু আলাপ করার জন্যে বললাম, দেখলে তো তোমার নাম আমার জানা হয়ে গেছে, কিন্তু তুমি আমার নামটাও পর্যন্ত জানতে পারনি।

স্বাগতা লজ্জা পেয়েছে বলে মনে হল। ও মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল না।

দেখলাম মাজা মাজা রঙ ওর। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ যাকে আমরা বলি। মুখখানা পানের মত। চোখ দুটোও সুন্দর। সব মিলিয়ে ভালবাসার মত।

আবার বললাম, কাঞ্চী আমার নাম। তুমি ইচ্ছে হলে কাঞ্চীদি বলে আমাকে ডাকতে পার।

ও এবার আমার মুখের ওপর বড় বড় দুটো চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

বোধহয় স্বাগতা নতুন আগন্তুকটি কেমন তাই পরীক্ষা করে দেখছিল।

দেখা শেষ হলে ও মাথা নাড়ল। এর অর্থ ও আমার কথাটা মেনে নিয়েছে।

বললাম, অরিন্দম তোমার দাদার বন্ধু, তাই না?

ও এবার একটু চঞ্চল হয়ে উঠল।

মনে হল আমার সঙ্গে অরিন্দমের সঠিক সম্পর্কটা কি তাই নিয়ে এতক্ষণ ও মনে মনে তোলপাড় করছিল। কিন্তু আমার মুখে অরিন্দম ডাক শুনে ও নিশ্চয়ই অরিন্দমকে আমার ভাই সম্পর্কে কেউ বলে ভেবে নিল।

এতক্ষণে কথা ফুটল ওর মুখে। বলল, হ্যাঁ, আমার দাদার বন্ধু বলতে পারেন। তবে আমার দাদা অরিন্দমদার চেয়ে কিছু বড় হবেন বয়সে। তাই অরিন্দমদা আমার দাদাকে দাদা বলেই ডাকেন।

বললাম, অরিন্দমদাকে নিশ্চয়ই তুমি খুব শ্রদ্ধা কর তাই না?

ও আমার দিকে তাকিয়ে রইল। একবার মাথা নেড়ে শুধু জানিয়ে দিল অরিন্দমদাকে সে শ্রদ্ধা করে।

চোখ দুটো তার দেখলাম ছলছল করছে।

আমার মনে একটা ভাবনা খর উত্তুরে হাওয়ার ছোঁয়া দিয়ে গেল।

স্বাগতার চোখের জল অরিন্দমের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার না নীরব ভালবাসার!

হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে বললাম, কি গান তুমি শিখতে চাও বল?

স্বাগতা নিজেকে সামলে নিয়েছে। ও বলল, আপনি যে গান শেখাবেন তাই শিখব। অরিন্দমদা গান খুব ভালবাসেন। মাঝে মাঝে ওঁকে গান শোনাতে আসতে হয়।

আবার সেই ব্যথার একটা অদৃশ্য আঘাত আমার কোমল অনুভূতির জায়গাটাতে বিদ্ধ হল। হয়ত এই গান শোনানোর ভেতর এমন কিছু জাটিলতা নেই, তবু কেন জানি না আমার উদ্বেগকে বিচার বিবেচনা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে নিজেকে সামলে নিলাম।

বললাম, তোমার অরিন্দমদার ইচ্ছে তুমি আমার কাছে কবিগুরুর দেশাত্মবোধক গান শেখ।

ও মাথা নেড়ে জানাল, তাতেই ও রাজী।

গাইলাম,

'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো!
একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো।।
দুন্দুভিতে হল রে কার আঘাত শুরু,
বুকের মধ্যে উঠল বেজে গুরু গুরু—
পালায় ছুটে সুপ্তি রাতের স্বপ্নে দেখা মন্দ ভালো।।
নিরুদ্দেশের পথিক আমায় ডাক দিলে কি—
দেখতে তোমায় না যদি পাই নাই বা দেখি।
ভিতর থেকে ঘুচিয়ে দিলে চাওয়া পাওয়া,
ভাবনাতে মোর লাগিয়ে দিলে ঝড়ের হাওয়া,
বজ্র শিখায় একপলকে মিলিয়ে দিলে সাদা কালো।।'

কি এক উন্মাদনায় গানটা গেয়ে গেলাম। আমার মনের সে সময়কার ভাবনার সঙ্গে গানের আশ্চর্য একটা মিল যেন আমি অনুভব করতে পারছিলাম।

গানটা সম্পূর্ণ গাইলাম ওর সামনে। দেখলাম, স্বাগতার চোখে মুখে এক মুগ্ধ ভাবনার ছবি ফুটে উঠেছে।

এরপর এক এক লাইন গেয়ে গেয়ে ওকে সমস্ত গানটা শিখিয়ে দিলাম।

আমি সত্যিকারের অবাক হলাম ওর সুরেলা গলার পরিচয় পেয়ে। গানটা ও এত দ্রুত তুলে নিল, যা সাধারণ গায়কের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

গান শেষ হল আর অরিন্দম ঘরে এসে ঢুকল।

বলল, অনেকক্ষণ বাইরে আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলে কিন্তু।

বললাম, বাইরে ছিলে কেন, ভেতরে ঢুকে এলেই তো পারতে।

অরিন্দম বলল, তাকি হয় নাকি, এমন নিবিষ্ট হয়ে গাইছ তোমরা, আমি কখনো রসভঙ্গ করতে পারি।

বললাম, তোমার ভক্তটি কিন্তু বেশ গায়।

আমার প্রশংসা শুনে ছেলেমানুষের মত খুশিতে ভরে উঠল স্বাগতার মুখ।

অরিন্দম স্বাগতার দিকে তাকিয়ে বলল, এবার তুমি বল স্বাগতা গুরু কেমন পেলে?

ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিতে একরাশ জুঁইফুল ছড়িয়ে দিল।

আমি উঠে গিয়ে চা করলাম। অরিন্দম খাবার যা এনেছিল তিনজনে তাই গল্প করতে করতে খেলাম।

অরিন্দম গল্পে এমনি মগ্ন হয়ে গিয়েছিল যে, নিজের ভাগের সিঙাড়া দুটো কখন খেয়ে ফেলেছে তা ওর মনেই ছিলনা। একসময় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি কি শুধু কচুরিই এনেছি, না সিঙাড়াও এনেছিলাম?

বললাম, কি মনে হচ্ছে?

অনেক ভেবে ও বলল, বেশ মনে আছে আমি এনেছিলাম, তুমি ভুল করে দাওনি।

আমাদের তখন সিঙাড়া খাওয়া হয়ে গিয়েছিল।

স্বাগতা হেসে উঠে বলল, কাঞ্চীদি, অরিন্দমদার কাণ্ডকারখানাই ঐ রকম।

অমি এখানে এসে ওঁকে চা করে খাওয়ালাম আর একটু পরেই গল্প করতে করতে সে কথা উনি বেমালুম ভুলে বসে রইলেন। আবার উনুন জ্বেলে চা কব। ধোঁয়ায় আমার চোখের জল পড়লে তবেই অরিন্দমদার শান্তি।

স্বাগতা এবার অরিন্দমের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠেছে। অরিন্দম বলল, চল স্বাগতা তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

স্বাগতা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আসছি কাঞ্চীদি। মাঝে মাঝে এলে কিন্তু গান শিখিয়ে দিতে হবে।

বললাম, যতটুকু জানি, শিখে নিও।

ওরা চলে গেল। অন্ধকার ঘরে আমি আর বাতি জ্বালালাম না, চুপচাপ বসে রইলাম।

একা বসে থাকলেই বিপদ ঘনিয়ে ওঠে। চারদিকে হাজার চিন্তা ভিড় করে এল।

আমার আসার আগে স্বাগতা কি এখানে নিত্যদিনের অতিথি ছিল। সেকি অরিন্দমের ভাঙা উনুন জ্বেলে চোখের জল ফেলে ওকে খুশি করতে চাইত।

আবার মনে এলো, অরিন্দম হারমোনিয়াম আর তানপুরো যত্ন করে রেখে দিয়েছে, সে কি শুধু আমার স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবে বলে। স্বাগতার গান শোনার লোভ কি তার ভেতর একটুও নেই।

একবার মনে হল, কি ভাবছি আমি এলোমেলো। এই আঠারো বছর বয়েসের মেয়েটিকে আমার ভালবাসার ভাগীদার ভাবতে নিশ্চয়ই লজ্জা হওয়া উচিত।

মন থেকে ওসব চিন্তা মুছে ফেলতে গিয়ে দেখলাম কখন চোখে জল এসে গেছে।

সেই মুহূর্তে মনে হল প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বয়েসের সীমা মানে না।

শেষে যখন কোন মীমাংসায় পৌঁছনো গেল না তখন মনে ধীরে ধীরে একটা প্রশান্ত ভাব জেগে উঠল। ঠিক তখনই মনে হল, আমি সবাইকে ক্ষমা করতে পারি। পৃথিবীতে যে যতখানি অপরাধ করুক না কেন আমি নিশ্চয়ই আমার মনের ঔদার্য দিয়ে তা ধুয়ে মুছে দিতে পারি।

এ কথা ভাবতে গিয়ে মনটা হাল্কা আর প্রসন্ন হয়ে উঠল। অরিন্দমকে ভাল লাগল। ওর মনে যদি কোনদিন দুর্বলতা এসে থাকে স্বাগতার ওপর তাহলে সেটা স্বাভাবিক বলেই মেনে নিলাম।

আর স্বাগতা যদি অরিন্দমকে চেয়ে থাকে তাহলে সে চাওয়া তার অসংগত নয়। স্বাভাবিক পথ ধরেই একটি নতুন ফুটে ওঠা ফুল তার সুবাস ছড়িয়ে অনুরাগীকে আমন্ত্রণ জানায়।

জানালায় বসে ভাবতে ভাবতে যখন আমার মন উদারতায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে ঠিক সেই সময় অরিন্দম ঘরে ঢুকল।

আলো জ্বালাওনি কাঞ্চী?

বললাম, আমার পাশে এইখানটিতে এসে বোস অরিন্দম। অন্ধকার বড় ভাল লাগছে আজ। দেখ, সূর্যের আলোকে আমরা কোনদিন অন্ধকার দিয়ে ঢেকে দিই না। তাহলে আঁধারকে কেন আলো জ্বেলে সরিয়ে দেব।

অরিন্দম আমার পাশে এসে বসল। ওর হাতখানা আমার কোলের ওপর তুলে নিয়ে বসে রইলাম। মনে হল, অতীত কাল থেকে আমি ওর হাতটা ধরে বসে আছি। বর্তমান পেরিয়ে ভবিষ্যতের সীমার দিকে যখন এগোব তখনও ওর হাতখানা ধরা থাকবে আমার হাতে।

কতক্ষণ কোন কথা না বলে বসেছিলাম, অরিন্দম নীরবতা ভাঙল।

আমাকে কালই যেতে হবে শহরের বাইরে বিশেষ কাজে। রাতে ফিরে আসার চেষ্টা করব, না পারলে একা কাটাতে পারবে তো একটা রাত?

ওকে প্রশ্ন করলাম না, ও কোথায় যাচ্ছে, কেনইবা যাচ্ছে। শুধু বললাম, অনেকগুলো রাত একাই কাটিয়েছি অরিন্দম, একা একা কাটাবার অভ্যেস আমার আছে।

আবার অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার ভেতর কাটল।

ও হঠাৎ বলে উঠল, আচ্ছা কাঞ্চী, স্বাগতা এই অন্ধকার উঠোনটা পেরিয়ে যাবার সময় হঠাৎ আমার হাতখানা ধরে কেঁদে উঠল কেন বলতে পার? ফিরে আসতে আসতে মনে হল; হয়ত ওর দাদার কথা মনে পড়েছে, তাই মনটা দুর্বল হয়ে গেছে।

আমি সেই মুহূর্তে নিশ্চিত হলাম একটি বিষয়ে। অরিন্দম কাঞ্চী ছাড়া এ পৃথিবীতে দ্বিতীয় কোন ভালবাসার মুখ খুঁজে পায়নি। আর অন্যদিকে স্বাগতা নীরবে পূজা নিবেদন করে চলেছে অরিন্দমকে।

বললাম, তুমি এমনই অন্ধ যে মেয়েটার ভালবাসার অশ্রুটুকু বুঝতে পারনি।

অরিন্দম আমার হাতখানা জোরে চেপে ধরে বলল, কি বলছ তুমি কাঞ্চী? কনকদার বোন আমারও বোন।

বললাম, তোমার দিক থেকে সে কথা খুবই ঠিক, কিন্তু স্বাগতার দিক থেকে তোমাকে ভাল না বাসার কি কারণ থাকতে পারে?

অরিন্দম চুপচাপ বসে রইল। জোর করে ধরে থাকা আমার হাতখানা একসময় শিথিল করে দিল ও। যেন একটা অবসন্নতার ভেতর ও একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে তলিয়ে যেতে লাগল।

আমি বললাম, রাতের রান্না আমার বাকী রয়েছে, আর এমন করে বসে থাকলে তো চলবে না।

ও আবার জোর করে আমার হাতখানা চেপে ধরল। আমাকে এক মুহূর্ত কাছছাড়া করতে চাইল না।

আমি বললাম, পাগলামী করেনা, ছাড়ো।

তারপর একটুখানি থেমে বললাম, আমার একটা কথা রাখবে অরিন্দম?

ও কি ভেবে খুব জোর দিয়ে বলল, না।

আমি অমনি বললাম, সে কি, তুমি তো এমন করে কোনদিন বল না। আমার ওপর রাগ করলে নাকি?

ও আবার বলল, না।

বললাম, তবে কথাটা রাখতে চাইছনা কেন?

ও বলল, কথাটা রাখার মত নয় বলে। তুমি নিশ্চয়ই স্বাগতাকে বিয়ে করতে বলে বসবে। তোমাকে আমি একটুও বিশ্বাস করিনা। সব বলতে পার তুমি, সব বলতে পার।

বললাম, না, নিজেকে এতটা বঞ্চিত আমি নিশ্চয়ই করতে চাইবনা। তবে এটুকু জেনে রেখো, সে যদি ভালবেসে থাকে তোমাকে তাহলে সে কোন অন্যায় করেনি। তার তারুণ্যের ধর্মই তাকে ভালবাসতে শিখিয়েছে।

তারপর ওর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম, একটি ভালবাসার অশ্রুর যে কি মূল্য তা তোমাকে বোঝাই কি করে অরিন্দম।

অরিন্দম তেমনি অবুঝের মত বলল, আমার বুঝে কাজ নেই।

আমি বললাম, এখন ছাড়ো আমায়, কাজ করতে দাও।

ও হাতটা ছেড়ে দিলনা। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বলল, বল, তোমার কি কথা রাখতে হবে?

বললাম, সত্যি রাখবে?

ও বলল, কথা দিয়ে আমি কোন কথাটা রাখিনি বল?

সোজাসুজি বললাম, স্বাগতাকে আমার কাছে এনে দাও। কাল থেকে ও এখানেই থাকবে। তুমি ওকে ভাল না বাসলেও আমি ওকে ভালবেসে ফেলেছি।

অরিন্দম অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলনা। তারপর একসময় দীর্ঘশ্বাসের মত একটা চাপা স্বরে বলে উঠল, তাই হবে কাঞ্চী।

আমি উঠে পড়তেই ও বলল, কিছু মনে করোনা কাঞ্চী, স্বাগতার চোখের জল কি তোমার হৃদয়টাকে ভরিয়ে ভাসিয়ে দিল?

বললাম, হয়তো তাই অরিন্দম।

ও বলল, একজন সত্যদ্রষ্টা ঠিকই বলেছিলেন, The greatest water-power known to humanity is woman's tears.

হেসে বললাম, মানুষের সমাজে সবচেয়ে বড় জল-শক্তি যে নারীর অশ্রু, এ কথা মানি, আর সেই শক্তির প্রবাহে পুরুষেরই হৃদয় চিরদিন ভেসে যায়।

একটু থেমে আবার বললাম, আমি ভেসে যাই ক্ষতি নেই, কিন্তু স্বাগতার চোখের জলে অরিন্দম যদি ভেসে যায় তাহলে আমার আফশোষের আর সীমা থাকবেনা।

ভোরবেলা কখন অরিন্দম উঠে চলে গেছে আমি টের পাইনি। রাতে আমার মনে হয়েছিল আমি যেন একটা নদীর চরের মত এলিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ প্রবল জোয়ারে আমি ডুবে গেলাম। তারপর কখন সে জোয়ার নেমে গেল, আর আমি অজস্র মসৃণ চিক্কণ পলি বুকে নিয়ে জেগে রইলাম।

ভোরে আধো ঘুমে একটা স্বপ্ন দেখলাম, পলির বুকে একটা সবুজ ঘাস জন্মেছে। সে তার মাথায় ফুটিয়েছে একটা ছোট্ট ফুল।

পাশে অরিন্দম নেই। আমার কেমন যেন কান্না পেল। এত দেরী করে আমি কোনদিন জাগিনি। অরিন্দমের ওপর অভিমানে ভরে উঠল আমার মন। যাবার সময় ও কেন আমাকে জাগিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়ে যায়নি।

বিছানায় উঠে বসে ভাবছিলাম গত রাতের কথা, জীবনের বুঝি সবচেয়ে রোমাঞ্চিত মুহূর্তগুলির কথা, চোখ দুটি আপনিই বন্ধ হয়ে আসছিল। ভাবছিলাম, রজনীগন্ধারবনে ঝড়ের লীলা কি মধুর।

পায়ে পায়ে নতমুখে উঠোন পেরিয়ে আসতে দেখলাম স্বাগতাকে।

দ্রুত বেশবাস সংযত করে উঠে গেলাম কলতলায়। স্বাগতা এ অবস্থায় ভাগ্যিস আমাকে দেখে ফেলেনি। ছোটর কাছে লজ্জা ঢাকবার ঠাঁই পেতাম না তাহলে।

স্বাগতাকে কাছে পেয়ে আমার একটুও খারাপ লাগল না। ওর স্বভাবের ভেতর কোন গোপনতা আমার চোখে পড়ল না।

একদিন বিকেলে বসে বসে খালি গলায় দুজনে গান গাইছিলাম। এক সময় গান থামিয়ে স্বাগতা বলল, আচ্ছা কাঞ্চীদি, তুমি গান শিখেছ কোথায়?

বললাম, পাটনাতেই।

একটু থেমে ও আবার গান ধরল। বেশ কিছুটা এগিয়েই থেমে গেল।

কাঞ্চীদি, অরিন্দমদা তোমার কি রকমের ভাই হয়?

ধমকের সুরে বললাম, এই তোমার গান অভ্যেস বুঝি?

ও ভীষণ থতমত খেয়ে গানের লাইনটা ধরবার চেষ্টা করল। কিন্তু ভয়ে সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। ঠিক সুরে গলা দাঁড়াল না। গান ছেড়ে দিয়ে বড় বড় চোখ মেলে অপরাধীর মত আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

হেসে বললাম, অরিন্দমকে জিজ্ঞেস করনি, আমি ওর কে হই?

ও ভয়ে ভয়ে বলল, করেছিলাম।

উৎকণ্ঠিত আগ্রহে জিজ্ঞেস করলাম, কি উত্তর পেলে?

অরিন্দমদা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বললেন।

কি উত্তর এখন দিই আমি স্বাগতাকে। অরিন্দমের ওপর ভারী রাগ হল। ও জেনে শুনে কেন আমাকে এমন একটা অপ্রস্তুত অবস্থার ভেতর ফেলে দিল তা বুঝে উঠতে পারলাম না।

একটু থেমে আমি বললাম, অরিন্দম আমার বন্ধু স্বাগতা। বহু দিনের, একেবারে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ওর সঙ্গে। জীবনে এখন আর ওর চেয়ে বড় বন্ধু আমার কেউ নেই।

স্বাগতা বয়েসে ছোট হলে কি হবে, বেশ বুদ্ধিমতী। আমার আর অরিন্দমের সম্বন্ধটা বুঝে ফেলতে ওর খুব বেশী সময় লাগল না।

অবশ্য মেয়েরা যদি ত্রিনয়নীর অংশ হয় তাহলে স্বাগতাও তার অতিরিক্ত চোখের দৃষ্টি দিয়ে আগেই আমাদের সম্পর্কের নিবিড়তা সম্বন্ধে কিছু অনুমান করতে পেরেছিল। আর তাই সে কাল ফেরার পথে রাতের অন্ধকারে হৃদয় ভাঙা কান্নার ঢেউ তুলেছিল অরিন্দমের সামনে।

স্বাগতা হঠাৎ আমার পায়ের ওপর নত হয়ে প্রণাম করল। ওকে দু হাতে বুকে জড়িয়ে ধরতেই ওর দু চোখ বেয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

আমি ওর মুখখানা তুলে ধরেছিলাম। মেঘভাঙা রদ্দুরের মত সেখানে তখন চলছিল কান্নাহাসির খেলা।

সেদিন রাতে, এমন কি তার পরের দিন রাতেও যখন অরিন্দম ফিরলনা, তখন ভাবনায় আমার মুখ শুকিয়ে গেল। তবু যতদূর সম্ভব নিজেকে স্বাগতার কাছ থেকে গোপন করে রাখলাম।

মার্কেটে আমি যেতাম না, স্বাগতাকে দিয়েই দরকারী জিনিসগুলো আনিয়ে নিতাম।

অরিন্দমের ডাকেই আমি ঘর থেকে প্রায় একবস্ত্রে বেরিয়ে এসেছিলাম। কয়েকদিনের ভেতরেই ঘরে ফিরে যাব এই ছিল আমার পরিকল্পনা। কিন্তু ওর কাছে এসে সবকিছু ভেস্তে গেল। অতীত জীবনটা আমার চোখের সামনে দিয়ে ভেসে ভেসে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল।

আমার পক্ষে পাটনার পথে বেরোনো এখন প্রায় অসম্ভব। এখানে অনেকের কাছেই আমি পরিচিত। এতদিন এসেছি, কিন্তু দেখা করিনি অরিন্দমের বাবা মার সঙ্গে, পরিচিতদের সঙ্গে, কি কৈফিয়ৎ দেব তার। ইতিমধ্যে বাবা হয়ত চিঠি পাঠিয়েছেন অরিন্দমের বাড়ির ঠিকানায়। আমার নামের চিঠি হয়ত পড়ে আছে সেখানে। কেউ খোলেনি। অথবা আমার কোন হদিস না পেয়ে ওরা খুলে ফেলেছে। খুলেই অবাক হয়ে গেছে। পাটনায় এসেছি, অথচ তাঁদের কাছে যাইনি, এটা জেঠামশাই আর জেঠাইমার কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছে।

তাই বাইরে বেরোন আমার পক্ষে এখন আর সম্ভব নয়।

স্বাগতা মার্কেটে বেরিয়ে গেলেই আমি অরিন্দমের কথা ভেবে উদ্বেগে দীর্ঘশ্বাস ফেলতাম। ওর প্রতিদিনের ব্যবহারের জিনিসগুলো নাড়াচাড়া করে দেখতাম। ওর ডায়েরীখানা পুরোনো জামার পকেটেই ছিল। ডায়েরীটায় কি লেখা আছে তাই দেখতে ভারী ইচ্ছে করছিল আমার। কিন্তু কোনদিন যা করিনি ইচ্ছে থাকলেও তা করতে পারলাম না। অন্যের কোন কিছু বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করা ছিল আমার স্বভাবের বাইরে।

তাছাড়া প্রথমেই অরিন্দম আমাকে একটা শর্তে বেঁধে ফেলতে চেয়েছিল। সে শর্তটি হল, আমরা কেউ কারো কাজকর্ম বা গতিবিধির ওপর নজর রাখব না।

তাই মনে মনে মুষড়ে পড়লেও ওর ডায়েরীর পাতা উল্টে দেখে নিতে পারলাম না, কোথায় কি উদ্দেশ্যে গেছে।

অবশ্য ডায়েরীর পাতাতেই যে সবকিছু পাওয়া যাবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। তবু নিয়ম ভাঙতে পারলাম না।

স্বাগতা বাইরে থেকে ফিরে এলে তৃতীয় দিনের এক সন্ধ্যায় আমি আর উদ্বেগ চেপে রাখতে পারলাম না।

বললাম, স্বাগতা, তোমার অরিন্দমদার দেখা নেই কেন বলতে পার? তিন তিনটে দিন একেবারে বেপাত্তা। আমি তো কিছু ভাবতেই পারছি না।

আমার গলাটা বোধকরি কথা বলতে গিয়ে ধরে উঠেছিল, ও আমার উদ্বেগটা আন্দাজ করতে পারল।

প্রায় অবিশ্বাস্য রকম জোর দিয়ে ও বলল, অরিন্দমদার জন্যে একটুও ভাববেন না কাঞ্চীদি, ওরা যা বলে কখনো তা রাখতে পারে না।

প্রথম প্রথম আমারও দাদা আর অরিন্দমদার জন্যে চিন্তা হত, কিন্তু পরে ওদের ব্যাপার স্যাপারগুলো আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। আমি আর একটুও ভাবতাম না। বরং ঠিক দিনটিতে ফিরে এলেই ধরে নিতাম নিশ্চয়ই কোন ব্যারাম বাধিয়ে এসেছে।

ওর উদ্বেগহীন বলার ধরণ দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম। বুক ঠেলে একটা চাপা নিশ্বাস বেরিয়ে এল, আর আমি মনে মনে অনেকখানি হাল্কা হয়ে গেলাম।

চারদিন পরে এক দুপুরের রোদে ঝড়ো কাকের মতো এসে হাজির অরিন্দম। ওকে দেখে আর চোখ ফেরাতে পারলাম না। ঠিক যেন মাসখানেকের মত রোগ ভোগ করে উঠে এসেছে ও। চেহারার হাল দেখে চোখে জল এসে গেল।

অরিন্দম অপরাধীর মত সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে রইল দেখে বললাম, উঠে এসো, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

ও ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল।

আমি বেশ লক্ষ্য করে দেখলাম অরিন্দম টলছে।

ওকে হাত ধরে নিয়ে গেলাম কলতলায়। ও যেন চোখে দেখতে পাচ্ছিল না। সারা গায়ে জল ঢেলে দিলাম। ও স্নান করে অনেকটা শান্ত হল।

ঘরে এসে গড়িয়ে পড়ল বিছানায়। কিছুক্ষণের ভেতর গরম দুধ আর খানিকটা খাবার খাইয়ে দিলাম।

সেই যে ও চোখ বন্ধ করল সারা রাত আর খুলল না। ওর মাথার পাশে বসে স্বাগতা ওর চুলে বিলি কাটতে লাগল। আমি রাতের রান্নাটা সেরে ফেললাম। একটা নিশ্চিন্ততা আমাকে গভীর তৃপ্তি দিচ্ছিল। স্বাগতা ওকে যে সেবা করছিল তাতেও আমার মনে সূক্ষ্ম ইর্ষার ছোঁয়া লাগেনি।

ও যে শেষ পর্যন্ত এসেছে এই অনুভূতিটুকুই আমাকে সব কিছু ভুলিয়ে শান্তিতে স্নান করিয়ে দিচ্ছিল।

রাতে আমি আর স্বাগতা খেতে খেতে গল্প করছিলাম। ওকে ঘুমের থেকে জাগিয়ে তুলে খাওয়াবার চেষ্টা করিনি।

স্বাগতা বলল, জান কাঞ্চীদি, দাদা যেবার ধরা পড়ল সেবার অরিন্দমদাকে নিয়ে গিয়েছিল একটা লালমুখোকে খতম করতে। ঐ ইংরেজ অফিসারটা যত দেহাতী মেয়ের ইজ্জত নিয়েছিল। তারা কেউ কিছু বলতে পারত না।

ছোট ছোট টিলার পাশে ছবির মত ভূট্টার ক্ষেতে কাজ করত মেয়েরা। তারা গান গাইত। জল ভরত কুয়ো থেকে।

ঐ ইংরেজটা হঠাৎ এসে পড়ত ঘোড়ায় চড়ে।

ওকে দেখলেই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাত সবাই। তখন ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে যাকেই হাতের কাছে পেত তারই ইজ্জত নিত।

দাদা আর অরিন্দমদা গিয়ে গাঁয়ের মোড়লের সঙ্গে যুক্তি করে ফাঁদ পাতল। ওরা খবর নিয়ে জানতে পারল সাহেব থানা থেকে বেরিয়ে এসেছে।

ওরা জনাকয় দেহাতী মেয়ের সঙ্গে মিশে গেল মেয়েদের সাজ পোশাক পরে।

তারপর সাহেবকে দেখে ওরা যখন দৌড়ে পালাল তখন দাদা আর অরিন্দমদা ছুটতে গিয়ে যেন পড়ে গেল।

সাহেব সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থেকে নেমে জাপটে ধরল দাদাকে।

দাদা সেই সুযোগই খুঁজছিল। অরিন্দমদা পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল সাহেবকে, আর দাদা ধারাল অস্ত্র দিয়ে সজোরে কোপ বসাল সাহেবের ডানহাতে।

আধখানা হয়ে ঝুলতে লাগল হাতখানা।

দৌড় দৌড়। সে তল্লাট ছেড়ে পালিয়ে এল দুজনে।

কিন্তু ধরা পড়তে হল দাদাকে। দেহাতী মেয়ের সাজে সাজতে গিয়ে দাদা তার জামাখানা ফেলে রেখে এসেছিল এক বাড়িতে।

সাহেবের প্রাণটা দিদি একেবারে কই মাছের। মরেও মরল না। আধকাটা হাতখানাকে ঝুলিয়ে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এল থানায়।

সঙ্গে সঙ্গে থানার পুলিশ বেরিয়ে পড়ল গাঁ খানা ঘেরাও করতে। পেয়ে গেল দাদার জামা। শুরু হয়ে গেল পাইকারী হারে পিটুনী।

ওরা কিছুতেই বলল না জামার মালিকের নাম। শুনেছি, ক'টা লোক নাকি মার খেয়ে বেহুঁস হয়ে গিয়েছিল, তবু নাম বলেনি।

খবরটা গোপন সূত্রে থানার এক কর্মচারীর কাছ থেকেই জানতে পারল দাদা। অমনি সদরে এসে সারেন্ডার করল।

সাহেব মরলে ফাঁসিই হয়ে যেত দাদার। সাহেব মরেনি, শুধু হাতখানা খোয়া গিয়েছিল, তাই দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে দাদা।

দাদার কথা বলতে গিয়ে ভারী হয়ে উঠল স্বাগতার গলা।

বললাম, তোমার দাদা যে কাজ করেছেন, তার জন্য চিরদিন মেয়েরা শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর কথা মনে রাখবে।

ছেলেমানুষ মেয়ে। দুঃখ পেলেই চোখ দুটি ভরে ওঠে জলে।

ওকে সহজ করে দেবার জন্যে বললাম, তুমি যে সভাসমিতিতে গান করে বেড়াও, তোমার বাংলা গান বোঝার লোক তো এখানে নেই বললেই চলে।

স্বাগতা বলল, হিন্দি গানও আমি গাই। তবে বাংলা গানের মানেটা অরিন্দমদা অথবা আর কেউ বক্তৃতার ভেতর দিয়েই বুঝিয়ে বলে দেন।

ওরা নজরুলের গানের সুর খুব পছন্দ করে। গান্ধীজী গুরুদেবের 'একলা চলরে' গানটি শুনতে ভালবাসেন। তাই ওদের কাছে কবিগুরুর অন্য গানের সঙ্গে এ গানটিও গাইতে হয়।

বহু মানুষের গানটা শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গেছে। আমি গাইতে শুরু করলে ওরা অনেকেই গাইতে থাকে।

এক মজা হয়েছিল কিছুদিন আগে। সভা শেষে এক বুড়ো তার নাতিনাতনীদের সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে হাজির। বলল, গানটা তাদের শিখিয়ে দিতে হবে।

আমি বললাম, গানটা শিখে নিতে অনেক সময় লাগবে।

কে শোনে কার কথা। নাছোড়বান্দা। অরিন্দমদা তো সদাশিব, তিনি বললেন, দেখ স্বাগতা, মানুষ কত আগ্রহে গুরুদেবের গান শিখতে চাইছে, আর তুমি শিখিয়ে দেবে না।

ওরা আমাদের সঙ্গে এল পার্টি অফিসে। বসে গেল গান শিখতে।

বুড়ো গায় এক পর্দায়, নাতি-নাতনীরা গায় অন্য পর্দায়। কারো সঙ্গে কারো মিল নেই।

শেখাতে শেখাতে আমি নাজেহাল। অরিন্দমদাকে ইংগিতে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতেই উনি বললেন, চালিয়ে যাও, ওরা 'একলা চলরে' গানের মানেটা অন্ততঃ ঠিক বুঝেছে।

স্বাগতার কথা শুনে আমিও না হেসে পারলাম না।

মাস দু'এক কেটে গেল। ওর ভেতরেই আমি অনুভব করতে লাগলাম যে স্বাগতা ছাড়া আমার চলবে না। মেয়েটার ওপর অস্বাভাবিক এক মমতায় বাঁধা পড়ে গেলাম।

ঠিক উল্টো হল অরিন্দমের মনোভাব। আমাকে একান্তে কাছে না পাওয়ার জন্যে মাঝে মাঝে ওর মেজাজ যেত বিগড়ে। কারণে অকারণে স্বাগতাকে ছোটাতো পার্টি অফিসে। সামান্য খাতা অথবা কয়েকখানা প্রচার পত্র আনবার জন্য মেয়েটাকে অনেক দূরের পথ হেঁটে হেঁটে যেতে হত।

মুখে এতটুকু প্রতিবাদের চিহ্ন নেই স্বাগতার। অরিন্দমদার আদেশটুকু পালন করতে পারলেই মনটা ওর সারাদিন খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

একসময় বললাম অরিন্দমকে, স্বাগতা কিন্তু সত্যিই তোমাকে ভালবাসে।

ও বলল, আমার মতে পার্টির কর্মীরা পরস্পরের সঙ্গে ভালবাসায় জড়িয়ে পড়লে কাজের চেয়ে অকাজ হয় বেশি।

বললাম, তুমি বড্ড হৃদয়হীন অরিন্দম।

ও বলল, তুমি আমাকে এ অপবাদ দেবে?

বললাম, আমার কথা এখানে আসছেনা। তুমি কি দেখতে পাও না ঐ অল্প বয়েসের মেয়েটা কেমন করুণ মুখ করে তোমার দিকে চেয়ে থাকে।

অরিন্দম বলল, ও কি জানে না, তোমার আমার সম্পর্ক?

হয়তো জানে, হয়তো বা কিছু অনুমান করে। মুখ ফুটে ওর অনুমানের কথা কোনদিনই জানায়নি।

অরিন্দম বলল, এতদিন তোমার কাছে রয়েছে, তুমি আসল সম্পর্কটা জানিয়ে দাওনি কেন?

বললাম, আমার চেয়ে তোমার কাছেই তো ও রয়েছে বেশিদিন, এতদিনে তোমারই ওকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

অরিন্দম আর কোন কথা বলল না। আমার মনে হল, যদি কোনদিন অরিন্দম ওকে রূঢ়ভাবে কিছু বলে বসে তাহলে দারুণ আঘাত পাবে স্বাগতা।

তাই আগেভাগে অরিন্দমকে বললাম, ওকে আমি বলেছি, আমরা দুজনে বন্ধু আর আমাদের বন্ধুত্ব খুবই নিবিড়।

ও বলল, একেবারে স্পষ্ট করে বলে দিলেই পারতে যে তুমি আমার ঘরণী।

হেসে বললাম, ঘরে যখন রয়েছি তখন একটা বাচ্চাতেও বুঝতে পারবে আমি তোমার ঘরণী।

কথাটা এবার ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, একটা কথা বলি বলি করেও বলতে পারছিনা। অভয় দাও তো বলি।

অরিন্দমের উত্তর, সত্যিই কি তুমি আমার থেকে ভয় পাও কাঞ্চী যে অভয় দিতে হবে।

সোজাসুজি বললাম, কোথায় গিয়েছিলে এই চারটে দিন, আমাকে তো গল্পের ছলেও বললে না?

অরিন্দম বলল, তোমাকে স্ত্রী ভাবি বলেই বলিনি, পার্টির মেয়ে ভাবলে অনেক আগেই বলে ফেলতাম। তোমার স্বাগতা সব জানে।

বিস্মিত হলাম। আমার অবাক হওয়ার কারণ হল, স্বাগতা এমন করে আমাকে জড়িয়ে রয়েছে যে আমার কাছ থেকে কোনকিছু গোপন করা তার পক্ষে অসম্ভবের সামিল।

বললাম, স্বাগতা জানল কি করে? তুমি কখন তাকে জানালে?

অরিন্দম বলল, পার্টির সামনে আমাদের সব কথা বলতে হয়, আলোচনা করতে হয় বিভিন্ন কর্মপন্থা নিয়ে।

আমি মুখ নীচু করে রইলাম, কিছু বললাম না। আমার কেবল মনে হতে লাগল কত স্বচ্ছ মন স্বাগতার, অথচ কত সংগোপনে সে তার পার্টির গোপন কথাকে আগলে রেখেছে। একটুও ছায়া পড়েনি তার কোমল মুখের ওপর।

আমাকে অমনি করে বসে থাকতে দেখে অরিন্দম বলল, স্বাগতা তোমাকে সব কথা বলবে, হয়ত এই আশাই তুমি করেছিলে কিন্তু তা হয়না কাঞ্চী! পার্টির গোপন আলোচনা ফাঁস না করার শপথ নিতে হয় প্রতিটি কর্মীকে।

বললাম, নিজেকে বড় দূরে পড়ে গেছি বলে মনে হচ্ছে।

ও কথা বলছ কেন কাঞ্চী, তোমার জন্যে আমার হৃদয়ের উত্তাপ কি কিছু কম দেখেছ?

বললাম, তা নয় অরিন্দম, তবে চিরদিনের একটা সংস্কার মনে বাসা বেঁধে আছে। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা অভিন্ন। তাদের কর্মধারার ভেতর নিশ্চয়ই পার্থক্য থাকবে, কিন্তু কোন গোপনতা থাকবে না।

অরিন্দম কিছু সময় বসে থেকে বলল, বড় কঠিন শপথ নিতে হয়েছে কাঞ্চী। দেশের কাজে সব ভুলে যেতে হয়।

বললাম, আমাকে তাহলে ঘর ছাড়া করলে কেন অরিন্দম? আমিও আমার বাবার তৈরি পথেই দেশের সেবা করে যেতাম।

আমার কথার সুষ্ঠু কোন উত্তর খুঁজে পেল না অরিন্দম। তাই থুতনীতে হাতখানা রেখে আমার দিকে চেয়ে বসে রইল।

এবার পরিস্থিতিকে লঘু করে দিয়ে বললাম, অমন করে বসে থাকলে যে? এই, শোন একটা কথা বলি। আজ তিথিটা চতুর্দশী, রাতে গঙ্গায় নৌকো করে একটু বেড়াবে?

অরিন্দম ছেলেমানুষের মত লাফিয়ে উঠে বলল, চমৎকার আইডিয়া, সারা রাত গঙ্গার বুকে কাটাব।

তারপর হঠাৎ যেন মনমরা হয়ে বলে উঠল, কিন্তু—।

বললাম, কিন্তু আবার কি!

ও আমার কথার জবাব না দিয়ে মনে মনে কি সব ভেবে নিল। তারপর একসময় আপন মনেই বলে উঠল, ঠিক আছে, আজই ওদের কাজে লাগিয়ে দেব।

বলার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে যেন হাওয়ায় হারিয়ে গেল।

ও কি ভাবল আর কেনই বা এত দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তা আমার কাছে অগম্য হয়ে রইল।

ওর চলে যাবার ঘন্টা খানেক পরে ঘরে এসে ঢুকল স্বাগতা। বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল ওকে।

বললাম, সকাল থেকে সেই বেরিয়েছ আর এই ফিরলে। পার্টির কাজ করলে কি ক্ষিদে তেষ্টা থাকেনা স্বাগতা?

ও বলল, সত্যি বড় ক্ষিদে পেয়ে গেছে দিদি, তার চেয়েও ঘুম পেয়েছে বেশি। আজ আবার কপালে দুর্ভোগ আছে মেলা।

কি রকম?

ও হেসে বলল, দিনরাত্রি বিরামহীন কর্মযজ্ঞের নির্দেশ। হ্যান্ড মেসিনে আজ সারা রাতের ভেতর কয়েক হাজার প্রচার পত্র ছাপিয়ে ফেলতে হবে। একদল করবে পোস্টার লেখার কাজ, অন্যদল করবে প্রচার পত্র ছাপার কাজ।

বললাম, আজ কি করে তুমি যাবে, এই ক্লান্ত শরীর নিয়ে রাত জাগা যায় নাকি?

স্বাগতা একটু হাসল। বয়েসের তুলনায় মনে হল ও একটু বেশি বিবেচক হয়ে পড়েছে।

বলল, মরে না যাওয়া পর্যন্ত পার্টির নির্দেশ মেনে চলতে হবে কাঞ্চীদি।

বললাম, নির্দেশটা জারি করল কে, তোমার অরিন্দমদা নাকি?

ও বলল, আমরা পার্টির এই নগর শাখায় ওর কথাই মেনে চলি।

বললাম, কিছু ভেব না, তুমি নিজে না বলতে পার, তোমার অরিন্দমদা এলে আমিই বলে দেব। আজ কিছুতেই কাজে তোমার যাওয়া চলবে না।

ও অমনি চমকে উঠে বলল, দুটি পায়ে পড়ি তোমার কাঞ্চীদি, আমার হয়ে অরিন্দমদাকে কিছু বল না। কোনদিন আমি ওর কথার অবাধ্য হইনি।

বেশ একটু কঠিন সুরেই বললাম, বাধ্য অবাধ্য হবার কোন কথাই উঠছে না স্বাগতা। তুমি ক্লান্ত হয়েছ, তোমার বিশ্রামের দরকার, এর বেশী কিছু নয়।

আমার গলার দৃঢ়তা দেখে ও চুপ করে গেল। কুয়োতলায় গিয়ে স্নান সেরে এল। খেতে দিলাম, কথা না বলে খেয়ে নিল।

ওর মনের অবস্থা বুঝতে আমার বাকী ছিল না। কাজ না করতে পারার ভাবনায় ও তখন মনে মনে জীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল।

ওকে বললাম, অরিন্দমের ফিরতে মনে হচ্ছে কিছু দেরিই হবে। তুমি ততক্ষণ বিছানায় একটু গড়িয়ে নাও। যদি রাতে নেহাৎই কাজ করতে চাও তাহলে চোখ বন্ধ করে কথা না বলে শুয়ে পড়।

ওর চোখে মুখে খুশির ছোঁয়া লাগল দেখে বললাম, অমনি মেয়ের মুখে হাসি আর ধরে না।

স্বাগতা বাধ্য মেয়ের মত শুয়ে পড়ল আর আমি ঘরের টুকটাক কাজ করতে করতে কত কথা ভাবতে লাগলাম।

এত স্বার্থপর হয়ে গেছি আমরা। আমাদের সুখের জন্যে সারারাত ধরে একদল ছেলেমেয়েকে ক্লান্ত শরীর টেনে টেনে কাজ করে যেতে হবে।

ভাবতে গিয়ে সমস্ত শরীর যেন অসাড় হয়ে এল। চোখের সামনে ফুটে উঠল অরিন্দমের মুখ। যে মুখখানা আমার কাছে চৈত্রের শালমঞ্জরীর মত সুন্দর, সে মুখে এমন স্বার্থপরতার ধূসর ছাপ লাগল কি করে?

দু'চোখ ভরে উঠল আমার কান্নায়। সামনে থেকে অরিন্দমের মুখখানা আবছা হয়ে মুছে গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক চোখ বন্ধ করে পড়েছিল স্বাগতা, এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কাঞ্চীদি, এবার যাই।

হেসে বললাম, পাশ ফিরে শুয়েছিলে তাই দেখার উপায় নেই সত্যিকারের ঘুমুচ্ছিলে কিনা। আমার তো মনে হয় শুয়ে শুয়ে শুধু কাজের কথাই ভেবেছ।

ও মিষ্টি করে হেসে বলল, বিশ্বাস কর দিদি একেবারে ঘুমিয়ে পড়লে আমার পক্ষে ওঠা আর সম্ভব হত না।

স্বাগতা বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণের ভেতর ঘরে এসে ঢুকল অরিন্দম। দেখলাম ওর মুখের ওপর আগত আনন্দের ছায়া।

অরিন্দম বলল, সব ঠিক করে এলাম। সারা রাতের জন্যে ভাড়া নিলাম নৌকোটা। জান কাঞ্চী, কোন মাঝিই আমি রাখিনি সঙ্গে।

একার পক্ষে অবশ্য কষ্টকর হবে নৌকো চালান, তবে মাঝে মাঝে ডাঙায় নৌকো বেঁধে আমরা বিশ্রাম করব। মাঝি থাকলে আনন্দের সবটাই মাটি।

ও উচ্ছ্বাসে বলে চলল, শোন কাঞ্চী, উজান ঠেলেই প্রথম চলব, কারণ ফেরার সময় শক্তি যাবে ফুরিয়ে, তখন স্রোতের টানে শুধু নৌকোটাকে ভাসিয়ে রাখা।

ফুটফুটে জোছনা, রাতচরা পাখির ডাক, নির্জন চরে লুটিয়ে পড়ে থাকা, সত্যি কাঞ্চী মনে হবে, স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, সে এখানে, সে এখানে, সে এখানে।

অরিন্দম আসন্ন নৌকো ভ্রমণের কল্পনায় কবি হয়ে উঠল।

আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল ওর কথা শুনে, তবু বিচলিত না হয়েই বললাম, আমাদের যাওয়া হবে না অরিন্দম।

এমন বিস্ময়ের ছবি বোধকরি আমার জীবনে কোনদিন দেখিনি! ও কতকক্ষণ কথা বলতে পারলনা। আমার দিকে শুধু চেয়ে রইল।

বললাম, ক্ষমা কর অরিন্দম, সবাইকে বঞ্চিত করে আমরা দুজন কেবল আনন্দে ভেসে যেতে পারব না।

এ কথা কেন কাঞ্চী?

বললাম, তোমার পার্টির ছেলেমেয়েরা আজ সারারাত যখন ক্লান্ত দেহটাকে টেনে টেনে কাজ করে যাবে তখন আমরা চাঁদের আলোয় নির্জন চরে বসে স্বপ্ন রচনা করব, এ হয়না অরিন্দম।

ও শুধু বলল, স্বাগতাকে আমাদের মাঝখান থেকে সরিয়ে রাখার জন্যেই আমি এ ব্যবস্থাটুকু করেছি আজ।

বললাম, তা আমি জানি, আর সে জন্যেই সমস্ত ব্যবস্থাটা আমার কাছে বড় বেশি অপ্রীতিকর বলে মনে হচ্ছে।

অরিন্দম বলল, এটা কোন নতুন ব্যবস্থা নয় কাঞ্চী, মাঝে মাঝে খুব বেশি প্রয়োজনে ওদের এমনি রাত জেগে কাজ করতে হয়।

বললাম, তাহলেও আমাদের আনন্দ মুহূর্তগুলোকে ওদের ক্লান্ত মুখগুলো যে ম্লান করে দেবে অরিন্দম।

গভীর তৃপ্তিতে দুজনে যখন হাতে হাতে দিয়ে বসব তখন চোখের সামনে ভেসে উঠবে কটি কর্মক্লান্ত হাত। এ আমি পারবনা অরিন্দম।

অরিন্দম বলল, বেশ তাই হবে। তোমার ইচ্ছাকে অবহেলা করে আমি সুখী হতে চাইনা।

সেই মুহূর্তে মনে হল, একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস চাপতে চাপতে বেরিয়ে গেল অরিন্দম।

রাত প্রায় বারোটা, ঘরে এসে ঢুকল ও।

উদ্বেগে আমি অস্থির হয়ে ঘর বার করেছি কতবার।

ও আসতেই আমি ওর হাত ধরে বললাম, অরিন্দম, কি অপরাধ তোমার কাছে আমি করেছি, যেজন্যে তুমি আমাকে এমন করে শাস্তি দিচ্ছ। আমি যে তোমার জন্যে সমাজ সংস্কার সব কিছু ছেড়ে ছুটে এসেছি। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ একবার, সেখানে শুধু তোমারই ছায়া। তুমি আমাকে দুঃখ দিওনা। আমার সব দুঃখকে তুমি তোমার স্পর্শ দিয়ে আনন্দ করে দাও।

অরিন্দম আমাকে তার বুকের মধ্যে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি আমার প্রেরণা, তুমি আমার সকল দুঃখের শান্তি। আজ যখন বিরাট শপথ নেবার সময় এগিয়ে এসেছে তখন প্রথমেই চাই তোমার কল্যাণ ইচ্ছা কাঞ্চী।

আমরা বসলাম বিছানার ওপর। ইতিমধ্যে কয়েকখণ্ড মেঘ আকাশে ভাসমান চাঁদটাকে ঘিরে ফেলেছে।

অরিন্দম বলল, এইমাত্র গোপন সূত্রে খবর এসেছে, গান্ধীজী দেশজুড়ে আন্দোলনের ডাক দিয়ে বলেছেন, 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।'

কাল সকালে সারা দেশ উত্তাল হয়ে উঠবে। তাই বলছিলাম কাঞ্চী, তোমার প্রেরণা হবে এই দুর্যোগের দিনে আমার চলার পথের সবচেয়ে বড় সম্বল।

ওর হাতখানা আমার দুটি হাতে নিবিড় করে ধরে রেখে দিলাম কতকক্ষণ। মনে মনে বললাম, তুমি আমার সব। তোমাকে ধরে রেখে দেবার ক্ষমতা আমার নেই। তবে আমার সবটুকু মন বিছিয়ে দিলাম তোমার চলার পথে।

রাত প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। বাইরে কড়া নাড়ার শব্দে চমকে উঠলাম।

অরিন্দম লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বাইরে কে যেন বলল, দরজা খোল অরিন্দমদা, আমি তাপস।

দরজা খুলে দিয়েছে অরিন্দম।

হাঁপাচ্ছে ছেলেটি। সে পার্টি অফিস থেকে ছুটে আসছে।

কি খবর তাপস? অরিন্দমের গলায় উদ্বেগ ফেটে পড়ল।

ভোর রাতে পার্টি অফিস ঘেরাও করে প্রায় সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ।

অরিন্দম চীৎকার করে উঠল, স্বাগতা কোথায় তাপস?

আমি পালিয়ে আসার সময় শুনলাম, স্বাগতার প্রাণ ফাটা চীৎকার। পেছনে ফিরে দেখলাম ওকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে কটা পুলিশের লোক। মনে হল কেউ তাকে রক্ষা করতে ছুটে গেল, অমনি একটা লাঠির ঘা এসে পড়ল তার মাথায়। সে মাটিতে পড়ে গেল। দূর থেকে চিনতে পারলাম না তার মুখ। আমি খবর দিতে ছুটে এসেছি তোমার কাছে।

অরিন্দম আমার মুখের দিকে আকাশের সেই মেঘ ভাঙা আলোয় একবার তাকাল। তারপর ঝড়ো হাওয়ার মুখে শুকনো পাতার মত উড়ে চলে গেল।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। কতকক্ষণ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম মনে নেই। আমার ভেতর থেকে সমস্ত বোধশক্তিটুকু তখন কে যেন নিঃশেষ করে নিয়ে গিয়েছিল।

শুধু একটা কান্নার শব্দ মনে হল অনেক দূরে মিলিয়ে যাচ্ছিল। আমি শুধু সেদিকে কান পেতে রইলাম।

পরের দিন বেলা যত বাড়তে লাগল মিছিলের পর মিছিল চলতে লাগল পথ প্রান্তর ছাপিয়ে। আকাশ জুড়ে বাজতে লাগল স্বাধীনতার শেষ মন্ত্র, 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।'

পুরো দুটো দিন আমার কেটে গেল নিদ্রাহীন। খাবার প্রবৃত্তি ছিল না, তাই রান্নার কোন প্রশ্নই উঠল না। আমি জানালায় মুখ রেখে একইভাবে চেয়ে বসে রইলাম।

তৃতীয় দিন ভোরবেলা কানে এসে বাজল একটা ধ্বনি। আমি শেষরাতে মেঝেতে বসে জানলায় মাথা রেখে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। আওয়াজটা শুনেই চমকে উঠে দাঁড়ালাম।

স্বেচ্ছাসেবকেরা বোধকরি মাইকে ঘোষণা করে যাচ্ছিল, আজ বেলা বারোটায় সেক্রেটারিয়েটের শীর্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে, আপনারা দলে দলে সেই পূণ্য উৎসবে যোগ দিন।

আপনারা আমাদের দলনে্ত। অরিন্দম সরকারের পরিচালনায় পুলিশের দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেঙে ফেলে এই উৎসব উদযাপনের শপথ নিন।

উত্তেজনায় সমস্ত শরীর আমার কাঁপছিল। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না অরিন্দমের জন্যে উদ্বেগে কাঁপছিলাম, না বিপুল একটা আনন্দে অস্থির হয়ে উঠছিলাম।

বেলা বাড়তে লাগল, আর আমি শুনতে পেলাম, অগণিত মানুষের প্রাণের ভাষা, 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।'

যত বেলা বেড়ে চলল ততই সমুদ্রের ঢেউভাঙা গর্জন কানে এসে বাজতে লাগল।

আমি বুঝতে পারলাম না সেই উত্তাল তরঙ্গ আমাকে কখন ঘর থেকে রাজপথে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

আমি তখন মিছিলের সামিল হয়ে গেছি। ওদের সঙ্গে প্রবল শক্তিতে ভারতমাতার জয়ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে চলেছি।

আমি যে আজ দুদিন অভুক্ত সে বোধ আমার নেই। মনে শুধু একটি কথা বার বার উচ্চারণ করে চলেছি, অরিন্দমের পথই আজ আমার একমাত্র পথ। এ পথ থেকে কেউ আমাকে আর ফেরাতে পারবে না।

ঢেউ-এর পরে ঢেউ, অগণিত জনতার ঢেউ আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলল, আমরা শহরের মাঝখানে বিরাট এক ময়দানে এসে পৌঁছলাম।

সেখানে শুধু মানুষের মাথাগুলো জেগে থাকতে দেখা যাচ্ছে। মানুষ, মানুষ, অগণিত মানুষের একটি মাত্র ইচ্ছার এমন বিরাট রূপ আর কোনদিন আমি দেখিনি।

দূরে, ময়দানের এক প্রান্তের মঞ্চ থেকে মাইকের আওয়াজ ভেসে এল, আমরা স্বরাজের দ্বারে এসে পৌঁছে গেছি। ভাই সব আর দাঁড়িয়ে থেকো না, সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়। ঐ দুশো বছরের পুরোনো জীর্ণ বন্ধ দরজাটা ভেঙে চূর্ণ করে দাও। এসো আমার সঙ্গে।

ঐ গলা আমার চেনা। অরিন্দম জনতার মাঝে আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে দিয়ে নেমে গেল মঞ্চ থেকে। আর অমনি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন।

এগিয়ে চলল জনতা। প্রবল স্রোতের প্রবাহে কিছু পথ এগিয়ে গিয়ে আমি জনতার চাপে পথের ধারে ছিটকে পড়লাম।

দুদিনের অভুক্ত ক্ষীণ দেহ। চোখে নেমে এল অন্ধকার।

সেই আচ্ছন্ন অবস্থায় দূরে, বহু দূরে যেন শুনতে পেলাম গুলির আওয়াজ। আমার পাশ দিয়ে কারা যেন ছুটে চলে যাচ্ছিল।

কতকক্ষণ আমি অচৈতন্য হয়ে রইলাম।

এক সময় জ্ঞান ফিরল। একটা নিস্তব্ধ অন্ধকারের সমুদ্রের মাঝখানে পড়ে আছি বলে মনে হল। জনমানবের কোনো চিহ্ন কোথাও নেই। আমি অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে এগোতে লাগলাম।

এখন আমার লক্ষ্য কোনরকমে দেহটাকে বাড়ি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া। যদি অরিন্দম ঘরে ফিরে আমাকে দেখতে না পায়? যদি তার ক্লান্ত শরীরে বিশ্রামের দরকার হয়?

আমি সেদিন কি করে যে পথ চিনে অন্ধকার শহরের রাজপথ আর গলিতে আছাড় খেতে খেতে এসে পৌঁছলাম আমার ডেরায় তা আজ আর স্পষ্ট করে মনে আনতে পারব না।

দরজা খোলা ছিল। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় অদ্ভুত শব্দ হচ্ছিল অন্ধকার প্রাসাদ-পুরীটাতে। আমি সিঁড়ির ওপর পড়ে রইলাম।

রাত কত জানিনা, কে যেন আমাকে ডাক দিল।

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। একে আমি এর আগে আর একটি দিন মাত্র দেখেছি। অরিন্দমকে ডাকতে এসেছিল।

ও বলল, অরিন্দমদাকে যদি দেখতে চান, আমার সঙ্গে আসুন।

আর কোন কথা না বলে ও চলতে লাগল। আমি ওকে নিশি পাওয়ার মত অনুসরণ করে চললাম।

অনেক পথ পার হয়ে এসে গলির মুখে একটা বাড়িতে আমরা পৌঁছলাম। উঠোন পেরিয়ে হল ঘরে ঢুকেই দেখি একটি প্রদীপ জ্বলছে, এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে বসে আছে কয়েকটা ছায়ামূর্তি।

ঘরের ঠিক মাঝখানে দুটি রক্তাপ্লুত দেহ পড়ে থাকতে দেখলাম।

এগিয়ে গেলাম। আমার অরিন্দম শুয়ে আছে। গুলি লেগেছে মাথায়। পাশে শুয়ে আছে সতের আঠারো বছরের একটি ছেলে।

আমি কেঁদে উঠলাম না, ভেঙে পড়লাম না। হাঁটু গেড়ে বসে ওর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। মাথার চুলগুলো ঠিক করে দিলাম।

কে একজন বলে উঠল, আমরা যখন অরিন্দমদাকে নিয়ে চলে আসি তখনও ওঁর প্রাণটা ছিল। উনিই আমাদের আপনাকে খবর দিতে বলেন।

একটি স্বেচ্ছাসেবক বলল, এখুনি এদের শ্মশানে সরিয়ে ফেলতে হবে, নৌকোয় নিয়ে পালাতে হবে নদীর ওপারের চরে। নইলে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যেতে হবে সবাইকে।

ওদের অনুনয়ের সুরে বললাম, শ্মশানে আপনাদের সঙ্গে যাবার অনুমতিটুকু দেবেন কি?

ওরা কি বলাবলি করল, তারপর সম্মতি মিলল আমার যাবার।

সেই নির্জন চর, যেখানে নৌকোয় করে ও আমাকে প্রথম এনেছিল যেখানে ও স্পষ্ট করে উচ্চারণ করেছিল আমাকে বিয়ে করবে বলে, সেখানে ওর সাজান চিতায় আমি আগুন দিলাম। হাহাকার করে উঠল আমার সমস্ত মন। ও জেনে যেতে পারল না যে ও শুধু স্বাধীনতা যুদ্ধের নির্ভীক সৈনিক অরিন্দম নয়, শুধু কাঞ্চীর স্বামী নয়, অনাগত এক শিশুর পিতাও। স্মরণ করলাম আমার গর্ভের সন্তানকে। আমার ভেতর দিয়ে সে তার জন্মদাতার চিতাকে স্পর্শ করল।

আমরা সব কাজ শেষ করে ফিরে এলাম এপারে।

এখন পাথর ভাই আমি মুক্ত, কোন বাঁধনই আমাকে আর বাঁধতে পারবে না।

কাঞ্চীদি থামল। কতক্ষণ আমরা কেউ আর কোন কথা বলতে পারলাম না।

একসময় আমি বললাম, তুমি এখন কোত্থেকে এলে কাঞ্চীদি?

পাটনা থেকে।

বললাম, বাবার কাছে যাচ্ছ যাও, তিনি তোমার জন্যে বড় উদ্বেগে রয়েছেন।

কাঞ্চীদির মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল।

অনেক কষ্টে বেরিয়ে এল ক'টি কথা, বাবাকে চেন না ভাই, এ ব্যাপারে কোন আপোসই উনি করবেন না। আর যদি এ অবস্থায় অরিন্দমের বাড়ি গিয়ে দাঁড়াই তাহলে ওঁরা আমার কাহিনীকে বানানো গল্প বলে মনে করবেন।

পাথর ভাই, আমার ভাবী সন্তানের জন্যেই আমাকে সবার কাছে থেকে দূরে সরে থাকতে হবে।

উদ্বেগের সঙ্গে গোপা বলল, এ অবস্থায় তুমি পথে পথে ঘুরে বেড়াবে! তা হবে না দিদি, তুমি আমাদের সঙ্গে চল।

গোপার মুখখানিতে হাত বুলিয়ে দিয়ে কাঞ্চীদি বলল, এখন আমার কোথাও যে যাওয়া চলবে না দিদি। আমি এই ঝালদায় ওর বাসাটাতে একবার যাব। কালই আবার ওর ক'টা স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে ফিরে যাব পাটনার বাসায়। তোমাদের কথা ভুলতে পারব না ভাই। আমার আর অরিন্দমের সঙ্গে তোমরা মিশে রয়েছ একেবারে অভিন্ন হয়ে।

ট্রেন ছাড়ার আর বাকী নেই, আমাদের উঠতে হল। ইতিমধ্যে ঘন অন্ধকার নেমেছে। পশ্চিমের কালো মেঘখানা সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে। জলো হাওয়া বয়ে এল।

বললাম, কাঞ্চীদি তুমি স্টেশনে একটু অপেক্ষা করে যাও, বৃষ্টি নামলো বলে।

আমরা আর কথা বলতে পারলাম না, তাড়াতাড়ি ট্রেনের কামরায় উঠে পড়লাম।

ট্রেন ছেড়ে দিল। অন্ধকার আকাশে ট্রেনের বাঁশিটা করুণ আর্তনাদের মত শোনাল।

এক মুহূর্তে বিদ্যুতের চমকে দেখলাম, কাঞ্চীদি প্ল্যাটফর্ম ধরে আমাদের কম্পার্টমেন্টের পাশে পাশে হেঁটে আসছে।

একটি ছবি সেই মুহূর্তে ফুটে উঠল আমার চোখের ওপর।

যেবার প্রথম এসেছিলাম ঝালদায়, সেবার ওরা দুজনে এসেছিল আমাকে বিদায় দিতে। অরিন্দম আমার হাতটা ছুঁয়ে ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা পথ দৌড়ে এসেছিল।

ট্রেন গতি নিয়ে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে চলে এল, আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল মুষলধারে বৃষ্টি।

আমি সেই অন্ধকার অঝোর বর্ষার ভেতর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম।

ভোরের রাগিণী

মেহেলী গল্প বলছিল ঃ শ্রোতা আমি আর সীমা।

কাঞ্চনজঙ্ঘার কাছেপিঠে কোন এক পাহাড়ের কোলে ছিল তাদের ছোট্ট ঘরখানা। বাপ মা আর একটিমাত্র মেয়ে। ছেলেবেলায় খুব সুন্দরী ছিল মেহেলী। বাপের সঙ্গে মোষ চরিয়ে পাহাড় আর বনে বনে ঘুরত সে। মোষের গলায় ঘণ্টা বাজত। মেহেলী অবাক হয়ে শুনত সে আওয়াজ। বনের ভেতর কিংবা কোন পাহাড়ের আড়ালে মোষ হারিয়ে গেলে সে ঐ ঘণ্টার টুং টাং শব্দ শুনে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে তাকে খুঁজে ফিরত।

এমনি একটি হারানো মোষের খোঁজ করতে এসে সে হারালো তার বাপ মাকে। একদল পাহাড়ী তাকে বলল, তারা তার মোষটাকে খুঁজে দেবে। সরল বিশ্বাসে মেহেলী চলল তাদের সঙ্গে।

সেই যাওয়াই তার শেষ যাওয়া। পাহাড় আর ফুরোয় না। কত কাঁদল সে। কত পথ পার হতে হল। রাতে মশাল জ্বেলে বনের পথে চলতে হত। বুনো পশুর ভয়। পাহাড়ী কত নদী পার হয়ে এল তারা। শেষে একদিন এসে পৌঁছল এই কার্শিয়াং শহরে। ওরা মেহেলীকে বিক্রি করল শিউশরনের বাপের কাছে। খ্রীষ্টান ছিল ওরা। একদিন খ্রীষ্টান মতে তার বিয়ে হল শিউশরনের সঙ্গে।

এই অবধি বলে মেহেলী থেমেছিল। সে তারপর তাকিয়েছিল কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে। বেলাশেষের কাঞ্চনজঙ্ঘা তখন কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে।

একসময় দুধের পাত্রটা নিয়ে উঠে পড়ল সে। তাকে এখন ফিরে যেতে হবে তার ঘরে। বড় মেয়েটা কদিন হল এসেছে দার্জিলিং থেকে। সেখানে তার শ্বশুরবাড়ি।

সীমা এতক্ষণ অবাক হয়ে শুনছিল মেহেলীর কাহিনী। হঠাৎ সে বলল, তুমি তোমার বাপমায়ের আর খোঁজ পাওনি মেহেলী?

সে অনেক কথা দিদিমণি।

আমার খোঁজ করে এই ক'বছর আগে বুড়ো বাপ এসেছিল। চোখে ভাল দেখতে পায় না। আমাকে পেয়ে জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না তার। তারপর যখন শুনল আমি খ্রীষ্টান হয়েছি, কিছু খেলে না দিদিমণি। তখনই আমার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেল।

বুড়ো বাপ একা। কোথায় গেল, কি হল তার কিছুই জানতে পারলাম না। মা নাকি মরেছিল আমার শোকে।

মেহেলী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। দুধের পাত্রটা হাতে নিয়ে একসময় উঠে চলে গেল।

কাঞ্চনজঙ্ঘার থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। কয়েকটা মেঘ বাংলোর পাশ দিয়ে ভেসে গেল। ওদিকের পাইনগাছগুলো মুছে গেল চোখের আড়ালে।

সীমা ফিরে তাকাল। চোখে মুখে তার ভয়ের আভাস। এতক্ষণ কথায় কথায় সে বুঝতে পারেনি বেলা চলে গেছে কখন।

বলল, সন্ধ্যে হয়ে এল এখন ওপরে ফিরব কেমন করে?

বললাম, নীচে অন্ধকার হলেও ওপরে আলো পাওয়া যাবে। এখনও ঘড়ির নিয়মে সূর্যাস্ত হয়নি।

আমার কথায় সীমা খুব ভরসা পেল বলে মনে হল না।

হেসে বললাম, ভয় নেই, একা যেতে হবে না।

সীমা আশ্বস্ত হল। মুখের ওপর ঘনিয়ে ওঠা ছায়াটুকু সরে গেল।

কোটখানা গায়ে জড়াতে গিয়ে বললাম, কি কৈফিয়ৎ দেবে আজ দিদিকে?

মুখের ওপর স্থির চাউনি মেলে তাকাল সীমা, কিসের কৈফিয়ৎ?

বললাম, খুব সাহস তো তোমার! পড়ার নাম করে মেহেলীর গল্প শুনলে। তারপর সময়ের সীমা পার করে ফিরছ। কৈফিয়ৎ দিতে হবে না?

হেসে মুখ নামিয়ে নিল সীমা। বেশ দেখায় সীমার এ ভাবটুকু।

মুখ না তুলেই বলল, যা হোক একটা কিছু কৈফিয়ৎ আপনিই দিয়ে দেবেন।

সীমার হয়ে কৈফিয়ৎ দেব আমি! আমার ওপর এ ধরনের নির্ভরতা কেন সীমার?

কথাগুলো এলোমেলো ভেসে আসছিল মনের ওপর, পাহাড়ে ভেসে আসা হাল্কা-মেঘগুলোর মত। মেঘেরা ছায়া ফেলছে, সরে গেলে আলোর আভাস এসে পড়ছে। মনের ওপর সীমার একটুকরো কথা আলোছায়ার খেলা খেলে চলল।

অন্যমনস্ক ভাবনায় ছেদ পড়ল একসময়। সীমা কখন আমার 'সঞ্চয়িতা' খানা ভেতর থেকে এনে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

বললাম, সে কি, অসময়ে সঞ্চয়িতা!

সীমা বলল, আপনিই তো একদিন ক্লাসে বলেছিলেন, সুদিন দুর্দিনের সঙ্গী সঞ্চয়িতা।

বললাম, সময় নষ্ট করার মতো সময় যখন আর একেবারে হাত নেই তখন সঞ্চয়িতা নিয়ে কি সুবিধে হবে বলতে পার?

সীমার মুখে হাসি, হাতে নিয়ে চলুন, দিদি কবিতার আবৃত্তি শুনতে খুব ভালবাসেন।

হেসে ফেললাম, ও, দিদিকে কাব্যের ঘুষ দিতে চাও। কিন্তু তোমাকে আস্তানায় পৌঁছে দিয়ে ফেরার সময় বড় একটা থাকবে বলে মনে হচ্ছে না। সুতরাং কবিতা শোনাতে হলে পরীক্ষার পড়া ফেলে তোমাকেই শোনাতে হবে।

ও যেন আকাশ থেকে পড়ল, আমি শোনাব কবিতা! তাহলেই হয়েছে আর কি! বেচারা জামাইবাবুকে তাহলে কালই স্টেশনে ছুটতে হবে ফেরার টিকিট কাটতে।

বললাম, আমার ফেরার সময়টা তো দিতে হবে। যে আঁধার-রাত, ফিরব কি করে?

সীমা বলল, একটা ভাবনা আপনি ভাবুন, আর একটার ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন। পৌঁছে দেবার ভার আপনার, আপনার ফেরা না ফেরার ভারটা না হয় আমার ওপরই রইল।

বললাম, কি সাংঘাতিক মেয়ে তুমি, তাই টেবিলের ওপর টর্চটা দেখতে পাচ্ছিনে। টর্চ থাকলে পাছে ফিরে আসি তাই সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

সীমা হেসে ফেলল, যদি আমাদের ওখানে আপনার একেবারে ভাল না লাগে তাহলে ভয় নেই, জামাইবাবুর টর্চটা সঙ্গে নিতে পারবেন।

আলো নিভে আসছে। অনেক ওপরে উঠতে হবে। তাছাড়া পথটাও বনের ভেতর দিয়ে। শুনেছিলাম কখনো সখনো দু'একটা ভালুক দেখা যায় এ পথে।

পথ চলতে কথাটা বললাম সীমাকে।

সীমা বলল, ভয় দেখানো আপনার একটা স্বভাব।

বলতে বলতে কিন্তু কাছে সরে এলও।

বললাম, কি রকম?

এই, ক্লাসে দেখান পরীক্ষার ভয়, এখানে দেখাচ্ছেন ভালুকের।

হেসে বললাম, কোন ভয়টা তোমার বেশি সীমা?

যে সহজ জবাবটা শুনতে চেয়েছিলাম, সে দিক দিয়ে ও গেল না।

বলল, যিনি রক্ষা করবেন তাঁর শক্তির ওপরেই সবটা নির্ভর করছে।

বললাম, নিজের শক্তিতে ভরসা রাখাই ভাল।

আপনি পাশে না থাকলে হয়ত তাই রাখতে হত। কিন্তু যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ আমার ভাবনার ছুটি।

পার হয়ে এলাম সেন্ট মেরী হিলসের ওপরের চার্চটা। প্রার্থনার শেষে একদল পাহাড়ী মেয়েপুরুষ নীচে নেমে যাচ্ছিল। নীরবে নেমে যাচ্ছিল তারা। প্রার্থনার ভাবে পূর্ণ হয়ে আছে।

বললাম, দিনান্তে এই প্রার্থনাটুকু আমার খুব ভাল লাগে সীমা। সারাটা দিন যিনি আমাদের আলো দেখালেন, দিনান্তে তাঁকে জানালাম একটি প্রণাম। এতে মনের একটা গভীর তৃপ্তি আছে।

সীমা কোন কথা বলল না। মুখ নিচু করে পাশে পাশে চলতে লাগল। আমি জানি সীমা গভীর হলে মাথাটা তার আপনিই নত হয়ে আসে। ক্লাসে পড়াবার সময় এটা আমি লক্ষ্য করেছি। এমনি তাকিয়ে থাকে মুখের দিকে, কিন্তু গভীর বিষয় হলেই মুখটি নিচু করে বসে থাকে। মন ভরে গ্রহণ করবার এ একটা অভ্যাস ওর।

একসময় ও হঠাৎ বলল, আচ্ছা এই পাহাড়ের দেশে সন্ধ্যের শাঁখ বাজালে কেমন হয়?

বললাম, কথাটা সত্যি ভেবে দেখবার মতো। বোধ করি একটি শাঁখের আওয়াজই পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে কাঞ্চনজঙ্ঘা অবধি পৌঁছবে। নভেল পরিকল্পনা তোমার। কলকাতা থেকে শাঁখ এনেছ নাকি?

শাঁখ আনব কেন, এমনি মনে এল তাই বললাম।

টুকরো ছবি, টুকরো কথা বড় ভাল লাগছে। ভাল লাগছে বাঁধাধরা নিয়মের বাইরে মনের এই এলোমেলো খেলা। শব্দ আসছিল। পাহাড়ী ঝর্ণার ঝরে পড়ার শব্দ। বাঁক ঘুরতেই এসে পড়লাম একটা জায়গায়। এ পথ দিয়ে আসিনি কোনদিন, কিন্তু শুনেছিলাম ডাওহিলে যাবার এটা সর্টকাট পাহাড়ী পথ। বাঁয়ে দীর্ঘ পাইন আর বুনো পাহাড়ী গাছের ঘন জঙ্গল ওপরে উঠে গেছে। ডাইনে উঁচু পাহাড়। দুটি পাহাড়ের মাঝ থেকে ঝর্ণাটা গড়িয়ে পড়েছে। একটা পাথরের ছোট সাঁকো পেরিয়ে আমরা যেখানটাতে এসে পৌঁছলাম, সেটা একটা আবিষ্কার বলেই মনে হল।

বাঃ কি সুন্দর জায়গাটা! সীমার মুখে অবাক খুশির মন্তব্য। পাহাড়ের যেখানে থেকে ঝর্ণার জলধারাটিকে বেরিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে, তার পাশেই একটি গুহা। সেই গুহায় মেরী মাতার অপরূপ একটি পাথরের মূর্তি। আমবা যেখানটাতে দাঁড়িয়ে আছি সেটা একশিলা একটা পাথর। তার নীচে গভীর খাদ। কিন্তু সেই পাথরের ছোট্ট জায়গাটুকু জুড়ে মরশুমী ফুলের একটুকরো বেড তৈরি করে রেখেছে কারা। সীমা খুশিতে প্রজাপতির মতো সেই এক চিলতে বাগানের ভেতর ঘুরতে লাগল।

ওমা কি সুন্দর সুইট-সুলতানগুলো। এদিকে দেখুন, পিঙ্ক-জিপসি!

ও শাড়ির আঁচলটা ছড়িয়ে নত হয়ে বসল। ফুলগুলোকে আলতো গুচ্ছ করে কতক্ষণ গালে ছুঁইয়ে স্পর্শসুখ নিল।

তারপর কি মনে এল অমনি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দেখুন, কত রঙ মিলিয়ে পোশাক-আশাক পরি আমরা, কিন্তু এই ফুলের বাহারের কাছে কোনটাই কিছু না।

মনে এল যীশুর একটি কথা। অবিকল সীমার কথার প্রতিধ্বনি। বললাম, 'consider ye the lilies of field, how they grow : they toil not neither do they spin. And yet I say unto that you even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.'

মাঠের লিলি ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ, তারা সুতো কেটে পোশাক বানায় না, আর তার জন্যে ব্যস্তও নয় তারা। তবু বিলাসী সম্রাট সলোমন তাঁর বহুমূল্য পোশাকে সেজেও এদের মতো সুন্দর দেখান না।

সীমা অমনি বলল, আমার ভাবনার সঙ্গে কি আশ্চর্য মিল এই কথাগুলোর। কার উক্তি?

পাহাড়ের গুহায় মেরীর মূর্তির দিকে তাকিয়ে বললাম, মেরীপুত্র যীশুর।

সীমা কতক্ষণ তাকিয়ে রইল সেদিকে। তারপর হাত জোড় করে নমস্কার করল।

বললাম, এখানে আর নয়, এসো সীমা। আমাদের সামনে সূর্যাস্ত, কিন্তু পথ অনেক দূর।

সীমাকে নিয়ে সেই অপরিচিত পাহাড়ী পথ ধরে এগুতে লাগলাম। ভুল হয়েছিল নতুন পথ নির্বাচনে। বেলা থাকলে নতুন পথে চলার আনন্দ আছে, উত্তেজনাও আছে। কিন্তু শেষ গোধূলির আলোয় অচেনা পথে চলার ঝুঁকি অনেকখানি। বেশ কিছুদুর এসে ভাবনায় পড়লাম। চওড়া পথটা

ক্রমে সরু হয়ে আসছে। পাশেই গভীর খাদ। খুব সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। আগে আমি, পেছনে সীমা।

ভয় পেয়ে গেলাম। ভেবেছিলাম পাহাড়ের ওপরে উঠতে গেলে আলো পাব, কিন্তু সব ভুল হয়ে গেল। মেঘে মুছে নিয়েছে অবশিষ্ট আলোটুকু। সীমার কাছে আমার ভয়ের কথাটা আর জানালাম না। ও নির্ভয়ে আমাকে অনুসরণ করছে। যেখানে পথ খুব সংকীর্ণ সেখানে ও হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। সাহায্য করছি আমি। নীচের খাদের দিকে তাকালে পথ চলা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই সামনের দিকে নজর রেখে চলতে লাগলাম।

সীমাকে বললাম, পায়ের তলার পথটুকুর ওপরেই শুধু নজর রাখবে। দরকার হলে হাত ধরো আমার।

মনে মনে আমি ভীত হলাম, সীমা কিন্তু একটুও না।

ও বলল, বেশ লাগছে নতুন পথে চলতে।

হঠাৎ বললাম, যদি পথ হারিয়ে ফেলি?

সীমা অবলীলায় বলে ফেলল, বিপথে যাবার সম্ভাবনা আছে নাকি?

গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেললাম, শব্দ প্রয়োগে দেখছি তুমি অদ্বিতীয়া।

নিজের কথার পাকে পড়ে সীমা লজ্জা পেল কিনা বুঝতে পারলাম না। তখন পেছনে তাকাবার অবসর ছিল না। সামনে খাড়াই। পায়ের তলায় সংকীর্ণ পথটুকুও আমাদের একেবারে নিরাশ করে হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। ফিরব তার উপায় নেই। নীচে নামতে গেলে ঘন অন্ধকারে পা পিছলে পড়ে যাবার খুবই সম্ভাবনা। তার পরিণতির কথা এ অবস্থায় না ভাবাই ভাল। খাড়াইতে ওঠা দুরূহ। তাছাড়া কোন রকমে উঠে নতুন পথ পাওয়া যাবে কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্চয়তা নেই। যে পাহাড়েব গা ঘেঁষে আসছিলাম তাতে ওঠা যায়, কিন্তু তার বুক জুড়ে পাইন অরণ্য। স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। এ সময় হতবুদ্ধি হবার অর্থই হল সব বিপদের ঝুঁকি একসঙ্গে নেওয়া।

আমাকে দাঁড়াতে দেখে সীমাও থামল। এতক্ষণে তার গলায় ভয়ের আভাস, দাঁড়ালেন যে?

আমার মুখের কোন পরিবর্তন হয়ত সে লক্ষ্য করে থাকবে। মিথ্যে সাহস দিয়ে আর লাভ নেই।

বললাম, পথ খুঁজে পাচ্ছিনে সীমা। জায়গাটাও এমন নির্জন যে কোন পাহাড়ির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

এবার আমার সে একেবারে কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। মনে হল সীমার চাহনিতে সন্দেহের ছায়া নেমেছে। সে চোখের দৃষ্টি পরক্ষণেই ভয়ে কাঁপতে লাগল। হঠাৎ সে নিজেকে হারিয়ে ফেলল, দুটি পায়ে পড়ি আপনার, আমাকে দিদির কাছে পৌঁছে দিন।

পায়ের তলা থেকে মনে হল মাটি সরে যাচ্ছে। সীমাকে ধরে না ফেললে হয়ত আমি পড়েই যেতাম। সীমার গায়ে আমার হাত লাগতেই বুঝলাম সেও থর থর করে কাঁপছে।

সীমা কি বলতে চায়! ও কি ভেবেছে আমাদের এই পথ হারানো একটা ছলনা! এই আলোহীন নির্জন স্থানটুকু কি তার মনের ওপর সংশয়ের ছায়া এনে ফেলল। সে কি ভুলে গেল আমার আর ওর সম্পর্কটুকু! এই পরিবেশে কেবল একটি নারী আর পুরুষই তার কাছে সত্য হয়ে উঠল।

এই আকস্মিক আঘাতে ভুলে গেলাম পথের ভয়।

বললাম, ভয় পেও না, তুমি এখানে দাঁড়াও, এখুনি আসছি।

বাঁ দিকের পাহাড়টাতে উঠে গেলাম। এমনি দিনের আলোয় যার ভেতরে ঢুকতে হয়ত ইতস্তত করতাম, এখন নির্ভয়ে সেখানে এসে দাঁড়ালাম। একটা উত্তেজনার তাড়ায় এলাম ঠিক কিন্তু এ আঁধারে পথ দেখা যায় না। অভ্যাসবশে ওভারকোটের পকেটে হাত ঢোকালাম, কিন্তু টর্চটা পেলাম না। মনে পড়ল, সীমা আগেই সেটা সরিয়ে রেখেছে। পাছে আমি ফিরে আসি তাই সীমার এ কারচুপি। দুঃখেও হাসি আসে মানুষের। কিন্তু একি! নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না। একটা মেঘের আড়াল সরে যেতেই চোখে এসে পড়ল কয়েকটা বিচ্ছিন্ন আলোর রেখা। লাইটপোস্টের আলো। পথ

সামনেই। আবার নেমে এলাম। এসে দেখি সীমা চোখের ওপর হাত ঢেকে বসে আছে। কাছে আসতেই চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল।

বললাম, যদি আপত্তি না থাকে আমার হাত ধরে উঠে এস।

হাত বাড়িয়ে ও আমার একটা হাত ধরল। তারপর পাইন বনের ভেতর দিয়ে কোনরকমে এলোমেলো পা ফেলে আমরা এসে উঠলাম একটা পথের ওপর।

যা হোক একটা পথ পাওয়া গেছে। মানুষও পাওয়া যাবে তাহলে।

পথের ধারে আলোটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। একবার আড়চোখে দেখলাম সীমাকে। ওর চোখ পথ ছুঁয়ে আছে।

বললাম, এখানে আবার একটু দাঁড়াতে হবে।

ও চোখ তুলে তাকাল। কি জানি কেন হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, ভয় নেই, একা ফেলে পালাব না।

ওর মুখটা আবার নামল।

পথের ওপাশে একটা আলো দেখা যাচ্ছিল, সেখানে গেলাম। ছোট্ট চায়ের দোকান। দু'চারটি পাহাড়ি গুড়িসুড়ি মেরে বসে চা খাচ্ছিল। ওদের কাছে গিয়ে ডাওহিলের নিশানাটা জিজ্ঞেস করলাম। একজন নেমে এল। কোন কথা না বলে ইঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করতে বলল। কিছুটা পথ আমরা তার সঙ্গে চললাম। তারপর একটা বাঁক ঘুরতেই এসে পড়লাম আমাদের চেনা জায়গায়। লোকটিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় দিলাম।

এবার আশা করি তুমি একাই যেতে পারবে, সীমার দিকে তাকিয়ে বললাম।

কোন কথা না বলে ও আবার মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

মনে হল ও যেতে পারলেও আমার ওকে এ সময়ে একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। কৈফিয়তটা আমারই দিয়ে আসা উচিত।

বললাম, এস।

সামনে আঁধার রাতের মতো স্তব্ধ হয়ে আছে সীমা। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে আমার পেছনে পেছনে আসতে লাগল।

পথের ওপরই দাঁড়িয়েছিলেন ওর দিদি আর জামাইবাবু। আমাদের আসতে দেখে সীমার দিদি এগিয়ে এসে বললেন, বড় ভাবনায় পড়েছিলাম সুমন্তবাবু। ভাগ্যিস আপনি সঙ্গে আনলেন। রোজই একা আসে কিনা, তাই এত দেরি দেখে দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। আর একটু হলে উনিই বেরুচ্ছিলেন।

বললাম, আপনাদের এ দুর্ভাবনায় জন্য সবটুকু দায়িত্ব কিন্তু আমারই, নতুন একটা পথ পরীক্ষা করতে গিয়েই আমাদের এ বিপর্যয়।

অর্ণববাবু রসিক মানুষ, বললেন, পরীক্ষা করাই তো আপনাদের কাজ। তবে যে ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করে তাকে নিয়ে অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা চিরকাল।

সীমার দিদি অসীমাদেবী অর্ণববাবুকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ঠাণ্ডায় পথে না দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতরে চায়ের কাপে তুফান তুললে খুব ক্ষতি হবে কি?

অর্ণববাবু হেসে বললেন, লাভের অঙ্কটা আর নাই বা বাড়ালাম। ইতিমধ্যেই শ্রীমতী সীমার সঙ্গ লাভ, তাঁর অগ্রজার সেবালাভ, এসব বড় বড় লাভের পরে আর কি এমন লাভ হতে পারে।

বললাম, উপরিলাভ বলে একটা কথা আছে, বোধকরি তাই।

অসীমাদেবী হেসে বললেন, আজ কিন্তু আপনি ভিন্ন শিবিরে যোগ দিচ্ছেন ভাই।

সবিনয়ে বললাম, ভুল ধারণা আপনার, সৈনিক আর কোন শিবিরেই ফিরবে না! লাল কালিতে তার নাম খারিজ হয়ে গেছে।

অর্ণববাবু বললেন হঠাৎ শিবির ত্যাগের ইচ্ছেটা জাগল কেন জানতে পারি কি? আরও ওপরের পাহাড়ে ওঠার সংকল্প—না, একেবারে নীচে নেমে যাবার মতলব।

বললাম, কোনটাই নয় আপাততঃ। তবে যুদ্ধে পঙ্গু সৈনিকের কিছুদিন অন্ততঃ পুরোপুরি বিশ্রাম নেবার অধিকার আছে।

কথা এমনিতেই বেড়ে চলত, কিন্তু মনটা আজ সত্যিই বিশ্রাম চাইছে। তাই হাত দুটি যুক্ত করলাম।

সে কি! দিদি যেন আকাশ থেকে পড়লেন, না, না, এমন করে মুখে কিছু না দিয়ে পালান যায় না।

অর্ণববাবু কথা যোগ করলেন, এতে গৃহস্থের অকল্যাণ আর সুগৃহিণীর অপমান।

অগত্যা ভেতরে ঢুকতে হল। কিন্তু এই মুহূর্তে ইচ্ছে করছিল চলে যাই। যে অঘটন আকস্মিক ভাবে ঘটে গেল, তাকে মনের থেকে মুছে ফেলি কি করে। সীমার সঙ্গে এখুনি হয়ত মুখোমুখি হতে হবে একই টেবিলে। ওর সঙ্গে স্বাভাবিক হতে পারব না কিছুতেই। তখন ব্যাপারটা হয়ত দৃষ্টিকটু হয়ে পড়বে।

কিন্তু সব ভাবনার ওপর ছেদ টেনে দিয়ে ভেতরে গিয়ে বসলাম।

সীমাই পরিস্থিতিকে রক্ষা করেছে। চায়ের আসরে সে আর আসেনি। হয়ত আসা সম্ভব ছিল না তার।

সীমাকে গরহাজির দেখে অর্ণববাবু প্রশ্ন তুলেছিলেন। উত্তর এল দিদির কাছ থেকে, দেখছ না, নাকের ডগায় পরীক্ষার খাঁড়া। তার কি আর তোমাদের সব আনন্দে যোগ দেবার সময় আছে। সে এখন গুটিয়ে বসেছে পড়ার ঘরে। আজ আর আলাপ ভাল জমল না। মনটা আলাপের অনুকূলে ছিলনা বলেই হয়ত।

সামান্য একটু অজুহাত দেখিয়েই উঠে পড়লাম।

অর্ণববাবু কথা তুললেন, পথটা রাতের যাতায়াতের পক্ষে সুবিধের বলে মনে হয় না অধ্যাপক। রাতে এখানে থাকলে খুব বেশি অসুবিধেয় পড়বেন কি?

হাসিতে ডুবিয়ে দিলাম ওঁর শঙ্কা। বেরিয়ে এলাম পথে। পথের ধারের ঘরটিই সীমার। আলো জ্বলছে ঘরে। একটুকরো রশ্মি পথে এসে লুটিয়ে পড়েছে। চমকে উঠলাম। মনে হল আলো নয়, ঠিক যেন আঁচল লুটিয়ে সীমাই ভূমিষ্ঠ আছে। ঘরের দিকে তাকাতে পারলাম না। পথটুকু পার হয়ে এলাম।

আমি জানি পকেটে আমার টর্চ নেই, এও জানি একা একা অন্ধকারে সেন্ট মেরী হিলে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, তবুও বেরিয়ে এলাম। অনেক সময় পথের আশ্রয় ঘরের চেয়ে কাম্য বলে মনে হয়।

কনকনে হাওয়া দিচ্ছে আজ, কুয়াশায় চারদিক ঢাকা। পরিচিত পথটা ধরে কিছুদূর এগিয়ে এলাম। একটি ছবি ভেসে এল চোখের ওপর। কলেজে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানীর' অভিনয় হচ্ছিল। সীমা সেজেছিল 'ইলা'। কি সুন্দর লাবণ্যে ভরা তরুণী মূর্তি। কথাগুলো 'কানে এসে আজও বাজছে—'

'যাও তুমি, আমি একা কেমনে পারিব তোমারে রাখিতে ধরে।
হায়, কত ক্ষুদ্র কত ক্ষুদ্র আমি! কি বৃহৎ এ সংসার,
কি উদ্দাম তোমার হৃদয়!
কে জানিবে আমার বিরহ! কে গণিবে অশ্রু মোর!
কে মানিবে এ নিভৃত বনপ্রান্তভাগে
শূন্য হিয়া বালিকার মর্মকাতরতা!'

ছি, ছি, এ আমি কি ভাবছি। কেন মনে আসছে এসব ছবি। একদিন ভাল লেগেছিল ওর অভিনয়। অভিনয়ের শেষে ও পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, মুখখানা নিচু করে।

বলেছিলাম, অভিনয় করছ বলে মনে হল না। এত স্বাভাবিক পটুত্ব তোমার। সত্যি, অবাক করেছ।

কিন্তু সে তো অনেক দিনের কথা। তবু মনে এল আজ। হঠাৎ অনেক দিনের হারিয়ে যাওয়া পাতাখানা উড়ে এল এলোমেলো হাওয়ায়। একে তুলে নিতে গেলে ধুলো লাগবে হাতে, ফেলে দিতে গেলে ব্যথার অদৃশ্য কাঁটা বিঁধবে কোথাও। কি এক আশ্চর্য সমস্যার ঢেউ মাঝে মঝে তুলে ধরে মন। যার হাত থেকে মুক্তি চাইলেও পাওয়া যায় না।

কতটা পথ চলে এসেছিলাম। পেছনে থেকে কে যেন ডাকল, বাবুজী! সঙ্গে সঙ্গে একটা আলোর ঝলক এসে পড়ল আমার সর্বাঙ্গে। দেখলাম, অর্ণববাবুদের নেপালী বাহাদুর।

একটা চিঠি আর একটা টর্চ সে হাত দিয়ে বলল, দিদিমণি তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয় আমাকে নাকি কোঠিতে পৌঁছে দিয়ে তবে তার ছুটি।

মনে মনে ইতস্তুতঃ করলাম। কিন্তু না, বাহাদুর আর টর্চ দুটো ফেরত দিলে কি ভাববেন অর্ণববাবুরা। আবার শুধু টর্চটা নিয়ে একা চলে গেলে কাল তা ফিরিয়ে দিতে আসতে হবে। বাহাদুরকে সঙ্গে নেওয়াই ভাল মনে হল।

রাতে শীত পড়েছে। একটানা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে কাঞ্চনজঙঘা থেকে। ভেতরে ভেতরে কাঁপুনি উঠে আসছে। মনে হচ্ছে যথেষ্ট পোশাক সঙ্গে নেওয়া উচিত ছিল। পাথর বাঁধান রাস্তা ছেড়ে এখন আমরা বনের পথ ধরলাম। রাতের বন এক থমথমে রহস্যপুরী। টর্চের আলো পড়ছে আর তাল তাল অন্ধকার দুদিকে ত্রস্তে সরে সরে যাচ্ছে। যেন বিরাট একটা সভার আয়োজন চলেছিল, হঠাৎ ভেঙে ভেঙে গেল। অন্ধকার বনের কত বিচিত্র কীট পতঙ্গ ডাকছে। মনে হল ওরা আর্তনাদ করছে।

কেন এমন ভাবছি আমি? অতৃপ্ত আশা, রুদ্ধ কামনাগুলো মনের গোপনে বোধহয় এমনি করে কাঁদে, অসহ্য যন্ত্রণায় গুমরে গুমরে আর্তনাদ করে। কতক্ষণ পথ চললাম, কত অসংলগ্ন কথা ভাবলাম। এক সময় বন শেষ হয়ে এল। মিশনারী কলেজের আলো দেখা গেল। অদূরে একটা বাঁক ঘুরতেই শোনা গেল ঝর্ণার একটানা ঝরে পড়ার শব্দ।

এতক্ষণে আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল, আমরা এসে পৌঁছলাম আস্তানায়। বাহাদুর ফিরে গেল। মনে হল ওকে কিছু খাইয়ে দিলে হত, কিন্তু ততক্ষণে ও অনেকখানি পথ উঠে গেছে। মনের ভাবনাগুলো কেন যে যথা সময়ে আসে না। তেনাংকে পাঠাব ভাবলাম ওকে ডেকে আনতে। থাক্, যা হয়নি তা হয়নি। তাকে নিয়ে মনের ভাবনা না বাড়ানোই ভাল। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসলাম। কাঁচের শার্সিগুলো তেনাং বন্ধ করে দিয়ে গেল। আলোটা অফ্ করে দিতে বললাম। আজ কোন কিছু লিখতে বা পড়তে একেবারেই ইচ্ছে করছে না।

তেনাং জিজ্ঞেস করল, আমি আজ শিগ্‌গির খাব কিনা। বললাম, আমার দেরি হবে, টেবিলের ওপর খাবার রেখে তুমি খেয়ে নিও।

তেনাং চলে গেল। চাঁদ উঠেছে, কুয়াশার ঘন আবরণ ভেদ করে অস্ফুট একটা আলো এসে পড়েছে। কাচের শার্সির ভেতর দিয়ে সামনের লনটুকু দেখছি। তার ওপরে পাইন গাছটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। বড় নিঃসঙ্গ ও। ওপরের পাহাড়ের পাইন গাছগুলো যেখানে জটলা বেঁধে আছে, ঝড় এলে এ ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ছে, সেখানে ওর যাবার উপায় নেই।

মিঃ মুখার্জীকে এবার কলকাতায় গিয়ে বলতে হবে আর একটা পাইন এই গাছটার ঠিক পাশেই লাগিয়ে দিতে।

তাইত, সীমার চিঠিখানা এখনও পড়া হয়নি। সুইচ টিপে আলো জ্বাললাম। কোটের পকেট থেকে বের করলাম সেই চিঠি। কতকগুলো চিন্তা এমন জট পাকিয়ে গিয়েছিল, তার ভেতর একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম চিঠিখানার কথা।

সীমা লিখেছে,

শ্রীচরণেষু

ক্ষমা চাইব এমন ক্ষমতা আমার নেই। শেষের পথটুকু কি করে যে এসেছি তা শুধু আমিই জানি। চরম বিপদের মুখোমুখি ফেলে আমায় পরীক্ষা করে নিলেন। আমি অকৃতকার্য হয়েছি, সমস্ত জীবন জুড়ে এ দুঃখ আমায় বইতে হবে। আপনাকে রাতে এ বাড়িতে থাকতে বলে আপনার ঘৃণাকে আর বাড়াতে চাইলাম না।

প্রণতা
সীমা

চিঠিখানা বার বার পড়লাম। সীমা তার কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়েছে, ভুল শুধরে নিতে তার বেশি সময় লাগেনি। কিন্তু আমি কি করে ভুলি গত সন্ধ্যার কথা। 'দুটি পায়ে পড়ি আপনার, আমাকে দিদির কাছে পৌঁছে দিন।' এই সামান্য একছত্র কথা, কিন্তু কি গভীর এর অর্থ। আমি যেন পথের সবটুকু জেনে ওকে স্বেচ্ছায় সেই নির্জন জায়গাটিতে এনে তুলেছি। ইচ্ছা করলেই যেন সেখান থেকে তাকে মুক্ত করে তার পরিজনের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। সেই মুহূর্তে সীমা আমার চোখে মুখে কি গোপন অভিসন্ধির ছবি দেখে এমন উতলা হল! মনে পড়ল প্রথম দিনটির কথা। ঐ সামনের লনে বসে তাকিয়ে ছিলাম দূরে পাহাড় ঘেরা সবুজ সমতলটুকুর দিকে। কার্শিয়াং-এর এই দৃশ্যটি বড় সুন্দর। সেদিন মেঘ আর মেঘ। সকালের সূর্য ঢাকা পড়েছিল তার আড়ালে। কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়োর যে অংশটুকু দেখা যায় তা সেদিন মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। তাকিয়েছিলাম ঐ সমতল ভূমিটুকুর দিকে। হঠাৎ মেঘভাঙা একটুকরো আলো এসে পড়ল ঐ সমতলের সামান্য অংশে। সে আলোর রশ্মি বিচিত্র সবুজ মখমলের যেন একটা গালিচা পেতে দিয়ে গেল। সেই অপরূপ দৃশ্যটুকু বসে বসে উপভোগ করছিলাম, হঠাৎ চমকে ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। পায়ে কার যেন ছোঁয়া লাগল ; তাকিয়ে সামনে যাকে দেখলাম, সে আমাকে আরও অবাক করে দিলে। আমাদের কলেজের ছাত্রী সীমা নমস্কার করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

তুমি এখানে সীমা, কি ব্যাপার? সত্যিই বিস্মিত হলাম।

ও ওর স্বভাবসিদ্ধ ধারায় মুখটি নিচু করে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

সেই মুহূর্তে আমার কিছু একটা করা দরকার, আমি তেনাংকে ভেতর থেকে আর একখানা চেয়ার আনতে বললাম। তেনাং চেয়ার দিয়ে গেল। বললাম, আগে বস, তারপর সব শুনছি।

সীমা কেমন যেন সংকুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বললাম, বস, বস, লজ্জা কি? এটা ক্লাস রুম নয়। তাছাড়া মাস্টার মশায়ের সামনে বেঞ্চ ছাড়া অন্য কোন আসনে বসব না, এরকম প্রতিজ্ঞা করলেই তো মুশকিল।

পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে ও কাদের যেন দেখতে লাগল। আমিও ওর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে পেছনে তাকালাম। ওপরে পাইন গাছের তলায় একটি ভদ্রলোক আর একটি ভদ্রমহিলাকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, এঁরা কারা?

উত্তর এল, দিদি, জামাইবাবু।

ভর্ৎসনা করলাম, বেশ মেয়ে তো তুমি, ওঁদের এখানে দাঁড় করিয়ে রেখে একা আসতে হয় বুঝি? আচ্ছা আমিই ডেকে আনছি।

সীমা তাড়াতাড়ি হাতছানি দিয়ে ওপরওয়ালাদের ডাক দিল।

আমি দূরে থেকেই যুক্তকরে ওঁদের আহ্বান জানালাম।

আরও দুখানা চেয়ার আনতে বললাম তেনাংকে। ওঁরা এসে গেলেন। নমস্কার বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গেই জামাইবাবুটি বললেন, আমার পাশে যিনি রয়েছেন তিনি অসীমা, আমার দশ বছরের পার্শ্বচারিণী, আপনার কাছে যিনি রয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই আপনার অপিরিচিতা নন। আমি অর্ণব ব্যানার্জী, একালের ভগীরথ বলতে পারেন। বর্তমানে রিভার প্রোজেক্টের সঙ্গে যুক্ত। আপনার পরিচয় আগেই পেয়ে গেছি। সীমা আপনার পরিচয় দিতে গিয়ে যে গুরুভক্তি দেখিয়েছে তা কিন্তু এযুগে দুর্লভ।

সহাস্যে বললাম, যদি আগের দিনের মতো গুরুগৃহে শিলনোড়া নিয়ে হলুদ পিষতে হত তাহলেই গুরুভক্তির বহরটা দেখা যেত।

অসীমাদেবী কথা বললেন, এ কিন্তু মেয়েদের ওপর আপনাদের আক্রমণ। আচ্ছা বলুন তো এমন কোন মেয়ে দেখেছেন যিনি শিলনোড়ার ব্যবহার জানেন না।

একটা উত্তর দেবার কথা ভাবছিলাম। অর্ণববাবু আমাকে সে সুযোগ না দিয়েই বললেন, নিজের ঘরের দিকে তাকিয়েই জবাবটা দিন না মশায়।

বললাম, সে পরীক্ষার সুযোগ আপাততঃ হাতে নেই। এখন যিনি আমার হলুদ পেষার কাজটা করছেন তিনি নারী সমাজকেও একাজে লজ্জা দিতে পারেন।

অসীমাদেবী মুহূর্তে ঘরোয়া হয়ে গেলেন। মেয়েরা বোধহয় এটা পারেন।

সে কি ভাই এখনও গৃহিণীর মুখ দেখেন নি!

বললাম, কাছে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই অদৃশ্য হয়ে থাকতেন না।

কি জানি, ঘরে রেখেও তো আসতে পারেন।

অর্ণববাবু আমার পক্ষ নিলেন, তাহলেই হয়েছে আর কি, ঘরে থাকবে তোমরা আর পাহাড়ে বেড়াব আমরা!

অসীমাদেবী বললেন, মেয়েদের হাতের সেবা না পেলে চেঞ্জের পুরো ফল পাওয়া যায় না, তাই বাধ্য হয়ে আমাদের আনা!

অর্ণববাবু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, এবার আমিই বাধা দিলাম।

সে কথা কিন্তু মিথ্যে নয়, একা এসে অর্ণববাবু কিরকম বিপাকে পড়তেন তা আমি নিজে বেশ বুঝতে পারছি।

ওঁদের বসতে বলে ভেতরে গেলাম। তেনাংকে মাখন বিস্কুট আর চা দিতে বললাম।

ঘরে থেকেই অর্ণববাবুর গলা শোনা গেল, ও ভাই সুমন্তবাবু, বলি কোথায় গেলেন?

বেরিয়ে এসে হেসে বললাম, নামটাও দেখছি ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে।

আমাদের সীমাদেবীর দৌলতে আপনার সম্বন্ধে অজানা কিছু থাকবার যো কি আছে ভাই। সীমার দিকে মুখ ফিরিয়ে অর্ণববাবু কৌতুকের হাসি হাসলেন।

এক মুহূর্তে এমন অন্তরঙ্গ হতে পারে মানুষ, এ যেন আমাকে সত্যিই অবাক করল। চা খেতে খেতে কথায় জানা গেল ডাওহিলে অর্ণববাবুর পৈতৃক একটা বাংলো রয়েছে। মাঝে মাঝে ওঁরা ওখানে এসে কাটান। অসীমা দেবী আর সীমা সহোদরা। বাবা-মা থাকেন কটকে। উড়িষ্যা সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী সীমার বাবা। সীমা নাকি দিদি-অন্ত প্রাণ। তাই কলকাতায় দিদির কাছে থেকেই বরাবর লেখাপড়া করছে।

হেসে বললাম, আর ক'মাস পরেই সীমার পরীক্ষা, এ সময়ে পুরো একমাস হাওয়া বদলে কি ওর বিশেষ কিছু সুবিধে হবে?

অর্ণববাবু বললেন, মশায়, বেশ মানুষ তো আপনি, যে রসে নিজে বঞ্চিত সে রসে অন্যকে বঞ্চিত করার অপচেষ্টা কেন। তাছাড়া আপনাদেরই কোন কবি যেন তাঁর কবিতায় লিখেছেন, 'বিবাহের পাশে যেন তাজা যৌতুক'। এখন বলুন এমন যৌতুকটিকে কি কাছছাড়া করা চলে?

বললাম, কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।

পাহাড়ের পরিবেশে সব কথা চললেও পরীক্ষার কথা যে একেবারেই অচল সেটা ভাবা উচিত ছিল।

অসীমাদেবী বললেন, উঁহু, ওটি চলবে না ভাই ; ধনুকের তীর আর মুখের কথা একবার ছেড়ে দিলে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। কথা যখন তুলেছেন, তখন তার সমাধান আপনাকেই করতে হবে।

বলুন, আমি আপনাদের কি কাজে লাগতে পারি?

অর্ণববাবু বললেন, মেয়েরা হিসেবী লোক মশায়, আমাদের মত বেহিসেবী কথা বলে না। এখন নিজের জালে নিজেই জড়ালেন।

হেসে বললাম, জাল থেকে মুক্তির উপায়টা বলে দিন।

অর্ণববাবু বললেন, সহধর্মিণীর বোনটিকে আপাততঃ পরীক্ষার ভয় থেকে কিছুটা মুক্ত করুন তাহলে নিজেও মুক্তি পাবেন।

ও এই কথা, হেসে বললাম, বেশ তো এতে আর আপত্তির কারণ কি।

সীমার দিকে তাকালাম। সে যেন খুব সংকুচিত হয়েছে বলে মনে হল।

অর্ণববাবু বললেন, সীমা দেবী, একটু আগেই তুমি দুঃখ করছিলে মেঘে ঢাকা কাঞ্চনজঙঘা দেখতে পেলে না বলে। কিন্তু এই যে সুমন্তবাবুর সঙ্গে হঠাৎ দেখাটা হয়ে গেল, এটা কি তোমার কম লাভ!

বললাম, ভ্রমণে এসে পড়াশুনা কুইনাইন গেলার সামিল। সুতরাং ঠিক এই মুহূর্তে ওর পক্ষে লাভের হিসেব করা কি সম্ভব?

সেদিন এমনি কথায় কথায় ওঁদের সঙ্গে পরিচয় হল। কিন্তু সে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে বেশি সময় লাগেনি। বড় চমৎকার পরিবার এঁদের। গল্পে গানে কার্শিয়াং ক'দিনেই অপরূপ হয়ে উঠল।

কিন্তু সেই প্রাণখোলা আনন্দের মাঝখানে হঠাৎ একবিন্দু কালি ছিটিয়ে দিলে কে! না, আর ও নিয়ে ভাবনা নয়। এইখানে তার ইতি হয়ে যাক। ঐ গ্লানির অধ্যায়টুকু মুছে যাক মন থেকে।

ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে অনেক হাল্কা মনে হল নিজেকে। তারপর কখন উঠে আলোটা নিভিয়ে কম্বলটা আবার গায়ে জড়িয়ে নিয়েছি তা আর মনে নেই।

ভোর হয়েছে কখন। মেঘমুক্ত আকাশ থেকে সূর্য মুঠি মুঠি সোনা ছড়াচ্ছে। বাগানে রোজকার মতো ছোট ছোট পাহাড়ী ছেলেমেয়ে এসে খেলার আসর পেতেছে।

ঘুম ভাঙতে দেখি, সারারাত ইজিচেয়ারে বসেই ঘুমিয়েছি। সত্যি কি ঘুমটাই না ঘুমিয়েছি। সামনেই গরম জল, পেস্ট, ব্রাশ সবকিছু সরঞ্জাম। না চাইতেই আজ তেনাং ওগুলো যথাস্থানে রেখে গেছে। দেরিতে উঠেছি তাই রোজের মত তাড়া দেবার সময়টুকু ও আর আমাকে দেয়নি। মুখ হাত ধুয়ে নিলাম। মনে পড়ল কাল রাতে কিছুই খাওয়া হয়নি। ঘরের ভেতরে উঠে এসে দেখি আমার খাবার টেবিলে দিস্তে খানেক পরোটা আর তার সঙ্গে আলু-মরিচ। চমৎকার ব্যবস্থা। মনে মনে তেনাংকে প্রশংসা না করে পারলাম না। কিন্তু এতগুলো খাওয়া যায় কি করে, তেনাংকে ডাক দিলাম। উত্তর এল না।

কি হল লোকটার, খাবার দিয়ে হাওয়া হয়ে গেল নাকি! কিচেনের কাছে এসে দেখি, সীমা কেটলী থেকে চা ঢালছে। আমি এলাম, বেশ খানিক সময় দাঁড়ালাম, কিন্তু সীমা সেই যে হাঁটুর ওপর মুখটা গুঁজে চায়ে দুধ আর চিনি মেশাতে লাগল, ওর মুখের ভাবান্তর আর দেখতে পাওয়া গেল না।

বললাম, কখন এলে?

চায়ের কাপটা আমার হাতে তুলে দিয়ে সীমা মাটির ওপর চোখ রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

একি! তুমি কাঁদছ সীমা?

টপ্ টপ্ করে কয়েক ফোঁটা জল সীমার চোখ থেকে ঝরে পড়ল পাথরের মেঝেতে। অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম নিজেই। ঠিক এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি আগে কোন দিন পড়তে হয়নি আমাকে। কালকের একবিন্দু কালির দাগকে সীমা যেন তার চোখের জল দিয়ে প্রাণপণে মুছে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল।

ওর মাথায় হাত রেখে বললাম, আমি মহাপুরুষ নই সীমা, তাই সাধারণ কোন ভুলের ভেতর জড়িয়ে পড়া আমার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু এমন অন্যায় হয়ত করব না যাতে নিজের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

সীমা এবার আঁচলটা চোখের ওপর টেনে নিল। প্রবল বন্যা তখন তার চোখ ডুবিয়ে নেমে আসছে। তাকে রোধ করার চেষ্টা করেও পারল না।

ওকে কাছে টেনে নিলাম।

ছিঃ, এমন করে কাঁদতে আছে?

আমার আন্তরিকতার ছোঁয়া পেয়ে ও থর থর করে কেঁপে উঠল। বললাম, নিজেকে এমন করে হারিয়ে ফেল না সীমা। ভুলের শেষ আছে। তার জের টানতে নেই। কাল যখনই ভুল বুঝেছ তখনই তার শেষ হয়ে গেছে। আজ আর তাকে নতুন করে মনে এনে দুঃখ পেও না।

কিছুক্ষণের ভেতরেই সীমা শান্ত হল। জল ঝরিয়ে মেঘ কেটে গেলে আকাশ যেমন শান্ত হয়।

বললাম, আমার সঙ্গে এসো সীমা।

ও পায়ে পায়ে এলো ঘরের ভেতর।

বললাম, দুষ্টু মেয়ে, আমার ঘুমের সুযোগ নিয়ে সারা সকাল এত সব করা হয়েছে। তেনাংকে কোথায় পাঠান হয়েছে শুনি?

এতক্ষণে সহজ হল সীমা। বলল, ঘরে তরকারি ছিল না তাই ওকে স্টেশনের বাজারে পাঠিয়েছি।

তারপর আমাকে আর কথা বলার সুযোগ দিলে না। এক-ঝাঁক প্রতিবাদের ঝড় বইয়ে দিলে। কেন আমি কাল রাতে খাইনি? কেন আমি সারারাত বারান্দায় শুয়ে শুয়ে কাটিয়েছি? পাহাড়ী ঠাণ্ডা একবার বুকে বসলে তার পরিণতির কথা আমি ভেবে দেখেছি কিনা? এই অচেনা জায়গায় তেমনি একবার অসুখে পড়লে কে সেবা করবে?

কি জানি কি মনে হল। অমনি বললাম, তুমি।

সঙ্গে সঙ্গে আমার দিক থেকে সীমা মুখটা ফিরিয়ে নিল। এই মুহূর্তে লনের ঐ পাইন গাছটা কি এক অনিবার্য কারণে সীমার লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠল।

কতক্ষণ পরে সীমা যখন মুখ ফেরাল তখন আর তার মুখের ভাবের কোন লেখাই পড়া গেল না।

শুধু বলল, চাটা তো বরফ হল, এখন খাবারগুলো ফেলে রাখার জন্যেই কি সারা সকাল বসে বসে তৈরি করলাম?

হেসে বললাম, বেশি বেলা অবধি কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমিয়েছি বলেই কি খাবার বেলাতেও কুম্ভকর্ণ ভাবলে? তবে যদি সাহায্য করতে পার তাহলে এই উপাদেয় বস্তুগুলো উঠে যেতে পারে।

ও চুপচাপ বসে রইল।

বললাম, আমি প্লেটে কয়েকটা পরোটা এখুনি তোমাকে তুলে দিতে পারি কিন্তু এ কাজে তোমরা এগিয়ে এলে বড় ভাল লাগে।

কি ভেবে ও মুখ টিপে হাসল। তারপর একটা খালি প্লেটে দুটো পরোটা রেখে বলল, এবার খান।

আরো তুলে নাও।

খান তো দেখি, না পারেন পড়ে থাকবে।

খেতে খেতে বললাম, চমৎকার লাগছে সীমা।

অন্যমনস্ক সীমা বলল, কী?

কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, এই পাহাড়, লন, তোমাদের সবার প্রীতি, মায় এই সকাল বেলায় গরম পরোটাগুলো।

এর ভেতর কোনটা আপনার সবচেয়ে বেশী ভাল লেগেছে? সীমার মুখে কৌতুক।

আগে বল কোনটা বললে তুমি বেশি খুশি হও?

সীমা বলল, চাই না আমি এমন মন রাখা প্রশংসা।

ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, আচ্ছা, আমি যা বলব তা তুমি বিশ্বাস করবে?

মাষ্টার মহাশয়কে ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণতঃ বিশ্বাস করতেই শেখে।

বললাম, তবে বলি শোন, খুব ভাল লেগেছে এই পরোটাগুলো। তার চেয়ে ভাল লাগছে তাকে যে এমন উপাদেয় পরোটাগুলো তৈরি করেছে। আবার বলি, সেই মেয়েটিকে ভাল লাগছে বিশেষ করে এই কারণে যে এই বন পাহাড়ের পরিবেশে তার সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে।

সীমা মাথা নেড়ে ঘোরতর প্রতিবাদ জানাল, না, না এমন করে বললে চলবে না। আপনি একই কথার ভেতর সবাইকে ভাল বলে নিলেন, এ আপনার কথার ফাঁকি।

বললাম, যাকে ঘিরে সব ভাল লাগার ভিড়, সেই সবচেয়ে ভাল একথা কি কাউকে বলে দিতে হয়।

সীমা চোখ নামিয়ে নিয়েছে ততক্ষণে। ওর মুখে পড়েছে গভীর ভাল লাগার ছায়া। ওর ভাল লাগার এই ছবিটুকু দেখতে আমি ভালবাসি, তাই আমারও সকালের পরিবেশটি বেশ ভাল লাগল।

খাওয়ার টেবিল থেকে রোজকার মত নেমে এস ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসলাম। সীমা পাশে আর একটা চেয়ারে বসল। এখন আর আমার সামনে চেয়ারে বসা নিয়ে ও বিব্রত হয় না। আজ ওর হাতে ছিল 'মহুয়া'।

বলল, একটুও ভাল লাগছে না আজ পড়তে, আজ পড়ার ছুটি।

বললাম, বুনো শেয়াল ডেকেছে নাকি?

তা কেন হবে?

বললাম, বৃষ্টি?

দোহাই, আপনার কতদিন পরে এমন রোদেভরা সকালটা দেখলাম, এখন আর বৃষ্টি নামাবেন না।

গম্ভীব হয়ে বললাম, তাহলে হল না। অনেকগুলো কারণের ভেতর শেয়ালের ডাক অথবা বৃষ্টি না হলে প্রাচীন নিয়মে ছুটি পাবার ভরসা নেই।

আমাকে গম্ভীর হয়ে কথাগুলো বলতে দেখে ও কি ভাবল জানি না। আমার হাতে 'মহুয়া' খানা তুলে দিয়ে বলল, পড়ান।

হেসে বললাম, অনিচ্ছায় যা নেওয়া যায় তা কিন্তু মনে থাকে না।

ও বলল, আচ্ছা, মনটা যদি দেখা যেত তাহলে কেমন অবাক ব্যাপার হত।

একথা কেন সীমা?

ও নিজেকে আবার গুটিয়ে নিল। শামুকে যেমন করে একটু চলে, আবার কারু ছোঁয়া পেলে নিজেকে গুটিয়ে নেয়।

ও বলল, তাহলে ক্লাসে আমাদের পড়াশোনার বাইরের মনটাকে ধরে ফেলতেন।

আসল কথাটা ঘুরিয়ে নিয়েছে সীমা।

ওর কথার খেই ধরেই বললাম, ক্লাসে আমাদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে সিনেমা শোএর স্বপ্ন দেখা হয় বুঝি?

ও হেসে ফেলল, মোটেই না।

তবে কলেজ-ছুটির পর দুপুরে কুলের আচার খাবার স্বপ্ন?

তাও না।

তাছাড়া তোমরা আর কিই বা ভাবতে পার।

সীমা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, আমাদের মনের ভাবনা আপনারা কতটুকুই বা জানেন। যদি বলি আপনি পড়াতে পড়াতে যে ছবি আঁকেন, আমার ঠিক তাই হতে ইচ্ছে করে।

সীমার কথার উত্তর সহসা দিতে পারলাম না। মূক হয়ে বসে রইলাম। আমি পড়াতে গিয়ে বিষয়বস্তুর যে ছবিটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করি, সীমার তাই হতে ইচ্ছা করে। আমি জানি, সীমা কবি। কিন্তু ও ঠিক এমন একটা কথা বলবে তা ভাবিনি। গভীর একটা তৃপ্তিতে মনটা ভরে গেল।

বললাম, অনেক দূরে ফেলে এসেছি তোমার প্রথম প্রশ্ন। সে প্রশ্নেরই এখন জবাবটা দিই।

কোন একটি বিশেষ মনের ভেতর সিঁধ কেটে কেউ একবার যদি ঢুকতে পারত তাহলে সে অবাক হয়ে দেখত, সবচেয়ে সেরা রত্নের খোঁজ সে পেয়ে গেছে।

সীমা মুখ নামাল। মনে হল ও খুশি হয়েছে আমার উত্তরে। তবে ওর প্রশ্নের ইঙ্গিতটা যে আমি ধরতে পেরেছি তা বুঝতে পেরে ও খানিকটা সংকুচিত হয়ে পড়ল।

এবার বললাম, ভয় নেই, পড়াব না আজ ; তবে এসো মহুয়ার 'নাম্নী' কবিতা পড়ে শোনাই। এবার আশা করি আপত্তি হবে না।

সীমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ওর কালো চোখের পাতায় ঘনিয়ে উঠল উন্মুখ ছায়া। ঘরের একটি মাত্র জানালা খুলে দিয়ে যেমন সলজ্জ বধূ বাইরের জগতকে ঘরের ভেতরে ডাক দেয়, ঠিক তেমনি করে ও তাকিয়ে রইল।

'সে যেন গো কাকচক্ষু দিঘিজল
অচঞ্চল,
কানায় কানায় ভরা,
শীতল অতল-মাঝে প্রসন্ন কিরণ দেয় ধরা।
কালো চক্ষু পল্লবের কাছে
থমকিয়া আছে
স্তব্ধ ছায়া পাতি
হাসির খেলার সাথী
সুগম্ভীর স্নিগ্ধ অশ্রুবারি ;
যেন তাহা দেবতারি
করুণা অঞ্জলি
নাম কি ....?'

সীমার দিকে হেসে তাকালাম। ওর তন্ময়তা ভেঙে গেল।

বলল, 'কাজলী'।

বললাম, কি রূপ এই মেয়েটির! নিটোল কাকচক্ষুঃদিঘি। সেই দিঘির বুকে ছোঁয়া দিয়ে যায় সোনার আলো। তার ঐ কালো চোখের পাতায় হাসি আর কান্নার লীলা। আষাঢ়ে কাজল কালো মেঘে যেমন সব কিছু উজাড় করে দেবার একটা ইচ্ছা জাগে, ঠিক তেমনি ও নিজেকে সঁপে দেবার জন্য তৈরী হয়ে আছে, কিন্তু কার কাছে,

'যে পথিক একদিন আসিবে দুয়ারে
ক্লিষ্ট ক্লান্তি ভরে
সেই অজানার লাগি গৃহকোণে, আনত নয়ন
বুনিছে শয়ন।'

একটু থেমে বললাম, সত্যি সীমা, কি চমৎকার ছবি আঁকা যায় এই কাজলী মেয়েটির।

সীমা বলল, অসম্ভব, দিঘির মত ভরা যে মন, তাকে আঁকা যায় কেমন করে।

বললাম, তার ছায়া এসে পড়বে চোখে। শিল্পী মনভরে সেই টলটলে চোখের ছবি আঁকবে।

কই, এঁকে দেখান!

তাহলেই হয়েছে আর কি, আমি আঁকব ছবি!

সীমা অন্যদিকে মুখটা ফিরিয়ে বলল, যদি আপনার স্কেচের খাতা না দেখতাম।

তাই বুঝি, এরই ভেতর দেখা হয়ে গেছে?

ওটা কিন্তু এখন আমার সম্পত্তি।

ডাওহিলে নিয়ে গেছ আমায় না বলে। জান, না বলে নিলে কি হয়?

বলল, যিনি নিজের গুণ গোপন করে রাখেন, তাঁর জিনিস না বলে নিলে আর যা হোক চুরি করা হয় না।

বললাম, ও খেয়াল এককালে খুব বেশি ছিল, আজকাল আর নেই। তবে কার্শিয়াং-এ একেবারে একলাটি পড়ে গিয়ে পুরানো অভ্যাসটা ঝালিয়ে নিচ্ছিলাম।

সীমা বলল, আজ দিদিকে গিয়ে বলব, আপনি গানও গাইতে জানেন।

না বলে নিলে চুরি করা হয় না, তাই বলে মিথ্যে বললেও কি পাপ হয় না?

সীমা বলল, এতবড় একটা গুণ যিনি গোপন করতে পারেন, তিনি সব গুণই ঢেকে রাখতে পারেন।

বললাম, মিথ্যে বলে লাভ নেই, গান গাইতে জানি কিনা তার বিচার অন্যের হাতে, তবে আমি গেয়েছি, আর ঘরে বসে নয় খোদ সভায়।

সীমা এবার উল্লসিত হয়ে উঠল, দেখুন, কেমন ধরেছি আমি, গুণী দেখলেই কিন্তু আমি চিনতে পারি।

বিলক্ষণ, তোমার ক্ষমতার তারিফ না করে পারছি না, তবে গুণীর গান গাওয়ার ইতিহাসটুকু শোন।

সীমা খুব উৎসুক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

বলতে লাগলাম, স্কুলে পড়ি তখন। বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব হবে। এবার সভাপতি হয়ে আসছেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং। উৎসব সরগরম। দু'মাস আগে থেকে রিহার্সেল চলছে। পড়াশোনা উঠেছে পাটে। হেডমাস্টার মশাই গট মট করে মাঝেমাঝে এসে ঢুকছেন রিহার্সেল রুমে। বলছেন, মান রাখতে হবে। ভেবে দেখ, তখন ইংরেজ শাসন। সাধারণ একটা গ্রামের স্কুলে রাজার প্রতিনিধি আসছেন; নিমন্ত্রিত হয়ে আসছেন দশ-বিশখানা গাঁয়ের লোক। মনে মনে বড় মুষড়ে পড়লাম। একটা প্রাইজ না পেলে মান থাকে না। পড়াশোনায় ছিলাম দিগ্‌গজ, সুতরাং সেদিক থেকে কোন আশাই নেই। শেষে অনেক কৌশলে উদ্বোধনসংগীতটি গাইবার অনুমতি পেলাম। গানটি সংস্কৃত ভাষায় গাওয়া হবে। কথা ছিল, এই গান যে গাইবে তার জন্য থাকবে একটা নির্দিষ্ট পুরস্কার। আর আমায় পায় কে। রাতে ঘুম ভেঙে গেলে ছবি দেখি, আমি চলেছি পুরস্কার আনতে। কত লোক তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তারপর স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে হ্যান্ডসেক। কিন্তু পুরস্কারের ভাবনা যত জোর এগুতে লাগল গান ঠিক তত জোরে এগুল না। শেষে অনুষ্ঠানের দিন এসে গেল। আসরে জনসমাগম দেখে বুকের ভেতর কেমন গুরগুর করতে লাগল। কি দরকার ছিল বাপু সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করার। কিন্তু তখন পেছু হটা যায় না।

ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুরের সামনে বসে গাইতে লাগলাম। চোখের সামনে নাচতে লাগল হল্‌দে রঙের গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল। নিজের গলায় কি বাজছে নিজেই শুনতে পেলাম না। হাতের কাছে একটা হারমোনিয়াম ছিল, সেটা মাঝে মাঝে টানছি, কি একটা পোঁ পোঁ আওয়াজ উঠছে তার থেকে। গান কখন শেষ হল জানি না, তবে উইংসের পাশ থেকে সেকেন্ড সারের চাপা একটা ধমক খেয়ে প্রায় ছিটকে উঠে গেলাম। তারপরের ইতিহাস খুবই করুণ। সবাই পুরস্কার পাচ্ছে, চলে যাচ্ছে, আমি চেয়ে আছি। কখন আমার ডাক আসে, কিন্তু হায়, যে টেবিলে পুরস্কারগুলি সাজান ছিল এক সময় তা খালি হয়ে গেল, আমি শুধু শূন্য টেবিলের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম।

পরে জেনেছিলাম, মাস্টার মশায়েরা অনুগ্রহ করে প্রাইজ লিস্টে আমার নামটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর নির্মম ভাবে তাকে নাকি ছেঁটে দিয়েছেন। সেই আমার প্রথম ও শেষ সঙ্গীত।

সীমা বলল, এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

পারা না পারা তোমার মর্জি।

সীমা ছাড়ার পাত্রী নয়, বলল, আজ সন্ধ্যেয় আমাদের ওখানে পরীক্ষা দিতে হবে।

বললাম, সে পরীক্ষা তো স্কুলেই দিয়েছি। তুমি তো জান স্কুলের গণ্ডী না পেরুলে অন্য কোথাও পরীক্ষা দেওয়া যায় না।

বেশ, আপনাকে একা গাইতে হবে না, না হয় কোরাসই গাইবেন।

বললাম, তাহলে সুরাসুরের যুদ্ধ বেধে যাবে, তার চেয়ে আমার একটা নতুন প্রস্তাব শুনবে?

বলুন।

বরং এসো কাব্য যুদ্ধ করা যাক্।

আপনার সঙ্গে আমি পেরে উঠব কেন।

সীমার গলায় শঙ্কা।

বললাম, এ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে আশা করি তুমি পেছপা হবে না, তোমার লেখার অভ্যেস না থাকলে কথাটা মোটেই তুলতাম না।

সীমা বলল, আপনি আগে লিখবেন।

না, তুমি।

সে হবে না, শুরু আপনার কাছ থেকেই হবে।

বললাম, বেশ, আমার হবে শুরু, তোমার হবে সারা।

কিছুক্ষণ ধরে আমাদের ভারী মজার কাব্যযুদ্ধ চলল।

দুপুরের দিকে ডাওহিলে যাই। আজকাল প্রায় প্রতিদিন ওখানে যেতে হয়। কোনদিন ফিরি একেবারে অর্ণববাবুদের ওখানে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে ; আবার কোন কোনদিন ওঁরাই আমার এখানে এসে কাটিয়ে যান। সীমার যাতায়াতের কোন সময় নেই। খুশিমত সে ডাওহিল থেকে সেন্ট মেরী হিলে যাতায়াত করে। সীমার দিদি ওর নামকরণ করেছেন, হরকরা।

অর্ণববাবু কথাটার সঙ্গে মিল রেখে আর একটা মিষ্টি নাম রেখেছেন, শর্করা।

সেদিন দুপুরে ডাওহিলে গিয়ে দেখি, বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে অর্ণববাবু গা এলিয়ে চুপচাপ পড়ে আছেন। চোখ দুটি বন্ধ, কিন্তু পদদ্বয় নৃত্য করছে। বুঝলাম, দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামসুখ উপভোগ হচ্ছে। এদিকে দেখি সীমা অর্ণববাবুর অবশিষ্ট কয়েক গুচ্ছ কেশের মধ্যে নিপুণ শিকারীর মত কিসের যেন সন্ধান করে ফিরছে।

ইঙ্গিতে বললাম, কি হচ্ছে?

সীমা বিশেষ মুখভঙ্গী করে চাপাগলায় বলল, পাকাচুলের বংশনাশ।

বললাম, ওটা রাবণবংশ।

কথাটা যতদূর সম্ভব আস্তেই বলেছিলাম, কিন্তু মালিক প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, আজ্ঞে মশায়, রাবণের বংশের চেয়ে বাড়বাড়ন্ত বংশের ছেলেরা এখানে বসবাস করছে। এরা খোদ রক্তবীজের ঝাড়।

বললাম, আর ভাবনা কি, স্বয়ং মহামায়াকে অসুরবধের কাজে লাগিয়েছেন, এরপর নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

অর্ণববাবু উঠে বসে একবার চারদিকে তাকালেন।

সীমা বলল, আপনি নিশ্চিন্তে বলুন, দিদি কম্বল মুড়ি।

অর্ণববাবু এবার আমার দিকে ফিরে বললেন, ভদ্রমহিলা, মানে আপনাদের দিদি নামেও অসীমা আর ধৈর্যও তাঁর অসীম।

সবে চাকুরিতে পদোন্নতি হয়েছে, অমনি মাথায় একটা বিশেষ জায়গা থেকে চুলগুলো হাওয়া হয়ে যেতে লাগল। সেই যে গেল আর মশাই ফিরে এল না। টাকা রোজগারের আনন্দে আমি তখন মত্ত, টাকের কথা ভাববার সময়কই। কিন্তু ভুলতে চাইলেও উনি ভুলতে দেবেন কেন।

রোজ একবার করে উঠতে বসতে হাহাকার করে আমাকে মনে করিয়ে দিতে লাগলেন, জগতে সুপুরুষের লিস্ট থেকে আমার নামটা নাকি খারিজ হয়ে গেছে।

তাতেও যখন আমি বিশেষ কোন সাড়া দিলাম না, তখন নিজেই মেরামতির ভার নিলেন।

সকালে স্নানের হুকুম হল। স্নান শেষে ঘন্টাখানেক ধরে চলল মালিশ : হস্তিদন্তমিশ্রিত কুঁচ তৈল। কোন এক কোম্পানিকে কিছুদিন অর্থদণ্ড দেবার পর সে হয়ে গেল জোচ্চোর। পূর্ণ উদ্যমে আবার নতুন কোম্পানির অব্যর্থ টাকনাশিনী তৈলের আমদানী হতে লাগল। খবরের কাগজ এলেই আগে উল্টে পাল্টে বিজ্ঞাপনগুলো দেখে নেন। কোন মহৌষধির সন্ধান পেলেই তার পরীক্ষা চলতে থাকে অধমের মগজের ওপর। কি আর করি। নীরবে সব শিরোধার্য করে চললাম।

কোন অঞ্চলের কোন কবিরাজ কবে টাকের চিকিৎসা করে ওঁর মেজ মাসিমার পিসশাশুড়ীকে ভাল করেছিলেন তার হদিস ওঁর কাছে ক্রমাগত আসতে লাগল। অমনি উনি আমাকে টেনে নিয়ে চললেন সেই ধন্বন্তরীর কাছে।

কবিরাজমশায়কে বললাম, মশাই, ঠিক ঠিক বলুন তো টাক কি ভাল হয়।

হেসে বললেন, হাতের চেটোয় চুল গজাবে মশাই, মাথা তো কোন ছার।

মনে মনে বললাম, তা বটে।

কবিরাজমশায় বলে চললেন, কেবল মাস পাঁচেক ব্যবহার করে দেখুন তেলটি, তারপর এসে ফি দেবেন। তার আগে ফি আমি ছোঁবই না। শুধু নগদে দেবেন তেলের দামটা।

সেখানে বেশ কিছু খেসারত দিলাম। তবুও আপনাদের দিদির অসীম ধৈর্যে চিড় খেল না। শেষে তিনি আবিষ্কার করলেন এক টাক বিশারদকে। তিনি টাকের ব্যাপারে সার দুনিয়া ঘুরে এসেছেন। কি বলব মশাই, কত রকম যান্ত্রিক চিকিৎসা চলল। তার ওপর তৈলমর্দন।

শেষে তিনিও হার মানলেন। আমার সঙ্গে সঙ্গে টাকেরও শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল।

তারপর চলল একদফা হোমিওপ্যাথি। পরিশেষে শাস্ত্রে ফেল হল দেখে টোটকার আশ্রয়।

কত রকমের চূর্ণ বিচূর্ণ নিয়ে দিনরাত মাজাঘষা চলল টাকের ওপর। ঘষামাজা খেতে খেতে দিনে দিনে শশিকলার মত বাড়তে বাডতে শেষে দেখুন কি আকার নিয়েছে।

দিদি কত দিনে হাল ছাড়লেন?

সীমা বলল, যেদিন জামাইবাবুর মাথায় পূর্ণচন্দ্রের উদয় হল।

বললাম, এখনও তীরের রেখা আছে।

অর্ণববাবু বললেন, ভাই, আপনাদের দিদির দৌলতে তাও বুঝি আর থাকল না। এখন কগাছা পাকা চুল তোলার হিড়িক পড়েছে। নিজে নিদ্রা যাচ্ছেন, কিন্তু কাজ থেমে নেই। সহোদরাকে নিযুক্ত করে গেছেন। আর উনিও 'যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি', এই ব্রত পালন করে চলেছেন।

বললাম, এর থেকে উদ্ধারের কি কোন উপায় নেই?

বহু চিন্তা করে ভাই কূল পাইনি, তাই আপাততঃ আত্মসমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

ভেতরে অসীমাদেবীর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। দুপুরে যে আলোচনা চক্র বসে তাতে তিনি অন্যতম সদস্যা। আমার আসার আগে তিনি কিছু সময়ের জন্য দিবানিদ্রা উপভোগ করেন। তারপর এসে বসেন চতুর্মুখচক্রে। আমরা সর্বসাকুল্যে চারজন সদস্য মুখ খুলি, তাই এ নামকরণ। নিয়মিত হাজির হলেও মাঝে মাঝে অসীমাদেবীকে ভেতরে উঠে যেতে হয়, কারণ বৈকালিক জলযোগের ভার তাঁরই ওপর। এ ব্যাপারে উনি একেবারে সিদ্ধহস্ত। প্রতিদিন জলযোগে একটা নতুন আইটেম যোগ করাতেই ওঁর বাহাদুরী।

অসীমাদেবী আসরে ঢুকতেই অর্ণববাবু তাঁকে স্বাগত সম্ভাবণ জানালেন, এই যে মধ্যমণির আসতে আজ্ঞা হোক, দিবানিদ্রার ব্যাঘাত ঘটেনি তো?

অসীমাদেবী স্বামীর প্রতি কটাক্ষপাত করলেন।

অর্ণববাবু অমনি বললেন, 'তোমারি কটাক্ষঘাতে,
ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল।'

অসীমাদেবী বললেন, যন্ত্রপাতি ছেড়ে কাব্যচর্চা করলেই ত পারতে।

অর্ণববাবু বললেন, তাহলে তোমার বাবার সুনজরে পড়ার কোন সুযোগই আমার ঘটত না। তার ফলে অসীমানন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হত। শুধু কি তাই, এমন লোভনীয় একটা যৌতুকই হাতছাড়া হয়ে যেত।

সীমা বলল, হচ্ছিল দিদিকে নিয়ে, তার ভেতর আবার আমাকে টানাটানি কেন?

অর্ণববাবু আমার দিকে ফিরে বললেন, কিছু মনে করবেন না ভাই, ছাত্রীটিকে সাহিত্যের পাঠ ঠিকমত দিতে পারেননি।

তারপর সীমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সীমার মাঝেই তো অসীমের প্রকাশ। সুতরাং দিদির কথার মাঝে তুমি এসে পড়বে এতে আর আশ্চর্য কি। আর এমনি দু'বোনের মিলনেই তো অসীমানন্দ।

'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।'

অসীমাদেবী বললেন, চতুর্মুখচক্রে আরও তিনটি প্রাণী রয়েছেন। তাঁদেরও কিছু বলবার অধিকার আছে। তুমি একা সময় হরণ করলে তো চলবে না।

অর্ণববাবু বললেন, আজ তাঁদের ত্র্যহস্পর্শ যোগ ঘটেছে, অতএব বাক্য নাস্তি।

সীমা বলল, চতুর্মুখে বলুন পিতামহ, আমারা অবহিত হয়ে শুনি।

অর্ণববাবু অমনি বললেন, তোমারটি এলে তখন আসরের নাম পালটে পঞ্চাননের আসরই রাখব, আর তখন পঞ্চমুখে তোমার পঞ্চাননকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হবে।

সীমা একটি সময়োচিত মুখভঙ্গী করল।

বললাম, দিদি, আজ অর্ণববাবুকে কোনদিক থেকেই বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে পারলেন না। উনি চতুর্মুখ ব্রহ্মার বরে আজ অজেয়।

বাহাদুর এসে খবর দিল, বাইরে এক বাবু আর মেমসাব অপেক্ষা করছেন। অর্ণববাবু বেরিয়ে গেলেন। সাধারণতঃ কোন অবাঞ্ছিতকে তিনি আমাদের আসরে এনে ফেলতে চান না।

অর্ণববাবু বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সীমা মন্তব্য করল, কি দুর্ভোগ, এমন জমাট আসরটাও ভেঙে গেল।

বাইরে থেকে অর্ণববাবু উচ্চকণ্ঠে কার যেন আগমন ঘোষণা করলেন। নামটা আমার অশ্রুত হলেও ওঁদের কাছে বিশেষ পরিচিত বলেই মনে হল। অসীমাদেবী তাড়াতাড়ি বাইরে উঠে গেলেন। তারপর একটি কান্তিমান যুবক আর এক তরুণীকে সঙ্গে নিয়েই ঘরে ঢুকলেন।

এটি আমাদের অঞ্জুঠাকুরপো, শ্রীমান অঞ্জন মুখার্জী। সম্প্রতি বিলেতে যাচ্ছেন। ওঁর বন্ধুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আর উনি ননদিনী অঞ্জুভগিণী সুদীপ্তা।

পরিচয় দিতে গিয়ে কৌতুকে উদ্ভাসিত হলেন অসীমাদেবী।

উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম।

অসীমাদেবী আমার পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন, আমাদের পরিবারের বিশিষ্ট বন্ধু অধ্যাপক সুমন্ত সেন।

সীমা অমনি বলল, উনি যে আমারই অধ্যাপক সে পরিচয়টা বুঝি কিছু না।

এতক্ষণে সীমার দিকে তাকালাম। সীমা নবাগতার কটি বেষ্টন করে দাঁড়িয়েছিল, আমাকে তাকাতে দেখে সলজ্জভাবে হাত ছেড়ে সরে দাঁড়াল।

হেসে বললাম, বেশ দেখাচ্ছিল, রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূতের দীপ্তি, স্রোতস্বিনীর মতো।

সীমা বলল, দীপা কিন্তু মেডিকেল কলেজ, আপনার এলাকার বাইরে।

অর্ণববাবু বাহাদুরকে নিয়ে এতক্ষণ বেডিংপত্র গোছগাছের কাজে ব্যস্ত ছিলেন ; সীমার শেষ কথাটা কানে পৌঁছতেই বললেন, কাকে কার এলাকার বাইরে ফেলা হচ্ছে গো। বাইরে ফেলতে চাইলেই কি ফেলা যায়? আজকাল কড়া আইন'

সীমা বলল, জামাইবাবু দেখছি কানের মাথাটিও খেয়েছেন।

বাইরে থেকে এবারও অর্ণববাবু ভেতরের কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পেলেন না। তিনি বললেন, আমার মাথা খাবার জন্যে তোমার দিদিই যথেষ্ট, আমি আর খাব কি।

ড্রইংরুমের ভেতর আমরা সকলে অর্ণববাবুর কথায় হেসে উঠলাম। অসীমাদেবী চলে গেলেন অন্দরে। নবাগতদের জন্য তাঁকে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হল। ওঁরা কলকাতা থেকে একেবারে কারে করেই এসেছেন, সুতরাং বিশেষ ক্লান্ত হয়ে আছেন। এখন বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন। সীমা তার পড়ার ঘরে নিয়ে গেল সুদীপ্তাকে। অর্ণববাবু ভেতরে এলেন ; এসেই অভিযোগ তুললেন, সেই এলে, অথচ আমরা এত করে ডাকলাম তখন এলে না। আর আসার আগে তো একটা পোস্ট কার্ড দিয়েও অন্ততঃ জানাতে হয়।

অঞ্জনবাবু বললেন, সারপ্রাইজ ভিজিট, দীপা বলল, সবাইকে অবাক করে দেবো, আগে ভাগে কিছু জানিও না।

এবার ঘরোয়া জিজ্ঞাসাবাদ চলল কতক্ষণ। ভাবলাম, এখন বাসায় চলে যাওয়াই উচিত। এঁরা শ্রান্ত হয়ে এসেছেন, বিশ্রাম করবেন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, পরিবারিক কথাবার্তা চলবে। এক্ষেত্রে আমার বসে থাকা ঠিক নয়। অসীমাদেবীও ভেতরে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

অর্ণববাবুকে এক ফাঁকে বললাম, যদি অনুমতি করেন তাহলে আজকের মতো শিবিরে ফিরে যাই।

সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জনবাবুর দিকে ফিরে বললাম, সেন্ট মেরী হিলে আমার আস্তানা, যদি কাল ভোরবেলা ওখানে চায়ের আসরে আসেন তাহলে খুব খুশি হব।

অর্ণববাবু বললেন, বুড়ো বলে কি আমি বাদ পড়লাম নাকি অধ্যাপক!

বললাম, গৃহকর্তা আপনি। ওঁরা এখন অন্দরমহলে ব্যস্ত রয়েছেন, সুতরাং সবার হয়ে আপনার কাছেই আমার নেমন্তন্ন জানিয়ে যেতে চাই।

কাল দুপুরের আসর কিন্তু আমার এখানে, অর্ণববাবু বললেন।

বললাম, তার আগে সকালের চায়ে আসুন। দুপুরের আসরের ডাকটা ওখানেই নেব।

অঞ্জনবাবুর সঙ্গে নমস্কার বিনিময় হল। মৃদু হেসে বেরিয়ে এলাম।

আজ আবার মেঘের মিছিল ; নীচের সমতল থেকে ওপরে উঠে আসছে। রাতে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। ফেরার পথে কি মনে এলো, সেদিনের সেই অজানা পথটাতেই পা বাড়ালাম। চায়ের দোকানটার কাছে এসেই পেলাম ল্যাম্প পোস্টটা। বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে সীমা এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। ল্যাম্প পোস্টটার নীচে অকারণে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। আচ্ছা, আমি যখন সীমাকে এখানে রেখে চায়ের দোকানে গিয়েছিলাম, সীমা সেটুকু সময় কি ভেবেছিল এখানে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে সে কি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছিল ; না, তখুনি সে তার ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল।

সত্যি, আমরা যত কথা গুছিয়ে ভাবি তার চেয়ে এলোমেলো কথা ভাবি অনেক বেশি।

ল্যাম্প পোস্টটা ছাড়িয়ে পাইনের ঘন বনের ভেতর ঢুকলাম। এই মেঘলা দুপুরে নিবিড় গাছের আবছা আঁধারে মনে হচ্ছিল, এ পথে না এলেই ভাল হত। কিন্তু পরক্ষণেই আর একটা চিন্তা মনে এল।

সেদিন কি করে রাতের ঘন আঁধারে এ পথটুকু পার হয়েছিলাম। মনের ভেতর যখন উত্তেজনা থাকে তখন ভয়-ভাবনাগুলো কোথায় যেন চলে যায়।

বনটা পার হয়ে এলাম। দু'একটা পাথরের চাঁই পেরিয়ে সেদিনের সেই সরু পথটায় এসে নামলাম।

একি হল আমার! শিউরে উঠলো সমস্ত শরীরটা। মনে হল যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি সীমার সেই ক'টি কথা, 'দুটি পায়ে পড়ি আপনার, আমাকে দিদির কাছে পৌঁছে দিন।'

সে ব্যথা যত বেশি করে ঢেকে রাখা যায়, তাতে তত বেশি আঘাত বারে বারে এসে লাগে। আমি তো সীমার সেদিনের কথা ভুলেই ছিলাম। কত বিচিত্র কথার আড়ালে সেদিনের সেই একছত্র কথাকে ঢেকে রেখেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ আঘাতটা ঠিক তাকে খোঁচা দিয়ে তুলল। মনের কি অদ্ভুত সঞ্চয়! যতদিনের যত পুরোনো, যত ছেঁড়াই হোক্ তাকে সে কিছুতেই ফেলে দেবে না।

নীচের পথ ধরে চলতে শুরু করলাম।

কিছুটা এসেই দেখলাম, ওপরের বন থেকে একটি পাহাড়ী তরুণী পিঠে ঘাসের বিরাট এক বোঝা নিয়ে নেমে আসছে।

মুখোমুখি হতেই বলল, বাবুজী, আমার বোঝাটা একটু নামিয়ে দেবে?

বোঝাটা নামিয়ে দিলাম। ও একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসে হাঁপাতে লাগল।

আমি দু'চার পা এগুতেই ও বলল, তুমি চললে বাবুজী, তাহলে আমার বোঝাটা তুলে দিয়ে যাও।

সত্যি এ কথাটা ভেবে দেখিনি। যে বোঝাটা ও আমার সাহায্যে নামাল, তাকে তুলে না দিলে সে একাই বা কি করে তুলবে!

কাছে গিয়ে বললাম, তুমি কিছুক্ষণ জিরিয়ে নাও, পরে তোমার বোঝা তুলে দেব।

পাহাড়ের গায়ে ফুল দেখতে লাগলাম। সাদা, পিঙ্ক, লাল রঙের তারাফুল সারা পাহাড়টাকে ছেয়ে আছে। পাহাড়ী মেয়েটি কথা বলল, বাবুজী তোমাকে সেন্ট মেরী হিলে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে ; তুমি ওখানেই থাক?

বললাম, হাঁ, তুমি থাক কোথায়?

বলল, আরও নীচে, ঐ যে ঝর্ণাটা পেরিয়ে যেতে হয়, ওর নীচে ঠিক রেল লাইনের ধার ঘেঁষে আমার কোঠী।

বেশ কিছু সময় থেকে মনে মনে একটা কৌতূহল জাগছিল। কিন্তু অপরিচিতা একটি মেয়ের সঙ্গে উপযাচক হয়ে কোন কথা বলতে যাওয়ার একটা মানসিক বাধা আছে। তাই চুপ করে ছিলাম। মেয়েটি কথা বলল দেখে আমিও সে কথাটি তুললাম, আচ্ছা তুমি এমন চমৎকার বাংলা শিখলে কোথায়?

ও হাসল। বলল, বাঙালী বাবুদের কোঠীতে আমি বহুৎদিন কাম করছি।

মাথায় হঠাৎ একটা মতলব এল। কালকে অর্ণববাবুরা সকালের চায়ে আসছেন। ওঁদের যদি একেবারে রান্না করে খাইয়ে দিই। কতদিন তো ওঁদের ওখানে খেয়েছি।

শুধু লোকের অভাবে ইচ্ছে থাকলেও কিছু করে উঠতে পারিনি। তেনাং ছেলেটা যা রাঁধে তার নাম হয়ত রান্না কিন্তু তা খেতে গেলেই কান্না পাবার কথা।

বললাম, তুমি মাছ মাংস রান্না করতে পার?

মেয়েটি হেসে বলল, কেন বাবুজী, তুমি কি আমাকে নোকরী দেবে?

বললাম, কাজ জানলে কি কাজের অভাব হয়?

ও বলল, মুরগী খান তো? একরোজ রোস্ট বানিয়ে দেব।

খুব উৎসাহিত হয়ে বললাম, তুমি কাল সকালে আমার কোঠীতে আসতে পারবে?

বলল, কোন্ কোঠী?

সেন্ট মেরী হিলে মুখার্জী বাবুদের কোঠী।

তারপর কোন পথে আমার আস্তানায় যাওয়া যেতে পারে তার হদিশ দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বড় বেশি বলতে হল না। মেয়েটি হেসে বলল, মুখার্জীবাবু আমার হাতের রান্না খেয়েছেন।

বললাম, তাহলে তো তুমি আমাদের বাসার পুরোনো লোক। কাল খুব ভোরবেলা এসো কিন্তু।

ও বলল, আমার কোঠীতে মুরগী আছে, বলেন তো নিয়ে যাব।

বললাম, সে তো খুব ভাল হয়। তাহলে তেনাংকে আর স্টেশনের বাজারে পাঠাতে হবে না।

বোঝাটা তুলে দিলাম ওর পিঠে। প্রায় আমার বাসা পর্যন্ত ও এল। তারপর নেমে গেল ডানদিকের পথটা ধরে নীচে। বলে গেল, সে নিশ্চয়ই আসবে।

মেয়েটি চলে গেল আর আমি ফিরে এলাম বাসায়।

চেহারায়, কথাবার্তায় এমন পরিচ্ছন্ন যে, মেয়েটিকে সাধারণ পাহাড়ী ঘরের বলে একেবারেই মনে হয় না।

আজ সন্ধ্যে হবার আগেই সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এল। মেঘে মেঘে সমস্ত কার্শিয়াং একাকার। দূরের সমতল আর কাছের পাহাড় সব এক। মনে হচ্ছে মেঘলোকে বাস করছি।

কিছুক্ষণের ভেতরেই সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম।

মনে হল মেঘের সমুদ্রে একখানা নিঃসঙ্গ বজরায় ভেসে চলেছি। তেনাং হাল চালাচ্ছে অপটু হাতে, আর আমি নির্বিকার বসে বসে তাই দেখছি।

রাত যত বাড়তে লাগল, ঝড়ের আওয়াজ ততই বেড়ে চলল। মেঘগুলো যেন তাড়া খেয়ে দৌড়ে কোথায় পালাচ্ছে, এ ওর গায়ে এসে লুটিয়ে পড়ছে, আবার উঠে ছুটে পালাচ্ছে, আশ্রয় নিচ্ছে বনের ভেতর। সেখানে তাড়া খেয়ে আরও উঁচু পাহাড়ের দিকে ছুটে চলেছে।

বেশ ভাল লাগছে এই মেঘ, বন আর ঝড়ের খেলা। অলস মনে বসে বসে কত কথা ভাবছি। ভাবছি ঐ মেঘগুলো যেন দেবকন্যা। ঝড়ের অসুর ওদের তাড়া করে ফিরছে। ওরা বনের ভেতর, পাহাড়ের কোলে লুকোবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঐ অসুরটা তোলপাড় করে খুঁজছে ওদের।

বৃষ্টি সুরু হল? ঝর ঝর করে ঝরে পড়তে লাগলো মেঘগুলো।

আর এক ভাবনা এল মনে, আচ্ছা ডাওহিলে ওরা এখন কি করছে। চারদিক বন্ধ করে ড্রয়িংরুমে আলো জ্বেলে নিশ্চয়ই গানের আসর বসিয়েছে এখন।

কত গান গাওয়া হচ্ছে। এ আসরে রবীন্দ্রনাথই স্মরণীয় অতিথি। রবীন্দ্র সংগীত ছাড়া বর্ষার আসর বসতে পারে একথা যেন ভাবাই যায় না।

আচ্ছা নতুন মেয়েটি কি রবীন্দ্র-সংগীত জানে? আজ আসরে থাকলে ওর গান শোনা যেত। কেমন গায় কি জানি।

কি কি গান গাওয়া হতে পারে। সীমার সেই প্রিয় গানটি,

'অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে'।

কি অদ্ভুত সমাহিত হয়ে গানটি গায় সীমা। মুখের এতটুকু বিকৃতি নেই। কত স্বাভাবিক ভাব বজায় রেখে গান গাওয়া যায় তা সীমাকে না দেখলে যেন বোঝা যায় না।

মনে আসছে একটি গান। কেউ যেন কবে গেয়েছিল, সে সুরটা ভেসে আসছে। তারই টানে আমার গলায়ও অস্পষ্ট একটা সুর গুনগুনিয়ে উঠছে,

'মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে
আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে ;
কাজের দিনে নানা কাজে থাকি নানা লোকের মাঝে,
আজ আমি যে বসে আছি তোমারি আশ্বাসে।'

এই বাদলের দিনগুলো সবার মাঝে বিলিয়ে দেয়া যায় না। এ তো কাজের দিন নয়, এ যে দু'জন মুখোমুখি বসে অশ্রুমুকুল দিয়ে মালা গাঁথার দিন। আজ তাই তো কাজের দেবতার কাছ থেকে ছুটি নেওয়া হয়েছে। রোজ আমার এ ঘরে সবাই আসে। আজ শুধু তুমি আসবে। তোমার আসার আশায় বসে আছি দুয়ার খুলে। কিন্তু,

'তুমি যদি না দেখা দাও করো আমায় হেলা
কেমন করে কাটে আমার এমন বাদল বেলা।
দূরের পানে মেলে আঁখি কেবল আমি চেয়ে থাকি
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে।'

সমস্ত প্রকৃতির মাঝে যে কান্না, সে যেন গানটি গাইবার সঙ্গে সঙ্গে মনে এসে বাসা বাঁধে। আচ্ছা, সীমা কি এখন সেই গানটি গাইছে,

'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।'

এখানেও প্রতীক্ষা। এখানেও দুয়ার খুলে প্রিয়তমের জন্য পথের দিকে চেয়ে থাকা।

'আকাশ কাঁদে হতাশ সম
নাই যে ঘুম নয়নে মম
দুয়ার খুলি' হে প্রিয়তম
চাই যে বারে বার।'

অনেক রাত অবধি আমার নিঃসঙ্গ ঘরে এমনি আসর চলল। মনে মনে মগ্ন হতে পারলে অনেক কিছু দেখা আর শোনা যায়।

ঘুম ভাঙল ভোরে। আকাশে কাল রাতের এতবড় ঝড়ের চিহ্নমাত্র নেই। উজ্জ্বল নীল ভোরের আলোয় চারদিক ভরে গেছে। শার্সি খুলে বিছানায় উঠে বসলাম। চোখ গিয়ে পড়ল ঘরের সামনের পথটার ওপর। পাহাড়ে কোলে যে অজস্র বুনো গোলাপ ফুটে থাকে, সেগুলো ঝড়ের ঝাপটায় উড়ে এসে পড়েছে পথটার ওপর। সারা পথটা ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। কি সুন্দর দেখাচ্ছে! গায়ে আলোয়ানটা জড়িয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লাম।

এত ভোরে সীমাকে দেখব এত আশাটা করিনি। সত্যি খুব অবাক হয়ে গেলাম। ও লনের সামনের গাছটা একহাতে জড়িয়ে ধরে দূরের দিকে চেয়েছিল। দোর খোলার শব্দে ফিরে তাকাল।

এত সকালে!

কাছে এল সীমা।

কাল আমায় না বলে কেন চলে এলেন?

সীমা আজ তার চোখের সম্পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল আমার দিকে।

কি উত্তর দেব এর। তবুও বললাম, নতুন অতিথিদের বিশ্রামের সুযোগ করে দেবার জন্যই চলে এলাম।

সে ভার আমার ওপর ছিল। তা বলে আপনি চলে আসবেন কেন?

সীমার কথায় দৃঢ় অনুযোগ।

হেসে বললাম, কাল এমনি করে চলে না এলে আজ ঠিক এ সময়টিতে তোমাকে পেতাম না।

সীমা কিন্তু একটুও হাসল না। বলল, বেশ, আজ সকালের আসরে আমি রইব গরহাজির।

বললাম, সে ভয় আর আমার নেই। সবার আগেই তুমি এসেছ, আর এসেছ একেবারে কুসুমাস্তীর্ণ পথের ওপর দিয়ে।

এবার সীমা হেসে ফেলল। বলল, ফুল ছড়ান পথে হয়ত এসেছি, কিন্তু কাঁটার আঘাত যাবার পথে অপেক্ষা করছে।

বললাম, সে কি!

সীমা বলল, ওপরের রাস্তায় বাহাদুরকে রেখে এসেছি। ভোরবেলা ওঁরা উঠতে পারেন না, তাই বাহাদুরকে নিয়ে কাছেপিঠে বেড়াবার নামে পালিয়ে এসেছি।

বললাম, সে কি, মাস্টারের কাছ থেকে পড়ুয়ারা পালায় জানি, আর তুমি উল্টে ঘর পালিয়ে এসেছ মাস্টার মশায়ের কাছে।

ও বলল, পড়া যেখানে খেলা, সেখানে ঘর পালাতে হয় না। তা ছাড়া ঘর ছাড়াবার মন্ত্র জানেন আপনি।

বললাম, সে কি রকম?

সীমা বলল, আপনি পাইড পাইপার অব হ্যামলিন। বাঁশি বাজিয়ে সবাইকে ঘরছাড়া করতে পারেন।

সীমার কথা শুনে হাসব না আর কিছু ভাবব ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না।

বললাম, হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা ছেলেমেয়েদের রেখেছিল একটা পাহাড়ের গুহায়। আমি তোমাকে রাখব কোথায়?

সীমা বলল, কেন পাহাড়ের গুহায়।

বললাম, তুমি গুহায় বন্দী হয়ে থাকার মেয়ে বটে। কোন ফাঁকে ঝরণার মতো খলখল খুশিতে পাহাড় ভেঙে বেরিয়ে যাবে।

সীমা এবার আর কোন কথা বলল না। কিছুক্ষণ চুপচাপ লনের পাইন গাছটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, দেখেছেন, ওদিকের বড় ডালটা কি রকম ভেঙে গেছে।

কাছে গিয়ে দেখলাম কাল রাতের ঝড় তার চিহ্ন রেখে গেছে।

কি জানি কেন মনে এল একটা কথা। বললাম, এই গাছটার সঙ্গে কোথায় যেন আমার মিল আছে।

সীমা আমার দিকে ফিরে তাকাল।

বলতে লাগলাম, দেখ, কত নতুন মানুষ আসে, দু'দিন বসে এর তলায় তারপর চলে যায়। আমাদের কাছেও তোমরা দু'দিন এসে দাঁড়াও, তারপর পড়ার খেলা শেষ করে চলে যাও। শুধু তফাৎ গাছটার স্মৃতির ব্যথা নেই, আর আমাদের সে ব্যথায় বুক ভরে আছে।

সীমার দৃষ্টি এবার মাটির ওপর নামল।

একদিন এ গাছটার সব কটি ডাল যখন এমনি ঝড়ের আঘাতে ভেঙে যাবে তখন এই সুন্দর লনের মাঝখান থেকে সরে যেতে হবে ওকে। তারপর যদি কোনদিন কোন পুরোনো অতিথি এখানে এসে দাঁড়ায় তাহলে সে-ই শুধু একটা স্মৃতির ব্যথা অনুভব করবে। জান সীমা, সেইটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া।

গাছটার দিকে তাকিয়ে কি জানি কেন আজ এসব কথা বেশি করে মনে পড়ছে।

সীমা দেখি আমার দিক থেকে ফিরিয়ে মুখ নিয়েছে কখন।

সীমা!

ও আমার কথা শুনতে পেল কিন্তু ফিরে দাঁড়াল না।

বললাম, কি হলো তোমার?

দেখি সীমা চোখের ওপর আঁচলটা তুলে নিল।

কাছে গিয়ে বললাম, কি হল, আমি তো তোমাকে কোন আঘাত দিইনি।

মুহূর্তে মুখোমুখি ফিরে দাঁড়াল ও, কেন বললেন ও কথা, বলুন কেন বললেন?

চোখের জলে সীমা উদ্যত প্রশ্ন তুলে ধরল।

কি উত্তর দেব এর!

ম্লান হেসে বললাম, মনের কথা মানুষ কাউকে শোনাতে চায় সীমা, এতে মনের ভার অনেকটা লাঘব হয়।

অন্যকে দুঃখের ভেতর ফেলে কি আনন্দ পান আপনি?

বললাম, এ অভিযোগের এখানেই শেষ হোক সীমা। আমি হয়ত না বুঝে তোমাকে আঘাত দিয়েছি, কিছু মনে করো না।

আরও কথা হতে পারত কিন্তু হল না। পথের দিকে সীমা একটু অবাক হয়েই তাকিয়ে রইল। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি কালকের সেই মেয়েটি আসছে, হাতে বড় বড় দুটি মুরগী।

সীমা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে বললাম, আজ থেকে নতুন রাঁধুনি বহাল হল।

কি রকম?

বললাম, তেনাং-এর রান্নার তারিফ তো কোনদিন করলে না তাই নতুন মানুষ এনেছি পরীক্ষা করে দেখ।

ও বলল, মুরগী দিয়েই শুরু, তাহলে তো আসতে হয়।

বললাম, শোন বলি, আজ ডাওহিলকে মধ্যাহ্নভোজের নেমন্তন্ন করব ভেবেছি।

সীমা বলল, তাই এ রাজসূয়!

বললাম, রাজসূয় কিনা জানিনা তবে নতুন রাঁধুনির পরীক্ষাটা এই সঙ্গে করে নিতে চাই।

ও হেসে বলল, তার চেয়ে বলুন নতুন মানুষকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে চাই।

বললাম, পুরোনোদের নেমন্তন্ন করি কিনা আগে দেখ, তারপর না হয় অপবাদ দিও।

সীমার কথায় এবার কপট ক্রোধ, চাইনা এমন দলে ভীড় করে আসতে।

বললাম, তুমি আসবে কি, তুমি তো আছ। সেন্ট মেরী হিলই তো তোমার রাজ্য।

ও বলল, আপাততঃ আসছি।

রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল সীমা। নতুন মেয়েটিকে কি যেন পরামর্শ দিল।

বসে রইলাম পাইন গাছটার তলায়। যেন কোন দায়িত্ব নেই আমার। নেমন্তন্ন করা অবধি আমার কাজ। তার পরেরটা সীমার। কতক্ষণ ঘরের ভেতর সীমা কি যেন সব করতে লাগল, বাইরে বসে আমি শুধু দেখতে লাগলাম সোনালী সকাল। এক সময় ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সীমা বলল, আমি আসছি এখন।

বলেই ওপরের পথে পা বাড়াল।

বললাম, আবার তাড়াতাড়ি ওঁদের সঙ্গে আসছ তো?

ও পথ চলতে চলতে চেঁচিয়ে বলল, কখন এলাম আমি যে আবার আসার কথা বলছেন? আমি আজ একেবারে আসিনি সকালে। ওদের সঙ্গেই প্রথম আসব কিন্তু।

বললাম, মাস্টার মানুষ হয়ে মিথ্যে কথা বলতে পারব না।

ততক্ষণে সীমা পাইনবনের কাছাকাছি উঠে গেছে। ওপরে থেকেই ঠোঁটে তর্জনী রেখে মাথা দুলিয়ে মিনতি জানাতে লাগল। যেন কোন রকমেই ওর এই পালিয়ে আসার কথাটুকু না প্রকাশ করে ফেলি।

বললাম, তাড়াতাড়ি চলে এসো, তারপর বিবেচনা করা যাবে।

সীমা পাইন বনের ভেতরে মিলিয়ে গেল।

খুব ভাল লাগছে এই লুকোচুরি খেলাটুকু। আজকাল সীমার আচার আচরণ কতকটা অভিভাবকের মতো হয়েছে। অভিযোগ অনুযোগের মাত্রাও বেড়ে গেছে।

পরিবেশ মানুষের কি আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়! এই পাহাড়ের কোলে পাইন বনের নিবিড় ছায়ায় কোন জাদুকর তার অবাক জাদুর জাল পেতে রেখেছে। এখানে একবার এলে মানুষ ধীরে ধীরে ভুলে যায় আগের অবস্থার কথা। মনে করতে চাইলেও যেন পূর্বের জীবনটাকে মনে করা যায় না।

বাবুজী?

ভেতর থেকে মেয়েটি ডাক দিল। এগিয়ে গেলাম।

মাইজী কোথা?

বললাম, কার কথা বলছ, দিদিমণি? সকালে যে এসেছিল?

মিষ্টি একটা হাসি হাসল মেয়েটি।

বললাম, কি নাম তোমার?

বলল, সোহেলী।

বাঃ বেশ নামটি তো। আচ্ছা কি জন্যে দিদিমণির খোঁজ করছ তাই বল?

সোহেলী বলল, দিদিমণি পোলাও বানাতে বলে গেছে, কিন্তু ঘি কই বাবুজী?

বললাম, কাল রাতে তেনাংকে বলেছি, সে সকালেই বাজারে বেরিয়েছে। এক্ষুনি এসে পড়বে।

সোহেলীকে জিজ্ঞেস করে জানলাম সীমা তাকে ভোজের একটা চূড়ান্ত ফর্দ দিয়ে গেছে।

মনে মনে একটু অবাক হলাম। সীমাকে যেদিন এখানে কিছু খেয়ে যেতে বলেছি সেদিনই সে প্রতিবাদ জানিয়েছে। যদিও বা কিছু খেয়েছে, রান্নাবান্নার ঝামেলা বেশি করতে গেলেই আপত্তি। কিন্তু আজ সে নিজেই ভোজের মেনুগুলো নিয়ে সোহেলীর সঙ্গে আলোচনা করে গেল।

একটু ভেবে নিজের মনেই হাসি পেল। তাই তো, এদিকটা যে একেবারেই ভেবে দেখিনি। আজ যে নতুন মানুষেরা আমন্ত্রিত। আর তাঁদের ধারণার ওপরে সীমার মান অপমান নির্ভর করছে।

প্রথমটা হাসি পেয়েছিল, কিন্তু পরক্ষণে একটুকরো চিন্তা আমার সমস্ত মনটা জুড়ে বসল।

সীমা এত কাছে সরে এসেছে। তার আত্মীয়ের চেয়ে আমার সঙ্গে আত্মীয়তা তার বেশি। আমার মান সম্মানের ওপর নির্ভর করছে তারও সম্মান সম্ভ্রম। খুব ভাল লাগল। শিক্ষার ভেতর দিয়ে পরিচয় হয়েছে আমাদের, সুতরাং সে পরিচয়ের গভীরতা সামাজিক অন্য সম্পর্কগুলোর চেয়ে বেশী হওয়াই তো স্বাভাবিক।

সোহেলীকে বললাম, সকালে যে দিদিমণি এসেছিল, সে কথা যেন বলো না কাউকে।

সোহেলীর মুখে তেমনি মিষ্টি হাসি। বলল, দিদিমণি মানা করে গেছে।

ওঁরা এসে পড়লেন। সকালে গায়ে একখানা র‍্যাপার জড়িয়ে এসেছিল সীমা। এখন অন্য বেশ। দামী কাশ্মীরী ক্লোক একখানা গায়ে জড়িয়ে এসেছে। সুদীপ্তা এসেছে অগ্নিশিখার মতো। পরনে রক্তরাঙা শাড়ি, গায়ে মেরুন কোট আর লাল রিবনে জড়ান কেশগুচ্ছ।

সীমা আর সুদীপ্তা আগেই লাফাতে লাফাতে এসে গেল।

সুদীপ্তাকে দেখিয়ে সীমা বলল, কেমন দেখাচ্ছে আমার বান্ধবীকে?

হেসে বললাম,

'উদ্ধত যত শাখার শিখরে
রোডোডেনড্রন গুচ্ছ।'

সুদীপ্তা বলল, আমার বেলায় কাব্য করলেন, ওর বেলায় কিছু বলুন। বললাম,

'বর্ষা অন্তে ইন্দ্রধনু
মর্তে নিল তনু'

এসে পড়লেন অতিথিরা। করজোড়ে আহ্বান জানালাম।

অর্ণববাবু বললেন, কি বলব ভাই, গাড়ি থেকেও খোঁড়া হতে হল।

এমনি পায়ে হেঁটে বনটা পার হলেই হয়ে যেত, কিন্তু শ্রীমান অঞ্জন কুমারের মতলবই আলাদা, বলল, গাড়ি ছাড়া পাদমেকং ন গচ্ছামি।

অগত্যা গাড়ি করে সারা মাথাটা বেড় দিয়ে শেষে নাসিকায় এসে পৌঁছলাম।

অঞ্জনবাবু বললেন, যন্ত্রযুগে পায়ে হাঁটলেই মনে হয় যেন প্রপিতামহের আমলে বাস করছি।

বললাম, কিছু মনে করবেন না অঞ্জনবাবু, হাঁটাপথের একটা আলাদা রোমাঞ্চ আছে। সেটা ঠিক গাড়িতে বসে পাওয়া যায় না।

আলোচনার মাঝে এসে দাঁড়াল সীমা আর সুদীপ্তা।

অঞ্জনবাবু হার মানবেন কেন। বললেন, আচ্ছা বলুন দেখি যন্ত্র আজ জগতটাকে কত কাছে এনে দিয়েছে।

বললাম, সব মেনে নিয়েও একটি কথা বলব, জগৎ যেমন চোখের কাছে এসেছে তেমনি মনের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

অঞ্জনবাবু একটা বিচিত্র ভঙ্গীর ভ্রূকুটি করে বললেন, কি রকম?

হেসে বললাম, কথাটা ঠিক ব্যাখ্যা করে বোঝান যায় না। তবে এটুকু বলা যায় দূরের একটা আকর্ষণ আছে। যে আকর্ষণে মার্কোপোলো, ফাহিয়ান একদিন ঘরের মায়া ছেড়ে পথে বেরিয়েছিলেন। সেদিন তাঁরা পথে পথে যে বিচিত্র আনন্দ কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, আজ অনেক দূরের জগতকে কাছে পেয়েও কি আমরা তা পেয়েছি?

অঞ্জনবাবু এবার অন্য সুর ধরলেন, আপনি কি তাহলে বলতে চান আবার আমরা যন্ত্রযুগ ছেড়ে বনমানুষের যুগে ফিরে যাব?

বললাম, আমি কিন্তু বিজ্ঞানের জয় গৌরবকে একটুও খর্ব করছি বলে মনে করবেন না। যন্ত্রের যুগ এটা তা মেনে নিয়েও বলব, পায়ে চলার যেটুকু পথ এখনও আছে তাকে আর দয়া করে চাকার তলায় মাড়াবেন না।

অর্ণববাবু বললেন, বুঝেছি, অধ্যাপকের মতটা হল এই যে রকেটে করে চন্দ্রলোকে যাও ক্ষতি নেই, কিন্তু খবরদার, এর ফলে চাঁদের হাট যেন ভেঙে না যায়।

হেসে বললাম, এখন চাঁদের হাটটা ঘরের ভেতর বসাতে খুব আপত্তি আছে কি?

কিছুমাত্র না। অর্ণববাবু ঘরের ভেতর যাবার জন্যে পা বাড়ালেন।

ওঁদের অভ্যর্থনা করে বসার ঘরটিতে নিয়ে এলাম।

এ কি! নিজের ঘরে ঢুকে নিজেই অবাক। সকাল থেকে ঘরের বাইরে এসে বসেছিলাম, এখন ঘরে ঢুকে চিনতে পারলাম না ঘরটা আমার নিজের কিনা। এ কাজ যে সীমার এতে সন্দেহ কি। সত্যি মেয়েটি যেন ভানুমতী। সেই যে তখন এসেছিল, কোন ফাঁকে ঘরে ঢুকে ভাল বেড কভার আর টেব্‌ল ক্লথ পেতে রেখে গেছে। ফুলদানিতে চমৎকার এক গুচ্ছ ফুল। আমার তো এ সব খেয়ালই ছিল না।

ওঁরা এসে বসলেন। অর্ণববাবু হঠাৎ চারিদিকে তাকিয়ে বললেন, একি অধ্যাপক, আজ হঠাৎ লক্ষ্মীর হাতের ছোঁয়া দেখছি। এমনি সাজিয়ে গুছিয়ে থাকা তো আপনার স্বভাবের বাইরে বলেই জানতুম। বলি ব্যাপারটা কি? বিদেশ বিভুঁয়ে হঠাৎ গৃহলক্ষ্মী লাভ হল নাকি?

অর্ণববাবু নিজেই নিজের রসিকতায় অট্টহাসি করে উঠলেন। কেবল দুটি প্রাণী ছাড়া আর সবাই সে হাসিতে যোগ দিলেন।

আমি হঠাৎ চায়ের ব্যবস্থা করার নাম করে উঠে চলে গিয়ে আত্মরক্ষা করলাম। বেশ বুঝলাম, সীমা মাথা নিচু করে বসে আছে। ছিঃ ছিঃ এমন বিপদেও মানুষ পড়ে।

সোহেলীকে বললাম, চা আর জলখাবার দাও এবার।

ও কাপ গুণে গুণে সাজিয়ে তাতে চা ঢালতে লাগল।

কতক্ষণ পরে ঘরে যখন ঢুকলাম তখন দেখি ফুলদানির গোলাপগুলোতে আপন মনে হাত বুলোচ্ছে সীমা।

সোহেলী এসে গেল চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে। সীমা অমনি এগিয়ে এসে খাবারের প্লেটগুলো আমাদের হাতে ধরে ধরে দিতে লাগল।

অঞ্জনবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখি, একটি ইলাস্ট্রেটেড উইক্‌লিতে মুখ ডুবিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। সীমা খাবার এগিয়ে দিতেই তিনি প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, এতগুলো খেতে হবে, বুনো পাহাড়ী ঠাওরালেন নাকি!

সীমা কেমন যেন সংকুচিত হয়ে গেল। ওঁর এ ধরনের মন্তব্যের ভেতর যে একটা কাঁটা ছিল তা উপস্থিত সকলকেই আহত করল।

সুদীপ্তা পরিস্থিতিটাকে রক্ষা করল। ও হেসে বলল, তুমি না খেতে পার, আমায় দিয়ে দাও। আমি আর সীমা ভাগ করে খাব। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, ডাক্তারের ব্যাগে জানবেন সব সময় কিছু না কিছু একটা হজমের ওষুধ থাকে। সুতরাং আমরা কোন কিছুতেই ভয় পাই না।

হেসে বললাম, ভয় দেখাব কি, বরং অভয় পেলাম আপনার কথায়।

অর্ণববাবু বললেন, খাওয়ার ব্যাপারে যে যার নিজস্ব একটা অভ্যেস থাকবেই তো। অঞ্জন খেতে চায় না এটা যেমন সত্য, সুদীপ্তা ভোজনবিলাসিনী এও ঠিক তেমনি সত্য।

চায়ের আসর শেষ হতে না হতেই আমি দ্বিতীয় প্রস্তাবটি করে বসলাম, মধ্যাহ্নভোজটা এখানেই সেরে যেতে হবে। মেনু—মুরগীর রোস্ট।

অসীমাদেবী আপত্তি তুলেছিলেন, কিন্তু প্রবলভাবে সে বাধাকে ডুবিয়ে দিয়ে অর্ণববাবু বললেন, একে ব্রাহ্মণ, তার ওপর একেবারে মুরগীর ডাক। একে এড়িয়ে যাবার মতো মনের জোর অন্ততঃ আমার নেই।

সামান্য আপত্তিগুলো আর টিকল না। এতক্ষণ অঞ্জনবাবু চুপচাপ বসেছিলেন। এবার মুখ খুললেন, শিকার করে খাওয়ার যে আনন্দ, বাজার থেকে কিনে খাওয়ার সে আনন্দ নেই কিন্তু।

হেসে বললাম, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি একেবারে একমত। তবে দুঃখ এই কলকাতার কাছেপিঠে কোন বন নেই। তাই ইচ্ছে থাক বা না থাক বাজারে আমাদের যেতেই হবে।

সুদীপ্তা হেসে বলল, আচ্ছা, গড়ের মাঠটাকে বন করে দিলে কেমন হয়?

বললাম, উত্তম প্রস্তাব। তবে সারা গড়ের মাঠ জুড়ে সরকার পোলট্রি খুললে মুরগী শিকারের বেশ সুবিধে হবে।

অর্ণববাবু বললেন, বনের ভেতর পোলট্রি, তা মন্দ না। যদি এমন একটা ব্যবস্থা আপনারা সরকারকে বলে করাতে পারেন অধ্যাপক, তাহলে আপনার দিদিও হাতে বন্দুক নিয়ে শিকারের শখটা মেটাতে পারেন।

অঞ্জনবাবু বললেন, তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে বৌদিকে এই পাহাড়ের বনেই আমি শিকারে নিয়ে যাব। দার্জিলিং-এর এক ফরেস্ট অফিসার আমার বিশেষ পরিচিত। তিনি বার বার আমায় ডাকছেন।

এক যুগ পরে মুখ খুললেন অসীমাদেবী, ঐটুকু সাধই যা জীবনে বাকী ছিল। তোমার দাদা তো

আমার সব সাধই মিটিয়েছেন, এখন শেষ সাধটা দাদার ভাই মেটালেই আমার ষোলকলা আশা পূর্ণ হয়।

অঞ্জনবাবু বললেন, এ যাত্রায় আপনাকে আমি অবশ্যই শিকারে নিয়ে যাবো।

অসীমাদেবী বললেন, রক্ষে কর ভাই, তোমাদের রক্তে তাপ আছে, তাই শিকার তোমাদেরই সাজে, আমরা শিকারের স্বপ্ন দেখেই খুশি হই।

কিন্তু অঞ্জনবাবু শিকারের লোভ ছাড়বার পাত্রই নন। অনেক গবেষণার পর ঠিক হল অসীমাদেবী আর অর্ণববাবু থাকবেন ডাওহিলে। সুদীপ্তা আর সীমাকে নিয়ে অঞ্জনবাবু যাবেন দার্জিলিং-এর পথে শিকারে।

সীমা আপত্তি তুলেছিল, কিন্তু সুদীপ্তা তাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। শেষে আমিও সুদীপ্তার সঙ্গে যোগ দিলাম।

সীমা বলল, পরীক্ষায় ফল খারাপ হলে আমি কিন্তু জানি না।

হেসে বললাম, আমি তো জানি, তাহলেই হল। দশ দিন শিকারে গেলে যে এনার্জী পাবে তাতে এদিকের ক্ষতিটা সহজেই পুষিয়ে নিতে পারবে।

সীমা আমার দিকে কেমন এক অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল!

খাওয়া-দাওয়া সেরে ওঁরা চলে গেলেন। যাওয়ার সময় একটিও কথা বলল না সীমা। মনে হল ওকে জোর করে পাঠানোর জন্যে আমার ওপর ও ক্ষুব্ধ হয়েছে।

বেলা শেষে গেলাম ওদের ওখানে। তখন আসর বসে গেছে। গান গাইছে সুদীপ্তা। বাইরে থেকে আমাকে ঢুকতে দেখেই মাঝপথে গান থেমে গেল।

অমনি থমকে দাঁড়ালাম।

অসীমাদেবী বললেন, দাঁড়ালেন যে, না ডাকলে বুঝি আসরে ঢুকবেন না।

বললাম, তেমন কোন প্রতিজ্ঞা ছিল না, তবে আমার আসাতে যদি অমন সুন্দর একটা গান মাঝপথে থেমে যায় তাহলে নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয়।

সুদীপ্তা বলল, গানের আসরে মান রাখা যার দায় তার গান এমনি মাঝপথেই থেমে যায়।

বললাম, গানের ব্যাপারে আপনার একেবারে নিকটতম প্রতিযোগীটিও আপনার সম্বন্ধে এমন রূঢ় মন্তব্য হয়ত করবে না।

অর্ণববাবু বললেন, দীপাদেবী মান না বাড়িয়ে আর একখানা গান গাইলেই আমরা খুশি হই।

বললাম, একখানা কি কয়েকখানা সেটা কিন্তু শ্রোতাদের মর্জির ওপর ছেড়ে দিতে হবে।

সুদীপ্তা হারমোনিয়মটা আবার টেনে নিল। গলা যে সম্প্রতি কিছুটা খারাপ হয়েছে সে অজুহাত দিল না। গান গাইল অত্যন্ত অনায়াস ভঙ্গীতে।

গান থামল। বললাম, যদি গায়িকার আপত্তি না থাকে তাহলে আশা করি আরও দু'একখানা শুনতে শ্রোতাদের কোন আপত্তি থাকবে না।

সুদীপ্তা বলল, আর কি গাইব বলুন?

বললাম, অর্ডার দিলে ভাল চপ, কাটলেট পাওয়া যেতে পারে কিন্তু ভাল গান পাওয়া যায় না। এখানে গায়িকার ইচ্ছার সঙ্গে আমরা একমত হতে চাই।

একটু হাসল সুদীপ্তা। তারপর একখানা ভজন গাইল। ভনিতা থেকে বুঝলাম ভজনটি সুরদাসের। বললাম, বড় ভাল আপনার গানের গলা।

অমনি অর্ণববাবু বললেন, শুধু তাই নয়, আরও ভাল ওর হাতের কাজ।

কই তা তো দেখলাম না।

অর্ণববাবু অমনি বললেন, সে সহজে দেখা যায় না।

একটু অবাক হয়ে তাকালাম অর্ণববাবুর দিকে।

উনি সুদীপ্তার দিকে তাকিয়ে বললেন, অধ্যাপককে কি তোমার হাতের কাজ দেখান যায়?

সুদীপ্তা হেসে বলল, অনেক দর্শনী দিতে হবে।

বললাম, তবু কত?

অর্ণববাবু বললেন, যেমন কাজ তেমনি দর্শনী। হৃদয়ের কাজ হলে তার দর্শনী অনেক বেশি।

কথাটা কিছুতেই ধরতে পারছি না। তাই আর এগুনো বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হল না।

আমাকে থেমে থাকতে দেখে অর্ণববাবু বললেন, মশায়, চড়া ফিয়ের কথা শুনে চমকে গেলেন দেখছি।

কি উত্তর দিলে অন্তত নিজের বোকামিটাকে ঢাকা যায় তাই যখন ভাবছি তখন অসীমাদেবীই আমায় রক্ষা করলেন।

ওদের কথায় কান দেবেন না ভাই। ডাঃ বোসের ছাত্রী আমাদের দীপাদেবী। তাই সার্জারিতে ওর হাতের কাজের কথাই উঠেছে।

অর্ণববাবু বললেন, যদি কোনদিন হার্টের রোগে পড়েন তাহলে স্মরণ করবেন আমাদের সুদীপ্তাকে।

বললাম, কামনা করুন যেন হার্টের রোগে না পড়তে হয় কোনদিন।

অর্ণববাবু বলে উঠলেন, সেকি বলছেন অধ্যাপক। আপনারা ইয়ংম্যান, হৃদয়ের রোগ তো আপনাদেরই শোভা পায়। আমাদের মতো বিবাহিত বুড়োদের কি আর ওসব রোগ মানায়?

হেসে বললাম, আমাদের মতো আপনার কোন বিশেষ রোগ নেই?

অসীমাদেবী হেসে বললেন, হাঁপানি।

অর্ণববাবু অমনি বললেন, রোগটা কার, আমার না তোমার?

ফোঁস করে উঠলেন অসীমাদেবী, আমার কেন হতে যাবে, যাদের চুল পেকেছে এ রোগটা কেবল তাদেরই।

অর্ণববাবু বললেন, কথাটা বলেছ মন্দ না। দশ বছর ক্রমাগত ভার বইতে থাকলে হাঁফ যে ধরবে এতে আশ্চর্য কি।

সীমা এসে দাঁড়াল। গায়ে একটা সাদা র‍্যাপার জড়িয়েছে।

শাড়িটাও সাদা। মাথায় গুঁজেছে সাদা ফুল।

শান্তস্নিগ্ধ মূর্তি আজ সীমার। ও কিন্তু আমার দিকে একবারও তাকাল না। বুঝলাম, এখনও রাগ পড়েনি।

অর্ণববাবু বললেন, 'একি রূপে দিলে দরশন':

ও একটু হেসে সুদীপ্তার গা ঘেঁষে বসে পড়ল।

অঞ্জনবাবু বললেন, এ কিন্তু আপনার ভারি অন্যায়। সারা সন্ধ্যেটা রইলেন রান্নাঘরে। বাহাদুরের কাজটা নিজে না করলে কি হত না? আমরা বসে রইলাম আপনার গানের আশায়।

অসীমাদেবী অমনি বললেন, বললাম মেয়েকে অঞ্জু ঠাকুরপো এসেছে, একটু গল্পগুজব কিংবা গানবাজনায় যোগ দে, তা না, মেয়ে বসলেন পঞ্চব্যঞ্জন রাঁধতে।

অর্ণববাবু বললেন, পঞ্চানন আজ পঞ্চমুখে শ্রীমতী সীমাদেবীর পঞ্চব্যঞ্জনের স্বাদ পাবে, এও কি কম কথা।

সীমা অমনি উঠে চলে গেল।

অর্ণববাবু বললেন, কি হল সীমাদেবী, রসিকতা যে বিষহীন সাপের কামড় এ কথাও কি তোমায় বলে দিতে হবে?

বললাম, বোধকরি ও নতুন কোন রান্নার ব্যবস্থায় গেল।

অসীমাদেবী বললেন, ওর ওই এক গোঁ। কথা মনের মতো না হলেই ও আসর ছেড়ে চলে যাবে।

অর্ণববাবু বললেন, সে কি! আমি আজ তো ওর মনের মতো কথাই বলেছি!

ফিরে এল সীমা। বড় একটা প্লেটে কয়েকটা চপ এনে রেখে দিল টেবিলটার মাঝখানে।

বলল, খান আপনারা, আমি ততক্ষণ গান করছি।

অর্ণববাবু বললেন, তোমরা খাও অঞ্জন, আমি কিন্তু খাচ্ছিনে।

সীমা বলল, অমনি রাগ হয়ে গেল?

অর্ণববাবু বললেন, বোকা ঠাউরেছ আমায়? চপ ঘুষ দিয়ে খারাপ গানগুলোকে ভাল বলে চালিয়ে নিতে চাও। সেটি হবে না সীমাদেবী।

অর্ণববাবুর কথায় আমরা সবাই হেসে উঠলাম। বেচারা সীমার প্রতিবাদ আমাদের সমবেত হাসিতে ডুবে গেল।

অর্ণববাবু সবার আগেই ট্রে থেকে একটি চপ তুলে নিয়ে খেতে শুরু করলেন।

খাও হে, খাও হে, এমন চপ কলকাতার রেস্টুরেন্টে পাওয়া যাবে না। এতে প্রীতির পুর দেওয়া আছে।

সবাই এক একটা করে চপ খেতে লাগলাম।

সীমা গান শুরু করল,

'আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়
কোন্ খ্যাপা সে।
ওরে, আকাশ জুড়ে মোহন সুরে
কী যে বাজে কোন্ বাতাসে।।
গেল রে গেল বেলা, পাগলের কেমন খেলা—
ডেকে সে আকুল করে, দেয় না ধরা।
তারে কানন গিরি খুঁজে ফিরি,
কেঁদে মরি কোন্ হুতাশে।।'

সীমার গান শেষ হল।

অঞ্জনবাবু বললেন, এতক্ষণ নিজেকে কেবল আড়ালে রেখেছিলেন, এমন গলাও কি কেউ গোপন করে রাখে!

আমার মনে কিন্তু আসছে আর একটি কথা। যে পাগল বাউলটি আমাদের খেপিয়ে নিয়ে বেড়ায়, যে সমাজ সংসারের বাঁধন খুলে দিয়ে যায়, তাকে আমরা ধরব কি করে। চেষ্টা করলেও তো তাকে ধরা যাবে না। সে যে বাঁধনহারা পথের পথিক।

সীমার সদ্য গাওয়া গানটুকুর মানে নিয়ে মনে মনে এমনি কত চিন্তার জাল বুনে চললাম।

ইতিমধ্যে আরও গান হল। এক একটা সুর ভেসে আসছে, কিন্তু সব ঢেউ মিলেমিশে আবার এক হয়ে যাচ্ছে। ওই ক্ষ্যাপা বাউল সব কটি সুরের মুখ খুলে দিয়ে পালিয়েছে। ছলছল কলকল আওয়াজ তুলে সমস্ত সুরের ঝরনাধারা তাকে ধরার জন্য ছুটে চলেছে। কি বিচিত্র এই গানের জগৎ!

গান শেষ হল। এবার খাওয়ার আয়োজন। আমরা খেতে বসলাম আর সীমা, সুদীপ্তা পরিবেশন করতে লাগল। অর্ণববাবু তুললেন খাওয়ার বিচিত্র সব গল্প।

গয়ার পাণ্ডাদের খাওয়ার গল্প উঠল। বললাম, একবার গয়ায় গিয়েছিলাম। শ্রাদ্ধশান্তির শেষে পুরোহিত বলল, ভোজন করাতে হবে।

বললাম, বেশ।

পাণ্ডা ঠাকুর অমনি বললেন, দামে দেবেন না দ্রব্যে দেবেন?

বললাম, দাম ধরে দিলে যদি খুশি হন তবে তাই হবে। কত দেব বলুন?

বললেন, তিরিশ টাকা।

আমি তো অবাক। ফলার করাতে তিরিশ টাকা দিতে হবে। কি বলেন মশাই, তিরিশ টাকা!

উনি অমনি বললেন, বেশ তো মশাই, পাত পেড়ে খাচ্ছি, তিরিশ টাকার বেশি যদি না খেতে পারি দামটা আমিই না হয় দেব।

কথা শুনে তিরিশটা টাকাই দিয়ে দিলাম।

অর্ণববাবু বললেন, ভাগ্য ভাল আপনার মশাই যে, পাত পেড়ে খেতে বলেননি।

কেন বলুন তো?

তবে বলছি শুনুন। আগেকার দিনে রাজারাজড়ারা কোন ক্রিয়া-কর্ম বাড়িতে পাণ্ডাদের নেমন্তন্ন করতেন। ভোজনপটু পাণ্ডারা খাটিয়ায় চেপে আসতেন ভোজ খেতে। শিষ্য সাগরেদরা বয়ে নিয়ে আসত তাঁকে।

খেতে বসতেন হেঁট হয়ে। ভার পড়লে সিধে হতেন। শেষটায় ওই ভোজের আসনেই পেছনে হেলে শুয়ে পড়তেন। শিষ্যেরা তখন তাঁর মুখে লাড্ডু, মেঠাই তুলে তুলে খাইয়ে দিত। হার হলে মান যাবে। প্রাণ যাক তাও ভী আচ্ছা। পাশে আরও সব খাচ্ছে। দস্তুরমত রেষারেষি।

বললাম, একজন কি পরিমাণ খেতেন?

অর্ণববাবু বললেন, আধমণি কৈলাসের নাম তো আপনারা শুনেইছেন। গয়ার পাণ্ডাদের কেউ কেউ নাকি খেত সব মিলিয়ে একমণ।

অঞ্জনবাবু বললেন, যে লোকটা খেত তার অবস্থাটা কি রকম হত দাদা?

ওঠার শক্তি লোপ। শিষ্যেরা খাটিয়ায় তুলে 'জয় গুরুজীকি জয়' বলতে বলতে কাঁধে বয়ে নিয়ে যেত। একবার এক রাজবৈদ্য একমণিকে হজমি বড়ি দিতে চাইলে তিনি কি জবাব দিয়েছিলেন জান?

জবাবটা শোনার জন্যে আমরা অর্ণববাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

মৃদু হেসে তিনি বললেন, কোবরেজমশাই, যদি আপনার একটা বড়িরই জায়গা করতে পারব তাহলে সেই পরিমাণে একটা মেঠাই-এর দানাও তো পেটে চালান করতে পারতাম।

হাসি গল্পে আসর বেশ জমে উঠল। আজ অর্ণববাবু একাই একশ। মুডে থাকলে অর্ণববাবুর সঙ্গে পাল্লা দেয় কার সাধ্য।

ফেরার সময় অঞ্জনবাবুকে বললাম, এরপর কিন্তু খাওয়ার আসর বসবে আপনার শিকারকরা বনমোরগের রোস্ট দিয়ে।

অঞ্জনবাবু হেসে বললেন, শিকারে যদি শের মেলে তখন কি হবে।

বললাম, তখন আমরা সবাই মিলে আপনার জন্য অভিনন্দন-পত্র ছাপাব।

হাসি ঠাট্টার ভেতর বিদায় নিলাম। পথে নেমে এসেছি, মসলা নিয়ে এল সীমা।

বলল, আপনার লেখাপড়ার সময়টুকু কেড়ে নিয়েছিলাম, তাই বুঝি দার্জিলিং পাঠালেন?

বললাম, একথা কেন বলছ সীমা? পাঠানো না পাঠানোর মালিক তো আমি নই।

সীমা বলল, আপনি অন্তত পড়ার কথা বলে একবারটিও তো বাধা দিতে পারতেন।

হেসে বললাম, অঞ্জনবাবু এত আগ্রহ দেখাচ্ছেন, এ অবস্থায় বাধা দেওয়া কি উচিত? তাছাড়া নতুন জায়গায় নিশ্চয়ই তোমার ভাল লাগবে।

সীমা হেসে বলল, দেখবেন, আর ফিরে আসছি না।

হেসে বললাম, তাহলে কিন্তু মাঝপথে নতুন শুরু করা উপন্যাসটা বন্ধ হয়ে যাবে।

উপন্যাস লিখছেন, কই সে কথা তো বলেননি। কিছুক্ষণ কি ভেবে বলল, কলমের আঁচড়ে দিন নায়িকার মৃত্যু ঘটিয়ে, তাহলে আর পাঠকের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে না।

হেসে বললাম, নিজের কাছে কি কৈফিয়ত দেব তার?

একটু থেমে বললাম, তার চেয়ে উপন্যাসের নায়িকাকে নতুন জায়গা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারলে উপন্যাসের পটভূমিকাটাই বেড়ে যাবে।

সীমা বলল, সত্যি, লেখকদের মত নিষ্ঠুর, স্বার্থপর আর হয় না। খুশিমত মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারেন আপনারা।

হেসে বললাম, খেলাকে খেলার মতো করেই নিতে হয়, জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ভাবতে গেলেই সব জটিল হয়ে পড়ে।

অসীমাদেবী পথে নেমে এসে বললেন, আজ রাতে এখানেই থেকে যেতে পারতেন। ভোরবেলায় অঞ্জুঠাকুরপো যাওয়ার পথে আপনার আস্তানায় নামিয়ে দিয়ে যেত।

বললাম, গুরুভোজনের পর মনীষীরা কিছু পথ হেঁটে যেতে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁদের কথার অবাধ্য হই কি করে বলুন।

অসীমাদেবী বলললেন, সঙ্গে টর্চ আছে তো?

আলো ফেললাম দূরে। পাইন বনের একাংশে সে আলো উজ্জ্বল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। হেসে বিদায় নিলাম।

* * *

আজ চারদিন সীমা আর সুদীপ্তা গেছে অঞ্জনবাবুর সঙ্গে। বড় নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে নিজেকে। সীমা যখন ছিল তখন দিনের কিছু সময় বসে বসে লিখতাম। ও এলে লেখা রেখে 'মহুয়া' আর 'ছিন্নপত্র' নিয়ে চলত আলোচনা।

তারপর শুরু হত টুকরো কথা। ঝিক ঝিক করতে করতে ট্রেন আসত নিচের পাহাড়ে। সীমাকে আর ধরে রাখা যেত না। তখন সীমা একেবারে 'মুকুলিকা বালিকা বয়সী'। ছুটে যেত লনের একেবারে শেষ প্রান্তে।

আসুন, আসুন, আসুন, বার বার ডাকত হাতছানি দিয়ে। কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম। তখন সীমা একেবারে চুপ। ট্রেনের খেলায় ও মগ্ন হয়ে যেত। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ঝিক ঝিক শব্দ করতে করতে ট্রেনটা এগিয়ে আসত চোখের সামনে। আবার একটা পাহাড়ের আড়ালে অথবা পাইন বনের ফাঁকে ট্রেনটা কখন অদৃশ্য হয়ে যেত। ভেসে আসত একটা ক্ষীণ আওয়াজ। তারপর আবার একেবারে অবাক করে দিয়ে হুস হুস ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সামনের পাহাড়ে এসে হাজির।

কাচের শার্সি দেওয়া রঙিন কাঠের বাড়ি, ছবির মত দু'একটি পাইন গাছ, উঁচু-নিচু পাহাড়ের কোলে আঁকাবাঁকা ট্রেনের লুকোচুরি, টুকরো মেঘের আনাগোনা ; সব মিলিয়ে আশ্চর্য সুন্দর একটা ল্যান্ডস্কেপ।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। ট্রেনটা চলে যেত তবু চেয়ে থাকত সীমা। বিকেলের আলোয় দেখা যেত রুপোর হাঁসুলির মতো নদীর রেখা।

বলত, ওই দূরে কি যেন ঝিকমিক করছে না?

বলতাম, পাহাড়ী কন্যা কার্শিয়াং-এর গলায় হার দুলছে। নেওরাঙ, চেলাঙ, জলঢাকা নদীর রুপোলি হার।

ও অমনি বলত, আমার রুপোর হাঁসুলি পরতে খুব ইচ্ছে করে।

বলতে বলতে কখনও একটা মেঘ এসে সবকিছু ঢেকে দিয়ে যেত। কতক্ষণ আমরা ডুবে থাকতাম তার ভেতর। মেঘ সরে গেলে দেখতাম ওর রেশমের মতো মিহি চুলে কণা কণা হিম মুক্তোর দানার মতো লেগে আছে।

বেলা শেষ হবার আগেই ও চলে যেত ওপরের পাহাড়ে। কিছুপথ এগিয়ে দিয়ে আসতাম ওকে। কোন কোনদিন গল্প করতে করতে হাজির হতাম একেবারে ডাওহিলে ওদের আস্তানায়।

তেনাং এসে আলো জ্বেলে দিলে। বললাম, থাক নিভিয়ে দাও, অন্ধকারে বসে থাকতে বেশ ভাল লাগছে।

আলোটা আবার নিভে গেল। চারদিকে গভীর অন্ধকার। দূরে দূরে কি অপরূপ দৃশ্য দেখা যাচ্ছে! ঘন কালো অন্ধকারের বুকে এদিক ওদিক অসংখ্য জোনাকির বাতির মতো জ্বলছে ইলেকট্রিকের আলো। হয়ত রোহিণী টি-এস্টেট, নয়ত শিলিগুড়ির আলো ওগুলো। রাতের জগৎ কি রহস্যময়!

আচ্ছা এখন ওরা কি করছে? কোন গভীর বনে ফরেস্ট বাংলোতে হয়ত রাতের আস্তানা পেতেছে। কি বিচিত্র রোমাঞ্চে ভরা রাত কাটছে ওদের। চারদিকের হরেক রকম পোকার একটানা আওয়াজ। মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব বন্যজন্তুর ডাক। রাতের অন্ধকার যাচ্ছে খান খান হয়ে ভেঙে। ওদের সঙ্গে গেলে নতুন একটা অভিজ্ঞতার স্বাদ নিয়ে ফেরা যেত।

আলো জ্বেলে উপন্যাসটা লিখতে শুরু করলাম। দু'এক পাতা লিখে দেখা গেল কাটাকুটি বাদ দিয়ে এগিয়েছি খুব অল্পই। লেখার আশা ছেড়ে দিলাম।

বাবুজী।

কে? চমকে উঠলাম।

সোহেলি এসে পাশে দাঁড়িয়েছে।

বললাম, কি খবর সোহেলী?

খেতে দেব বাবুজী?

কোন কাজে মন বসছিল না। বললাম, দাও।

খেতে বসেছি। সোহেলি বলল, দিদিমণি কবে আসবে বাবুজী?

বললাম, তুমি দিদিমণির খোঁজ নিচ্ছ, কি ব্যাপার?

মুখ নিচু হল সোহেলির। বলল, ওর জন্য মনটা কেমন করে।

হেসে বললাম, কই আমার তো কিছুই করছে না।

কেমন অবিশ্বাসের চোখে ও তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর ম্লান হেসে বলল, হাঁ তোমারও মন কেমন করে বাবুজী। আমি ঠিক বলছি।

বললাম, অনেকদিন কাছে কাছে থেকে তারপর কেউ চলে গেলে একটা দুঃখ আসে সোহেলি। তোমাদের ছেড়ে চলে যাব যখন তখনও এমনি কষ্ট পেতে হবে।

বাবুজী, একটা কথা বলব, রাখবে?

বললাম, কি?

তোমার আর দিদিমণির দু'খানা ছবি আমাকে দেবে?

কৌতূহল হল, বললাম, আমাদের ছবি নিয়ে কি করবে তুমি সোহেলি?

বলল, ভাল মানুষের ছবি রাখলে মানুষ নিজে ভাল হয়।

সে কি রকম?

ও কিছু নয় বাবুজী, তোমাদের আমার খুব ভাল লেগেছে।

সোহেলি মেয়েটি বেশ ভাল। কাজকর্ম অতি পরিচ্ছন্ন। তার ওপর ওর স্বভাবের কোথায় যেন একটা ভাল লাগার ছাপ আছে। যখন চলে যাব, সত্যি ওদের জন্যে মনটা কেমন করবে।

একদিন গেলাম ডাওহিলে। অর্ণববাবুরা খুব খুশি হলেন। অভিযোগ করলেন অসীমাদেবী, ছাত্রী নেই বলে কি আসতেও নেই ভাই?

বললাম, এমন অভিযোগ করছেন কেন দিদি? অবশ্য আমার দিক থেকে ত্রুটি ঘটেছে ঠিক, কিন্তু তাব জন্যে এভাবে অপরাধী করবেন না।

অসীমাদেবী এবার সহজ হলেন। হেসে বললেন, এ কদিন কি রাজকার্য করা হচ্ছিল শুনি?

বললাম, কার্য একটা হচ্ছিল ঠিক, তবে তা রাজকার্য কিনা জানি না।

অর্ণববাবু বললেন, ওভাবে ফাঁকি দিলে চলবে না। দিদির কাছে কাজের কৈফিয়ত দিতে হবে।

লিখছিলাম একটা উপন্যাস।

দুজনে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, সে কি, উপন্যাস!

অসীমাদেবী বললেন, এ আপনার ঘোরতর অন্যায়। পাণ্ডুলিপিখানা তো সঙ্গে করে আনতে হয়।

বললাম, ক্ষমা করবেন দিদি, লিখি বলে কি পয়সার হিসেবটাও জানি না?

অর্ণববাবু বললেন, পয়সার হিসেবটা আবার কোথা থেকে এল?

বললাম, পাণ্ডুলিপি শোনা হয়ে গেলে বই কিনবে কে? বেচারা লেখকের অন্তত এক কপি বই বিক্রির যে আশা ছিল তাও মাঠে মারা যাবে।

অসীমাদেবী বললেন, অগ্রিম দাম দিতে রাজি আছি।

বললাম, তা হয় না দিদি, পাণ্ডুলিপি পড়ার লোক ভূমণ্ডলে মাত্র দুজন—একজন সহধর্মিণী, অন্যজন প্রকাশক। সহধর্মিণীকে না দেখালে গৃহবিবাদ, আর প্রকাশককে না দেখালে সংসার অচল।

অর্ণববাবু বললেন, আর দিদিকে না দেখালে নতন নতুন আইটেম যে বন্ধ।

বললাম, সব হারাতে রাজি আছি, দিদির হাতের চা আর চপ হারাতে রাজি নই। অতএব আদেশ করলেই প্রস্তুত আছি।

ও কথা কেন বলছেন, আপনি বরং অনুগ্রহ করলে আমরা শুনতে পাই, বললেন, অর্ণববাবু।

বললাম, পাণ্ডুলিপি একেবারে প্রথম অবস্থায় ; একটা বিশেষ পরিণতির পথ না ধরলে শুনে বা শুনিয়ে কোনটাতে আরাম নেই।

অসীমাদেবী বললেন, বেশ, আগে শেষ হোক, তারপর আমাদের পড়িয়ে তবে প্রেসে দেবেন।

বললাম, শিরোধার্য। তবে সেটা কার্শিয়াং-এ না হয়ে কলকাতাতেও হতে পারে।

অসীমাদেবী বললেন, তাতেই আমরা রাজি।

ওঁদের কাছে খবর পেলাম অঞ্জনবাবুরা দার্জিলিং পৌঁছে একটা চিঠি দিয়েছেন। ওখান থেকে কোথায় কোথায় যাবেন সে প্রোগ্রাম আর কিছু জানাননি। লিখেছেন, গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে বসে আছি, যেখানে খুশি পৌঁছে যাব।

রাতে বাসায় ফিরে এসে অবাক হলাম। এত রাতে সোহেলির থাকার কথা নয়। সন্ধ্যায় খেতে দিয়ে ও চলে যায়।

বললাম, সোহেলি, কোঠিতে ফেরনি?

ও হেসে আমার হাতে যে বস্তুটি দিলে তাতে আমি আরও অবাক হলাম। সীমা চিঠি লিখেছে। খামেই দিয়েছে চিঠি ; কিনতু সোহেলি জানল কি করে চিঠিখানা সীমার!

বললাম, কার চিঠি বল তো সোহেলি?

ও একটু সঙ্কুচিত হয়ে বলল, দিদিমণির।

কি করে বুঝলে তুমি? খামের একপাশে লেখা সীমার নামটা ও দেখিয়ে দিলে।

তুমি ইংরাজি জান?

আমি খ্রিষ্টান বাবুজী। আমরা ইংরাজি স্কুলে পড়েছি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। ওর সামনে আর চিঠিখানা পড়লাম না। অনেকক্ষণ একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বললাম, রাত হয়েছে সোহেলি, তুমি যাও, আমি নিজেই খাবার নিয়ে খেতে পারব।

ওকে সরে যেতে বলছি, সে ইঙ্গিত ও বুঝতে পারল কিনা জানি না তবে পায়ে পায়ে খানিকটা এগিয়ে গেল। তারপর আবার ফিরে এল ও। আচ্ছা বাবুজী, দিদিমণি ভাল আছে তো?

বললাম, আছে নিশ্চয়ই।

বলল, আসবে লিখেছে কিছু?

চিঠিটা একবার উল্টে পাল্টে দেখলাম, সে কথার কোন উল্লেখ নেই।

বললাম, সে কথা কিছু লেখেনি তো।

আর দাঁড়াল না সোহেলি। পায়ে পায়ে বেরিয়ে গেল। বড় ভালবেসে ফেলেছে ও আমাদের।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে নিলাম। তারপর নিশ্চিন্তে গিয়ে বসলাম বিছানায়। সীমার চিঠিখানা পড়তে হবে এবার। কাজ হাতে রেখে চিঠি পড়ার ভেতর তৃপ্তি পাই না, তাই সবশেষে বসলাম চিঠিখানা নিয়ে।

অনেক কথা লিখেছে সীমা। গভীর বনের ভেতর রয়েছে তারা একটা রেস্ট হাউসে। অঞ্জনবাবুর কোন এক বন্ধু নাকি জাঁদরেল শিকারি। তিনিও রয়েছেন সঙ্গে। বনের পরিবেশটি অদ্ভুত রোমাঞ্চে ভরা, তবু কেন জানি না সীমার সেখানে থাকতে একটুও ইচ্ছা করছে না। আমার ওপর কল্পিত অজস্র অনুযোগে ভরে তুলেছে তার চিঠিখানা।

কিন্তু সবার শেষে সীমা উপহার দিয়েছে একটি কবিতা। নাম দিয়েছে 'বন্দিনী'। কবিতার শুরুতেই দু'ছত্র লেখা : একদিন কাব্যযুদ্ধের কথা হয়ত ভুলে গেছেন, আমি কিন্তু ভুলিনি। কথা ছিল আপনি আগে লিখবেন, তা যখন হল না তখন কাব্যের প্রথম শরটি আমিই ত্যাগ করলাম। এ আমার গুরুপ্রণামী। আঙ্গিকে ইচ্ছে করেই প্রাচীনের গন্ধ মেখে দিলাম।

বন্দিনী

কাঁদে লতা, কাঁদে ফুল, সীতা কাঁদে অশোককাননে
রাম-মন্ত্র জপে মনে মনে
দিকে দিকে রাবণের ছদ্মবেশী যত অনুচর
প্রলোভন দিতেছে বিস্তর
তারি মাঝে ম্লানমুখী দিন গণে দিবস রজনী
কবে হায় রাম রঘুমণি
সমস্ত অসত্য হতে মুক্ত করে লয়ে যাবে তারে।
আলোর প্রকাশ হবে গ্লানিময় আঁধারের পারে।
মনে হয় মানুষের মন
অশোককাননে বন্দি অশ্রুমুখী সীতার মতন।

সীমার কবিতাটি বারবার পড়লাম। এ কি বন্দিনী সীতার কান্না? না সীতার ছদ্মবেশে সীমাই কাঁদছে! কী গোপন ব্যথায় কাঁপছে সীমার মন।

কবিতার শেষে সীমা লিখেছে, ৬ই আমরা দার্জিলিং-এ হোটেল-স্যানাটোরিয়ামে ফিরছি। ফিরেই আপনার একখানা চিঠি পাব এই আশায় নির্জন বনে দিন গুনছি।

সঙ্গে সঙ্গে একটি উত্তর লিখলাম।

সুকল্যাণী,

শিষ্যের কাছে পরাজয়েই গুরুর গৌরব। তবু যুদ্ধ ঘোষণা যখন হয়েই গেছে তখন তোমার নিক্ষিপ্ত তীর আমি তুলে নিলাম।

দুষ্মন্তের বিস্মৃতি

দুষ্মন্ত কেমন করে ভুলে যাবে সে শকুন্তলা
তপোবন-কানন-কুন্তলা!
স্বপ্নের কমল পাত্রে করেছে সে সত্য মধু পান
তার থেকে হবে অসম্মান
সত্য নয়, সত্য নয়, দুষ্মন্তের সব ভুলে যাওয়া
হারানোর ছদ্মবেশে এ যেন একান্ত করে পাওয়া
দুর্বাশার ক্রুদ্ধ অভিশাপে
চিরদিন দুটি মন মিলন-মুহূর্তে এসে কাঁপে।

পরের দিন পাঠিয়ে দিলাম দার্জিলিং-এ সীমার ঠিকানায়।

শিকার-যাত্রা শেষ হল ওদের একদিন। বসে বসে এক পড়ন্ত বেলায় উপন্যাস লেখায় ডুবে গিয়েছিলাম, সীমা এল নিঃশব্দে। মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকাতেই ও হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিলে। মাথায় হাত রেখে বললাম, ভাল ছিলে তো?

সীমা ম্লান হেসে মুখ নামিয়ে নিল। চূর্ণ চুলের রাশ কপালে উড়ে পড়ছিল ওর।

বললাম, চিঠি পেয়েছিলে ঠিক সময়ে?

মাথা নেড়ে ও পাওয়ার কথা জানাল।

বললাম, কয়েকদিন পরে আমাকেও যেতে হবে দার্জিলিং-এ। দাদা চিঠি লিখেছেন, ভাইপোটিকে নিয়ে আসতে হবে সেন্ট জোসেফস্ কলেজ থেকে।

ফেরার পথে এখানে আসবেন তো? সীমার গলায় উৎকণ্ঠার সুর।

বললাম, ফিরে আসা আর হবে না সীমা।

কথাটা শুনে ও কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

বললাম, দাদার হাতে বেশি ছুটি নেই। উনি দেরাদুন যাবার আগে পিন্টুকে একবার দেখে যেতে চান। তাই ইচ্ছে না থাকলেও কার্শিয়াংকে ছেড়ে যেতে হবে।

সীমা আর কোন কথা বলল না। শুধু মুখটা নামিয়ে নিল। পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ডুবে গেল।

সীমাকে ডাওহিলের পথে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে ফিরে এলাম।

যত তাড়াতাড়ি দার্জিলিং যাব ভাবছিলাম তা আর কিন্তু হল না। মানুষ ভাবে এক হয় ঠিক তার উল্টো।

ডাওহিলে নেমন্তন্ন খেতে সেদিন রাতে ফিরছিলাম। সন্ধ্যে থেকেই মেঘ ছিল আকাশে। হঠাৎ পাহাড়ি ঝড়। সঙ্গে নামল মুষলধারায় বৃষ্টি। সে বৃষ্টির যেন আর শেষ নেই, ভিজে গেলাম বৃষ্টিতে। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভিজে জামা-কাপড়ে প্রবল কাঁপুনি এল।

বাসায় এসে বেশ পরিবর্তন করলাম। গরম জামা-কাপড়-কম্বলে আপাতমস্তক মুড়ি দিয়ে বিছানা নিলাম। সে বিছানা ছেড়ে সহসা আর উঠতে পারলাম না। শেষ রাত্তে থেকে প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়লাম প্রবল জ্বরের ঘোরে। কখন সীমা এসেছে, ডাক্তার ডাকা হয়েছে তা আর আমার মনে নেই। সারাদিন কেটে যাবার পর সন্ধ্যের দিকে আচ্ছন্ন ভাবটা ধীরে ধীরে কেটে গেল। দেখলাম, সীমা বসে রয়েছে মাথার কাছে।

বললাম, সন্ধ্যে হল, তুমি এখানে!

সীমা আমাকে কথা বলতে মানা করে মাথার চুলের ভেতর আঙুল চালাতে লাগল।

আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ কাদের যেন গলার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। পাশের ঘরেই কথা হচ্ছিল। কানে ভেসে এল।

তুমি জান, বাবা মায়ের ইচ্ছে অঞ্জু ঠাকুরপোর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়।

অসীমাদেবীর গলা বলেই মনে হল।

সীমা কি বলল ঠিক বোঝা গেল না।

আবার অসীমাদেবী বললেন, তুমি এখানে রাত কাটালে জামাইবাবু হয়ত কিছু ভাববে না, কিন্তু কি ভাববে অঞ্জু ঠাকুরপো। সুদীপ্তাই বা কি ভাববে।

এবার সীমার গলা স্পষ্ট শোনা গেল, কিছুতেই যেতে পারব না দিদি। সারাদিন যে মানুষ জ্বরের ঘোরে পড়ে আছে তাকে কি করে একটা চাকরের হাতে ফেলে দিয়ে চলে যাওয়া যায়।

অসীমাদেবীর গলায় ঝাঁঝাল সুর, কি মনে করেছ তুমি? দু'অক্ষর পড়েছ বলেই সমাজকে অস্বীকার করবে। আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি, তুমি যাবে। মা বাবা হলে পারতে এমন মুখের ওপর না বলে দিতে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সীমা বলল, তুমি জোর করে নিয়ে যেতে চাও দিদি, তাহলে আমিও বলি, নিজের বিবেককে বলি দিয়ে আমি যেতে পারব না। তাতে অপবাদ রটে রটুক। সে কলঙ্ক বইবার মতো মনের জোর আমার আছে।

ছিঃ ছিঃ লজ্জায় মরে গেলাম আমি। আমাকে নিয়ে দু'বোনের ভালবাসার ভেতর এমন ফাটল ধরল। পরমুহূর্তেই নিজের উত্তেজনায় আবার আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

মাঝরাতে জেগে দেখি সুদীপ্তা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, সীমা বসে আছে পায়ের কাছে। আমাকে তাকাতে দেখে সীমা এসে এক দাগ ওসুধ খাইয়ে দিলে।

আবার চোখ বন্ধ করলাম। কতক্ষণ চুপচাপ ভাবতে লাগলাম আগের ঘটনা।

সীমা তাহলে যায়নি। কিন্তু সুদীপ্তা হঠাৎ এল কোথা থেকে। মিথ্যা অপবাদের হাত এড়াবার জন্যে অসীমাদেবী কি সুদীপ্তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমাকে স্থির হয়ে পড়ে থাকতে দেখে ওরা কথা বলতে আরম্ভ করল। খুব আস্তে কথা বলছিল ওরা যাতে আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত না হয়।

আমি কিন্তু ওদের প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলাম।

সুদীপ্তাই কথা আরম্ভ করল, তোকে যখন বৌদি নিতে এল তখনই আমি বুঝেছিলাম তুই আসবি না। ফিরে গিয়ে বৌদির সে কি কান্না। যখন বললাম, আমি যাচ্ছি ওর সঙ্গে থাকব, তখন কান্না থামল।

সীমা বলল, তুই বল ভাই, যে মানুষটি একেবারে একলা অসহায়ভাবে পড়ে আছে তাকে ফেলে রেখে আমি কোন প্রাণে চলে যাব।

সুদীপ্তা বলল, যখন শুনলাম তুই ফিরে আসবি না তখন তোর ওপর শ্রদ্ধায় মনটা ভরে উঠল।

হঠাৎ সীমার মুখে কোন কথা শোনা গেল না। মনে হল সীমা কাঁদছে।

আমি বেশ বুঝতে পারছি সুদীপ্তা উঠে গেল সীমার কাছে। বলল, কাঁদছিস কেন ভাই, জীবনে যা সত্য বলে ভেবেছিস, তাকে আঁকড়ে ধরেছিস, তার জন্য কান্না থাকবে কেন?

কতক্ষণে মনে হল শান্ত হয়েছে সীমা।

বললে, তুই ওই ঘরে একটু ঘুমিয়ে নে দীপা, কত রাত আর আমার সঙ্গে বসে থাকবি।

সুদীপ্তা হেসে বলল, তোরই আজ জাগার পালা তাই না রে। যে চোখ ঘুমে ঢুলে আসে সেই চোখই আবার জাদুর ছোঁয়ায় রাতের পর রাত জেগে থাকে।

অল্পক্ষণ থেমে সুদীপ্তা আবার বলল, একটা কথা জানতে বড় ইচ্ছে করছে, বলবি সীমা?

বল।

কিসের যাদুতে তুই রাত জাগার শক্তি পেলি ভাই?

সীমা চুপ করে রইল। সুদীপ্তা বলল, আমার কাছে কিছু লুকোসনি সীমা। আমি তোর মতই মেয়ে, মনের কান্না আমারও আছে।

সীমা বলল, আমাকে কত অপরাধী ভাববি তোরা দীপা, তবু যখন জানতে চাইলি তখন না বলে পারছি না। কি যে অসহ্য দুঃখে আমার দিন কাটে তা তোকে আমি কেমন করে বোঝাই। তোর দাদাকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু শ্রদ্ধা আর ভালবাসা তো এক নয় ভাই।

সুদীপ্তা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বলল, কি যে ভাল লাগছে ভাই, তোকে যেন আজ নতুন চোখে আমি দেখছি।

সীমা বলল, আমি জানি এজন্যে অনেক দুঃখ পেতে হবে, কিন্তু সে দুঃখের কাছে হার মানলে নিজের কাছে কি কৈফিয়ত দেব ভাই।

সুদীপ্তা বলল, এ বিষয়ে সুমন্তবাবুর কি মত?

কিছুক্ষণ সীমা চুপচাপ বসে রইল, তারপর বলল, আজও জানতে পারিনি ওঁর মনের খবর।

সে কি রে! সুদীপ্তার কথায় বিস্ময়ের সুর।

হাঁ ভাই, মুখোমুখি কোনদিন এ নিয়ে আমাদের কথা হয়নি।

আচ্ছা, কলেজে পড়তে পড়তেই কি ওঁকে তোর ভাল লেগেছিল?

ভাল লেগেছিল ঠিকই, কিন্তু সে ওঁর পড়ানোর ধরন আর ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যটুকু। তাছাড়া আর কিছু নয়।

তবে এভাবে নিজেকে সঁপে দিলি কি করে?

সীমা বলল, এই কার্শিয়াং-এ এসে নিজেকে কেমন হারিয়ে ফেললাম ভাই। এই পাহাড় আর মেঘের দেশে এসে মনে হল উনি অন্য মানুষ। আমার এতকালের চেনাজানা জগতটা হঠাৎ চোখের সামনে থেকে সরে গেল।

গভীর ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়েছিলাম, তবু ওদের সব কথাই শুনলাম। সীমা আমাকে ভালবাসে। অধ্যাপককে ভালাবাসা ন্যায় কি অন্যায় সে নিয়ে আজ বিচারে বসতে চাইছে না মন। তবে সীমার শেষের কথাটুকু নতুন এক ভাবনার পথ খুলে দিল। কার্শিয়াং-এর প্রকৃতি সীমার মনে ভাল লাগার রঙ লাগিয়েছে। কিন্তু যখন সরে যাবে এ প্রকৃতি চোখের ওপর থেকে, আবার যখন ফিরে আসবে পুরনো জগৎ তখন কি সীমা ধরে রাখতে পারবে তার এ রঙিন ভালবাসা। কলকাতার হাঁফধরা পরিবেশে কার্শিয়াং-এর রঙ ধীরে ধীরে হয়ত মুছে যাবে ওর মনের ওপর থেকে, তখন কি করবে ও। আজ যে শক্তি নিয়ে ও লড়বার জন্যে তৈরি হয়েছে সেদিন তার অনেকখানি হয়ত হারিয়ে ফেলবে, তখন ক্লান্ত হয়ে নিজের পরিবারের হাতে নিজেকে সঁপে দিতে ও দ্বিধা করবে না।

অসুস্থ দেহ, মনটাও সুস্থ নেই, তাই কতরকমের অসংলগ্ন চিন্তা মনের ওপর ভেসে আসতে লাগল। কিন্তু এই কার্শিয়াং-এর পরিবেশই যেন সব চিন্তার শেষে ফিরে ফিরে আসতে লাগল আমার মনের মধ্যে।

কয়েকদিন বিছানায় পড়ে থেকে শেষে একদিন সুস্থ হয়ে উঠলাম। আর থাকা যায় না। ডাওহিলে গিয়ে বিদায় নিয়ে এলাম। ইতিমধ্যে সুদীপ্তাকে নিয়ে অঞ্জনবাবু চলে গেছেন। আর নয়, আমাকেও শিবির ভাঙতে হবে।

সীমা রোজই আসে। নিয়মিত ফলের রস আর দুধ খাইয়ে যায়। ওই বস্তুগুলো আমি খেতে পারি না নিজের তাগিদে তাই ও কাজটা ও রেখেছে নিজের হাতে।

কাল দুপুরের ট্রেনেই কার্শিয়াং ছেড়ে চলে যেতে হবে দার্জিলিং। তেনাংকে বখশিস দিলাম। কিন্তু কোথায় গেল সোহেলি। আজ সারাদিনে একবারও সে আসেনি বাসায়।

সীমা আমার বিছানাপত্র গুছিয়ে দিচ্ছিল, কথাটা তাকে বললাম।

কাজের থেকে মুখ না তুলেই সীমা বলল, সোহেলি আজ ছুটি নিয়েছে।

বললাম, সে কি, তাকে যে আমার দরকার।

সীমা চুপ করে রইল দেখে বললাম, যাবে সীমা সোহেলির কোঠিতে?

সীমা গরম একটা জামা ব্যাগের মধ্যে রাখছিল। ব্যাগটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল।

সীমাকে নিয়ে নীচের রাস্তায় সোহেলির কোঠির খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম।

বিশেষ খুঁজতে হল না। ঝর্ণার ধারে ট্রেনলাইনের পাশে ও ওর কোঠিতে বসেছিল। আমরা এগিয়ে গেলাম, কিন্তু মনে হল ও আমাদের দেখতে পায়নি।

কাছে গিয়ে দেখলাম, একটা বড় পাথরের কাছে হাঁটু গেড়ে দুটি হাত জোড় করে ও বসে আছে। সামনেই ছোট্ট একটুকরো বাগান। মরশুমি ফুল ফুটেছে। চোখ দুটি বন্ধ ওর। প্রার্থনায় বাধা না দিয়ে ওখান থেকে সরে এলাম আমরা। কোঠির একপাশে বসেছিল একটি বৃদ্ধা। উল দিয়ে একমনে সোয়েটার বুনছিল। আমাদের কাছে আসতে দেখে একবার চোখ তুলে তাকাল। কি অর্থহীন সে চোখের চাহনি! কোন কথা না বলে বোনার কাজে মগ্ন হয়ে গেল। লক্ষ্য করে দেখলাম কয়েক ঘর বুনে গিয়েই আবার ও খুলে ফেলছে। আবার বুনছে আবার খুলছে। এ যেন বোনার খেলা চলেছে। পাগল নাকি!

বাবুজি! সোহেলি অবাক চোখে দেখছে আমাদের।

হ্যাঁ, এলাম তোমার কাছে। কালই চলে যাচ্ছি কিনা তাই।

ও মাথা নিচু করল, কিছু বলল না। পকেট থেকে কটা টাকা বের করে ওর হাতে দিলাম।

টাকা কি হবে বাবুজি, আমি তো আগাম মাহিনা পেয়ে গেছি।

বললাম, খুশি হয়ে দিচ্ছি, রেখে দাও।

তারপর পকেট থেকে আমার একখানা ফটো বের করে ওর হাতে দিয়ে বললাম, তুমি সেদিন ফটো চেয়েছিলে তাই নিয়ে এলাম। হেসে বললাম, দিদিমণি কাছেই রয়েছে—তার ফটো তুমিই চেয়ে নাও।

ও হাত বাড়িয়ে আমার ফটোটা নিয়ে মাথায় ঠেকাল। একটু ম্লান হাসি হেসে বলল, সেই যদি দিলে বাবুজি, আর দুদিন আগে দিলে না কেন?

সোহেলির কথাটা ঠিক ধরতে না পেরে বললাম, দিদিমনি আর আমার ফটো চেয়েছিলে, তাইতো তোমাকে এনে দিলাম। আমি চলে যাব, দিদিমণি ডাওহিলে রইল। তুমি একদিন গিয়ে ওর কাছ থেকে ফটো একখানা নিয়ে নিও।

ফটো চাওয়ার কথাটা সীমাকে বুঝিয়ে বললাম।

সোহেলিকে কেমন নিরুত্তাপ মনে হল। ও বলল, ফটো আর দরকার হবে না বাবুজি। জোসেফের সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে।

অবাক হলাম সোহেলির কথা শুনে। হেসে বললাম, বিয়ে করছ, সে তো খুব ভাল খবর, কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের ফটোর যোগটা কি আছে!

সোহেলি আমাদের ঘরের ভেতর নিয়ে গেল। ছোট ঘর কিন্তু চমৎকার সাজান। ও আমাদের

খাটের ওপর বসতে অনুরোধ করল। আমরা বসলাম। একটি টিপয়ের ওপর যীশুর মূর্তি। কাঠের দেওয়ালে অনেকগুলো ছবি টাঙানো।

সোহেলি সেই ছবিগুলোর থেকে একটি টেনে এনে আমাদের সামনে রাখল। একটি মেয়ে আর একটি পুরুষের ছবি। মেয়েটিকে সোহেলি বলেই মনে হল। বললাম, কার ছবি?

আমার আর টমাসের।

তারপর সোহেলি বলে গেল টমাসের সঙ্গে তার সম্পর্কের দীর্ঘ ঘটনা। ওরা পাহাড়ী খ্রিষ্টান। জীবনের প্রথম রঙিন এক ভোরে টমাসের সঙ্গে ওর মন দেওয়া-নেওয়া হয়েছিল। অন্ধ হয়ে গিয়েছিল ও টমাসের ভালবাসায়। কিন্তু হঠাৎ সন্দেহের মিথ্যা কীট ঢুকল টমাসের মনে। সোহেলির ওপর ভুল বুঝে ও পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল।

সোহেলি আমাদের ডেকে নিয়ে এল বাইরে। যেখানটায় ও একটু আগে প্রার্থনা করছিল, সেখান এসে দাঁড়াল। সামনের পাথরের চাঁইটা দেখিয়ে বলল, ওইখানে টমাস ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, টমাস ছিল চার্চের বাগানের মালী। ওই যে ফুলের বেড দেখছেন, ওটা ওরই হাতের তৈরি।

বললাম, ওই বৃদ্ধাটি কে?

টমাসের মা, বলল, সোহেলি, বুড়ি পাগল হয়ে গেছে ছেলের শোকে। আজ পাঁচ বছর ঘর ছেড়ে ওর সঙ্গেই রয়েছি।

বুড়ি ভাবে, ছেলে ওর কোথায় গেছে, ফিরে আসবে, তাই তার জন্যে সোয়েটার বুনছে। বুনবে কি, ওর মাথা একদম বেঠিক হয়ে গেছে বাবুজি।

বললাম, বিয়েই যদি করবে তাহলে এতদিন তুমি করলে না কেন সোহেলি?

সোহেলি ম্লান হাসি হেসে বলল, এই পাঁচ বছর ধরে নিজের সঙ্গে যুঝেছি বাবুজি। রোজ এসে এই পাথরের কাছে বলেছি, তুমি কেন আমাকে ভুল বুঝলে টমাস। দেখ, আমি আজও তোমাকে ভুলিনি।

কিন্তু পারলাম কই বাবুজি। মনের সঙ্গে যুঝে যুঝে শেষ হয়ে গেলাম। তাই তোমাদের দেখে ফটো চেয়েছিলাম। দুদিন আগে ফটোটা পেলে হয়ত মনে বল পেতাম, আরও কিছুকাল যুঝতে পারতাম।

বললাম, কবে তোমার বিয়ে সোহেলি?

কাল বাবুজি। একটু পরে ম্লান হেসে বলল, কি হবে যুঝে বাবুজি। সারাজীবন কি পারব এমন যুদ্ধ করে...

বেলা শেষ হয়ে আসছিল। সোহেলির কোঠি থেকে আমরা ওপরে উঠে এলাম। কারু মুখে কথা নেই। বড় ভারি আর বিষণ্ণ হয়ে গেল মনটা।

পরের দিন দুপুরে সীমা এল। আজ একটিও কথা বলছে না সে। গোছগাছ সব হয়ে গেছে। একখানা গাড়ি আসবে তারই অপেক্ষা। ওই গাড়ি করে নেমে যাব স্টেশন অবধি। সেখান থেকে আবার সেন্ট মেরি হিল ছুঁয়ে ঝিক ঝিক আওয়াজ তুলে দার্জিলিংয়ের পথে চলে যাবে ট্রেনখানা।

ট্যাক্সি এসে গেল। তেনাং বেডিংপত্র তুলতে লাগল তার ভেতর। দেখি সীমা বনের সেই পাইন গাছটা ধরে দূরের দিকে তাকিয়ে আছে।

কাছে গিয়ে মাথায় হাত দিলাম। ও সাড়া দিল না।

বললাম, জীবনের পাতায় কার্শিয়াং অক্ষয় হয়ে রইল সীমা।

মুখ নিচু হল ওর।

বললাম, পরিবেশ মানুষের মনের সঙ্গে বড় বঞ্চনার খেলা খেলে সীমা। আজ এই মেঘ আর পাহাড়ের দেশে পাইনের ঘন ছায়ায় যে মুখখানি দেখলে তা হয়ত চিরদিনের হয়ে রইবে না। অন্য পরিবেশে মনের অনেক পরিবর্তন হয়ে যাবে। তখন শুধু থাকবে স্মৃতি। দুঃখের মেঘলা দিনে সেই স্মৃতির ক্ষণিক আলোটুকুই গভীর সান্ত্বনা এনে দেবে মনে।

সীমা আজ আর চোখের জল ফেলল না। গাছটি ধরে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

বললাম, কলেজ খুলতে দেরি নেই, আমি চললাম। তুমি শিগগির চলে এস।

গাড়িতে নেমে গেলাম কার্শিয়াং স্টেশন অবধি। দার্জিলিংগামী ট্রেন এল। বেডিংপত্র তুলে উঠে বসলাম।

ঝিক ঝিক শব্দ তুলে গাড়ি ওপরে উঠতে লাগল। ওই তো ঝরনাটা। সোহেলির ঘর। বুড়ি বসে বসে সোয়েটার বুনছে।

তার পাশ দিয়ে গাড়ি উঠছে আরও ওপরে। একটা পাহাড় আর পাইন বনের আড়াল। তারপর সেন্ট মেরি হিলের গীর্জাটা দেখা যাচ্ছে। ঘণ্টা বাজছে। অসময়ে ঘণ্টার আওয়াজ! এখনও তো প্রার্থনার সময় হয়নি, তবে ঘণ্টা বাজছে কেন! হঠাৎ মনে পড়ল, আজ সোহেলির বিয়ে। সুখী হোক ওরা। অতীতের দুঃখ ভুলে যাক সোহেলি।

পাহাড়ের বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল আমাদের লাল রঙের বাড়িটা। ওই তো সীমা গাছটা ধরে তাকিয়ে আছে ট্রেনের দিকে। দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, হাওয়ায় উড়ছে ওর চুলগুলো।

আজ আর ও আমাকে ডাকবে না, আসুন আসুন, দেখে যান, কি সুন্দর ঝিক ঝিক শব্দ করে ট্রেনটা লুকোচুরি খেলছে।

পেরিয়ে এলাম সেন্ট মেরি হিল। সীমা চোখের আড়াল হয়ে গেল।

আচ্ছা, এর পর কলেজ ফিরে গেলে কি হবে? তখন ফুরিয়ে যাবে সব যাদুর খেলা। সেখানে আবার রেজেস্ট্রি খাতাখানা নিয়ে গম্ভীর চালে ঢুকতে হবে ক্লাশে। ওয়ান, টু, থ্রি চলতে থাকবে রোল কল। সেভেন মনে হচ্ছে প্রক্সি দিচ্ছে? নাইন, অনেক দিন পরে এলে দেখছি। সেভেনটিন রোলটার কাছে এসে নিজেই বুঝতে পারব না কখন একটুখানি থমকে দাঁড়িয়েছি। মুহূর্তে সারা কার্শিয়াং-এর ছবিখানা ভেসে উঠবে চোখের সামনে।

হঠাৎ মনে পড়বে আমি ক্লাসে রয়েছি। অমনি দ্রুত ডেকে যাব বাকি রোলগুলো।

উত্তরমেঘ
(দ্বিতীয় পর্ব)

কতদিন এখানে বসে এমনি সূর্যাস্ত দেখেছি। পেছনে বালুর পাহাড়। বাঁশ, বাদাম আর বুনো জামের জঙ্গল। কি অবাক করা বেলা-শেষের খেলা। পাতায় পাতায় শেষ সোনার লুটিয়ে পড়া। কলেজ থেকে ফিরে শত কাজের ভেতরেও একবারটি অন্তত এই বাদাম গাছটির তলায় বসে সূর্য ডোবার সমারোহটুকু দেখেছি। এ দেখা জীবনের কতকগুলি বছরের সঙ্গে গাঁথা আছে।

এ ডোবা যেন প্রতিদিনের থেকে আলাদা। আমার মনের সঙ্গে কোথায় যেন ওর একটা স্পষ্ট যোগ আছে।

চোখের ওপর ভেসে উঠছে আজকের ছবিটা। যেন শিল্পীর হাতে আঁকা করুণ মধুর একখানা ছবি।

শেষ বিদায়ের দিনে ছাত্রী অধ্যাপকেরা মিলেছে বড় হল ঘরটাতে। কতদিন কত উৎসবে আমরা সেখানে জড়ো হয়েছি। আজ আমার পালা। যদিও আরও অনেকগুলি বছর আমি কাজ করতে পারতাম, কিন্তু না. নিজেকে একান্তে এনে দেখতে চাই আমি। সমস্ত দর্শকের দেখা শেষ হয়ে গেলে অভিনেত্রী যেমন নিভৃতে দেখে নিজেকে। আমিও তেমনি দেখতে চাই নিজেকে। তাই সরে এলাম কাজের জগৎ থেকে। আমাকে ঘিরে ওদের আজ উৎসব। বিজয়ার উৎসব। চোখের জল ঝরিয়ে ওরা আজ বিদায় দিচ্ছে আমাকে। আমার এতগুলি বছরের যোগ ছিঁড়ে ফেলে চলে আসতে হচ্ছে। কি করুণ, কেমন নির্বাক আর কত নিঃশব্দ এই চলে আসা। অধ্যাপিকা সীমা মুখার্জির নামটা হারিয়ে গেল চিরদিনের মত। তবু ভরে আছে মন। ছাত্রীরা এত ভালবাসত। এত কান্না লুকিয়েছিল আমার জন্য। সত্যি, এ যেন নতুন করে আবিষ্কার করলাম নিজেকে।

মনে পড়ছে আর একদিনের কথা। সেদিন কলেজ থেকে আমাদের চলে আসার দিন। টেস্টের পর কলেজ ছেড়ে চলে আসছি। মেয়েরা সব হুড়োহুড়ি করে অধ্যাপকদের নমস্কার করছিল। এগিয়ে দিচ্ছিল অটোগ্রাফের খাতা। আমি শুধু দাঁড়িয়েছিলাম তেতলার সিঁড়ির আড়ালে। দেখছিলাম ওঁকে। হাত দু'টি জোড় করে আছেন, মেয়েরা একে একে প্রণাম করে যাচ্ছে। তারপর লিখতে শুরু করলেন ওদের খাতায়।

ভাবছেন, লিখছেন। ইচ্ছে করছিল, একটু দেখে নি। কত নিপুণ শব্দে উনি কথার মালা গাঁথছেন।

একে একে চলে গেল সবাই। উনি চুপচাপ বসে রইলেন। আমি জানি এটি তাঁর অফ পিরিয়ড। চুপচুপ বসে থাকেন এসময়! কখনও বা একখানা বই-এর পাতা ওল্টান। এই পিরিয়ডে ফিলজফির ক্লাস। তাই আমারও ছুটি। মাঝে মাঝে এসময় ওঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম। খাতা এগিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে দেখে দিতেন। আমি দেখতাম, পাশে পড়ে থাকা বইগুলো। জাপানি ছবির বই বেশির ভাগ দিন দেখেছি। উল্টে পাল্টে দেখতাম। কত বিচিত্র ডিজাইন। উনি বইখানা টেনে নিতে গিয়ে হেসে বলতেন,

'পড়ার সময় খেলিতে চায়
সেজন কখনো বিদ্যা না পায়'

তারপর একে একে শুধরে দিতেন আমার ভুলগুলো। বিচিত্র সব মন্তব্য যোগ করে দিতেন।

মেয়েরা প্রণাম করে চলে গেলে তেতলার আড়াল থেকে বেরিয়ে পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ালাম ওঁর কাছে। আজ আর আগের মত বাড়িয়ে দিলাম না আমার প্রশ্নোত্তরের খাতাখানা। সাদা অটোগ্রাফের প্যাডটি শুধু এগিয়ে দিলাম। উনি কেমন যেন শূন্যদৃষ্টিতে কতক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের ওপর। তারপর বললেন,

—বল কি করব? খাতা তো দেখছি শূন্য।

—ভরে দিন।

উনি মুখটা নিচু করে খাতার পাতায় পেন দিয়ে আঁকিবুকি কাটতে লাগলেন। একটি অশ্বত্থ পাতা তৈরি হল। তার ভেতর লিখলেন,

যে অশ্বত্থ ছায়া দেয়
সে অশ্বত্থ হোক তব প্রাণ,
জীবনের ক্লান্ত পথচারী
পায় যেন ছায়ার সন্ধান।

কবিতাটিতে চোখ বুলিয়ে কেন কি জানি, চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এল। উনি খাতাটি আমার হাতে তুলে দিয়ে তাকালেন। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আত্মগোপনের চেষ্টা করলাম। পায়ে এসে পড়ল দু'ফোটা জল। নিজের দুর্বলতায় নিজেই লজ্জিত হলাম। আঁচলটা টেনে চোখ মুছে তাকালাম ওঁর দিকে।

মুখের ভাবটা ঠিক বোঝা গেল না। ততক্ষণের ওঁর মুখ ঢাকা পড়েছে একটা ম্যাগাজিনের বড় বড় দুটো পাতার আড়ালে।

কিছু একটা বলা দরকার। তাই বললাম, আশীর্বাদ করুন যেন পাশ করতে পারি।

কথাটা বললাম, কিন্তু নিজের কাছেই কেমন যেন বেসুরো বাজল। এত সাধারণ একটা প্রার্থনা করব তা একেবারেই ভাবিনি।

উনি এবার আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, শুভ কামনা তোমার জন্য চিরদিনই থাকবে।

মনে হল, কেন এমন করে বলতে গেলাম। তুচ্ছ একটা পাশ ফেলের জন্য ওঁর আশীর্বাদ চাইলাম। কত কিছু চাওয়ার ছিল ওঁর কাছে।

সত্যি আমরা আসলে যা চাই তা বলতে পারি না কোন দিন, যা কখনও চাই না তাই হঠাৎ করে চেয়ে বসি।

চলে আসব তাই প্রণাম কবলাম।

উঠে দাঁড়ালেন। হাত রাখলেন আমার মাথায়। বললেন, জীবনে জয়ী হও।

মনে মনে বললাম, যে যন্ত্রণা আমার বুক জুড়ে, তার ওপর জয়ী হব কেমন করে।

মুখে তুললাম অন্য প্রসঙ্গ। আজ তো সকাল দুপুর সমানে আপনার ক্লাশ। খাবেন কোথায় শুনি?

হেসে বললেন, জীব আর আধার দুটোই নাকি বিধাতার দান। তাই সব ভাবনা ওই একটি লোকের ওপর ছেড়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত আছি।

কথাগুলো উনি কৌতুকের ছলে বলে গেলেন। কিন্তু আমি জানি অনেক দূরে ওঁর বাড়ি। সকাল দুপুর দু'বেলা ক্লাশ করার ফাঁকে যে বিরতিটুকু পান, তাতে এত দূরে গিয়ে স্নান খাওয়া সেরে আবার ফিরে আসা যায় না। তা ছাড়া হোটেল রেস্টুরেন্টে খাওয়াও ওঁর পছন্দ নয়। এ অবস্থায় যা হবার তাই হয়। সারা দিন প্রায় অভুক্ত থেকে সন্ধ্যায় ফিরে গিয়ে যাহোক কিছু খেতে পান।

বললাম, বাড়িটাকে একেবারে তেপান্তরে না রেখে একটু কাছে পিঠে আনলেও তো পারতেন।

ওঁর মুখে আবার ফুটল হাসির রেখা। বললেন, পারতাম হয়ত কোনদিন কিন্তু আজ আর নয়।

কেন নয়?

বললেন, তাহলে যে আমায় সবকিছু নিয়ে আসতে হয়।

বললাম, তাই আনবেন।

অমনি হেসে বললেন, আনতে চাইলেই কি সব কিছু আনা যায়?

তারপর নিজের কথায় নিজেই কেমন যেন সঙ্কুচিত হলেন। কিছুক্ষণ থেমে বললেন, গাছপালা করেছি নিজের হাতে। শরতে শিউলি ফোটে, বর্ষায় গন্ধরাজ আর জুঁই। ঠিক শোবার ঘরের জানালার পাশেই। টুপটাপ বৃষ্টি পড়ে আর জুঁগুলো ঝরে ঝরে পড়ে। গন্ধরাজের গন্ধ আসে। শরতের আলো আঁচল লুটায়, সে আঁচলে শিউলি ঝরে। এদের ফেলে কোথায় নতুন ঘর বাঁধব সীমা?

মাথা আমার নত হল।

উনি বললেন, সুন্দরকে ভালবাসলে এমনি কিছু কষ্ট দুঃখ সয়ে নিতে হয়।

বললাম, আপনার ঘরে যেতে পারিনি, সে আমার অক্ষমতা। গেলে হয়ত আপনাকে নতুন বাসার কথা বলতাম না।

উনি বললেন, পরীক্ষা শেষ হলে একদিন দেখা করে যেও।

বললাম, এখানে নয়, একেবারে আপনার বাড়িতে যাব।

পারবে যেতে?

ঠিকানা আমার কাছে রয়েছে।

সবসময় ঠিকানা ঠিক করে সব জায়গায় কি যাওয়া যায়?

কৌতুক করে বললাম, একদিন পাহাড়ে ঠিকানা হারিয়েও তো ঠিক জায়গায় পৌঁছেছিলাম।

উনিও হেসে ফেললেন। তারপর কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি সীমা, কিন্তু কেন জানি না কার্শিয়াং আমার স্মৃতিতে অপরূপ হয়ে আছে।

সে আপনার মনের গুণ।

কেন, তোমার ভাল লাগেনি?

কি উত্তর দেব এ কথার। আমার সমস্ত কল্পনাকে যদি কোন রূপ দেওয়া যায় তাহলে তার সঙ্গে কার্শিয়াং-এর তুলনা মেলে। কতদিন এই কার্শিয়াংকে ভুলতে চেয়েছি, কত নতুন কথা আর কাজের বোঝা চাপাতে চেয়েছি তার ওপর, তবু ভুলতে পারলাম কই। আজ চলে যাবার দিনে কেন এমন করে কার্শিয়াং-এর কথা এল।

বললাম, ভুলতে পারব না কোন দিন কার্শিয়াংকে।

আবার যেতে ইচ্ছে করে না?

কান্নায় ভেঙে পড়তে চাইল সমস্ত মন।

কোন কথা বলতে পারলাম না। কেন জানি না উদ্‌গত চোখের জলকে রোধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নামছি, গোপার সঙ্গে দেখা। ও উঠে আসছিল। আমার অবস্থা দেখে থমকে দাঁড়াল।

কোথা যাচ্ছিস সীমা?

তখন কথা বলার মতো ক্ষমতাই হারিয়েছি। কিছু বলতে না পেরে ইঙ্গিতে নীচের দিকে দেখিয়ে দিলাম। ও আর ওপরে উঠল না। আমার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে এল। সামনেই কমনরুম। ও আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল কমনরুমের পাশে ইউনিয়ন রুমে। আমাকে সেখানে থাকতে ইঙ্গিত করে গোপা বলল, বোস এখানে, আসছি এখুনি।

ও চলে গেল। কমনরুম শূন্য, একটিও মেয়ে নেই। সেই নির্জন ঘরে বসে কতক্ষণ কাঁদলাম। জল ঝরিয়ে মেঘ যেমন হালকা হয়, কেঁদে কেঁদে মনটাও ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল।

ফিরে এল গোপা। হাতে এক ঠোঙা আলুর চপ।

কিরে, মেঘ কেটে গেল?

বললাম, কিসের মেঘ!

এই আষাঢ়ের।

হেসে ফেললাম। বললাম, আষাঢ়ে সবে মেঘের শুরু আশ্বিনের আগে কাটবে কি করে?

গোপা গম্ভীর হয়ে স্বগতোক্তি করল, সিরিয়াসলি ইল। নে একটা চপ খা।

খেতে ইচ্ছে করছে না ভাই।

চোপ, ধমক দিয়ে গোপা একটা চপ আমার মুখে পুরে দিল। তারপর বলল, বিনোদিনীর চপ কিনে খেতে ভারি বয়েই গেছে। কিন্তু কি জানিস ভাই, চলে যাচ্ছি, তাই শেষ দিনটা না নিয়ে পারলাম না।

বিনোদিনী বলে একটি মেয়ে আমাদের ক্যান্টিনে চপ ভেজে দিত। তার সেই চপ নিয়ে গোপার সঙ্গে রোজ হত বচসা। কোনদিন নুন বেশি, কোনদিন বা লঙ্কাকাণ্ড।

একটা গান গাইবি? চপ খেতে খেতে গোপা বলল।

তারপর আমাকে কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বলল, বেশ বানিয়েছে আজ চপগুলো, না রে?

মাথা নেড়ে সায় দিলাম ওর কথায়। গানের কথা তুলেই কিন্তু ও ভুলে গেছে সে কথা।

বলল, হাঁরে সীমা, তুই অমন করে কাঁদছিলি কেন?

হেসে বললাম, কই!

গোপা গম্ভীর হয়ে বলল, এখুনি রোদ ঝিলিক দিচ্ছে বলে তার আগে বৃষ্টি হয়নি, একথা ভগবান বললেও বিশ্বাস করি না।

কাঁদছিলাম ঠিক, কিন্তু কান্নার কারণটা বলতে পারব না।

গোপা বলল, তাতে দর্শনের ছাত্রীর বুঝতে কোন অসুবিধে হবে না।

গোপা বলে চলল, কান্নার জাত দুটো। এক দৈহিক আর একটা মানসিক। দাঁতের ব্যথায় কান্না কিংবা চোখে ধোঁয়া লেগে কান্নাটা স্রেফ দৈহিক আর 'মন কেমন করা' হল মানসিক কান্না। প্রথমটা যে তোমার নয়, তা আমি হলফ করে বলতে পারি। অতএব বাকি পড়ে রইল যা তুমি এখন তারই বশ।

বললাম, তবে তাই।

গোপা বলল, আমারও ভাই মনটা আজ ভাল নেই।

কৌতুক করে বললাম, তোর আবার কি ঘটল। বন্ধুর জন্যে সিমপ্যাথেটিক 'মন কেমন করা' নাকি রে?

গোপা বলল, না ভাই, বিনোদিনীর জন্যে মনটা কেমন করছে। একটু থেমে বলল, জানিস, এখুনি চপ কিনতে গিয়েছিলাম, বিনোদিনী কিছুতেই দাম নেবে না। বলে কি, তুমি চলে যাচ্ছ দিদিমণি, কে আর রোজ আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে।

বলতে বলতে চোখে জল এসে গেল বিনোদিনীর। ওর জন্যে সত্যি মনটা কেমন হয়ে গেল সীমা।

একি, ছেড়ে যাচ্ছি বলে কান্না? আজ চারটি বছর ধরে যাদের মাঝে জড়িয়ে রইলাম, তাদের এমনি করে চিরদিনের মতো ছেড়ে যেতে মনটা কেঁদে উঠছে।

এই বিশাল বাড়ির প্রতিটি ঘর, প্রতিটি কোণ আমার কত আপনার। কত মুহূর্তের কত হাসি কান্নার সাক্ষী হয়ে আছে ওরা। ওই যে দরজা, ঘণ্টা পড়ার পর দুটি চোখ পেতে রেখেছি অধীর আগ্রহে। প্রতিটি মুহূর্ত মনে হয়েছে কত যুগ পার হয়ে গেল। উনি এসেছেন। গভীর আনন্দে আমার প্রতীক্ষার শেষ হয়েছে। নত হয়েছে আমার দু'টি চোখ আনন্দের ভারে। আমি চলে যাচ্ছি, আর আসব না কোনদিন। আর তেমন করে ওই দরজার ওপর কে মেলে রাখবে এমন উৎসুক চাহনি।

হয়ত কেউ আসবে ; হয়ত এমনি উন্মুখ হয়ে রইবে সে, কিন্তু আমি আর রইব না।

আচ্ছা আমি চলে যাবার পরে কেউ যদি আমার মতো করে প্রতীক্ষা করে, তার ওপর কি ঈর্ষা হবে আমার।

না, কোন ক্ষোভই থাকবে না তার ওপর। সে হবে আমারই উত্তরাধিকারী। আমার মতো সেও কাঁদবে। সেও ফেলবে তার ভাল লাগার মানুষটির জন্য দীর্ঘশ্বাস।

সেদিন চলে এলাম কলেজ থেকে। পেছনে ফেলে এলাম আমার মন, যে মনটা টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে রইল কলেজের প্রতিটি ঘরের আনাচে কানাচে।

বাংলা অনার্সের প্রথম পরীক্ষার দিনটিতে ওঁকে ডেকে পাঠালাম। ফার্স্ট ইয়ারের একটি মেয়ের হাতে চিঠি লিখে দিয়েছিলাম। মেয়েটি প্রতিবেশিনী।

পরীক্ষার হলে ঢোকার আগে পথের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইলাম, কিন্তু তাঁর দেখা পাওয়া গেল না। মনটা বড় দমে গেল। তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে ঢুকব বলে মনে কেমন একটা লোভ ছিল। সে ইচ্ছে মিটল না।

পরীক্ষা শেষে হল থেকে বেরিয়ে আসার সময় কে যেন আমার নাম ধরে ডাকলেন। দেখি, সিনেটের সিঁড়ির এক পাশে উনি দাঁড়িয়ে আছেন। গেলাম ওঁর কাছে। প্রণাম করে বললাম, সকালে এলেন না যে?

হাতের চিঠিটা দেখিয়ে বললেন, কয়েক হাত ঘুরে এসেছে, তাই গোলমাল হয়ে গেছে। নইলে হলে ঢোকবার আগেই আসতাম। সে কথা থাক, এখন কেমন পরীক্ষা দিলে বল?

কোশ্চেনটা ওঁর হাতে তুলে দিয়ে বললাম, বিশেষ ভাল না ; অবশ্য প্রশ্নগুলো না পারার মতো ছিল না।

উনি বললেন, তবে?

কি জানি, কেমন যেন হয়ে গেল।

হেসে বললেন, এমন যেন না হয়। তারপর গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, কত আশা তোমার ওপর সীমা। উদ্বিগ্ন না হয়ে পরীক্ষাগুলো দিয়ে দাও। আমার শুভেচ্ছা রইল।

বললাম, পরীক্ষার কদিন রোজ আপনাকে কিন্তু আসতে হবে। বললেন, আসব, কিন্তু তার আগে কথা দাও, শান্ত মন নিয়ে প্রতিটি পরীক্ষা দেবে।

মাথা নাড়লাম।

উনি খুশি হলেন। পকেট থেকে এক প্যাকেট মিষ্টি বের করে হাতে দিলেন।

মিষ্টির প্যাকেট হাতে নিয়ে বললাম, খাবার আনলেন কেন, ফার্স্টহাফের পর দিদি আমাকে খাইয়ে গেছে।

উনি কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। খাবারের প্যাকেটটা দেবার সময় ওঁর সঙ্কোচ লক্ষ্য করছিলাম।

তাড়াতাড়ি বললাম, আপনি দিয়েছেন, আমি বাড়ি নিয়ে গিয়ে খাব।

কথা শুনে ওঁর যেন সঙ্কোচের সীমা নেই।

বললেন, ছি ছি সামান্য মিষ্টি, অর্ণববাবু কিংবা তোমার দিদি দেখলে কি মনে করবেন। তার চেয়ে ফেরার পথে কলেজ স্কোয়ারে বসে খেয়ে নিও।

হেসে বললাম, এ মিষ্টির ভাগ আমি আর কাউকে দেব না।

উনিও হাসলেন।

সেদিন বাড়িতে ফিরলাম। মনে গভীর শান্তি।

বাড়ি ফিরতেই জামাইবাবু বললেন, কেমন পরীক্ষা দিলে?

তেমন কিছু নয়।

মুখ দেখে তো তা মনে হচ্ছে না।

মনে মন বললাম, কেমন করে বোঝাব আপনাদের, যার ছোঁয়ায় ধুলো সোনা হয়ে যায়, সে ছোঁয়া আমি পেয়েছি। হেসে বললাম, মুখ দেখে সব সময় সব কিছু কি বোঝা যায়?

জামাইবাবু আমার হাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, হাতে কি?

মিষ্টির প্যাকেটটা লুকোবার চেষ্টা করেও পারিনি। ধরা পড়ে গিয়ে বললাম, আসার পথে এনেছি।

সে কি রকম! জামাইবাবু অবাক হয়ে বললেন, সীমাদেবীকে কোনদিন মিষ্টির প্রতি অনুরাগিণী দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।

বললাম, মানুষের রুচি পাল্টাতে কতক্ষণ।

জামাইবাবু মাথা নেড়ে বললেন, যথার্থ, আজ যা বররুচি, কাল তা গররুচি।

তার মানে?

মানে খুবই সোজা। এই ধর, তোমার দিদির কাছে আগে ছিলাম বররুচি এখন হয়েছি তার ঠিক উল্টোটি ; অর্থাৎ গররুচি।

বললাম, ডাকি দিদিকে, কথাটা তার সামনেই হোক।

রান্না ঘরে তোমার অগ্রজার কিঙ্কিনী শুনতে পাচ্ছি, এর পর আর ঝঙ্কার শুনিও না। এখন বরং দিদিকে পরীক্ষার সমাচারটা দিয়ে এসো।

চলে গেলাম ভেতরে। পরীক্ষা মনোমত হয়নি, তার জন্য যেন কোন দুঃখ নেই, আগামী কালের দুশ্চিন্তা, তাও যেন কোথাও উধাও হয়ে গেছে।

যে কদিন পরীক্ষা চলল, রোজ একবার করে এলেন উনি। শেষ দিন বললেন, আজ ত তুমি একেবারে ভারমুক্ত হলে

কোন জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে মনে বললাম, যে গুরুভার বয়ে চলেছি তার থেকে মুক্তি পাব কি করে।

উনি বললেন, আজ নিশ্চয়ই সিনেমা দেখার অথবা কোথাও যাবার প্রোগ্রাম করে রেখেছ?

কই না তো!

কি ভেবে নিয়ে ঘড়ি দেখে বললেন, এখন সোয়া চার, পাঁচটার ভেতরে বাড়ি ফিরলে কোন অসুবিধে হবে কি?

তাঁর দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে জানালাম, কোন অসুবিধেই হবে না। বললেন, একটু বেড়িয়ে আসবে গঙ্গার ধার থেকে?

ওঁর দিকে দু'চোখ ভরে তাকালাম। পরক্ষণেই মাথা নিচু হল। এক অদ্ভুত রোমাঞ্চে ভরে গেল সারা মন।

আমাকে নিরুত্তর দেখে উনি ভুল বুঝলেন।

থাক্ থাক্, সামান্য অসুবিধে থাকলে গিয়ে কাজ নেই।

এবারও কথা বলতে পারলাম না। মাথা নেড়ে আমার গভীর ইচ্ছে জানালাম।

ট্রাম থেকে নেমে উনি আমাকে একটু দাঁড়াতে বলে কোথায় চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলেন। হাতে এক ঠোঙা খাবার। বললেন, পথ চলতে মন্দ লাগবে না।

চললাম গভর্ণরস্ প্লেস ডাইনে রেখে, ইডেন গার্ডেনের দিকে। কখনো উনি আগে, কখনো বা পাশাপাশি। ইডেনের গা ঘেঁষে চলতে চলতে বললেন, নোনতা খেতে নিশ্চয়ই তোমার আপত্তি থাকার কথা নয়।

দুটো আলাদা ঠোঙায় খাবার এনেছিলেন, একটি আমার হাতে দিলেন। খেতে খেতে চললাম গঙ্গার দিকে। ফোর্ট লক্ষ্য করেই হাটতে লাগলাম। এক জায়গায় থেমে বললেন, একটু পরেই জলের দরকার হবে। আর এগুলে জল পাওয়া যাবে না। এসো, লেমনেডে জলের কাজটা সেরে নিই।

পথের পাশে দোকান থেকে লেমনেড কিনলেন। খাওয়া শেষ করে আবার হাঁটতে লাগলাম। এবার পাশাপাশি। মনে হল, এমনি যদি পাশাপাশি চলতে পারতাম সময়ের সীমা পেরিয়ে। কি আশ্চর্য রোমাঞ্চেভরা এই পথচলা।

আমার দিকে ফিরে উনি এক সময় বললেন, গঙ্গার ধারে বসার চেয়ে ফোর্টের কাছে এই সবুজ লনটাতে বসা অনেক ভাল, কি বল?

বললাম, খুব সুন্দর জায়গাটা।

উনি বসলেন, আমি সংকোচে একটু দূরে সরে বসলাম।

কেমন অবাক হয়ে উনি আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বুঝলাম, ওঁর কাছাকাছি না বসাতে উনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। কিন্তু মুখ ফুটে আমাকে কাছে ডাকতে পারলেন না। আর আমারও তখন নতুন করে সংশোধনের উপায় রইল না।

আমরা এবার তাকালাম গঙ্গার দিকে। দুটি জাহাজ নোঙর করে আছে। ছোট ছোট নৌকো জল কেটে কেটে চলেছে। গঙ্গার থেকে উনি চোখ ফেরালেন। চোখাচোখি হতেই বললেন, কলেজ থেকে চলে আসার দিন এমন করে চলে এলে যে?

মাথা নিচু করলাম।

বললেন, এতদিন কথাটা জিজ্ঞেস করার সুযোগ পাইনি, আজ কিন্তু জবাব দিতে হবে।

মুখ তুললাম। সেই মুহূর্তে মনে হল আমার কোন সংকোচ নেই। আমি আজ কথা বলব। এতদিনের রুদ্ধ মনটা হঠাৎ মুক্তির জন্যে আকুল হয়ে উঠল।

বললাম, সেদিন কেন তুললেন কার্শিয়াং-এ যাবার কথা। কি অপরাধ করেছিলাম আপনার কাছে।

উনি বিব্রত হয়ে বললেন, অপরাধের কথা কেন সীমা। অপরাধ যদি হয়ে থাকে তাহলে সে আমারই।

মুখ নিচু করে উদ্‌গত অশ্রু রোধ করে বললাম, পাওয়ার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল আমার চাওয়া, তাই সে অপরাধের শাস্তি আমি পেয়েছি।

বললেন, তোমাকে দুঃখ দিতে গিয়ে তার আঘাত আমার কাছেও ফিরে এসেছে সীমা।

গঙ্গার বুকে জাহাজ থেকে বাঁশির একটা আর্ত আওয়াজ ভেসে এল। আমরা সেদিকে তাকালাম।

এবার উনি কথান্তরে গেলেন, দুদিনের নোঙর, তারপর নোঙর উঠবে, পাড়ি দেবে সাগরে তবু আজকের এই গঙ্গার বুকে ওর ক্ষণিক থাকাটুকু কত সত্য। তাই না সীমা?

আমার দিকে উনি জিজ্ঞাসু চোখ দুটি মেলে ধরলেন।

বললাম, ও যখন নোঙর তুলে চলে যাবে তখন গঙ্গার বুক জুড়ে শুরু হবে তোলপাড়।

উনি বললেন, তবু চলে যেতে হয়।

বললাম, কিন্তু সারা মন বলে, 'যেতে নাহি দিব।'

সীমা!

মাথা নিচু করলাম। সমস্ত দেহ আমার রোমঞ্চিত হল। উনি ডাক দিলেন। মনে হল এই অস্পষ্ট মধুর ডাকটুকু গঙ্গার কোন জলতরঙ্গে জন্ম নিয়ে আজ এই মগ্ন-মুহূর্তে আমার কানে এসে পৌঁছল।

আবেগ-কম্পিত মনটাকে উনি ততক্ষণে সংযত করেছেন। এবার সহজ গলায় বললেন, হয়ত আর কোনদিন তোমার গান শুনতে পাব না, তাই আজ চলে যাবার আগে একটা গান শুনিয়ে যাও।

এমন করে বললে গলায় কি করে গান আসবে বলুন?

ম্লান হেসে বললেন, আচ্ছা, ফিরিয়ে নিচ্ছি আমার কথা, এখন গাইতে পার।

একটু থেমে বললাম, বলুন কি গাইব?

আজ আমি কিন্তু আমার ইচ্ছের কথা জানাব না। তোমার ইচ্ছেই আজ আমার হোক্।

মনে আমার সহস্র মৌমাছি গুঞ্জন করে উঠল। আনন্দে কান্নায় মন কাঁপতে লাগল প্রথম বসন্তের ছোঁয়ার মতো।

গাইলাম।

'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ
সুরের বাঁধনে
তুমি জান নাই, আমি পেয়েছি তোমারে
অজানা সাধনে।'

ধীরে ধীরে গাইলাম। এমন করে বোধ হয় জীবনে কোনদিন গাইনি। সুর ঝরছিল, আমার মনের গোপন কামনা বাসনা এই সুরের পাখায় ভর করে ঝরে ঝরে পড়ছিল।

গান শেষ হলে উনি হঠাৎ বললেন, তোমার একটি গানের লোভেই আমি আজ তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি সীমা।

আর কোন কথা নেই। কতক্ষণ বসে রইলাম দুজনে। যাবার সময় হয়ে এল। গঙ্গার জলে বিদায়ী আলোটুকুর শেষ ঝিলিমিলি।

উনি বললেন, কতবার ভেবেছি তোমাকে কিছু দেব, কিন্তু দিতে পারিনি কখনো ; আজ যদি সামান্য কিছু দিই তাহলে নেবে কি?

কি উত্তর দেব এর। কাঙালের মতো তাকালাম।

উনি পকেট থেকে আইভরির চমৎকার একটি কৌটো বের করে বললেন, বিয়ের ঠিক পরেই বাবা গিয়েছিলেন আগ্রা। সেখান থেকে মায়ের জন্যে এনেছিলেন এই উপহারটি। মাকে দেওয়া বাবার প্রথম উপহার। এটি উত্তরাধিকার সূত্রে আমার হাতে এসেছে। একটু থেমে বললেন, কিছু যদি মনে না কর তাহলে এটি তোমার হাতে তুলে দিতে চাই।

দুটি হাত বাড়িয়ে কৌটোটি নিয়ে মাথায় ঠেকালাম।

উনি বললেন, এর ভেতর চন্দনের চূর্ণ আর একটুকরো চিঠি আছে। বাড়ি ফিরে দেখো।

আবার ফিরে চলেছি। সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে। চৌরঙ্গীর প্রাসাদগুলোর লাল নীল হলুদ আলোর সমারোহ। মনে হল, এ যেন কোন বাঞ্ছিত উৎসবের রাত্রির আলোক-সজ্জা।

এসে পড়লাম এসপ্ল্যানেডে।

উনি বললেন, সন্ধ্যে হয়ে গেছে। তোমার দিদি হয়ত ভাবছেন। এবার ঘরে ফিরতে হবে সীমা।

মন আর্তনাদ করে উঠল। আমাকে ফিরিয়ে দিওনা, নিয়ে চল তোমার সঙ্গে, তোমার ঘরে। এক কোণে সামান্য একটু ঠাঁই কি হবে না আমার। এর চেয়ে বেশি কামনার ধন আমার ইহ জগতে নেই।

শুধু তাকিয়ে রইলাম ওঁর মুখের দিকে, একটি কথাও বলতে পারলাম না। বাস এসে গেল। প্রণাম করে উঠে এলাম। আর একবারও ওঁর দিকে তাকাতে পারলাম না। চৌরঙ্গীর জনারণ্যে হয়ত কোথাও উনি মিশে গেলেন।

বাসায় ফিরে স্নানের ঘরে ঢুকলাম। স্নান সেরে পরলাম একটা নতুন শাড়ি। জন্মদিনে মা পাঠিয়েছিলেন কটক থেকে। তারপর পড়ার ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে ধূপ জ্বাললাম। আইভরি কৌটোটা খুলে চিঠিখানা তুলে নিলাম। কপালে ছোঁয়ালাম চন্দনের রেণু। চিঠিখানা মেলে ধরলাম চোখের সামনে।

কল্যাণী,

জীবনে তোমার কাছে অতিরিক্ত যা পেলাম তা তোলা রইল অক্ষয় ভাণ্ডারে। আমি দিয়েছি যা, নিয়েছি তার বেশি। ঋণী রইলাম চিরদিন। এখানে গ্লানি নেই, শুধু গৌরব।

চির শুভার্থী

চিঠিখানা বার বার পড়লাম। এক সময় ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিলাম। অন্ধকার ঘরে শুধু ধূপের কাঠিটা জ্বলতে লাগল। কপালে চন্দনের কৌটোটা ছুঁইয়ে মনে মনে বললাম, তোমাকে ঋণী করে রাখব এমন ঐশ্বর্য আমার নেই। তুমি যে গৌরব আমায় দিলে তার ভার আমি বইব কেমন করে। এ দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে কোন দিন কি আমার মুক্তি হবে না।

পরীক্ষার ফল বেরুল। আশাতিরিক্ত না হলেও ফল মন্দ হয়নি। রেজাল্ট জানিয়ে ওঁর বাসার ঠিকানায় চিঠি লিখে আশীর্বাদ চাইলাম। ফেরৎ ডাকেই উত্তর এল।

আরও আশা করে রইলাম সীমা। এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা বাকি। জয়ী হবে তুমি, এই গভীর বিশ্বাস নিয়ে দিন গুনছি।

শেষে লিখেছেন, তোমার জীবনে ঈশ্বরের সবচেয়ে বড়ো আর্শীবাদ সঙ্গীত, সেকথা ভুলে যেওনা।

চিঠি পাওয়ার পর পড়ার ঘরে বসে আপন মনে ওঁর প্রিয় রবীন্দ্রনাথ আর অতুল প্রসাদের গানগুলি গাইলাম।

মনে মনে ভাবলাম, উনি বসে আছেন আমার পাশে। মগ্ন হয়ে শুনছেন আমার গান।

এর কয়েকদিন পরের কথা। জামাইবাবু একদিন ড্রইংরুমে ডাক পাঠালেন। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন, সীমা দেবী, পরীক্ষা পাশের পর এমন অবহেলা করবে জানলে পরীক্ষা দেবার ব্যাপারে এতখানি অন্তত উৎসাহ দেখাতাম না।

কি হল আবার? এমন কি গলদ করে বসলাম!

গলদ নয় বিদুষী, গল্‌দা। আই মিন, গল্‌দা চিংড়ি। পরীক্ষার আগের প্রতিশ্রুতির কথাটা কি ফল প্রাপ্তির পর সকলেই ভুলে যায়?

মনে পড়ল কথাটা। পরীক্ষার ফল মনোমত হলে চিংড়ির মালাইকারী খাওয়াব বলেছিলাম।

বললাম, কসুর হয়েছে, এখন আদেশ করুন গল্‌দা আনাই।

এত সহজে ছাড়া পাবে ভেবো না। ভুলের মাসুল চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়েছে।

বললাম, অতএব।

অতএব, একঝুড়ি গল্‌দা আনা হোক্, নিমন্ত্রিত হোক বহুবচন।

বহুবচন কারা জানতে পারি কি?

জামাইবাবু বললেন, নিয়ে এসো খাতা আর পেন, তৈরি হোক নামের তালিকা।

তালিকা রচনা চলল।

একে একে পরিচিত নামগুলি মনে করে জামাইবাবু বলতে লাগলেন, আর আমি লিখে যেতে লাগলাম।

তাইতো বটে, অঞ্জনের নামটা বাদ পড়ে যাচ্ছিল, কি মুশকিল, একটু মনে করিয়ে দিতে হয়।

সকৌতুকে তাকালেন আমার দিকে।

বটুকবাবু বেশ ভোজন রসিক, বিশেষ করে তোমার দিদির হাতের রান্নার প্রতি তাঁর একটা দুর্বলতা আছে অতএব লেখ তাঁর নাম।

এমনি অনেক নামই উনি বলে গেলেন। কিন্তু একটি নাম ওঁর মনে এল না, আর আমি বার বার বলি বলি করেও বলতে পারলাম না।

লেখা শেষ হলে নামের লিস্টটা ওঁর দিকে এগিয়ে দিলাম।

উনি খানিক সময় তার ওপর চোখ বুলিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিলেন। কতক্ষণ পরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এমন একটা নাম লিস্ট থেকে বাদ গেছে যা তোমার মনে আনা উচিত ছিল। কথাটা বলে জামাইবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি আকাশ পাতাল ভাবনার ভান করলাম। মনে মনে বললাম, এবার খোঁজ পড়েছে আসল মানুষের। কিন্তু আমি কেন বলতে যাব তাঁর নাম।

বললাম, ভেবে কূল পাচ্ছি না, কেন মিথ্যে ভাবিয়ে মারছেন।

যাঁর দৌলতে পরীক্ষার পাথারে কূল পেলে, তাঁকেই ভুলে বসলে!

এতক্ষণে যেন সত্যিই হদিস পাওয়া গেল। খুঁজে খুঁজে মিলল হারান মানুষের নিশানা।

টেবিল থেকে লিস্টটা তুলে লিখলাম, সুমন্ত সেন।

নেমন্তন্নটা তুমি করবে, না এ অধমকে যেতে হবে?

আপনার অভিরুচি।

তোমার করাই ভাল, যেহেতু আয়োজনটা তোমার তরফের।

বেশ তাই হবে।

জামাই বাবু বললেন, কলেজে ইতিমধ্যে একদিন চলে যেও। কাজের অজুহাত দেখালে কোন কথা শুনবে না।

বললাম, যথা আজ্ঞা।

মনের খুশি মনে চেপে রেখে দুএকটা দিন কাটিয়ে দিলাম। তারপর একদিন নেমন্তন্ন করাব নাম করে কাউকে না জানিয়ে একেবারে এসে উঠলাম ওঁর বাড়ি। বিশেষ খোঁজাখুঁজি করতে হল না। উনি এক সময় ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ওঁর বাড়ির নিশানা। প্রথম দেখায় কি যে ভাল লাগল চারদিকের খোলা মেলা পরিবেশটুকু! কলকাতার কাছে পিঠে যে এমন জায়গা থাকতে পারে এ যেন কল্পনায় আনা যায় না! বাড়ির সামনেই দিগন্ত খোলা মাঠ। মাঠের এখানে ওখানে রূপোর পাতের মতো জল চিকচিক করছে। সবুজ সবুজ। যতদূর চোখ যায় কোন বাধা নেই। মাঠের শেষে আকাশ এসে মিশেছে। টুকরো টুকরো মেঘ সারা আকাশ ছড়িয়ে। আসন্ন বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, রোদে-জ্বলা দুপুরটাকে শুধু ছায়ায় স্নিগ্ধ করে রেখেছে।

বাড়ির নাম 'জননী'। একটি তুষার শুভ্র ফলকে লেখা আছে। সত্যিই জননীর স্নিগ্ধতা আছে সারা বাড়ির পরিবেশে। উঠোনে নানা ধরনের ফুল আর লতা গাছ। সব কটি দিশি। গেট খুলে ঢুকলাম, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না।

আগে ওঁর যে রুটিনখানা আমার মুখস্থ ছিল, তার সময় অনুযায়ী আজ ওঁর ঘরে থাকার কথা। কিন্তু ভুল হয়েছিল আমার। রুটিনের যে পরিবর্তন হয় তা আর আমার ধারণায় ছিল না।

গেটের ভেতর ঢুকে কড়া নাড়লাম। দবজা খুলে গেল।

একটি শ্যামলী মেয়ে আমার মুখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, ভেতরে আসুন।

মুহূর্তের দেখায় এত ভাল বুঝি কাউকে লাগেনি। এমন মিষ্টি মুখের আদল ত কই চোখে পড়েনি কোন দিন। আমার চেয়ে বয়সে ছোটই হবে বলে মনে হল।

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলাম। আর এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল আমার জন্য।

তাকিয়ে দেখতে লাগলাম চারদিক। এমন শোভন পরিচ্ছন্ন ঘর সচরাচর চোখে পড়ে না।

দেয়ালে বিরাট একখানা ছবি। ক্যানভাসের ওপর অয়েলে আঁকা রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মিকী প্রতিভা'র ছবিখানা। দেখলেই মনে হয় যীশুখৃষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন। ঘরের এক পাশে একটি কাশ্মিরী কাজ করা বুক শেলফ্। শেলফ্টির ডিজাইন একটু বিশেষ ধরনের।

শেলফের ওপরে বীণাবাদিনী বাগ্‌দেবীর মূর্তি ঈষৎ ক্রীম কালারে তৈরি, পাথরে গড়া বলে ভ্রম হয়। বেতের সুন্দর কয়েকখানা চেয়ার পাতা রয়েছে। মেয়েটি তারই একটিতে আমাকে বসতে বলল। বললাম, আমি প্রফেসার সেনের কাছে এসেছিলাম। উনি কি বাড়ি নেই?

মিষ্টি হেসে মেয়েটি বলল, আপনি বসুন, এখুনি এসে পড়বেন। আড়াইটাতে একটা ট্রেন ইন করছে, ঐ ট্রেনেই ওঁর আসার কথা। স্টেশন থেকে এটুকু আসতে আরও ধরুন মিনিট দশেক।

বসলাম একটা চেয়ারে। মেয়েটি বসতে বলে ভেতরে চলে গেল।

জানালা দিয়ে কি একটা লতা ঘরের ভেতরে উঁকি দিচ্ছে। হাওয়ায় দুলে দুলে উঠছে পাতাগুলো। একটা মেঘ জানালার ওপারে থমকে দাঁড়িয়েছে।

সেদিকে তাকিয়ে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। সুখ দুঃখের একটা মিশ্র অনুভূতিতে ভরে গেল আমার মন। খানিক পরে ফিরে এল মেয়েটি। একহাতে চায়ের কাপ, অন্য হাতে একটি প্লেটে পাঁপড়। সামনে রেখে বলল, দাদা আসার আগে আসুন সময় কাটাই।

হেসে বললাম, তোমার কই ভাই?

এই আনছি, বলে মেয়েটি ভেতরে গিয়ে নিয়ে এল চা পাঁপড়।

কই আপনি এখনও শুরু করেন নি, আমার পাশে আর একটা চেয়ারে বসতে বসতে ও বলল।

বললাম, উহুঁ, আগে তোমার নামটা শুনি, তারপর আতিথ্য নেওয়ার কথা ভাবা যাবে।

আমি সায়ন্তনী। দাদা ডাকেন সানু বলে।

তোমার মুখের মতই মিষ্টি তোমার নাম।

সায়ন্তনী অমনি হেসে বলল, এবার বলুন আপনার নাম, সে নাম তা হলে আমার নামের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর হবে।

হেসে বললাম, তা কেন হবে?

আমার চেয়ে আপনি সুন্দর বলে।

বললাম, এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলে আমার চেয়ে বেশি খুশি বোধ করি আর কেউ হত না।

সায়ন্তনী বলল, সত্যি, আপনাকে আমার প্রথম দেখাতেই খুব ভাল লেগেছে।

বললাম, আমারও সেই অবস্থা।

মেয়েটির সহজ খোলামেলা স্বভাবের ভেতর কেমন যেন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। ওকে ভাল না বেসে পারা যায় না। চা খেতে খেতে বললাম, প্রফেসর সেন তোমার দাদা হন?

উনি আমার ছোটদা। আমরা দু'ভাই এক বোন। বড়দা থাকেন বাইরে, আমি আর ছোটদা থাকি এখানে।

বললাম, চমৎকার তোমাদের বাড়ি।

ও অমনি বলল, কই বললেন না তো আপনার নাম।

আমি সীমা, তোমার দাদার কাছে পড়েছি।

চায়ের কাপটা টিপয়ের ওপর কোন রকমে রেখে দিয়ে ও উঠে এসে আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরল।

তুমি সীমাদি! কত চেনা তুমি আমার। কতদিন দাদাকে বলেছি আন সীমাদিকে, আমি দেখব। দাদা অমনি বলে, যেদিন নিজের থেকে ও আসবে সেদিন দেখতে পাবি। সত্যি, আর আমি তোমাকে ছাড়ছিনে।

কথাটা শুনে চোখে কি জানি কেন জল এসে গেল।

অলক্ষ্যে চোখ মুছে হেসে তাকালাম ওর দিকে। বললাম, মনে মনে তুমি ডাক দিয়েছ, না এসে কি থাকতে পারি ভাই।

ও বলল, দাদার কাছে কত গল্প শুনেছি তোমার। সেই কার্শিয়াং এর গল্প, কলেজের গল্প। আরও একটা গল্প শুনেছি।

আরও একটা কি গল্প শুনলে শুনি?

বলব না।

হেসে বললাম, কি পেলে বলতে পার?

শুধু তোমাকে পেলে।

কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলাম না। তারপর বললাম, আমারও ত ভাই তোমাকে পাওয়ার ভাগ্য থাকা চাই।

তুমি ভাগ্য বিশ্বাস কর সীমাদি।

করি ভাই। অনেক সময় কত কিছু করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি, কিন্তু হাতের কাছে এনে ধরে রাখতে পারিনি, হারাতে হয়েছে। তাই ভাগ্য না মেনে উপায় কি।

ও জানালার গরাদে পাক দিয়ে দিয়ে ওঠা লতাটা দেখিয়ে বলল, জান সীমাদি, ঐ লতাটাকে ঘরের ভেতর নিয়ে আসার কত চেষ্টাই না করেছি। কিন্তু কিছুতেই আসবে না। ঐ দেখ ওর শেষ প্রান্তটি সূর্যের দিকে কেমন মুখ তুলে রয়েছে। এ ওর ইচ্ছা শক্তির জোরে।

ওর কথার কোন উত্তর দেওয়া বুঝি সম্ভব ছিল না। তাই পুরনো কথায় ফিরে গিয়ে বললাম, আমার সম্বন্ধে নতুন কি গল্প তুমি শুনেছ, তাই আগে বল?

রাগ করলে সীমাদি?

হেসে বললাম, শুনতে আগ্রহ হলে বুঝি রাগ করা হয়?

ও আর কোন ভূমিকা না করেই বলল, সেদিন দাদার মুখে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাবার গল্প শুনেছি।

বললাম, সেদিন আমি পেয়েছি একটা খুব সুন্দর উপহার।

তাও জানি। সায়ন্তনীর চোখে মুখে ফুটে উঠল ছেলে মানুষী কৌতুক।

কথা বলতে বলতে ও দৌড়ল ছাদের ওপর।

ট্রেন হুইসল দিচ্ছে।

কিছু পরে ও ছাদ থেকে নেমে এসে বলল, ছাদে যাবে সীমাদি?

যাব বৈকি।

সায়ন্তনীর সঙ্গে গেলাম ছাদে। ঘরের ভেতরে থেকে কথায় কথায় বুঝতে পারিনি আকাশে মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে। কি যে ভাল দেখাচ্ছে চার দিকটা! মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

ও বলল, ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে, না সীমাদি?

বললাম, এ সুন্দরের তুলনা দেওয়া যায় না।

ট্রেনটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু হুইসেলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দূরের গাছগাছালির ভেতর দিয়ে ট্রেনটা চলেছে। ঝিক্ ঝিক্ একটা শব্দ ভেসে আসছে। মনে হচ্ছে মেঘগুলো হয়ে গেছে কার্শিয়াং পাহাড়। ট্রেন চলেছে সেই পাহাড়ের আড়ালে।

ঝিম ঝিম বর্ষা ধারায় স্বপ্ন ভাঙল আমার। সায়ন্তনী হাত ধরে ভেতরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, ট্রেন গেলেই আমি ছাদে উঠে আসি। কি যে ভাল লাগে এ সময়টা।

ঘরের ভেতর এসে বসলাম। জানালা দিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, দূর গাঁয়ের সবুজ বনরেখা ঝাপসা হয়ে আসছে।

সায়ন্তনী বলল, এ সময়ে একটা জিনিস চাইব, দেবে?

হেসে বললাম, অসম্ভব না হলে নিশ্চয়ই দেব।

বড় সাবধানী তুমি সীমাদি, খরচ কর বুঝে সুঝে।

এমন অপবাদ কেন দিচ্ছ ভাই?

তবে কেন সম্ভব অসম্ভবের কথা তুললে?

হেসে বললাম, হার মানছি, এখন আমার যা কিছু আছে তার সবই তোমাকে দিতে প্রতিশ্রুত রইলাম।

অনেক আছে তোমার, আমি শুধু এমন দিনে একটি গান শুনতে চাই।

কি গান শুনবে বল?

দাদার কাছে শুনেছি তুমি খু—উ—ব ভাল রবীন্দ্র সঙ্গীত জান। আমি কিন্তু শুনতে চাই অতুলপ্রসাদের গান।

বললাম, অতুলপ্রসাদের গান আমি গাই, কিন্তু সব গান তো আমার জানা নেই ভাই।

আচ্ছা, 'ডাকে কোয়েলা বারে বারে', গানটা জান?

হেসে বললাম, কৃপণ বলে অপবাদটা ছিল এবার তা আশাকরি ঘোচাতে পারব।

সায়ন্তনী হেসে বলল, হারমোনিয়ম আছে, দেব কি?

শুধু গলাতেই তো ভাল।

বৃষ্টি ঝেঁপে এসেছে। লতায় পাতায় কাঁপন লেগেছে। কিন্তু উনি আসছেন না কেন। ট্রেন চলে গেছে কখন। গুন গুন করে গান ধরলাম।

ডাকে কোয়েলা বারে বারে
হা মোর কান্ত, কোথা তুমি হারে!
চিত্তপিক চিতনাথে ফুকারে।।
বাজিছে বংশী মনবন মাঝে,
এমন সময়ে সে কোথা বিরাজে,
পুষ্পে পরিমলে ফুল বঁধূ যাচে
এসো বঁধূয়া নিকুঞ্জ দুয়ারে।।

গাইতে গাইতে আবিষ্ট হয়ে গেলাম। এ যেন আমার মনের এক গোপন প্রার্থনা, সুরের টানে বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে। এক সময় গান থামল। সাধারণ কোন স্তুতিবাদ করল না সায়ন্তনী। সে চুপচাপ বসে রইল বাইরের দিকে তাকিয়ে।

কতক্ষণ পরে বলল, জান সীমাদি মিষ্টি কোন গান শুনলেই সামনের ঐ আকাশ, মাটি আর বনের সবুজকে আরও ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

সায়ন্তনীর চোখ দুটো কবির চোখ। আমি তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। কি এক অদৃশ্য মায়ায় যেন ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়লাম।

বাইরে কার পায়ের সাড়া পাওয়া গেল। ভেতর থেকে দরজাটা সায়ন্তনী বন্ধ করে দিয়েছিল। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে ও বেরিয়ে গেল। বাইরের থেকে আবার ভেজিয়ে দিলে দরজাটা।

এত দেরি হল আসতে?

ট্রেন থেকে নেমেই বৃষ্টি। দাঁড়িয়ে গেলাম প্রভাস বাবুর ওখানে। শেষে ভদ্রলোক ছাতিটা দিয়ে আমাকে উদ্ধার করলেন।

কি চমৎকার বৃষ্টি না দাদা? বাইরে বোস মোড়াটা এনে দিই। সায়ন্তনী সন্তর্পণে এলো ঘরের ভেতর, আমাকে চোখ ইসারায় কথা বলতে বারণ করে মোড়াটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

কতক্ষণ পরে উনি কথা বললেন, দেখ সানু, কলেজের কাছে পিঠে বাড়িটা হয়নি বলে আমার কোন দুঃখ নেই। এমন আকাশ আর মাঠ কি সেখানে দেখতে পেতাম?

তা হয়ত পেতে না, কিন্তু এখানে যেমন একা একা কাটাতে হয় সেখানে তা হত না।

আমি আর বেশি সঙ্গী চাই না সানু। তোদের পেলেই আমার চলে যাবে।

কিন্তু একটা অভাব যে থেকে যাবে দাদা।

কি অভাব?

তোমার এই মাঠে যখন ঋতুর পালা বদল হবে তখন গান গাইবার লোক পাবে না।

উনি হেসে বললেন, তোকে ছবি আঁকা না শিখিয়ে গান শেখালেই ভাল হত।

সায়ন্তনী জবাব দিল, যা এখন হবার নয় তা ভেবে আর লাভ কি। তার চেয়ে গান গাইবার লোক আন ঘরে।

হাত বাড়ালেই কি মনের মানুষ মেলে সানু?

ঠিক মত হাত বাড়াতে পারলে অনেক দুর্লভ জিনিসও হাতের কাছে এসে যায় দাদা।

তা আর পারলাম কই বল।

আচ্ছা দাদা, আজ আমি তোমাকে একটা দুর্লভ জিনিস দেব। কিন্তু একটি শর্ত, চোখ বন্ধ করে হাত পাততে হবে।

এ আবার কি খেলা শুরু করলি।

আগে বল, আমি না বলা পর্যন্ত চোখ খুলবে না।

বেশ তাই হবে। কিন্তু কি দিবি তুই তা আগে একটু আঁচ করে দেখি, বলতে পারি কিনা।

বেশ, বল।

গরম গরম রাধা বল্লভী।

হল না।

একটা নতুন আঁকা ছবি।

তাও না।

আমার বাগানের এক মুঠো ফুল।

পারলে না। তবে ফুলের চেয়েও তোমার প্রিয় আর একটি জিনিস তোমাকে দেব। এবার চোখ বোজ।

ঘরের ভেতর বসে আমি সংকোচে মনে মনে কেঁপে উঠলাম। ঘরে এসে ঢুকল সায়ন্তনী। কাছে সরে এসে বলল, শুধু আজকের দিনটা দিদি রাখ ছোট বোনের একটা কথা। এসো আমার সঙ্গে।

সে কি করে হয় সায়ন্তনী।

মনের জোর থাকলে হয় দিদি।

আমাকে একি খেলার ভেতর ফেললে ভাই।

একটু আগেই ত আমাকে তোমার সব কিছু দিতে চেয়েছিলে। তবে এখন তোমার ইচ্ছাটাকে আলাদা করে রেখে দিতে চাইছ কেন?

ও আমার হাত ধরে টানল। সে আকর্ষণকে আমি উপেক্ষা করতে পারলাম না। আমার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি সায়ন্তনী নিয়ে চলল। আমি চোখ বন্ধ করলাম।

একখানা হাতের মুঠোয় আমার হাতখানা বাঁধা পড়ল। থর থর করে কেঁপে উঠল সমস্ত শরীরটা।

মুহূর্তকাল মাত্র। তারপরেই আমি তাকালাম। বিপুল বিস্ময়ে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। মাথা নত হল। ওঁর পায়ের ধুলো মাথায় ছুঁইয়ে নিলাম।

ততক্ষণে অঘটন ঘটন পটিয়সী পালিয়েছে। উনি বেশ অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, পাগলীটা যে কি করে তা ও নিজেই বোঝে না। তারপর কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না। পরে নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললেন, সত্যিই তুমি এলে সীমা! আমি ভাবতেই পারিনি একা পথ চিনে তুমি আসবে কোনদিন।

বললাম, আমার ওখানে যাবার নেমন্তন্ন নিয়ে এসেছি।

কি ব্যাপার?

সামান্য একটা অনুষ্ঠান, জামাইবাবু ডেকেছেন।

আমার কি যাওয়া শোভন হবে সীমা?

সে বিচার আপনার। আমার ডাকটুকু শুধু আপনার কাছে পৌঁছে দিতে এসেছি।

তুমি যখন ডাক দিয়েছ তখন আমার যেতে অবশ্য বাধা থাকার কথা নয়। কিন্তু উপলক্ষ্যটা কি?

সেটা একেবারে গৌণ।

তবু শুনি? যেমন উপলক্ষ্য তেমনি প্রস্তুতি না থাকলে অপ্রস্তুত হতে হবে।

এ অনুষ্ঠানে প্রস্তুত হয়ে না গেলেও কাউকে অপ্রস্তুত হতে হয় না। জন্মদিন, বিয়ে কিংবা উপনয়নের কোনটাই নয়।

হেসে বললেন, পরীক্ষা পাশের প্রীতিভোজ?

হেরে গেলাম আপনার কাছে।

নিজের থেকে হার মানতে পারে ক'জন সীমাদি। হার মানতে হলে মনের যে জোরের দরকার তা সবার থাকে না; বলতে বলতে দু'প্লেট খাবার নিয়ে সায়ন্তনী এসে দাঁড়াল।

বললাম, এত সব কি, দাদাকে দাও, আমি কিন্তু খাচ্ছিনা।

খাচ্ছিনা বললেই হল।

দাদার দিকে তাকিয়ে এবার সায়ন্তনী বলল, দাদা, আজ সীমাদি তার ইচ্ছাশক্তিটুকু আমার কাছে বাঁধা রেখেছে। আমার খুশিমত আমি তা ব্যবহার করতে পারব।

উনি অমনি বললেন, অপব্যবহার করলে সব কিছুই খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়।

বেশ, তাহলে তোমরা সময়ের অপব্যবহার না করে এ দুটো প্লেটের সদ্ব্যবহার কর।

সায়ন্তনী টিপয়ের ওপর দুটো প্লেট রেখে, জোর করে আমার হাত ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উনি বললেন, ওর সঙ্গে পেরে উঠবে না সীমা, তারচেয়ে যতটুকু পার খেয়ে নাও।

বললাম, ওকে এমনি ভালবেসে ফেলেছি যে ওর কথা উপেক্ষা করার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছি।

উনি বললেন, ও আমার বড় আদরের বোন সীমা। মা, বাবার অভাব ও যাতে বুঝতে না পারে সেজন্য আমাকে রীতিমত ওর মনের খবর নিয়ে চলতে হয়।

বললাম, খুব মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে ও। চোখ দুটো যেন কবিতা।

হেসে বললেন, উপমাটি তোমার কিন্তু চমৎকার। ওর আঁকা ছবিগুলো দেখলে মনে হবে যেন নিটোল এক একটি গীতি কবিতা।

ছবি আঁকে নাকি সায়ন্তনী! বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

আর্ট কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ছে। ইতিমধ্যে ওর ছবি আকাদেমি অব ফাইন আর্টস এর এগ্‌জিবিসনে বিশেষ প্রশংসা পেয়েছে।

ঘরের ভেতরে উঠে গেলাম। সায়ন্তনী বিনুনি করছিল।

সামনের আয়নায় আমার ছায়া পড়তেই বলল, কি মতলবে?

বললাম, এবার কিন্তু আমার চাওয়ার পালা।

বুঝেছি, দাদা তোমার কাছে অনেক কিছু ফিরিস্তি দিয়েছে।

সত্যি মিথ্যা জানিনা, তবে দাদারা সাধারণত বোনেদের পক্ষে একটু বেশিই ওকালতি করে থাকে।

সে তো পাত্র পক্ষের কাছে। আমাকে কি ও দলে ফেলতে চাও নাকি?

দুষ্টু হাসি হেসে সায়ন্তনী মুখ ফিরিয়ে বলল, তুমি পাত্রপক্ষ হতে যাবে কেন, কনেপক্ষ। না, না স্বয়ং কনে।

ওর মিষ্টি মুখখানাকে দুটো হাতের ভেতর টেনে নিলাম। ও অমনি আমার গলাটা জড়িয়ে ধরল। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে আছি। ওর দু'চোখের তারায় আমার মুখের প্রতিচ্ছবি।

ও বলল, তুমি আমার মিষ্টি বৌদিমণি।

সমস্ত শরীর আমার মুহূর্তে রোমাঞ্চিত হল। হাতদুটো ছাড়িয়ে নেব ভেবেও ছাড়াতে পারলাম না। ও তেমনি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। যেন কোন অতিশয়োক্তি ও করেনি ; ওর একান্ত স্বাভাবিক দাবিটুকু ও জানিয়েছে আমাকে।

কোন উত্তর দিতে পারলাম না। আমাব সব কথা ফোঁটা ফোঁটা চোখের জলে ওর মুখ আর বুক ভাসিয়ে দিতে লাগল।

সায়ন্তনী আরও নিবিড় করে আমার গলা জড়িয়ে বসে রইল।

মেঘ কেটে গিয়ে অপরাহ্নের রাঙা রোদটুকু ছড়িয়ে পড়েছে। উঠোনের গাছ গাছালিতে সেই রোদ্দুরের আভা বড় অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছে। সায়ন্তনী আমার হাতে তার আঁকা একখানা ছবি দিয়ে বলল, এই ছবিখানা তোমার আমার প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি হয়ে থাক।

ছবিটির দিকে তাকিয়ে দেখি, একটি কুমারী কন্যা এক অন্ধ বধূর হাত ধরে ঘাটের পথে চলেছে। নীচে লেখা, অন্ধ বধূ। আরও নীচে লেখা রয়েছে পরিচিত একটি কবিতার দুটি ছত্র।

পায়ের তলায় নরম ঠেকল কি,
আস্তে একটু চলনা ঠাকুর ঝি।

ছবিখানা দেখে যেন আশ মিটতে চায় না। বিষয়বস্তু আর রঙের এমন স্নিগ্ধ মিল বড় একটা চোখে পড়ে না।

বললাম, বড় কষ্ট হচ্ছে ভাই এত সুন্দর ছবিখানা দেখে।

কেন সীমাদি!

বধূটি অন্ধ।

সায়ন্তনী অমনি হেসে বলল, ও অন্ধ নয় দিদি, ভালবাসায় অন্ধ। প্রেমে অন্ধ না হলে কি কোন কিছু পাওয়া যায়।

ওর বিনুনীতে একটা টান দিয়ে নেমে এলাম উঠোনে। পেছন থেকে দুষ্টু মেয়েটা বলল, ঠিক ঠিক কবে আসছ?

বললাম, এ আসাটা বুঝি পছন্দ হল না?

ও ওর সুন্দর মুখখানাকে দ্রুত ডাইনে বাঁয়ে নাড়তে লাগল। উনি এলেন আমাকে ট্রেনে তুলে দিতে। এসেছিলাম বাসে, ফিরে চললাম ট্রেনে। বাসের চেয়ে অনেক কম সময়ে ট্রেনে যাওয়া আসা করা যায়। ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গেছে, তবু মনে হল, এত তাড়াতাড়ি চলে না এসে আরও খানিক সময় কাটিয়ে এলে বুঝি ভাল হত।

অনুষ্ঠানের দিনটির কথা আজও মনে পড়ে।

জামাইবাবুর পরিকল্পনা মতো ঘর সাজান হল। আমার কোন বারণ না শুনে উনি বসবার ঘরের দেয়াল ভরে আমার সব ছবি টাঙালেন। সেই ছোটবেলা, ফ্রকপরা মেয়ে। তারপর নানা সময়ের নানা ধরনের বড় ছবি।

আমার একটি পরিকল্পনা শুধু মেনে নিলেন উনি। সোফা সরিয়ে দেওয়া হল ঘর থেকে। তার জায়গায় আনাচে কানাচে আলপনা এঁকে তার মাঝে বিছানো হল ফরাস।

কেবল যাঁরা সুট পরে আসবেন তাঁদের বসার জন্য রইল কয়েকটি শ্রীনিকেতনের কাজ করা মোড়া।

আর একটি জিনিস ঘরের এক কোণে রাখা হল। সেটি আমার বিশেষ প্রিয়। মাছের ঘর। কাঁচের তৈরি ঘরখানা বালি, নুড়ি, ঝিনুক আর জলজ উদ্ভিদে ভরা। তার মাঝে খেলা করছে লাল কালো হরেক রকমের মাছ। মনে হবে যেন সমুদ্রের রহস্যময় তলদেশ। মাছের ঘরের ওপরে লেখা আছে 'মীন নিকেতন'।

নির্দিষ্ট সময়ে একে একে নিমন্ত্রিতেরা এসে পৌঁছলেন। প্রথমে এল সুদীপ্তা, হাতে একটি গোলাপের তোড়া। একহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে অন্যহাতে উপহার দিল ফুলের গুচ্ছ।

বলল, অসময়ের দুর্লভ বস্তু, আশা করি অপছন্দ হবে না।

কানে কানে বললাম, নারী চিরদিন দুর্লভকে পেতে চায়।

সুদীপ্তার গলা অমনি নিচু হল। বলল, সমজাতীয় না হলে জয় করে নিয়ে যেতুম।

হেসে ওর গালে একটা টুস্‌কি দিলাম।

গাড়ী থেকে ইতিমধ্যে নেমে এসেছেন অঞ্জন বাবু। হাতে একগুচ্ছ গ্ল্যাডিওলা।

বললেন, নিউ মার্কেটে আগের থেকে অর্ডার দিয়ে সংগ্রহ করা।

ওঁকে নমস্কার করে ফুলগুলো হাতে নিয়ে বললাম, বড় প্রিয় ফুল আমার। যেমন সতেজ, তেমনি সুন্দর।

সুদীপ্তা দাদার দিকে বক্রদৃষ্টি হেনে বলল, ঠিক মিঃ অঞ্জন মুখার্জীর মতো, তাই না?

হেসে বললাম, ফুলের ভেতরে মানুষের মনের ছায়া পড়ে বই কি।

অঞ্জন বাবু অমনি বললেন, খুব খুশি হলাম আপনার মন্তব্যে।

ওঁরা ভেতরে এসে বসলেন।

অন্যান্য নিমন্ত্রিতেরা প্রায় সবাই এসে গেছেন। কলহাস্যে ভরে উঠেছে আমাদের আসর। সুদীপ্তা আর আমি একের পর এক গান গেয়ে চলেছি। গানের ফাঁকে বাইরে উঠে যাই, আর পথের দিকে তাকিয়ে দেখি, উনি আসছেন কিনা।

সায়ন্তনীকেও ডেকে এসেছি। মিথ্যে করে বলতে হয়েছে, কলেজ স্ট্রীটের পথে ওঁদের সঙ্গে দেখা, তাই ডেকেছি ভাই বোন দুজনকেই।

জামাইবাবু খুব খুশি হয়েছেন। কিন্তু কেন আসছেন না ওঁরা! উনি নীল রং ভালবাসেন, তাই আজ নীল শাড়ি পরেছি। খোঁপায় দিয়েছি সাদা-ফুল। সন্ধ্যে ঘনিয়ে উঠল, মেঘ ঘনাল, আর ভারী হয়ে উঠল আমার মন। কৃপণের মতো ভাল ভাল গানগুলো না গেয়ে ওঁকে শোনাব বলে সঞ্চয় করে রেখে দিলাম। কিন্তু কই উনি। চোখে প্রায় জল এসে গেল।

ঝড় শুরু হয়েছে বাইরে। কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে দৌড়ে গেলাম। দরজা খুলে দেখি, উনি দাঁড়িয়ে আছেন, একগুচ্ছ রজনীগন্ধা হাতে। প্রণাম করলাম। উনি হাতে রজনীগন্ধা দিয়ে বললেন, শুভ্র ফুলে আমার শুভেচ্ছা রইল সীমা।

ওঁর ফুল হাতে নিয়ে দেখি, সায়ন্তনী পেছনে দাঁড়িয়ে হাসছে।

এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরতেই ও বলল, আমার কিন্তু কাঁটার উপহার। এই বলে একটি ছবি ও আমার হাতে তুলে দিলে। কেয়া ফুল ফুটেছে। কয়েকটি পাতার ফাঁকে সুন্দর শুভ্র ফুলটি। এত জীবন্ত, মনে হল, সদ্য বৃষ্টিতে ভিজে গন্ধ ছড়াচ্ছে। নীচে লেখা,—'বর্ষাসখি'।

বললাম, সানু, আজকের জয়ের গৌরব তোমার।

সায়ন্তনী অমনি হেসে বলল, কেয়ার কাঁটা দিয়ে।

কানে কানে বললাম, ননদিনীরা সাধারণত কণ্টকিনী।

ওঁদের নিয়ে এলাম ভেতরে। উনি প্রায় সবারই পরিচিত। নমস্কার বিনিময় হল। সায়ন্তনীর পরিচয় দিয়ে বললাম, ইনি কৃতি শিল্পী, সায়ন্তনী সেন। আর ওঁর কৃতিত্বের পরিচয় আমার সঙ্গেই রয়েছে।

তুলে ধরলাম ছবিখানা। সবার হাতে ঘুরতে লাগল সে ছবি। প্রশংসায় সকলেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। সায়ন্তনীর সংকোচে সে এক বিচিত্র অবস্থা। একে সুদর্শনা, তার ওপর লজ্জা।

ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে।

উনি বললেন, গৃহস্বামীনীকে তো দেখছি না।

জামাইবাবু অমনি বললেন, উনি ফুড ডিপার্টমেন্টে আছেন। কার্শিয়াং এর রস কলকাতাতেও যাতে অটুট থাকে, সেইজন্যে উনি স্বয়ং তদারক করছেন।

গান হল। ওঁর প্রিয় গানগুলি গাইলাম। অঞ্জনবাবু কয়েকটি গান গাইতে অনুরোধ করলেন। তাও গাইলাম।

উনি কথা তুললেন, মিঃ মুখার্জী বাইরে যাচ্ছেন কবে?

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি, অঞ্জনবাবু বললেন।

জামাইবাবু অমনি কথা যোগ করলেন, একা নয়, যুগল-যাত্রা।

উনি হেসে বললেন, সে ত খুব ভাল।

সুদীপ্তা জামাইবাবুর দিকে ফিরে বলল, অর্ণবদা যে কি, ভাবি ভ্রাতৃ বধূকে নিয়ে রসিকতা।

জামাইবাবু অমনি আমার দিকে তাকালেন। তারপর সুদীপ্তার দিকে ফিরে বললেন, ভ্রাতৃবধূ যদি সরস সম্পর্কের ভেতর থেকে আসে তা হলে রসিকতার ব্যাপারে ভাসুরের কিছুটা কনশেসন প্রাপ্য।

নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগলেন। সকলে সে হাসিতে যোগ দিলেন, কিন্তু দিতে পারলাম না আমি। জামাইবাবুর ইঙ্গিত সকলে ধরতে না পারলেও আমার কাছে তা অস্পষ্ট ছিল না। আর শুধু সেই জন্যেই আমি মাথা নিচু করে মনে মনে কাঁপতে লাগলাম।

সেদিনের অনুষ্ঠান শেষ হল। একে একে সবাই বিদায় নিলেন। যাবার আগে সুদীপ্তা একান্তে বলল, [redacted]নের খবর কি বল তো?

বললাম,

'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে।'

সুদীপ্তা বলল, বাউলের গানে নিজেকে আড়াল করলি তো?

এমন সহজ কথার উল্টো মানে করলে আমিও বা দাঁড়াই কোথা বল?

সুদীপ্তা যেতে গিয়েও ফিরে এল। কাছে সরে এসে বলল, তোকে কাছে পেলে সত্যি খুব ভাল হত।

সায়ন্তনীর সঙ্গে দিদি ভেতরে কথা বলছিলেন, তাই ওঁদের দেরী হল যেতে।

যাবার আগে আমি সায়ন্তনীকে নিয়ে গেলাম ছাদে। বললাম, এখানে আকাশ দেখা যায়, তবে ওখানকার মতো খোলামেলা নয়।

সায়ন্তনী বলল, ঘরের পরিবেশটি কিন্তু আমার খুব ভাল লেগেছে সীমাদি। বিশেষ করে তোমার ঐ বিভিন্ন সময়কার ছবিগুলো।

বললাম, ওতে যদি কিছু কৃতিত্ব থেকে থাকে তাহলে তা একমাত্র জামাইবাবুর প্রাপ্য।

চমৎকার মানুষ উনি, বলল সায়ন্তনী।

ছাদের আর এক প্রান্তে ওকে নিয়ে এলাম। এখানে একটি ছোট ঘর। আমার একান্ত আপন। ঘরটি খুললাম। মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আবছা আলো এসে পড়েছিল। জানলা খুলতেই ওপাশের টবে রাখা এক ঝাঁক বেল ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে এল।

সায়ন্তনী বলল, কি সুন্দর তোমার ঘর। বেলফুল আমার এত ভাল লাগে। একটি চঞ্চল কিশোরীর মতো ও মনের কথাগুলো বলে গেল। কতক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, তোমাকে আমার হাতের তৈরি গাছের ফুল দেব বলেই ছাদে নিয়ে এলাম।

তোমার হাতের তৈরি বুঝি?

হেসে বললাম, হাঁ, আমিই মালিনী। ওকে টবের কাছে নিয়ে গিয়ে কতকগুলো ফুল তুলে হাত ভরে দিলাম।

বললাম, দুজনে নিও কিন্তু।

দুষ্টুমির হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। বলল, আমি ত তোমার ওপর ভাগ বসাতে চাইনি সীমাদি, তবে দাদা কেন আমার ফুলে ভাগ বসাবে?

ওর মুখটা নেড়ে দিয়ে বললাম, আচ্ছা হিংসুটে মেয়ে তো বাপু। দিতে হবে না তোমাকে ভাগ। তবে দয়া করে একটি কাজ শুধু করে দাও।

সায়ন্তনী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কি কাজ বল?

ওকে নিয়ে এলাম আমার ছোট ঘরের ভেতর। সূর্যমুখীর বীজ ধরে রেখেছিলাম আগামী মরসুমের জন্যে। তার থেকে কিছু নিয়ে একটা কৌটোতে ভরে দিলাম। চিঠি একখানাও লিখলাম।

শ্রীচরণেযু,

আপনি একদিন একটি কবিতা পড়াতে গিয়ে বলেছিলেন, মালঞ্চের মালাকর হতে পারলে আর কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকবে না। আমি আজ আপনার জন্যে আমার হাতের তৈরি সূর্যমুখীর বীজ পাঠালাম। বছরে বছরে এ ফিরে ফিরে ফুল দেবে। সূর্য প্রণামের মন্ত্র এর অঙ্গে লেখা রইল।

প্রণতা
সীমা।

সায়ন্তনীকে বললাম, এর ওপর আর ভাগ বসিও না ভাই।

দাদার হাতে আমার এ প্রণামীটুকু সংগোপনে তুলে দিও।

সায়ন্তনী বলল, বছরে বছরে তোমার দেয়া বীজ থেকে ফুল ফুটবে আর দাদা সূর্যমুখীর দিকে তাকিয়ে তেমনি সুন্দর আর একটি মুখের কথা মনে করবে, এই ত চাও।

বললাম, বেঁচে থাকতে কে না চায় ভাই।

সেই প্রথম আমি সায়ন্তনীকে গভীর হতে দেখলাম। ওর মাটির দিকে ঝুঁকে পড়া মুখটাকে তুলে ধরে বললাম, এমন সুন্দর দুটো চোখ যে দেখতে পাচ্ছিনে ভাই।

সায়ন্তনী আমার চোখের ওপর চোখ রাখল। আবছা চাঁদের আলোয় দেখলাম, সে চোখে জল চিকচিক করছে। ওর মুখটা আমার বুকের ভেতর নিবিড় করে চেপে ধরলাম। ও কতক্ষণ আমাকে ওর দুটি হাত দিয়ে জড়িয়ে রইল। আমার চোখও শুকনো ছিল না। বললাম, সানু, কেন এমন করে আমায় জড়ালি ভাই?

কোন কথা না বলে ও আরও শক্ত করে আমায় ধরে রইল।

ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম, যাব সানু তোদের কাছে। শুধু ওঁকে বলিস্ একটু ঠাঁই যেন আমার জন্যে উনি রাখেন।

সানুকে কথা দিয়েছিলাম। তাই একদিন গিয়ে দাঁড়ালাম ওঁদের সামনে। উনি শুধু নিষ্পলকে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। আমিও তাকিয়ে ছিলাম। আমার দৃষ্টির সামনে ধীরে ধীরে উনি আবছা হয়ে এলেন। চোখ থেকে টপ্ টপ্ করে পড়তে লাগল অবিরল জলের ধারা।

উনি এগিয়ে এসে আমার হাত ধরলেন। ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, অস্থির হয়ো না সীমা। বস এখানে। সুস্থ হও। নিজেকে শান্ত কর।

ঘরের ভেতর আমাকে রেখে উনি কোথায় বেরিয়ে গেলেন।

একটা ইজিচেয়ারে বসে রইলাম। মনে হল আমি যেন একখণ্ড শিলা। আমার নিজের কোন ইচ্ছাশক্তি নেই। সমস্ত শক্তি-পরীক্ষা আমার শেষ হয়ে গেছে।

একটা নিদারুণ ভূমিকম্পে চারিদিকের পরিচিত একান্ত আপন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথায় যেন স্থান-ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছি। সেখান থেকে উঠে আসার কোন শক্তিই আর আমার নেই।

কি দুঃসহ সেই ভূমিকম্পের দিনটি। চোখের ওপর ভেসে উঠছে সে দিনের ছবি।

বাবা বসেছিলেন বাইরের ঘরে। আমি ঢুকে ওঁকে প্রণাম করতেই উনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মা ভেতর থেকে আমার আসার সাড়া পেয়ে দৌড়ে এলেন।

বললাম, টেলিগ্রাম করলে কেন বাবা। তোমার শরীর ভাল নেই ভেবে সারারাত ট্রেনে ঘুমুতে পারিনি। কি যে দুশ্চিন্তা নিয়ে এসেছি।

মাথায় হাত রেখে বাবা বললেন, আমার কি দুশ্চিন্তা কম আছে মা। ক'দিন প্রেসারটা বেড়েছে। রিটায়ার্ডের সময় হয়ে এল। এখন সৎপাত্রের হাতে তোকে দিয়ে যেতে না পারলে আমি যে মরেও শান্তি পাব না মা।

বাবার কথা শুনে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। প্রেসার বেড়েছে বাবার তা জানতাম, কিন্তু সহ্যশক্তি তাঁর ছিল অসাধারণ। কোন অসুখে কারু কাছ থেকে সামান্য সেবাও নিতে চাইতেন না অত্যন্ত স্নেহ প্রবণ হলেও চাপা প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি।

বেশি কোন কথা বলা ছিল তাঁর স্বভাবের বাইরে। তাই টেলিগ্রাম পেয়ে বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম। মনে হয়েছিল, বাবা নিশ্চয়ই বিশেষভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। নইলে টেলিগ্রাম করে আমাকে ডাকার দরকার হত না। কিন্তু এখানে এসে সব কিছুই প্রায় স্বাভাবিক দেখলাম। কেমন একটা রহস্যের ছায়া ঘনিয়ে উঠল আমার মনে।

রাতে খেতে বসে মার মুখ থেকে জানলাম, অঞ্জনবাবু তাঁর কয়েকজন বন্ধু নিয়ে পুরীতে আছেন। তাঁরা নাকি কোণারক, ভুবনেশ্বর হয়ে কটকে আমাদের এখানে উঠবেন।

তারপর মার মুখে শুরু হল অঞ্জনবাবুর প্রশংসা। হীরের টুকরো ছেলে। এমন ছেলে লাখে একটা মেলে না। যেমন রূপ তেমনি বিদ্যে। আবার বিলেত যাচ্ছে শীগ্গীর। এমন জামাই পাওয়া ভাগ্য বলতে হয়।

আমি বাবা পাশাপাশি খেতে বসেছিলাম। মার কথা শুনে একটা অশুভ অস্বস্তির ভাব আমার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। আমি আর এক গ্রাসও মুখে তুলতে পারলাম না।

শরীর খারাপের অজুহাতে উঠে এলাম খাবার টেবিল ছেড়ে।

বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগল। যে ঘটনা আমি কোনদিন কল্পনা করিনি তেমনি একটা ঘটনার ছবি আমার মনের পর্দায় ফুটে উঠল। আমি চেষ্টা করেও তাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারলাম না।

মা এসে শরীর খারাপের কারণ জানতে চাইলেন। বললাম, ট্রেনে সারারাত ঘুম হয়নি। তাই বোধ হয় হঠাৎ শরীরটা কেমন খারাপ বোধ হল।

মা পাশে বসলেন। বাবা ঘরে ঢুকলেন।

এখন কেমন বোধ হচ্ছে মা, বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

ভাল বাবা, বিছানায় উঠে বসলাম। বাবা পাশেই একটা সোফাতে বসলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। হঠাৎ বাবা সোফা থেকে উঠে এসে আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, বুড়ো ছেলের একটা কথা রাখতে হবে মা।

বাবাকে এমন করে কোনদিন আমি কোন কথা বলতে শুনিনি। অবাক হয়ে বাবার দিকে চেয়ে রইলাম।

তোর দিদি তোকে এত বড় করে তুলেছে, অর্ণব তোকে ছোট বোন বলেই জানে. তাদের সবার ইচ্ছে ফরেনে যাবার আগে অঞ্জনের সঙ্গে তোর বিয়ের কাজটা চুকে যাক। অমত করিস নে মা।

পৃথিবীতে যত রকমের যন্ত্রণা আছে, বোধকরি এ যন্ত্রণার সঙ্গে তাদের তুলনা করা যায় না। মনে হল যেন হৃৎপিণ্ডটা সেই মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। আমি নির্বাক হয়ে মাথা নত করে বসে রইলাম।

বাবা বললেন, আমি জানি মা, তুই আমার কথায় অমত করবি না। এদিকে সব ব্যবস্থাই করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে বুধবার তোর দিদি জামাইবাবু এসে পৌঁছবে। অঞ্জনরাও আসবে ভুবনেশ্বর হয়ে। আমার শেষ আনন্দের কাজ মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় ভাল ভাবেই হয়ে যাবে আশা করি।

আমাকে ঘুমুতে বলে বাবা পাশের ঘরে চলে গেলেন। মাকে একা পেয়ে বললাম, এ হয়না মা।

কি হয়না সীমু?

এ বিয়ে কেমন করে হয় মা.

যেমন করে সবার হয়, তেমনি করেই হয়।

আমাকে না জানিয়ে কেন তোমরা এ ব্যবস্থা করতে গেলে মা? মনের সবটুকু শক্তি সঞ্চয় করে বললাম।

মা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ভাল বুঝেছি বলেই করেছি মা। আমাদের মা বাবার ওপর আমরা কোন কথাই কোনদিন বলিনি।

তোমাদের কাল আর একাল এক নয় মা।

কলেজে দুঅক্ষর পড়েছ বলেই কি তোমরা সব বিষয়ে মত খাটাতে চাও।

তা কেন হতে যাবে মা। তোমাদের ভালবাসি বলেই কি নিজেদের একটা কোন কথাও বলার সুযোগ আমাদের থাকবে না।

মা বললেন, এ নিয়ে আমি তর্ক করতে চাই না। তোমার বাবা এতদূর এগিয়েছেন যে সেখান থেকে আর ফেরা যায় না।

সমস্ত মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। বললাম, তার আগে আমাকে মহানদীতে বিসর্জন দিলে পারতে তোমরা।

অমনি মা ঝঙ্কার দিয়ে উঠে পড়লেন বিছানা থেকে. এত বড় কথা বললি আজ। অসীমা ত ঠিক তাহলে বলেছিল।

দিদি কি বলেছিল বলে যাও।

থাক, সে কথা তুমি ভাল করেই জান। শুধু জেনে রেখো আমরা বেঁচে থাকতে তোমার সে আশা মিটবে না। মরলে সে সাধ মিটিও।

মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়ার ভেতর আমি নির্বাক বসে মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগলাম। কতক্ষণ এমনি বসেছিলাম মনে নেই। বাবার ঘর থেকে এক সময় মায়ের চেঁচামেচি শুনে ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখি বাবা অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। মা জল জল বলে চীৎকার করছেন। দৌড়ে জল নিয়ে এলাম।

কতক্ষণ মুখে চোখে জল দিলাম। হাওয়া চলল সমানে সারারাত। রঘু ডাক্তার নিয়ে এল। উত্তেজনায় প্রেসার বেড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। চিকিৎসা চলল তিন চার দিন। রাত জেগে বাবার কাছে বসে বসে সেবা করতে লাগলাম। শিশুর মতো অবুঝ হয়ে গেছেন তিনি। আমি নিজের হাতে কোন কিছু না করে দিলে তাঁর শান্তি নেই। অস্থির হয়ে পড়েছেন। একটু স্বাভাবকি অবস্থা ফিরে পেলেই আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন একদৃষ্টে। চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

আমি নাওয়া খাওয়া ভুলে গেলাম। মনে মনে তীব্র অনুশোচনা আমাকে দগ্ধ করতে লাগল। যদি বাবার কিছু একটা হয় তাহলে কি কৈফিয়ত দেব আমি নিজের কাছে।

কয়েক দিন পরেই বাবা উঠে বসলেন। অত্যন্ত দুর্বল। চলাফেরা ডাক্তার একেবারে বারণ করে দিয়েছেন। সারাক্ষণ আমি আছি তাঁর কাছে। মনে মনে কেবল ঠাকুরকে ডেকে চলেছি, তুমি আমার মুখ রেখো ঠাকুর। আসছেকাল দিদিদের কলকাতা থেকে আসার কথা। কাউকে বাবার কথা কিছুই জানানো হয়নি।

দুপুরের দিকে বাবা বসেছিলেন ইজিচেয়ারে। রোদ্দুর লাগছিল গায়ে।

আমি বসেছিলাম তাঁর পায়ের কাছে।

ইঙ্গিতে বাবা আমাকে তাঁর আরও কাছে ডাকলেন। মুখের ভাবটি বড় অসহায় বলে মনে হল।

ধীরে ধীরে বললেন, তোকে দুঃখ দিতে আমি চাইনি মা। সুখী করতে চেয়েছিলাম। অঞ্জনেরা আসছেন কাল, ওঁদের ভাল কথায় ফিরাবি মা। যেন কোন অসম্মান বোধ না করেন।

আমার চোখ বেয়ে ততক্ষণে গড়িয়ে পড়ছে ধারা। বাবার করুণ মুখখানির দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমাদের আমি সুখী করব বাবা। তোমাদের ইচ্ছে ছাড়া আমার নিজের আর কোন ইচ্ছেই নেই। তুমি শুধু ভাল হয়ে ওঠ। আমি আর কিছু চাইনা। তোমার আশীর্বাদ নিয়ে আমি সব কিছু ভুলতে চেষ্টা করব।

বাবার মুখ মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আলোয় আলোয় ভরে গেল ঘর। সানাই-এর সুর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। আমি মনে মনে শুধু প্রার্থনা করতে লাগলাম, হে দেবতা, তুমি আমার নবজন্ম দাও। ভুলিয়ে দাও আমার সমস্ত অতীত। স্মৃতির জ্বালাভরা অতীত হোক আমার পূর্বজন্ম। এ জন্মে আমি অন্তর দিয়ে চাইনি অন্য কোন জন। অঞ্জনকেই শুধু চেয়েছি। সে এসেছে আমার কাছে। সমস্ত জীবনের শ্রদ্ধা, ভালবাসা দিয়ে তাকে বরণ করবার শক্তি আমাকে দাও।

কলকাতায় ফিরে এলাম। বাবা সুস্থ হয়েছেন। এ বিয়েতে সকলে খুশি হয়েছেন। আমার স্বামী হয়েছেন সবচেয়ে তৃপ্ত। বাসরঘরে তিনি আমাকে বলেছিলেন, এ বিয়েতে তুমি তৃপ্ত হওনি সীমা?

সমস্ত মন দিয়ে উচ্চারণ করলাম, আমি তৃপ্ত, আমি তৃপ্ত, তোমার প্রেমে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চাই।

কিন্তু একি হল আমার। কলকাতায় ফিরে এলাম। সমস্ত ভুলে যাওয়া অতীত আমার মনের বন্ধ দরজা জানালার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়তে লাগল। দুহাতে আপ্রাণ ঠেকিয়ে রাখতে চাইলাম, কিন্তু প্রবল ঝড়ের ঝাপটায় সব দ্বার খুলে গেল। আমার জাতিস্মর মন ফেলে আসা স্মৃতির পথ ধরে আবার ফিরে এল নিজের জায়গায়।

উনি ঘরে এসে ঢুকলেন। একটু আগেই মনের ওপর দিয়ে প্রবল একটা ঝড় বয়ে গেছে। স্থির নিশ্চল হয়ে বসে বসে শুধু ভাবতে লাগলাম, কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। কি যেন ছিল আমার, কাছে পেলেও আর কোনদিনই আমি তাকে ছুঁতে পারব না।

উনি আমার একেবারে পাশে এসে দাঁড়ালেন। মাথায় হাত রাখলেন। আমার চোখ দুটো আপনিই বন্ধ হয়ে এল।

কতক্ষণ এমনি কেটে গেল। উনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

কি হল আমার জানি না, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে গভীর আবেগে ওঁর বুকে মুখ গুঁজে আমার জমে ওঠা চোখের জল ঝরিয়ে দিতে লাগলাম।

উনি এক হাতে আমায় জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

জলে ভেজা চোখের দৃষ্টি এক সময় মেলে ধরলাম ওঁর মুখের ওপর। বললাম, কি দোষ আমি করেছি আপনার কাছে যে এমন শাস্তি আমায় পেতে হল।

উনি আমার মুখের ওপর ওঁর দুটি শান্ত চোখের স্থির দৃষ্টি মেলে দিয়ে বললেন, তুমি যদি শাস্তি পেয়ে থাক তাহলে সে শাস্তি আমার কাছে দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এসেছে সীমা।

কেন আপনি আমাকে জোর করে টেনে নিলেন না। কেন আমাকে যেতে দিলেন। আমি তো চাইনি কোথাও যেতে। এই ঘর, এ যে আমার সংসার। আজ কেন এমন করে আমি নিজের ঘরে পর হয়ে গেলাম।

মনের দুঃখে এমনি কত কথা বললাম। উনি তেমনি নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে।

এক সময় বললেন, আমার কতদিনের কত মধুর চিন্তা তোমাকে ঘিরে রয়েছে সীমা। কেমন করে আমি ভুলব সে সব কথা। আমার জীবনের সেই চিন্তাগুলির সঙ্গে তুমি জড়িয়ে রইবে চিরদিন। আমি তোমাকে ভালবাসি, আজ সমাজের কাছে যখন এ কথাটুকু বলার কোন দাবি আমার নেই, তখন একান্তে তোমার কাছে বলতে পেরে তৃপ্তি পাচ্ছি সীমা। তোমার সিঁথিতে সিঁদুর দিতে পারিনি বলে আজ আর আমার কোন ক্ষোভ রইল না।

বললাম, তবু যে মন কাঁদে। রোজ আমার সেবা দিয়ে ভরে দেব, এ সাধ যে আমার মিটল না। আমি কেমন করে এ ক্ষতি ভুলব।

সব ভুলতে হবে সীমা। আজ যাঁকে গ্রহণ করেছ, তাঁকে তোমার সেই সেবা দিয়ে তৃপ্ত কর। এ আমার মহত্ত্বের কথা নয় সীমা, আমি তোমাকে ভালবাসি বলেই বলছি। সব সইতে পারব, কিন্তু তোমার ক্ষুদ্রতার ভার বইতে পারব না।

হাত ছাড়িয়ে ওঁর পায়ে মাথা রেখে কতক্ষণ নীরবে ওঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে লাগলাম। মনে মনে বললাম, তুমি আমাকে সব সইবার ক্ষমতা দাও, যেন মনের এই দুঃখকে আমি ভুলতে পারি।

উনি আমার হাত ধরে তুললেন। মুখে ওঁর প্রসন্ন হাসির রেখা। বললেন, একটি কথা আজ আমায় দিতে হবে সীমা।

ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। উনি বললেন, আগে কথা দাও তারপর বলব।

মাথা নেড়ে জানালাম, অদেয় আমার কিছুই নেই।

বললেন, আমার ঘরে এসে কোনদিন চোখের জল ফেলবে না, আর নতুন সংসারকে ভরে তুলবে তোমার আনন্দ দিয়ে।

মাথা নেড়ে ওঁর কথা মেনে নিলাম।

হুইসেলের শব্দ ভেসে এল। উনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সানুর আসার সময় হল।

ভেতরে উঠে গিয়ে দেখলাম বাহাদুর নেই। হিটারে চায়ের জল চাপিয়ে দিলাম। জানালার বাইরে উনি উঁকি দিচ্ছেন দেখে বললাম, একটু চা করে রাখছি। কলেজ থেকে ফিরছে সানু, বাহাদুর কাছে পিঠে নেই, তাই।

উনি সরে গেলেন জানালার ধার থেকে। খানকয়েক নিমকি ভেজে ফেললাম। বাইরে সানুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

দাদা, আমার সেই 'বিদায় অভিশাপ' ছবিখানা এগজিবিসনে অল মিডিয়ামে ফার্স্ট হয়েছে।

রান্নাঘরে জানালার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, সানু প্রায় লাফাতে লাফাতে এসে দাদার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই উনি তাকে জড়িয়ে ধরলেন। কতক্ষণ সানু বাঁধা রইল ওঁর বুকের ভেতর।

স্পষ্ট দেখতে পেলাম ওঁর চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। একি সানুর সাফল্যের আনন্দে ওঁর চোখে জল, না আর কিছু। যে বেদনা আমার সামনে উনি প্রকাশ করতে পারেননি, তাই কি এবার ঝরে পড়ল অঝোর ধারায়।

তুমি কাঁদছ দাদা?

উনি মুখে হাসি টেনে চোখ মুছলেন। আমি সরে এলাম জানালার ধার থেকে।

সানু বলল, আজ এমন আনন্দের দিনে তুমি কেন চোখের জল ফেললে বল?

বাবা মা থাকলে তাঁরা কত খুশি হতেন বল তো সানু। তারপর খানিক চুপচাপ থেকে বললেন, দাদা বৌদিকে আজই চিঠি লিখে রাখ।

সানু বলল, আর একটা ইচ্ছে করছে দাদা?

কি ইচ্ছে?

সীমাদিকে খবরটা জানিয়ে দু'কলম চিঠি লিখতে।

বেশ, তাতে আর আপত্তি কি।

এবার সায়ন্তনী বলল, কিন্তু তোমাকে ছাড়ছিনে দাদা। আমার ফার্স্ট হবার পুরস্কার তোমাকেই দিতে হবে। সোনার মেডেলের চেয়ে তার দাম অনেক বেশি।

বল কি দেব?

তুমি দেবে, খামোকা আমি নির্বাচন করতে যাব কেন!

বেশ, তাহলে আমার দেওয়া জিনিস তোমাকে খুশি মনে গ্রহণ করতে হবে।

বলাই বাহুল্য।

তবে চোখ বোজ।

এ আবার কি। সেই যে সে দিনের মত সীমাদিকে এনে দেবে নাকি?

বললাম, তাই যদি দিই।

সায়ন্তনী বলল, থাক মশাই ঢের হয়েছে, এখন সত্যি যা দেবার তা দিয়ে ফেল।

তাহলে চোখ বন্ধ করতে হবে।

করলাম।

উনি এসে আমাকে বললেন, চা দেবে না আমাদের?

চা আর নিমকির প্লেট সাজিয়ে রেখেছিলাম। ওঁর সঙ্গে নিয়ে এলাম বাইরে। উনি চায়ের কাপ সায়ন্তনীর হাতে দিতে ইঙ্গিত করে সরে গেলেন আড়ালে।

হাতে কাপ পেয়ে সায়ন্তনী চোখ মেলে তাকাল আমার দিকে। কেমন অভিভূত হয়ে তাকিয়ে রইল। উজ্জ্বল এক মুখ হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে।

সত্যি তুমি এসেছ সীমাদি!

চায়ের কাপ মেঝেতে রেখে দিয়ে ও জড়িয়ে ধরল আমাকে।

কি উত্তর দেব আমি। সানুর কাছে এতটুকু হয়ে গেলাম। আমার মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না।

সানু এবার আমাকে ছেড়ে দাদাকে নিয়ে পড়ল, তুমি এমন করে আমার কাছে গোপন রেখে সীমাদিকে ঘরে নিয়ে এলে। যাও চাই না তোমার পুরস্কার।

আমি চোখ বন্ধ করে কাঁপতে লাগলাম। উনি বললেন, শান্ত হও সানু। দান নিতে হয় শ্রদ্ধার সঙ্গে।

সায়ন্তনী বলল, বেশ রাজি আছি। কিন্তু তোমার দানের বস্তুটির ওপরে তোমার আর কোন অধিকার থাকবে না। সীমাদি শুধু আমার। ওর ওপর একটুও ভাগ বসাতে দেব না তোমাকে।

বেশ তাই হবে।

দেখব তুমি কেমন তোমার কথা রাখতে পার।

সায়ন্তনী এবার আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ভেতরের ঘরে।

এস বৌদি ভাই, তুমি আমার ঘরে বন্দিনী হয়ে রইবে চিরদিন। যদি একান্তই দাদাকে দেখা দিতে চাও তাহলে ছায়া ফেলবে ওই ড্রেসিং টেবিলের আয়নায়। দাদা ওঘরের জানালা দিয়ে শুধু দেখবে ছায়া-পদ্মিনীকে।

কথা বলতে গিয়ে সায়ন্তনী হঠাৎ থেমে গেল। আমি তখন কোন রকমে ওর ঘরের আলনাটা ধরে নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলার হাত থেকে রক্ষা করছিলাম।

ও ছুটে এসে আমাকে ধরে ফেলল।

কি হল তোমার?

নিজেকে কোন রকমে সামলে নিয়ে বললাম, তোমাদেব প্রতারণা করেছি ভাই।

কি বলছ তুমি সীমাদি!

আর চোখের জল ফেলব না। এমন অনেক অন্যায় আছে যা শুধু চোখের জল ফেলে মোছা যায় না।

বললাম, ঠিক বলছি ভাই, সমস্ত গঙ্গার জলেও আমার পাপ মুছবে না।

আমাকে ছেড়ে দিয়ে ও আমার চোখের ওপর ওর দৃষ্টি মেলে দিয়ে বলল, এমন কোন অন্যায় তুমি করতে পার না সীমাদি যাতে তোমার ওপর আমার ধারণা পাল্টে যেতে পারে।

বললাম, আমার অন্যায়ের কথা শুনলে তুমি আমাকে ঘৃণা করবে সানু।

যতই অপরাধ কর দিদি, আমার কাছ থেকে ঘৃণা পাবার সব পথই তুমি বন্ধ করে দিয়েছ।

আমি অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী সানু, তোমাদের ঘরে শুধু এসেছি আমার পাপের কথাটুকু জানাতে।

আমার দুটো হাত ধরে ও বসাল একটা মোড়ার ওপর। ও নিজে বসল হাঁটু গেড়ে মাটিতে। আমাকে এবার জড়িয়ে ধরে ও তাকাল আমার মুখের দিকে। বৃষ্টির ভেতর দিয়ে মাঝে মাঝে স্নিগ্ধ সোনালি আলো যেমন করে ঝিলিক দেয় ঠিক তেমনি হাসির আভা ছড়িয়ে ও তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

বলল, কত মিষ্টি তুমি সীমাদি, ও মুখে কি পাপের ছোঁয়া লাগে।

আমার চোখের জল তখন টপ টপ করে গড়িয়ে পড়ছে ওর মুখে।

বললাম, শাস্তি দিলে কিছুটা শান্তি পেতাম সানু। তোমাদের ভালবাসার কাছে আমি সংকোচে মরে আছি।

সায়ন্তনী ওর হাত দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিতে গিয়ে বলল, ও কথা বল না সীমাদি। তোমার ভেতর ভালবাসার টান না থাকলে আমাদের তুমি টানলে কি করে।

প্রাণের টান থাকলে এমন কাজ কি করতে পারি সানু।

আমি জানি দিদি, যা হয়েছে তা তোমার ইচ্ছার বাইরে। হঠাৎ করে যা ঘটে যায় তাকে বড় করে দেখতে নেই। তুমি আমাদের চিরদিনের লোক, এর বেশি অন্য কিছু আমি জানতে চাই না।

ওর কোঁকড়ান চুলের ওপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। মনে মনে বললাম, ঠাকুর যা হারিয়েছি তা আর ফিরে পাব না কোনদিন। কিন্তু যা পেলাম জীবনে তা যেন গুপ্তধনের মতো সঞ্চয় করে রাখতে পারি।

উনি আর সানু আমাকে গাড়িতে তুলে দেবার জন্যে স্টেশন অবধি এলেন।

আমি ওঁকে প্রণাম করলাম।

বললেন, আবার এস। না এলে ভাবব আমাদের থেকে সরে গেলে তুমি।

বললাম, না এসে আমি কি করে থাকতে পারব বলুন?

সায়ন্তনী বলল, তুমি থাকতে পারলেও আমরা পারব না।

সায়ন্তনীর দিকে ফিরে বললাম, যেখানে যাই না কেন, আমি তোরই রইলাম সানু।

গাড়ি ছাড়ল। গাড়ি ছাড়ার আগে উনি আমার হাতে কাগজে জড়ান একগুচ্ছ ফুল দিয়ে বললেন, তোমার নতুন জীবনে আমার সামান্য দান সীমা।

মাথায় ছুঁইয়ে হাতে ধরে রইলাম। ওদের থেকে ক্রমেই দূরে সরে আসতে লাগলাম, কিন্তু মনটা আমার একটি লতার মতো ওদের দুটি ভাই-বোনকে নিবিড় করে জড়িয়ে উঠতে লাগল। অজস্র স্মৃতির ফুলে ভরে গেল সে লতাগাছটি।

স্টেশন আড়াল হয়ে গেল। ওঁর দেওয়া কাগজের মোড়কটি খুলতেই বেরিয়ে এল একগুচ্ছ সূর্যমুখী। সঙ্গে একটি চিঠি।

কল্যাণী

একদিন তুমি সূর্যমুখীর বীজ প্রীতির চিহ্ন হিসেবে পাঠিয়েছিলে। সেই বীজের আকাঙ্ক্ষা আজ ফুল হয়ে ফুটেছে। তোমার প্রীতির দানকে.আমি যে ভুলিনি, সে কথা জানালাম তোমারই দেওয়া ফুল তোমাকে দিয়ে। তোমার এ প্রীতির দান আমার কাছে গচ্ছিত রইবে চিরদিন।

নিত্য শুভার্থী

ফুলগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, বৃন্তের কাছ থেকে ঈষৎ নত হয়ে আছে। সূর্যের মুখোমুখি হবার আগেই লজ্জায় নতমুখী হয়েছে।

মনে হল, আমি মরব না। বেঁচে রইব চিরকাল। আমার মনের ইচ্ছা ঋতুতে ঋতুতে এমনি ফুল হয়ে ফুটে উঠবে ওঁর মনে।

কয়েক মাস কেটে গেল। অঞ্জন ফরেন গেল। সঙ্গে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করেছিল, কিন্তু পড়ার অজুহাতে গেলাম না। তা ছাড়া আমার ভাবী সন্তান ভারতের মাটিতে ভূমিষ্ঠ হোক, এই আমি চেয়েছিলাম।

অঞ্জন বলেছিল, ওই তোমার কুসংস্কার সীমা। শিক্ষায় দীক্ষায় এমন উন্নত হয়েও এ সংস্কারটুকু ছাড়তে পারলে না।

বলেছিলাম, তোমার সন্তান প্রথম ভূমিষ্ঠ হয়ে ভারতের মাটিকে স্পর্শ করবে, এর আলো বাতাস লাগবে ওর গায়ে, এ ওর কত বড় গৌরব। একে সংস্কার বল না, এ হল শুভ প্রেরণা।

অঞ্জন চলে গেলে আমি পড়ার ভেতর ডুবে গেলাম। আগেই ভর্তি হয়েছিলাম ইউনিভার্সিটিতে। এখন উঠে পড়ে লেগে গেলাম। ভাল ফল আমাকে করতেই হবে।

উনি আমাকে সাহায্য করতে লাগলেন।

এম এ পরীক্ষাটা দিলাম ওঁরই উৎসাহে। ফল বেরুল ; ওঁর সাহায্যের অমর্যাদা আমি করিনি।

আর সেই শুভ ফলের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার কোলে এল নম্রতা। মেয়ের একটা নাম অঞ্জন বিদেশ থেকে পাঠিয়েছিল, কিন্তু সে নামটা বিলিতি। তাই পছন্দ হল না কারু। উনি নামকরণ করলেন, নম্রতা। বড় সুন্দর নামের ভাবটুকু। সকলেরই বিশেষ পছন্দ হয়ে গেল।

উনি বললেন, সীমা, মেয়ের বাবা বিদেশ থেকে নাম পাঠিয়েছেন, তাঁর অমর্যাদা করা ঠিক হবে না। তার চেয়ে লিলি নামটা আটপৌরে হিসেবে ব্যবহার করা হোক।

বললাম, আপনার কথাই থাকবে।

অঞ্জন লিখল, লন্ডনে তাকে আরও একটি বছর থাকতে হবে। এই দীর্ঘ দিনগুলো আমার কাটবে কি করে তাই চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

কোন সমস্যার মীমাংসা করতে না পারলেই ওঁর শরণাপন্ন হতাম। গেলাম ওঁর কাছে।

উনি হেসে বললেন, আর কখানা নব মেঘদূত রচিত হোক।

বললাম, থাক, আপনাকে আর পথের সন্ধান দিতে হবে না।

রাগ করছ কেন সীমা। কালিদাস যক্ষের বিরহে মেঘদূত রচনা করেছিলেন, এযুগে যক্ষ প্রিয়ার দুঃখেই না হয় একখানা মেঘদূত সৃষ্টি হোক।

সায়ন্তনী পাশে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছিল ওঁর কথাগুলি। সে অমনি বলল, তাহলে কালিদাসের ভূমিকাটা নেবে কে? তুমিই নাও দাদা।

উনি বললেন, সে কেমন করে হয়। কালিদাস পুরুষ ছিলেন তাই অমন দরদ দিয়ে যক্ষের মনের কথা লিখতে পেরেছিলেন। এখন যক্ষ প্রিয়ার মনের কথা লিখতে গেলেই মহিলা কবির প্রয়োজন আসবে।

সায়ন্তনী বলল, তাহলে সে ভারটা স্বয়ং বিরহিনীকেই নিতে হয়। আমার দিকে তাকিয়ে ও দুষ্টুমির হাসি হাসতে লাগল।

আজকাল কৌতুকের একটা মধুর সম্পর্ক আমাদের ভেতর গড়ে উঠেছিল। আমার বিয়ের পর থেকে উনি আমার কাছে নিজেকে খুব সহজ করে ধরা দিয়েছিলেন।

বললাম, এমন গুরুতর একটা কাজের ভার আমার ওপর পড়বে জানলে আমি কখনও সমস্যাটার উত্থাপন করতাম না।

উনি বললেন, এর পর সীমার রাগের পালা। অতএব প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরটা শোন এখন। উপযুক্ত গুরুর কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা কর। কোথা দিয়ে ছ'টি ঋতু পার হয়ে যাবে তা বুঝতেই পারবে না।

বললাম, আপনার কথা আমি মেনে নিতেই শিখেছি।

উনি হেসে বললেন, এ এমন এক পরিকল্পনা, যা অন্যকে দিয়ে শেষে পস্তাতে হয় না।

রবীন্দ্রসঙ্গীত আমি বহুদিন অনুশীলন করেছি। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের কাছে আমার গলার প্রশংসাও শুনেছি। তবু আমার মনে হয়েছে এ শিক্ষার শেষ নেই। কথার সঙ্গে সুরের এমন অঙ্গে অঙ্গে মিল ফুটিয়ে তুলতে গেলে বহু যুগের সাধনার প্রয়োজন।

প্রাণ মন ঢেলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা করতে লাগলাম। নতুন নতুন গান তুলি আর সপ্তাহের শেষে রবিবার দিনটি গিয়ে ওঁকে শুনিয়ে আসি।

একদিন উনি বললেন, ভানুসিংহের পদাবলীর গানগুলি তুমি গাইবে, আর আমি তাদের কথা নিয়ে ব্যাখ্যা করব।

পর পর যে গানগুলো বইতে ছিল, উনি তাদের সুবিধে মতো আগে পিছে সাজিয়ে নিলেন। তারপর আমি গাইতে লাগলাম আর উনি গ্রন্থনা করে গেলেন।

আমরা যাকে চাই তাকে কেন পাইনা। যদি আমার আকাঙ্ক্ষিত জন কাছে আসে তাহলে সে কেন চিরদিনের হয়ে আসে না। এত দুঃখের সাগর মন্থন করলাম যে অমৃতকে লাভ করব বলে সে কেন অনন্ত বেদনার স্বাদে পূর্ণ করে দেয় অন্তর।

এই পাওয়া না পাওয়ার মাঝে জীবনের যে অশান্ত দুঃখলীলা, তাই হল প্রেম।

অমনি করে উনি প্রেম সম্বন্ধে প্রথমে ব্যাখ্যা করে গেলেন। তারপর শুরু হল গানের সঙ্গে কথকতা।

ওই শ্যামের বাঁশি বাজছে। বাঁশিতে ঝরছে সুর, আর নয়নে প্রেমসিন্ধু। তিনি ডাকছেন তাঁর মানসীকে, রাধা, রাধা, রাধা। বাঁশির সুরে সাধা হচ্ছে আকাঙ্ক্ষিতার নাম।

এই ডাকে সাড়া দাও সজনি। নীল বসনখানি জড়িয়ে নাও অঙ্গে, হৃদয়ের সাজিখানি ভরে নাও প্রণয়ের রাঙা ফুলে। যাঁর কাছে চলেছ, এ ফুল তাঁর চরণে উজাড় করে দিয়ে এস।

ওই গহন কুসুম কুঞ্জে বাঁশি বাজছে। আর দেরি নয়, ত্বরা করে চল সখি সেই বংশী-বাদকের কাছে যাই।

এবার আমার গান শুরু হল,

'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে,
বিসরি ত্রাস লোক লাজে
সজনি, আও আও লো...'

গান শেষ হলে উনি আবার কথকতা শুরু করলেন।

প্রেমাস্পদ ডাক দিয়েছেন বাঁশির সুরে, সে ডাকে সাড়া না দিয়ে কি থাকা যায়। যিনি আকাঙ্ক্ষিত, যাঁকে পাবার জন্য নিরন্তর মনের কান্না, তিনি যখন ডাক দেন, তখন সকল কিছু ফেলে রেখেই যে চলে যেতে হয়। তখন শাঙন গগনের ঘোর ঘনঘটার ভয় থাকে না, শাল পিয়াল আর তাল তমালের নিবিড় ঘন আঁধার, কুঞ্জের পথ রোধ করতে পারে না।

তখন শ্রীমতী রাধা তাঁর পার্শ্বচারিণী সখীদের বলেন, চম্পকের ফুলে সাজিয়ে দে আমার চিকুর, সিঁথিতে পরিয়ে দে সিঁথি মৌর, গলায় দুলিয়ে দে মালা, দারুণ বাঁশির সুর আমার কানের ভেতর দিয়ে মর্মে এসে বিঁধেছে। আমি যাব সেই নির্দয় কানুর কুঞ্জে। তর্জিত যমুনা, গর্জিত মেঘ আমার পথরোধ করতে পারবে না সখী। এই শাওন নিশীথেই আমি যাব শ্যাম-অভিসারে।

ওঁর কথা শেষ হলেই আমি গান শুরু করলাম।

'শাঙন গগনে, ঘোর ঘনগটা
নিশীথ যামিনীরে।
কুঞ্জ পথে সখি, কৈসে যাওব
অবলা কামিনীরে।'

আমি গানের পর গান গেয়ে গেলাম, উনি তার সঙ্গে কথা যোগ করে চললেন।

এক সময় কথা শেষ হল, গান থামল। সারা ঘরে কি এক মধুর আনন্দ কতক্ষণ ধরে কাঁপতে লাগল। আমরা কেউ কথা বলতে পারলাম না। সেই অদৃশ্য রোমাঞ্চকর মুহূর্তগুলো নীরবে থেকে অনুভব করতে লাগলাম।

এক সময় বললাম, আপনার কথাগুলো লিখে রাখুন। আমি সেগুলি পড়ব আর গান গাইব। তাহলে গানে আমার সত্যিকারের প্রাণ আসবে।

সায়ন্তনী বলল, সত্যি সীমাদি, এমন মিষ্টি গাওয়া তোমার গলায় আমি অনেকদিন শুনিনি।

বললাম, সে আমার কৃতিত্ব নয় ভাই, ওঁর!

উনি বললেন, কথা আর সুরের হরগৌরী মিলন না হলে তা সম্ভব হয় না সীমা। তোমার গানের ভাব আর সুর আমার কথাকে টেনে বের করেছে।

এরপর থেকে কি এক অনিবার্য আকর্ষণে জড়িয়ে পড়লাম। সপ্তাহের ছয়টি দিন অধীর আগ্রহে কাটাতাম। রবিবারের সকাল থেকে আনন্দে রোমাঞ্চ হত। দুপুরে ট্রেনে চেপে আসতাম ওঁর বাড়ি। গানে গল্পে জমে উঠত আমাদের আসর। আমি, উনি আর সায়ন্তনী, যেন একটি ছোট সংসারে আমরা তিনটি প্রাণী। সুখ দুঃখ হাসিকান্নার ভেতর কেটে যায় আমাদের দিন।

এক রোববার গিয়ে শুনলাম, উনি হঠাৎ কোথায় যেন তাঁর এক অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে গেছেন। ফিরবেন সেই রাত্তিরে।

আমি আর সায়ন্তনী মুখোমুখি বসলাম। সেদিন কেবল আমরা দুজনে। হঠাৎ কি মনে এল জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা সানু, আমার কাছে একটা সত্য কথা বলবি?

সায়ন্তনী বলল, ভনিতা রাখ, কবে তোমার কাছে মিথ্যে বলেছি বল?

না ভাই, রাগের কথা না, আজ একটা কথা জানতে বড় ইচ্ছে করছে। বলে ফেল। আমি জানলে তুমিও জানতে পারবে।

বললাম, এমন মিষ্টি দুটো চোখ দেখে কেউ কি কোনদিন ভোলেনি সানু?

সহসা ও আমার কথার কোন উত্তর দিতে পারল না। দূরের মাঠের দিকে কেমন যেন বিষণ্ণ মুখে তাকিয়ে রইল।

বললাম, কি হল ভাই, এমন আনমনা হয়ে গেলে কেন?

এবার ও তাকাল আমার দিকে। নতুন পাতায় জমে ওঠা জলের মতো ভারি হয়ে উঠেছে ওর দুটো চোখ।

বলল, এ প্রসঙ্গ কেন তুললে দিদি?

কোন কিছু ভেবে তো বলিনি ভাই। যদি কোন আঘাত দিয়ে থাকি...।

সায়ন্তনী আমার মুখে হাত রেখে বলল, অমন কথা বল না দিদি, তাহলে আমার দুঃখ রাখার ঠাঁই থাকবে না।

ও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বড় কষ্ট পাচ্ছিলাম দিদি মনের কথা কাউকে বলতে না পেরে। কথাটা তুমি তুললে, তাই কিছু বলার সুযোগ পেয়ে বাঁচলাম।

আমার চোখও শুকনো ছিল না। এমন আনন্দময় মেয়েটির ভেতর এত দুঃখ কোথা থেকে এল।

বললাম, যদি কষ্ট হয়, তাহলে এ প্রসঙ্গ বন্ধ থাক সানু।

আমি বলতে চাই দিদি। কতবার কত চেষ্টা করেছি ঢেকে রাখার জন্যে কিন্তু পারিনি। সারাদিন সবার সঙ্গে হাসি গল্পে কোন রকমে কেটে যায়, কিন্তু রাতে বিছানায় শুয়ে হঠাৎ বুকের ভেতর কেমন গুমরে গুমরে ওঠে। চোখের জলে ভিজে যায় আমার বুক।

বললাম, আমি তোর দিদি সানু, খুলে বল তোর মনের কথা। কোন কিছু গোপন করিস নে ভাই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে সানু নিজেকে সামলে নিল। মেঘ-ভাঙা করুণ রোদ্দুর ফুটে উঠল মুখে। বলল, আমার গোপন কথা যতদিন গোপন থাকে ততদিনই ভাবনার কথা, কিন্তু তা প্রকাশ হয়ে পড়লে আর ভাবনার কিছুই থাকে না।

সায়ন্তনী বলল, তোমরা শুনে কি ভাববে জানি না, আমি ভালবাসতাম এমন একটি ছেলেকে, যাকে তোমরা সমর্থন করতে পারবে না কোন রকমেই।

বললাম, তোমার বিবেচনার ওপর আস্থা কখনও হারিয়েছি বলে তো মনে পড়ছে না সানু।

সায়ন্তনী কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। এরই ভেতর মনে হল সে গুছিয়ে নিচ্ছে তার মনের কথাগুলো।

একসময় ও কথা শুরু করল।

কলেজ থেকে মাঝে মাঝে আমাদের ছবি আঁকার কাজে বাইরে বেরুতে হয়। আমিও তেমনি বেরুতাম।

ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ত। আমি কিন্তু ছবি আঁকার কাজে একা থাকাই পছন্দ করতাম।

এবার আমার দৃষ্টি মাঠের দিকে আকর্ষণ করে সায়ন্তনী বলল, ওই যে বাড়ির সামনে ফাঁকা মাঠখানা দেখছ, ওর মাঝে একটা ঝিল আছে। তার তিনদিক ঘিরে সারি সারি নারকেল গাছ। চমৎকার পরিবেশটি। একদিন কলেজ থেকে ছবি আঁকার কাজে বেরিয়ে সিধে ওইখানেই চলে গেলাম। চৈত্রী দুপুর ঝাঁ ঝাঁ করছে। একটা নারকেল গাছের ছায়ায় বসে ওপারের ছবিটি আঁকার জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম, হঠাৎ চোখ পড়ল এপারে ঝিলের দক্ষিণ কোণে। অমনি সাবজেক্ট বদল হয়ে গেল। দেখলাম, একটি লোক মাচান বেঁধে বসে ঝিলে ছিপ ফেলছে। চমৎকার সাবজেক্ট। আঁকার জন্যে তৈরি হলাম। সবে খাতার পাতায় আঁচড় টেনেছি, দেখি লোকটি ছিপ রেখে উঠে পড়েছে। শুরুতেই ভেস্তে গেল দেখে একটু বিমর্ষ হলাম। হয়ত আবার বসবে ভেবে অন্যদিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একসময় ফিরে দেখি লোকটি আমার দিকে আসছে। কাছাকাছি আসতেই চিনতে পারলাম। একই ট্রেনে মাঝে মাঝে ভদ্রলোককে উঠতে দেখেছি। বয়সে ছোড়দার চেয়ে কিছু কম হবে বলেই মনে হয়।

একটু দূরে এসে দাঁড়ালেন। আমি অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলাম। ছবি আঁকার খাতায় এলোমেলো কতকগুলো আঁকিবুকি কাটতে লাগলাম।

ভদ্রলোক বললেন, স্কেচ করছেন বুঝি?

মুখ তুলে তাকালাম ওঁর দিকে। বললাম, চেষ্টা করছি।

আর্ট কলেজের ছাত্রী মনে হচ্ছে?

সংক্ষেপে বললাম, হাঁ।

ভদ্রলোক এবার বললেন, কি আঁকলেন, দেখাতে আপত্তি আছে কি?

আঁকলাম কই। শুরু করতে না করতেই তো আপনি উঠে পড়লেন।

ভদ্রলোক হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়েন আর কি।

আমি সাবজেক্ট! একটু আগে ভাগে বলতে হয়। তাহলে নিজে ছবি হবার এমন দুর্লভ সুযোগটা নষ্ট করতাম না।

হেসে বললাম, সাবজেক্টকে সচেতন করে দিতে নেই।

ভদ্রলোক বললেন, আপনার বিষয় নির্বাচনে কিন্তু একটু ভুল হয়েছে।

কেন বলুন তো?

কাল আসুন আসল সাবজেক্ট পেয়ে যাবেন।

পরের দিন ঠিক ওই সময়ে গিয়ে দেখি ভদ্রলোক নারকেল গাছের ছায়ায় আগে ভাগেই বসে আছেন।

বললাম, সাবজেক্ট কই?

উনি উঠে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে দেখালেন।

গতকাল ভদ্রলোক যেখানে বসে মাছ ধরছিলেন, ঠিক সেখানেই আর একটি লোক বসে আছে। সম্পূর্ণ খালি গা। মাথায় একটা গামছা বাঁধা। রোদ্দুরের তাপ থেকে মাথা রক্ষা করছে। ফাতনার দিকে তাকিয়ে আছে একাগ্র দৃষ্টিতে।

ভদ্রলোক বললেন, মৎস শিকারীর এই হল টিপিক্যাল চেহারা।

সত্যি, অদ্ভুত চেহারার ওই মানুষটি।

বললাম, চমৎকার টাইপ কিন্তু। উনি মুখে আঙুল রেখে ইসারায় জোরে কথা বলতে বারণ করলেন।

বললেন, জোগাড় করলাম আপনার সখ মেটাতে। আমাদের মতো লোককে দিয়ে কোনরকমে কাজ চললেও ঠিক ঠিক বিষয় অনুযায়ী এফেক্ট আসবে না।

এরপর হাসতে হাসতে বললেন, বসে যান, বসে যান, বড়শিতে একটা মাছ লাগলেই চেহারা বদলে যাবে।

বেশ কৌতুকপ্রিয় মানুষটি। ভাল লাগল ওঁর ব্যবহার।

ছবি আঁকছি, উনি এদিক সেদিক তাকাতে লাগলেন।

এক সময় আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ছবি আঁকার সময়ে কাউকে দেখালে অস্বস্তি লাগে তাই না?

আঁকতে আঁকতেই বললাম, আপনাকে দেখাতে অবশ্য অস্বস্তি লাগার কথা নয়।

কেন, আমি আপনার মাস্টারমশায় নই বলে, না সাবজেক্ট নই বলে?

কোনটাই নন, তাই।

বেশ, আপনি আগে আঁকা শেষ করুন।

কেন বলুন তো?

আমি সাধারণত বলার চেয়ে করাকেই পছন্দ করি।

কি করবেন আপনি?

তার আগে আপনার আঁকা শেষ হোক।

স্কেচটা শেষ করতে বড় একটা দেরি হল না। উনি আমার হাত থেকে ছবিখানা চেয়ে অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন।

বললেন, আপনার হবে, তবে আরও স্পিড দরকার।

কথা শুনে জ্বালা ধরল গায়ে।

বললাম, আর্ট কলেজে পাশ করেছেন নাকি?

মাথা নেড়ে বললেন, আরে রামো, পয়সা কই পয়সা নষ্ট করবার। ওসব বড়লোকদের মানায়।

বললাম, কিন্তু সমালোচনা দেখে মনে হচ্ছে ছবি আঁকার অভ্যাস আছে।

উনি হেসে বললেন, একেবারে আঁকতাম না বললে মিথ্যে বলা হয়, তবে আপনাদের মতো পড়িনি কোন ইস্কুল কলেজে।

একটু দমে গেলাম।

উনি বললেন, এই যে আপনার ছবিতে আপনি কতকগুলো বাঁশের খণ্ড এঁকেছেন, এগুলো বড় বেশি ফিনিসড ড্রইং হয়ে গেছে। স্কেচের ক্ষেত্রে সেটা ঠিক নয়।

দিন আপনার পেন্সিলটা।

দু চার টানে উনি আমার মতো আর একটি স্কেচ করলেন।

এমন অবাক জীবনে হইনি। এত বড় শিল্প প্রতিভা একটা আধময়লা শার্ট পরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কাল এই মানুষটিকে কোমরে গামছা জড়িয়ে মাছ ধরতে দেখেছি।

বললাম, আপনি আর্ট কলেজে শেখেননি, এমন কথা বললেন কেন?

সত্য বলা ভাল বলে।

নিজেই শিখেছেন?

দাদু ছিলেন শিল্পের সত্যিকারের সাধক, তাঁর কাছেই হয়েছিল আমার হাতে খড়ি। তারপর নিজের চেষ্টায় যদ্দুর এগুনো যায়। হঠাৎ এক সময়ে থেমে গেল সব। বাবা মারা যাবার পর অগাধ ঋণ আর সঙ্গে মস্ত বড় একটা সংসারের ভার এসে পড়ল মাথার ওপর। ছবির জগৎ মুছে গেল।

বললাম, এটা হতে দেওয়া উচিত হয়নি কিন্তু।

আপনি হলেও তাই হত।

এরপর উনি ওই প্রসঙ্গে ছেদ টেনে দিয়ে বললেন, সাবজেক্ট দরকার হলে সংকোচ না করে চলে আসবেন এখানে। কিছু কিছু সন্ধান দিতে পারব।

হেসে বললাম, এলেই আপনাকে পাব, এমন নিশ্চয়তা আপনি দিচ্ছেন কি করে?

আমি এখানে থাকি বলে।

চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, কোথাও ঘরবাড়ির চিহ্ন নেই। একটা ঝিল অগাধ জল বুকে নিয়ে শুয়ে আছে।

বললাম, মাঠের মাঝে ঝিলের ধারে বসে রাতদিন কি শুধু মাছই ধরেন।

বললেন, আন্দাজটা দেখছি ঠিকই করেছেন। আপাতত তাই, পরে কি হয় বলতে পারি না। এই যে ঝিলটা দেখছেন, এতে অঢেল মাছ। এইটুকু মাত্র আমার পৈতৃক সম্পত্তি। মাছ ধরা আর চালান দেওয়া আমার কাজ।

বললাম, এতে শুনেছি অনেক পয়সা পাওয়া যায়।

হেসে বললেন, আর্টিস্ট মানুষ হয়ে অনেক কিছু জেনে ফেলেছেন দেখছি।

ওঁর কথায় একটু সঙ্কুচিত হলাম।

উনি অমনি বললেন, না না সংকোচের কি আছে। সব কিছু জানাই তো ভাল। এই দেখুন না আমার লাইন ছেড়ে কোথায় আমাকে দাঁড়াতে হয়েছে।

বললাম, কারু ওপরে এ কাজের ভার দিয়ে নিজের কাজটা করতে পারেন না?

বললেন, মাঠের মাঝে পুকুর, তাই মাছ চুরির সম্ভাবনা এখানে সবচেয়ে বেশি। অতএব আত্মনির্ভরশীল হওয়া ছাড়া উপায় কি বলুন।

এরপর মাঝে মাঝে গিয়েছি ওখানে। উনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন পাশের গাঁয়ে। সেখানে খাটালে বসে এঁকেছি মোষেদের বিচিত্র জীবনযাত্রার ছবি। উৎসাহ দিয়েছি ওঁকে। উনি একের পর এক ছবি এঁকে গেছেন। যেন ওঁর হারানো জীবনটাকে উনি ফিরে পেয়েছেন।

পরের দিন গিয়েছি, মাছ ধরায় মগ্ন। কালকের শিল্পী মানুষটি আজকে একেবারে ঘোর সংসারি।

মনে মনে একটা জেদ চেপে গেল। প্রায় দিন আমি বেরুতে লাগলাম ওঁকে নিয়ে। জাগিয়ে তুলব ঘুমিয়ে থাকা একটি মানুষকে। এ যে কতবড় জয়ের আনন্দ দিদি, তা হয়ত আর কেউ বুঝবে না।

আমরা বিভিন্ন ঋতুতে ছবি আঁকতে লাগলাম। রঙের ব্যবহারেও দেখলাম মানুষটির আশ্চর্য দক্ষতা। ওঁর কাছে হার মেনে মনে মনে খুশি হই। কিন্তু মুখের ঝগড়া থামে না। যে ভাবেই হোক ওঁকে একবার খোঁচা দিতে পারলেই আসল শিল্পী মানুষটি বেরিয়ে আসে। তখন শিল্প সম্বন্ধে ওঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় মেলে।

একদিন বললাম, বুড়ো যদি আঁকতে হয়, তাহলে তার দাড়ি থাকাই ভাল।

উনি বললেন, মোটেই তা না।

বললাম, কেন, রবীন্দ্রনাথের দাড়িতে কি বেমানান দেখায়?

তা হয় তো দেখায় না, কিন্তু এর ফলে সব বৃদ্ধই এক হয়ে যান।

অর্থাৎ?

দাড়িতে ঢাকা পড়ে তাঁদের মুখের আসল চেহারা। তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানুষকে এক মানুষ বলে ভুল হয়।

আপনি আসল বৃদ্ধ দেখেননি বলে এমন কথা বলছেন। দাড়িই বৃদ্ধদের আসল শোভা।

শুধু তাই নয়, দাড়িওয়ালা বুড়োদের আঁকতে আপনাদের মতো ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধেও।

একথা কেন বলছেন?

আপনি আসল বৃদ্ধ দেখেননি বলে।

কেমন রাগ হল। বললাম, আপনার দেখা দাড়িহীন সেই সুন্দর বৃদ্ধটিকে দেখাবেন কি?

বললেন, সাধারণের আর শিল্পীর চোখে দেখা ভাল কি এক হয়। দাড়িতেই যদি মুখের তিন ভাগ ঢাকা পড়ে গেল তাহলে আঁকলেন কি। কাল আসুন আপনাকে যথার্থ বুড়োর ছবি দেখাব।

পরের দিন ঠিক দুপুরে গিয়ে দেখি, অবাক কাণ্ড। ঝিলের ধারে শুকনো একটি পলাশ গাছ। বসন্তেও ফুল ফোটাতে পারেনি হতভাগ্য গাছটা। তারই তলায় একটি ছেঁড়া চাটাই এর ওপর বসে এক বৃদ্ধ। একেবারে অথর্ব। পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। চিনতে পারল না। অন্ধ বলেই মনে হল। সহস্র বলী-রেখায় মুখটি ভরে আছে। সত্যি আঁকার এমন সাবজেক্ট এর আগে পেয়েছি বলে মনে হয় না। উনি ছিপ ফেলে বসেছিলেন। আজ উঠে এলেন না। আমাকে ইসারায় কাছে ডাকলেন।

যেতেই বললেন, আপনার মডেল রেডি। পছন্দ হলে কাজে বসে যেতে পারেন।

বললাম, হার মানলাম আপনার কাছে।

উনি বললেন, তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিন, নইলে অনেক কিছুই হারাবেন।

স্কেচ করতে শুরু করলাম। যৌবনে বৃদ্ধটি বেশ উন্নতদেহী ছিল বলেই মনে হয়। মুখের কয়েকটি রেখার পরিবর্তনে কি আশ্চর্য পরিবর্তন আসে মানুষের।

আঁকা শেষ হল। উনি কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। উঠে দাঁড়ালাম। ছবিটি খুব নিবিষ্ট হয়ে দেখতে লাগলেন।

বললেন, আজ সত্যি আপনার জয় হল। এত ভাল স্কেচ আগে কখনও আপনার হাতে দেখিনি।

মনে মনে খুশি হয়ে বললাম, আপনি কই আঁকলেন না? তাহলে আরও ভাল হত।

ভাল হত না।

বললাম, এমন বিনয় তো আগে কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না।

মিথ্যে কেন বকাচ্ছেন বলুন তো। আমি চেষ্টা করেও পারিনি।

মনে মনে খুব রাগ হল। বললাম, সত্যবাদী যুধিষ্ঠির শূন্যে আঙুল দিয়ে আঁকছিলেন নাকি?

উনি আমার কথার কোন জবাব দিলেন না। বৃদ্ধটির হাত ধরে উঠিয়ে সামনের নারকেল গাছের ছায়ায় বসিয়ে দিয়ে এলেন।

ফিরে আসতেই বললাম, বুড়ো মানুষকে শুকনো পলাশ গাছের তলায় না বসিয়ে নারকেল গাছের ছায়ায় বসাতে পারতেন। রোদ্দুর থেকে মাথাটা বাঁচত।

বললেন, বিশ্বকর্মা আপনাকে উপমার যোগ্য দুটি চোখ দিয়েছেন কিন্তু দৃষ্টি দেননি।

ওঁর আক্রমণটা বড় আঘাত করল।

বললাম, একটু দৃষ্টিটা খুলে দেবেন কি?

হেসে বললেন, রাগলে পরে অন্ধ হয়ে যেতে হয়। তখন শত চেষ্টাতেও দৃষ্টি আর ফেরে না।

হেসে ফেললাম।

উনি ততক্ষণ গভীর হয়ে গেছেন। বললেন, এই শুকনো পলাশ গাছটার মতই আজ ওই বৃদ্ধের অবস্থা। রঙ নেই শুধু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার প্রতীক্ষা। এতবড় একটা ব্যাকগ্রাউন্ড, তাকে কাজে লাগাতে পারলেন না। বৃদ্ধের কষ্টটা সার্থক হত যদি আপনি এই পরিবেশটুকু ঠিকমত ব্যবহার করতে পারতেন।

মনে হল সত্যি বুড়োটিকে আমার জন্যেই এমন চড়া রোদের তাপটুকু সহ্য করতে হল।

বললাম, বুড়োটিকে কিছু দিলে হয়। অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে আমার জন্যে।

মুহূর্তে মানুষের মুখের এমন পরিবর্তন হতে পারে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি! ওঁর মুখখানা লাল হয়ে উঠল।

বললেন, নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে দান করাটা শোভন নয়কি?

কেমন চমকে উঠলাম।

কেন বলুন তো?

আপনি যে জায়গাটুকুতে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন, ওটুকু ওই বৃদ্ধের।

কি বলছেন আপনি?

আর ওই ঝিলটা দেখছেন, ওটাও।

অবাক হয়ে বললাম, কিন্তু আপনি একদিন বলেছিলেন, এ ঝিলটা আপনার।

উনি আমার দাদু সায়ন্তনী।

চোখের জল ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না। ভেজা দুটো চোখ ওঁর মুখের ওপর তুলে বললাম, কেন আপনি আমাকে এমন অসম্মানেব মাঝে ফেললেন। কেন আগে পরিচয় দিলেন না উনি আপনার দাদু বলে।

সেই প্রথম আমি এমন একটি বলিষ্ঠ পুরুষের চোখ সজল হয়ে উঠতে দেখলাম।

বললেন, এতবড় শিল্পী, আজ নিজেই শিল্পের বস্তু হয়ে উঠেছেন। ভাগ্যের এমনি খেলা সায়ন্তনী।

ফিরে আসব। উনি কাছে ডাকলেন। বললেন, একটা কথা বলব কিছু মনে করবেন না।

তাকিয়ে রইলাম ওঁর মুখের দিকে।

আর আসবেন না এখানে। আমার শেষ মডেল আপনাকে সাপ্লাই করলাম।

বললাম, একথা কেন বলছেন, আমাকে কি ক্ষমা করতে পারেন না?

ক্ষমার কথা নয় মিস সেন। আমি গরিব, আপনার মতো এখনও দুটি আইবুড়ো বোন আমার ঘরে। বিয়ে দিতে পারিনি। শিল্প বড় সখের জিনিস। আপনার সঙ্গে ঘুরে আমি এসব কথা ভুলে ছিলাম, কিন্তু

ভুললে তো চলবে না। তাই অনুরোধ. আর আসবেন না আপনি। আপনাকে দেখলেই আমার ভুলে যাওয়া অতীত ফিরে আসবে।

সেদিন চোখের জল ফেলতে ফেলতে ফিরে এসেছি সীমাদি।

সায়ন্তনী কথা শেষ করে চুপচাপ বসে রইল।

আমি কিন্তু চুপচাপ থাকতে পারলাম না। বললাম, এমন মানুষ ফেলে কি চলে আসতে হয় ভাই।

আমি ওঁর বিঘ্ন ঘটাতে চাই না দিদি।

জীবনের ক্ষেত্রে এত অভিমান কি চলে সানু?

সায়ন্তনী কোন কথার জবাব না দিয়ে খোলা মাঠের দিকে তাকিয়ে রইল।

বললাম, আমি একবার ওঁকে দেখতে চাই, অবশ্য যদি তুমি কিছু মনে না কর।

এ কেমন কথা হল দিদি। তোমার কাজে আমি কিছু মনে করব এ কথা তুমি ভাবলে কি করে!

বললাম, তোমাকে না নিয়ে আমি একাই যাব। আর যাব আজ, এখুনি।

ওঁকে এখন পাবে কি না তা তো বলতে পারি না দিদি।

এটুকু পথ, না হয় ফিরেই আসব।

চলে গেলাম মাঠের মাঝে সিঁথি পথটা ধরে।

এসে পৌঁছলাম সেই নারকেল গাছের সারির ভেতর। সামনেই ঝিল। চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না। শেষে নিরাশ হয়ে মাঠের পথ ধরলাম। পেছন থেকে কে যেন ডাক দিল, মিস সেন, চললেন নাকি?

ফিরে দাঁড়িয়ে দেখি, ঝিলের উঁচু পাড়ের ওপর এক ভদ্রলোক হাতে এক কাঁদি ডাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

কাছে এগিয়ে যেতেই উনি অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।

ক্ষমা করবেন, আপনাকে ভুল করেছিলাম।

হেসে বললাম, ভুল আপনি ঠিক করেননি, আপনি যাকে ডাক দিয়েছিলেন, সম্পর্কে আমি তার বৌদি। কথাটা বলেই মনে হল 'দিদি' বললেই শোভন হত। যাক যা হবার তা হয়ে গেছে।

উনি বললেন, আপনি এসে ঝিলের ধারে দাঁড়ালেন, আমি তখন দক্ষিণের ওই নারকেল গাছটার ওপরে। এই, ডাব পাড়ছিলাম আর কি।

ডাব পাড়ছিলেন, আপনি নিজে!

কেন, খুব অবাক হলেন বুঝি? শহরের কাছেপিঠে থাকি তবু এখনও গায়ের থেকে মাটির গন্ধ যায়নি, তাই না?

বড় ভাল লাগল ওর সহজ ব্যবহারটুকু।

বললাম, না ভাই, আমার সম্বন্ধে যা ভেবেছেন, আমি কিন্তু তার একটাও নই। শহরে থাকলেও মাটিকে আমি ভালবাসি।

আপনার সঙ্গে দেখছি আমার বেশ মনের মিল আছে। আসুন একটু গল্প করা যাক।

আমরা একটা নারকেল গাছের তলায় গিয়ে বসলাম।

প্রথমে আমিই কথা বললাম, আমাকে যে মানুষ বলে ভুল করছিলেন, তার কাছে কিছু বলার থাকলে আমাকে নিশ্চিন্তে বলতে পারেন।

মনে হল একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। কিন্তু সে সামান্য সময়মাত্র। বললেন, সায়ন্তনী আসে না কেন বৌদি?

আপনি তো তাকে আসতে বারণ করে দিয়েছেন ভাই।

আচ্ছা আপনিই বলুন, সংসারে চলতে গেলে এটা কর না, ওটা কর না কতই তো শুনি, কিন্তু তার সবকটা কি আমরা মেনে চলি?

সায়ন্তনী বড় চাপা আর অভিমানী জানবেন।

একটু থেমে ভদ্রলোক বললেন, ওকে সেদিন ফিরিয়ে দিয়ে আমিও কি খুব আরামে আছি মনে করেন?

হেসে বললাম, কেন, কি হল আবার আপনার?

বেশ ছিলাম একা একা। মাছ ধরা আর চালান দেওয়া। হঠাৎ সব গোলমাল হয়ে গেল। এখন না পারি মাছ ধরতে আর না পারি ছবি আঁকতে।

বললাম, আপনার কাছ থেকে ছবি আঁকার অনেক কিছুই ও শিখেছে।

সে কি হাসি ভদ্রলোকের। বললেন, আজ আর মাছ ধরা হল না বৌদি। ব্যবসাটা একেবারে মাটি করে দিলেন।

একটু অবাক হয়েই বললাম, কেন বলুন তো?

তেমনি হাসতে হাসতেই ভদ্রলোক উত্তর করলেন, শ্রীমান দক্ষিণা রঞ্জন গুপ্তের কাছে ছবি আঁকার কৌশল শিখেছেন একজন আর্ট কলেজে পড়া ভদ্রমহিলা, একথা শুনলে মাছ ধরায় মন বসে বৌদি।

না না ঠাট্টা নয়, সত্যি বলছি।

আমিও কি মিথ্যে বলছি বৌদি! আবার হাসি।

বললাম, নিজের সম্বন্ধে বড় কম ধারণা আপনার।

বড় ধারণা করবার মতো কিছু নেই বলে।

আপনার সঙ্গে কথায় পেরে উঠব না ভাই। পাতার আড়ালে যতই লুকোবার চেষ্টা করুন, গন্ধ চাপা থাকবে না।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। পাশে পড়েছিল এক কাঁদি ডাব। কাটারি দিয়ে একটি কেটে আমার হাতে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নিন, গরমের দিনে শরীর ঠাণ্ডা করুন।

ডাব খেতে গিয়ে কাপড় ভিজল দেখে বললেন, সব শহুরে হয়ে গেলেন বৌদি। স্ট্র ছাড়া দেখছি আপনাদের গতি নেই।

উঠে গেলেন ঝিলের ধারে। নিয়ে এলেন জলজ কোন উদ্ভিদের পাব। হাতে দিয়ে বললেন, টানুন, হয়ত কিছুটা সুবিধে হতে পারে।

ডাব খাওয়া শেষ করে আবার বসলাম। এবার আমিই কথা শুরু করলাম, এই গরমের দিনে দান করলেন, দক্ষিণা দেবেন না?

দক্ষিণা?

হ্যাঁ, ও তো আপনার নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে।

হেসে অস্থির। বললেন, ঝিলে জাল পড়ে সকালে, সে সময় এলে না হয় একটা মাছ দক্ষিণা দেওয়া যেত। আর দুপুরে ছিপ নিয়ে আমি নিজে মেটাই মাছ ধরার সখ। আজ বোধহয় আপনার আসার আঁচ পেয়েছিল মাছগুলো, তাই বৈষ্ণব ভজন গেয়ে গেল। এখন দক্ষিণা কি দিই বলুন?

ওসবের কিছুই চাই না। কেবল আসুন একদিন আমাদের ওখানে। এই আপনার দক্ষিণা।

একে দক্ষিণা বলছেন বৌদি। আমার কাছে আপনার এই ডাক তো প্রতিদান।

সে যাই ভাবুন, কবে আসছেন বলুন তো?

শনি আর সোম ছাড়া যেদিন যেখানে বলবেন সেখানে হাজির হতে পারি।

বেশিদূর নয়, ওই যে মাঠের শেষে কলোনির বাড়িগুলো আরম্ভ হয়েছে, ওখানে গিয়ে প্রফেসর সেনের নাম করলেই বাড়ি চেনার অসুবিধে হবে না। আর আসুন না আগামীকাল, এর একটু আগে।

বেশ যাব।

কোন ভুল হবে না তো?

আপনারাই না আবার ভুলে বসেন।

হেসে বিদায় নিলাম। পথে নেমে এসেছি, দক্ষিণা রঞ্জন পেছন থেকে বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান, একটা কথা মনে এল।

দাঁড়ালাম। কাছে এসে বললেন, আমার ব্যবহারে কিছু মনে করলেন না তো?

একটু অবাক হয়েই বললাম, কেন বলুন তো? মনে করার কথা এল কোত্থেকে।

আপনাকে 'বৌদি' বলে ডাকলাম, আপনি আবার কিছু ভেবে বসেন নি তো?

হেসে বললাম, খুব ভাবনায় পড়েছেন দেখছি। তা একটু ভাবুন না। বৌদি বলতে গেলে যে অঙ্ক কষতে হয়, তা একটু কষেই দেখুন।

ও অমনি বলল, ভাবতে আমার ভারি বয়েই গেছে। আমি তো ডেকে ফেলেছি, এর পর যা ভাবনার আপনিই ভাবুন।

চলে গেল ও।

ফিরে আসতে আসতে সায়ন্তনীর পাশে রেখে ওকে কল্পনা করতে লাগলাম। শহুরে সংস্কৃতির ধারে কাছেও নেই দক্ষিণা রঞ্জন। কিন্তু ওর ভেতর সতেজ সহজ একটি মানুষের মন আছে, আর তার ওপর আছে শিল্পের প্রতিভা। মনে মনে ভাবলাম, শহর চাই না, মানুষের মন চাই। সেদিক থেকে দক্ষিণা রঞ্জন আমাদের মনের মানুষ।

ফিরে এসে ওঁকে সব বললাম, সব শুনে বললেন, তুমি আর সানু যাকে স্বীকার করে নিয়েছ, তাকে মেনে নিতে আমার বাধা কোথায় সীমা।

বললাম, তবু একবার আপনার ওর সঙ্গে কথা বলা দরকার। আমরা হয়ত অনেক কিছু জানতে পারিনি, যা আপনার চোখে ধরা পড়বে।

পরের দিন শুক্রবার। আমি এসে পৌঁছলাম। ওঁর অফ ডে। উনি বাড়িতেই ছিলেন। বললাম, সায়ন্তনী কোথায় বেরিয়েছে?

কলেজ থেকে এখনও তো ফেরার সময় হয়নি।

আমি নিজেই যে আজ তাড়াতাড়ি এসে পড়েছি, সে খেয়ালটা আগে হয়নি। উনি আমাকে কাছে ডাকলেন। পাশে গিয়ে বসলাম। বললেন, তুমি জান, সানু আমার কত আদরের।

ওঁর দিকে তেমনি চেয়ে রইলাম। বলতে লাগলেন, বাবা মা মারা যাবার পর আমি ওকে একটি দিনও ছেড়ে থাকিনি। তাই আজ ওর চলে যাবার কথা ভেবে বড় কষ্ট পাচ্ছি সীমা।

বললাম, আগে দক্ষিণা রঞ্জনের সঙ্গে আলাপ করুন, তারপর সানুর চলে যাবার কথা ভাববেন।

না সীমা, এতদিন ভাবিনি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে না ভেবে আর উপায় নেই। সানুকে ছেড়ে থাকার দিন আমার ঘনিয়ে আসছে।

ওঁর মুখে একটা করুণ হাসির রেখা ফুটে উঠল।

বললেন, আমি কি ভাবছি জান সীমা, ওর চলে যাবার পর কলেজ হোস্টেলে চলে যাব। সেখানেই কাটিয়ে দেব বাকি দিনগুলো।

বললাম, আমি কোথায় আসব তাহলে?

হেসে বললেন, নাঃ তোমরা দেখছি ভাবিয়ে তুললে।

আমাদের জন্যে না হয় নাই ভাবলেন, কিন্তু এরপর যখন ঘরের মানুষ আসবে, তখন ঘর ছেড়ে কোথায় যাবেন দেখব।

বললেন, ঘর ছেড়ে যেতে হবে বলেই তো সে মানুষের আর ঘরে আসা হবে না।

বললাম, আমি কিন্তু সে সব কথা শুনব না।

কি শুনবে না সীমা?

কথাটা বলেই আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম। এখন ওঁর কথার আসল উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম, মোট কথা আপনার কোথাও যাওয়া হবে না, আর আমিও যেতে দেব না।

উনি চুপচাপ মাঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন কতক্ষণ। একসময় বললেন, তোমার কথাকে উপেক্ষা করে কোথাও যাওয়ার ক্ষমতা আমার নেই সীমা।

বললাম, আমার কিন্তু তবুও ভরসা হয় না।

উনি অমনি হেসে বললেন, বড় নিন্দুক তুমি।

কিসের আবার নিন্দে করলাম।

তোমার ক্ষমতার ওপর আমার বিশ্বাসের।

সায়ন্তনী এসে গেল। আরও কোন কথা হয়ত হতে পারত, কিন্তু হল না।

বললাম, সায়ন্তনী আজ সিঙাড়া ভেজে আমাদের সবাইকে খাওয়াবে।

ভারী বয়েই গেছে আমার।

বললাম, আমরা কি ঠিক ঠিক অতিথি নয়।

তোমরা অতিথি হতে যাবে কোন দুঃখে। অতিথি হলে নিশ্চয়ই নিজের হাতে করে খাওয়াতাম।

সায়ন্তনীর কাছে দক্ষিণা রঞ্জনের আসার কথাটা গোপন রেখেছিলাম।

এখন বললাম, সত্যি ভাই নতুন একজন অতিথি আসছেন। তাঁর জন্যে কিছু খাবার তৈরি করে রাখা দরকার।

সায়ন্তনী অমনি আমার গলা জড়িয়ে বলল, কে সীমাদি?

কানে কানে বললাম, তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় অতিথি।

দূর ছাই, আসল কথাটাই বল না?

আমাকে আর বলতে হল না। বাইরে থেকে উনি হাঁকডাক শুরু করলেন। আমরা গিয়ে দেখি—একটি ছেলে বাইরের উঠোনে একটা মাছ ফেলে রেখে দাঁড়িয়ে আছে। মস্ত বড় মাছ। সদ্য ধরা হয়েছে। লাফাচ্ছে তখনও। সায়ন্তনী মাছ দেখে হৈ হৈ করতে লাগল। উনি আমার হাতে একখানা চিঠি এগিয়ে দিলেন।

দক্ষিণা রঞ্জন আমাকে লিখেছে, মাছটা সদ্য ধরলাম। বরফ দেওয়া মাছ খাওয়াই আপনাদের অভ্যেস, তাজা টাটকা মাছটা খেয়ে দেখুন কেমন লাগে। খান কয়েক ভেজে রাখবেন, গিয়েই যেন খেতে পাই।

ওঁকে চিঠিটা ফিরিয়ে দিলাম। চিঠি পড়ে উনি তো হেসেই অস্থির। বললেন, বাহাদুরকে বল মাছটা এখুনি তৈরি করতে।

সায়ন্তনীকে বললাম, এবার অতিথির জন্যে কি তৈরি করবে বল?

ও অমনি বলল, একটা আস্ত রুই মাছের ছবি।

ছবি খেয়ে শ্রীমান দক্ষিণা রঞ্জনের কি পেট ভরবে?

পেট না ভরলেও মন ভরাতে পারব।

তবে তাই হোক।

সায়ন্তনী বলল, থাক থাক আমার পরিকল্পনা আজ না হয় তুলেই রাখলাম। হাজার হোক তুমি হলে গুরুজন। না হয় গুরুজনের কথাটাই আজ মানলাম।

সায়ন্তনী হাসতে হাসতে রান্নাঘরে চলে গেল।

যথাসময়ে দক্ষিণা রঞ্জন এলেন। কোন সংকোচ নেই। দুটি ঘণ্টা ওঁর সঙ্গে সমানে কথা বলে গেলেন। শিল্প, সাহিত্য, খেলার মাঠ তিনটি বিষয়েই দেখা গেল ওঁর সমান আগ্রহ। যাবার সময় সায়ন্তনীকে ছবি আঁকার উৎসাহ দিয়ে গেলেন। আর ওঁর বাড়িতে ডেকে গেলেন আমাদের সবাইকে।

দক্ষিণা রঞ্জন চলে গেলে উনি আমাকে একান্তে ডেকে বললেন, খুব খুশি হয়েছি সীমা। বাজার দর ওর বেশি না হলেও আসল মূল্য ওর কম নয়। সানু ওকে পেলে সুখিই হবে।

এরপর উনি একদিন একাই গেলেন দক্ষিণা রঞ্জনের বাড়ি। উদ্দেশ্য, ওঁর অভিভাবকের কাছে বিয়ের কথাটা পাড়বেন।

ফিরে আসতেই কি হল জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, পুরনো জমিদার বাড়ির ভগ্নাবশেষ, তবে ও বাড়ির আচার আচরণ দেখে শেখার অনেক কিছুই আছে। দক্ষিণা রঞ্জনের মা একেবারে মাটির মানুষ। বাইরে থেকে গিয়েছি বলে একটুও সংকোচ নেই। নিজের হাতে তৈরি খাবার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমাকে একঠাঁই বসিয়ে খাওয়ালেন। আসার সময় বললেন, তোমার কাছে একটা প্রার্থনা আছে বাবা।

বললাম, ওকথা বলে লজ্জা দিচ্ছেন কেন, আপনার আদেশ পালন করার চেষ্টা করব সাধ্যমত।

উনি বললেন, ওর বিয়েতে আমি কিছুই চাই না বাবা। শুধু তুমি এমন একটি মেয়ে আমাকে দাও, যাকে পেয়ে আমি আমার নিজের দুটো মেয়েকে ছেড়ে থাকার দুঃখ ভুলতে পারব।

বললাম, উনিশটি বছর ধরে, যদি ভুল না দেখে থাকি তাহলে আপনি আপনার মনের মতো বউ পাবেন মা।

কৌতুক করে ওঁকে বললাম, বোনের নামে যে মস্ত বড় একটা সার্টিফিকেট দিয়ে এলেন, এদিকে শ্রীমতী যে ধনুভঙ্গ পণ করে বসে আছে।

বললেন, সে কি!

সানু বলেছে, দাদাকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না। শুধু একটি মাত্র শর্তে রাজি হতে পারি।

কি বলে পাগলি?

এ ঘরে আগে বউ না এনে অন্যের ঘরে সে বউ হয়ে যাবে না।

হাসিতে ফেটে পড়লেন উনি। এত বিদ্যে হয়েছে সানুর। তা খুঁজে দিক না ওর মনের মতো একটা মেয়ে। আমি কি দিব্যি খেয়েছি বিয়ে করব না বলে।

বললাম, আমি যদি মেয়ে দেখে দিই, পছন্দ হবে আপনার?

হাসি থেমে গেল। কতক্ষণ নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। তুমি পছন্দ করে দেবে আমার মেয়ে! দিতে পারবে সীমা?

বললাম, আপনি আদেশ করলে কেন পারব না বলুন?

তা তুমি পার না।

পারব না কেন বলুন?

নিজেকে জিজ্ঞেস করে দেখো।

চুপ করে গেলাম। বাড়ি গিয়ে মনে মনে বারবার নিজেকে প্রশ্ন করেছি। কোন উত্তর পাইনি। বুদ্ধি বিবেক দিয়ে ভেবে ওঁকে সংসারি করতে চেয়েছি, কিন্তু পরক্ষণেই কোথা দিয়ে কি হয়ে গেছে। গভীর এক রিক্ততা মনের ভেতর জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। জানি এ আমার ক্ষুদ্রতা। যাঁর ভালবাসার প্রতি মর্যাদা না দেখিয়ে আমি সবে এসেছি, তাঁকেই আবার স্বার্থপরের মতো আগলে রাখতে চাই। মনের এ মোহ থেকে চেষ্টা করেও আমি নিজেকে মুক্ত করতে পারলাম না।

বিয়ে হল সায়ন্তনীর। স্বামীর ঘরে ও গেল সংসার পাততে। এ সময়ে উনি বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন।

প্রতিদিন একবার করে যাই।

আমাকে দেখলেই উনি অনুযোগ করেন, রোজ এলে মেয়েকে কে দেখবে সীমা?

যত বলি, জন্মের পর থেকে মার চেয়ে ও মাসীকে চেনে বেশি, তার কাছেই থাকতে ভালবাসে, উনি কিন্তু তা বোঝেন না। বলেন, ভালবাসায় সন্তানকে স্নান করিয়ে দেবে, তবেই তো মা। আমার জন্যে চিন্তা কর না, দু'চার দিনে মনটা ঠিক হয়ে যাবে।

উনি বারণ করেন, তবু মন মানে না। ওঁর কলেজ থেকে ফেরার আগেই আমি গিয়ে পৌঁছই। খাবার তৈরি করি নিজের হাতে, উনি শ্রান্ত হয়ে এলে সাধ্যমত সেবা করবার চেষ্টা করি।

বলেন, এমনি করে মায়ায় জড়িও না।

ওকথা কেন বলছেন?

ওতে আমি আরও কষ্ট পাই সীমা।

কিসের কষ্ট বলুন?

সে কথা কি বলে দিতে হয়!

আমি চুপ করে যাই। সত্যিই তো যাঁকে চিরদিন সেবার সুযোগ পাব না, তাঁকে দুদিনের সেবা দিয়ে শুধু দুঃখই ডেকে আনা, তবু মন মানে না। ঠিক দুপুর হলেই চলে যাই ওঁর ওখানে।

একদিন বললেন, দিন কয়েক দেশে ঘুরে আসব ভেবেছি। জমিজমা নিয়ে একটু গোলমাল হয়েছে। একটা কিছু বিলি ব্যবস্থা করে আসতে হবে।

বললাম, কিসের গোলমাল?

দেশে না থাকলে যা হয়, বার ভূতে লুটে পুটে খাচ্ছে।

আপনি চলে গেলে আমি একা কি করে থাকব?

হেসে বললেন, একদিন তোমাকেও তো আমাদের ছেড়ে চলে যেতে হবে, তখন আমরাই বা কি করে থাকব।

কোন উত্তর দিতে পারলাম না।

বললাম, কবে ফিরছেন?

তাড়াতাড়ি ফেরার ইচ্ছে আছে। তবে যদি দেখি জমি বিলি-ব্যবস্থার অসুবিধে হচ্ছে তাহলে সব বিক্রি করে দিয়ে আসব। এতে দু'চারদিন দেরি হয়ে যেতে পারে।

কাজ ফুরিয়ে গেলেই কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে আসবেন।

বললেন, আমারও কি তোমাদের ছেড়ে বেশিদিন থাকতে ইচ্ছে করে সীমা।

উনি দেশে গেলেন। ফিরতে কয়েক দিন দেরি হল। এক দুঃসহ যন্ত্রণার ভেতর আমার দিনগুলো কাটতে লাগলো। মেয়েটাকে নিয়ে ডুবে থাকতে চাইলাম কিন্তু পারলাম না। গান আমাকে একটুও শান্তি দিতে পারল না। গেলাম শাশুড়ীর কাছে। অত্যন্ত নিস্পৃহ প্রকৃতির মানুষ। সব সময় নামজপ নিয়ে থাকেন। ছেলে মেয়ে বউ কারো সম্বন্ধে প্রায় কোন খোঁজই রাখেন না। ছুৎমার্গে তাঁর বিশ্বাস। সেবা করব তাঁকে, তার সুযোগ নেই।

ফিরে এলাম দিদির ওখানে। অঞ্জন আগে প্রতি মেলে একখানা করে চিঠি লিখতেন, তাও ধীরে ধীরে কমে আসছিল। শেষ চিঠিতে তিনি লন্ডন থেকে জার্মানীতে যাবার কথা জানিয়েছেন। পড়া শেষ করতে তাঁর নাকি আরও কয়েক বছর সময় লাগবে। অল্প কয়েক ছত্রের চিঠি।

চিঠি পেয়ে বাবা, মা, দিদি, জামাইবাবু সবার মুখই গম্ভীর হয়ে গেছে। এমন কথা তো ছিল না। তাছাড়া আজকাল তিনি প্রায় কাউকেই চিঠিপত্র লিখছেন না। জামাইবাবু পর পর কয়েক খানা চিঠি দিয়ে একটি মাত্র উত্তর পেয়েছিলেন। সে উত্তরের ভেতর আর যাই থাক্ উত্তাপ ছিল না। মাঝে মাঝে মনে হয় এজন্যে আমি দায়ী, আমিই দোষী। ভালবাসা দিয়ে অঞ্জনকে আমি ভোলাতে পারি নি। যদি অপরাধ কিছু হয়ে থাকে, তাহলে তা অঞ্জনের নয়, সবটুকুই আমার। কিন্তু মনকে অপরাধী করলেও সমাধান কিছুই হয় না। আমি চেষ্টা করেছি অঞ্জনকে ভালবাসতে, কিন্তু ভালবাসা চেষ্টা দিয়ে হয় না, তাই সফল হতে পারিনি।

একদিন গেলাম ওঁর ওখানে। ভয় ছিল যদি না ফেরেন, তাহলে মনকে বোঝান শক্ত হবে। গিয়ে শুনলাম উনি দুদিন হল দেশ থেকে ফিরেছেন। এখনও কলেজ থেকে ফেরেননি। আনন্দে চোখ জলে ভরে এল। মনে হল যেন কত যুগ ওঁর জন্যে পথ চেয়ে ছিলাম। আজ উনি এলেন আমাকে দেখা দিতে। তাই চোখের জল আমার বাধ মানছে না।

বাহাদুর বলল, এ কদিন বড় মন কেমন করছিল দিদিমণি।

কেনরে?

দাদাবাবু নেই আর আপনিও আসেন না।

বললাম, আমি না এলে কষ্ট হয় কেন বাহাদুর?

সে বলতে পারব না দিদিমণি। তবে রোজ একবার আপনাকে এ বাড়ি না দেখলে মন আমার খারাপ হয়ে যায়।

বাহাদুর, এ কদিন দাদাবাবু একা একা কি করছিলেন রে?

কাল অনেক রাতে উঠে দেখি বারান্দায় বসে আছেন। মনে হল চাঁদের আলো দেখছেন। কাছে গিয়ে দেখি কেতাব লিখছেন।

এত রাতে কি কেতাব লিখছিলেন উনি?

বাহাদুর হেসে বলল, মুখ্যু মানুষ, কেমন করে জানব দিদিমণি।

সত্যিই তো, বাহাদুর জানবে কি করে। অকারণে ওকে জিজ্ঞেস করে মনে মনে লজ্জিত হলাম।

নিজের হাতে খাবার তৈরী করে রাখলাম। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সামান্য প্রসাধনে নিজেকে সুন্দর করে তুললাম। বাগান থেকে ফুল এনে সাজিয়ে নিলাম খোঁপা। আজ ওঁর ফিরতে দেরি হচ্ছে বলেই মনে হল। ঘড়ি দেখলাম, তখনও সময় হয়নি। বুঝলাম, মনে মনে আমি অস্থির হয়ে পড়েছি।

উনি এলেন। বাইরের ঘরে জামা কাপড় ছেড়ে বারান্দায় ইজিচেয়ারটাতে গিয়ে বসলেন। প্লেটে খাবার সাজিয়ে আমি হাজির হলাম ওঁর সামনে।

খুশিতে ভরে উঠল ওঁর মুখ। কখন এলে সীমা?

প্রায় দুটো।

তুমি আসবে জানলে পাবলিশারদের ওখানে আর ঘোরাঘুরি করতাম না। খাবারের প্লেটটা টিপয়ের ওপর রেখে দিয়ে বললাম, নতুন কিছু বই বেরুচ্ছে নাকি?

বেরুচ্ছে, 'অকারণে চঞ্চল'।

কই পাণ্ডুলিপি পড়ালেন না তো?

তাহলে পরিশ্রমের পুরস্কার মিলবে না।

কেন? আমরা কি শ্রোতা হিসেবে মন্দ!

তোমরা আমার সবচেয়ে প্রিয় শ্রোতা বলেই আগে ভাগে পড়তে দিতে চাই না।

হেসে বললাম, সে কি রকম?

ঠিকই বলছি সীমা। বই বেরুবার পর তোমার নাওয়া খাওয়া ফেলে এক নিশ্বাসে আমার বইখানা শেষ করে ফেলবে, তার চেয়ে বড় পুরস্কার আমি কোথায় পাব।

বললাম, আপনার সেই বইখানির প্রকাশের অপেক্ষায় দিন গুণছি।

উনি এবার অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন।

বস সীমা, একটা জরুরী আলোচনা আছে।

বসলাম ওঁর পাশে।

বললেন, এসে অবধি তোমাকে মনে মনে এখানে চেয়েছিলাম।

তাকিয়ে রইলাম ওঁর কথা শোনার জন্যে। একটু থেমে বললেন, সব কিছু বিক্রি করে দিয়ে এলাম সীমা।

সে কি, দেশের বাড়ি ঘরও বিক্রি করলেন নাকি!

পৈতৃক ভিটে, পুকুর বাগান আর কিছু ধান জমি রেখে বাকি সব বিক্রি করে দিলাম।

বললাম, আপনি যা ভাল বুঝেছেন তাই করেছেন, আমি ত ওসব কিছু বুঝি না।

উনি বললেন, তা নয়, তোমার কাছে আমি যে কথাটা বলতে চাই তা আমার জমি বিক্রির পরের কথা।

আমি আবার তাকালাম ওঁর মুখের দিকে।

বললেন., সানু আর দক্ষিণাকে ফ্রান্সে পাঠাতে চাই, ছবি আঁকা শিখতে।

সে ত খুব ভাল কথা।

কিন্তু তুমি জান, আমি ধনী নই।

চুপ করে বসে রইলাম। কি উত্তরই বা দেব এ কথার।

উনি বললেন, তাই জমি বিক্রি করতে হল। একটু থেমে আবার বললেন, নিজের জীবনে আমার আর কোন সাধ নেই সীমা। যা রোজগার করি তাইতে চলে যাবে আমার দিন। ওরা সুখী হোক্, প্রতিষ্ঠা লাভ করুক, আমি তাই দেখতে চাই।

মনটা কেঁপে উঠল। এতকাল স্বার্থপরের মতো ওঁকে নিজের করে রাখবার চেষ্টা করেছি। কোনদিন ভাবিনি ওঁর ভাবী দিনগুলোর কথা। আজ মনে হল, ওঁকে সংসারী দেখলেই আমার সুখ। ওঁর জীবন সুখে সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে, এই হবে আমার কামনা। ভাবতে গিয়ে গভীর আনন্দে মনটা ভরে গেল। বললাম, সানুকে আমিও ভালবাসি। তারা খ্যাতি লাভ করুক, সুখী হোক, আপনার মত আমিও তা চাই। তবু বলব, ওদের বাইরে পাঠিয়েও নিজের জন্যে আপনাকে কিছু রাখতে হবে। আপনি সংসারী হলে আমার মতো সুখী আর কেউ হবে না।

কেন একথা বলছ সীমা। তুমি ভাল করেই জান, জীবনে ঘর বাঁধা আর হবে না আমার।

কোন কথা শুনতে চাই না আপনার। শুধু বলুন, এমন কথা কোন দিন আর বলবেন না।

কথা বলতে গিয়ে গলাটা ধরে গেল আমার। চোখে জল এল।

উনি আবার বললেন, আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি সীমা, তা অনেক চিন্তার পর। তাকে মুহূর্তের উত্তেজনায় উড়িয়ে দিতে চেও না।

কথাগুলি উনি স্পষ্ট উচ্চারণ করলেন। সাময়িক কোন উত্তেজনায় শব্দগুলি একটুও কাঁপল না। আমি শুধু ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলাম।

উনি আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, অবুঝ হয়ো না সীমা। জীবনে কোন কিছু করার আগে নানা দিক থেকে চিন্তা করতে হয়। কিন্তু একবার সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছে তাকে খুশি মত পরিবর্তন করা ঠিক নয়।

ওঁর কথায় কোন সদুত্তর দিতে পারলাম না। শুধু মনে হল, কি অভিশাপ দিয়ে বিধাতা আমাকে গড়েছিলেন। দুটি জীবনই ব্যর্থ হয়ে গেল শুধু আমারই জন্যে। অঞ্জনকে সুখী করতে পারলাম না। আর যাঁকে সুখী করতে পারলে নিজে ধন্য হয়ে যেতাম, তিনি কাছে থেকেও বিচ্ছেদের দুঃখ নিয়ে দূরে সরে রইলেন।

জীবন কি বিচিত্র নাটক। সহস্র সহস্র রজনীতেও এ নাটকের শেষ হয় না। দিনে দিনে নতুন ঘটনা, নতুন বৈচিত্র্যের যোগ হয় এর সঙ্গে। যে অদৃশ্য নাট্যকার নতুন অঙ্ক যোগ করেন, বাদ দেন পুরাতন অঙ্ক, তিনি যে যথার্থ শক্তিমান তাতে সন্দেহ কি। অভিনেতাদের সাজ বদল হয়, চরিত্র অনুযায়ী তাদের সাজতে হয় নতুন সাজে।

আমার জীবনেও তেমনি পালা বদল ঘটল।

শুরু হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। পশ্চিমের আকাশে জ্বলে উঠল রাঙা আগুনের শিখা। সে আগুন অল্প সময়ের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল সারা ইয়োরোপে। কোন দেশই সে আগুনের হাত থেকে পুরোপুরি রক্ষা পেল না।

অঞ্জন জার্মানীতে। কাঁপতে লাগল আমার মন। বহুদিন উনি চিঠিপত্র বন্ধ করেছিলেন, তাতে দুঃখ পেলেও মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে সান্ত্বনা পেয়েছি। কিন্তু এই উদ্বেগের শান্তি কোথায়।

ওঁর কাছে মাঝে মাঝে যাই। আমারই মত ওঁর অবস্থা। সানু আর দক্ষিণা প্যারিসে। আজকাল নিয়মিত চিঠিপত্র আসছেনা।

উনি সান্ত্বনা দেন। বলেন, সবই আমাদের হাতের বাইরে চলে গেছে সীমা। এখন ঝড় থামার

প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর আমাদের কোন উপায় নেই। পৃথিবীর জলস্থল আকাশ বাতাস শান্ত হোক্, এই প্রার্থনাই আমাদের করে যেতে হবে।

একদিন ঝড় থামল। দেখা গেল পৃথিবীর মানচিত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। সানু আর দক্ষিণার খবর এল, কিন্তু কোন খবরই এল না অঞ্জনের। বাবা, মা দু'বছরের তফাতে গত হলেন। দিদি মাঝে মাঝে শুধু আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে। শুধু বলে, আমি তোর জীবনটাকে নষ্ট করে দিলাম সীমু। দিদিকে সান্ত্বনা দিই।

বলি, এই আমার ভাগ্যে ছিল, তোমার কি দোষ দিদি। জামাইবাবুর ক'বছরে কি আশ্চর্য পরিবর্তন হয়ে গেছে। সেই সদা হাস্যময় মানুষটি রাতদিন শুধু কাজের ভেতর ডুবে থাকেন। হাসি গল্প সবই বন্ধ হয়ে গেছে তাঁর।

আজকাল উনি আসেন এবাড়ি। দিদিকে বোঝান কত কথা। মেয়েকে আদরে সোহাগে ভরে দেন। জামাইবাবু দেখি ওঁর সঙ্গে আলাপ করে কিছুটা শান্তি পান।

দুঃখ পেতে পেতে মানুষের দুঃখ সহ্য করার একটা ক্ষমতা আসে। আমার ভেতরেও ধীরে ধীরে সেই শক্তি এল। কমে এল মনের অস্থিরতা। কাজের ভেতর ডুবিয়ে রাখলাম নিজেকে। শুধু যখন মেয়েটা বুকের ভেতর ঘুমিয়ে থাকে, তখন মনে পড়ে একটা হারানো মানুষের কথা। গড়িয়ে পড়ে চোখের জল। এই সর্বধ্বংসী যুদ্ধে কত মানুষ বলী হল, কে কোথায় ছিট্‌কে পড়ল, কে রাখে তার হিসেব। শুধু যার হারাল সেই কাঁদে। রহস্যময় হারিয়ে যাবার গোলক ধাঁধায় মন তার বার বার ঘুরে ক্লান্ত হয়।

এক দুপুরে মনটা বড় অস্থির হয়ে পড়েছিল, গেলাম ওঁর ওখানে। গিয়েই শুনলাম, সন্ধ্যের আগে ফিরবেন না উনি। ভাবলাম, এ অশান্ত মন নিয়ে ফিরে যাবার চেয়ে একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করে যাওয়াই ভাল। ওঁকে একটিবার দেখলে মনের অস্থিরতা অনেকখানি শান্ত হয়ে আসবে।

এতক্ষণ কি করি। ওঁর সেলফের বইগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলাম।

একটিতে বিদেশী বিখ্যাত বই এর সংগ্রহ। অন্যটিতে সংস্কৃত সাহিত্যের বই। শেষেরটিতে বাংলার নামী সাহিত্যিকেরা ভীড় করে আছেন। বইগুলো নাড়াচাডা করছি। বেসারেক্সনের ভেতর থেকে একটা কাগজ পড়ে গেল মেঝেতে। কুড়িয়ে নিতে গিয়ে দেখলাম, ফরেন সার্ভিসের খাম। তারিখ দেখলাম, কয়েকদিন আগে চিঠিখানা এসেছে। খোলাই ছিল। সায়ন্তনীর চিঠি হওয়াই সম্ভব। ওদের দেশে ফেরার কথা ছিল, কবে নাগাদ আসবে তাই জানার জন্যে চিঠিটা পড়তে লাগলাম। কিন্তু একি হল আমার! চিঠিখানা পডা শেষ হতেই চোখদুটো ঝাপসা হয়ে এল। মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগল। মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়লাম। কতক্ষণ পড়েছিলাম মনে নেই। এক সময় কিছুটা সুস্থ হতেই উঠে বসলাম। চারদিকে তাকিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই। বাহাদুর বোধহয় কাছেপিঠে কোথাও গিয়ে থাকবে। পাশেই পড়েছিল চিঠিখানা। তুলে নিলাম। আবার তার ওপর চোখ বুলিয়ে গেলাম। প্রতিটি অক্ষর ছুরির ফলার মতো আমার হৃৎপিণ্ডকে টুকরো টুকরো করে কাটতে লাগল।

দক্ষিণারঞ্জন চিঠির এক জায়গায় ওঁকে লিখেছে, আপনার নির্দেশ মত আমি লন্ডনে গিয়ে অঞ্জনবাবুর আগের ঠিকানায় খোঁজ করেছিলাম। একটি দুঃখের খবর শুনলাম ওখানে। যুদ্ধের আগেই সহপাঠিনী এক জার্মান মহিলার সঙ্গে ওঁর ভাব হয় ; শেষ-পর্যন্ত তাঁকে বিয়ে করেই তিনি বার্লিনে চলে যান। ওদের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করে আমি চার্চে যাই। খোঁজ করে জেনেছি এ বিষয়ে সন্দেহের আর কোন কারণ নেই। ওঁদের বর্তমান ঠিকানা কোন রকমেই জানা সম্ভব হল না।

চিঠিখানা পড়ে যথাস্থানে রেখে দিলাম। উঠে এসে বসলাম বাইরের বারান্দায়। দিগন্ত খোলা মাঠ। শরতের সাড়া এসে পড়েছে। বৃষ্টি শূন্য মেঘগুলো স্তব্ধ হয়ে জমে আছে আকাশের গায়। তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হল, আমার মনের সঙ্গে কি আশ্চর্য মিল ঐ মেঘেদের। ফুরিয়ে গেছে জল ঝরানোর ক্ষমতা, শুধু আছে স্তব্ধতা।

উনি এলেন, কত সুন্দর সব আলোচনা করলেন। অনুযোগ করলেন লিলিকে আনিনি বলে।

কি মনে এল, বললাম, আমার মেয়েকে লিলি বলে ডাকবেন না। 'নতি' বলে ডাকবেন। পোশাকী নাম নম্রতাই রইবে।

বললেন, সে কি ঠিক হবে সীমা। একটা স্মৃতি জড়িয়ে আছে যে নামের সঙ্গে, তাকে হঠাৎ করে সরিয়ে দেওয়া কি উচিত?

চুপ করে গেলাম। ইচ্ছে হচ্ছি চেঁচিয়ে বলি, কেন মিথ্যে আমাকে বঞ্চনা করছেন। ও দুঃসপ্নের স্মৃতি মনে করে রাখার অর্থই হল, নিজেকে অসুস্থ করে তোলা। কিছু বলতে পারলাম না। মাথা নিচু করে বসে রইলাম। ফেরার পথে উনি এগিয়ে দিতে এলেন স্টেশান অবধি। তবু একবারও চিঠির কথা তুললেন না।

কয়েকদিন পরে মনটা যেন ভারমুক্ত বলে মনে হল। অঞ্জনের খবর না পেয়ে যে পাষাণের গুরুভার চেপেছিল মনের ভেতর তা একেবারেই নেমে গেল। একটা মুক্তির আনন্দে আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম। আমার আকস্মিক পরিবর্তন ওঁর দৃষ্টি এড়ালো না। আমি যখন খুশীতে কথা বলে যাই, তখন উনি কেবল তাকিয়ে থাকেন আমার দিকে। মাঝে মাঝে কি যেন চিন্তা করেন। আমি দেখতে পাই, কি করুণ একটা ছবি ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে ওঁর মুখে। আমার কাছ থেকে উনি যে বেদনাকে গোপন করে রেখেছেন, তারই যন্ত্রণায় নিজে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছেন। আমি তা জানতে পারি। কিন্তু মুখ ফুটে কোন কথাই আমাকে তিনি বলতে পারলেন না। চরম দুঃখ থেকে আমাকে মুক্তি দেবার জন্যে নিজেই নীলকণ্ঠ হয়ে রইলেন। শুধু ওঁর দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে ভাবি, যাঁকে আমি জীবনে কোন সুখ দিতে পারলাম না, তিনি আমাকে দুঃখের আঁচ থেকে রক্ষা করার জন্যে কি আপ্রাণ চেষ্টাই না করে চলেছেন।

রাতে বিছানায় শুয়ে চোখের জলে ভাসি। ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি আঁকার চেষ্টা করি। কিন্তু সে ছবি অস্পষ্ট হয়ে আসে।

একদিন ওঁর কাছে গেলাম। ঠিক সেদিনই খবরের কাগজে একটি অধ্যাপিকার পদের জন্যে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। কলেজটি মফঃস্বলে। সমুদ্র তীর, স্বাস্থ্যকর স্থান।

কিছুক্ষণ কি চিন্তা করে বললেন, খুব খুশী হলাম, তুমি সুন্দর একটি জীবনকে বেছে নিচ্ছ বলে।

বললাম, সপ্তাহে একবার করে অন্ততঃ কলকাতায় আমায় আসতেই হবে।

কেন, 'নতি' তোমার সঙ্গে যাচ্ছে না?

বললাম, ও আমার সঙ্গেই থাকবে।

তবে প্রতি সপ্তাহে কলকাতা আসতে চাইছ কেন?

কোন কথা বলতে না পেরে চুপ করে বসে রইলাম।

হেসে বললেন, বুঝেছি, আবার মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি চেপেছে। ওসব হবে টবে না। তোমার চাকরি হলে আমিই যাব সমুদ্রতীরে স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্যে। কলকাতায় আসার সুযোগই তুমি পাবে না।

দরখাস্ত করলাম। রেজাল্টটা ভালই ছিল। চাকুরি হয়ে গেল। জীবনে একটি নতুন অভিজ্ঞতার মাঝে এসে ঢুকলাম। প্রিন্সিপাল অত্যন্ত প্রবীণ। তিনি হলেন আমার এখানকার অভিভাবক। প্রথম দিন ওঁর কোয়ার্টারে দেখা করতে গিয়ে আমার চোখে জল এসে পড়েছিল। মুখের আদল, কথা বলার ভঙ্গী সবই প্রায় বাবার মতো।

উনি আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হবে মা। আত্মীয় পরিজনকে ছেড়ে এসেছ। ধীরে ধীরে দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

উনি আমাকে কলেজে নাম ধরে ডাকতেন। ওঁর বাড়িতে গেলেই মা বলে সম্বোধন কবতেন। বড় ভাল লাগল কলেজের কাজ। পড়ানোর ভেতর ডুবে গেলাম। গান জানতাম, তাই কলেজের মেয়েরা এসে আমার কাছেই ভীড় করত। যে কোন ফাংশান হলেই প্রিন্সিপাল আমাকে ডেকে পাঠাতেন। অনুষ্ঠানের সব ভারই তুলে দিতেন আমার ওপর।

ছুটি হলেই চলে যেতাম কলেজের পেছনে বালুর পাহাড়ে। কি আশ্চর্য পরিবেশ। বাংলা দেশে এমন প্রকৃতির রূপ এখানে ছাড়া আর বুঝি কোথাও নেই। কলেজের পেছনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বালু-পাহাড়। পূর্ব-পশ্চিমে বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে পাহাড়ের সারি। আমি এর নাম রেখেছিলাম, সোনার পাহাড়। বালুকণার ওপর সূর্যের আলো পড়ে সোনার মত ঝক্ ঝক্ করে। এখানে আগে ছিল সমুদ্র। ধীরে ধীরে উঁচু বালুকার সঞ্চয় রেখে দূরে সরে গেছে। এই বালু ভূমির ওপরে কোথাও কোথাও বন ঝাউ, বাদাম, বুনো জাম আর বাঁশের ঝাড় চোখে পড়ে। বেলাশেষের রোদ এসে লুটিয়ে পড়ে বালুস্তরের ওপর। গাছ গাছালির আল্পনা-আঁকা পথের ওপর দিয়ে গ্রামবাসীরা বালু পাহাড়ের নীচের গ্রামগুলির দিকে ফিরে যায়।

বৃষ্টির দিনগুলিতে এর রূপের তুলনা হয় না। বৃষ্টি থেমে গেলে পায়ে লাগে না একটুও কাদা। মেঘভাঙা রোদে সমস্ত অঞ্চলটা কবিতার জগৎ বলে মনে হয়। জামের পাতায়, বাঁশের পাতায় করুণ রোদের ঝিলিক লাগে। ভাঙা একটা পোড়ো মসজিদের পাশে সাদা সাদা গোলাচ ফুল ফুটে থাকে। সেখানে থাকলে নিজেকে মনেহয় রূপকথার জগতের অধিবাসী বলে।

প্রথম ছুটিতে কোলকাতা ফিরে ওঁর কাছে গেলাম।

বললেন, তোমার চিঠিতে আশ্চর্য জগতের খবর পেলাম। দেখার জন্যে সত্যি মনটা অস্থির হয়।

বললাম, থাক্ আর দেখে কাজ নেই আপনার।

অমনি রাগ হয়ে গেল?

দেখবেন, আর ডাকবনা কোনদিনও।

হেসে বললেন, বুঝছনা কেন সীমা, বাংলাদেশে এমন অপূর্ব একটি দর্শনীয় স্থান আছে, তাকে দেখে ফেললে আর আমার বাকী রইল কি। তাই কৃপণের মতো ওকে সঞ্চয়ের ঘরে তুলে রেখেছি।

বললাম, কথার যাদুতে সবকিছু ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আপনার ওখানে না যাবার দুঃখ আমি কোনদিনও ভুলব না।

বললেন, ওখানে একখান বাড়ি কর, তারপর যাব বেড়াতে। ভাড়াটে বাড়িতে এমন সুন্দর একটা পরিবেশকে উপভোগ করার মেজাজই পাওয়া যাবে না।

সানু আর দক্ষিণারঞ্জনের খোঁজ নিলাম। গর্ভণমেন্টের ডিজাইন সেন্টারে ওরা দুজনেই কাজ পেয়েছে। এখন রয়েছে দিল্লীতে। বেশ সুখে আছে ওরা। কথাটা শুনে নিজের মনে কেমন একটা রিক্ততা অনুভব করলাম। পরক্ষণেই মনে হল, সুখী হোক, শান্তিতে উজ্জ্বল হোক ওদের দিনগুলি।

ফিরে এলাম কলেজে। এবার সঙ্গে এলেন দিদি আর জামাইবাবু। জায়গাটা দেখে ওঁদের খুশী আর ধরে না। কয়েক দিন ওঁদের নিয়ে খুব ঘুরে বেড়ালাম।

জামাইবাবুই কথাটা তুললেন, এখানে সমুদ্রের ধারে একটা বাড়ি হলে মন্দ হয় না।

কথাটা লুফে নিয়ে বললাম, আমারও তাই ইচ্ছে। এমন জায়গায় ভাড়াটে বাড়িতে থাকার কোন মানেই হয় না। তবে বাড়িটা একেবারে সমুদ্রের ধারে না হয়ে কলেজের কাছেপিঠে হলেই সুবিধে হয়।

জামাইবাবু যাবার আগেই আমার নামে কিনলেন জায়গাটা। আমাদের সবারই খুব পছন্দ হয়ে গেল।

ছোট একখানা বাড়ি শুরু করলাম। প্রিন্সিপাল নিজে এসে দেখাশোনা করলেন।

বললাম, আপনি এ বয়েসে কলেজের কাজের পর রোজ বাড়ির কাজ দেখতে আসেন, কত কষ্ট হয় আপনার জ্যাঠামশাই।

বললেন, আমার স্বার্থ আছে মা।

এমন মানুষের আবার কি স্বার্থ থাকতে পারে। তাই তাকিয়ে রইলাম ওঁর মুখের দিকে।

হেসে বললেন, আমার মা-টিকে বন্দী করে রাখতে চাই এখানে। আমার তো সময় ফুরিয়ে এল।

এক্সটেনশন চলছে। এরপর তোমরাই দেখবে কলেজ। কত কষ্টে মা গড়ে তুলেছি কলেজটা। তোমার সাহায্য পেলে এ আরও অনেক বড় হয়ে উঠবে।

লোকটি যেমন পণ্ডিত, তেমনি হৃদয়বান আর আদর্শবাদী। একটি বিধবা মেয়ে কাছে থাকেন। তিনিই করেন বাবার পরিচর্যা। স্ত্রী নেই। একমাত্র ছেলে কাজ করেন বোম্বেতে।

বাড়ি তৈরি শেষ হল। মনের মতো করে সাজালাম। একটা ঘর রইল শুধু নতির পড়া আর খেলার জন্যে। ভর্তি করে দিলাম ওকে মেয়েদের স্কুলে।

কলেজে পড়াই। অবসর সময়টুকুতে গানের চর্চা করি। মেয়েরা আসে। এ যেন তাদেরই বাড়ি। নতিকে নিয়ে খেলাধূলো, হৈ-হুল্লোড়ে মাতে। গান গায়, রিহার্সেল দেয়।

মনের নিঃস্বতাকে এমনি করে ভরিয়ে রাখার চেষ্টা করি।

একটি দিনের মর্মান্তিক স্মৃতি গাঁথা হয়ে আছে জীবনের পাতায়। সেদিন কলেজের মেয়েদের নিয়ে 'নটীর পূজার' রিহার্সেল দিচ্ছিলাম, পিয়ন এসে একখানা চিঠি দিয়ে গেল।

চিঠিখানার পাশে সায়ন্তনীর নাম লেখা দেখে একটু বিস্মিত হলাম। কলকাতায় অনেকবার গিয়েছি, কিন্তু কোনবারই দেখা হয়নি ওদের সঙ্গে। ওদের কাজ দিল্লীতে। থাকে ওখানেই। আসে খুব কম। তাই মাঝে মাঝে মনে পড়লেও ইদানিং যোগাযোগটা প্রায় ছিলই না। হঠাৎ সায়ন্তনীর চিঠিটা পেয়ে খানিকটা অবাক হলাম। চিঠিখানা দীর্ঘ। পড়তে পড়তে সমস্ত শরীরটা কেমন অবসন্ন হয়ে গেল। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এল।

উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ডাক্তার বলছেন, প্লুরিশির স্টেজেই আছে। এখন পুরোপুরি বিশ্রামের দরকার। যে হারে লেখার কাজ করছেন, তাতে অসুখের বাড়াবাড়ি হবার সম্ভাবনাই বেশি।

সানু শেষে লিখেছে, আমরা দিল্লী নিয়ে যেতে চেষ্টা করেও পারিনি। শুনেছি, তুমি সমুদ্রের ধারে বাড়ি করেছ, যদি অসুবিধে না হয় তবে দাদাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর।

মনে মনে বললাম, উনি এলে আমার অসুবিধে হতে পারে, এমন করে ভাবতে পারল সানু। আমার জীবনের কতখানি অংশ জুড়ে আছেন, আজ তা আমি কাকে বোঝাব।

টপ্ টপ্ করে চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। পাশে বসে আছে মেয়েরা, তারা কি ভাবছে, সে কথা ভাববার সময় নেই।

এক সময় মনটা একটু শান্ত হলে ওদের বললাম, আমার এক আত্মীয় বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমি আজ রাতের গাড়িতেই কলকাতা যাচ্ছি তাঁকে আনতে। তোমরা নতিকে দেখো।

এক কাপড়েই বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে।

কলকাতায় পৌঁছে সিধে গেলাম ওঁর ওখানে। বললাম, মেয়েকে ফেলে এসেছি একা। দেরী না করে চলে আসুন আমার সঙ্গে।

উনি যেন কিছু বলতে চাচ্ছিলেন।

বললাম, যা বলার গাড়িতেই বলবেন। ট্রেন ছাড়ার বেশি সময় নেই।

ওঁকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই নিয়ে এলাম এখানে।

জায়গাটি দেখে উনি একেবারে অভিভূত। এমন চমৎকার জায়গা সীমা! দেখো আমি দুদিনেই সেরে উঠব।

চোখের জল আঁচলে মুছে বললাম, কতবার ডাকলাম, কই ভাল থাকতে একবারও তো এলেন না।

তাহলে আর একটা জিনিস এমন করে পাওয়া যেত কি?

বললাম, কি এমন জিনিস।

তোমার সেবা।

উদগত অশ্রুকে রোধ করে কাজের ছলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

মন হাহাকার করে উঠল, আমি সব কিছু দিয়ে তোমার সেবা করতেই তো চেয়েছিলাম, কিন্তু এমন করে ঈশ্বর আমাকে সেবার সুযোগ দেবেন তাতো কোনদিন ভাবিনি।

রোজ সকালে পূর্ব মুখে আসন পেতে বসেন। অজস্র আলোয় শরীর স্নান করে। দক্ষিণ থেকে সমুদ্রের হাওয়া আসে। আলো বাতাস আর পথ্য, এর চেয়ে বড় চিকিৎসক আর কোথায়। প্লুরিশি প্রথম অবস্থায় ধরা পড়েছে। ভাগ্যিস শুরুতেই ওঁকে নিয়ে আসা হয়েছে, নইলে ভয়াবহ হতে পারত।

একদিন বললাম, আপনি এসেছেন, আমার কি যে ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে, রোজ রোজ কলেজ কামাই করে আপনার কাছে বসে থাকি।

বললেন, আজও তুমি ছাত্রীই রয়ে গেছ সীমা। একটুও গম্ভীর হতে পারনি।

হেসে ফেলে বললাম, আপনার কাছে চিরদিনই আমি তাই।

আচ্ছা সীমা, তোমার ছাত্রীরা তোমাকে খুব ভালবাসে, তাই না?

বললাম, তার নমুনা অনেক আগেই দেখতে পেতেন। শুধু আপনার অসুবিধে হবে বলেই ওদের আসতে বারণ করেছি।

সে কি! তোমাদের আনন্দে আমার অসুবিধে হবে। কি বলছ তুমি!

ওরা হৈ হুল্লোড়, গান বাজনা করবে। রোগীর বিশ্রামের পক্ষে সেটা খুব ভাল হবে বলে মনে হয় না। আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন, তারপর দেখবেন, ওরা সকাল সন্ধ্যে এ ঘর দখল করে বসে আছে।

কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, অসুস্থ মানুষের কাছে এখন ওদের আসা ঠিক নয়।

উনি মনে হয়ত কষ্ট পেয়েছেন। তাই বললাম, আমি আপনাকে রোজ গান শোনাব, খুশী হবেন তো?

হেসে বললেন, খুশী হব না মানে! সেই লোভেই তো এখানে এলাম।

আপনি বড় লোভী।

বললেন, এই দুর্নাম শুধু তুমিই দিতে পার।

চুপ করে গেলাম। মুখ ফুটে বলতে পারলাম না, আমি তোমার চেয়েও লোভী।

সাধ মিটিয়ে সেবা করতে লাগলাম ওঁর। কলেজের সময়টুকু শুধু বাইরে থাকি, মন পড়ে থাকে ঘরে। ভাবি, এ সময়টুকু উনি একা একা কাটাচ্ছেন। কত কষ্ট হচ্ছে। অবশ্য দশটা থেকে বেশ কয়েক ঘণ্টা ওঁর পুরোপুরি বিশ্রামের রুটিন।

যদি কোনদিন হঠাৎ ছুটি হয়ে যায়, তাহলে তাড়াতাড়ি চলে আসি ঘরে। আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখি, কি করছেন। কোনদিন দেখি ঘুমোচ্ছেন অঘোরে। তাকিয়ে থাকি মুখের দিকে। পরিতৃপ্তির ভাবটুকু আঁকা হয়ে আছে সেখানে। তার আড়ালে খুঁজে ফিরি কোন বেদনার ছোঁয়া লেগে আছে কিনা।

পাশে পড়ে থাকে ওঁর ডায়েরীর খাতাখানা। ডায়েরী লেখা ওঁর অভ্যেস। বলেন, ডায়েরী হল স্মৃতির সংকেত-সূত্র। মন যখন ক্লান্ত হয়, তখন ডায়েরীর সংকেত পথে অতীত দিনে ফিরে যাই। সেখান থেকে নিয়ে আসি অজস্র আলো হাওয়া।

বড় লোভ হয় মাঝে মাঝে ওঁর ডায়েরী পড়তে। একদিন চেয়েই বসলাম।

বললেন, পৃথিবীতে নিজস্ব বলে যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে তা এই ডায়েরী। একান্ত গোপন মনের কাহিনী এর উপজীব্য। সবাইকে সব কিছু বিলিয়ে দেয়া যেতে পারে, শুধু ডায়েরীটি ছাড়া। উনি হাসতে লাগলেন।

বললাম, বেশ আর কোনদিন চাইব না।

কি ভেবে বললেন, আমার উইলে লেখা থাকবে, সংসার থেকে বিদায় নেবার পর আমার ডায়েরীর একমাত্র অধিকারী হবে সীমা মুখার্জী।

চাই না, চাই না, আপনার ডায়েরী। কিছু চাই না আমি আপনার কাছে। বলতে বলতে চোখের জল কোন রকমে রোধ করে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম। কিছুক্ষণ পরে মন শান্ত হল। ভাবলাম, ওঁর

অসুস্থ মনে এমন করে আঘাত দিয়ে চলে আসা ঠিক হয় নি। হয়ত এ নিয়ে কত কিছু ভাবছেন উনি।

ধীরে ধীরে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

দেখি, কি যেন লিখছেন ডায়েরীর পাতায়। কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার দিকে একবার তাকিয়ে আবার লেখায় মগ্ন হলেন। লেখা শেষ করে উনি ডায়েরীর খাতাখানা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। প্রথমে কয়েক ছত্র গদ্য রচনা, তারপর কিছু অংশ কবিতা লেখা। পড়তে লাগলাম।

আজ আমার সোনার ক্ষেতের ধারে এক কুড়ুনি এসেছিলো। আলের ধারে দাঁড়িয়ে সে বলল, তোমার ক্ষেতের ধান কুড়োতে চাই।

বললাম, আমার অন্য যে ক্ষেত আছে, সেখানে ফসল কুড়োও ইচ্ছে মত, বাধা দেব না একটুও। তবে এ ক্ষেতের নিয়ম স্বতন্ত্র। এ শুধু আমার একার ভোগের ধন। মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে রইল কুড়ুনি।

বললাম, ভোগ দখলের বাইরে যেদিন চলে যাব, সেদিন তোমার হাতেই দিয়ে যাব এ ক্ষেতের অধিকার।

কথা শুনে আর দাঁড়াল না সে। বলল, তোমার ক্ষেত তোমার থাক। চাইনা আমি অমন ক্ষেতে ধান কুড়ুতে।

*　*　*　*

কতক্ষণ পরে আবার দেখি ফিরে এসেছে কুড়ুনি। মেঘ কেটে গিয়ে রোদের হাসি ঝিলিক দিচ্ছে তার মুখে।

কোথায় বিরোধ, কোথায় বিরোধ,
মেঘ ভাঙা রোদ,
কেবল ঝরে মাটির পরে
খড়ের ঘরে।
কান্নাহাসির এই যে খেলা
দুপুর বেলা,
এই হারানো এইতো পাওয়া
প্রাণের মেলা।

বললাম, কবিতা আর কাহিনী গেঁথে এমন করে ভুলিয়ে রাখলে চলবে না।

আমি তো ভুলাইনি। যা সত্য তাই লিখেছি· সাময়িক ভাবনাগুলোকে যথাযথ লিখে রাখাই তো ডায়েরীর কাজ।

আজকাল আমরা একটা খেলা আবিষ্কার করেছি। মজার কবিতার খেলা। এতে দুজনেই আনন্দ পাই। উনি কবিতার একটা কিংবা দুটো কলি লিখলেন। ভার পড়ল আমার ওপর পাদপূরণের। তখন আবার খুঁজে পেতে মিল দিলাম। এসব কবিতাগুলো হাল্কা ধরনের, তবু বেশ উপভোগ্য মনে হয় আমাদের কাছে।

উনি হয়ত লিখলেন,

তানপুরো থাকলেই যায় কিগো বাজানো?
সাজ ঘরে ঢুকলেই যায় কিগো সাজানো?

ওর সঙ্গে আর দুছত্র যোগ করে পাদপূরণ করলাম,

জল না দিলেও মেঘ, নাম তার জলদ
বল থাক নাই থাক নাম তবু বলদ।

আবার কখনও আমার মেয়ে নতিকে নিয়ে লেখেন,

'নম্রতা', নামটি তার
চপলতা তবু দিনরাত।

পাদপূরণ করি,

তুষারের বুকে জন্ম
নদী রচে জলের প্রপাত।

আবার কোন কোন দিন ছবি আঁকার ঝোঁক চাপে। ডাক পড়ে নতির। বলেন, কাপড়টা কোমরে ভাল করে জড়িয়ে নাও। ছেড়ে দাও চুলের গোছা।

নতি অমনি তার কোঁকড়া একরাশ চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে বসে বসে বই পড়ে।

উনি স্কেচ্ করেন। আঁকা শেষ হলে বলেন, কে নেবে এই ছবি।

নতি অমনি বলে, আমি, আমি।

উনি ছবিটা টেবিলের ওপর উল্টো করে রেখে দিয়ে বলেন, সই করে দাও নাম। ছবি যেমন হোক্, তাকে তোমার বলে মেনে নিয়েছ, সে প্রমাণ থাকবে।

নতি বলে, আগে দেখি আপনার আঁকা ছবি।

থাক্, থাক্, অমন মেয়েকে আমার ছবি দিতে চাই না। আঁকিয়ের ওপর যার বিশ্বাস নেই, তাকে ছবি দেব কোন দুঃখে।

নতি দ্বিতীয় কথা না বলে ওর পেনটা নিয়ে এসে ছবির পেছনে নিজের নাম সই করে দেয়।

উনি অমনি বলেন, এতে হবে না, ওপরে লেখ, 'এটি আমার ছবি'।

নতি, তাই লেখে।

বলেন, ছবি পেলে খুশী হবে তো?

হবো।

খুব?

খু-উ-ব।

উনি এবার নতির হাতে স্কেচের কাগজটা তুলে দেন।

ছবি দেখে নতি হাত-পা ছুঁড়তে থাকে। এগিয়ে গিয়ে দেখি উনি এতক্ষণ নতির আদরের বেড়াল 'পুষুর' ছবি এঁকেছেন।

চাই না আপনার ছবি, আমি কি বেড়াল নাকি। এ তো 'পুষুর' ছবি।

উনি নির্বিকার। চেয়ারে বসে কড়ি কাঠের দিকে তাকিয়ে আছেন। ভাবটা এই, সই যখন করেছ তখন এ ছবি তোমার না হয়ে পারে না। মুখে আঁচল ঢেকে হাসি চাপতে চাপতে বেরিয়ে আসি।

কয়েক মাসে শরীরটা বেশ সেরে উঠেছে ওঁর। স্বাস্থ্যেরও যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে।

একদিন বললেন, চলোনা আজ সারাদিন সমুদ্রের ধারে কাটিয়ে আসি।

বললাম, সে তো খুব ভাল হয়। কিন্তু আপনি কি হেঁটে যেতে পারবেন?

বললেন, এখানে এসে অবধি সমুদ্র দেখিনি। রোজ তার নিমন্ত্রণ আসে হাওয়ায়। আজ তার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারছি না।

বললাম, চলুন ধীরে ধীরে।

সেদিনটা ছুটির দিন। নিশ্চিন্তে কাটানো যাবে সময়। বন্ধুর বাড়ি নতির নেমন্তন্ন, তাই তাকে আর নিয়ে গেলাম না। টিফিন কেরিয়ারে সারাদিনের খাবার নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

একটি পথ গাঁয়ের ভেতর দিয়ে গেছে সমুদ্রের দিকে। অন্য পথটি বালুর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে। গাঁয়ের পথটা দূর, বালুর পথ সোজাসুজি। কিন্তু এই সোজা পথে বালু ভেঙে যাওয়া বেশ কষ্টকর। তবু উনি বালুর পথ ভেঙে যাওয়াই পছন্দ করলেন। এ পথটি নির্জন আর সুন্দর।

দুজনে কিছুক্ষণ চললাম পাশাপাশি। বনঝাউ আর বাদামের জঙ্গল পেরিয়ে চললাম। উনি বললেন, এটি কবিতার পথ।

ভাল লেগেছে?

হেসে বললেন, নতির ভাষায় খু-উ-ব।

কেউ কোথাও নেই। বাঁশ, বুনোজাম আর বন ঝাউ-এর গাছের ফাঁকে আলো এসে বালুর ওপর কত বিচিত্র আঁকি বুকি কাটছে।

কখনো বালু পাহাড়ের ওপরে উঠছি। উনি আমার হাত ধরে উঠছেন। ওপরে উঠে আবার নামছি। নেমেই গাছের ছায়ায় বসছি।

কষ্ট হচ্ছে?

তার চেয়ে আনন্দ পাচ্ছি আরও বেশি।

কষ্ট হলেও বলবেন না, এই তো?

তা কেন, 'আনন্দময়ীর আগমনে, আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।'

তার কাছে আর একটি কাঙালিনী মেয়ে যে রয়েছে, তার দিকে আপনার চোখ পড়ে না।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সে তো কাঙালিনী নয়, ইন্দ্রানী।

মাথা নিচু করলাম। মনে মনে বললাম, তোমার কৃপায় আজ কাঙালিনী ইন্দ্রানীর বর পেয়েছে।

আমরা এসে পড়লাম সমুদ্রের কাছাকাছি। ঢেউ-এর গর্জন শোনা যাচ্ছে। সামনে একটি বালু পাহাড়। ঐ পাহাড়টা পার হলেই সমুদ্র। আমরা বালু ভেঙে ওপরে উঠে দাঁড়ালাম।

হঠাৎ যেন একটা নতুন জগৎ আমাদের চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে উঠল।

নীল সমুদ্র দিগন্তে মিশে গেছে। সাদা সাদা অসংখ্য ঢেউ নীলের বুকে আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝে সাদা সুতোর রেখা টেনে টেনে কে যেন একটা নীল শাড়ি বুনে চলেছে। পাখিরা উড়ছে। সাদা ডানায় সোনালী ঝিলিক দিচ্ছে। সমুদ্রের কোল ঘেঁষে এদিকে ওদিকে ছোট ছোট বালুর ঢিবি। দূরে একদিকে সরকারী বিভাগের ঝাউবন। দীর্ঘ ঋজু গাছগুলোর ঘন সবুজ মাথা দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে নুলিয়াদের মাছ ধরার জন্যে সাময়িক আস্তানা। এ অঞ্চলের লোকে একে 'খটি' বলে। লোকালয়ের চিহ্ন নেই কোথাও।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন উনি। বুঝলাম, সমুদ্রের রূপে ডুব দিয়েছেন। এক সময় বললেন, আমার রোগ-মুক্তি হয়ে গেল সীমা।

ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সকালের আলো এসে পড়েছে ওঁর মুখে। এতটুকু ক্লান্তির চিহ্ন নেই কোথাও।

বললেন, তোমার সেবা, সমুদ্রের শান্তি। তার ভেতর রোগের স্থান নেই সীমা।

বললাম, সমুদ্র দেখে সুখী হয়েছেন?

আমার দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, তার চেয়েও খুশী হয়েছি, সমুদ্রের তীরে তোমাকে পেয়ে।

এক অব্যক্ত যন্ত্রণা আবার আমার বুক ঠেলে উঠে আসতে চাইল। মাথা নীচু করে কোন রকমে সে ব্যথাকে ওঁর চোখের আড়াল করলাম।

বললেন, চল আমরা আজকের মতো ঐ ঝাউবনের ভেতর আমাদের সংসার পাতি।

খুশীতে মনটা ভরে উঠল। সমুদ্রের তীরে তীরে আমরা চলতে লাগলাম। কখনো বা জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে চললাম। কত রঙ বেরঙের ঝিনুক কুড়োলাম।

একটি ঝিনুক কুড়িয়ে হাতের মুঠোয় ধরে উনি বললেন, বলতো এর রঙটা কি?

বললাম, নিশ্চয়ই সাদা।

হেসে বললেন, দেখ সাদা ঝিনকুটা কেমন একজনের মনের রঙ লেগে রঙীন হয়ে উঠল।

হাত খুলতেই দেখলাম, একটি গোলাপী আভার ঝিনুক।

দুজনেই হেসে উঠলাম। আমাদের হাসির শব্দে সাগর পাখিরা পাখা টেনে আরও ওপরে উঠে গেল।

কত বছর যেন পেছু হটে এসেছি আমরা। একটি চঞ্চল কিশোরী তার কত দিনের ঘুম ভেঙে হঠাৎ জেগে উঠল।

আমরা এসে বসলাম ঝাউবনের ভেতর।

টিফিন কেরিয়ার থেকে খাবার বের করে খাওয়ালাম ওঁকে। আমাদের চারদিকে ঋজু সরল ঝাউগাছ উঠে গেছে। মাঝখানে বালুর ওপর আমরা সংসার সাজিয়ে বসেছি।

মনে হচ্ছে, একটি নতুন জীবন যেন শুরু হয়েছে আমাদের। যত সামান্য সময়ের জন্যে হোক্ তবু কি অসামান্য এই মুহূর্তগুলো।

জলযোগের পর আবার ঘুরতে বেরুলাম। এবার গেলাম মাছের 'খটি'র দিকে। নুলিয়ারা সমুদ্রের মাছ এনে জড়ো করেছে।

হারের মতো মালা গেঁথে, শুকোতে দিয়েছে রোদ্দুরে।

নুলিয়াদের ছেলেমেয়েগুলো অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে।

কত বিচিত্র রূপোলী মাছ তুলে জড়ো করেছে ওরা। রোদ্দুব বাড়ল। আমরা আবার ফিরে এলাম ঝাউবনে।

স্নানের সরঞ্জাম নিয়ে এসেছিলাম।

উনি বললেন, চল সমুদ্রে স্নান করি এবার।

কেমন লজ্জা পেলাম মনে মনে। বললাম. আপনি করুন, আজ আমি আর মাথা ভেজাব না।

কেমন বিমর্ষ হয়ে গেলেন।

ম্লান হেসে বললেন, তাহলে থাক্। এক যাত্রায় আলাদা ফল ভাল না।

বললাম, চলুন স্নান করি।

খুশীতে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, এই যে বললে মাথা ভেজাবেনা।

হেসে বললাম, সমুদ্রের কাছে এসে যদি স্নান না করে ফিরে যাই, তাহলে সে দুঃখ চিরদিনের হয়ে রইবে।

দু' জনে সমুদ্রে নামলাম। প্রথমে ছোট ছোট ঢেউ, তারপর আস্তে আস্তে বড় বড় ঢেউ ভাঙতে লাগলাম। কেউ কোথাও নেই। ধূ ধূ বালু বেলা। নীল সমুদ্র আর নীল আকাশ। ধীরে ধীরে মনের ভেতর একটা চিন্তা অধিকার করে বসল। আমরা যেন আদিম যুগের পুরুষ আর রমণী। অনন্ত আকাশ আর অশান্ত সমুদ্রের মাঝে সৃষ্টির কৈশোর লগ্নে আমাদের আবির্ভাব।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। একটা বড় ঢেউ এগিয়ে আসছে দেখে আমি হঠাৎ ওঁর হাতটা চেপে ধরলাম। মুহূর্তের ভেতর আমরা চলে গেলাম ঢেউ-এর তলায়। জলের ভেতর থেকে যেন ভেসে এল লক্ষ লক্ষ শাঁখের আওয়াজ। ঢেউ ভেঙে আলোর জগতে উঠে দাঁড়াতেই দেখলাম. উনি অবাক চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার হাত দুটি ওঁর হাতের ভেতর।

কেঁপে উঠল আমার সারা শরীর। কতক্ষণ দুজনে দুজনের দিকে এমনি অবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম। একসময় উঠে এলাম সমুদ্র থেকে।

ভিজে কাপড়ে কোনদিন ওঁর সামনে এমন করে নিজেকে প্রকাশ করিনি। কেমন সঙ্কুচিত হয়ে রইলাম। আড়চোখে দেখলাম, উনি পথের ওপর চোখ নামিয়েই চলেছেন। মনে হল. কত নিকটে ছিলাম আমরা কয়েক মুহূর্ত আগে, এখন কত দূরে সরে এসেছি।

আমরা ঝাউ-এর তলায় আমাদের সেই বিশেষ স্থানটিতে এলাম। পোশাক পরিবর্তন করে আবার পাশাপাশি বসলাম। কিন্তু দুজনের কেউ আগের মতো সহজ হতে পারলাম না।

দুপুরে উনি বালুর ওপর শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের ভেতরেই ঘুম এল ওঁর চোখে।

বুঝলাম, ক্লান্তি এসেছে। হাওয়া দিচ্ছিল সমুদ্র থেকে।

ঝাউগুলো কি করুণ দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। ছায়াগুলো কাঁপছে, সরে সরে যাচ্ছে। আলো এসে পড়েছে, আবার সরে যাচ্ছে। আবার ছায়া। কি বিচিত্র আলপনা আঁকা হচ্ছে বালুর জমীনে।

সে আলপনার ছবি এসে পড়েছে আমার মনে। কি এক অদৃশ্য বাতাসের ছোঁয়ায় সে আলপনা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

হাতের ওপর মাথা রেখে উনি শুয়েছিলেন। মুখের দিকে তাকিয়ে বড় ক্লান্ত বলে মনে হল। কেমন মায়ায় জড়িয়ে পড়লাম। নতির ঘুম কাতর মুখখানা চোখের ওপর ভেসে উঠল। কোন সংকোচ না করে কোলের ওপর তুলে নিলাম ওঁর মাথাটা। ঘুম থেকে জেগে উঠে অবাক চোখে তাকালেন আমার দিকে। তারপর পরম তৃপ্তিতে আমার কোলে মাথা রেখেই চোখ বুজলেন।

বেলা শেষে বললাম, ঘরে যে এবার ফিরতে হবে।

বললেন, এর মধ্যেই সব ফুরোলো।

তাকালাম ওঁর দিকে। উনিও তেমনি তাকিয়ে আছেন আমার মুখের ওপর স্থির চাহনি মেলে।

মুখ নীচু করলাম।

বললেন, আর কয়েকটা মুহূর্ত পরেই চাঁদ উঠবে। সেই চাঁদের আলোয় এই রহস্যময় সমুদ্রকে আর একবার দেখে যাবে না?

বললাম, যে সমুদ্র এ জীবনে এত সম্পদ এনে দিলে, তাকে সেই মুহূর্তে নমস্কার জানিয়ে যাব।

চাঁদ উঠল। সেই ঝাউ-এর বনে বালুর জমীনে পাশাপাশি বসে অদ্ভুত চাঁদের উদয় দেখলাম। উনি আঙুলের রেখায় বালুর বুকে আঁকলেন একটি মুখ। কবরী আঁকা হল।

আমি তাকিয়ে রইলাম ওঁর ছবির দিকে।

এক সময় হাওয়া বইল। মুছে গেল বালুর লিখন। বললেন, যত সহজে বালুর বুকে চিহ্ন হারায়, তত সহজে যদি সবকিছু মুছে ফেলা যেত।

মন বলল, সবকিছু মুছে ফেলতে চাইলেই কি ফেলা যায়।

উনি বসে আছেন, পাশে বসে আছি আমি। ঝাউ-এর দীর্ঘ ছায়া পড়েছে। জোর বাতাস বইছে।

সামনেই বালু বেলায় আছড়ে পড়ছে ঢেউ। ছড়িয়ে পড়ছে ফেনার ফুল।

কার যেন পুষ্প-বাসরের আয়োজন চলেছে।

ওঁর দিকে তাকালাম। নিবিষ্ট হয়ে নিজের কোলের ওপর তাকিয়ে আছেন। ওঁর দৃষ্টিকে অনুসরণ করতেই দেখলাম, চাঁদের আলোয় আমার ছায়া আঁকা হয়ে আছে সেখানে। উনি তাই দেখছেন তন্ময় হয়ে।

এক সময় আমার দিকে চোখ পড়তেই কেমন সংকুচিত হয়ে গেলেন। মুহূর্তমাত্র।

একটা ম্লান হাসির রেখা ফুটে উঠল ওঁর মুখে। বললেন, এমন সীমাহীন সমুদ্রের কূলে এসে বসলে সমাজ সংসারের সীমা কতদূর যে সরে যায়।

কিছু বলতে পারলাম না।

মুখ নত হল। সহসা একটা মধুর ছোঁয়ায় চোখ মেলে দেখি, ওঁর দুটি অঞ্জলি বদ্ধ হাত আমার নত মুখখানা তুলে ধরল।

কোন কথা কেউ বলতে পারলাম না। উনি তাকিয়ে রইলেন। কেমন এক বিহ্বলতার ছবি ফুটে উঠল ওঁর দৃষ্টিতে। আমার চিবুক ছোঁয়া ওঁর দুটি হাতের অঞ্জলিতে ভরে দিলাম আমার চোখের জলের বকুল।

সেদিন আমরা ফিরে এলাম। ফিরলাম আশ্চর্য এক যাদুর জগতের ভেতর দিয়ে। নির্জন, নির্বাক, রোমাঞ্চিত একটি পথের ওপর পায়ের চিহ্ন এঁকে এঁকে।

পরের দিন ভোর বেলায় আমি কলেজে গেলাম। গরমের দিনগুলিতে সকালে কলেজ চলে এখানে। অদ্ভুত এক উন্মাদনায় কত বিচিত্র কথার ছবি এঁকে চললাম ছাত্রীদের সামনে। পড়ার বইয়ের কথা, কিন্তু স্বাধীন মুক্ত এক জীবনের স্বাদে ভরা সে সকল কথা। ওরা অবাক হয়ে শুনল। মনে হল, আমার জীবনেব শ্রেষ্ঠ অনুভবের ধন আমি বিলিয়ে দিলাম ওদের মাঝে।

কলেজ শেষে ফিরে যখন এলাম, তখন সমস্ত মন আমার সহস্রদল কমল হয়ে ফুটে উঠেছে।

সেই কমল নিবেদন করব বলে চলে এলাম ওঁর ঘরটিতে।

শূন্য ঘর। ওঁর রোজকার ব্যবহারের টেবিলের ওপর একটি খাম। তার ওপর খোলা অবস্থায় পড়ে আছে ওঁর প্রিয় ফাউন্টেন-পেনটি। যেন এইমাত্র লিখতে লিখতে কোথাও বেরিয়েছেন।

খামটি তুলে নিলাম। খামের ওপর পেনের কালিতে একটি রেখাচিত্র আঁকা আছে। সমুদ্রের ঢেউ। তার ওপর দুটি ডানা মেলে উড়ছে একটি নিঃসঙ্গ সাগর পাখি। বুঝলাম, ওঁর বিহঙ্গ-মন পাখা মেলেছে।

কতক্ষণ চিঠিখানা ধরা রইল আমার হাতে। এক সময় খাম খুলে পড়তে লাগলাম ওঁর লেখা!

কল্যাণী,

সারারাত চোখে ঘুম আসেনি। অশান্ত সাগরের ঢেউ বারে বারে আছড়ে পড়েছে। তারা আমায় প্লাবিত করে দিয়ে গেছে। সেই সাগরের স্পর্শ নিয়ে গেলাম। আমার জীবনে এরচেয়ে বড় সঞ্চয় আর কিছু রইল না। এর পরে আর কোন পাওয়ার মূল্য এর চেয়ে বেশি হবে না। তাই চললাম।

যদি তোমার মনে কোনদিন এ প্রশ্ন জাগে, কেন আমি নিঃশব্দে সরে গেলাম, তাহলে আমার একটি দুর্বলতার কথাই শুধু বলব। সে দুর্বলতা আমার ভেতরে যে রোজকার মানুষটি আছে, তার। যে ঘর বাঁধতে চায়। শান্ত সমাজের বুকে চায় একটা ব্যতিক্রম সৃষ্টি করতে। সেই লোভী মানুষটির হাত থেকে আমি নিষ্কৃতি চাই। তুমি আমাকে সাহায্য কর। আজ আমি তোমার কাছে এই গুরুদক্ষিণাই প্রার্থনা করব।

তোমার থেকে দূরে সরে গিয়ে আমি আরও নিবিড় করে তোমাকে পেতে চাই।

একটি জিনিস তোমার জন্যে ফেলে এসেছি। আমার প্রিয় কলমটি তোমার হাতে সার্থক হোক্, এই কামনা।

তিনি চলে গেলেন। সেইদিন থেকে আমি পরলাম বৈধব্যের বেশ। সেই বেশেই গেলাম কলকাতা।

দিদি অবাক হয়ে বলল, একি বেশ সীমা!

এই তো আমার ঠিক পরিচয় দিদি।

কি করে তুই বলতে পারলি এ কথা, অঞ্জনের কোন খোঁজ কি পেয়েছিস।

তিনি হয়ত সুখে আছেন দিদি।

কেমন করে জানলি?

বললাম, সবকিছু কি হাতের ভেতর প্রমাণ রেখে জানতে হয়। রূঢ় কথা বেরিয়ে এল দিদির মুখ দিয়ে, বুঝেছি, মিথ্যা বিধবার বেশ পরে সমাজকে ভুলিয়ে তুমি সুমন্তের গলায় মালা দিতে চাও।

ছি, ছি, দিদি, এ কি বলছ তুমি!

আমার কাছে গোপন করো না সীমা। সুমন্ত সেন কয়েক মাস কলেজ ফাঁকি দিয়ে কাটিয়ে এসেছে তোমার ওখানে। অস্বীকার করতে পার সে কথা।

বললাম, আর একবার এমনি ভুল তুমি করেছিলে দিদি। আজ হয়ত ভুলে গেছ কার্শিয়াং-এর কথা। অসুস্থকে সেবা দিয়ে সুস্থ করে তোলার ভেতর অন্যায় তোমরা দেখলেও আমি কিন্তু দেখতে পাই না।

সব বুঝি আমি সীমা। আজ শুধু অঞ্জন ঠাকুরপোর মুখটাই ভেসে উঠছে চোখের ওপর। প্রতিদিন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছি, সে যেন সুস্থ থাকে, ফিরে আসে আবার। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে তার আর না আসাই ভাল।

সে আর আসবে না দিদি।

সত্যিই যেন সে আর না আসে।

বললাম, স্ত্রীর কাছ থেকে যে চোরের মতো পালিয়ে সংসার থেকে নিজেকে মুছে ফেলতে চায়, তাকে তোমরা শ্রদ্ধা করতে পার, আমি করি না।

একথার অর্থ?

অর্থ কিছু শক্ত নয়। অঞ্জনবাবু তাঁর নতুন সংসারে সুখেই আছেন।

মিথ্যে বলনা সীমা। নিশ্চয়ই সুমন্ত তোমাকে এই সব বুঝিয়েছে।

মিথ্যে তুমিও বলো না দিদি। যাঁর সম্বন্ধে কিছুই জান না, তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা, বা তাঁর নামে মিথ্যে অপবাদ দেওয়া কি শোভন।

আচ্ছা, কোনটা সত্যি তাই দেখা যাবে।

বললাম, তোমাকে আমার মায়ের সঙ্গে তফাৎ করে দেখিনি কোনদিন। মিথ্যে আমি তোমাকে বলব না। তবে জেনে রেখো, যে ইঙ্গিত তুমি করতে চাইছ, তার ভেতর এক কণা সত্য নেই.

চলে এলাম কলকাতা থেকে। ওঁর সঙ্গে দেখা করলাম না। হয়ত উনি বিব্রত হবেন। তাছাড়া মনে একটা অভিমান জমা হয়ে উঠেছিল। কেন উনি এমন করে আমার চোখের আড়ালে সরে গেলেন। যদি কোনদিন সুযোগ আসে, তাহলে ডাকব ওঁকে। ভাঙব ওঁর ভুল।

* * * *

সূর্যাস্ত হয়ে গেছে কখন। পেছনে বালুর পাহাড় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। সামনের ঝাউগাছটার মাথায় সমুদ্রের হাওয়া বিচিত্র সুর তুলেছে। উঠে দাঁড়ালাম। আজ থেকে একটি জীবনে ছেদ পড়ল। শুরু হবে আর একটি জীবন। তাঁর দেওয়া কলম সযত্নে তুলে রেখেছি। তাই তুলে নেব হাতে। আজ থেকে হবে আমার নবজন্ম।

ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালাম ঘরের সামনে। চাঁদ উঠেছে বালু-পাহাড়ের ওপারে। তরল এক ঝলক আলো এসে পড়েছে আমার বাগানের হাস্নুহানার ঝাড়ে। নতির পড়ার ঘরের জানালা খোলা। সৈকত পড়াচ্ছে নতিকে। বি. এ. পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছে নতি। বড় মধুর আর লাজুক প্রকৃতির ছেলে সৈকত। সবে এসেছে কলেজে। কিন্তু এই কদিনেই যথেষ্ট নাম করেছে ও।

একটি ছবি ফুটে উঠল চোখের ওপর। আমার জীবনে যা ঘটতে পারত তারই একটা ছায়াছবি। সে ছবি ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে এল। তার ওপর ফুটে উঠল আর একটি ছবি। উজ্জ্বল, মধুর।

নতির পাশে সৈকতকে বড় সুন্দর মানায়। হোক না সে ভিন্ন জাত। সে শিক্ষক, নম্রতা ছাত্রী। তাতে কি এসে যায়।

যার সঙ্গে প্রতিদিন শিক্ষার ভেতর দিয়ে চেনাজানা হচ্ছে, দৈনন্দিন জীবনে তাকে গ্রহণ করতে বাধা কোথায়। যেখানে আমি হেরেছি, সেখানে নতি জয়ী হোক্।

আমাকে দেখতে পেয়েছে ওরা। উঠে এল নতি। সঙ্গে সৈকত। নতি আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, মা মণি, এত দেরী হল ফিরতে?

পুরোনো জীবনটাকে বিদায় দিয়ে আসতে একটু দেরী হবে বৈকি মা।

সৈকত হঠাৎ নত হয়ে আমার পায়ের ধুলো নিল।

দু'হাতে ওকে ধরে তুললাম।

উঠে দাঁড়িয়ে ও বলল, আশীর্বাদ করুন জীবনে যে ব্রত গ্রহণ করেছি তাতে যেন আপনার মতো সফল হতে পারি।

তুমি আমার চেয়েও কৃতি হবে সৈকত। আর জীবনে যেখানে আমার হার হয়েছে, সেখানেও তুমি জয়ী হবে।

আজ প্রাণ খুলে ওকে আশীর্বাদ করলাম।

নতি বলল, কই আমাকে আজ আশীর্বাদ করলে না তো মা?

বললাম, জীবনে যা সত্য বলে অনুভব করবে, তাকে সমস্ত বাধার ভেতর থেকেও গ্রহণ করো। চিরদিন জানবে সেখানে তোমার মায়ের আশীর্বাদ আছে।

অনেক রাত অবধি ঘুম এল না চোখে। কত বছব আগে উনি যে কলমখানি আমার জন্যে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন, আজ তাই তুলে নিলাম। ওঁরই দেওয়া কলমে ওঁকে লিখলাম একখানা চিঠি।

শ্রীচরণেষু,

কতদিন দেখিনি আপনাকে, আজ দেখতে বড় ইচ্ছে করছে। ছুটি নিলাম অধ্যাপনার কাজ থেকে। এবার নতুন পথে যাত্রা শুরু হবে। তার আগে একবারটি এসে আমার সামনে দাঁড়াবেন না?

আপনার কলম হাতে তুলে নিয়েছি, জানি এই হবে আমার শেষ জীবনের সঙ্গী। আমি লেখিকা হব, এই কামনাই আপনি করতেন, আজ সেই ব্রতই আমি গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছি। আপনি আমাকে কাছে থেকে আশীর্বাদ করবেন না?

আর একটি কথা।

পথে চলতে চলতে যেখানে আমরা দুজনের কাছ থেকে দূরে সরে গেছি, ঠিক সেইখানটিতে এসে দাঁড়িয়েছে আর দুটি যাত্রী। তারা পরস্পরকে চিনেছে শিক্ষার ভেতর দিয়ে। কোন সংস্কারের মিথ্যা বাঁধনে বাঁধা পড়েনি তাদের মন। তাদের কাছে এসে আজ আপনাকে দাঁড়াতে হবে। নতি আর সৈকত তাকিয়ে আছে আমাদেরই দিকে। আপনি এসে তাদের সত্য পথের সন্ধান দিন। যেখানে আমরা হার মেনেছি, সেখানে জয়ী হোক ওরা। ওদের জয়ের ভেতর দিয়ে আজ পেতে চাই আমাদের না পাওয়া জয়ের গৌরব।

—আপনার সীমা।

●

আপন ঘর

দূর থেকে মনে হচ্ছে পিঙ্ক রঙের একখানা লম্বা ওড়নার দুই প্রান্ত উঁচুতে তুলে ধরে কারা যেন হাওয়ায় ওড়াচ্ছে। ওড়নাটা উড়ে আসছে নীচু থেকে উঁচুতে। একটা সম্মেলক গানের ক্ষীণ আওয়াজ কান পাতলে শোনা যায়।

জয়তিলক ওপরের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছে। তার পেছনে ডাল-পালা ছড়িয়ে একটা শাউর গাছ দাঁড়িয়ে। গাছটা বসন্তে চেরীর মত গুচ্ছ গুচ্ছ পিঙ্ক ফুলে নিজেকে ভারী সুন্দর করে সাজিয়েছে। দুটো চুইয়া পাখি গাছের ডালে বসে, চুঁহু চুঁহু করে পরস্পরে ঘরোয়া কথা বলছে। ওরা চুঁহু চুঁহু কি দুঁহু দুঁহু বলছে তা বোঝা যাচ্ছে না।

নীচ থেকে অনেক ওপরে উড়ে এসেছে সেই গোলাপী ওড়না। এখন আর ওটিকে ওড়না বলে ভুল হচ্ছে না। এক দঙ্গল যুবক যুবতী ফাগ মেখে, হাওয়ায় আবীর ওড়াতে ওড়াতে এগিয়ে আসছে। জয়তিলক জানে ওরা ওদের তিলকসাহেবের কোঠীর দিকেই আসছে। আজ হোলির দিনে ওরা মাতোয়ারা। ওরা ওদের তিলক সাহেবকে আজ সাজাবে। ওদের সামনে খুলে ফেলতে হবে ওপরের অঙ্গবাস। ওরা জয়তিলকের শ্যামল রঙের ওপর ফাগুয়ার গোলাপী রঙ উজাড় করে ঢেলে মাখাবে। তার পর ওরা উঠে যাবে পাইন বনের বুক চিরে মিত্রসাহেবের কোঠীর দিকে। জয়তিলকের প্রায় পঙ্গু বৃদ্ধ বাবা রাধামোহন থাকেন ওখানে। তাঁকে আবীর দিয়ে ওরা নমস্কার জানাবে। রাধামোহনের সেবার জন্যে নিযুক্ত তরুণী নার্সটি পাত পেড়ে মেঠাই আর পুরী খাওয়াবে সবাইকে। এ নির্দেশ স্বয়ং রাধামোহনের।

সন্ধ্যায় রূপোর থালার মত চাঁদ উঠবে আকাশে। কাছে দূরে পাহাড়, ভ্যালি, পাইন বন, চা গাছের ঝোপগুলো অদ্ভুত রহস্যময় মনে হবে। চা বাগানের কুলি-ধাওড়ার টিনের ঘরগুলোর সামনের প্রাঙ্গনে বসবে গানের আসর। সারা রাত চলবে গান আর নাচের মাতন। বিহারী, রাজস্থানী, বাঙালী, অসমিয়া, পাহাড়ী, ওড়িয়া সব একাকার। বংশ পরম্পরায় ওরা চা বাগানের কুলিকামিনের কাজ করে। ওদের দেশ বলতে এই পাহাড় আর কাল্‌চে সবুজ চায়ের বাগানগুলো।

প্রতি বছরের মত এবারও জয়তিলক গিয়ে সন্ধ্যার আসরে কুলিদের ডেরায় ওদের সঙ্গে মিলিত হল। হৈ হৈ করে উঠল কুলি কামিনের দল। তাদের তিলক সাহেব এসে গেছে। জয়তিলক সবার মাঝখানে বসলে আবার খঞ্জনী, ঢোল, কাঠ করতাল বেজে উঠল। চলল হোলির উদ্দাম গানের স্রোত।

'হোরী খেল শ্যাম সো
মৈঁ হারী
তোড় দঈ মোরী সির কী গাগরিয়াঁ
ভীজ গঈ মোরী সারী।
অবীর গুলাল মলে মেরে মুখ পর
মোরী রংগকী ভর পিচকারী
অচানক মুখ পর মারী
হোরী।'

তরুণী সজনী বাম করাঙ্গুলিতে ঘাঘরা ছুঁয়ে, প্রসারিত ডান হাতে দো-পাট্টার প্রান্ত উড়িয়ে লীলাভরে নেচে নেচে গান গাইছে আর অসহায় রাধার অভিনয় করছে। সজনীর গান থামলেই সমবেত যুবক যুবতীরা ঢোল করতাল বাজিয়ে তারস্বরে ধুয়া ধরছে।

এবার উঠল মোতিয়া। সঙ্গে সঙ্গে তার সখিরাও উঠে দাঁড়াল। মোতিয়ার গলায় যেন পাহাড়ী মধু ঝরছে। সে সখিদের দিকে চেয়ে আধ চক্কর ঘুরে গান ধরল,—

'চল সখী শ্যামকো
আজ মানাই।
আও বসন্ত সময়
বনফুল ফাগুন অধিক শোহাই।
খেলত ফাগ সবাই
অবরখ আবীর উড়াই
হামই একো ন সোহাই।
বাজুবন্ধ বিজায়ঠ
হরোয়া মতিয়ন মাঙ ভরাই।'

এরপর অসহায় চোখ দুটো শ্রোতাদের দিকে মেলে করুণ সুরে গাইতে লাগল মোতিয়া,—

'তাস বাদল কি আঙিয়া
হামারি সারি কেশরমে বোরাই।
পাহিরি হাম কাকো দেখাই।'

বাদল রঙের চোলিখানা কেশর রঙে চুবিয়ে দিয়েছে। ওটা পরে আমি কাকে দেখাবো।

আসরের মাঝখান থেকে হায়-হায়, হায়-হায়, একটা রসের রব উঠল। শ্রীমতি রাধাসুন্দরীর কেশর রঙে-ভেজা চোলীর দৃশ্য দেখে সবাই তখন রসের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে।

সামলাতে পারলনা শ্যামবাহাদুর। সে তার ঢোল ফেলে মোতিয়াকে জড়িয়ে ধরে তার মাথায় ফাগ ঘষে দিলে। হৈ হৈ করে উঠল সকলে। মোতিয়া বাঁ হাতে শ্যামবাহাদুরকে কিল মারতে লাগল। দেহখানা ছাড়িয়ে নেবার জন্যে পা নাচাতে গিয়ে মোতিয়ার পায়ের ঘুঙুর ঝম্ ঝম্ ঝম্ বেজে উঠল।

মোতিয়াকে টানা হেঁচড়া করে শ্যামবাহাদুরের হাত থেকে উদ্ধার করল সাথিরা।

মোতিয়া শ্যামের দিকে চেয়ে ফুঁসতে লাগল আর শ্যামবাহাদুর হাসি ঝরাতে লাগল সমানে।

আসরে তখন ছড়িয়ে পড়েছে একটা চাপা উত্তেজনা।

মোতিয়া বলছে, ঝোরার কাছে একা একা পানি ভরতে যাবার জো নেই, গাছের ফাঁক থেকে বেরিয়ে ঠিক সামনে এসে দাঁড়াবে ঐ শ্যাম। লক্‌ড়ি কুড়োতে যাবার জো নেই, গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে গান ধরবে।

এবার তিলক সাহেবের কাছে সবাই শ্যামের বিরুদ্ধে বিচার-প্রার্থী হল। মেয়েরা চেঁচিয়ে বলল, ওকে আজ শাস্তি দিতে হবে সাহেব।

যার বিরুদ্ধে এত আস্ফালন সে কিন্তু এতক্ষণ সমানে মুখে হাসি টেনে দাঁড়িয়েছিল।

মেয়েদের প্রতিবাদের ঝড় থামলে সে জয়তিলকের কাছে এগিয়ে এসে মাথাটা একেবারে নুইয়ে বলল, তিলক সাহেব, আমার দিল মোতিয়াকে চায়। ঐ বেয়াড়া দিলখানাকে মোতিয়া উপড়ে ফেলে দিক্, আমি কিছু বলবনা। দোহাই তোমার তিলক সাহেব, শাস্তির এই পরোয়ানাটা তুমি জারি করে দাও।

জয়তিলক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার কথা তোমরা সবাই মানবে তো আমি বিচার করি।

সমস্বরে সকলে চেঁচিয়ে উঠল, আলবাৎ মানবে।

মোতিয়া?

মানব সাহেব।

শ্যাম?

আমি তো শির পেতে আছি হুজুর।

জয়তিলক বলল, আজ রাতভোর চাঁদের রোশনি। চারদিকে চেয়ে দেখ কোথাও আঁধার নেই। এ

রাতে কারোও মনে তাই দুঃখ দিতে নেই। আজ দিল খুলে নাচ, গাও, ফূর্তি কর। কাল থেকে শ্যাম মোতিয়ার পিছু নিতে পারবে না। মোতিয়া যদি ফের নালিশ জানায়, তাহলে শ্যামকে বড় কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

সবাই বলে উঠল, ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায় সাহেব।

শ্যাম, মানবে আমার বিচার?

তেমনি মাথা নত করে শ্যাম বলল, জী হুজুর।

জয়তিলক আবার বলল, মোতিয়া?

মোতিয়া অমনি ঘাড় নেড়ে বলল, বিচার তো ঠিক হ্যায় সাহেব।

জয়তিলক বলল, আমারও একটা আর্জি আছে তোমাদের কাছে।

সবাই আবার হৈ হৈ করে উঠল, বল সাহেব? আর্জি কেন, আদেশ কর।

গতবার ফাগুয়ায় সজনী নেচেছিল শ্যামের সঙ্গে, এবার শ্যামের সঙ্গে মোতিয়াকে নাচতে হবে। শুধু আজ রাতের জন্যে তোমরা গাইবে আর ওরা দুজনে নাচবে।

আবার রব উঠল, ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়।

জয়তিলক বলল, মোতিয়া রাজী?

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল মোতিয়া।

শ্যাম, তোমার আপত্তি আছে?

আপত্তি হুজুর! একবার মোতিয়ার সঙ্গে নাচতে পেলে সাত জনম আমি ঐ খাদে পড়ে মরতে রাজী আছি।

বাজনা বেজে উঠল। মেয়েরা একদিকে গেয়ে উঠল আহিরী রমণীদের হোলী খেলার গান। তারা রাধারাণীর পক্ষ নিয়ে গান গাইতে লাগল। অন্যদিকে পুরুষেরা গান ধরল শ্যামের পক্ষ নিয়ে। চাপান আর উতোরে গান জমে উঠল। এদিকে গানের সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল নূপুর। মোতিয়ার হাত ধরে টানছে শ্যাম আর মোতিয়া ঝট্‌কা মেরে ঘুরে ঘুরে সে বাঁধন ছাড়াবার চেষ্টা করছে। প্রথমে মোতিয়া একটু আড়ষ্ট ছিল। পর পর গান দুন থেকে চৌদুনে চলল, আর অমনি নাচেও লেগে গেল [illegible]। চোখ ইসারায়, দেহের সঙ্কোচন প্রসারণে, পায়ের আঘাতে নূপুরের কান্নায় সৃষ্টি হল এক মোহিনী মায়ার জগৎ। কে বলবে, এই দুটি নর্তক নর্তকী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমিক প্রেমিকা নয়!

একাই কোঠীতে ফিরে এল জয়তিলক। রাত দশটার কাছাকাছি। সামনের গেট আগলে যে নির্দিষ্ট জায়গায় কর্তব্যরত বাহাদুর বসে নেই। ঘরে ঢুকেই সে সোজা চলে এল ড্রইং রুমে। এবার অবাক হবার পালা তার। একটা সোফায় শ্রুতি বসে আছে।

জয়তিলককে ঘরে ঢুকতে দেখেই শ্রুতি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

জয়তিলক মুখে হাসি টেনে বলল, এত রাতে কি মনে করে শ্রুতি?

মনে হল শ্রুতির মুখখানা লাল হয়ে উঠল। সে অনেক কষ্টে সংকোচ কাটিয়ে বলল, বাবা আমাকে আপনার এখানে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, আজ হোলীর দিন। বেচারা বাহাদুর মুখ ভার করে থাকবে। তার চেয়ে তুমি গিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে ওকে ছুটি দাও। তাই আমাকে আসতে হল।

জয়তিলক বলল, খুব খুশি হলাম তোমার আসাতে। তবে বাবা বোধ হয় খবর রাখেন না যে আমি গানের আসর থেকে ফিরে এসেই সারা রাতের জন্য বাহাদুরকে ছুটি দিয়ে দিই।

শ্রুতি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে জয়তিলক বলল, বোস, বোস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন।

জয়তিলক সোফায় বসার পর শ্রুতি তার মুখোমুখি অন্য একখানা সোফায় বসল। বসেই কিন্তু সে আবার উঠে দাঁড়াল।

কি হল, উঠলে যে?

একটুখানি হাসল শ্রুতি। বলল, আপনি তৈরি হয়ে নিন, বাবা আপনার জন্যে খাবার পা[illegible]ন।

বাবা খাবার পাঠিয়েছেন! কই কোনদিন তো এমন ঘটনা ঘটেনি।

এবার মুখে আঙুল ঢেকে সত্যিই হেসে ফেলল শ্রুতি। হাসি থামলে বলল, কেন, ছেলের কাছে বাবার বুঝি কোনকিছু পাঠাতে নেই?

তা পাঠাবেন না কেন, তবে খাবার নয় খবর। অক্ষম বাবা সক্ষম ছেলের কাছে দরকারে খবর পাঠাবেন, এটাই তো স্বাভাবিক।

শ্রুতি বলল, আজ বাবা রাধাবল্লভীর গল্প করছিলেন সকাল থেকে। দোলের দিন আপনার মা নাকি রাধাবল্লভী তৈরী করতেন, আর আপনি আপনার ক্লাশের বন্ধুদের ডেকে এনে তাই খাওয়াতেন।

জয়তিলক কয়েকমুহূর্ত স্মৃতির জগতে ফিরে গেল। আপন মনে একসময় বলে উঠল, মায়ের রান্নার হাত ছিল অসাধারণ, আর তার চেয়েও বেশি ছিল মানুষজনকে ডেকে ডেকে খাওয়াবার ইচ্ছে। আমার বন্ধুরা মায়ের সামনে খেতে বসে খাবার নিয়ে এমন কাড়াকাড়ি করত আর মায়ের কাছে পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনত, যাতে বাইরের লোকে মনে করত আমরা সকলে সহোদর ভাই।

শ্রুতি বলল, আজ প্রায় সারাক্ষণই বাবা মায়ের কথা বলেছেন।

জয়তিলক বলল, দোলের দিন গৃহদেবতা রাধামাধবের পায়ে আবীর দিয়ে মা প্রথমেই বাবার পড়ার ঘরে ঢুকত। সারাক্ষণ বাবার চোখ ডুবে থাকত বই এর ভেতর। মা ডাক দিয়ে বলত, এবার একটু ধ্যান ভঙ্গ হোক্ পণ্ডিত মশায়ের।

বাবা বই রেখে সুবোধ ছেলেটির মত উঠে দাঁড়াতেন। অপরাধীর মত চেয়ে থাকতেন মায়ের মুখের দিকে। মা রূপোর রেকাবী থেকে আবীর নিয়ে কতক্ষণ ধরে বাবার সারাটা পায়ে মাখাত। যেন আশা মিটত না। বাবা দাঁড়িয়ে থাকতেন মূর্তির মত। মা যখন প্রণাম শেষে উঠে দাঁড়াত তখন বাবা যেন হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেতেন। মায়ের রেকাবী থেকে আবীর নিয়ে চওড়া করে মায়ের সিঁথিতে লাগিয়ে দিতেন।

মা বলত, কৃষ্ণের নামে তোমার নাম, তাই সারাবছর তোমার হাতের একটুখানি আবীর পাব বলে এই দিনটির অপেক্ষায় বসে থাকি।

পাশের ঘরে আমাদের হল্লা শোনা গেলেই বাবা বলতেন, পেটুক দামুরা এসে গেছে তোমার হাতে রাধাবল্লভী খাবার লোভে।

মা মুচকি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বলত, তাহলে শুধু আমার ছেলেদের জন্যেই গুনে গুনে রাধাবল্লভী বানাই।

কিন্তু শ্রুতি, ছেলেবেলা থেকেই আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, দোলের খাবার তৈরী হয়ে গেলেই মা আগে ঠাকুর ঘরে নিবেদন করে বাবাকে দিয়ে আসতেন। তারপর আমাদের মত পেটুকদের ভাগ বাঁটোয়ারা করে খাওয়াতেন।

শ্রুতি বলল, বাবার মুখে রাধাবল্লভীর গল্প শুনে আনাড়ী হাতে খানকতক বানালাম।

জয়তিলক কৌতুকের চোখে শ্রুতির দিকে চেয়ে বলল, রাধাবল্লভী খেয়ে বাবা কি মন্তব্য করলেন?

শ্রুতি বলল, সে কথা শুনতে নেই। আপনি খেয়ে বরং ভালমন্দ যা হোক্ একখানা সার্টিফিকেট দিন।

হেসে বলল জয়তিলক, আর কখানা সার্টিফিকেট চাই তোমার? অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে তো কলকাতার তাবৎ বাঘা বাঘা ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়েছিলে?

ওটা আমার নার্সিং বিদ্যের সার্টিফিকেট। রাঁধুনির সার্টিফিকেট একখানা রেখে দেওয়া ভাল। নার্সের চাকরি না থাকলে গ্রীন ভ্যালি টি গার্ডেনের মালিকের সার্টিফিকেট দেখিয়ে নিদেন পক্ষে একটা রাঁধুনির কাজও পেয়ে যেতে পারি।

জয়তিলক বলল, একটু যে ভুল করে ফেললে শ্রুতি। গ্রীণ ভ্যালি টি গার্ডেনের মালিক আমি কদাপি নই, খবরদারী করি মাত্র। মালিকের সার্টিফিকেট পেতে গেলে মেমসাহেবের কাছে আসতে হবে।

শ্রুতি একটু দ্বিধা করেও বলে ফেলল, বাহাদুরের কাছে শুনলাম, ভোরবেলাতেই মিসেস মিত্র গাড়ি করে বেরিয়ে গেছেন। খুব জরুরী কিছু কাজ আছে নিশ্চয়।

জয়তিলক বলল, টি প্ল্যানটার্স ক্লাবের জয়েন্ট সেক্রেটারির গুরু দায়িত্ব যার ওপর তার কাজটা জরুরি হওয়াইতো স্বাভাবিক।

আর কথা বাড়াল না জয়তিলক। প্রসঙ্গের ইতি টানবার জন্যেই মুখে একটুখানি ম্লান হাসি টেনে বলল, গ্রীন ভ্যালির যে কোন একজন কর্মীর সার্টিফিকেটে যদি কাজ হয় তাহলে আমি তোমাকে এই মুহূর্তে লিখে দিতে রাজী আছি।

কথাটা বলেই জয়তিলক হাত মুখ ধুতে ভেতরে চলে গেল।

জয়তিলকের খাওয়া শেষ হলে দেয়াল ঘড়িতে দেখা গেল এগারোটা বেজে আট মিনিট।

জয়তিলক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, এখনও এগারোটা দশ হতে দু' মিনিট বাকি। মিনিট দু'এক-এর ভেতর সার্টিফিকেটটা লিখে দিতে পারি।

শ্রুতি বলল, বুঝেছি রাধাবল্লভী আপনার মুখে লাগেনি। দু'মিনিটে সার্টিফিকেট লিখে রাঁধুনিকে বিদেয় করতে চাইছেন।

হো হো করে হেসে উঠল জয়তিলক। বলল, তুমি যে সেই বিখ্যাত ডাক্তার আর তাঁর পেসেন্টের গল্পটা মনে করিয়ে দিলে।

শ্রুতি বলল, সেটাও কি দু'মিনিটের গল্প নাকি?

জয়তিলক বলল, তাও নয়, মাত্র একমিনিট। তখন ডাক্তার রায় চিফ্ মিনিস্টার।

রোজ সকালে কিন্তু রোগী দেখার কামাই নেই। একদিন তাঁর ক্যাবিনেটের এক মন্ত্রী একজন প্রবীন এম-এল-এ পেসেন্টকে রেকমেণ্ড করে তাঁর কাছে পাঠালেন। ডাক্তার রায় পেসেন্টকে মিনিটখানেক বাজিয়ে নিয়ে একটা প্রেসক্রিপশন লিখে ছেড়ে দিলেন। এদিকে বৃদ্ধ এম-এল-এ ভদ্রলোকের অসন্তোষ চরমে উঠল। ডাক্তার রায় তাঁকে উপেক্ষা করেছেন। এতকালের রোগের চিকিৎসা মাত্র একমিনিটে নমো-নমো করে সেরে দিয়েছেন।

কথাটা মন্ত্রীমহোদয়ের মারফৎ ডাক্তার রায়ের কানে গেল। তিনি পেসেন্টকে ডেকে পাঠালেন। এবার আর একমিনিট নয়, পুরো আধঘন্টা ধরে সারা অঙ্গ টিপেটুপে দেখলেন, অসুখ সংক্রান্ত নানা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। পরে যত্ন করে প্রেসক্রিপশন লিখে ছেড়ে দিলেন। রোগী বাড়ি ফিরে এসে দেখে আগের এবং পরের দুটো প্রেসক্রিপশনই হুবহু এক।

শ্রুতি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে উঠল।

জয়তিলক বলল, চাইলে আমি দু'ঘণ্টা ধরে মুসাবিদা করে তোমার জন্যে একটা সার্টিফিকেট লিখে দিতে পারি।

শ্রুতি মুখের আঁচল না সরিয়ে মাথা নেড়ে জানাল, এমন সার্টিফিকেট তার চাইনা।

পরে মুখের কাপড় সরিয়ে বলল, ডাক্তার রায়ের সে প্রেসক্রিপশনে কাজ হয়েছিল?

জয়তিলক বলল, শুনেছি পাঁচসিকের ওষুধে ভদ্রলোকের রোগমুক্তি ঘটেছিল। তবে আমার সার্টিফিকেটে কাজ হবে কিনা বলতে পারিনা। আমি তো আর ডাক্তার রায়ের মত ধন্বন্তরী নই।

শ্রুতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সার্টিফিকেটটা দরকারে নেওয়া যাবে, আজ চলি, অনেক রাত হল।

জয়তিলক বলল, চল, খানিক পথ এগিয়ে দি।

শ্রুতি বলল, আমি একাই চলে যেতে পারব, দারুণ চাঁদের আলো বাইরে। আর তাছাড়া বাহাদুর নেই, ঘর ফেলে যাবেন কি করে?

জয়তিলক বলল, দশমিনিটে ডাকাতি একটা হয় তো হোক্, তাতে লাভ ছাড়া লোকসান নেই।

কি রকম?

বিনি পয়সায় গ্রীন ভ্যালি টি গার্ডেনের প্রচারটা খবরের কাগজে হয়ে যাবে। যা সবরেট আজকালকার বিজ্ঞাপনের! বোয়ালের হাঁ নয়, একেবারে ব্লু হোয়েলের হাঁ।

ওরা দুজনে পাশাপাশি হাঁটছিল। পাইনবনের ভেতর দিয়ে পাথর আর নুড়ি বাঁধান পথ। পথটা ক্রমেই ওপরে উঠছিল। এটা সরকারী গাড়ি চলাচলের পথ নয়। স্থানীয় বাসিন্দা আর গ্রীন ভ্যালি টি-গার্ডেনের যৌথ প্রচেষ্টায় তৈরী পথ। পাইন বনের প্রায় শেষ সীমায় গ্রীন ভ্যালি টি-গার্ডেনের আউট হাউস। আগে ওটা অতিথি অভ্যাগতদের গেস্ট হাউস হিসেবেই ব্যবহার করা হত। এখন বছর খানেক ওটা ব্যবহার করছেন, রাধামোহন মিত্র মহাশয়। বাতে প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তবু স্ত্রীর স্মৃতি বিজড়িত দেশের মাটি ছেড়ে আসতে তাঁর প্রাণ চায়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মানতে হল ছেলের কাছে। জয়তিলক দেশে ফিরে গিয়ে বলল, এ অবস্থায় আপনাকে একা ফেলে থাকতে পারি না। হয় আপনাকে এখানকার মায়া ছেড়ে আমার সঙ্গে যেতে হবে, নয়তো আমাকে সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে এখানে এসে থাকতে হবে।

রাধামোহন বললেন, বেশ, আমিই না হয় যাব তোমার সঙ্গে, কিন্তু তুমি তো জান আমার জীবনযাপনের ধারা। সঙ্গে যাবে মহাপুরুষদের একরাশ বাঁধান ছবি। আমার ঘরের চারদিকের দেয়ালে ছবিগুলো টাঙানো থাকবে। আমি বিছানায় শুয়ে তাঁদের দেখব। এতে তোমার অসুবিধা হবে না জানি, কিন্তু বৌমার হতে পারে। তিনি অন্যভাবে মানুষ হয়েছেন। আর তা ছাড়া ঐ টি-এস্টেট যখন তাঁরই, তখন ঐ বাংলোতে তাঁর কথাই চূড়ান্ত হবে, এটাই স্বাভাবিক।

জয়তিলক বলল, আপনাকে অসম্মানের ভেতর টানবোনা বাবা। আমি সব ব্যবস্থা পাকা করে এসেছি। আপনি থাকবেন আউট হাউসে। মূল বাংলোর সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ থাকবে না। আপনার জন্য কাজের লোক আর নার্স থাকবে। একটি ভাল নার্সের জন্য কলকাতার এক ডাক্তার বন্ধুকে আমি বলে রেখেছি।

রাজী হলেন রাধামোহন। নার্সের ব্যাপারে জয়তিলকের কথা মানতে রাজী হল না তার স্ত্রী বাসবী। সে বলল, আমরা যখন গুনে গুনে একগোছা করে নোট দেব তখন ডেইলি পেপারে বিজ্ঞাপন দিয়ে নার্স বাছাই করে নেওয়াই ভাল।

জয়তিলক এ ব্যাপারে স্ত্রীকে ঘাঁটাতে চাইল না। একে অশক্ত বাবা আসছেন ছেলের বউ-এর জমিদারিতে, তার ওপর প্রথমেই যদি সামান্য একটা নার্স নিয়ে তুলকালাম হয়ে যায় তাহলে ভবিষ্যতে শুভ হবার সম্ভাবনা কম। তার চেয়ে শ্বশুরের সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে নিজের থেকে যখন কথা তুলেছে বাসবী তখন নার্সের ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

কিন্তু পত্রিকায় বিজ্ঞাপন চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এল কলকাতা থেকে ডাক্তার বন্ধুটির চিঠি। সে শ্রুতি সমাদ্দার নামের একটি নার্সের কথা লিখে পাঠিয়েছে। জানতে চেয়েছে তাকে কবে এবং কেমন করে পাঠাবে।

জয়তিলক বন্ধুকে সব ঘটনাই খুলে লিখল। শেষে লিখল, শ্রুতি সমাদ্দারকে পত্রিকার বক্স নাম্বারে দরখাস্ত করতে বল। যতগুলো পার সার্টিফিকেট জোগাড় করে দিও। শুধু সমাদ্দারকে বলে দিও সে যে তোমার লোক তা যেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবার পরেও প্রকাশ না করে।

এই সামান্য কৌশলেই কাজ হল। দরখাস্তগুলো নির্বাচনের দিন বাসবী আর জয়তিলক পাশাপাশি বসেছিল। ইচ্ছে করেই একটা সাধারণ মানের দরখাস্ত তুলে নিয়ে জয়তিলক বলল, এতেই চলে যাবে, অতশত বাছাবাছির দরকার কি। আমরা তো আর হাসপাতাল চালাতে যাচ্ছি না।

বাসবী সে কথাটা শুনেই ফোঁস করে উঠবে তা জানত জয়তিলক। ওর মন্তব্য শুনে হাত থেকে দরখাস্তখানা টেনে নিয়ে চোখ বুলিয়ে বলল, আনকোরা নতুন, কোন অভিজ্ঞতাই নেই। একই টাকা যখন দিচ্ছি তখন সব থেকে যোগ্যকে বেছে নেওয়াই ভাল।

জয়তিলকের ডাক্তার বন্ধুটি চেষ্টার কোন ত্রুটিই রাখেনি। সোনার গয়নায় মুড়ে দেবার মত করে অজস্র সার্টিফিকেটের মালায় সাজিয়ে দিয়েছিল শ্রুতি সমাদ্দারের দরখাস্তখানা।

বাসবী জয়তিলকের চোখের ওপর শ্রুতির দরখাস্তখানা তুলে ধরে বলল, একবার চোখ মেলে দেখ, যোগ্যতা কাকে বলে।

জয়তিলকের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। সে মুখখানা গম্ভীর করে ছোট্ট একটি মন্তব্য করল, টিকলে হয়।

বাসবী জেদের সঙ্গে বলল, কালই একে চিঠি দিয়ে দাও। টেঁকে কি না টেঁকে আমি দেখব'খন।

ঘরের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে যেতে যেতে বাসবী হঠাৎ ফিরে বলল, যে দরখাস্তখানা বেছে বেছে হাতে তুলে নিয়ে রেকমেণ্ড করছিলে, তোমার ডাক্তার বন্ধুর পাঠানো নয়তো। যদি হয়, ওকে একটা রিগ্রেট জানিয়ে চিঠি দিয়ে দিও।

জয়তিলক হেসে বলল, ওকে বাতিল করে তুমি খুশি হয়েছ জানলেই আমি খুশি।

ঘটনাটা প্রায় বছরখানেক হতে চলল। শ্রুতি সব কারচুপির খবর রাখলেও জয়তিলকের কাছে পর্যন্ত এসব ব্যাপার নিয়ে কোন আলোচনাই তোলেনি। তবে পরস্পর জানত পরস্পরের যোগসূত্রের কথা। আর ডাক্তার বন্ধুর সুবাদেই জয়তিলক প্রথম থেকে নাম ধরে ডাকতে শুরু করেছিল শ্রুতিকে।

বাসবীর সঙ্গে নার্স শ্রুতি সমাদ্দারের যোগসূত্র ছিল বড় ক্ষীণ। বাসবী মিত্র সারাক্ষণ তার ক্লাব আর বন্ধু আর গাড়ি নিয়ে থাকত, সামান্য নার্সের ওপর নজর দেবার সময় কোথা। কালেভদ্রে পথের ধারে গাড়ির রাস্তায় চোখাচোখি হলে শ্রুতি হাত তুলে নমস্কার জানাত। চলতি গাড়ির গতি একটুখানি থামিয়ে মুখখানা ঈষৎ কাৎ করে বাসবী বলত, কাজকর্ম চলছে তো ভাল?

শ্রুতি মাথা নেড়ে জবাব দেবার আগেই ফুল স্পীডে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চলে যেত বাসবী মিত্র। একজন নার্সের সঙ্গে এর বেশি কথা বলা কিংবা সময় দেওয়া সাজেনা।

দশ মিনিটের পথ ওরা পাশাপাশি হাঁটছিল। পথের ওপর পাইন গাছের ছায়া পড়েছে। পূর্ণিমার উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় পথের ওপর লুটিয়ে পড়া ছায়াগুলোকে অনেক গাঢ় বলে মনে হচ্ছিল। বনের পথ একেবারে জনহীন তবে নিঃশব্দ নয়।

পাহাড়ী ঝিঁঝিঁগুলো ঝম্ ঝম্ ঝক্ ঝক্ শব্দ করছিল একটানা। গাছের ফাঁকে ফাঁকে নীচের পাহাড় আর উপত্যকা এলাকার বস্তিগুলোর আলো জোনাকীর মত ঝিক্‌মিক্ করছিল। রাতের বাতাসে স্নিগ্ধ শীতল একটা আমেজ।

জয়তিলক বলল, কোন কষ্ট হচ্ছে না তো তোমার?

শ্রুতি বলল, কিসের কষ্ট ?

জয়তিলক কষ্ট কথাটার অর্থ ব্যাখ্যা করতে না পেরে চুপ করে রইল।

এখন দুজনেই চলার গতি অনেক কমিয়ে এনেছে, কারণ পথ ফুরোতে আর বেশি বাকী নেই।

এবার জয়তিলককে চুপ করে থাকতে দেখে কথা বলল শ্রুতি, জানেন, এখানে এসে আমি আমার পাওনার অতিরিক্ত অনেককিছুই পাচ্ছি।

কি রকম?

টাকার অঙ্ক আমাকে এখানে টেনেছিল। এখন দেখছি টাকাটা একেবারেই গৌণ। আমার সামনে বিরাট এক সোনার খনির পথ খোলা।

তোমার হেঁয়ালিটা ঠিক ধরতে পারলামনা শ্রুতি।

ধরা উচিত ছিল আপনার। মানুষ বোধহয় নিজের হাতের কাছের সম্পদগুলো দেখতে পায়না।

বাবার কথা বলছ?

দেরীতে হলেও বুঝেছেন দেখে আনন্দ পেলাম। সত্যি এমন মানুষের কাছে থাকতে পারব একথা স্বপ্নেও ভাবিনি।

আমার বাবা আদর্শবাদী হেডমাস্টার ছিলেন শ্রুতি।

সে কথা আমার জানা হয়ে গেছে।

জয়তিলক যেন আপনমনেই বলে উঠল, আমি কিন্তু তাঁর চরিত্রের কাণাকড়িও উত্তরাধিকার সূত্রে পাইনি।

আপনিও তো কলকাতার কলেজে অধ্যাপনা করেছেন কিছুকাল।

বাবার উত্তরাধিকারীর ওটুকু কোন পাওয়াই নয় শ্রুতি।

শ্রুতি বলল, নিজেকে এতখানি গুণহীন ভাবছেন কেন। আপনারও তো গুণগ্রাহী থাকতে পারে।

যে আমার গুণগ্রাহী সে কোনদিন আমার বাবার চরিত্রের সান্নিধ্যে আসেনি। তাহলে যথার্থ গুণী চিনতে তার অসুবিধে হত না।

কথা বলতে বলতে ওদের পথ ফুরিয়ে গেল। জয়তিলক গলা নামিয়ে বলল, বাবা হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছেন, আমি আর ঘরের ভেতর যাব না। তুমি রুকমীকে ডেকে ঢুকে পড়।

জয়তিলক ফিরল। শ্রুতি ঘরে ঢুকতেই রাধামোহন বললেন, জয়ের গলা পেলাম যেন?

আপনি হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন ভেবে উনি চলে যাচ্ছেন।

ওকে একবার ডাক তো মা।

শ্রুতি দৌড়ে নেমে গেল বনের পথে। বেশীদুর যেতে হলনা, জয়তিলকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

বিস্মিত জয়তিলক বলল, কি ব্যাপার? ফিরে এলে যে?

অনুমান করুন।

দরকারী কোন জিনিস বাংলোতে ফেলে এসেছ বুঝি?

যদি বলি, আপনাকে খানিক পথ এগিয়ে দেবার জন্য আবার ফিরে এলাম।

জয়তিলক মুখে হাসির রেখা টেনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, কোন কথা বলল না।

আপনাকে বাবা ডাকছেন।

উনি জেগে আছেন? চল যাই।

জয়তিলক বাবার পায়ের কাছে মোড়ায় বসতেই রাধামোহন বললেন, মায়ের ছবিতে আবীর দিয়ে আজ প্রণাম করেছ?

হ্যাঁ, বাবা। আপনাকে যখন প্রণাম করতে এসেছিলাম তখনই মায়ের ছবিতে আবীর দিয়ে প্রণাম করে গেছি।

আবার প্রশ্ন করলেন রাধামোহন, শ্রুতির তৈরী রাধাবল্লভী খেয়েছ?

শ্রুতির দিকে একচোখ টিপে তাকিয়ে বলল, খেয়েছি।

কেমন লাগল বললে না তো?

বেশ ভাল, তবে মায়ের হাতের তৈরী খাবারের মত কিনা বলা শক্ত।

উত্তেজিত হলেন রাধামোহন, ও এখনও ছেলেমানুষ জয়। তোমার মায়ের হাতে পড়লে ও এতদিনে পাকা রাঁধুনি হয়ে যেত। বড় ভাল তৈরী করেছে ও।

জয়তিলক কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, আজ আপনি অনেক রাত অব্দি জেগে আছেন বাবা।

ঘুম আসছে না খোকা। দোল পূর্ণিমার রাতে আমার চোখে ঘুম আসে না।

জয়তিলক আর শ্রুতির বুঝতে বাকি রইল না যে এই দোলের রাত্রিতে রাধামোহন স্মৃতি-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন।

জয়তিলক বলল, বাবা, দোলের দিনে দাশুকাকা কীর্তন গাইতেন। মা বড় ভালবাসতেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাধামোহন। হঠাৎ সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন, আজ আমিও গান শুনেছি খোকা, কীর্তন নয়, রবিঠাকুরের পূজার গান। বুক ভরে গেছে।

জয়তিলক ভাবল, আজ রেডিওতে রবীন্দ্রনাথের গানের নিশ্চয় কোন স্পেশাল প্রোগাম ছিল, বাবা তাই শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। হাতের সামনেই থাকে বাবার রেডিওখানা।

ঘর থেকে উঠে অন্য ঘরে চলে যাচ্ছিল শ্রুতি, রাধামোহন ডেকে বললেন, কোথায় যাচ্ছ শ্রুতি, গান গাইতে পারাটা কোন সংকোচের ব্যাপার নয়। যে পারে সে ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়েই জন্মেছে।

জয়তিলক রসিকতা করে বলল, শ্রুতির এই সংগীত বিদ্যার উল্লেখ ভাগ্যিস ওর দরখাস্তে ছিল না, নইলে টাকার অঙ্কটা আরও অনেকখানি বেড়ে যেত।

রাধামোহন বললেন, সংগীত কখনো দাম দিয়ে কেনা যায়না খোকা। ও বড়লোকের বাড়ির পাখি

নয় যে যা খুশি দাম দিয়ে কিনে রূপোর খাঁচায় সাজিয়ে রাখা যায়। ও হল বনের পাখি, সবুজ পাতার আড়ালে বসে আপন মনে সুর সাধে। মনের তাগিদে যে বনে যায়, সে-ই কেবল শুনতে পায় তার গান।

রাধামোহন চিরদিনই রবীন্দ্র ভাবনায় জারিত, তাই তিনি মাঝে মাঝে কাব্যিক উপমা দিয়ে কথা বলতে ভালবাসেন।

একটু থেমে আবার বললেন, শ্রুতি মেয়েটা কাছে না এলে বোধহয় জীবনের শেষ সাধটা অপূর্ণ থেকে যেত।

দূরে চার্চের ঘড়িতে বারোটা বাজল। শ্রুতি বলল, আপনার বোধহয় আর বেশীক্ষণ এখানে অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। মিসেস মিত্র ফিরে এসে ঘরে ঢুকতে পারবেন না। বড্ড অসুবিধেয় পড়বেন।

জয়তিলক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ঠিক বলেছ। বাহাদুর নেই আর চাবি তো আমার কাছে।

রাধামোহন ছেলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। জয়তিলক বেরিয়ে গেল। শ্রুতি সঙ্গে সঙ্গে গেট বন্ধ করতে আসতেই চাপা গলায় জয়তিলক বলল, খুব যে বাবাকে গান শোনান হচ্ছে। আমরা বুঝি বেরসিক।

শ্রুতি হেসে বলল, গ্রীন ভ্যালি টি-গার্ডেনের মালিককে গান শোনান তো রীতিমত সৌভাগ্যের ব্যাপার।

জয়তিলক শ্রুতির ভুলটা শুধরে দিয়ে বলল, মালিক শুনতে চাইলে সেটা তোমার সৌভাগ্যের ব্যাপার হত কিনা জানিনা, তবে এই দীন কর্মচারী শ্রুতিদেবীর গান শুনলে নিশ্চয়ই নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করবে।

আচ্ছা, যেদিন শুনতে চাইবেন শোনাব, —বলেই মিষ্টি করে হাসল শ্রুতি। জয়তিলক দ্রুত পা চালিয়ে বনের রহস্যময় পথ ধরে চলতে চলতে ভাবল, যে শ্রুতিকে এই একটি বছর ধরে সে জেনে এসেছে, এ সে শ্রুতি নয়। দিনের আলোয় এই বন যত স্পষ্টই হোক, সে তার রহস্যের গোপন দরজাটি কখনো খুলে দেয়না। তাকে যথার্থ করে জানতে হলে আসতে হবে এই রহস্য ভরা রাত্রির নির্জন নিরালায়।

বাংলোতে পৌঁছে জয়তিলক দেখল, শূন্য বাড়িখানা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লনের মাঝখানে নিঃসঙ্গ পাইনগাছটা জ্যোৎস্নার নির্মল জলে স্নান করে নিজেকে শুদ্ধ করছে।

নিস্তব্ধ রাতে যেন একটা ভোমরা ঢুকে পড়েছে ঘরে। চাঁদের আলোয় ঘুমুতে পারেনি, তাই উড়ে এসেছিল বাংলোর বাগানে ফুলের মধু খেতে, শেষে হঠাৎ হাওয়ার তাড়ায় জানালার ফাঁকে ঢুকে পড়েছে ঘরের ভেতর। বেরুবার পথ খুঁজে পাচ্ছেনা, তাই শব্দ করে উড়ে বেড়াচ্ছে ঘরের চারদিকে।

আচ্ছন্ন তন্দ্রার ঘোরটা কেটে যাচ্ছে জয়তিলকের। দূরে কাছে ভোমরার আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে। কখনো সামনে কানের কাছে কখনো দূরে একেবারে বাংলোর বাইরে।

জয়তিলক বিছানার ওপর উঠে বসল। এখন আর তার ভুল হচ্ছে না। সে জানালার বাইরে চোখ ফেলল। একখানা গাড়ি হেড লাইট জ্বেলে এগিয়ে আসছে। কখনো পাহাড়ী বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আবার কখনো জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠছে তার দুটো চোখ। সামনে এলে শোনা যাচ্ছে তার গোঁঙানি আবার আড়াল হলে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে আওয়াজ।

জানালার ধারে উঠে এসে দাঁড়াল জয়তিলক। বাসবী ফিরে আসছে। টেবিলের ওপর থেকে হাত ঘড়িটা তুলে নিয়ে দেখল, দুটো বেজে পাঁচ।

গাড়িটা এখন তাদেরই বাংলোর পাহাড় এলাকায় ঢুকে পড়েছে। গোঙানিটা বড় বেশি করে বাজছে।

জয়তিলক দরজা খুলে বাইরের আলোটা জ্বালিয়ে দিল। গাড়িটা ঘুরে গ্যারেজের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নেমে এল বাসবী। জুতোর খুট্ খুট্ শব্দটা এগিয়ে এল বারান্দায় সামনে। বাসবী এখন জয়তিলকের মুখোমুখি।

এবারও তুমি বাহাদুরকে ছুটি দিয়েছ জয়!

ভুলে যাচ্ছ কেন সেও একটা মানুষ বাসবী। সারাদিন তোমাদের গেটের সামনে স্ট্যাচু হয়ে বসে থাকলেও তার মন বলে একটা বস্তু আছে। সেও ছুটি চায়।

বাসবী দৃঢ় গলায় বলল, তার ছুটির বরাদ্দ নির্দিষ্ট আছে। সেখান থেকে তো আমরা কেড়ে নিই না।

মনে মনে হাসল জয়তিলক। মুখে বলল, হঠাৎ পাওয়া ছুটির একটা আলাদা আনন্দ আছে বাসবী। দোলের দিনে তোমরা আনন্দ করতে বেরুলে তারও আনন্দ করার অধিকার আছে।

তীক্ষ্ণ গলায় বলল বাসবী, বাহাদুরের সঙ্গে তুমি আমার তুলনা করছ!

তুলনা নয় বাসবী, আমি আনন্দে সবার অধিকারের কথাই বলছি।

এবার বাসবীর গলায় বাঁকা সুর, বাহাদুরকে কর্তব্য করতে হবে না?

সে তো সারাক্ষণই করছে।

তুমিও তো সারাদিন তোমার কর্তব্য করছ, তবে আজ কেন তোমার বাবার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে আমাদের ক্লাবের পিকনিকে যোগ দিলে না? তোমার কর্তব্য যদি প্রবল হয় তাহলে বাহাদুরেরই বা হবে না কেন?

বাসবীর যুক্তির কাছে জয়তিলক হার মানতে বাধ্য হল। গতরাত্রে বাসবী তাকে ক্লাবের পিকনিকে যাবার কথা বলেছিল। সে বাবার অসুস্থতার দোহাই দিয়ে এড়িয়ে গেছে। আসলে তার যাবার ইচ্ছাই ছিল না। এখানে আসার দ্বিতীয় বছরে সে দোলের দিনে পিকনিক পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। জলঢাকার কাছে হয়েছিল প্ল্যানটার্স অ্যাসোসিয়েশনের পিকনিক। সারাদিন অশান্ত অসংযত হুল্লোড়ে তার সংস্কৃত মন বিষিয়ে উঠেছিল। নারী আর পুরুষের এমন বে-আব্রু উচ্ছৃলতা সে আর কোনদিন দেখেনি।

ফিরে আসার সময় কেমন যেন সে আড়ষ্ট হয়ে বসেছিল। গাড়ি ড্রাইভ করছিল বাসবী। আকণ্ঠ ড্রিংক করেও পাহাড়ী বাঁকগুলো সে অবলীলায় পেরিয়ে আসছিল। অনেক অনুরোধ আর বাঁকা কৌতুক সত্ত্বেও জয়তিলককে কেউ মদ স্পর্শ করাতে পারেনি। সে সারাক্ষণ অবাক হয়ে দেখে যাচ্ছিল বাসবীর অনায়াস পানলীলা। পুরুষ বন্ধুদের গাড়িতে হৈ হৈ করে হঠাৎ কোনকিছু আনার নাম করে হারিয়ে যাওয়া।

জয়তিলকের সেদিন মনে হয়েছিল, সে যেন একান্ত গোপনীয় একটা অনুষ্ঠানে ট্রেস পাস করেছে।

গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ একটা বাঁকের মুখে ব্রেক করে গাড়ি দাঁড় করাল বাসবী। একটা উদ্দাম ঝোরা ওপরের পাহাড় থেকে লাফাতে লাফাতে ছোট্ট সাঁকোর তলা দিয়ে নীচের উপত্যকার দিকে ছুটে চলে গেছে। বাসবী বলল, নেমে এস, এখানে একটু দাঁড়াই।

জয়তিলক নামল। একটা চম্বক গাছে শ্বেতপদ্মের মত নিটোল সাদা সাদা ফুল ফুটে আছে। ফিনকি দেওয়া জ্যোৎস্নার সঙ্গে সাদা ফুলগুলো যেন প্রতিযোগিতায় মেতেছে। জায়গাটা ভারী সুন্দর।

বাসবী জয়তিলকের দিকে ফিরে বলল, জয় এ জায়গাটা তোমার ভাল লাগছে না?

খুব সুন্দর বাসবী। ঠিক যেন নির্জন একটা স্বপ্নলোক। ঐ ঝর্ণার ছুটে চলা, চম্বক গাছটার ফুল ফোটানো, ঐ রহস্য ঘেরা জ্যোৎস্নার জলে ভরা উপত্যকা, সবকিছু আশ্চর্য এক আকর্ষণে মনকে টানে।

এস বসা যাক্।

জয়তিলক বাসবীকে অনুসরণ করে ঝর্ণার ধারে একখণ্ড পাথরের চাঁই-এর ওপর বসল।

কয়েকটা মুহূর্ত নীরবতার ভেতর পার হয়ে গেল। একসময় বাসবী বলল, এই দুরন্ত ঝর্ণাটাকে কেমন লাগছে জয়?

আমি অবাক হয়ে দেখছি ওর প্রাণশক্তি। কতযুগ ধরে ও তরুণী একটি মেয়ের মত বিপুল উচ্ছ্বাসে ছুটে চলেছে।

বাসবী বলল, তবে মানুষের জীবনে এই প্রাণের উচ্ছ্বাসকে তুমি মেনে নিতে পারনা কেন জয়?

আজ সারাদিন তুমি আমাদের মাঝখানে থেকেও নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলে। এই ঝর্ণাটার মত অবিরাম আনন্দের আবেগে ছুটে চলতে পারলে না কেন?

জয়তিলক বলল, বিশ্বপ্রকৃতিতে যা সম্ভব, মানুষের প্রকৃতিতে সবসময় তা সম্ভব নয় বাসবী। এই ঝর্ণা কত যুগ আগে থেকে তার ছুটে চলা শুরু করেছে, আরও কতযুগ সে এমনি উচ্ছ্বাসে ছুটে চলবে, কিন্তু মানুষ তার জীবনের কতটুকু কাল এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারবে?

জীবনের সবটুকু সময় সে ছুটে চলতে পারবেনা বলেই তো যৌবনের অল্প সময়টুকুকে সে অপচয় করতে পারে না। তাই পাগলের মত সে তার যৌবনকে ভোগ করতে চায়।

জয়তিলক বলল, তোমার কথা মানছি, কিন্তু তাহলেও একটা কথা থেকে যায়; বিশ্বপ্রকৃতির বাঁধনছাড়া ঝড়ঝঞ্ঝায়, বিধ্বংসী বন্যায় যে ভয়ঙ্কর সুন্দরের একটা রূপ আছে, মানুষের সমাজ-ভাঙা উদ্দাম ব্যভিচারে তা নেই। তার শ্রী সংযমে।

বাসবী বলল, এই মুহূর্তে কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। তোমার আর আমার জীবনের ফিলজফিই আলাদা।

মানছি বাসবী।

তাহলে এস, আজ থেকে আমরা নিজেদের পথে খুশি মত চলি। আমাদের পরস্পরের ভেতর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক থাকবে, কিন্তু এমন কোন বাঁধন থাকবে না যাতে করে স্বাধীনভাবে চলতে গেলে টান পড়ে।

বেশ তাই হবে। তবে বাসবী, চেষ্টা কর পরস্পরকে বুঝতে, হয়ত তাতে অনেক অশান্তি, ক্লান্তি আর গ্লানির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

বাসবী সেদিন আর কোন কথা বলেনি। সে উঠে এসে স্টিয়ারিং ধরে বসেছিল। জয়তিলক গাড়িতে উঠলে সে একটি কথাও না বলে দারুণ স্পীডে শেষ পথটুকু গাড়িটাকে চালিয়ে এনেছিল।

জয়তিলক বুঝেছিল, গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিয়ে বাসবী তার মতটাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে।

সেদিনের পর অনেক ঘটনা ঘটে গেছে ওদের জীবনে। কিন্তু দুজনে দুজনকে সহ্য করে গেছে। ইচ্ছা করেই বিচ্ছিন্ন হয়নি।

আজ বাসবীর কথায় সামান্য প্রতিবাদ করলেও জয়তিলক আর কথা বাড়িয়ে পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলল না। সে নিজে গিয়ে গ্যারেজের কোলাপসিব্‌ল গেটটা টেনে খুলে দিলে। বাসবী হেডলাইট জ্বেলে সগর্জনে গাড়িখানাকে গ্যারেজে ঢুকিয়ে বেরিয়ে এল।

দুজনে পাশাপাশি শুয়ে আছে। একটা হাল্‌কা পিঙ্ক রঙের নাইটি পরে শুয়ে আছে বাসবী। এইমাত্র রেশমের মত চুলগুলোকে শ্যাম্পু করে হেয়ার ড্রায়ারে শুকিয়ে নিয়ে চিরুনী চালিয়ে এসেছে। যখন ও সাদা লেসের ফ্রিল দেওয়া পিঙ্ক নাইটিখানা পরে কোমল এক টুকরো আলোয় ঘাড় কাৎ করে আয়নার সামনে চিরুণী চালাচ্ছিল তখন বিছানায় শুয়ে আড়চোখে ওকে দেখছিল জয়তিলক। একটা পিঙ্ক তাজা গ্ল্যাডিওলার স্টিকের মত মনে হচ্ছিল ওকে। সারাদিনের দস্যুতার কোন চিহ্ন ছিলনা ওর মুখে। একটি তরুণী যেন তার সমস্ত তারুণ্যের লাবণ্য নিয়ে ফুটে আছে।

এখন দুজনেই নিঃশব্দে শুয়ে আছে পাশাপাশি। দক্ষিণের খোলা জানালার হাওয়া বাসবীর চুল থেকে শ্যাম্পুর মিষ্টি গন্ধটুকু লুটে নিয়ে বিলিয়ে দিচ্ছিল সারা বিছানায়। জয়তিলকের নিঃশ্বাসে সেই পরিচিত গন্ধটুকু প্রবেশ করছিল। একটা প্রতিকারহীন করুণ বেদনা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল ধীরে ধীরে। কতদিন সে তার বলিষ্ঠ বুকের ভেতর টেনে নিয়েছে বাসবীকে। আদরে আশ্লেষে ভরে দিতে চেয়েছে আর একখানা কোমল বুক। কিন্তু বাধা না পেলেও এমন উত্তাপ পায়নি যা একটি পুরুষের কামনাকে উদ্দীপ্ত করে তার দেহে মনে পরিপূর্ণ তৃপ্তি এনে দিতে পারে। কামনার ব্যাপারে বাসবী যে শীতল নয় সে প্রমাণ তো পেয়েছে জয়তিলক। বন্ধু সমাগমে তার অফুরন্ত উচ্ছ্বাস, চোখের ভাষায় আমন্ত্রণের স্ফুলিঙ্গ, এ সব কিছু তার অদেখা নয়। তাছাড়া বিয়ের প্রথম কয়েকটি দিন যখন তারা

পালিয়ে গিয়েছিল নির্জন এক সমুদ্র সৈকতে তখন বাসবী ছিল তার সামনের সমুদ্রের মত আবেগের তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত। দর্বার আক্ষেপে তখন সে কি বারবার ভেঙে পড়েনি তার বুকের ওপর।

ওরা জুনপুটের ফিসারী আর ঝাউবন পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে আরও পশ্চিমে। নুলিয়াদের অর্ধ উলঙ্গ ছেলেমেয়েগুলো ওদের দিকে অবাক চোখে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। বাসবীকে হয়ত ওরা মনে করেছে সমুদ্র থেকে উঠে আসা কোন জলপরী। হাওয়ায় উড়ছে ওর চুল। বালিতে ম্যাক্সির প্রান্ত লুটিয়ে ও ছুটছে ঝাঁক ঝাঁক উড়ন্ত সী-গাল এর পেছনে। কাৎ হয়ে পড়ে আছে কালো কালো নৌকো। তার পেছনে লুকোচ্ছে ও। এই সামান্য খেলা, কিন্তু কি অসামান্য প্রাণের জোয়ার ছিল সেদিন। আর আজ! অফুরন্ত একটা প্রাণ যেন হঠাৎ কিসের ছোঁয়ায় পাষাণ হয়ে গেছে। অবিকল সেই দেহ-সুষমা, তবু ভাস্করের হাতে তৈরী মূর্তি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু সে মূর্তিও জাগে। নির্জন পাষাণপুরীতে হঠাৎ যখন প্রার্থিত পুরুষ এসে ছোঁয়া দেয় তখন পাষাণ মূর্তি প্রাণ পায়। নিভৃতে নির্জনে লীলা রঙ্গে মাতে।

বুকখানাতে মোচড় দিয়ে উঠল জয়তিলকের। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা গ্রীষ্মের বিদীর্ণ মৃত্তিকার বুক ঠেলে বেরিয়ে আসা উত্তপ্ত নিশ্বাসের মত তাকে পীড়িত, দগ্ধ করতে লাগল।

তিন বছর বিবাহিত জীবনেও সন্তান ধারণের কোন ইচ্ছা জাগেনি বাসবীর। আধুনিক ভেষজশাস্ত্রের উপাদানগুলিকে সে অঙ্কের হিসেবে দেহজাত করেছে। ধীরে ধীরে তার ভেতর গড়ে উঠেছে এক প্রতিরোধের দুর্গ। সেখানে স্বার্থপর দৈত্যের মত কঠিন এক নিষেধের সাইনবোর্ড টাঙান, এখানে শিশুরা প্রবেশের চেষ্টা করলে শাস্তি পেতে হবে।

জয়তিলক মাঝে মাঝে বলেছে, তুমি দিনে দিনে সত্যিকারের সেলফিশ জায়েন্ট হয়ে উঠছ। তোমার দেহের এমন সুন্দর একটি বাগানে শুধু নিষেধের বেড়া। কোন দেবশিশুর আমন্ত্রণ নেই সেখানে।

বাসবী বলেছে, ওসব বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গল্পকারের কলমে মানায়। আমার ফিলজফি হল, যৌবন যেহেতু ক্ষণস্থায়ী, তাকে যত ভাবে পারি ভোগ করে যাব। ফুল থেকে ফলের পরিণতি ইউনিভার্সাল ট্রুথ হলেও আমি ফুলের ভেতরেই তার লীলার শেষ পরিণতি দেখতে চাই। জয়, ফুল যখন ফলে রূপান্তরিত হয়ে যায় তখন সে আর ফুল থাকে না। না থাকে রঙ আর না থাকে তার গন্ধ। আমার মনে হয় সেটা ফুলের মৃত্যু। সেই রূপহীন, নামহীন মৃত্যুকে আমি কোন রকমেই মেনে নিতে পারব না।

জয়তিলকের স্বভাবের কোথাও নিজের মতকে জোর করে অন্যের ওপর চাপানোর চেষ্টা ছিল না। তাই তার ক্ষীণ প্রতিবাদ বেশিদূর গড়াত না।

কিন্তু কেন এমন হল। জয়তিলকের জীবন চলছিল সহজ ছকে বাঁধা পথের ওপর দিয়ে, হঠাৎ এমন করে মরুভূমির ভেতর সে পথ হারাল কেন? বাবা আদর্শবাদী মানুষ। মহাপুরুষদের ভেতর তিনি জীবনের সত্য চিরদিনই খুঁজে বেড়িয়েছেন, আর তাঁর উপলব্ধ সত্যগুলোকে ছাত্র আর একমাত্র পুত্রের মাঝে বিতরণ করেছেন। ছেলেবেলা থেকেই জয়তিলক আদর্শবাদী। গোপনীয়তা, ছলনা, প্রতারণা, এসব ধর্মের সঙ্গে তার পাঠ্য জীবনে পরিচয় ঘটেনি। স্কুলে পড়ার সময় সে বেশি রাত জেগে পড়াশোনা করতে পারত না। এ নিয়ে বাবার তাড়না তাকে ভোগ করতে হয়নি। কিন্তু এক একদিন তাকে ঘুম থেকে টেনে তোলা হত। বাবা চোখে জল দিয়ে জাগিয়ে আদর করে পাশে বসাতেন। তারপর সেই মুহূর্তে পড়া কোন বই-এর থেকে বিশেষ বিশেষ মূল্যবান অংশ পড়ে শোনাতেন। কোন মহত্ব, কোন ত্যাগের গল্প সে সব। পড়তে পড়তে বাবার গলা আবেগে বুজে আসত। সদ্য ঘুম ভাঙলেও এ ব্যাপারগুলো অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বলে খারাপ লাগত না জয়তিলকের। বাবাকে সে হেডমাস্টার হিসেবে যতখানি ভয় করত, তার চেয়ে ভালবাসত বেশি। অন্যায় দেখলে রাধামোহন আগুনের মত দপ করে জ্বলে উঠতেন, আবার উদারতা দেখাবার বেলা তাঁর হৃদয়খানা বরফের মত গলে জল হয়ে যেত।

জয়তিলক যখন কলেজের ছাত্র তখন মায়ের মৃত্যুর খবর আসে কলকাতায়। কাউকে সেবার সুযোগ না দিয়েই তিনি চলে গেলেন। সেদিনটা জয়তিলকের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। শ্রাবণের

আকাশভাঙা বৃষ্টি। কলকাতার প্রতিটি রাস্তা যেন গঙ্গার এক একটি শাখানদী। আকাশে সূর্য স্বাভাবিক কারণেই অদৃশ্য, যদিও ঘড়ির নিয়মে সূর্যের চিতা রচনার আরও ঘণ্টা দুয়েক বাকি। যেতে হবে জয়তিলককে। মেদিনীপুরের যানবাহনহীন এক গ্রামে তাকে এই দুর্যোগ মাথায় করে পৌঁছতে হবে যে কোন রকমে। সে ট্রেন ধরতে ছুটল না স্টেশানে। ওপথে যেতে গেলে রাত অনেক গভীর হবে। সময়ও লাগবে অনেক বেশি। হাঁটা পথের দূরত্বও হবে অনেকখানি। চলে এল জয়তিলক ডায়মণ্ডহারবারে গঙ্গার ধারে। তখনও অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠেনি। একটি মাঝিকে বহু টাকা কবুল করে রাজি করাল। যখন ওপারে গিয়ে পৌঁছল তখন মেঘের অন্ধকারের সঙ্গে রাতের অন্ধকার ভয়াবহ আকার নিয়েছে। সে রাত্রে যে নৌকাডুবি হয়নি এ জন্যে জয়তিলক আজও সেই অপরিচিত মাঝি ও ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। পিছল পথের ওপর দিয়ে আছাড় খেতে খেতে বিদ্যুতের আলোয় পথ চিনে জয়তিলক যখন গভীর রাতে বাড়ির দরজায় আর্ত গলায় মা বলে ডেকে আঘাত করল তখন বাবা এসে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমার বিদ্যাসাগর এসেছে মাকে শেষ দেখা দেখতে।

মায়ের কাজ মিটে যাবার পর ও কলকাতা ফিরে আসার জন্যে তৈরি হচ্ছিল, বাবা ওকে কাছে ডাকলেন। বললেন, বিদ্যাসাগর শুয়ে আছেন বিছানায়। প্রায় মিশে গেছেন শয্যার সঙ্গে। নিভু নিভু হয়ে আসছে দীপ, কিন্তু চেয়ে আছেন দেয়ালে টাঙান মায়ের ছবিখানির দিকে। চোখে পলক পড়ে না! করুণাময়ী ভগবতী। শেষ নিশ্বাস পড়ল দয়ার সাগরের কেবল মাতৃনাম উচ্চারণ করতে করতে।

কথা কটি বলে রাধামোহন টেবিলের ওপর থেকে বাঁধান একখানা ছবি নিয়ে এলেন। সদ্য পরলোকগত স্ত্রীর ছবি। জয়তিলকের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, সুখে, দুঃখে, বিপদে-সম্পদে এঁকে স্মরণ কর, জীবনে শান্তি পাবে।

জয়তিলক সে ছবি আজও সঙ্গে রেখেছে। অধ্যাপক জীবনের যে কটি দিন সে কলকাতার একটি বিশিষ্ট মেস বাড়িতে ছিল সে দিনগুলিতে তার শিয়রে মায়ের ছবিখানা টাঙান থাকত। প্রতিদিন মায়ের ছবিকে সে প্রণাম করে বেরোত। একটা আশ্চর্য শক্তি সেই মুহূর্তে যেন ভর করত তার ওপর।

বিয়ের পর যখন অধ্যাপনার জীবনে ইতি টেনে তাকে চলে আসতে হল টি-গার্ডেনের এই বাংলোতে তখন সঙ্গে এনেছিল মায়ের ছবিখানা। বাংলোর এই শোবার ঘরেই টাঙিয়ে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু বাধা এল বাসবীর কাছ থেকে। এখন জয়তিলক ধরতে পেরেছে বাসবীর সেদিনের প্রতারণাটুকু। বাসবী রূঢ়ভাবে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করে কৌশল অবলম্বন করেছিল। সে বলেছিল, এ ঘরখানা কেবল তোমার আর আমার ভাবনায় নিশ্ছিদ্র থাক্, এখানে প্রণম্যদের আনার চেষ্টা করনা। ছবি হলেও যার ভেতর আমরা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছি, আমাদের স্বামী-স্ত্রীর গোপন জীবনের দর্শক করে তাদের না রাখাই ভাল।

কথাটা সেদিন মনে ধরেছিল জয়তিলকের। সে আর পীড়াপীড়ি না করে মায়ের ছবিখানা ঢুকিয়ে রেখেছিল সুটকেশের ভেতরে। প্রতিদিন একবার সুটকেশ খুলে সে ছবিখানা বের করে মাথায় ঠেকাত। বাবা এখানে আসার পর যখন আউট হাউসে তাঁর থাকার পাকা বন্দোবস্ত হল তখন সুটকেস থেকে বের করে মায়ের ছবিখানা সে টাঙাল আউট হাউসের ড্রইংরুমের দেয়ালে। বাইরের থেকে ঢুকতে গেলেই যাতে মায়ের ছবিখানা প্রথমেই নজরে আসে।

রাধামোহন ছেলে বউ-এর কাছে আসার পর খুব কম দিনই শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে বাসবী। প্রথম দিকে অবশ্য নিয়মিত কদিন আসা যাওয়া করছিল। রাধামোহন কিছুটা বিগলিতও হয়েছিলেন। এমন কি বাসবীর কোন কোন পরামর্শকে তাঁর সমীচীন বলে মনে হচ্ছিল। দেশে গিয়ে সামান্য ভূসম্পত্তি দেখাশোনা করার সময়াভাব ছিল জয়তিলকের, তাই বাসবীর পরামর্শ মত তিনি সে গুলিকে বেচে দেবার ব্যবস্থা করলেন। আশ্চর্য, বাসবীই তাঁকে পরামর্শ দিল পুরাতন বাড়িখানা ঐ জমি বিক্রির টাকায় মেরামত করে গ্রামের স্কুলকে দান করে দিতে। ওতে ছাত্রীদের একটা বোর্ডিং হাউস হতে পারে। আর ঐ ছাত্রী নিবাসটি হবে বাসবীর শাশুড়ী করুণাময়ীর নামে।

বাসবীর প্রস্তাবে মনে মনে তৃপ্ত ও উৎসাহিত হলেন রাধামোহন। উত্তেজনায় তিনি একাই বিছানা

থেকে উঠে দাঁড়াতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না। জয়তিলকও সেদিন খুশি হয়েছিল বাসবীর পরিকল্পনায়। সে দেশে গিয়ে কয়েকদিন থেকে সব কাজ গুছিয়ে এসেছিল।

কিন্তু ফিরে এসেই শুনল দীঘার সমুদ্রতীরে বাবা অনেকদিন আগে যে লোভনীয় জায়গাটি কিনে রেখেছিলেন তা বধূমাতাকে ইতিমধ্যেই দানপত্র করে দেওয়া হয়েছে।

এতে জয়তিলকের ক্ষোভের কোন কারণই ছিল না। তবে সামান্য বিস্মিত হয়েছিল, তার অবর্তমানে এত দ্রুততার সঙ্গে কাজটি সম্পন্ন হবার জন্য।

আজ অবশ্য জয়তিলকের কাছে সেদিনের ঘটনাটি আর অপাবিষ্কার নেই। সংসারের অনেক কিছুই সে এখন চোখ মেলে দেখতে শিখেছে। এখন দীঘার ঐ জায়গায় উঠেছে 'সী অ্যান্ড সান হোটেল'। আধুনিক, বাতানুকুল। সঙ্গে রয়েছে বার। অবশ্য সে বারেব পরিচালক স্নো ভিউ টি-এস্টেটের মালিক দিগন্ত সোম। বারের জন্য নাকি অনেক মূল্য দিয়ে জায়গাটা দীর্ঘ দিনের লীজ নিয়েছে সোম বাসবীর কাছ থেকে। টাকা আদৌ দিয়েছে কিনা সে হিসেব কোনদিনই সে জানতে চায়নি বাসবীর কাছে। আর জানার প্রবৃত্তিও হয়নি তার।

হোটেল তৈরীর কথাটা জানালেও সংলগ্ন বারেব কথাটা জানান হয়নি রাধামোহনকে। শুনলে আহত হবেন তিনি।

বাসবীর ডাকে দু'একবার গাড়িতে করে দীঘার হোটেলে গেছে জয়তিলক। প্রতিবারই তাদের সঙ্গী হয়েছে দিগন্ত সোম। অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী এই সোম। সমানে গাড়ি ড্রাইভ করে গেছে সে। মাঝে মাঝে তাকে অবশ্য রিলিফ দিয়েছে বাসবী। বেশী সময়ই সামনের সীটে দিগন্তের পাশে বসেছে বাসবী। পেছনের সীটে বিশ্রামেব ফাঁকে চেয়ে দেখেছে জয়তিলক ওদের দিকে। রাতের ক্লান্তি দূর করতে ওরা সমানে ড্রিঙ্ক করে গেছে।

এখন আর জয়তিলক যেতে চায়না ওদিকে। বাসবীও উপযাচক হয়ে ডাক দেয়না। তবে জয়তিলক জানে দিগন্ত সোম প্রতি যাত্রায় বাসবীর সঙ্গী। টি গার্ডেন আর হোটেল দুটোই এখন জমজমাট। হোটেলের দিকে সম্প্রতি নজর পড়েছে বাসবীর, তাই টি-গার্ডেনের দিকটাতে বেশি করে নজর দিতে হচ্ছে জয়তিলককে। এ কাজে তার দক্ষতা খুবই সীমিত কিন্তু টি-গার্ডেনের কুলি-কামিনরা তাকে এমন ভালবাসার বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে যে দুরূহ কাজগুলো অনেক সময় ওদের সহযোগিতায় সহজ হয়ে যাচ্ছে।

এ নিয়ে কথা উঠেছে অ্যাসোসিয়েশনের ক্লাব ঘরেব পানচক্রে। বাসবী সোজাসুজি একদিন জিজ্ঞেস করল জয়তিলককে, শুনছি, তুমি নাকি কুলি-কামিনদের আস্কারা দিচ্ছ খুব। তাই চারদিকে দারুণ সুনাম ছড়াচ্ছে তোমার?

তাই বুঝি?

একটুখানি তিক্ত গলায় বলল বাসবী, এটা কোন রসিকতার ব্যাপার নয় জয়।

জয়তিলক এবার শান্ত অথচ গম্ভীর গলায় বলল, রসিকতা যদি কেউ করে থাকে তাহলে তা তোমার ঐ অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বাররা।

তোমার কানে তাহলে আগেই অ্যাসোসিয়েশনের সমালোচনার খবরটা পৌঁছে গেছে দেখছি।

তুমি কি এতে খুব বিচলিত হয়েছ বাসবী?

না, বিচলিত হবার ব্যাপাব নয়, আমি দারুণরকম ইনসালটেড ফিল করেছি।

আমি দুঃখিত বাসবী, অকারণে তোমাকে এত বড একটা শক পেতে হল।

দারুণ ক্ষোভে ফেটে পড়ল বাসবী, তুমি ঐ কুলিকামিনদের নিয়ে থাকতে পার কিন্তু আমার একটা সোসাইটি আছে। সেখানকার প্রতিটি চালচলন আর হাওয়াব সঙ্গে আমাকে মানিয়ে চলতে হয়।

জয়তিলক কোন রকমেই উত্তেজিত হল না। সে শুধু স্পষ্ট গলায় বলল, যাদের নিয়ে আমার কাজ তারাই তো আমার সমাজ বাসবী।

না, ওটা তোমার সমাজ নয়। তুমি যদি সামান্য একজন সুপারভাইজার কিংবা কেরাণীবাবু হতে তাহলে ওদের সঙ্গে মেলামেশাতে কারুর নজরই পড়ত না। তুমি গ্রীন ভ্যালি টি-গার্ডেনের মালিকের স্বামী। তোমার স্ট্যাটাস সম্বন্ধে অ্যাসোসিয়েশনের সকলেই সচেতন।

জয়তিলক বলল, এ দু'বছর গ্রীন ভ্যালির ব্যবসায়িক দিকটা লক্ষ্য করেছ কি ? কোয়ালিটি চায়ের বাজারে গার্ডেনের সুনাম আর প্রোডাক্সানের ব্যাপারে অনেক এগিয়ে যাওয়া, এগুলোর কি কোন দাম নেই ?

বাসবী আবার ক্ষেপে উঠল, শিলিগুড়ির অক্সান, কলকাতার অক্সান, সে কি তুমি কিংবা তোমার ঐ সমাজের লোকেরা ট্যাক্‌ল করে? গভর্ণমেণ্টের একসাইজ অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাড়াতাড়ি গার্ডেনের মাল পাঠানোর ব্যাপারটা কি তুমি দেখা শোনা কর? ফরেন মার্কেটের ওঠানামার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় কি তোমার সমাজের ঐ কুলিরা? গার্ডেনের উন্নতি যদি ঐ কুলিকামিনগুলোর ওপর নির্ভর করত তাহলে ওদের মাথার ওপর আর আমাদের বসে থাকার দরকার করত না। দয়া করে ঐ সিলি রিমার্কগুলো করনা জয়।

জয়তিলক বলল, আজ তুমি আহত আর উত্তেজিত বাসবী। তর্কের এখানেই শেষ হোক।

প্লিজ জয়, আমার রিকোয়েস্ট, একটু বুঝেসুঝে কাজ কর।

জয়তিলক দ্রুত পরিস্থিতিটাকে শীতল করার জন্যে বলল, চেষ্টা করব বাসবী তবে নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কোন কাজ আমি করতে পারব না। শুধু এইটুকু কথা দিতে পারি, দরকার হলে বরং কাজ থেকে সরে দাঁড়াব, কিন্তু তোমার আমার অসম্মান হয় এমন কাজ করব না।

সেদিন তর্ক আর বেশিদূর গড়ায়নি। জয়তিলক ভাল রকম বুঝেছিল প্ল্যানটার্সদের গায়ের জ্বালাটা কোথায়।

এখন ঘুমিয়ে আছে বাসবী। চাঁদের একটুকরো আলো এসে পড়েছে ওর গালের ওপর। আশ্চর্য কোমল মসৃণ ওর ত্বক। জ্যোৎস্না যেন হালকা পাউডারের পাফটা আলতো করে বুলিয়ে নিয়েছে ওর গালে। শিশির ধোয়া সদ্য ফোটা একটা গোলাপ বলে মনে হচ্ছে। জয়তিলক ভাবছে কেন এমন হয়। মানুষ ঘুমোলে এত সুন্দর, এত নিষ্পাপ, কিন্তু জেগে উঠলে কেন তার মুখের এমন পরিবর্তন ঘটে যায়। এত নিষ্ঠুরতা কি করে ছায়া ফেলে এমন সুন্দর একখানা মুখে।

কিছু আগের বাসবী আর এ বাসবীতে কত তফাৎ। সারাদিন দস্যিবৃত্তির পর একটি দুরন্ত কিশোরী যেমন অকাতরে ঘুমোয় বাসবী তেমনি করে ঘুমোচ্ছে। এই মুহূর্তে জয়তিলকের মনের সব দুঃখ, সব জ্বালা আর অভিমান ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে গেল। একটা ভালবাসার উত্তাপ জয়তিলকের হৃদয় থেকে উঠে ধীরে ধীরে আবৃত করে ফেলল ঘুমন্ত বাসবীকে।

বিয়ের দিনটির কথা মনে পড়ছে। বাসর ঘরে বন্ধু সমাগম। বাসবীর বান্ধবীতেই সারা হলঘর খানা ঠাসা। বিয়ের কনের সাজের ওপরেই কলাকুশলী এক বান্ধবী ওকে সামনে একটু মেক আপ দিয়ে সাজিয়ে দিলে নটীর মূর্তিতে। শুরু হল সমবেত কণ্ঠের গান। চঞ্চল হয়ে উঠল বাসবীর চরণ। বেজে উঠল নূপুর।

'আমার ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমো,
তোমায় স্মরি হে নিরুপম
নৃত্যরসে চিত্ত মম
উছল হয়ে বাজে।

আমার সকল দেহের আকুল রবে
মন্ত্র হারা তোমার স্তবে
ডাইনে বামে ছন্দ নামে
নবজনমের মাঝে।

বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ
সঙ্গীতে বিরাজে।।'

নাচে বাসবীর নৈপুণ্য যে কোন দর্শককেই সম্মোহিত করে ফেলতে পারে। তার ওপর আজকের এই স্মরণীয় দিনের পটভূমি। চারদিকে বেলকুঁড়ির মালার ঝালর দুলছে। কারুকার্য করা দক্ষিণ ভারতীয় পেতলের পিলসুজের ওপর প্রদীপ জ্বলছে। চিত্রিত ঘটে ফুটন্ত শ্বেত ও রক্ত পদ্ম। হলের মাঝখান থেকে ঝুলছে ঝাড় লণ্ঠন। সারা ঘর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত।

নাচের শেষে জয়তিলককে বান্ধবীদের কলকণ্ঠের অনুরোধ, গান করুন একাধিক। বলাই বাহুল্য প্রেমের গান।

জয়তিলক বলল, বিশ্বাস করুন গান আমি ভালবাসি কিন্তু গান আমার গলায় আসেনা। বিয়ের বাসরে আসার আগেই আমি জানতাম, আমাকে এই বাসরে কিছু অংশ নিতে হবে। তাই একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে আসিনি। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিরা যেসব ভালবাসার কবিতা লিখেছেন, তার কিছু কিছু ছত্র আমার অক্ষম ভাষায় অনুবাদ করে এনেছি। অনুমতি করলে শোনাতে পারি। ঘরের কোণ থেকে একটি মন্তব্য ভেসে এল, উত্তম অবতরণিকা।

সবাই হৈ হৈ করে উঠল, এটা একেবারে নতুন চমক, বেশ শোনান শোনান, দারুণ আইডিয়া।

জয়তিলক তার স্বাভাবিক দরদভরা ভরাট গলায় আবৃত্তি করল জন ক্লেয়ারের কবিতার একটি অংশ।

'তোমার সঙ্গে ঘুমোই আমি, জাগি তোমার সঙ্গে,
তুমি কিন্তু থাকোনা সেইখানে;
আলিঙ্গনের দুহাত দিয়ে অঙ্গ মেলাই অঙ্গে,
শূন্য হাওয়াই স্পর্শটা তার জানে।
তোমার দুচোখ রয় যে চেয়ে আমারই দুই চোখে,
চোখের বাইরে যখন তুমি যাও,
আমার দুঠোঁট তোমারই ঐ ঠোঁটের স্বপ্নলোকে
সকাল দুপুর এবং রাত্রিটাও।'

দারুণ দারুণ, আর একটা মশাই। বিয়ের আগে শূন্য হাওয়ায় বিরহী যক্ষের মত হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করেছেন, এবার হাত বাড়ান, পূর্ণ কুম্ভ পেয়ে যাবেন।

জয়তিলক বলল, এবার আলফ্রেড টেনিসনকে স্মরণ করছি নারীর উক্তি দিয়ে, জানিনা এটা আপনাদের বান্ধবীর মনের কথা হবে কিনা।

'আর কোন প্রশ্ন নয়ঃ
আমাদের দুজনেরই পথ নেই আর,
স্রোতের উজানেই আমি যেতে চেয়ে হেরেছি কতোই;
নিক তবে মহানদী টেনে নিক সমুদ্রে অথৈ;
আর নয় প্রিয়তম,
বুকে নিলে দেব সারাৎসার;
তবু কেন জিজ্ঞাসা আবার।'

এবার আমার একটি অনুরোধ রাখছি আপনাদের বান্ধবীর কাছে, অনুরোধ রাখা না রাখা তাঁর ইচ্ছার ওপর।

'সারাদিন আমার এ মেঘগুলি তোমার মেঘের সঙ্গে মিশে
তোমারই ও সানুদেশে নতুন চারণভূমি খুঁজেছিল তারা,
বিস্ময়ে অবাক দেখি তারা আর আমি বল সারাদিন কী সে
আনন্দিত তৃণভূমি; থেকে গেছি কতক্ষণ যেন দিশাহারা।

বড় দেরী হয়ে গেছে, বাড়িতে ফেরার পথ পাহাড়ী খাড়াই,
তোমার এ দেশে সব তারা আর পথচিহ্ন বড়ই অচেনা,
কী করে পাহাড় বেয়ে আবার এ মেষগুলি এখন ফেরাই!
হে মেষপালিকা, বল, দয়া করে ঘুমোবার ঠাঁই কি দেবেনা?'

আবার হৈ হৈ করে করতালি দিয়ে উঠল সবাই। সুরসিকা জনৈকা বান্ধবী মন্তব্য করল, ঘুমোবার ঠাঁই দেবেনা মানে, বুকের মধ্যিখানে ঠাঁই করে দেবে।

জয়তিলক এবার উঠে দাঁড়িয়ে জোড় হাত করে বলল, রাত্রি প্রায় শেষ, আপনাদের বান্ধবী যদি সত্যিই তাঁর বুকে আমাকে একটু ঘুমোবার আশ্রয় দেন তা হলে দয়া করে নিশ্চিন্তে সে বিশ্রাম সুখটুকু ভোগ করতে দিন।

পরমানন্দে ঘুমোন, তনু মন প্রাণ এক করে ঘুমোন, বলতে বলতে হাসির তরঙ্গ তুলে এক ঝাঁক প্রজাপতির মত বান্ধবীরা উড়ে পালাল।

একজন বলল, দরজা বন্ধ করে দে বাসবী।

অন্যজন বলল, নিশ্ছিদ্র করে।

ওরা চলে গেলে পায়ের নূপুর খোলায় মন দিল বাসবী। চাঁদের আলো এসে পড়েছে বিছানায়। দক্ষিণে খোলা পার্ক। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল বাসবী। বলল, ঘুম পেয়েছে আপনার, মস্ত বড় বিছানা পাতা, আরাম করে ঘুমোন, তার বেশি কিন্তু কিছু নয়।

জয়তিলক আর বাসবী বিছানায় গা এলিয়ে দিল। চাঁদের আলো বাসবীর গাল ছুঁয়ে বালিশে গড়িয়ে পড়েছে। রুজের ছোপ লাগা গাল সেদিন অবিকল একটি গোলাপ বলে মনে হচ্ছিল।

জয়তিলক বলল, আপনার আদেশ শিরোধার্য, তবে তার আগে চার ছত্র কবিতা শোনাবার অনুমতি দিন।

বাঁকা চোখে মিষ্টি করে হেসে তাকাল বাসবী।
জয়তিলক আবেগ ভরা গলায় আবৃত্তি করল,—
'সারা রাত আমি গোলাপের পাশে গোলাপ,
গোলাপেরই পাশে সারা রাত শুয়ে থাকি;
গোলাপ চুরির সাহস হয়নি মোটেই,
ফুলটির তবু কিছুই থাকেনা বাকী।'

কবিতা শেষ হলে জয়তিলক বাসবীর কাছ থেকে সে রাতে একটি পুরস্কার পেয়েছিল। একটি ফুল। না, গোলাপ নয়, চাঁপা। চাঁপার কলির মত আঙুলগুলো সমর্পণ করে দিয়েছিল বাসবী জয়তিলকের হাতে।

আজ জয়তিলক তেমনি করে চেয়ে আছে বাসবীর দিকে। তেমনি চাঁদের আলো এসে পড়েছে বাসবীর মুখের ওপর। অবিকল কোমল একটি গোলাপ হয়ে গেছে ওর মুখখানা। কিন্তু আজ বাসবী জয়তিলককে একটি চাঁপার ফুল উপহার দিলনা।

জয়তিলকের বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। সে মনে মনে উচ্চারণ করল, হে সময়, হে মহাকাল, তুমি কি তোমার প্রবাহকে থামিয়ে একবার উৎসের দিকে যেতে পারনা। আর একটি বার কি নিয়ে যেতে পারনা সেই বাসর ঘরে যেখানে বধূ তার লজ্জায় কাঁপা হাতখানা তুলে দেয় তার বাঞ্ছিতের হাতে।

নিরুত্তর মহাকাল। সময় দ্রুত ভোরের দিকে গড়িয়ে চলে।

দুই

আউট হাউসের লনে একটা লম্বা পানিসাজ গাছ দাঁড়িয়ে। মাথায় একরাশ মাখন রঙের ফুল। কটা পাখি নীচের ডালে চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ দারুণ রকম চঞ্চল হয়ে উঠল। ফরফর করে পাখা টেনে ওপরের দিকে উঠে মগডালে ফুলের স্তবকগুলো দিয়ে উড়তে লাগল। আবার ভালমানুষের মত চুপটি করে এসে বসল আগের ডালে। এমনি বার তিন চার খেলা দেখিয়ে ফুরুৎ ফুরুৎ ফুরুৎ করে পাখা টানতে টানতে পাঁই পাঁই করে উড়ে পালাল।

ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে নিজের মনে হাসল শ্রুতি।

ভোরের দিকে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে, তাই প্রথম রোদ্দুরটা বড় মিঠে লাগে। এ সময় রাধামোহনের কোন কাজই বাকী থাকে না। উনি চিরকালই আর্লি রাইজার। রাধামোহনকে বারান্দায় একখানা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে পেছনের লনে গিয়ে প্রতিদিন এ সময়টা দাঁড়িয়ে থাকে শ্রুতি। রাধামোহন হাত দুটো কোলের ওপর ফেলে উদিত সূর্যের কথা চিন্তা করেন। প্রায় একঘণ্টা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। সূর্যের কথা চিন্তা করতে করতে সূর্যের ভাস্বরত্ব নিজের মধ্যে অনুভবের চেষ্টা করেন।

এ সময়টা শ্রুতির ছুটি। সে পেছনের লনে দাঁড়িয়ে কতকিছু চেয়ে চেয়ে দেখে। পানিসাজ গাছের মাথায় প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়ে। সে আলো ধীরে ধীরে গাছের গা বেয়ে নামতে থাকে। ওদিকে নীচের পাহাড়টা গা থেকে ঠেলে ঠেলে সরিয়ে দেয় তার রাতের কালো কম্বলখানা। ধীরে ধীরে এবার সে জড়িয়ে নেয় একখানা রোদ্দুরের সুতোয় বোনা সোনালী উত্তরীয়। তার ওপর সবুজের চোখ জুড়ানো আঁকিবুকি। রাতে যে মেঘগুলো উপত্যকায় ঘুমোবার জন্য জড়ো হয়েছিল তারা এখন আলোর ছোঁয়ায় দুধ-সরোবরের রূপ ধরেছে। এবার মেঘগুলো তাপ পেয়ে উপত্যকার গোলাকার কিনার বরাবর ওপরের দিকে উঠছে। ঠিক যেন বিরাট এক শ্বেতপদ্ম পাপড়ি মেলে জাগছে। দেখতে দেখতে সূর্যের সোনালী আলোর ছোঁয়া লাগল তার গায়, অমনি শ্বেতপদ্মটি রূপ নিল সোনার কমলে।

নিজের ফেলে আসা জীবনের কথা শ্রুতি ইচ্ছে করেই ভাবেনা। কি লাভ সে ভাবনায়। বাবা ডাক্তার ছিলেন। তাঁর প্রথম বিয়ের একটি সন্তান ছিল। স্ত্রী মারা যাবার পর বাবা তার মাকে বিয়ে করে দ্বিতীয়বার সংসার পেতেছিলেন। শ্রুতি কৈশোরেই মা বাবাকে হারাল। দাদা তখন ডাক্তারি পড়ছে। পয়সা কড়ি পর্যাপ্ত ছিল না। তাই দাদা ফাইন্যাল ইয়ারে উঠলে শ্রুতি যখন হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে বেরুল, তখন ইচ্ছে থাকলেও তার আর ডাক্তারি পড়া হল না। শেষে পরীক্ষা দিয়ে নার্সিং শিখতে লেগে গেল। নার্স হয়ে যখন সে বেরুল তখন দাদা পাশ করে ডাক্তারী শুরু করেছে। দাদার চেহারা ছিল সুন্দর, রেজাল্টও ভাল, তাই তার এক প্রফেসারের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল।

শ্রুতি কাজ পেল বিখ্যাত এক প্রাইভেট নার্সিংহোমে। কাজটা দাদার ডাক্তার শ্বশুর মশায়ই জোগাড় করে দিয়েছিলেন। কিন্তু একটি বছর ঘুরতে না ঘুরতেই শ্রুতি বুঝল তার নতুন বৌদিটি সুবিধের মানুষ নয়। সামান্য সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে বাঁকা কথা, কটু মন্তব্য করতে ছাড়ত না। তার বাবা যে এত বড় একটা নার্সিংহোমে শ্রুতির রুটি রোজগারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, এ কথা বৌদির মুখে শোনার পর সে নার্সিংহোমের লোভনীয় চাকরীটা ছেড়ে দেওয়াই সাব্যস্ত করল। আর ঠিক সেই সময় টি-গার্ডেনের এই অফারটা এসে গেল তার কাছে।

অতি সংক্ষিপ্ত ঘটনা। হাজারটি পারিবারিক জীবনের যেমন পরিণতি হয় ঠিক তেমনি একটি। কিন্তু এখন শ্রুতি ধীরে ধীরে ভাবতে আরম্ভ করেছে, তার জীবনের এই পরিণতি তার পক্ষে শুভ ছাড়া অশুভ নয়। হয়ত নানা ধরনের রোগীকে অ্যাটেন্ড করার ভেতর যে উত্তেজনা আর শিক্ষা আছে তার সুযোগ সে পাবেনা, কিন্তু নীচতা, স্বার্থপরতার কুৎসিৎ ছবিগুলোও তাকে রোজ রোজ দেখতে হবেনা। এটা তার মার্জিত শান্ত মনের পক্ষে কম লাভ নয়।

শ্রুতি তাই তার বর্তমান জীবনে খুশি, আর তাই সে মনে করতে চায়না তার ফেলে আসা অতীত জীবনটাকে।

ভোরের একটা হাওয়া বয়ে এল। পানিসাজ গাছের পাতাগুলো চড়বড়িয়ে উঠল। শ্রুতি এগিয়ে গেল পাইন বনের দিকে। অন্যমনে একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে পাথর বাঁধান পথ ধরে নীচে নামতে লাগল। পাইন বনের ডানদিকে একটা শিলাস্তূপ। পথ থেকে নেমে ঐ শিলাস্তূপের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

শ্রুতি বাঁয়ে তাকিয়ে দেখল জয়তিলকদের বাংলো বাড়ির পেছনে একটা সাদা রঙের বেতের চেয়ার পেতে বসে আছে বাসবী। হলুদ রঙের একটা ম্যাক্সিতে ওকে বেশ মানিয়েছে। ভোরের আলো, বাসবীর গায়ের রঙ, হলুদ ম্যাক্সি, সব মিলে একটা উজ্জ্বল সোনালী সমারোহ।

বাসবী মনে হয় উল বুনছে। একটা উলের বল পড়ে আছে তার পায়ের কাছে লনে। শ্রুতির কেন জানিনা হঠাৎ জানতে ইচ্ছে করল, কার জন্যে উলের পোশাক তৈরী করছে বাসবী। নিজের জন্যে? কোন বন্ধুর জন্যে? না, জয়তিলকের জন্যে?

আবার নিজেকে বিজ্ঞের মত শাসন করে বলল, যার জন্যই হোক্ না কেন, তোমার এ নিয়ে ভাবনা কেন শ্রুতি।

সে দূর থেকে জয়তিলকদের সংসারের যতটুকু ছবি দেখেছে তাতে তার মনে হয়েছে, ওরা একই সঙ্গে থাকলেও মনের দিক থেকে খুব কাছাকাছি নয়। জয়তিলককে সে প্রায়ই দেখে। রাধামোহনের কাছে বিশেষ কাজ না থাকলেও রোজই প্রায় একবার আসে। বাবা আর ছেলেতে বসে বসে নানা বিষয় নিয়ে গল্প হয়। পৃথিবীর অতি আধুনিক নামকরা কবি, ঔপন্যাসিক, চিন্তাবিদদের সম্বন্ধে ছেলের কাছে জানতে চান রাধামোহন। কাজের ফাঁকে শ্রুতি চেয়ে চেয়ে দেখে, কি গভীর আগহ নিয়ে বৃদ্ধ রাধামোহন শোনেন সে সব কথা। কখনো বা দুজনে গুরুতর আলোচনায় জড়িয়ে পড়েন। যখন জয়তিলক চলে যান তখন শ্রুতি বুঝতে পারে ঘরের আবহাওয়াই বদলে গেছে। বৃদ্ধের মুখ আশ্চর্য প্রশান্তিতে ভরা।

কিন্তু একটি বিষয় শ্রুতির কাছে আজও রহস্যে ঢাকা। বাবা আর ছেলের ভেতর কোনদিনই সে বৈষয়িক কোন আলোচনা হতে শোনেনি।

আজ সকালবেলা পাইন বনে উদ্দেশ্যহীনভাবে বেড়াতে বেড়াতে শ্রুতির মনে হতে লাগল, জয়তিলক যেন তার পাশে পাশেই হেঁটে চলেছে। আজ ভোরবেলাকার আলোছায়া যেন গত রাতের মায়াভরা জ্যোৎস্নার অবিকল প্রতিরূপ। সে এই মুহূর্তে একা নয়, আর একজনের উত্তপ্ত উপস্থিতি ভোরের রোদের মত সে অনুভব করতে লাগল।

শ্রুতি ফিরে এসে দেখল ইতিমধ্যেই রুক্মী এসে গেছে। বাহাদুরের বৌ রুক্মী। বাংলোর চৌকিদার বাহাদুর, আর আউট হাউসের রাঁধুনী রুক্মী। ওদের ডেরা নীচের ঐ লুপ লাইনের কাছে। রাতে বাচ্চাদের সঙ্গে নিজের ডেরায় থাকে রুক্মী। ভোর রাতে উঠে দিনের খাবার দাবার তৈরী করে সারাদিনের মত বেরিয়ে আসে। বড় মেয়েটা বাড়ি আগলায়। ছোট ভাইটাকে নিয়ে পাহাড়ী আল্‌সেতে বসে রোদ পোহায়। দশ বছরের দিদির চালচলন মুরুব্বির মত। তিন বছরের ভাইও কম যায় না। ঐ একহাত চওড়া পাঁচিলের ওপর দিয়ে সমানে দৌড়োদৌড়ি করে। নীচে গভীর গিরিখাদ। পা পিছলে পড়ে গেলে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, কিন্তু আশ্চর্য! পাহাড়ী বাচ্চারা কখনো খাদে পড়ে গেছে, এমনটা শোনা যায়না।

একদিন রুক্মীর খোঁজে গিয়ে শ্রুতি পাঁচিলের কিনার ঘেঁষে তার বাচ্চাটাকে দৌড়তে দেখে ভয়ে আঁতকে উঠেছিল। কথাটা রুক্মীকে বলতেই সে বলেছিল, ওর চেয়ে ছোট ছোট বাচ্চাদের মায়েরা রোদ্দুরে ঐ পাঁচিলের ওপর বসিয়ে দিয়ে যায়। ওরা চুপ করে বসে থাকে, নড়ে না চড়ে না।'

সেদিন রুক্মীর কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল শ্রুতি।

আজ তার ভোরের ভ্রমণ শেষ করে আসতে না আসতেই রুক্মী এসে গেছে। সে রাধামোহনকে ধরে ইতিমধ্যেই ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়েছে।

ঘরে ঢুকে শ্রুতি বলল, কি রুক্‌মী, এ: সকালে যে?

রুক্‌মী মুখ ভার করে বলল, মেমসাব ভোরবেলা গিয়ে আমাদের ধমকে এসেছে। কাজে লেট হলে নোক্‌রী যাবে।

শ্রুতি একটু অবাক হয়েই বলল, নিজে গিয়েছিলেন মেমসাব?

হাঁ বহিনজী, ভোরবেলা শুনি কোঠীর সামনে হর্ণ বাজছে। দরজা খুলতেই দেখি মেমসাব। গুস্‌সা করে বলল, বাহাদুরকে জলদি বোলাও।

রাতভর ফূর্তি করে ও নিদ যাচ্ছিল। বেহুঁশ মানুষটাকে ঠেলে তুললাম। ও চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাহার হতেই মেমসাব যেন ঝাঁপায়ে পড়ল বহিনজী। মুখমে যা আসে তাই বলল। আরও বলল, রাতে বাংলো ছেড়ে বাহারে থাকলে নোকরি যাবে।

মেমসাব আমার দিকে আঁখ রাঙা করে তাকাল। শেষে যাবার সময় বলল, সূয্যি ওঠার আগে আউট হাউসে না গেলে তোমারও নোকরি থাকবে না।

নোকরি গেলে খাব কি, তাই বহুৎ ডর পেয়ে সকাল সকাল এলাম বহিনজী।

শ্রুতি সব শুনল, কিন্তু কোন মন্তব্য করতে পারল না। যে কথার প্রতিবাদ করার কোন ক্ষমতা বা অধিকার তার নেই অকারণ মন্তব্য করে লাভ কি। শ্রুতি শুধু বলল, মেমসাব যখন বলেছেন তখন তাঁর কথা অবহেলা করনা। ভোরবেলা বাংলোর পাশ দিয়ে যেমন আস তেমনি আসবে। মেমসাব শোবার ঘরের জানালা দিয়ে তোমার যাওয়া আসার ওপর নজর রাখতে পারেন।

একটু থেমে আবার বলল শ্রুতি, তুমি এখানে হাজিরা দিয়ে ওপরের ঘুর পথ ধরে কোঠীতে চলে যেও। সেখানে রান্নার কাজ সেরে আবার ঐ পথ ধরে এখানে চলে এস। কিন্তু সাঁঝে ফিরবে যখন তখন বাংলোর সামনে দিয়েই ফিরতে হবে। তাহলে মেমসাব আর কিছু ধরতে পারবেন না।

বিরাট একটা সমস্যার এত সহজ সমাধান হয়ে গেল দেখে চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠল রুক্‌মীর। সে বলল, বহিনজী, আমার বালবাচ্চাকে তুমি বাঁচিয়ে দিলে। ভগবান তোমার ভাল করবে।

হঠাৎ শ্রুতি বলল, হাঁ রুক্‌মী, সাহেব তোমাদের কিছু বলেননা?

ও তো দেব্‌তা আছে। সারা তল্লাটের কুলি কামিন ওকে দেব্‌তা বলে।

তারপর গলা নীচু করে বলল রুক্‌মী, গার্ডেনের মালিক তো আছে মেমসাব, তাই মেমসাবের উপর কেউ কথা বলেনা।

শ্রুতি একটুখানি হেসে রাধামোহনের ঘরে ঢুকে গেল। রুক্‌মী বাইরের ঘরে কাজকর্ম গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

শ্রুতিকে দেখে হঠাৎ রাধামোহন বলে উঠলেন, দেখ তো দেখি তোমাকে ছাড়াই কেমন ঘরে চলে এসেছি। উন্নতি হয়েছে, স্বীকার করতেই হবে।

শ্রুতি হেসে বলল, এত তাড়াতাড়ি এতখানি উন্নতি হলে তো আমার চাকরি থাকবেনা বাবা।

তাহলে তুমি কি চাও তোমার বাবা চিরকাল খোঁড়া হয়ে পড়ে থাকুক।

শ্রুতি বলল, আমি এই মুহূর্তে আনন্দে চাকরি ছেড়ে দেব যদি দেখি আপনি নিজের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

রাধামোহন হেসে বললেন, রুক্‌মীর সঙ্গে কথা হয়েছে বুঝি?

শ্রুতি বলল, ও আজ অসময়ে এসে পড়ে আমাকেও অবাক করে দিয়েছে।

রাধামোহন বললেন, আমি জিজ্ঞেস করে জানলাম, বৌমাই নাকি ওকে আউট হাউসে তাড়াতাড়ি কাজে আসতে বলেছেন।

আর কিছু বলল রুক্‌মী?

রাধামোহন বললেন, না, আর কি বলবে। তবে আমার কাছে না বললেও মনে হয় ওর এই ভোরবেলা আসতে বেশ অসুবিধেই হবে।

শ্রুতি বুঝল, কাল বাহাদুরকে জয়তিলক ছুটি দেবার জন্যে সাতসকালে বাসবী গিয়ে যে রুক্মী আর তার বরকে ধমকে এসেছেন সে খবর রাধামোহন রুক্মীর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেননি।

শ্রুতি মুখে বলল, তা একটু অসুবিধে হবে বৈকি। তবে মিসেস মিত্রের চারদিকে খুব কড়া নজর আছে। নিজের এত কাজের মাঝেও আপনার কাজে গাফিলতি হচ্ছে কিনা তার খোঁজখবর রেখেছেন।

রাধামোহন এ কথায় প্রীত হবেন বলেই মনে করেছিল শ্রুতি, কিন্তু তিনি হঠাৎ বললেন, রুক্মী তো কাজে কোন গাফিলতি করেনা। সকালের চা জল-খাবার তো তুমিই তৈরী করে নাও। ও সংসারের কাজ সেরে এখানে এসে রান্না চাপায়। সারাদিন সংসার ছেড়ে, বাচ্চা ফেলে, দুটো পয়সার জন্যে ও থাকে এখানে। এখন ভোরবেলা এলে বেচারার চলে কি করে। জয়তিলক এলে ওকে বলতে হবে, আগের ব্যবস্থাই পাকা থাক, ও দেরিতে এলে এদিকে কোন অসুবিধেই হবে না।

শ্রুতি বলল, এতে মিসেস মিত্র মনে দুঃখ পেতে পারেন। তিনি আপনার কথা ভেবেই তো কাজটা করেছেন।

একটু থেমে আবার বলল, কাউকে কিছু বলে দরকার নেই। সকালে ও বাংলোর সামনে দিয়েই আসবে। তারপর আউট হাউসের পাশ দিয়ে ও চার্চ ঘুরে আবার ঘরে ফিরে যাবে। ঘরের কাজ সেরে আসবে ঐ চার্চের পথেই। সন্ধ্যায় নেমে যাবে বাংলোর রাস্তা ধরে। একটু লুকোচুরি আর কি। এতে সবদিকে শান্তি বজায় থাকবে বাবা।

রাধামোহন বললেন, তুমি মা আমার খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। সব সমস্যার সমাধানই সুন্দরভাবে করে দিতে পার।

মনে মনে হাসল শ্রুতি। মিথ্যে হোক্ তবু শান্তি আসুক এই সম্ভ্রান্ত মানুষটির মনে। পুত্রবধূর রূঢ়তার পরিচয়টুকু নাই বা পেলেন রাধামোহন। জীবনের শেষ কটা দিন প্রসন্নতার ভেতর কেটে যাক তাঁর।

শ্রুতি রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। রাধামোহন তার দিকে চেয়ে কি ভেবে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

রান্নাঘরে ঢুকেই রুক্মীকে ছুটি দিয়ে দিল শ্রুতি। বলল, চারদিকে নজর রেখে সাবধানে যাওয়া আসা করবে। হঠাৎ করে যদি মেমসাব তোমাকে দেখে ফেলে কিছু জিজ্ঞেস করেন তাহলে বলবে, আমি তোমাকে সওদা করতে বাজারে পাঠিয়েছি। আর ভোরবেলা যখন ঘরে থাকবে তখন খুব হুঁসিয়ার থেকো। দরজা খুলতে নিজে বাইরে বেরিও না।

রুক্মী সব বুঝেছে এমনি ভাব দেখিয়ে মাথা নাড়ল। সে চলে যেতেই শ্রুতি খাবার তৈরী করে নিয়ে এল রাধামোহনের ঘরে।

রাধামোহন খেতে খেতে কথা বলছিলেন শ্রুতির সঙ্গে।

তোমার খাবার এখানে নিয়ে এস। তুমি তো এখন আর হসপিটালের সিস্টার নও শ্রুতি, তুমি আমার ডটার। আগেও বলেছি, তোমার সংকোচ কাটেনি, এখন বাবার আদেশ বলে এটাকে মেনে নাও। লক্ষ্মী মেয়ের মত আমার পাশে বসে এবার থেকে তুমি খাবে।

শ্রুতি টোস্ট আর অমলেট এনে রাধামোহনের পাশে বসে খেতে লাগল।

এবার আপনি খুশি তো?

খুউব।

রাধামোহন একটু থেমে বললেন, ছেলেবেলা বড্ড গরীব ছিলাম, তাই এক মাস্টারমশায়ের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করতাম। তাঁর বাড়ির অনেক কাজই আমাকে করে দিতে হত। ইচ্ছে মত লেখাপড়ার সুযোগ আমি পেতাম না। কিন্তু ইস্কুলে গেলেই পড়া না পারার জন্যে ঐ মাস্টারমশাইয়ের হাতে বেত খেতে হত। আমি চোখের জল ফেলতাম, আর মনে মনে বলতাম, একটুখানি পড়ার সুযোগ পেলে আমাকে আর বেত খেতে হত না।

খাবার সময় কিন্তু মাস্টারমশায় আমাকে পাশে ডেকে নিয়ে বসাতেন। আমার সংকোচ হলেও উনি

শুনতেন না। বলতেন, ভাল করে এখানে পেট ভরে খা। ইস্কুলে গেলে তো পিঠে খেতে হবে। তিনি রান্নার ভাল ভাল অংশ আমার পাতে দিতে বলতেন।

শ্রুতি হেসে বলল, ওটা কিন্তু মাস্টাবমশায়ের দয়ার দান নয়। উনি জানতেন পেটে খেলে পিঠে সয়। তাই ভাল করে খাইয়ে মার সইবার জন্য তৈরী করে নিতেন।

হাসলেন রাধামোহন। বললেন, ম্যাট্রিক ক্লাশে যখন স্কলারশিপ পেলাম তখন আমাকে জড়িয়ে ধরে মাস্টারমশায়ের সে কি কান্না। বললেন, আর তোকে পিটুনি খেতে হবেনা, এখন থেকে তোর পিটুনি খাওয়া জন্মের মত ঘুচে গেল।

ওদের খাওয়া শেষ হলে বেল বাজল বাইরে। শ্রুতি প্লেট তুলে নিয়ে ভেতরে চলে গেল। পরে বাইরে গিয়ে দরজা খুলতেই মুখোমুখি হল জয়তিলকের।

মুখখানা থমথম করছে। শ্রুতিকে দেখেই একটুখানি হাসল। শ্রুতি বুঝল, বাসবীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে। হয়ত আজ ভোরবেলাকার ঘটনা নিয়েই।

জয়তিলক চিন্তিত মুখে বাবার ঘরের দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিল, শ্রুতি গলার আওয়াজ যদ্দুর সম্ভব নরম করে বলল, আপনি একটুখানি এদিকে আসুন, কথা আছে।

ওরা পেছনের বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

শ্রুতি বলল, একটা অন্যায় করেছি!

জয়তিলকের গলায় বিস্ময়, অন্যায়! কিসের অন্যায়?

মিসেস মিত্র রুক্‌মীকে ভোরবেলা কাজে যোগ দিতে বলেছিলেন, আমি তাকে ওপরের রাস্তা ধরে ঘরে চলে যেতে বলেছি। ঘরের কাজ সেরে আবার সে ফিরে আসবে ঐ পথ ধরে।

জয়তিলক কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বলল, কাজটা সতিাই দোষের হয়েছে শ্রুতি। ওকে ওভাবে ঘরে ফিরে যেতে বলা তোমার ঠিক হয়নি।

শ্রুতি মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য রুক্‌মীর অসহায় সংসার-চিত্রটা সে তুলে ধরতে পারত, কিন্তু তা সে করল না। কোথায় যেন তার বাধল। একটা অভিমান তার সব যুক্তির পথ রুদ্ধ করে দিল। অতি অল্পদিন সে জয়তিলকের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই তার অবচেতন মনে মানুষটির ওপর এক ধরনের অধিকারবোধ জন্মে গিয়েছিল। আর তাই আজ রুক্‌মীর ওপর ওর সহানুভূতিব কথাটা জানাবার সাহস পেয়েছিল। কিন্তু জয়তিলক ওর কাজের সমর্থন করল না, তাই রুদ্ধ অভিমানে ও মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

জয়তিলক রাধামোহনের ঘরের দিকে পা বাড়াল। যাবার সময় শুধু বলল, তুমি এখানে অপেক্ষা কর, আমি আসছি।

জয়তিলক বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। বারান্দায় আহত শ্রুতি নীরবে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল। সে সহজেই রাধামোহন আর জয়তিলকের কথোপকথন কান পাতলেই শুনতে পেত কিন্তু তার মার্জিত প্রবৃত্তি তাকে বাধা দিল। পাছে কথাগুলো তার কানে ভেসে আসে তাই সে বারান্দা থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে পেছনের বাগানে গিয়ে দাঁড়াল। সিজন্ ফ্লাওয়ারের বেডে ছোট বড় হরেক রঙের এক ঝাঁক প্রজাপতি উড়ছিল, অন্য সময় হলে সে মুগ্ধ হয়ে ওদের দেখত, নয়ত বাগানের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ছুটত ওদের পেছন পেছন, কিন্তু আজ নিরাসক্ত চোখে চেয়ে রইল ওদের দিকে। তার একসময় মনে হল, কে যেন কতকগুলো রঙীন কাগজকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে।

কতক্ষণ পরে জয়তিলকের ডাকে ও চমকে ফিরে দাঁড়াল। বারান্দার দিকে পা বাড়াতেই জয়তিলক বলল, তোমাকে আসতে হবে না আমি আসছি।

জয়তিলক নীচে নেমে গিয়ে শ্রুতির মুখোমুখি দাঁড়াল।

খুব দুঃখ পেয়েছ আমার কথায়?

শ্রুতি চোখ নামাল মাটির ওপর। জয়তিলকের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে অভিমানের যে বরফটা

বুকের ওপর চেপে বসেছিল এতক্ষণ, তা এই মুহূর্তে চোখের পাতা উপচে ঝরে পড়ল মাটিতে। শ্রুতি কথা বলতে পারল না। সে শুধু মাথা নেড়ে জানাল, কোন দুঃখই সে পায়নি।

জয়তিলক বলল, তোমাকে আঘাত দেবাব জন্যে কথাটা বলিনি শ্রুতি। শুধু পরিস্থিতিকে বুঝে চলতে শেখ, এই ছিল আমার বলার উদ্দেশ্য।

শ্রুতি এবার মুখ তুলে বলল, আমি আপনাকে ভুল বুঝিনি। আমার নিজের অবিবেচনার জন্যে লজ্জা পেয়েছি। আপনি আমার ভুল ধরিয়ে ঠিক কাজই করেছেন।

জয়তিলক বলল, রুক্মীকে সাহায্য করতে গিয়ে তুমি বাসবীর বিরাগভাজন হও, এ আমি চাইনা।

শ্রুতি বলল, বাবার সঙ্গে আপনার কি কথা হয়েছে জানিনা, তবে আমি ওঁকে বুঝিয়েছি ওঁর সুবিধের কথা ভেবেই মিসেস মিত্র রুক্মীকে সকাল সকাল কাজে যোগ দিতে বলেছেন। আর এ কথাও বাবা জানেন যে মিসেস মিত্রের অগোচরে ওর সাময়িক ছুটিব ব্যবস্থাও আমি করে দিয়েছি।

জয়তিলক বলল, প্রতিবাদ আমার ঐখানেই শ্রুতি। তুমি রুক্মীর জন্যে যা করতে গেছ তা তোমার মনুষ্যত্ব। কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে সেটা তো প্রতিবাদ নয়, সেটা অসহায়ের আপোস মাত্র।

শ্রুতি বলল, প্রতিবাদ জানাবার অধিকার যদি আমার থাকত তাহলে হয়ত গোপনতার আশ্রয় নিতাম না।

জয়তিলক বলল, আমার ঐখানেই আপত্তি। প্রতিবাদের অধিকার যেখানে নেই, সেখানে গোপন কিছু করার অধিকারও নেই। তুমি বুদ্ধিমতী শ্রুতি, তুমি আমার কথাটুকু আশা করি বুঝবে।

শ্রুতি বলল, প্রথমে আপনার কথায় আঘাত পেয়েছিলাম, কিন্তু এখন আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। এখন আমার আর কোন দুঃখ নেই। আমি আমার অধিকারের সীমা বুঝে চলার চেষ্টা করব।

এতে অনেক অশান্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে শ্রুতি।

জয়তিলকের কথায় হাল্কা হল শ্রুতির মন। সে বলল, একটা কথা জানতে চাইব, উত্তর না দিলেও রাগ করবেন না বলুন?

জয়তিলক হেসে বলল, উত্তরও দেব, রাগও করব না।

শ্রুতি বলল, না শুনেই।

কথা দিলে এমনি করেই দিতে হয়।

শ্রুতি সোজাসুজি প্রশ্নটা ফেলল, রুক্মী আর বাহাদুরকে নিয়ে বাসবীদির সঙ্গে আপনি কি কোন বচসা করেছেন?

জয়তিলক বলল, উত্তর তুমি পাবে, কিন্তু তার আগে জিজ্ঞেস করি, এ অনুমান তুমি করলে কি করে?

আপনি যখন ঘরে ঢোকেন তখন আপনার মুখে রোজকার মত খুশির ভাব ছিল না। আর তার আগেই রুক্মীর ব্যাপারটা আমি জেনে ফেলেছিলাম। তাই দু'টা মিলিয়ে আমার অনুমান করতে অসুবিধে হয়নি।

জয়তিলক বলল, তোমার অনুমানই ঠিক। কাল অনেক রাতে বাসবী ফিরেছিল। ফিরে আসার পর বাহাদুরের ছুটি নিয়ে আমাদের ভেতর কিছু কথা কাটাকাটি হয়। তারপর ভোরবেলা ও গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে আবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল। এসেই ওর শাসনের কথা সদর্পে ঘোষণা করল।

শ্রুতি বলল, আমার কৌতূহল মাপ করবেন, এর বেশি আমি আর কিছু জানতে চাইনা।

জয়তিলক বলল, তোমার হয়ত আর শোনার আগ্রহ নেই কিন্তু আমার যে এই মুহূর্তে একজন অন্তরঙ্গ শ্রোতা চাই শ্রুতি। যার কাছে আমি কথা বলে মনের ভার লাঘব করতে পারব।

শ্রুতি নীরবে দাঁড়িয়ে আছে দেখে জয়তিলক বলল, বহু কষ্টেও মানুষ দাম্পত্য জীবনের কলহের কথা আর কাউকে বলতে চায়না, কিন্তু আজ কারু কাছে না বললে আমি একটুও শান্তি পাবনা শ্রুতি।

আপনি কি বাবাকে এসব কথা বলেছেন?

বলতে গিয়েছিলাম কিন্তু বলতে পারিনি।

কেন?

ঘরে ঢুকতেই উনি বৌমার একমুখ প্রশংসা করলেন। বাসবীর যে সবদিকে তীক্ষ্ণ নজর আছে সে কথা জানালেন। পরে তোমার বুদ্ধিমত্তার কথাও ফলাও করে বললেন। এরপর ওঁর কাছে অন্য আলোচনা করা ছাড়া আর কোন উপায়ই ছিল না।

শ্রুতি বলল, এবার বলুন আপনার কথা।

জয়তিলক বলল, আমি শুধু বাসবীকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি নিশ্চয় চাইবে সকল পরিস্থিতিতে স্বামী তার স্ত্রীর সম্মান রক্ষা করুক।

ও উত্তর করল, সাধারণ মানুষও এটা বোঝে। এর জন্যে নীতি শাস্ত্র পড়তে হয়না।

আবার প্রশ্ন করলাম, উল্টোটাও কি সত্য নয়?

তার মানে? স্পষ্ট করে বল।

আমি বললাম, স্ত্রীও সকল অবস্থায় তার স্বামীর সম্মান রক্ষার চেষ্টা করবে?

ও বলল, এটা কোন প্রশ্নই নয়। পরস্পরকে রাখতে হবে পরস্পরের সম্মান। কিন্তু জানতে পারি কি এসব প্রশ্নের মানে?

বললাম, বাসবী, তোমার বাবার দেওয়া এতবড় একখানা জমিদারী চালাচ্ছ আর এই সামান্য প্রশ্নের অর্থ জাননা, একথা আমাকে বিশ্বাস করে নিতে হবে।

ও রাগ করে ঘরের ভেতর ঢুকতে গিয়ে বলল, আমি তো তোমার মত কলেজে পড়াইনে যে আমার মগজ তোমার মত সাফ্ হয়ে থাকবে।

কঠিন গলায় বললাম, যেওনা, দাঁড়াও।

ও সম্ভবত আমার গলার এ স্বরের সঙ্গে পরিচিত ছিলনা। আওয়াজ শুনে তাই চমকে উঠল। ঘরের ভেতর ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারলনা।

বললাম, তুমি অন্যায় করেছ বাসবী। ওদের শাসন করার অধিকার তোমার থাকতে পারে কিন্তু আমাকে অপমান করার অধিকার তোমার নেই।

ফোঁস করে উঠল বাসবী, অপমান বোধটা দেখছি তোমার খুব টনটনে।

বললাম, তুমি যদি কাল রাতে কাউকে ছুটি দিতে আর সকাল হতে না হতেই আমি তার ঝুঁটি ধরে টেনে আনতাম তাহলে তুমি কি খুব সম্মানিত বোধ করতে?

আমি কাজ করার আগেই বিবেচনা করে'নি। তাই অসম্মান বা ঝামেলার ভেতর অকারণে জড়িয়ে পড়তে হয়না। তুমি প্ল্যান্টারস্‌দের ভেতর একটুখানি খোঁজ খবর করলেই জানতে পারবে আমার সম্বন্ধে তাদের কতবড় ধারণা।

হেসে বললাম, নিজের বিয়ে করা স্ত্রী সম্বন্ধে ধারণা দেবে বাইরের লোক, বলিহারী তোমার বুদ্ধি বিবেচনা বাসবী।

ও সঙ্গে সঙ্গে বলল, কোনদিন তুমি আমাকে বোঝার চেষ্টা করেছ? কোনদিন কি খোঁজ নিয়েছ, আমার মন কি চায়?

বললাম, এ সত্য আমি মানি বাসবী যে তোমার মন জুগিয়ে কোনদিনই আমি চলতে পারিনি।

মন জোগানোর প্রশ্ন নয়, স্ত্রীর মনের সঙ্গী হয়ে চলা।

বললাম, সমুদ্রের ঢেউ-এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে জাহাজ কিন্তু একটা সাইক্লোনের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধ করে চলা তার পক্ষে সম্ভবও নয় আর সংগতও নয়।

বাসবী বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, বিয়ের আগে আমাদের ক্ষমতার পরীক্ষাটা হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, তাহলে এত পথ পেরিয়ে এসে আর এ অঘটন ঘটত না।

বললাম, আমি এবিষয়ে তোমার সঙ্গে একমত বাসবী। এ ভুল আমরা প্রথমেই করে বসে আছি, আর তার জের হয়ত জীবনভোর আমাদের টানতে হবে।

বাসবী ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। আমি ফিরে তাকাতেই দেখি বাহাদুর বাগানের ওপার থেকে আমাকে সেলাম জানাচ্ছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমি নিজেকে বড় অসহায় মনে করলাম শ্রুতি। আমার মনে হল, বাহাদুরের সেলাম পাবার অধিকারটুকুও আমার নেই।

ঘরের ভেতর এসে নিজের উত্তেজনাকে দূর করার জন্যে আমি চুপচাপ একখানা চেয়ারে বসে রইলাম। ভুলে যেতে চেষ্টা করলাম সকালের ঘটনাটুকু। কিন্তু ভাবনার সামান্য ছিদ্রপথ ধরে সে অসামান্য আকার নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি আমার সেই প্রতিপক্ষের সঙ্গে মনে মনে তর্ক শুরু করে দিলাম। আমি চেষ্টা করেও তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম না। যখন আমার সমস্ত চিন্তাভাবনা উত্তপ্ত হয়ে উঠল তখন হঠাৎ বাইরে চোখ পড়ল। বাসবী বাংলোর পেছনের লনে বসে আছে। হাতে উল বোনার কাঁটা। সে গুনগুন করে গান গাইছে আর উল বুনছে। বিশ্বাস কর শ্রুতি নিজের ওপর ধিক্কার এল। ও যদি মুহূর্তে সব ভুলে গিয়ে স্বাভাবিক হতে পারে তাহলে আমিই বা পারবনা কেন। আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। হলিহকের ফোটা ফুলগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে ওদের রঙের বাহার দেখতে লাগলাম। ধীরে ধীরে কখন আমার মনের উত্তেজনা কমে এল। বাসবী একসময় আমার পাশ দিয়ে গ্যারেজে গিয়ে ঢুকল, আমি জানতে পারলাম না। ওর গাড়ি বের করার শব্দে চমকে তাকালাম। ও আমার পাশ দিয়ে ড্রাইভ করে চলে গেল। ওর গাড়িখানা পাহাড়ী বাঁকের ভেতর অদৃশ্য হলে নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হল। তাই একমুহূর্ত বাংলোয় অপেক্ষা না করে চলে এলাম এখানে।

এতক্ষণ কথা বলে জয়তিলক তার মনের ভারকে অনেকখানি লঘু করে ফেলল। সে থামলে শ্রুতি বলল, রাগ করে সকালের খাবার তো খেয়ে আসেননি, বসুন বারান্দার ওপর মোড়ায়, আমি অমলেট আর টোস্ট করে আনছি।

জয়তিলক বাধা দিল না, বরং বলল, দাও, তোমার হাতেই সকালের জলখাবারটা খেয়ে যাই।

শ্রুতি বলল, খুব সামান্য জিনিস, বাসবীদি আপনাকে কত ভাল ভাল সব খাবার খেতে দেন, আপনার মুখে কি এসব রুচবে?

জয়তিলক বলল, সবটাই তোমার ভুল হল শ্রুতি। অমলেট টোস্ট খুব সামান্য জিনিস নয়। আর জলখাবার কেন, কোন খাবারই কখনো তোমার বাসবীদি হাতে তুলে দেয়না।

শ্রুতি আর কথা না বলে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

বিকেল চারটেতে ফোন বেজে উঠল। চায়ের কাপ হাত থেকে নামিয়ে জয়তিলক ফোনটা ধরল। ওপার থেকে ভেসে এল বাসবীর গলা।

কে ? জয় ?

আমি জয় বলছি।

বাসবী পরিষ্কার গলায় বলল, শোন, আজ আমার বাংলোতে ফেরা হবে না। ড্রামার রিহার্সেল দিতে দিতে অনেক রাত হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। সবাই বারণ করছেন এত রাতে গাড়ি চালিয়ে ফিরতে।

জয়তিলক ফোন পেয়ে খুশি হল। বাসবী যে বিবেচনা করে ফোন করেছে এতেই তার সান্ত্বনা।

সে বলল, রাতে থাকছ কোথায়?

থাকার জায়গার অভাব নেই।

সেই মুহূর্তে ফোনের কাছে পুরুষ কণ্ঠের একটা চাপা আওয়াজ শোনা গেল। অস্পষ্ট, তবু 'মিসেস সেন' কথাটা কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে বাসবী ফোনে জানাল, মিসেস সেন বলছেন, কষ্ট করে তাঁর বাড়িতে থেকে যেতে।

জয়তিলক বুকের ভেতর একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল, রাতে এসে দরকার নেই, যেখানেই থাক সাবধানে থেক।

বাসবী ফোন রেখে দিল। জয়তিলক অন্য মনে ফোনটা নাড়াচাড়া করতে করতে এক সময় নামিয়ে রাখল। কতক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। একসময় মনে পড়তে চায়ের কাপটা মুখে তুলল, কিন্তু চা ততক্ষণে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

পায়ে পায়ে জয়তিলক যখন এসে পৌঁছল আউট হাউসের সামনে তখন তার কানে ভেসে এল কয়েকটা কথা। রাধামোহন বক্তা। শ্রোতা যে শ্রুতি সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না।

বাইরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে জয়তিলক ওদের কথাগুলো শুনতে লাগল।

রাধামোহন বলছেন, বিদ্যাসাগর বাল-বিধবাদের গোপন দীর্ঘশ্বাস কান পেতে শুনেছিলেন। বহু রমনীকে বিয়ে করে যারা পশুর মত ভোগে লিপ্ত থাকে তাদের তিনি দেখেছিলেন ঘৃণার দৃষ্টিতে। সারাজীবন অসহায় নারীদের হয়ে তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। তাই যদি মানুষ-রূপী কোন দেবতাকে নমস্কার করতে হয় তাহলে তিনি বিদ্যাসাগর। অন্য গুরু বা দেবতাকে নমস্কার করার আগে তাঁকে নমস্কার জানিও মা।

একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, রামমোহন সমস্ত নারী জাতির অন্যতম রক্ষাকর্তা। আগুনে যে সব মেয়েদের সঁপে দেওয়া হত তাদের আর্তনাদ তাঁর বুকে এসে বেজেছিল, তাই তিনি এই বীভৎস সতীদাহ প্রথা দূর করার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলেন। তাঁকে গুরু বলবে মা। যিনি অন্যায় থেকে, চরম বিপদ থেকে নারী জাতিকে উদ্ধার করলেন তিনিই তোমাদের গুরু। তিনিই তোমাদের উদ্ধারকর্তা, তাঁকে নমস্কার কর। ঠাকুর ঘর যদি থাকে, প্রতিষ্ঠা কর এই সব মূর্তি। যাঁরা কল্পনার দেবতা নন, প্রত্যক্ষ দেবতা।

জয়তিলক জানে, রাধামোহন শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বের বিকাশ যাঁর মধ্যে দেখেন তাঁকেই দেবতা জ্ঞানে পুজো করেন। তাঁর ঘরে রামকৃষ্ণ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি টাঙানো। তিনি তাঁদের গ্রন্থ পাঠ করেন, আর শয়নে, উপবেশনে, উত্থানে তাঁদের দিকে তাকিয়ে গভীর প্রেরণা লাভ করেন।

শ্রুতির গলা শোনা গেল, শুনেছি, প্রথম জীবনে আপনার সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সংযোগ ছিল।

রাধামোহন বললেন, তখন দেশ স্বাধীন করব ইংরাজ হটিয়ে এই ছিল আমাদের ধ্যান জ্ঞান। আজকের রাজনীতির ছলাকলা সেদিন আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা ছিল।

শ্রুতির আবার প্রশ্ন, শিক্ষকতা শুরু করলেন কিভাবে?

রাধামোহন বললেন, একসময় এক সর্বত্যাগী গাঁয়ের মানুষের কাছ থেকে ডাক পেলাম। তিনি বলে পাঠালেন, আমার শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত দিয়ে আমি একটি জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছি, তুমি যদি তার হাল ধর তাহলে আমাদের কিশোর তরুণদের মেরুদণ্ডটা তৈরী হয়।

মানুষটির চরিত্র আমাকে বহুদিন থেকে আকৃষ্ট করেছিল, আমি সন্ত্রাসবাদ থেকে সরে এলাম মানুষ গড়ার ব্রত নিয়ে।

শ্রুতি বলল, আপনি একদা কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, মিসেস মিত্রের বাবা নাকি একসময় আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি কি আপনার সন্ত্রাসবাদী বন্ধু ছিলেন?

হা হা করে হেসে উঠলেন রাধামোহন। বললেন, বৌমার বাবা ভীমচরণ নামেই ছিল ভীম, আসলে ওর মত ভীতু বড় একটা কেউ ছিল না। ও ছিল ধনী বাড়ির ছেলে, ইংরেজ ভক্ত। সে যুগে ওর বাবা ইংরেজদের সঙ্গে খাতির জমিয়ে গ্রীন ভ্যালি টি-এস্টেটের মালিক হয়েছিলেন। ইংরেজদের সঙ্গেই ছিল তাঁর ওঠা বসা।

শ্রুতি কথার মাঝে বলল, এমন বাড়ির ছেলের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা হল কি করে বাবা?

ভীম যখন কলেজের ছাত্র তখন আমি ওর সহপাঠী, আর ঠিক সেই সময় ওর বাবা মারা যান। ওর মা ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহিলা। তিনি সমস্ত এস্টেটের হাল ধরেন। ভাল ছাত্র ছিলাম বলে ভীম তার পড়ার সঙ্গী হিসেবে আমাকে ওদের বাড়ি নিয়ে যেত। ওখানে আমরা পড়াশোনার বিষয় নিয়ে

আলোচনা করতাম। ওর মা আমাকে নিজের ছেলের মত যত্ন করে খাওয়াতেন। সেই থেকে ও বাড়ির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা।

মিসেস মিত্রের বিয়ের প্রস্তাবটা নিশ্চয়ই ওঁর বাবার কাছ থেকে এসেছিল।

তা তো নিশ্চয়ই। কলেজ জীবনের পর নানা ঘাত প্রতিঘাতে আমি ভীমচরণের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। বহু বছর ভীমচরণের সঙ্গে আমার কোন সংযোগ ছিল না। যেমন শৈশবের বহু বন্ধুই হারিয়ে যায়, জীবনের শেষ পর্বগুলিতে ভীমচরণ তেমনি ধীরে ধীরে মুছে গিয়েছিল আমার মনের থেকে। হঠাৎ বছর কয়েক আগে আমি ওর একখানা চিঠি পেলাম। ঐ চিঠিতেই ছিল বাসবীর সঙ্গে জয়তিলকের বিয়ের প্রস্তাব। বিশেষ অনুরোধের আকারে সে প্রস্তাবটা এসেছিল।

শ্রুতি বলল, দাদার সঙ্গে কি ঐ পরিবারের জানাশোনা ছিল?

আমার কাছে চিঠি পাঠানোর আগে পর্যন্ত ছিল না। তবে ভীমচরণ একটি সূত্রে জয়তিলকেব খোঁজ পেয়েছিল।

রাধামোহন বললেন, জয়ের কলেজের এক ছাত্রীর সঙ্গে বাসবীদের বাড়ির যোগ ছিল। একদিন ভীমচরণ তার মুখে জয়ের প্রশংসা শোনে। তারপর থেকেই সে নানাসূত্রে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারে জয়ের ছাত্রজীবনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে। শেষে বংশ পরিচয়ও বেরিয়ে যায়। ভীমচরণ জয়ের সঙ্গে আগে যোগাযোগের চেষ্টা না করে আমাকেই সরাসরি চিঠিখানা লেখে। শ্রুতি, আজ তোমাকে আমার মনের কথাটা খুলে বলছি। আমি ভীমচরণের মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দেবার ব্যাপারটা নিয়ে বড় বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। আমরা যে আদর্শে মানুষ হয়েছি, ভীমচরণের পরিবার তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ধনী সমাজের রীতিনীতি চাল চলনই আলাদা। তার ওপর ভীমচরণের একটিমাত্র মেয়ে। সে আবাল্য ইংরেজী আবহাওয়ায় মানুষ। আমার ছেলের সঙ্গে বনিবনা হবে কিনা, সে নিয়ে ছিল আমার সংশয়। কিন্তু ভীমচরণের দ্বিতীয় চিঠি এসে আমার সব চিন্তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ভীমচরণ লিখেছিল, আমি হঠাৎ এমন এক রোগের শিকার হয়েছি, যার হাত থেকে আমার পরিত্রাণ নেই। আমার মৃত্যুর আগে তোমার মতটুকু জেনে যেতে চাই। অতি দ্রুত এবং অসংকোচে লিখে জানাও।

ভীমচরণকে সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখে জানালাম, আমার মতামতের কোন প্রশ্নই নেই, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হলে আমি খুশি হব।

বিয়ে হয়ে গেল। ভীমচরণের ইচ্ছায় কলেজের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে জয় এল টি-এস্টেটের কাজ দেখা শোনা করতে। ইতিমধ্যে দুরারোগ্য ক্যান্সারে মারা গেল ভীমচরণ। আমি এখন পঙ্গু হয়ে এসেছি ছেলে বউ-এর সংসারে। ওদের যত্নের ত্রুটি নেই। 'তুমি নিয়েছ সেবার ভার। এর চেয়ে শান্তির আর কি হতে পারে।

একটু থেমে বললেন রাধামোহন, আমার দুঃখ শুধু এই, জয় এখনও সন্তানের মুখ দেখলনা।

শ্রুতি হেসে বলল, নাতি-নাতনীর মুখ দেখতে না পেয়ে আপনারই কষ্ট হচ্ছে বলুন। ওঁদের তো মোটে তিন বছর বিয়ে হয়েছে।

রাধামোহন বললেন, আমি যে ঐ মেঘের আড়াল থেকে বার বার ঘণ্টার ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি মা।

শ্রুতি বলল, এত সহজে চলে যাওয়া যায়না বাবা। মেয়ে বলে যখন ডেকেছেন তখন মেয়ের হাতের পরিপূর্ণ সেবা আপনাকে ভোগ করে যেতে হবে। সেবায় আমার শান্তি এলে তবে তো আপনার ছুটি।

রাধামোহন শুধু বললেন, তোমার সেবাই আমাকে বেঁধে রেখেছে মা।

জয়তিলক বাইরে থেকে পায়ে পায়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মুখে হাসি টেনে বলল, বাবার কি বিকেলের সেবা হয়ে গেছে? এই চা কিংবা ফ্রুটজুস?

রাধামোহন হেসে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, বলনা, এখানে আর একবার চা কিংবা ফলের রস খাবি।

জয়তিলক বাবার বিছানার এক প্রান্তে বসে বলল, যে-হারে স্বাস্থ্যবৃদ্ধি হচ্ছে তাতে ফলের রস খেয়ে আর কাজ নেই, তার চেয়ে শ্রুতি যদি এক কাপ কড়া চা খাওয়াতে পারে তাহলে আরাম পাই।

শ্রুতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, শুধু চা? সঙ্গে আর কিছু?

জয়তিলক বলল, না, বেশি লোভ দেখালে রোজ রোজ সকাল বিকেলে এখানে চায়ের আসরে আসতে হবে।

শ্রুতি বলল, এলেই তো পারেন, বাবার সঙ্গে গল্পও হবে আর আনাড়ী হাতের চা-পানও হবে।

তাহলে আর দেখতে হবে না। বেচারা কোশী মংগনীর মাইনের টাকা ছাঁটাই হয়ে যাবে।

শ্রুতি বলল, তা কেন হবে। ও তো রান্নার জন্যে হোল টাইম নিযুক্ত।

জয়তিলক হেসে বলল, বেশি কাজে যা মাইনে কম কাজে কি সে মাইনে হতে পারে? কোশীর কাজ কমলে মাইনেও কমবে।

শ্রুতি বলল, বেশ, কোশীর যে মাইনে কাটবেন সেটা আমার হাতে দেবেন চা খাওয়া বাবদ। তারপর কোশীর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হবে।

জয়তিলক এবার রাধামোহনের দিকে তাকিয়ে বলল, অনেক বুদ্ধি হয়েছে আপনার মেয়ের। রুক্মীকে ছুটি করে দিয়ে নিজের হাতে তার কাজ করে নিচ্ছে। জানিনা তার সঙ্গে টাকার বখরা আছে কিনা। এদিকে আবার কোশীর সঙ্গে বোঝাপড়ার তাল করছে।

শ্রুতি খিলখিলিয়ে হেসে উঠে বলল, আপনিও ভাগ পাবেন মশাই। মাপ দিয়ে যাবেন, একটা ভাল সোয়েটার বুনে দেব।

বলতে বলতে শ্রুতি দ্রুত পায়ে চা তৈরীর জন্যে রান্না ঘরের দিকে চলে গেল।

প্রাণোচ্ছল প্রসন্ন মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জয়তিলকের মন খুশি হয়ে উঠল।

রাধামোহন বললেন, খোকা, ও একাই আমার নিঃসঙ্গতাকে ভরিয়ে রেখেছে। আমি যাতে একটুও অসহায় বোধ না করি সেজন্যে সারাদিন ওর চেষ্টার ত্রুটি নেই।

একটু থেমে আবার বললেন, মাদার টেরিসার ওপর একখানা বই বেরিয়েছে। 'রূপা'র বুক নিউজে ওটা দেখেছিলাম। তুমি বইটা রেজিস্ট্রি ডাকে আমাকে আনিয়ে দাও। আমি কথায় কথায় জেনেছি, বৈশাখ শ্রুতির জন্মমাস। ওকে বইখানা প্রেজেন্ট করতে চাই।

জয়তিলক হিসেব করে বলল, সময় আছে হাতে। কালই অর্ডার দিচ্ছি। ডাকে ঠিক সময়ে এসে যাবে।

বিকেলে চা-পর্বের পর রাধামোহন পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্যাস্ত দেখেন। সে সময় ঘরের পশ্চিমের বারান্দায় তাঁকে নিয়ে গিয়ে ইজিচেয়ারে বসিয়ে দিতে হয়। হাতের কাছে থাকে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী। ইচ্ছে হলে আপন মনে কিছু পড়েন। না হলে পাহাড়ের চূড়ায় সমারোহপূর্ণ সূর্যাস্তের দিকে নির্নিমেষ চেয়ে থাকেন। ঐ সময়টুকু রাধামোহনের ধ্যানের লগ্ন। তিনি বলেন, সূর্যের অয়ন পথই মানুষের জীবনের চলার পথ। তার উদয়, তার অস্ত, তার সমারোহপূর্ণ আকাশ পরিক্রমা, সবই মানুষের অনুকরণীয়।

তিনি দেড় দু'ঘণ্টা সময় একা একা বসে থাকেন। সন্ধ্যার ছায়া সামনের পাহাড়, অরণ্যকে একেবারে ঢেকে না ফেলা পর্যন্ত তিনি ঘরের ভেতর আসেন না। এ সময়টুকু কাছে থাকে রুক্মী। ঠিক কাছে নয়, ঘরের মধ্যে। একান্ত প্রয়োজনে যাতে সাহায্যে আসতে পারে। শ্রুতির ছুটি এই দেড় দু'ঘণ্টা কাল। ইচ্ছেমত বাজার অথবা বেড়াতে যাবার এইটুকু তার অবকাশ।

রাধামোহনকে পশ্চিমের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হল। জয়তিলক আর শ্রুতি সরে এল সেখান থেকে।

শ্রুতি সিঁড়ি বেয়ে লনে নেমে এসে বলল, কোথায় যাবেন?

জয়তিলক হেসে উত্তর করল, আমি যেদিকে যাব তার উল্টো দিকে তুমি যাবে তো?

ও মা, তা কেন! আমি বুঝি ঐ ভেবে জিজ্ঞেস করলাম।

এবার তাহলে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তুমি কোনদিকে যাবে?

শ্রুতি চোখ দুটো আকাশের দিকে তুলে মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, জানিনা।

জয়তিলক বলল, তাহলে চল দুজনে নিরুদ্দেশের পথে ঘণ্টা দুয়েক ঘুরে বেড়াই।

চুপ করে কিছু সময় জয়তিলকের মুখের দিকে চেয়ে শ্রুতি বলল, বাংলোতে বাসবীদি বসে আছেন। আপনি গেলে গাড়ি করে হাওয়া খেতে বেরোবেন।

তোমার বাসবীদি এখন ইন্ডিয়ার ত্রি-সীমানায় নেই। তিনি এখন ভেনিস অথবা সাইপ্রাসে।

মস্ত বড় বড় দুটো চোখ পুরো ঝিনুকের মত খুলে দিয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল শ্রুতি।

জয়তিলক বলল, বিশ্বাস হচ্ছে না।

শ্রুতি বোকার মত মুখভঙ্গী করে মাথা আস্তে আস্তে দোলাতে দোলাতে জানাল, সে একটুও বিশ্বাস করতে পারছেনা।

তবে আমি মিথ্যে বলছি?

এবারও শ্রুতি মাথা দোলাতে দোলাতে জানাল, সে জয়তিলককে অবিশ্বাসও করতে পারছেনা।

জয়তিলক বলল, দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট না করে চল পাইন বনের দিকে পা চালাই।

সত্যি বলছেন, বাসবীদি ভেনিসে রওনা হয়ে গেছেন?

চল, পাইন বনে বেড়াতে বেড়াতে বলব।

ওরা বেলা শেষের পাইন বনে এসে ঢুকল। চলাচলের পথ এড়িয়ে ওরা এল এমন একটি জায়গায় যেখানে পাথরের চাঁইকে ধুয়ে মসৃণ করে দিয়ে বয়ে চলেছে একটি ঝর্ণা। ওরা পাথরের শুকনো প্রান্তে এসে পাশাপাশি বসল। হঠাৎ শ্রুতি ছেলেমানুষের মত উঠে দাঁড়িয়ে পাইন গাছের ফাঁকে উঁকি দিয়ে ঢেউ খেলান সবুজ উপত্যকা দেখতে লাগল।

জয়তিলকের মনে হল, শ্রুতি যেন 'দ্য স্টোরি অব দ্য লরেল' এর ডেফনে।

পরমা সুন্দরী ডেফনে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল একটি বৃক্ষ। চির সবুজ লরেল বৃক্ষে। শ্রুতিও ঠিক তাই।

কি অত ভাবছেন?

শ্রুতির কথায় চমক ভাঙল জয়তিলকের। বলল, নারীর সঙ্গে বৃক্ষের কত সাদৃশ্য তাই ভাবছিলাম।

আপনার অদ্ভুত সব পরিকল্পনা।

অদ্ভুত নয় শ্রুতি, একটু চিন্তা করলেই সাদৃশ্যটা ধরতে পারবে। বৃক্ষের শাখা পাখির আশ্রয়। নারীর বাহু পুরুষের আশ্রয়। শুধু পুরুষের নয়, প্রার্থিতকে সে দুটি বাহুর সেবায় ধন্য করে। বৃক্ষের শ্যাম-পত্র-সমারোহ নারীর লাবণ্য শ্রীকে মনে করিয়ে দেয়। বৃক্ষের পুষ্প, নারীর বিশ্ববিমোহিনী সৌন্দর্য ও সৌগন্ধ। আর বৃক্ষের ফলসম্ভার, নারীর সৃষ্টিশক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ।

শ্রুতি বলল, চমৎকার সাদৃশ্য কল্পনা করেছেন তো আপনি!

মনে এল, তাই তোমাকে বললাম। আর এই মনেআসার পেছনে কাজ করছে একটি রূপকথার গল্প।

শ্রুতি এই মুহূর্তে কিশোরী হয়ে গেল, বলুন না গল্পটা। দারুণ ভাল লাগে আমার গল্প শুনতে।

বলতে বলতে সে জয়তিলকের মুখোমুখি বসে মুগ্ধ শ্রোতার মত তার দিকে চেয়ে রইল।

জয়তিলক বলল, গল্প শুনতে গেলে কিন্তু তোমার বেড়ান হবেনা।

শ্রুতি বলল, তা কেন হবে না। গল্পের ভেতরেও তো বেড়ানোর জায়গা আছে।

জয়তিলক হেসে বলল, তোমার অসাধারণ ক্ষমতা আছে দেখছি, বিছানায় শুয়ে শুয়েও বেড়াতে পার।

শ্রুতি অমনি হেসে উঠে বলল, স্বপ্নে আর কল্পনায়।

জয়তিলক বললে, যখন এত বুদ্ধি তোমার তখন গল্প তোমাকে শোনাতেই হয়। শোন।

একদিন এক বনের ধারে প্রেমের দেবতা কিউপিডের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সূর্যদেবতা অ্যাপোলোর। দুজনেরই হাতে তীরধনু, দুজনেই রূপবান।

অ্যাপোলো কিউপিডের তীরধনুর দিকে চেয়ে বলল, ওসব কতকগুলো কি কাঁধে বয়ে নিয়ে বড়াচ্ছো? কোনদিন তো একটা খরগোসকেও মারতে দেখলাম না। ও দিয়ে কি হয়? এই দেখ না আমার তীরধনু। এক্ষুনি মেরে এলাম একটা বিরাট ভয়ঙ্কর জন্তু।

কিউপিড বিদ্রূপ হজম করার পাত্র নয়। তার তীরের মোহিনী শক্তি। দু'রকমের তীর থাকে তার তূণীরে। সীসের তৈরী আর সোনার তৈরী। সীসের তৈরী তীর যাকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়, তার অন্তরে হঠাৎ জেগে ওঠে মানুষের প্রতি বিতৃষ্ণা আর সোনার তৈরী তীরের আঘাত খেলেই মানুষ প্রেমে পাগল হয়ে যায়।

কিউপিড দেখল বনের ধার দিয়ে চলেছে সুন্দরী এক বনপরী। ভারী মিষ্টি তার নাম,—ডেফ্‌নে।

কিউপিড অমনি তাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ল সীসের তীর। কী আশ্চর্য! যেন শিরশিরে শীতের হাওয়ায় সে থরথরিয়ে কেঁপে উঠল।

ডেফ্‌নে ফিরে তাকাতেই চোখাচোখি হল অ্যাপোলোর সঙ্গে। মুহূর্তে ডেফ্‌নের অন্তর রূপবান অ্যাপোলোর ওপর বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বনের ভেতর পালাতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে কিউপিড আর এক কাণ্ড করে বসল। সে অ্যাপোলোর বুক লক্ষ্য করে ছুঁড়ল সোনার তীর। অ্যাপোলো তীরের ঘা খেয়ে মুহূর্তে সমুদ্রের ঢেউ-এর মত ভালবাসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সে সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করল ডেফ্‌নের পেছনে। একজন ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে, অন্য জন তাকে পাওয়ার জন্য ধাওয়া করে চলেছে। অ্যাপোলো বলছে, শোন, শোন, আমি সূর্যের দেবতা, আমি তোমাকে ভালবাসি। আমার থেকে তোমার ভয় পাবার কিছু নেই।

অ্যাপোলো যত ভালবাসার কথা চেঁচিয়ে ঘোষণা করতে লাগল, ডেফ্‌নে ততই ভয় পেয়ে দৌড়তে লাগল।

শেষে ওরা এসে পৌঁছল বনের প্রান্তে এক নদীর ধারে। অ্যাপোলো এখন ডেফ্‌নের অনেক কাছে এসে পড়েছে। কিন্তু ঐ নদীটি ছিল ডেফ্‌নের বাবা। ডেফ্‌নে চীৎকার করে বলতে লাগল, বাবা আমাকে বাঁচাও। আমার এ দেহটা যাতে ও ছুঁতে না পারে সে ব্যবস্থা তুমি করে দাও।

ডেফ্‌নের বাবা মেয়ের প্রার্থনা শুনে সঙ্গে সঙ্গে তাকে একটি বৃক্ষে রূপান্তরিত করে দিলেন।

ডেফ্‌নের কোমল ত্বক হয়ে গেল গাছের বাকল। তার দুটো চঞ্চল পা মাটির ভেতর শেকড় হয়ে আটকে রইল। তার হাত দুটি হয়ে গেল বৃক্ষের প্রসারিত শাখা। আর ডেফ্‌নের চমৎকার কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ শাখায় সবুজ পল্লবের রূপ ধরে বায়ু হিল্লোলে আন্দোলিত হতে লাগল।

থামল জয়তিলক। শ্রুতি জয়তিলককে থামতে দেখে বলল, তারপর?

তারপর আবার কি, গল্প শেষ।

বাঃ, বেচারা অ্যাপোলোর কি হল বললেন না তো?

অ্যাপোলোর জন্যে মন কেমন করছে বুঝি?

শ্রুতি জোর গলায় বলল, আপনিই বলুন না তার অন্যায়টা কোথায়? সে ডেফ্‌নেকে ভালবেসেছে বৈ তো নয়।

জয়তিলক বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি যখন এত করে অ্যাপোলোর পক্ষে সুপারিশ করছ তখন সে বেচারার জন্যে একটা পুরস্কার বরাদ্দ করা যাক্।

শ্রুতি গম্ভীর গলায় বলল, পুরস্কারটা কি শুনি।

জয়তিলক বলল, ডেফ্‌নে হয়ে গেল একটি লরেল বৃক্ষ। আর অ্যাপোলো সেই বৃক্ষটিকে জড়িয়ে ধরে বলল, হে আমার ভালবাসার ধন, যখন তোমাকে আমার স্ত্রীরূপে আর কাছে পেলাম না তখন

তুমি হবে আজ থেকে আমার প্রিয় বৃক্ষ। তোমার শ্যামল পাতা শোভা পাবে আমার মুকুটে। শুধু তাই নয়, আজ থেকে বিজয়ী বীরের বিজয়-চিহ্ন হয়ে তুমি স্থান পাবে তার শিরে।

জয়তিলক থামলে শ্রুতি বলল, গাছ হয়েও তো ডেফ্‌নে জিতে গেল। আমি যদি অ্যাপোলো হতাম তাহলে ঐ গাছটাকে কেটে মূলসুদ্ধ উপড়ে ফেলে দিতাম।

জয়তিলক বলল, ভালবাসার ক্ষেত্রে পুরুষ পাগল। অপমানকে সে তুচ্ছ মনে করে। শুধু তার ভালবাসার পাত্রীকে সে গৌরবান্বিত করতে চায়।

শ্রুতি অন্য কথায় এল, কাহিনীটি কোন দেশের?

জয়তিলক বলল, যে সব দেশে তোমার বাসবীদি এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে সেইসব দেশের। গ্রীস আর রোমের উপকথার ভেতরেই রয়েছে এই গল্পটি।

শ্রুতির ভুলে যাওয়া একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। সে অমনি বলে উঠল, ওহো, একেবারে ভুলে বসেছিলাম। আপনি না পাইন বনে বেড়াবার সময় বাসবীদির ভেনিস যাবার কথা বলবেন বলেছিলেন?

জয়তিলক বলল, কথাটা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু এখন তো আমরা বেড়াচ্ছি না, বসে আছি, তাই তোমার বাসবীদির ভেনিস প্রসঙ্গ উঠছে না।

হঠাৎ চঞ্চল কিশোরীর মত উঠে দাঁড়িয়ে জয়তিলকের দুখানা হাত খপ করে ধরে টানতে টানতে তুলল শ্রুতি। চলুন, চলুন এবার পাইন বনে পা চালাই, আর বলুন বাসবীদির গল্প।

জয়তিলক শ্রুতির এই ছেলেমানুষীতে কিছু মনে করল না, বরং খুশিই হল।

ওরা কখনো পাশাপাশি কখনো বা সামনে পেছনে চলছিল। ওদের শরীরের ওপর আলোছায়ার আঁকিবুকি। হালকা হলুদ একখানা শাড়ি আর সাদা ব্লাউজে শ্রুতিকে বনের ভেতর হঠাৎ আলোর ঝলকের মত মনে হচ্ছিল।

জয়তিলক শ্রুতির মুখের দিকে বার বার চেয়ে চেয়ে দেখছিল। একটি সজীব সুন্দর মুখ। যেমন স্বচ্ছ তেমনি গভীর। মনের ভাবনার কোন জটিল আবর্ত রেখা ফেলেনি ঐ কোমল-লাবণ্যভরা মুখখানার ওপর।

জয়তিলক এক সময় বলল, এতক্ষণে তোমার শোনার অধিকার জন্মেছে শ্রুতি।

শ্রুতি হেসে বলল, বোধহয়। কারণ বেশ কিছু পথ আমরা বনের ভেতরে হেঁটে এসেছি।

কথা বলা শেষ করেই চঞ্চল হয়ে উঠল শ্রুতি। মুখে আঙুল দিয়ে জয়তিলককে কথা বলতে বারণ করে চুপি চুপি পা ফেলে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। এবার বসে পড়ে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল জয়তিলককে। জয়তিলক কাছে যেতেই শ্রুতি তাকে ইংগিতে বসে পড়তে বলল। সামনে একটা মাকিমা গাছ। লম্বা লম্বা সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে গুচ্ছ গুচ্ছ বেগুনী ফুল ফুটে আছে। একটা ঝুঁটিওলা ছোট্ট জুরেলি পাখি টুই টুই লিক্, টুই টুই লিক্ শব্দ করতে করতে নেচে নেচে গাছটাব এদিক ওদিক ঘুরছে।

নির্জন নিঃশব্দ বনস্থলীতে মধুর মত চুঁইয়ে পড়ছে শেষ বেলার আলো, আর তারই মাঝে ফুটে উঠেছে প্রকৃতির এক টুকরো ছবি।

পাখি একসময় উড়ে গেল, ছায়া নামল পাইন বনে। দুটি মুগ্ধ দর্শক উঠে দাঁড়িয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। ওদের মুখে আশ্চর্য এক খুশির ছায়া।

শ্রুতি বলল, দেখুন তো কত দেরী হয়ে গেল। বাবা অনেকক্ষণ একলাটি বসে রয়েছেন, চলুন ফেরা যাক্।

দ্রুত পা চালিয়ে চলতে চলতেই বলল, এখন বলুন ভেনিস যাত্রার কথা।

তুমি যে দেখছি কোন কিছুই ভোল না শ্রুতি!

হ্যাঁ, শুনুন, একটা কথা ভুলে গিয়েছিলাম! এই যে আমরা এতক্ষণ বসে বসে পাখির নাচ আর ফুল ফোটা মাকিমা গাছ দেখলাম, এর মানেটা কি?

চলতে চলতে জয়তিলক বলল, এর আবার মানে আছে নাকি। ও তো একটা ছবি।

শ্রুতি বলল, মিথ্যে আপনি প্রফেসারি করেছেন। বেশী পড়লে বুদ্ধি ক্ষয়ে যায়।

জয়তিলক ভারী গলায় বলল, মানছি।

শ্রুতি বলল, ওটা আপনার গল্পের ছবি। ডেফ্‌নে হল ঐ মাকিমা গাছ। নিজের রূপের গর্বে চুপ রে দাঁড়িয়ে আছে। আর শুধু তাই নয়, ঘন বনের আড়ালে নিজেকে লুকিয়েছে।

জয়তিলক বলল, এবার বুঝেছি, ঐ ঝুঁটিওলা জুরেলি পাখিটা অ্যাপোলো। ও ডেফ্‌নেকে ঘিরে নচে চলেছে।

শ্রুতি উল্লসিত হয়ে উঠল, দারুণ বলেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে গলা নামিয়ে অভিযোগের সুরে বলল, বাসবীদির ভেনিস যাত্রার গল্পটা বেমালুম চেপে গেলেন তো?

জয়তিলক হেসে উঠে বলল, আমি চেপে গেলুম! তা ভালই বলেছ, ওটা গল্পই বটে। তোমার বাসবীদি ওথেলো নাটকে ডেসডেমোনার পার্ট করছে। এখন রিহার্সেল চলছে অ্যাসোসিয়েশনের ক্লাব ঘরে।

কি মিথ্যুক আপনি, তাহলে যে বললেন, বাসবীদি এখানে নেই, ভেনিসে গেছেন, —শ্রুতির গলায় তীব্র প্রতিবাদের সুর।

জয়তিলক বলল, মিথ্যে আমি বলিনি, ভেনিসের মাটিতেই ওথেলো নাটকের শুরু। তাই বলছিলাম, এখন তোমার বাসবীদি ভেনিসেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শ্রুতি বলল, সত্যিই আপনার কাছে বোকা বনে গেলাম। এ ধাঁধার উত্তর দেবার সাধ্য কি আমার? তবে দারুন মেয়ে বাসবীদি। একেই বলে প্রতিভা!

আউট হাউসের কম্পাউণ্ডে ওরা এসে পড়ল। দূর থেকে দেখল রাধামোহন তখনও স্থির দৃষ্টিতে পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছেন। ওরা পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে আসতেই শুনতে পেল রাধামোহনের গলায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার আবৃত্তি। মগ্ন হয়ে রাধামোহন উচ্চারণ করছেন :—

‘কতবার মনে করি পূর্ণিমা নিশীথে
স্নিগ্ধ সমীরণ,
নিদ্রালস আঁখি-সম ধীরে যদি মুদে আসে
এ শ্রান্ত জীবন।
গগনের অনিমেষ জাগ্রত চাঁদের পানে
মুক্ত দুটি বাতায়ন দ্বার—
সুদূরে প্রহরে বাজে, গঙ্গা কোথা বহে চলে,
নিদ্রায় সুষুপ্ত দুই পার।
মাঝি গান গেয়ে যায় বৃন্দাবন গাথা
আপনার মনে,
চির জীবনের স্মৃতি অশ্রু হয়ে গলে আসে
নয়নের কোণে।
স্বপনের শরীর স্রোতে দূরে ভেসে যায় প্রাণ
স্বপ্ন হতে নিঃস্বপ্ন অতলে,
ভাসানো প্রদীপ যথা নিবে গিয়ে সন্ধ্যা বায়ে
ডুবে যায় জাহ্নবীর জলে।’

তিন

প্ল্যানটার্স অ্যাসোসিয়েশানের ক্লাব হাউসটা প্রথমে যাঁরাই প্রতিষ্ঠা করুন না কেন, তাঁদের ভেতর অনেকেই আজ আর ইহলোকে নেই। কিন্তু ক্লাবের স্থান নির্বাচনে তাঁরা যে আশ্চর্য শিল্পবোধের পরিচয় রেখে গেছেন তা তারিফ করার মত। ঢেউখেলানো টি-গার্ডেন, ভ্যালির সবুজ সমুদ্রে নেমে গেছে। ঐ ভ্যালির প্রায় মাঝখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটি উঁচু টিলা। টিলার সারা দেহ চিত্রিত। মখমল সবুজ একটা আলোয়ানে জড়ান তার শরীর। তাকে শ্বেত একটা অজগর যেন পাকে পাকে জড়িয়ে রেখেছে। পথের ধারগুলো সাদা পাথর দিয়ে বাঁধান। তাই দূর থেকে এমনি একটা ছবি ফুটে ওঠে। কাছে গেলে পাক দেওয়া পথের ধারে পাইনের সারি যেন ভি, আই, পি দের অভিবাদন জানাবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। বাংলোটা ঠিক টিলার চূড়ায়। সামনের দুদিকে দুটি অর্ধচন্দ্রাকার লন। ধারে ধারে মরশুমি ফুলের কারুকার্য। কোন অনুষ্ঠানে লনের ওপর চিত্রিত চন্দ্রাতপ টাঙান হয়। লনে সারি সারি পেতে দেওয়া হয় লাল গদি আঁটা সাদা রঙের চেয়ার। বাংলোর একটি পাশ দিয়ে উত্তরের দিকে তাকালে কয়েকটি পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গের বেশ খানিকটা অংশ চোখে পড়ে। সব চেয়ে যা চোখের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে তা হল তিস্তার রূপ। লনে বসে সকাল সন্ধ্যায় শুধু তিস্তার দিকে চেয়ে থাকলেই চোখ জুড়িয়ে যাবে। পাহাড় বেয়ে শিরা উপশিরার মত জলধারা গড়িয়ে পড়েছে তিস্তার প্রবাহে। তিস্তা কখনো রূপো, কখনো সোনা, আবার কখনো বা গলিত তামার মত রূপ নিচ্ছে। সূর্যের আলোর সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে তার রঙ।

বাঁ দিকে কাঁচের ঘরে রিহার্সেল চলেছে। আলোয় আলোয় বাংলো বাড়িখানা যেন ইন্দ্রলোক।

কাঁচের ঘরের উঁচু সিলিং থেকে ঝুলছে আধুনিক ডিজাইনের ঝাড়লণ্ঠন। আলোটা হাল্কা হলুদ।

ডিউকের সামনে দাঁড়িয়ে ব্রাবান্‌সিও। কাতর ব্রাবান্‌সিও বলে চলেছে, কেমন করে মহামান্য ডিউকের প্রিয় সেনাপতি মুর ওথেলো কোমলমতি কন্যাটিকে যাদু করে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেছে।

ডিউকের সামনে দাঁড়িয়ে ওথেলো। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

ডিউক হঠাৎ ওথেলোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তার দিক থেকে এ বিষয়ে কিছু বলার আছে কিনা।

ওথেলো গলায় আবেগ ঢেলে বলতে লাগল, কেমন করে মাননীয় সিনেটার ব্রাবান্‌সিওর গৃহে সে যাতায়াত করত আর উত্তপ্ত আতিথ্য পেত। ব্রাবান্‌সিওর কন্যা ডেসডেমোনা ধীরে ধীরে কেমন করে তার গুণমুগ্ধ হয়ে উঠল। আশৈশব তাকে কঠিন সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে, আর যুদ্ধ করতে করতেই সে আজ লাভ করেছে এই মহান দেশের সেনাপতির পদ। তার মুখে এসব সংগ্রামের কাহিনী শুনে ডেসডেমোনা বলেছিল, যদি তোমার কোন বন্ধু আমার ভালবাসা পেতে চায় ওথেলো তাহলে তাকে বলো, সে যেন আমার কাছে শুধু তোমার বীরত্বের কাহিনীই বর্ণনা করে যায়।

এরপর কোন প্রেমিকেরই বুঝতে বাকি থাকে না যে ডেসডেমোনা অন্তরে কাকে চায়।

ওথেলোর দীর্ঘ আত্মকাহিনী শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কূটচক্রী ইয়াগো ডেসডেমোনাকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকল ডিউকের বিচার সভায়।

ওথেলোর ভাষণে অভিভূত ডিউক বলতে যাচ্ছিলেন, এই কাহিনী শুনলে ব্রাবানসিও, কেবল তোমার কন্যা নয়, আমার কন্যাও ওথেলোকে হৃদয় দান করে বসত।

কথাটা আর বলা হল না। ওসেন ব্লু রঙের ম্যাক্সি পরিহিতা বাসবী ডেসডেমোনার ভূমিকায় ডিউককে অভিবাদন জানাতেই ডিউক উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে উঠলেন, আজ একি রূপে দিলে দরশন! বৃদ্ধ তরুটিও যে তোমাকে দেখে মঞ্জরিত হয়ে উঠতে চাইছে। ঐ ব্যাটা আফ্রিকার কৃষ্ণকায় মুরটা তোমাকে লাভ করবে, এ আমি প্রাণ থাকতে কেমন করে সইব। তার চেয়ে সোম যদি আমার সঙ্গে লড়াই-এ নামতে চায়, অমি রাজি আছি।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ডিউকরূপী অনিমেষ তরফদার ওথেলোর দিকে ডান হাতখানা প্রসারিত করে বললেন, দিগন্ত সোম জেনে রাখ, 'এই পৃথিবীর মধ্যে আয়েষার প্রণয়াকাঙ্খী দুই ব্যক্তির স্থান হয় না। একজন এইস্থানে প্রাণত্যাগ করিব।'

বাসবী কাঁদো কাঁদো গলায় চেঁচিয়ে উঠে বলল, মাটি করে দিলেন তো আমার মুডটাকে। কতক্ষণ ধরে ও ঘরে বসে ডেসডেমোনার পার্টটা নিয়ে ধ্যান করছিলাম। ঢুকেই ছিলাম সেই মুড নিয়ে, সব এখন ভেস্তে গেল।

অনিমেষ তরফদার, চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, স্যরি বাসবী, এক্সট্রিমলি স্যরি, তোমাকে দেখে আমি স্থির থাকতে পারিনি। এখন চালিয়ে যাও।

বাসবী বাঁ চোখটা কুঁচকে মিষ্টি একটু হেসে তাকাল ডিউকের দিকে। তারপর পিতা ব্রাবানসিওর কথার জবাবে বলতে লাগল, একদিকে সে যেমন একজনের কন্যা অন্যদিকে তেমনি একজনেব সহধর্মিনী। দুটি কর্তব্যের সূত্রে সে এখন বাঁধা। পিতার কাছে সে তার জীবনের জন্যে, শিক্ষার জন্যে কৃতজ্ঞ কিন্তু সামনে তার স্বামী। মা যেমন তাঁর পিতা উপস্থিত থাকলেও তাঁর স্বামীর প্রতি অধিক অনুরাগ প্রকাশ করতেন, তার ক্ষেত্রেও ঠিক সে রীতিই অনুসৃত হবে।

এরপর রিহার্সেলে ঘটে চলল, ওথেলোর সর্বময় কর্তা হয়ে সাইপ্রাস-যাত্রা। সাইপ্রাসে কুচক্রী ইয়াগোর গভীর সব ষড়যন্ত্র। নির্দোষ সরল হৃদয়া ডেসডেমোনার ওপর ইয়াগোর চাতুরীর ফলে ওথেলোর অবিশ্বাস। শেষে নিষ্পাপ ডেসডেমোনার রাতের শয্যায় ওথেলোর শ্বাসরোধ করে হত্যা। পরে ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেলে মৃতা স্ত্রীর পবিত্র কপালে চুম্বন চিহ্ন এঁকে দিয়ে মৃত্যু বরণ।

ওথেলোরূপী দিগন্ত সোম যেই মুহূর্তে নিহত ডেসডেমোনার গালে আলতো করে চুম্বন চিহ্ন আঁকতে যাচ্ছিল ঠিক তখুনি দারুণ একটি যোগাযোগ ঘটে গেল। লোডশেডিং হয়ে গেল ক্লাব ঘরে।

চেয়ার থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন ডিউক অনিমেষ তরফদার, ব্রাদার সোম সামলে। বিদ্যুতকে বিশ্বাস নেই, কখন হুট্ করে এসে পড়বে।

অন্ধকার কাঁচের ঘরখানা সমবেত হাসির ধাক্কায় যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

ডিনারের আগে এক রাউণ্ড ড্রিংক হয়ে যাক। ক্লাব সেক্রেটারির ঘোষণায় মেম্বারদের গলা শুকিয়ে যেন সাহারা হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে গোবি সাহারার বুকে একখণ্ড মেঘের জন্য চাতকের মত চেয়ে রইল সকলে।

ক্লাবের বিরাট ডাইনিং রুমে সবাই এদিক ওদিক ছড়িয়ে বসেছে। অনিমেষ তরফদারের সঙ্গে বসেছে বাসবী মুখোমুখি চেয়ারে। তরফদার সিক্সটি আপ। পাকা আঙুরের মত রসে টৈ-টম্বুর। ওদিকে তিনজনে বসেছে এক টেবিলে। মিঃ অ্যান্ড মিসেস সেন আর দিগন্ত সোম। বিপত্নীক তরফদারকে লক্ষ্য করে কথা ছুঁড়লেন পঞ্চাশোর্ধ্বের মিসেস সেন, মুকুলিকা বালিকা বয়সীটির সঙ্গে কি নিয়ে রসালাপ চলছে তরফদার সাহেব?

এই তোমাকে নিয়ে।

'তুমি' বললে খুশি হন ঝুমুর সেন। কারণ যৌবনকে তিনি যে কোন মূল্যে ধরে রাখতে ব্যগ্র। এজন্যে রূপচর্চার সবরকমের উপকরণ তাঁর নিত্য সঙ্গী। তিনি তাঁর চেয়ে বেশ কম বয়েসী সভ্য সভ্যাদের কাছে বয়েস ভাঁড়িয়ে বলেন, আমাকে অত খাতির করে কথা বলছ কেন, এক আধ বছরের তফাৎ বৈ তো নয়, নাম ধরেই ডাকবে।

ঝুমুর নামটা পিতৃদত্ত কি স্বামী প্রদত্ত তা কেউ জানে না। স্বামী এস, এন, সেন, মানে সুরেন্দ্রনাথ সেন নিপাট ভালমানুষ। স্ত্রীর একান্ত অনুগত। স্ত্রীর সামনে বেশী কথা বলেন না, পাছে ক্রুদ্ধা স্ত্রীর রক্ত চোখের অগ্নি ঝলক গায়ে এসে লাগে। ঝুমুর সেন এক কালে নাচতেন। সেই নাচের গল্প করতে করতে তিনি দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারত চষে বেড়ান। তাবৎ গুণী শিল্পীর নাম ও কর্ম তাঁর জিহ্বাগ্রে নৃত্য করে।

তরফদারের উত্তর শুনে পাল্টা প্রশ্ন করে বসলেন ঝুমুর সেন, আমাকে নিয়ে! নিশ্চয় দারুণ কিছু ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড এক্সাইটিং ব্যাপার?

উঠে দাঁড়ালেন তরফদার। ঝুমুর সেনের দিকে হাতটি প্রসারিত করে দিয়ে বললেন,

'বৃন্তহীন পুষ্প সম আপনাতে আপনি বিকশি
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী!
আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্র শান্ত ভুজঙ্গের মতো
পড়েছিল পদ প্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত
করি অবনত।
কুন্দ শুভ্র নগ্ন কান্তি সুরেন্দ্র বন্দিতা
তুমি অনিন্দিতা।'

'সুরেন্দ্র বন্দিতা' বলবার সময় এস, এন, সেনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন তরফদার।

তরফদার বসে পড়তেই এক ঝাঁক পায়রা ওড়ার মত হাততালি পড়ল। বিগলিত ঝুমুর সেনের চোখ তখন ঝিনুকের বুজে আসা মুখের মত মনে হচ্ছে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দুটি শব্দ শুধু বেরিয়ে এল, দারুণ, ওয়াণ্ডারফুল।

বেয়ারাকে দেখতে পেয়ে মিঃ তলাপাত্রের বউ বললেন, জিন!

অমনি একে একে মেয়ারা ড্রাই জিনের অর্ডার দিলে। পুরুষরা সবাই স্কচ্ হুইস্কি। কেউ বললে, সোডা মেশাও, কেউ নিলে এমনি জল মিশিয়ে। টেবিলে সার্ভ করা হয়েছে ফিস্ফ্রাই, চিপ্স্। টুকরো টুকরো গল্পের সঙ্গে পান চলেছে।

কোণায় একা বসে আছেন বি, বি, নাগ। ভুজঙ্গভূষণ নাগ। তাঁকে ককটেল বানিয়ে দেয় ক্লাবের বিশেষ বেয়ারা। তিনি প্রতিটি অনুষ্ঠানে আসেন। কোন কথার উত্তরে মৃদু হাসেন, কিন্তু বড় একটা সবাক উত্তর দিয়ে প্রশ্নকর্তাকে কথার পিঠে কথা চাপাবার সুযোগ দেন না।

তরফদার নীচু গলায় বাসবীকে বলল, ভুজঙ্গ নাগ এখন 'মন্ত্র শান্ত ভুজঙ্গের মত' হয়ে গেছে। আগে তো দেখনি দাপট। ব্যবসায়িক আলোচনা মনের মত না হলেই ফোঁস। ও লিটারেলি দুমুখো সাপ। না না খারাপ অর্থে নয়, লোকটা বেসিকেলি ভাল মানুষ। ওর মুড়োটা ভুজঙ্গ ল্যাজটা নাগ, তাই দুমুখো সাপ বলছিলাম।

বাসবী ভয় দেখানোর ভান করে বলল, কথাটা ঘোষণা করে দি এই পানশালায়?

মিস্, তুমি এমন বিপজ্জনক তা তো জানতাম না।

আমি মিস্ নই। মিসেস মিত্র।

ভেবেছিলাম মিস্ বললে তুমি খুশি হবে। তোমার মত তরুণীরা স্বামী কাছে না থাকলে যে কোন অপরিচিতের মুখ থেকে 'মিস্' শুনলে খুশি হয়।

আপনি আমার অপরিচিত নন। সুতরাং আপনার মুখে মিস শুনলে আমি খুশি হব না।

সত্যি রাগ করলে বাসবী?

দারুণ গম্ভীর গলায় বাসবী বলল, আর যার ওপর রাগ করি না কেন অনিমেষদার ওপর অনুরাগ ছাড়া রাগ দেখাতে পারব না কোনদিন।

কথাটা শেষ করেই ফিক্ করে হেসে ফেলল বাসবী।

অনিমেষ তরফদার বললেন, মেয়ের আমার গুণের শেষ নেই। জ্যাঠার বয়েসী মানুষটাকে দাদা ডেকে তার এক কুড়ি বয়েস কমিয়ে দিলে।

তেড়ে উঠল বাসবী, থামুন তো, আর জ্যাঠামি করতে হবে না। এখন যে প্রসঙ্গ নিয়ে কথা চলছিল, তাই চলুক।

কি সে প্রসঙ্গ তরুণী?

ভুলে গেলেন, সেই যে ভুজঙ্গ প্রসঙ্গ শুরু করেছিলেন।

অনিমেষ তরফদার বললেন, সত্যি মানুষটার জন্যে ভারী কষ্ট হয়। নিজেকে যেন তিল তিল করে নিঃশেষ করে ফেলছে।

কেন অনিমেষদা?

তুমি কি কিছুই জান না বাসবী?

বিশ্বাস করুন, অন্যের ব্যাপারে কোন দিনই দারুণ রকম কোন কৌতূহল আমার নেই। কোনকিছু কানে এল, দু'একটা মন্তব্য করলাম, তারপর সব ভুলে গেলাম ব্যস।

ওঁর স্ত্রী ঘটিত ব্যাপার কিছু কানে এসেছে তোমার?

না, তেমন কিছু না। কেবল শুনেছিলাম, উনি বিয়ে করেছিলেন, বউ তাঁর সঙ্গে এই গার্ডেনেই থাকতেন। তারপর বউকে নিয়ে একবার কলকাতা গেলেন, এলেন একা। লোকে জিজ্ঞেস করলে বলতেন, মারা গেছে। আর বেশি কিছু বলতে চাইতেন না। ভদ্রলোক হয়ত স্ত্রীর মৃত্যুর ব্যাপারে দারুণ রকম শক্ পেয়েছিলেন।

শক্ পেয়েছিলেন ঠিক, তবে স্ত্রীর মৃত্যুর ব্যাপারে নয়।

তবে?

ওঁর স্ত্রী এখনও জীবিত।

কোথায় তিনি?

প্রথমে ছিলেন এক হার্টের ডাক্তারের হেফাজতে, ইদানিং এক রিটায়ার্ড আর্মি ইঞ্জিনিয়ারের বিশ্রাম কুঞ্জে।

আমার কাছে সবটুকুই কিন্তু হেঁয়ালি অনিমেষদা।

তরফদার বললেন, তোমাদের সকলের সঙ্গে রাত দিন রসিকতা করলেও তোমরা আমার চেয়ে অনেক ছোট। আমি তোমাদের স্নেহ করি বাসবী। সেই স্নেহের দাবীতেই বলছি, জীবনটাকে সবসময় চেষ্টা করবে সরলরেখায় চালাতে। জীবন বড় বেয়াড়া, সে ঘোড়ার মত এঁকে বেঁকে চলতে চাইবে, সুযোগ পেলে সওয়ারকে ফেলে দেবে খানাখন্দে, কিন্তু সারাক্ষণ চেষ্টা করবে তাকে বাগ মানাতে। পুরোটা পারবে না। তুমি তো তুমি, সাধু মহাপুরুষেরাও পারেন না। তবে যতটুকু পারবে ততটুকু লাভ। অনেক অশান্তির হাত থেকে মুক্তি পাবে।

একটু থেমে আবার বললেন তরফদার, তুমি হয়ত ভাবছ বাসবী, আমি নাগ পরিবারের হাঁড়ির খবর কি করে জানলাম। শুধু এটুকু জানলেই যথেষ্ট হবে যে আমি মধ্যস্থের ভূমিকা নিয়ে ওদের মিলনের চেষ্টা করেছি। শেষ পর্যন্ত যে পক্ষেরই দোষ থাক না কেন, পারিনি। বড় ভাল মেয়ে ছিল নাগের বউ। আর তার ভালমানুষীর সুযোগ নিল তারা যারা অন্ধকারে শিকারের সন্ধানে ওৎ পেতে বসে থাকে।

বাসবী বলল, আমার সব কিছু কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে দাদা।

তরফদার বললেন, সংক্ষেপে বলছি শোন, নাগের এক ডাক্তার বন্ধু এক সময় টি-গার্ডেনে বেড়াতে এসে নাগিনীর প্রেমে পড়ে যায়।

বাসবী বলল, সিরিয়াস কথার ভেতরেও কি আপনার রসিকতা না করলে নয়।

ও হো, নাগিনী বলেছি বলে তোমার আপত্তি। তা আপত্তি থাকবারই কথা। ওর স্বভাবের ভেতর কোথাও নাগিনীর চিহ্ন মাত্র ছিল না। দেহখানা ওর যত সুন্দর ছিল, মনটা তার চেয়ে কম সুন্দর ছিল না। ও মানুষজনকে ভালবাসত, সহজেই আপন করে নিত। ডাক্তার ওর ভালমানুষীর সুযোগে ওর মনের ভেতর ঢুকল। আমি তখন ওদের বাড়ি যাতায়াত করতাম। বড় শ্রদ্ধা করত মেয়েটা আমাকে। দাদা বলে ডাকত, কাছে এসে সামান্য জিনিস এনে দেবার জন্যে বায়না ধরত।

একটু সময় থামতে হল তরফদারকে। বেয়ারা পানীয় দিয়ে গেল। বাসবী তরফদারের পাত্রে হুইস্কি ঢেলে বলল, আপনি তো সোডা মেশান, তাই না দাদা?

মাথা নাড়লেন তরফদার।

দুজনে ড্রিংক করতে শুরু করল।

তরফদার আবার শুরু করলেন কথা।

একদিন গিয়ে নাগের মুখে শুনলাম, মেয়েটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমি ওর বিছানার কাছে গেলাম। মুখে একটুকরো ম্লান হাসি। বিশ্বাস কর বাসবী সেদিন ওর বিছানার পাশে ডাক্তারকে বসে থাকতে দেখে আমার একটুও ভাল লাগেনি।

বাসবী সিপ্ করে গ্লাশটা টেবিলে রেখে বলল, এ আপনার প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা অনিমেষদা। মিঃ নাগের স্ত্রীকে হয়ত আপনার অবচেতন মন ভালবাসত।

তরফদার বললেন, তোমার ধারণার ভেতর কিছু সত্য হয়ত থাকতে পারে বাসবী। আমি ব্যাচিলার মানুষ সংসার করিনি ঠিক, তা বলে সাধু তো হয়ে যাইনি। আমার মনের ভেতর ব্যাভিচার নেই এ কথা বুকে হাত দিয়ে কি করে বলি।

বাসবী বলল, স্রেফ রসিকতা করলাম আর অমনি আপনি সিরিয়াস হয়ে গেলেন। বলুন আপনার কাহিনী।

তরফদার হেসে বললেন, আমার নয় ম্যাডাম, নাগিনীর কথামালা। তারপর শোন, কদিনের ভেতরেই ডাক্তার, নাগ আর তার বউ নীচে নেমে গেল। শুনলাম রোগিনীর অ্যাবডোমেনে কি রকম একটা যন্ত্রণা হচ্ছে, হয়ত ওপেন করতে হতে পারে।

আমি আনাড়ী, তাই আমাকে বিশ্বাস করতে হল। কিন্তু ডাক্তার সম্বন্ধে সন্দেহটা আমার ঘুচল না।

আপনার এ রকম সন্দেহ হল কেন দাদা?

তরফদার বললেন, আমি মাঝে মাঝে গিয়ে দেখেছি, নাগ নেই কিন্তু ওরা দুজনে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে গল্প করছে।

বাসবী বলল, কিছু মনে করবেন না অনিমেষদা, এটা আপনার সংকীর্ণতা। বন্ধুত্ব হলে নিভৃতে গল্প করাটা অন্যায় নয়। এটা আপনাদের সময়কার একটা উৎকট গোঁড়ামী।

তরফদার বললেন, মানলাম, কিন্তু দু'দুটো মাস কলকাতার চেম্বার ফেলে একটি ডাক্তার বসে আছে বন্ধুর টি-গার্ডেনে তার বউ এর সঙ্গে গল্প জমিয়ে, এটা কি নিছক বন্ধুত্ব আর ভাললাগার খাতিরে বাসবী?

তারপর কি হল?

ওরা চলে গেল কলকাতা।

তারপর প্রায় মাস সাতেক রঙ্গমঞ্চের পর্দা উঠল না। নাগের টি-গার্ডেন চালান ম্যানেজার। খবর জানতে গেলে শুনতে পেতাম নাগের স্ত্রীর কঠিন অসুখ, তাই নাগ মশায় আসতে পারছেন না।

শেষে একদিন নাগের সঙ্গে দেখা হল গার্ডেনে। সদ্য পত্নী বিয়োগে উদভ্রান্ত। আমি গভীর দুঃখ প্রকাশ করে প্রবোধ দিতে গেলাম কিন্তু ও যেন কানে তুলল না কথাটা।

রহস্যভেদ হল বছর দেড়েক পরে। একখানা চিঠি এল আমার নামে।

থামলেন তরফদার। বাসবী বলল, এ যে একখানা রহস্য উপন্যাস দাদা।

বলতে পার। চিঠিতে অনেক কথা লিখেছিল নাগিনী। সে কেমন করে দুর্বৃত্ত ডাক্তারটির মোহে পড়ে তা অকপটে লিখেছিল। তারপর তার মোহভঙ্গ হয়েছিল কি করে সে সব করুণ কাহিনী জানিয়েছিল।

তরফদার আবার থামলেন।

কিছুটা পানীয় ঢেলে দিলেন গলায়।

বাসবী বলল, কি সে করুণ কাহিনী অনিমেষদা? অবশ্য বলতে বাধা থাকলে জানতে চাইব না।

তরফদার বললেন, অনেক দিনের ঘটনা, বিলুপ্ত ইতিহাস হয়ে গেছে। আমি সেই সুপ্রাচীন

প্রস্তরখণ্ড, যার বুকে উৎকীর্ণ হয়ে আছে নাগিনী কন্যার সকরুণ কাহিনী। তুমি উৎসুক গবেষক বাসবী, তাই তোমার কাছে ঐ লুপ্তপ্রায় শিলালেখটি মেলে ধরতে আমার কোন কুণ্ঠা নেই।

একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন তরফদার, চিঠি অনেক দীর্ঘ, সংক্ষেপে তার মর্মার্থটা বলছি। নাগিনী স্বীকার করেছে সব দোষ তার। সে এখন দারুণ অনুতপ্ত। তবে ক্ষমা চাইবার প্রশ্ন উঠছে না, কারণ তার অপরাধ এত বড় যে দয়াময় বিধাতাও তাকে ক্ষমা করতে ঘৃণাবোধ করবেন।

আসল ঘটনাটা হল এই, ভুজঙ্গ নাগ একদিন হাতে নাতে নাকি ওদের অসংযত অবস্থায় দেখে ফেলে। ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে বের করে দেয় দুজনকে। নাগিনীর অসুস্থতা যে ছলনা একথা বুঝতে তার আর বাকী থাকে না। নানা রকম পরীক্ষার অজুহাতে ডাক্তারটি নাগিনীকে ঘরের বার করে নিয়ে যেত। সেটা যে নিভৃত প্রণয়ের সুযোগ সন্ধান ছাড়া আর কিছু নয় তা ভুজঙ্গনাগ এখন স্পষ্ট করে বুঝতে পারল।

নাগিনী লিখেছে, ভুজঙ্গ নাগের আসার পর ঐ ডাক্তারের নার্সিংহোমে সে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে। ডাক্তার জানায়, সে মৃত সন্তানের জন্ম দিয়েছে। ওর কিন্তু তা মনে হয়নি, তবে ডাক্তারকে সে জোর করে কিছু বলতে পারেনি।

বাসবী হঠাৎ একটু কৌতূহলী হয়ে উঠল। সে জিজ্ঞেস করল, মেয়েটি কার?

তরফদার বললে, তাও জানিয়েছে নাগিনী। অনুমান কর দেখি মেয়েটি কার?

এ আর ভাববার কি আছে, মেয়েটি ডাক্তারের।

না, ঐখানেই ভুল হল তোমার। অবশ্য অসম্ভব কিছু ছিল না, তবে মেয়েটি ছিল ভুজঙ্গ নাগেরই।

বাসবী বলল, ওতো মিসেস নাগের চিঠির কথা। সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় কি করে?

এখানেই রহস্যের ঘটনাটা বাসবী। নিঃ নাগের মেয়ে এখন বড় হয়েছে, সে দার্জিলিং-এর কোন একটা কন্‌ভেন্টে উঁচু ক্লাশের ছাত্রী। আর তার পড়াশোনার সব খরচা দিচ্ছে তার বাবা।

ব্যাপারটা পবিষ্কার করে বলুন অনিমেষদা, সব কেমন যেন ফগে ঢেকে গেল।

বলছি। আসলে ভুজঙ্গ নাগের মেয়েটি মারা যায়নি। ডেলিভারীর পর নার্সের হাতে পুঁটলি পাকিয়ে তুলে দিয়ে দূরের কোন একটা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসতে বলেছিল ডাক্তার। কিন্তু নার্সটি বাইরে গিয়ে পুঁটলি খুলে দেখেছিল, তখনও বেবীটার প্রাণ আছে। সে কাউকে না বলে তাকে নিজের কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে রেখেছিল।

বেশ কয়েকমাস পরে একটি ঘটনা ঘটল। কোন কারণে উত্তেজিত হয়ে ডাক্তার নার্সিং হোম থেকে ঐ নার্সটিকে ডিস্‌মিস্‌ করে দিল। নার্সটির সঙ্গে ডাক্তারের পূর্বে কিছু প্রণয় ঘটিত ব্যাপার ছিল। তাই প্রতিশোধ নেবার পথ খুঁজতে লাগল নার্সটি। সে গোপনে ডাক্তারের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তার কোয়ার্টারে গেল। ভুজঙ্গের স্ত্রীকে দেখাল তাকে লেখা ডাক্তারের কতকগুলো পুরনো প্রেমপত্র। আর শেষে মোক্ষম ঘটনাটা ফাঁস করে দিলে।

বাসবী বলল, সেই মেয়েটির কথা?

হ্যাঁ, সেই মেয়েটি যে মারা যানি, তখনও জীবিত, সে কথাটা নাগের স্ত্রীকে জানিয়ে দিলে। আরও বললে, ঐ ডাক্তার নতুন কোন শিকার পেলে ওকেও ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

নাগিনী নার্সের সঙ্গে চলে এল তার কোয়ার্টারে। মেয়েকে বুকে তুলে নিয়ে ভাসল ঠিকানা হীন বিরাট সংসারে।

তরফদার থামলেন। আবার গলায় পানীয় ঢাললেন। এবার কাহিনীটা শুরু করে বললেন, প্রথম চিঠি পাবার পর আমি ভুজঙ্গের সঙ্গে দেখা করে তাকে চিঠিখানা পড়াই। শেষে অনেক করে বোঝাই, ভুল মানুষেরই হয়ে থাকে, সে অনুতপ্ত আর তুমিও তাকে ভালবাসতে, তাহলে কাছে টেনে নিতে দোষ কি? আর মৃত্যু সংবাদ রটনার ব্যাপার যদি বল তাহলে তুমি তাকে দার্জিলিং-এর যে কোন হোটেল কিংবা প্রাইভেট কোয়ার্টারে এনে তোল। কিছুকাল পরে ব্যাপারটাকে সহজ করতে আরও কিছু ভাবা যাবে।

ভুজঙ্গ আমার কথায় ফণা না তুললেও বেঁকে রইল। তাকে কিছুতেই রাজী করাতে পারলাম না। তোমার মত তার মনের মধ্যেও তখন একটা সংশয় জেগেছিল, মেয়েটা তার নয়।

আমি নাগিনীর চিঠির বিশেষ অংশটুকু আর একবার পড়িয়ে বলেছিলাম, দেখ, মেয়েটা যে তোমার তা এই চিঠিতে লেখা আছে। চিঠিখানাকে অবিশ্বাস করবার উপায় নেই, কারণ তোমার স্ত্রী অকপটে তার সকল দোষ স্বীকার করছে। সে তোমার কাছে আসতে চেয়েও চিঠি লেখেনি। সে আমাকে তার অনুতাপের কথা জানিয়েছে। এখানে তার সকল দোষ স্বীকার করেছে। এখন তার মেয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলার কোন মানে হয় না।

তবুও পারলাম না ভুজঙ্গ নাগকে বাগ মানাতে। মনে একটা গভীর দুঃখ নিয়ে নাগিনীকে অনেক প্রবোধ দিয়ে চিঠি লিখলাম। এ কথাও জানালাম, তার দাদা তাকে অন্তর থেকে ক্ষমা করেছে। প্রয়োজন হলে সে যেন আর্থিক সাহায্য চাইতে ইতস্তত না করে।

আর কোন চিঠি এল না। আমি নাগিনীর প্রসঙ্গ প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ আবার যবনিকা উঠল। দশ বছর পরে চিঠি এল। হাতের অক্ষরও এতদিন পরে অচেনা হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া নীচে যে নাম সই দেখলাম তা আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

থামলেন তরফদার। উৎসুক আগ্রহে বাসবী জানতে চাইল, কি নাম?

তরফদার হেসে বললেন, এতক্ষণ আমি যে নাগিনী, নাগের স্ত্রী বলে চলেছি, সেদিকে তুমি খেয়ালই করনি। শুধু আমার রসিকতা বলেই ভেবেছিলে। কিন্তু ওকে কি নামে ডাকবো আমি। আগে ছিল হিন্দু, এখন মুসলমান।

মুসলমান!

হাঁ রিজিয়া বেগম। একজন রিটায়ার্ড মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারের বেগম।

কি লেখা ছিল চিঠিতে?

অনেক কথা। তার সার হল এই, সে এখনও নাগকে ভুলতে পারেনি, যদিও ইহ জীবনে তার আর ফেরার রাস্তা নেই।

সে লিখেছে, তার বর্তমান স্বামীটি খুব ভাল। তাকে শুধু ঐশ্বর্যের ভেতরেই রাখেনি, মনের গভীরে ঠাঁই দিয়েছে।

শেষে একটি কথা লিখেছে, আপনাদের নাগসাহেবের মেয়ে এখন দার্জিলিং-এর কনভেন্টে পড়ছে। তার নাম রেখেছি, সুদীপ্তা নাগ। সে তার বাবাকে কোন দিনও দেখেনি, কিন্তু আমার কাছে অনেক গল্প শুনেছে। এখন বড় হয়েছে, বাবার গল্প শুনতে শুনতে ওর চোখে জল আসে। আর আশ্চর্য হয়ে যাবেন আপনি ওকে দেখলে। অবিকল ওর বাবার মত দেখতে হয়েছে। সেই উঁচু কপাল, খাড়া নাক আর বড় বড় টানা টানা চোখ।

জান বাসবী, নাগকে দ্বিতীয় চিঠিটা দেখালাম। চিঠি পড়ে সে যেন পাগলের মত হয়ে গেল। আমাকে জড়িয়ে কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এ জীবনে একজনকে হারালাম, কিন্তু আর একজনকে হারাতে পারব না। এখুনি চলুন, দার্জিলিং-এ গিয়ে মেয়েকে দেখে আসি।

অনেক কষ্টে কনভেন্টে মেয়েকে দেখার অনুমতি পাওয়া গেল।

ভিজিটার্স রুমে দাঁড়িয়ে আছি দুজনে, মেয়ে এল। দরজা দিয়ে ঢুকেই সে থমকে দাঁড়াল। ভুজঙ্গ চেয়ে আছে মেয়ের দিকে আর মেয়ে পলকহীন চোখে চেয়ে আছে বাপের দিকে। আমি অবাক হয়ে দুজনের সাদৃশ্য দেখছি। নাগিনীর চিঠি যে এমন অক্ষরে অক্ষরে সত্য হবে তা ভাবতে পারিনি।

কিছু পরেই দেখলাম ফুলের মত সুন্দর মেয়েটার গোলাপ পাপড়ির মত কোমল ঠোঁট কেঁপে উঠল। পাতার কোণা থেকে শিশির বিন্দু ঝরে পড়ার মত দুচোখের কোণ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল। বাপ ছুটে গিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরল বুকের মধ্যে। নাগের চোখের জল ঝরে পড়তে লাগল মেয়ের মাথার ওপর। সেদিন আমার চোখ দুটোও শুকনো ছিল না বাসবী।

তারপর।

তারপর আমার চিঠি গেল নাগিনীর কাছে। এবার আমার দিক থেকে সকাতর অনুরোধ, তুমি নিজে না আসতে পার দয়া করে বাবার কাছে তার মেয়েকে রাখার অনুমতি দাও।

উত্তর এল ফেরৎ ডাকে। নাগিনী লিখেছে, আমি এখন নিঃসঙ্গ নয়, কিন্তু ও একেবারে একা। আমার চিঠি পাবার মাস দুয়েক পরে ওকে নিয়ে আপনি কনভেন্টে যাবেন। আমার দিক থেকে যা করার ইতিমধ্যে আমি তা করে রাখব।

মেয়েকে দেখে আসার পর থেকেই নাগ প্রায় উদ্‌ভ্রান্তের মত হয়ে গিয়েছিল। সে প্রায়ই আমার কাছে আসত আর হা হুতাশ করত তার কৃতকর্মের জন্যে।

আমি কিন্তু তার কাছ থেকে আমাদের শেষের চিঠি আদান প্রদানের কথা গোপন রেখেছিলাম।

দু'মাস পার হয়ে যাবার পর নাগকে আবার নিয়ে গেলাম কনভেন্টে। ইতিমধ্যে কখন দার্জিলিং-এ এসে নাগিনী সব ব্যবস্থা পাকা করে গেছে। মেয়েকে ফিরে পেতে নাগের আর কোন অসুবিধে হল না। প্রতি রোববার নিয়ম মত নাগ যায় মেয়ের কনভেন্টে দেখা করতে। ছুটিতে মেয়ে আসে বাবার কাছে। সে সময় নাগের বাংলোতে এক এলাহি উৎসব লেগে যায়। কিন্তু আমি জানি, মেয়েকে পেয়ে নাগ খুশি হলেও নাগিনীকে হারানোর ক্ষত তার কোন দিনই শুকোয়নি।

অনেকক্ষণ একটানা কাহিনী শুনিয়ে থামলেন তরফদার। ওদের দুজনের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল ডাইনিং হলের কোণায় বিশেষ একটি টেবিলের ওপর। গ্লাশটা ডান হাতে চেপে ধরে ঘাড় বেঁকিয়ে টেবিলের ওপর চোখের দৃষ্টি ফেলে ভুজঙ্গ নাগ কি যেন ভেবে চলেছে।

তখন ঘড়ির কাঁটা দশটার দাগ ছুঁই ছুঁই। সেক্রেটারীর ঘোষণা শোনা গেল, ডিনার রেডি। রাত বাড়ছে, বাংলোতে ফিরতে হবে সবাইকে, অতএব তৈরী হয়ে নিন চটপট।

এতক্ষণ স্টিরিও থেকে অর্কেস্ট্রার একটা আশ্চর্য সুর ভেসে আসছিল। কখনো সমুদ্রের জলকল্লোল কখনো বা বালুতীরের নারিকেল কুঞ্জের মৃদু পত্রমর্মর। দূর থেকে ভেসে আসছে এক ঝাঁক পাখির পাখা টানার শব্দ। শব্দটা কাছে এগিয়ে এল, আবার বাজতে বাজতে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল। কে যেন জীবনে আসছে শব্দে বর্ণে গন্ধে, আবার সে সরে যাচ্ছে জীবন থেকে। গন্ধ নেই, বর্ণ নেই, নেই কোন শব্দ।

আবার ঘোষণা, আজকের ডিনারের মেনু ঃ ক্যারট সুপ।

তরফদার মন্তব্য করলেন, প্যারট সুপ না হলেই বাঁচি।

ঘোষক বলছেন, লবস্টার রিসোলেট।

হৈ হৈ করে উঠল সবাই। একজন বলল, খেতে খেতে মনে হবে বিদেশী সোনা খাচ্ছি।

ঘোষক থেমে আছেন। তিনিও মন্তব্য উপভোগ করছেন।

অন্য একজন বলল, বিদেশীরা গলদা চিংড়ির ধড়টাই শুধু কেনে, মুণ্ডুটা পড়ে থাকে এদেশে, কেন বলতো?

তরফদার বললেন, বিদেশীর কাছে ভারতীয় মাথার কোন দাম নেই বলে।

সেক্রেটারীর আবার ঘোষনা, চিকেন রোস্ট আছে।

মিসেস সেন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, জার্মান না ফ্রেঞ্চ স্টাইলে রান্না?

একজন মন্তব্য করল, ও খেলেই মালুম হবে। কুক সবাইকে তুষ্ট করার জন্যে ফ্রাংকো জার্মান ওয়ার লাগিয়ে দিয়েছে।

ঘোষক বললেন, ফ্রায়েড রাইস আছে।

বলেই একটু থামলেন মন্তব্য শোনার জন্যে। কেউ কিছু বলল না দেখে আবার পড়তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে ঘরের কোণ থেকে কে যেন মন্তব্য করল, ইন্ডিয়ান বিস্কুট কিংবা পপকর্ণ না হলেই হল। ফ্রায়েড রাইসকে একটু কড়া ফ্রাই করে আমাদের কুক ওসব বানিয়ে দিতে পারে।

লাস্ট আইটেম, লেমন পুডিং।

সকলে, বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা, আওয়াজ তুলল।

সেক্রেটারী এবার নিজেই মন্তব্য করলেন, এ স্পেশাল আইটেমটা যাদের দাঁত নেই তাদের জন্যে।

সবাই হা হা হি হি করে উঠল।

তরফদার বললেন, যাঁরা বাঁধান দাঁত নিয়ে বসে আছেন?

তাঁরা দাঁত খুলে ফেললেই খেতে পাবেন।

তরফদার আবার জানতে চাইলেন, সেক্রেটারী মহোদয়, যাঁর একটিমাত্র দাঁত পড়েছে তিনি কি আপনার ঐ মহামূল্য বস্তুটি পাবার অধিকারী হবেন?

অবশ্যই, তবে পরিমাণ কিছু কমবে।

কতখানি?

আমাদের বত্রিশটি দাঁত, তাই আস্ত পুডিং-এর বত্রিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র পাবেন তিনি।

একটু থেমে সেক্রেটারী বললেন, অবশ্য দন্তহীনেরা যদি কৃপাপরবশ হয়ে অনুমতি দেন তাহলে ঐ পুডিং প্রসাদটি সবার ভেতর সমভাবে বণ্টিত হতে পারে।

হলের মাঝখানের টেবিল থেকে পঁচাত্তর বছরের বি সিন্‌হা, মানে বাঘা সিন্‌হা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি গলিত নখদন্ত সিংহ। আমি সর্বান্তঃকরণে শিশু দন্তরদের পুডিং ভক্ষণের অনুমতি দিচ্ছি। আশাকরি অদূর ভবিষ্যতে তাঁরাও তাঁদের ইয়ংগার জেনারেশনদের এই ঔদার্য দেখাবেন।

খাবার শেষে সবাই বিদায় নিয়ে চললেন যে যার বাংলোর দিকে। তরফদার লিফ্‌ট দিলেন ভুজঙ্গ নাগকে। মিসেস সেন কিছুতেই বাসবীর গাড়িতে প্রাণ ধরে ছেড়ে দিতে চান না দিগন্ত সোমকে। যাবার সময় তরফদার ফুটুনী কেটে বলে গেছেন, ঝুমুর, সোমের যথার্থ গার্জেন হলে তুমি। উঠতি বয়সের ডানপিটে ছেলে, ওকে একটু সামলে রেখ।

আর যায় কোথা, গার্জেনী শুরু হয়ে গেছে। ঝুমুর সেন বললেন, দিগন্ত যাবে আমাদের সঙ্গে।

বাসবী বলল, খুব ভাল কথা। আপনাদের সঙ্গে ওকে নিয়ে যান। যে রকম পেটুক, কাল একেবারে খাইয়ে দাইয়ে ছাড়বেন।

দিগন্ত বলল, মিসেস সেনের আতিথ্য বরাতে জোটা একটা ভাগ্যের কথা, কিন্তু কাল অন্তত সে সৌভাগ্যের অধিকারী আমি হতে পারব না। কাল অতি ভোরে আমাকে জলপাইগুড়ি বেরিয়ে যেতে হবে।

মিসেস সেন শেষ চেষ্টা করলেন, খুব ভোরে আমার ড্রাইভার যদি তোমাকে তোমার বাংলোতে পৌঁছে দিয়ে আসে?

দিগন্ত বলল, তাতে লাভ কি! প্রথমতঃ আপনার হাতের তৈরী খাবার আমি খেতে পারব না, দ্বিতীয়তঃ বেচারা ড্রাইভারকে শেষ রাতের ঘুম কামাই করে আসতে হবে। তার চেয়ে একদিন ভাল করে রান্নার ব্যবস্থা করুন। ডাক দিন ফোনে। আসামী হাজির থাকবে আপনার এজলাসে।

ঝুমুর সেন দিগন্তকে আটকে রাখার আর কোন উপায় বের করতে না পেরে বললেন, তোমাকে আজ ছাড়তে পারি একটি শর্তে।

কি এমন শর্ত বলুন?

বার বার বলা সত্ত্বেও তুমি আমাকে 'আপনি' সম্বোধন কর, ওটিকে 'তুমি'তে নামিয়ে আনতে হবে।

তথাস্তু। তবে আমারও একটি কথা আছে।

বল কি কথা?

'তুমি' বললেও নাম ধরে অন্যদের মত ডাকতে পারব না।

ঝুমুর সেন বললেন, একদিনে আর কি সব হয়, ধীরে ধীরে সব অভ্যাস হয়ে যাবে।

মিসেস সেনকে খুশি করার জন্যে বাসবী বলল, দিগন্ত তুমি গাড়ি চালাও, আমি পেছনের সীটে

একটু আরাম করে বসি। তোমার ড্রাইভিং-এর ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস। আমি ঘুমিয়ে পড়লে দয়া করে আমাকে আর জাগাবার চেষ্টা কর না।

বিপজ্জনক কথা। তুমি কি সারারাত গাড়ির ভেতর ঘুমুবে নাকি?

তা কি বলছি নাকি? তুমি তোমার বাংলোর কাছে নেমে যাবার সময় আমাকে জাগিয়ে দিও। বাকি পনের মিনিট নিজের হাতে গাড়ি চালিয়ে আমার বাংলোতে পৌঁছে যাব।

ঝুমুর সেন একমুখ হাসি ফুটিয়ে বাসবীর গাড়ির পেছনের দরজাটা খুলে ফেলে বললেন, এস বাসবী তোমাকে একটু সাহায্য করা যাক।

বাসবী পেছনের সীটে ঢুকে পড়ে দরজাটা বন্ধ করতে করতে বলল, ধন্যবাদ ঝুমুরদি। শুভরাত্রি।

দিগন্ত স্টিয়ারিং ধরে গাড়িতে স্টার্ট দিল। গাড়ি এগিয়ে চলল সামনের রাস্তা আলোয় ধুয়ে দিয়ে।

কিছুটা পথ গিয়ে দিগন্ত গাড়ি থামাতেই পেছন থেকে বাসবী বলল, চালাও চালাও, খবরদার থামিও না। এখনও ঝুমুর সেন উল্টো দিকে যেতে যেতে তার গাড়ির পেছনের গ্লাস দিয়ে নির্ঘাৎ আমাদের গাড়ির দিকে চেয়ে আছে। সে দেখছে গাড়িখানা হঠাৎ থেমে দাঁড়ায় কিনা। তাহলেই বুঝবে পেছনের সীটের মানুষ সামনে চলে এসেছে।

দিগন্ত গাড়িখানা আরও জোরে ছুটিয়ে নিয়ে চলল।

একটা পাহাড়ের নির্জন বাঁকে গাড়িখানা থামিয়ে দিগন্ত বলল, এখনও নিশ্চয় সেই শ্যেন-চক্ষু আমাদের অনুসরণ করছে না।

বাসবী বলল, 'সেন-চক্ষু' অনুসরণ না করলেও তার অতৃপ্ত আত্মাটা আমাদের মাঝখানে জেগে বসে আছে। সামনে থেকে শরীরটাকে পাক দিয়ে বাসবীর মুখোমুখি হয়ে দিগন্ত বলল, ও অনন্ত কাল চেয়ে বসে থাক, তাতে আমাদের পাশাপাশি বসা কেউ আটকাতে পারবে না।

বাসবী কোন কথা না বলে গাড়ির সামনে চলে এল। দিগন্তের কাঁধে হাত ঠেকিয়ে বলল, সরে বস, আমি চালাচ্ছি। দিগন্তের পাশে বসে ড্রাইভ করতে লাগল বাসবী।

রাতের প্রকৃতি চমকে চমকে উঠছে হেড্‌লাইটের আলোয়। অন্ধকারের বিচিত্র গোপন আয়োজন মুহূর্তে চোখের সামনে ফুটে উঠে আবার অন্ধকারের অতলে ডুবে যাচ্ছে।

দিগন্ত সিগারেট টানতে টানতে বলল, কথা বলছ না কেন বাসবী?

আমাকে একটা সিগারেট ধরিয়ে দাও।

তুমি তো আজকাল স্মোক করতে চাও না।

কোন একটা অভ্যেস গায়ের তিলের মত আমৃত্যু লেপ্টে থাকবে তা আমার ধাতে সয় না। তাবলে ইচ্ছেমত কিছু করতে পারব না এমন প্রতিজ্ঞা পত্র আমি কোথাও লিখে দিইনি।

দিগন্ত সিগারেট ধরিয়ে দিল। আপন মনে সিগারেট টানতে টানতে গাড়ি চালাতে লাগল বাসবী।

একসময় বলল, আচ্ছা দিগন্ত আমরা যদি আজ সারারাত ঐ অনেক নীচের অন্ধকার খাদে ঘন কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে নিবিড় হয়ে পড়ে থাকি, তাহলে কেমন হয়?

দিগন্ত বাসবীর পিঠের দিকের ব্লাউজ চিমটে ধরে নাড়া দিয়ে বলল. মাথায় লাল ঘূর্ণি লাগেনি তো? এবার আমাকে দয়া করে চালাবার হুকুম দাও।

খিল খিল করে হেসে উঠল বাসবী। বলল, ভয় পেয়ে গেলে দিগন্ত? তোমাকে বাংলোতে পৌঁছে দিয়ে আমাকে একা আরও খাড়া পাহাড়ে চড়তে হবে না?

তুমি রাত বারোটায় গাড়ি চালিয়ে একা ফিরবে বাংলোয়!

স্বাধীন জেনানা হব অথচ সাহসী হব না, এ কেমন কথা।

দিগন্ত সিগারেটে ঘন ঘন কয়েকটা টান মেরে বলল, আমাদের প্ল্যান কিন্তু অন্যরকম ছিল, তাই বলছিলাম।

গাড়ির গতি একটুখানি স্লো করে বাসবী ফিস্ ফিস্ করে বলল, আজ রাতে আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকব বলেছিলাম, তাই না?

দিগন্ত কিছু না বলে সামনের দিকে চেয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

কিছু উত্তর দিচ্ছ না যে?

দিগন্ত বলল, পরিকল্পনাটা আমারই ছিল, তুমি শুধু সায় দিয়েছিলে।

ও তাই হল। দুজনের একসঙ্গে রাত্রিবাসের কথা হয়েছে, কিন্তু কোথায় নির্দিষ্ট হয়নি।

দিগন্তের কণ্ঠে ক্ষোভের সুর, তুমি যদি বল তাহলে তোমার সঙ্গে তোমার বাংলোতে গিয়ে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে আসি?

ঠিক অতটা মাথা খারাপ আমার হয়নি দিগন্ত। আমি তোমার সঙ্গে রাত কাটাতে রাজি তবে স্থানের একটু পরিবর্তন হবে। অবশ্য তুমি যদি রাজি থাক।

বল জায়গাটা কোথায়?

আগেই বলেছি, ঐ পাহাড়ের নীচে গভীর খাদের ভেতর। যেতে দু'এক সেকেন্ডের বেশী সময় লাগবে না। কী অনন্ত শান্তি ওখানে। কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে গাড়ির ভেতর ঘুমবো, যে ঘুম আর কোনদিন ভাঙবে না। ভোরবেলা সূর্য উঠবে। কুয়াশা ভেদ করে সে আলো এসে ছুঁয়ে যাবে আমাদের। চা-বাগানের কুলি-তরুণী লক্ড়ির খোঁজে এসে আমাদের তালগোল পাকান মিলিত দেহ দুটো আবিষ্কার করবে। সে খবর দেবে পাশের বাংলোতে। চা-বাগানের লোকেরা ভীড় করে দেখতে আসবে। আমরা এসব অঞ্চলে অচেনা নয়, তাই আবিষ্কৃত হতে বেশী সময় লাগবে না। সবাই এসে সযত্নে আমাদের দেহ দুটো গাড়ির ভেতর থেকে উদ্ধার করবে। অ্যাক্সিডেন্ট, সাংঘাতিক অ্যাক্সিডেন্ট। কেউ তিলমাত্র সন্দেহ করবে না যে আমরা স্বেচ্ছায় এখানে দুজনে অনন্ত রাত্রির জাগরণহীন অন্ধকারে ঘুমুতে চেয়েছিলাম।

আস্তে আস্তে গাড়ী চালাতে চালাতে কথা বলে যাচ্ছিল বাসবী। দিগন্ত নিরুত্তর। সে মাঝে মাঝে চেয়ে চেয়ে দেখছিল বক্তার মুখের দিকে। সে ভাবছিল, তরফদারের টেবিলে বসে আজ মাত্রাতিরিক্ত পান করেনি তো! জিন্ ছেড়ে ও নির্ঘাৎ সমানে হুইস্কি ঢেলে গেছে গলায়।

হঠাৎ কথা শেষ হতেই গাড়ির স্পিড দারুণরকম বাড়িয়ে দিল বাসবী। আঁকা বাঁকা পাহাড়ী পথে গাড়ি শব্দ করে বাঁক নিতে লাগল।

দিগন্তের মুখ শুকিয়ে গেছে। এতবড় চওড়া বুকখানাতে কে যেন দারুণ শব্দে হাতুড়ি পিটতে শুরু করেছে।

ও হঠাৎ একটা বাঁকের মুখে চেপে ধরল স্টিয়ারিং।

কি হচ্ছে বাসবী, চেঁচিয়ে উঠল দিগন্ত। একটা ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর অন্ধকার ভেদ করে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলল।

সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করাল বাসবী। তীক্ষ্ণ গলায় ধাতব শব্দের মত গমকে গমকে হাসি ঝরাতে লাগল সে।

ভয় পেয়ে গেলে দিগন্ত!

আবার খিল খিল হাসির লহরী ছুটল।

পর-নারীকে নিয়ে নিভৃতে রাত কাটাতে গেলে বুকের পাটা চাই দিগন্ত। কাওয়ার্ড, কাওয়ার্ড!

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে বলল, নাও, স্টিয়ারিং ধর। প্রাণ বাঁচিয়ে চালাতে পারবে।

দিগন্ত যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল। বলল, তুমিই চালাও। স্বর্গ নরক যেখানে নিয়ে যেতে চাও আমার কোন প্রশ্ন নেই।

বাসবী গাড়ির ভেতর ঢুকে দিগন্তর ডান হাতখানা তুলে নিয়ে গভীর আবেগে চুমু খেয়ে গালে চেপে ধরে বলল, এবার দিগন্তের মত কথা বললে তুমি। আমি যে দিগন্তকে ভালবাসি, সে নির্ভীক, সে দুর্বার। দারুণ গতিতে সবকিছু ভেঙে চুরমার করে দিয়ে যেতে সে জানে। দুরন্ত চলন্ত দিগন্তকে আমি ভালবাসি।

আবার গাড়ি চলল। এবার স্বাভাবিক গতিতে। দিগন্তের বাংলোয় গাড়ি ঢুকিয়ে নেমে দাঁড়াল বাসবী। দিগন্ত নামল। বাসবী ওর দুটো হাত নিজের হাতের ভেতর ধরে নিয়ে বলল, আজ ঘুমোও লক্ষ্মীটি। সামনের কোন একটি রাত আমরা পাশাপাশি বসে জেগে কাটাব।

দিগন্ত বলল, আজ তুমি থাকবে বলে আমাব ঘর ভরে বাগানের ফুল এনে সাজিয়ে রেখেছিলাম।

বাসবী বলল, চল, তোমার ফুলের উৎসবটা দেখে যাই।

ওরা ড্রইংরুম থেকে শোবার ঘর পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে দেখল। বাসবী কখনো বা নতজানু হয়ে কার্পেটের ওপর বসে আলতো করে গালে ছোঁয়াল সুইট সুলতান। আবার কখনো পোর্সিলেনের ভাসে রাখা হলুদ সাদা চন্দ্রমল্লিকার ওপর দুচোখের দৃষ্টি পেতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বেরিয়ে আসার সময় দিগন্ত ওর হাতে দিল বিরাট একটি গোলাপ। তখনও সম্পূর্ণ ফুটে ওঠেনি।

বাসবী গোলাপের পাপড়ি ঠোঁটে ছুঁইয়ে নিয়ে বলল, এই লেডি সেটন গোলাপটির জন্যে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। এ অঞ্চলে কেবল তোমার বাগানেই এ গোলাপ তার পূর্ণ যৌবন নিয়ে ফুটেছে।

দিগন্ত বলল, তাই তার সমঝদারের হাতে গোলাপটিকে সমর্পণ করলাম।

গাড়িতে বসে মুখ বাড়িয়ে বাসবী বলল, তোমার আজকের এ উপহারের কথা ভুলব না দিগন্ত।

লনে দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে লাগল দিগন্ত সোম। বাসবীর গাড়ি বেরিয়ে গেল প্রচণ্ড স্পীড নিয়ে।

বাসবীর গাড়ি বাংলোতে ঢোকার মুখেই ওপরের চার্চের ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল।

গাড়ি এসে প্রায় নিঃশব্দে দাঁড়াল গ্যারেজের সামনে। বাগানের ওপারের ঘরে ঘুমুচ্ছে বাহাদুর। মাঝরাতে ডাক হাঁক করে ঘুম ভাঙাল না বাসবী। থাক্ আজ গাড়িখানা বাইরে। ভোরে উঠে গাড়ির ছাদে জমে ওঠা কুয়াশার ওপরে ও আঙুল বুলিয়ে ছবি আঁকবে, নাম লিখবে।

জানালার কাছে গিয়ে দেখল কাঁচ বন্ধ না করে ঘুমিয়ে গেছে জয়তিলক। জ্যোৎস্নার একফালি ম্লান আলো তার বিছানায় গিয়ে পড়েছে। জয়তিলকের বালিশের পাশেই তার বালিশটি রাখা। সে আজ রাতে আসবে না বলেই ফোন করেছে তবু তার বালিশখানা সযত্নে পাশে রেখেছে জয়। পাশবালিশটাও যথাস্থানে পড়ে।

জয়ের দিকে চেয়ে এই মুহূর্তে বুকখানা হু হু করে উঠল বাসবীর। জয় তাকে সত্যি ভালবাসে, কিন্তু সে তার ভালবাসাকে সারাক্ষণ উপেক্ষা করে চলেছে।

জয়, জয়।

এই মুহূর্তে বাসবীর মন জয়ের জন্যে কানায় কানায় ভরে উঠল। সে আবার ডাকল, জয় আমি এসেছি।

জয় উঠে বসে দুটো হাতের আঙুল দিয়ে চোখ রগড়ে তাকাল।

বিস্ময়ের ঘোর লাগল চোখে, বাসবী! এত রাতে।

বাসবী চাপা গলায় বলল, দরজা খোল, চোর নই। তুমি যে অপরাধীর মত বাইরে আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখলে?

জয়তিলক বিছানা থেকে নেমে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল।

বাসবী ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, ভাগ্যিস জানালাটা খোলা রেখেছিলে, না হলে এতখানি রাতে দরজা ধাক্কা দিতে হত।

তুমি আসবে জানলে আমি জেগে থাকতাম বাসবী। ওদিকে বাহাদুরও জেনে গেছে তুমি আসবে না, তাই মিথ্যে বসে না থেকে কোয়ার্টারে চলে গেছে।

বাসবী দরজা বন্ধ করে বললে, গেছে, বেশ করেছে।

জয়তিলক বলল, দরজা বন্ধ করলে যে, গাড়ি গ্যারেজ করবে না?

থাক্। সারারাত একটু ঠাণ্ডা হোক্। কাল ভোরবেলাতেই আমার কোথাও বেরুবার দরকার নেই।

জয়তিলক আড়মোড়া ভেঙে বসে পড়ল বাইরের ঘরে একখানা সোফার ওপর। বাসবী ঢুকল পোশাক ছাড়তে বক্স রুমের ভেতর।

জয়তিলক ভাবতে লাগল বাসবীর কথা। দারুণ খেয়ালী। ওর যত শক্তি তত অপচয়। প্রাণের জোয়ার যেন ওকে ছাপিয়ে উপচে পড়ছে। কিন্তু সে উপচে পড়া জল কোন কল্যাণকর সৃষ্টির কাজে লাগছে না কেন।

কিছুক্ষণের ভেতরেই হাত মুখ ধুয়ে সামান্য প্রসাধন সেরে রাত্রিবাস পরে ও জয়তিলকের সামনে এসে দাঁড়াল।

এ সময়টাতে জয়তিলকের কাছে বাসবী অনন্যা। শ্যাম্পু করা চুল চিরুণীর পরিচ্ছন্ন টানের পর কাঁধের কিছু নীচে একটা ঢেউ দিয়ে থেমে গেছে। খুব হাল্‌কা রঙের নাইটিতে ওর সুগঠিত মোমের মত মসৃণ শরীরটা ঢাকা। বাসবী প্রতি রাতেই নতুন রঙের নাইটি পরে। সাতদিনে সাতটা রঙ। ফিরে ফিরে ওগুলো ওর দেহ ঘিরে আসতে থাকে। এটা ওর বিলাস। ধনী পিতার একমাত্র কন্যা। কুমারী জীবন থেকেই এ বিলাস বাসবীর।

বাসবী জয়তিলকের সামনে এসে হঠাৎ তার দুটো কাঁধের ওপর হাত রেখে নীচু হয়ে বলল, খুব কষ্ট দিচ্ছি, না জয়?

বাসবীকে অনেকদিন এমন অন্তরঙ্গ হতে দেখেনি জয়তিলক। এই মুহূর্তে বাসবীর মুখে মাখা ক্রীমের গন্ধ, চুলের শ্যাম্পুর গন্ধ, নাইটিতে লাগান দামী বিদেশী সেন্টের গন্ধ, জয়তিলকের সামনে এক গন্ধময় জগতের উপস্থিতি ঘোষণা করল। এ গন্ধ নিশ্বাসের সঙ্গে বুকের গভীর থেকে গভীরে চলে গিয়ে সমস্ত অনুভূতির তন্ত্রীগুলোকে সূক্ষ্ম আঘাতের তরঙ্গে আন্দোলিত করতে থাকে।

কি, কথা বলছ না যে জয়?

তোমাকে দেখছি বাসবী।

আমি খুব খারাপ, তাই না?

আমার মনে ও প্রশ্ন তো কোন দিন জাগেনি বাসবী। তাহলে আমি নিজেই চলে যেতাম তোমাকে মুক্তি দিয়ে।

তবে তুমি আমার সম্বন্ধে কি ভাব জয়?

তুমি দারুণ সব খেয়ালের খেলায় মেতে থাক। দেহে তোমার ফুটে ওঠা গোলাপের রেখা আর ছন্দ থাকলে কি হয়, আসলে তুমি আধফোটা এক কিশোরী। ফুটে ওঠার ব্যাকুলতাতেই তুমি চঞ্চল। তোমার গোপন গন্ধটুকু প্রকাশের পথ খুঁজে দিশেহারা।

তুমি কবি হলে আমি আরও খুশি হতাম। তোমার কথায় কবিতা। বিয়ের পর আমি তোমার মত করে কথা বলতে অভ্যেস করেছিলাম, কিন্তু নতুন স্রোতের টানে ভেসে গেছি।

জয়তিলক বলল, তুমি তোমার মত থাকলেই আমি খুশি হব। জাম গাছে জামরুল ফললে সেটা প্রকৃতির বিচিত্র খেয়াল হতে পারে, কিন্তু সেটা স্বাভাবিক নয়। তোমার মনের বিকাশ বা স্বাভাবিক পরিণতি তার নিজের পথ ধরে চলুক, এই আমি চাই। পথ ছেড়ে বিপথে গেলেই পেতে হবে কাঁটা আর নুড়ির আঘাত কিন্তু বার বার আঘাতের অভিজ্ঞতাই তোমাকে ফিরিয়ে আনবে ঠিক পথে।

বাসবী জয়তিলকের কাঁধ থেকে হাত দুটো সরিয়ে নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল। তারপর আবার ঝুঁকে ওর দুটো হাত ধরে টেনে তুলল। কোমরটা আলতো বেষ্টন করে বুকের কাছে চুলে ভরা মুখখানা নিবিড় করে চেপে ধরে বলল, জয়, আমার জয়, তুমি কত ভাল।

জয়তিলক বাসবীকে জড়িয়ে ধরে ওকে উত্তপ্ত চুম্বনে আকুল করে তুলল।

বাসবী একসময় বলল, চল বিছানায় যাই। তোমার ঘুম ভাঙিয়েছি আমি, তোমাকে ঘুম পাড়ানোর দায়িত্বও আমার।

অনিমেষ তরফদার বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখছিলেন, তার বাড়ির বাইরে কে যেন ডাকছে। দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখেন বাসবী।

তরফদার চেঁচিয়ে উঠলেন, কি খবর ডেসডেমোনা? এত রাতে আবির্ভাব!

রাত হলেও দেখুন, আমার সাদা পোশাকের মত ধবধবে জ্যোৎস্না। আমি আপনাকে একটা কথা জানাতে এসেছি।

কি কথা, বল?

আমি মৃত্যুর পর নতুন জীবন পেয়েছি।

খুশি হলাম শুনে। আমার অন্তরের শুভেচ্ছা জেনো।

অনিমেষদা, আমি একটা অন্যায় কাজ করতে চলেছিলাম, কিন্তু আপনি আমাকে ফিরিয়েছেন।

আমি ফিরিয়েছি! কি রকম?

আপনিই ফিরিয়েছেন। ভুজঙ্গ নাগের কাহিনীটা না শুনলে আমি দিগন্তের সঙ্গেই রাত কাটাতাম।

অনিমেষ তরফদার হেসে বললেন, আমি ফেরাবার কে! চোখের আড়ালে এক যাদুকর আছে, সেই খেলোয়াড় সুতো টানছে আর গুটোচ্ছে। ঘুড়ির মত আকাশের বুকে যত ওড়ার খেলাই দেখাও তার লাটাই-এর টানে সবাইকে—না, না করে মাথা দোলাতে দোলাতেও ফিরে আসতে হবে।

বাসবী বলল, আমি তো সেই খেলোয়াড়কে চোখে দেখতে পাচ্ছি না, তাই আপনাকেই সেই খেলার গুরু বলে মেনে নিচ্ছি।

হা হা করে হেসে উঠলেন অনিমেষ তরফদার, আমকে গুরু বানিয়ে দিলে বাসবী! দাদা ডাকো, ডিউক বল, সব সইতে পারব, কিন্তু গুরু বানালে সইতে পারব না। গুরু হবার ধাত থাকে এক এক জনের। ওঁরা বেশ শিষ্য সাবুদ রাজ্যপাট বানিয়ে ফেলতে পারেন, পথেরও নিশানা টিশানা দিব্বি দিয়ে ফেলতে পারেন কিন্তু আমি হলাম ব্যাচিলার বাউন্ডুলে। আড্ডা মারি মদ টানি। খালি মেয়েদের মনের রহস্যটা জানতে পারলাম না বলে হিল্লে হল না এ জীবনে। আমার কথায় যদি তোমার মনের কিছু পরিবর্তন ঘটে থাকে তাহলে জেনো সেটা গুরুর উপদেশ নয়, নিছক গপ্পে লোকের একটা গল্প তোমার মনে গেঁথে গেছে। তার একটা অ্যাক্সন চলছে তোমার ভেতর। এই অ্যাক্সনটা স্থায়ী হবে কিনা, সেটা সময়ই বলবে।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে ছ'টা বাজল। ঘুম ভেঙে গেল অনিমেষ তরফদারের। ঘুম ভাঙল সাত মাইল দূরে বাসবীরও।

বাসবী বিছানায় উঠে বসে দেখল জয়তিলক একটি বলিষ্ঠ নিরুদ্বিগ্ন শিশুর মত ঘুমিয়ে আছে। সে জয়তিলকের গায়ে অসীম মমতায় চাদরখানা টেনে ঢাকা দিয়ে দিল, তারপর ধীরে ধীরে নেমে এল নীচে।

পেছন থেকে কে হঠাৎ চোখ টিপে ধরল শ্রুতির। সবে গান থামিয়ে সে চেয়েছিল ভোরের কাঞ্চনজঙঘার দিকে। সূর্যের সোনা ঝিলিক দিচ্ছিল বরফের চূড়ায়। তার সমস্ত চেতনায় লেগেছিল সেই সোনালী রঙ। এমন সময় কে এল!

শ্রুতি কাঁপছিল মনে মনে। জয়তিলক নয়ত, তাহলে সে মরে যাবে লজ্জায়। লজ্জায় না আনন্দে সে ঠিক বুঝতে পারল না। কাঁপা কাঁপা হাত দুটো তুলে সে আক্রমণকারীকে অনুভব করতে লাগল।

না, এ কোন পুরুষের বলিষ্ঠ বাহু নয়, তারই মত কোন এক নারী তার সঙ্গে কৌতুকে মেতেছে।

কে হতে পারে! তার পরিচিত এমন কেউ নেই এখানে যে তাকে এমন করে কৌতুকের বাঁধনে বাঁধতে পারে!

হাত সরে গেল চোখের থেকে। সামনে মুখ বাড়িয়ে বাসবী বলল, চিনতে পারলে না তো?

শ্রুতি উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে, মিসেস মিত্র!

না, আমি বাসবী। যদি নাম ধরে ডাকতে খুবই অসুবিধে মনে কর তাহলে বাসবীদি বলেই ডেকো। কিন্তু তোমার গান আমাকে এখানে টেনে এনেছে শ্রুতি। এত তাড়াতাড়ি গান থামালে চলবে না। এসো আমরা বসি। তোমার গলা এত মিষ্টি ! সত্যি অবাক হয়ে গেছি।

শ্রুতি লজ্জায় কিছু বলতে পারল না। চোখে মুখে তার ফুটে উঠল একটা সলজ্জ ভাব।

বাসবী শ্রুতির হাত ধরে একটা পাইন গাছের তলায় টেনে বসাল। বলল, বিশেষ গানের ফরমায়েশ করব না, তোমার খুশির গানেই আমার প্রাণ ভরে উঠবে।

চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থেকে শ্রুতি গাইল —

'তোমার গোপন কথাটি, সখী, রেখো না মনে।
শুধু আমায়, বোলো আমায় গোপনে।।
ওগো ধীর মধুরহাসিনী, বোলো ধীরমধুর ভাষে—
আমি কানে না শুনিব গো, শুনিব প্রাণের শ্রবণে।।'

গেয়ে চলল শ্রুতি তার গলার সবটুকু মাধুর্য ঢেলে। গান শেষ হলে সে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল নীচের দিকে চোখ পেতে।

বাসবী বলল, কি আশ্চর্য সম্পদ তোমার গলায়! একটা সুরেলা বাঁশির মত বেজে চলেছে সারাক্ষণ। অপূর্ব! কিন্তু শ্রুতি এ যে প্রিয়তমের কণ্ঠের গান, প্রিয়ার গলার গান তো নয়।

শ্রুতি চোখে মুখে হাসির তরঙ্গ তুলে বলল, আপনি আরও একখানা গান শুনতে চাইছেন তো বাসবীদি?

একখানা কেন অনেকগুলি।

শ্রুতি গাইল,—

'মরি লো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে।।
ভেবেছিলেম ঘরে রব, কোথাও যাবনা—
ওই-যে বাহিরে বাজিল বাঁশি, বলো কী করি।।
শুনেছি কোন্ কুঞ্জবনে যমুনা তীরে
সাঁঝের বেলায় বাজে বাঁশি ধীর সমীরে—
ওগো, তোরা জানিস যদি আমায় পথ বলে দে।।
দেখি গে তার মুখের হাসি,
তারে ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
তারে বলে আসি 'তোমার বাঁশি
আমার প্রাণে বেজেছে ॥'

সত্যি তুমি আমাকে হারিয়ে দিলে শ্রুতি। আমার চাওয়ার উত্তর যে এমন করে পাব তা ভাবতে পারিনি। তুমি গানের গলা নিয়েই জন্মেছ, নার্স হবার জন্যে জন্মাওনি।

এ কথা কেন বলছেন বাসবীদি। নার্সের কাজ করে যে উপার্জন করি সেটা আমার বাইরের ধন, সেটা আমার প্রয়োজনের কড়ি। আর এই গান আমার পরম ধন, একে যত্নে সঞ্চয় করে রাখি অন্তরের গভীরে। আমি সভায় গাই না। আমার মনের সুখ দুঃখের সঙ্গী এ গান। নির্জনে একা গান গাইতে ভালবাসি।

মনের কথা উজাড় করে দিয়ে এবার লজ্জা পেল শ্রুতি। সংকোচের কারণ ঘটলেই নীচের দিকে চোখ নামিয়ে বসে থাকে সে।

বাসবী তার হাত ধরে বলল, তোমার নির্জন গানের আসরে আমি যদি একমাত্র শ্রোতা হই তাহলে খুব আপত্তি করবে কি?

হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে শ্রুতি বলল, না, না, কি যে বলেন। আপত্তি করব কেন? আমি তো মস্ত বড় গাইয়ে।

বাসবী বলল, তোমার গান শুনতে পেলে আমি বড় গাইয়ের দরবারে কোন দিনও যেতে চাই না।

এবার কে যেন বাসবীর চোখ চেপে ধরল পেছন থেকে। বাসবী হাত তুলে আক্রমণকারীকে একবার অনুভব করে নিয়ে বলল, যার সঙ্গে ছাদনাতলায় চারি চক্ষের মিলন ঘটেছিল, সেই আমার দৃষ্টি হরণ করেছে।

জয়তিলক হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, হৃদয় হরণ তো করতে পারলাম না, তাই সাময়িক দৃষ্টি হরণ করেই তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

বাসবী বলল, হৃদয় থাকলে তো হরণ করবে।

স্বামী স্ত্রীর কথার ভেতর থাকতে চাইল না শ্রুতি। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আমি আসছি বাসবীদি।

বাসবী তার হাত ধরে টেনে বসাল। জয়তিলকের দিকে তাকিয়ে বলল, কি ভাল যে গান করে শ্রুতি, তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে। আমি ভাবছি কি জান? আয়, দাঁড়িয়ে রইল কেন, বস না।

জয়তিলক বাসবীর চোখেব নাগালের ভেতর বসল। বসেই বলল, কি ভাবছ তুমি?

বাসবী যেন নিজের দিকে চেয়ে আছে এমনি ভাবে বলল, আমাদের ড্রামা পারফরমেন্সের দিন শ্রুতিই ওপ্‌নিং সঙ করবে।

জয়তিলক বলল, যদ্দুর শুনেছি তোমরা ওথেলো অভিনয় করছ। ইংরাজী নাটকে বাংলা গান দিয়ে শুরু, সে কেমন পরিকল্পনা?

তুমি তো বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলে, সত্যি করে বলতো দেখি রোল কল করতে কি ভাষায়? ইংরাজী না বাংলায়।

জয়তিলক বলল, হার মানছি বাসবী. তুমি এখন শ্রুতিকে দিয়ে চীনে গান গাওয়ালেও বলার কিছু নেই।

বাসবী বলল, আমার আইডিয়াটা একটু ভেবে দেখ। মঞ্চস্থ হচ্ছে সেক্সপিয়ারের নাটক, উদ্বোধন করা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে। দুজনেই মহাকবি আর মহানাট্যকার।

জয়তিলক বলল, অভিনব আইডিয়া তোমার। প্রশংসা না করে উপায় নেই।

শ্রুতি বলল, আমাকে খামোকা কেন বিপদে ফেলছেন বাসবীদি। আমি আপন মনে গাই, সভায় গাইবার গলা আমার নয়।

বাসবী ধমক দিয়ে বলল, খুব হয়েছে থাম। নিজের সমালোচনা নিজে করতে যেওনা। গান গাইতে না পারলেও গানের গলা চিনতে পারব না এমন বে-রসিক ভাবলে কি করে।

অগত্যা রাজি হতে হল শ্রুতিকে। সে বলল, গান কি আপনি নির্বাচন করে দেবেন, না আমিই একখানা গান ভেবে নেব?

একটুও চিন্তা না করে বাসবী বলল, ওসব অনিমেষদার ব্যাপার। ওঁর সঙ্গে তোমার মোলাকাত করিয়ে দেব, সবকিছু দুজনে মিলে ফয়সালা করে নিও। আমি ওর ভেতর নেই।

জয়তিলক বলল, তুমি বাবাকে গান শোনাও নাকি শ্রুতি?

শ্রুতির মুখের ভাবখানা অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। সে ইনিয়ে বিনিয়ে বলল, মানে উনি আমাকে একখানা বই দেখিয়ে বললেন, এর থেকে একটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনাও তো শ্রুতি। বড় ভাল কালেক্‌সান। সব কটাই দেশাত্মবোধক কবিতা।

সত্যি কথা বলতে কি আবৃত্তি করিওনি কোনদিন আর আবৃত্তি আমার গলায় আসেও না। বললাম, আপনি যদি দেশাত্মবোধক গান গাইতে বলেন আমি বরং গেয়ে শোনাতে পারি, কিন্তু আবৃত্তি করতে চেষ্টা করলেই নামতা পড়া হয়ে যাবে।

বাবা, বললেন,—

সঙ্গে সঙ্গে বাসবী জানতে চাইল, বাবা কে?

হকচকিয়ে গিয়ে শ্রুতি বলল, জয়তিলকদার বাবা, মিঃ মিত্র।

বিদ্যুৎ চমকের মত জয়তিলকের মুখের ওপর দিয়ে বাসবীর দৃষ্টি খেলে গেল। 'জয়তিলকদা' 'বাবা' এমন ঘনিষ্ঠ শব্দগুলো বেশ কিছু অন্তরঙ্গতা ছাড়া প্রয়োগ করা যায় না।

পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে বাসবী বলল, হাঁ, বাবা কি বললেন?

শ্রুতি কিছুটা সামলে নিয়েছে। সে বলল, উনি গান গাইতেই বললেন। তবে কোন ভজন, কীর্তন বা অন্য কোন ধর্মসংগীত নয়। দেশাত্মবোধক গানই শুনতে চাইলেন।

জয়তিলক বলল, বাবা চিরটা কাল ন্যাশনাল মুভমেন্টের সঙ্গে কোন না কোন রকমে জড়িত ছিলেন। তাই দেশাত্মবোধক কবিতা বা গান ওঁর কাছে খুবই প্রিয়। আমরা ইস্কুলে 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটি প্রার্থনা সংগীত হিসেবে গাইতাম।

বাসবী বলল, তুমি বল শ্রুতি, সেদিন 'তোমার বাবার কাছে' কি গান শুনিয়েছিলে?

'তোমার বাবার কাছে', কথাটা জয়তিলক আর শ্রুতির কানে আচমকা এসে যেন আঘাত হানল।

শ্রুতি তার মনের ভাবটুকু গোপন করে স্পষ্ট গলায় বলল, ঠিক মনে পড়ছে না বাসবীদি।

হেসে উঠে বলল বাসবী, এতে একটা বিষয় কিন্তু স্পষ্ট হয়ে উঠল। তোমার গানের স্টক অফুরন্ত। অনেক গান জানা থাকলে কোন গানটা কখন গাওয়া হয়েছে তা শিল্পীর মনে থাকে না।

শ্রুতি অস্বীকারের ভঙ্গীতে দ্রুত মাথা নেড়ে বলল, না না, আমি অতি সাধারণ গাইয়ে, একটুও বিনয় না করে বলছি। আমার গানের স্টক বলে এমন কিছু একটা নেই। ভাল লেগেছে যে দু দশখানা গান, তাই গলায় তুলে রেখেছি।

বাসবী উঠে দাঁড়াল হঠাৎ। বলল, আজ সারাদিন বাড়ি থেকে আর বেরুব না। তুমি তো তোমার কোয়ার্টারে থাকছ শ্রুতি। আমি অনিমেষদার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করছি। যদি তিনি আসতে পারেন তাহলে তোমাকে বাংলোতে ডেকে নেব।

শ্রুতি আর জয়তিলক উঠে দাঁড়িয়েছিল। শ্রুতি ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানাল। বাসবী জয়তিলকের দিকে ফিরে বলল, কোথায় যাবে এখন? বাবার কাছে নাকি?

জয়তিলক বলল, বাবা এখন রুটিনের ছকে কাজ করে যাবেন, এখন ওঁকে ডিসটার্ব করা ঠিক নয়। চারটের পর ওঁর কাছে বসে গল্প করা যেতে পারে। চল, বাংলোতেই যাই।

শ্রুতি একটু হেসে ওপরে উঠে গেল। বাসবী জয়তিলককে বলল, মেয়েটি বেশ মিষ্টি স্বভাবের, তাই না?

জয়তিলক বলল, বাইরে থেকে তো তাই মনে হয়। তবে মেয়েরাই মেয়েদের সবচেয়ে ভাল চেনে।

নীচে নামতে নামতে ওদের কথা হচ্ছিল। বাসবী হঠাৎ থমকে থেমে বলল, সে কি কথা, এতদিন ওকে এত ঘনিষ্ঠভাবে দেখলে অথচ চিনতে পারলেনা!

জয়তিলক বলল, শ্রুতি যেখানে নার্স, সেখানে ওর কাজ ঠিক মত হচ্ছে কিনা তা আমি নিখুঁত করে দেখি, কিন্তু ও যেখানে কেবল একটি মেয়ে সেখানে আমার চেনার প্রশ্নই ওঠেনা।

বাসবী এবার চলতে চলতেই বলল, কিন্তু জয়, ঘনিষ্ঠ না হলে তো কেউ কাউকে দাদা বলে ডাকেনা।

জয়তিলক মনে মনে আগেভাগেই সম্ভাব্য প্রশ্ন আর তার উত্তরটা ঠিক করে রেখেছিল। সে বলল, তুমি 'বাসবীদি' হলে আমি কি শুধু মিঃ মিত্রই থেকে যাব? তোমার সুবাদে আমিও 'জয়তিলকদা' হয়ে গেলাম।

তা না হয় মানলাম, কিন্তু তোমার বাবা ওর বাবা হল কবে থেকে?

জয়তিলক বলল, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একজন পঙ্গু বৃদ্ধ মানুষকে যদি তার মেয়ের বয়সী একটি নার্স বাবা বলেই ডেকে থাকে তাহলে সেটাকে বিশেষ একটা অর্থপূর্ণ ব্যাপার বলে আমি গুরুত্ব দিইনা।

বাসবী বলল, এমন গম্ভীর গলায় কথা বলছ কেন? একটুও রসিকতা করার অধিকার কি আমার নেই?

জয়তিলক বলল, থাক ওসব কথা। প্রতিদিন তো তুমি কাজ নিয়ে ছুটোছুটি কর, আজ একটি দিন মাত্র কাজ ছাড়া বাংলোতে রয়েছ, তাই অনুরোধ, আজকের দিনটা আমাদের ভেতর অন্য কারুর প্রসঙ্গকে ঢুকতে দিওনা।

বাসবী হেসে বলল, অত সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছ কেন জয়?

ওরা বাংলোর লনে এসে পড়েছিল। বাসবী জয়তিলকের হাতটা নিজের হাতের ভেতর ভরে নিয়ে একটা ঝাকানি দিল। যেন ঘরে ঢোকার আগে সবকিছু ঝেড়ে ফেলে দিতে চায়।

হঠাৎ বাংলোর পাশের রাস্তায় ডিম্ ডিম্ শব্দে একটা বাজনা বেজে উঠল। বাজনা থামতেই একটা লোকের চেঁচানি শোনা গেল। সে তারস্বরে কিছু একটা ঘোষণা করছিল।

জয়তিলক আর বাসবী দাঁড়িয়ে গেল। ঘোষণার বিষয়বস্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না।

হঠাৎ আবির্ভাব বাহাদুরের।

বাসবী বলল, কি হয়েছে বাহাদুর?

বাহাদুর যা বলল তার মর্মার্থ এই, তিস্তার কূলে যে মেলা হয় তাতে এ তল্লাটের সব টি-এস্টেটের কুলি কামিন জড়ো হয়। তার ওপর দূর দূর থেকে আসে সব পাহাড়ীরা। জ্যোৎস্না রাতে তাদের ভেতর নাচের প্রতিযোগিতা হয়। সেই প্রতিযোগিতায় গ্রীন ভ্যালি টি-গার্ডেনের মোতিয়া প্রথম হয়ে পুরস্কার জিতে নিয়েছে। আর যুগল নাচে শ্যাম বাহাদুর, মোতিয়া জুটিও সবাইকে হারিয়ে পুরস্কার পেয়েছে। যুগল নাচ বড় কঠিন নাচ। বিরাট জায়গা জুড়ে নাচ চলবে পাঁচ দশটা দলের। তারা নানা কসরৎ দেখিয়ে নাচতে থাকবে। কিন্তু বড় কথা হল, ক্লান্ত হয়ে যে দল থামবে সে দল আউট। শ্যামবাহাদুর আর মোতিয়া নাকি পরদিন সকাল আটটা অব্দি নেচে ট্রফি জিতে নিয়েছে। এই প্রথম একটা টি-গার্ডেন ট্রফি পেল। প্রতি বছর পাহাড়ীরা জিতে নিয়ে যায়।

খবর শুনে দারুণ খুশি হয়ে উঠল ওরা দুজনে। বাসবী বাহাদুরকে বলল, ডাক ঐ লোকটিকে।

বাহাদুর ডেকে আনল ঘোষককে।

জয়তিলক বলল, আরে, এ যে শ্যাম নিজে! কি শ্যামবাহাদুর কি খবর?

শ্যামবাহাদুর সবিনয়ে জানাল, মোতিয়া প্রাইজ পেয়েছে। সব থেকে ভাল নাচ নেচেছে সে তিস্তা মেলায়।

শ্যামবাহাদুর কিন্তু নিজের কথা নিজের মুখে বলল না।

বাসবী বলল, তুমিও তো মোতিয়ার সঙ্গে নেচে ট্রফি জিতে এনেছ।

এবারও শ্যামবাহাদুর নিজের কৃতিত্বকে আড়ালে রেখে বলল, মেমসাব, মোতিয়া বহুৎ আচ্ছা নাচ নেচেছে।

বাসবী বলল, তোমরা দুজন বাংলোতে ও বেলা এসো।

শ্যাম বলল, ও আমার সাথে আসবেনা মেমসাব।

সে কি! আমি ডেকেছি বোলো।

শ্যামবাহাদুর মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল, কোন কথা বলল না।

জয়তিলক বলল, আচ্ছা, তুমি এখন তোমার কাজে যাও শ্যাম। বাহাদুরকে দিয়ে খবর পাঠালে তখন এসো। মেমসাব তোমাদের বখ্‌শীস করবে।

শ্যাম চলে গেল। বাসবী বলল, কি ব্যাপার জয়, মোতিয়া শ্যামের সঙ্গে আসবেনা কেন? ওরা তো দুজনেই নেচে প্রাইজ পেয়েছে!

জয়তিলক বলল, প্রাইজ পেয়েছে ঠিক, কিন্তু মোতিয়া ওকে একদম আমল দেয়না। শ্যাম কিন্তু মোতিয়াকে খুব ভালবাসে।

এমন সময় বাইরের রাস্তায় আবার ডুগডুগি বেজে উঠল। শ্যামের তারস্বরে ঘোষণা শোনা গেল কয়েকবার। গ্রীনভ্যালি টি-গার্ডেনের মোতিয়া যে এবার মেলায় সব দলকে হারিয়ে ট্রফি জিতে এনেছে, সেই ঘোষণা। আশ্চর্য! নিজেও যে সেই কৃতিত্বের অন্যতম অংশীদার, সে ঘোষণা কোথাও নেই।

শ্যামের ঘোষণা দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যেতে লাগল। জয়তিলকের চোখের ওপর ভেসে উঠল যুগল মূর্তি। হোলির জ্যোৎস্না ঝরা রাতে শ্যাম আর মোতিয়া নাচছে। যেন স্বর্গ আর মর্তের মাঝামাঝি কোন জগতের বুকে দাঁড়িয়ে নাচছে একজোড়া কিন্নর কিন্নরী।

ফোনে যোগাযোগ হল বাসবীর সঙ্গে অনিমেষ তরফদারের। ওপার থেকে পুরুষ কণ্ঠ 'হ্যালো' বলতেই বাসবী বলল অনিমেষদা কথা বলছেন?

গানে ওপার থেকে মিঃ তরফদারের উত্তর এল,

'কে তুমি ঘুম ভাঙায়ে, কেন মোরে,
ডাকিলে গো এ আঁধারে?
স্বপ্নে যারে চেয়েছিনু
সে বুঝি চাহে আমারে।'

বাসবী বলল, আশ্চর্য অনিমেষদা, আমি আপনাকে গানের ব্যাপারেই ফোন করছি।

তাই তো গানে উত্তর দিলাম।

বাসবী বলল, স্বপ্নে যারে চেয়েছিলেন সে কিন্তু আপনার ঘুম ভাঙায়নি।

আমি কাকে স্বপ্নে চেয়েছি, সেটা কি তোমাকে বলেছি?

অন্তত বাসবী মিত্র যে নয় সেটা হলফ করে বলতে পারি।

তুমি আবার 'মিত্র' হলে কবে থেকে বাসবী?

কেন, বিয়ের পর থেকে।

হাহা করে ওপারে হেসে উঠলেন তরফদার, তুমি তো 'শত্রু'।

কার সঙ্গে শত্রুতা করেছি বলুন?

আর কারু সঙ্গে না কর, আমার সঙ্গে করেছ।

কি রকম?

এই যে অকালে সিক্সটি আপ মানুষটার ঘুম ভাঙালে। এটা কি খুব একটা মিত্রজনোচিত কাজ?

বাসবী আনুনাসিক গলায় বলল, অনিমেষদা, খুব জরুরী কথা আছে, আপনি খালি সবকিছুকে হাল্‌কা করে দিচ্ছেন।

বল, আমি এখন সিরিয়াস।

একটি মেয়ে জোগাড় হয়েছে।

কার জন্যে? তুমি তো সাংঘাতিক, বুড়ো লোকটার আইবুড়ো দশা ঘোচাবার প্ল্যান করছ বুঝি?

আবার অনিমেষদা! উঃ, আপনি একটু শুনবেন আমার কথা?

বল।

মেয়েটি জয়ের বাবার কাছে নার্সের কাজ করে।

বেশ।

ওর নাম শ্রুতি।

কি নাম বললে?

শ্রুতি।

বেশ।

ও খুব ভাল গাইতে পারে। আপনি ঝটপট আমার এখানে চলে আসুন। ওর গানের পরীক্ষা নিন। পাশ করলেই আমাদের ফাংশানের ওপনিং সঙ্‌ ওকে দিয়ে গাওয়াব।

তুমি তো পাশ মার্ক দিয়েই রেখেছ, তাতেই হবে।

এ আপনার না আসার মতলব। এত কুঁড়ে হয়ে গেছেন আপনি। প্লিজ অনিমেষদা, একবারটি চলে আসুন।

বেশ তুমি যখন বলছ তখন যাচ্ছি। তবে ওল্ডম্যান রাতে কি ফিরতে পারব?

আমার এখানে রাতে থাকার জন্যে আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সত্যি অনিমেষদা রাতে আর ছাড়ছিনা আপনাকে।

আমি থাকতে না চাইলেও!

বাসবী চড়া গলায় বলল, আপনার ইচ্ছার তোয়াক্কা কে করে। আপনি এখানে থাকবেন ব্যস্।

জো হুকুম। অনেকখানি পথ যেতে একটু দেরী হলেও কিছু ভেবনা। তোমার কিংবা দিগন্তের হাতে স্টিয়ারিং থাকলে গাড়িটা এরোপ্লেন হয়ে যায়, আর আমার হাতে থাকলে বড় জোর একখানা ফিটন। ছাড়ছি।

ফোন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বাসবী। কুক্‌কে রাতের রান্নার ফরমায়েস করে এল। জয়তিলক লনে বসে রোদ্দুরে গা গরম করছিল, বাসবী তাকে পেছনে থেকে ছোট্ট একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, শুনছ, অনিমেষদা আসছেন। ওঁকে তোমার শ্রুতির গান শোনাব। দারুন সমঝদার গানের। আজ রাতে ওঁকে আমি থাকতে বলেছি। বয়েস হয়েছে রাতে ড্রাইভ করে ফেরাটা ঠিক হবে না।

জয়তিলক বাসবীর দিকে ফিরে বলল, খুব ভাল কথা। মিঃ তরফদারের সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হবে। রাতে বেশ গল্প জমবে। খুব মজলিশি মানুষ উনি। কিন্তু তুমি যেন আর একটা কি কথা বললে? হ্যাঁ, মিঃ তরফদারকে কার গান শোনাবে।

শ্রুতির। তোমার একান্ত পরিচিত একটি মেয়ের।

জয়তিলকের গলায় ক্ষোভ, তোমরা বোধহয় এসব কথা খুব সহজেই ব্যবহার করতে পার?

আবার সিরিয়াস হয়ে গেলে তুমি জয়!

ঠিক আছে। তুমি সহজভাবে বললে আমিও কোন গুরুত্ব দেবনা কথাটায়।

বাসবী বলল শ্রুতিকে এখানে রাতে বেশ কিছু সময় আটকে রাখলে তোমার বাবার অসুবিধে হবে না?

হয়ত কিছুটা হবে তবে সে সময়টুকু বাহাদুরকে ওখানে পাঠিয়ে দেব। রুক্মী বাবাকে খাইয়ে চলে যাবে।

বাসবী বলল শ্রুতির গলাখানা সত্যিই সুন্দর। ওর গলায় বেশ কয়েকখানা গান শোনার ইচ্ছে আছে আজ। ওকে এখানেই খেতে বলি কি বল?

শুতে বললেও আমার আপত্তির কিছু নেই।

খিল খিল করে হেসে উঠল বাসবী। হাসি আর থামতেই চায়না। বলল, এবার তোমার দিকের আক্রমণটা খুব ভালই শানিয়েছ। এই তো চাই। একেবারে পিউরিটান হয়ে বসে থাকলে একটুও ভাল লাগে না।

খানিক থেমে বলল বাসবী, আমার কিন্তু একটুও আপত্তি নেই। তুমি জান, আমি এসব ব্যাপারে ভীষণ লিবারেল।

জয়তিলক বলল, বেশ, পরে ওসব ভেবে দেখা যাবে। এখন বাগান থেকে কিছু ফুল সংগ্রহ করে ড্রইংরুমটা সাজান যাক্।

বাসবী টিপ্পনি কাটল, দারুণ রোমান্টিক অ্যাটমোসফিয়ার তৈরী হবে।

জয়তিলক আর বাসবী দুজনে মিলে ড্রয়িংরুমখানা ফুল, নতুন পর্দা আর গালচে এনে সাজাল। বিরাট ঘরখানা কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে মুখ করে অপরূপা হয়ে উঠল। ঘরের সাজসজ্জার পর নিজে স্নান সেরে প্রসাধনে মন দিল বাসবী। বিকেলে স্নান করে হেয়ার ড্রায়ারে চুল শুকিয়ে নেবার অভ্যেস তার অনেকদিনের। হাল্‌কা ভায়োলেট অর্গাণ্ডির একখানা শাড়ি, ভায়োলেট রঙের ব্লাউজ আর টিপ পরে বাসবী যখন ড্রইংরুমে এল তখন সাদা পাজামা আর সিল্ক বাফতার একখানা পাঞ্জাবী গায়ে চড়িয়ে সোফায় বসেছিল জয়তিলক।

বাসবী ঘরে ঢুকেই বলল, শ্রুতিকে এখন ডেকে পাঠালে হয়।

মিঃ তরফদারকে তো আগে এখানে পৌঁছতে দাও।

বাসবী বলল, তুমি বুঝছনা কেন জয়, শ্রুতিকে এখন ডাক দিলে তার ওখানকার ডিউটি সেরে বেরিয়ে আসতে কিছুটা সময় নেবে। আমি ওকে একটা স্লিপ লিখে বাহাদুরের হাতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কথাগুলো বলেই জয়তিলকের উত্তরের অপেক্ষা না করে বাসবী স্টাডিতে গিয়ে ঢুকল। কাগজ আর পেন নিয়ে চিঠি লিখতে বসল শ্রুতিকে।

প্রিয় শ্রুতি, অনিমেষদা এলে তোমাকে খবর দেবার কথা ছিল। উনি রওনা হয়েছেন, তাই খবরটা তোমাকে পৌঁছে দিলাম। কাজ গুছিয়ে চটপট তৈরী হয়ে চলে এস। এখানে গান শুনিয়ে ডিনার সেরে ফিরবে। রুক্মী তোমার বাবাকে রাতের খাবার খাইয়ে বাড়ি ফিরবে। আমি এখান থেকে বাহাদুরকে পাঠাচ্ছি। তোমার না ফেরা অব্দি ও ওখানে থাকবে। তাড়া নেই, তবু যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি এলে খুশি হব।

বাসবী।

অনিমেষ তরফদারের গাড়ি লনে ঢুকতেই দেখা গেল ড্রাইভারের আসনে বসে দিগন্ত সোম আর তার পাশটিতে মিঃ তরফদার বসে।

বাসবী দ্রুত পায়ে গাড়ির কাছে এগিয়ে গেল। ঠোঁটের ফাঁকে বাইরের হাওয়াটা এক ধরণের অদ্ভুত শব্দ করে টেনে নিয়ে বাসবী তার বিস্ময় আর আনন্দের অনুভূতিটুকু প্রকাশ করল। মুখে বলল, আশ্চর্য! তুমি কোত্থেকে দিগন্ত?

গাড়ি থেকে নামতে নামতে দিগন্ত সোম বলল, খুশি হলে না তো?

দ-া-রু-উ-ণ।

অনিমেষ তরফদার বললেন, কেমন সারপ্রাইজ দিলুম ডেসডেমোনা। ওথেলো সশরীরে হাজির।

দারুণ মজা করলেন আপনি।

ভেতরের দিকে তাকিয়ে বাসবী ডাকল, জয়, তোমার গেস্টরা এসে গেছেন।

জয়তিলক স্টাডিতে ঢুকে বইগুলো সাজিয়ে রাখছিল। বেরিয়ে এসে হাত তুলে নমস্কার করল।

অনিমেষ তরফদার বললেন, ব্রাদার, ভয় নেই, তোমার ভোজ্য, পানীয়ে ভাগ বসাব না। তুমি তো বৈষ্ণব, শাকসব্জি, তুলসীপাতার রসে মজে আছ। আমরা ঘোরতর শাক্ত। মদ্য মাংসেই আমাদের পরিতৃপ্তি। উপরি অতিথিটির জন্যে ভাবনা নেই, আমরা তিনজন শাক্ত ভাগ করে খাব।

জয়তিলক হেসে বলল, মিঃ সোম আসতে দারুণ খুশি হয়েছি।

অনিমেষ তরফদার বললেন, বাসবী আর তোমার মুখে সোমের জন্যেই যত আনন্দ উচ্ছ্বাস, আর আমি কি বৃদ্ধ বলে উপেক্ষিত নাকি?

জয়তিলক বলল, মিঃ সোমের আগমনটা অপ্রত্যাশিত, তাই উচ্ছ্বাসটা খুবই স্বাভাবিক, আর আপনি আজ আমাদের প্রত্যাশিত অতিথি, তাই আপনার আসার আগেই আপনার উপস্থিতি আমাদের মনের মধ্যে স্থায়ী হয়ে আছে। আজকের ডিনারে আপনিই প্রধান।

মিঃ তরফদার বাসবীর দিকে চেয়ে বললেন, পার্টনারটিকে তো বেশ তৈরী করেছ দেখছি। হার মানাতে পারা যাবে না সহজে।

জয়তিলক বলল, আমার নামেই কেবল 'জয়' অনিমেষদা, কিন্তু আমি সব বিষয়ে সবার কাছে হার মেনে বসে আছি।

একটু থেমে জয়তিলক বলল, আসুন দাদা ভেতরে। আসুন মিঃ সোম।

ঘরে ঢুকেই বললেন মিঃ তরফদার, তোমার গায়িকা কোথায় গেল বাসবী, তাঁকে তো দেখছি না।

বাসবী বলল, ও আমাদের সকলের ছোট তাই সম্মান দিয়ে ওকে কথা বলতে হবে না। ওকে আপনারা তুমি বললেই আমার নিশ্চিত ধারণা ও খুশি হবে। হ্যাঁ, অনিমেষদা ও এখুনি এসে পড়বে। এখন বলুন, কফি না চা?

চা খেতে খেতে পেটে পলি পড়ে গেছে, কফিই হোক্, কি বল ওথেলো?

মিঃ সোম মাথা নেড়ে বলল, কোনটাতেই আমার আপত্তি নেই।

ওঁরা ড্রইংরুমে বসে ঘর সাজানোর তারিফ করতে লাগলেন। একটু পরেই কফি এল। টুকরো টুকরো কথার সঙ্গে কফি-পান চলল।

একসময় আগন্তুকদের প্রায় চমকে দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল শ্রুতি। তরতাজা তরুণী। সাদা নাইলনের জর্জেটের ওপর লাল, সবুজ এমব্রয়ডারীর বুটী তোলা শাড়িতে ওকে দারুণ মানিয়েছে। বুক আর গলা বেষ্টন করে একখানা ক্রিম রঙের আলোয়ান।

বাসবী বলল, আরে এসো এসো, আমরা সবাই তোমার পথ চেয়ে রয়েছি।

হাত বাড়িয়ে মিঃ তরফদারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে যেতেই অনিমেষ তরফদার গেয়ে উঠলেন,

'আমি চিনিগো চিনি তোমারে
ওগো বিদেশিনী,
তুমি থাক সিন্ধু পারে
ওগো বিদেশিনী।'

গান থামিয়ে বললেন, এসো, বস শ্রুতি। আমি সবার অনিমেষদা। বাচ্চা বুড়ো সকলের। তুমি অসংকোচে আমাকে ঐ নামে ডাকতে পার।

শ্রুতি দুটো চোখ ছোট করে ভারী মিষ্টি হাসি হাসল।

বাসবী এবার বলল, ইনি আমাদের বন্ধু দিগন্ত সোম। তুমি মিঃ সোম বলে ডাকতে পার।

আর সোম, এ হল শ্রুতি, আমাদের বিশেষ প্রিয়। জয়ের বাবার গার্জেন। তাঁর তদারকির সব ভারটুকু ওর ওপর।

পরস্পর নমস্কার বিনিময় করতেই অনিমেষ তরফদার বললেন, আমার বেলা এক টুকরো হাসি আর দিগন্তের বেলা দু'হাত তুলে নমস্কার! আমি কি এতই লঘুজন কন্যে।

শ্রুতি এগিয়ে পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করবার জন্যে নত হতেই হাত ধরে তাকে তুলে ধরলেন দীর্ঘদেহী তরফদার। বললেন, তোমার হাসি টিউলিপ ফুলের মত। তুমি আমাকে সেই হাসি দিয়ে একেবারে কাছে টেনে নিয়েছ। আমি কি এতই বোকা যে তোমার প্রণাম নিয়ে আবার দূরের মানুষ হয়ে যাব। এখন এসো আমরা আসরের মাঝখানে গাল্‌চের ওপর বসি। গান শুরু হোক্।

বাসবী ঘরের ভেতর উঠে গিয়ে হারমোনিয়ামটা নিয়ে এল।

সুন্দর সচ্ছন্দ ভঙ্গীতে হারমোনিয়ামটা কাছে টেনে নিয়ে গান ধরল শ্রুতি।

'আজ আমার শূন্য ঘরে আসিল সুন্দর,
ওগো অনেক দিনের পর।
আজ আমার সোনার বঁধু এল আপন ঘর,
ওগো অনেক দিনের পর।'

গান শেষ হলে সবাই একসঙ্গে তারিফ করে উঠল। বনের আড়ালে ফুটে ওঠা ফুলের মত এমন একটি কণ্ঠকে আড়াল থেকে সবার সামনে এনে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে বাসবীকে ধন্যবাদ দিল দিগন্ত সোম।

মিঃ তরফদার বললেন, কে তোমার সুন্দর শ্রুতি, যে আজই তোমার শূন্য ঘরে এল? কে সে ভাগ্যবান একবার বলে দাও, শুনে কান জুড়োক।

শ্রুতি কোন কথা না বলে মিষ্টি মিষ্টি করে হাসতে লাগল। বাসবী বলল, আর যে হোক্ আপনি যে এই গানের বঁধু নন তা হলফ করে বলতে পারি।

অনিমেষ তরফদার বললেন, বিয়ে করিনি, বঁধু হবার সব যোগ্যতাই ছিল বাসবী, কেবল বয়েসটা পথে বসিয়ে দিয়েছে।

জয়তিলক বলল, আপনি অনেক তরুণের চেয়েও তরুণ।

কৃত্রিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনিমেষ তরফদার বললেন, ভাই ও কথায় কি আর চিঁড়ে ভিজবে, না তরুণীর মন ভিজবে। তবে শোন গায়িকা, তুমি যে আকুল গলায় গাইলে, 'আর ছেড়ে যেয়োনা বঁধু

জন্ম-জন্মান্তর'—ওটা তোমার অতিরিক্ত বলা। এমন সুন্দরী তরুণী আর তার এমন সুমিষ্ট কণ্ঠের গান ছেড়ে চলে যাবার হিম্মৎ কোন বঁধুর আছে কিনা আমার জানা নেই।

জয়তিলক বলল, গানটি যার উদ্দেশ্যেই নিবেদন করা হোক্ না কেন, সে যে ভাগ্যবান, এ বিষয়ে সন্দেহ কি।

মিঃ তরফদার বললেন, সাবধান বাসবী। অধ্যাপকের রস-উৎসের মুখটা খুলে গেছে। কিন্তু ব্রাদার, এ বৃদ্ধ তো নয়ই, ইয়ং হলেও তুমি ওর গানের উপলক্ষ্য হতে পারনা, কারণ তোমার ঘরে একটি সুন্দরী বউ আছে। একমাত্র এখানে আমাদের ঈর্ষার পাত্র এই সোমটা। ও একদিকে বলিষ্ঠ যুবক, অন্যদিকে ব্যাচিলার।

শ্রুতি বলল, আমি আর গাইবনা অনিমেষদা। আপনারা যা শুরু করেছেন।

মিঃ তরফদার বললেন, কেউ আর একটি কথাও বলবে না সিস্টার। তুমি একটির পর একটি গান গেয়ে যাও। আমরা মনে মনে বাহবা দিলেও, কথা দিচ্ছি, মুখ ফুটে সে বাহবা বেরুবে না।

বহু রাত অবধি পান, ভোজনের ব্যবস্থা। ডিনারের আগে ওরা পানীয় নিয়ে বসেছিল, তাই বাসবী শ্রুতির খাবার ব্যবস্থাটা আগে ভাগেই করে দিয়েছিল। ওকে ফিরে যেতে হবে আউট হাউসে। জয়তিলক পান রসের রসিক নয়, তাই সে চলল শ্রুতিকে পাইন ফরেস্টের পথটুকু পার করে দিতে। ফিরে এসেই ওদের সঙ্গে ডিনারে বসবে।

ওরা দুজনে পাশাপাশি হেঁটে উঠছিল ওপরের দিকে। পাইন বনে জ্যোৎস্নার জোয়ার শুরু হয়ে গিয়েছিল। শ্রুতি হঠাৎ একটা পাইনের কাণ্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। জয়তিলকও দাঁড়িয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার ভেতর কাটল। শ্রুতির দুটো হাত পাইনের কাণ্ডটিকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেছিল। মুখখানা কাৎ করে সে দাঁড়িয়েছিল দর্শনীয়. এক ভঙ্গীতে।

জয়তিলক একসময় চাপা গলায় বলল, দাঁড়ালে যে শ্রুতি, কষ্ট হচ্ছে বুঝি ?

মুখখানা এবার সোজা করে জয়তিলকের দিকে তাকাল শ্রুতি। গভীর গলায় বলল, আপনার কষ্ট হয়না?

কই না তো।

আমার কষ্ট হয়। আজ আপনাদের আসরে আমি না গেলে এত কষ্ট পেতাম না।

কি হয়েছে শ্রুতি, কে তোমাকে আঘাত করল?

প্রথমে মাথা নেড়ে শ্রুতি জানাল, কেউ ওকে আঘাত করেনি। তারপর ব্যথা আর ক্ষোভ গলায় মিশিয়ে বলল, তুমি কি কিছুই বুঝতে পারনা জয়তিলকদা? তোমার মন বলে কি কোন বস্তু নেই?

এই প্রথম জয়তিলককে সে 'তুমি' বলে সম্বোধন করল!

জয়তিলক এতক্ষণে সচেতন হয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে শ্রুতির কথার তাৎপর্যটুকু।

ম্লান এক টুকরো হাসি মুখে টেনে জয়তিলক বলল, এই প্রথম আভাস পেলে তাই তোমার এতখানি বেজেছে, আর আঘাত পেতে পেতে অনুভূতিগুলো আমার অসাড় হয়ে গেছে।

ক্ষোভের সঙ্গে বলল শ্রুতি, এর কোন প্রতিকার নেই?

আমাকে সবকিছু ছেড়ে চলে যেতে হয়।

বোধহয় সেটাই ভাল ছিল।

জয়তিলক গভীর গলায় বলল, শ্রুতি, একটা মূর্তি ভেঙে গেলে তাকে ফেলে দেওয়া কোন কঠিন কাজ নয়, কিন্তু, তার ভাঙা দাগ মিলিয়ে নতুনের মত করে গড়ে তোলা একজন নিষ্ঠাবান দক্ষ ভাস্করের কাজ। অসীম ধৈর্য ছাড়া তা সম্ভব নয়। আমি ততবড় ভাস্কর নই তবু ধৈর্যের সঙ্গে ভাঙা টুকরোগুলো জোড়া দেবার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

হঠাৎ জয়তিলকের একখানি হাত ধরে শ্রুতি বলল, আমাকে ক্ষমা কর জয়তিলকদা। আমি তোমাকে আঘাত দিয়ে কথা বলতে গিয়ে নিজেও কম আঘাত পাইনি। তুমি আর অনিমেষদা যখন

আমার মুখোমুখি বসে গান শুনছিলে তখন মিঃ সোম আর বাসবীদি মেঝের কার্পেট থেকে উঠে গিয়ে তোমাদের পেছনে সোফায় বসল পাশাপাশি। তোমরা না দেখতে পেলেও আমার দৃষ্টির ভেতরেই তারা বসেছিল। আমি জানিনা, আমাকে ইচ্ছে করেই বাসবীদি উপেক্ষা করল কিনা। অথবা আমাকে প্রকারান্তরে জানাতে চাইছিল, মিঃ সোম তারই একমাত্র ভালবাসার পাত্র, আমি যেন তার দিকে নজর না দিই। তারা আমার চোখের ওপরে যে আচরণ করছিল তা আমার স্নায়ুতে দারুণ আঘাত দিচ্ছিল। বিশ্বাস কর, আমি তখন রেকর্ড প্লেয়ারে চাপান রেকর্ডের মত গান করে গেছি। আমার সমস্ত শরীর সংকোচে, ক্ষোভে, দুঃখে থর থর করে কাঁপছিল।

জয়তিলক শ্রুতির ধরে থাকা হাতখানা টেনে নিলনা। সে তার আর একখানা হাত শ্রুতির হাতের ওপর চেপে ধরে বলল, হয়ত তুমি আমার কাপুরুষতাকে ঘৃণা করবে শ্রুতি, কিন্তু আমি যথার্থই একদিন তোমার বাসবীদিকে ভালবেসেছিলাম। আমার মনের ওপর থেকে তার সেদিনের মুখের ছবিখানা আজও মুছে ফেলতে পারিনি। আমার দুর্বলতা বল, কাপুরুষতা বল, সেদিনের সেই ছবির সঙ্গে জড়ান।

শ্রুতি বলল, বাসবীদিকে তুমি খুব ভালবাস, তাই না জয়তিলকদা? আর তাই তুমি জেনে শুনেও ওর সব দোষ ক্ষমা করে দিতে পার।

বিশ্বাস কর শ্রুতি, ওর এই ঐশ্বর্যের ওপর আমার কানাকড়ি মোহ নেই। শুধু মেয়েটাকে একদিন ভালবেসেছিলাম, সেই স্মৃতি। ও যদি সমস্ত কোলাহল থেকে মুক্তি নিয়ে আমার সঙ্গে কোন নির্জন অখ্যাত জায়গায় গিয়ে বাসা বাঁধতে পারত তাহলে বুঝিয়ে দিতাম ভালবাসা কাকে বলে। আমি জানি, একদিন এই কোলাহলের ভেতর ক্লান্ত হয়ে পড়লেই ও আমার খোঁজ করবে। আমি সেই আশা নিয়ে অপেক্ষা করে আছি শ্রুতি।

তুমি বড় ভাল জয়তিলকদা। আমি তোমাকে যতটুকু ভাল ভাবতাম তার চেয়ে অনেক বড় তুমি।

বড় কি ছোট তা আমি জানি না শ্রুতি, তবে আদর্শবাদী বাবার কাছে থেকে আমি মানুষ হয়েছি, তাই ছলনার ব্যাপারটা কোন দিনই আমি শিখতে পারিনি। আজ একটি সত্য তোমার কাছে বলব শ্রুতি, যদি তুমি অন্যায় বলে মনে কর তাহলে শাস্তি দিতে পার।

এমন কথা বলবেন না জয়তিলকদা। শাস্তি আপনাকে যে দিতে পারে তার অনেকখানি ক্ষমতার দরকার। সে ক্ষমতার কণামাত্রও আপনার শ্রুতির নেই।

জয়তিলক বলল, তবু নিজের অপরাধের কথা বলে গ্লানির হাত থেকে মুক্ত হতে চাই শ্রুতি।

একটু থেমে জয়তিলক বলল, যেদিন শেষ বেলায় এই পাইনের বনে তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়ালাম, সেদিন প্রতিমুহূর্তে তোমার ভেতর আমার মন আমার প্রথম দিনগুলোর বাসবীকে খুঁজে পাচ্ছিল। আমার ক্লান্ত যে মনটা এতদিন পাষাণের মত ভারী হয়ে উঠেছিল হঠাৎ তার বুকে একটা খুশির ঝরণা কান্নাহাসির দোলা দিয়ে ছুটে চলল। আমার সারা বুকটা সেদিন জুড়িয়ে গিয়েছিল শ্রুতি। তাই আজ তোমাকে একটা কথা জানাই, তুমি আমার মায়া-দর্পণ। তোমার স্বচ্ছ সুন্দর চরিত্রের ভেতর আমি গ্লানিমুক্ত একটি মেয়ের প্রতিবিম্ব বার বার দেখতে চাই। তুমি আর বাসবী আজ আমার চিন্তায় অভিন্ন হয়ে গেছ।

শ্রুতি রুদ্ধ গলায় বলল, বাসবীদির সঙ্গে আমার কোন তুলনা হয় না জয়তিলকদা। তুমি আমাকে অকারণে এতখানি মর্যাদা দিয়ে ফেলনা। আমি অতি সাধারণ, আমার চাওয়া পাওয়ার সীমাও আমি জানি, তাই আমার অনুরোধ, তুমি আমাকে এমন লোভ দেখিও না যা আমার মনকে আমার সীমার গণ্ডী ভাঙতে চঞ্চল করে তুলবে।

জয়তিলক বলল, তুমি নিশ্চিন্তে থাক শ্রুতি। তোমাকে ভালবাসি বলেই তোমার ক্ষতি বা কষ্টের কারণ আমি হব না।

চার্চের ঘড়িতে দশটা বাজতেই ওরা চঞ্চল হয়ে উঠল।

শ্রুতি হঠাৎ জয়তিলকের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই তাকে দুহাতে তুলে ধরল জয়তিলক। তারপর শ্রুতির কোমল সুন্দর মুখখানাকে হাতের পাতায় ভরে নিয়ে বলল, অনেক অনেক আগে যদি তোমার সঙ্গে আমার দেখা হত শ্রুতি।

কথাটাকে আর সম্পূর্ণ করলনা জয়তিলক। বোধহয় পূর্ণ করার দরকারও ছিল না।

শ্রুতি দুচোখ ভরে জয়তিলককে দেখে নিয়ে একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলল, আমি নার্স জয়তিলকদা। শুধু দেহের নয়, মনের সেবা করাও আমার ধর্ম, আমার কাজ। যদি কোনদিন তোমার মনের সামান্য দুঃখকেও আমি লঘু করে দিতে পারি তাহলে সেই হবে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা। আজ এর বেশি তোমার কাছে আর আমার চাইবার কিছু নেই।

ডিনারের পর মাঝরাতে গাড়ি চালিয়ে ফিরছিলেন মিঃ তরফদার আর সোম। মিঃ তরফদারই ড্রাইভ করছিলেন। সোমের চোখে এখন রঙীন পর্দা। দুটি অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই পর্দায়। তারা হাসছে, তারা তাকিয়ে আছে সোমের দিকে। একজনের চোখে বিদ্যুতের ঝলক, মুখে বাঁকা হাসি। দামী বিলিতী মদের নেশা ধরিয়ে দেয় তার রূপ। অন্যটি বর্ষাদিনের জুঁই। সবুজ শ্যামল দেহ, ধবধবে শুভ্র হাসিতে ভরে আছে। গন্ধে, সরসতায় আকুল করে তোলে। সোম বসে আছে দর্শকের আসনে। কে যেন পাশ থেকে বলছে, দুজনের ভেতর কে সুন্দর সোম?

দিগন্ত সোম উত্তর করল, একজন মোহময়ী, যার আছে তীব্র আকর্ষণ, অন্যজন শান্ত সুন্দর, যার কাছে প্রার্থিতের প্রশ্রয়। দুজনের দু'রকমের সৌন্দর্য, আকর্ষণের রীতিও আলাদা।

মিঃ তরফদার বললেন, শ্রুতি মেয়েটি শুধু রূপেই সুন্দর নয়, স্বভাবেও সুন্দর। যে কোন পুরুষকে ও আনন্দে শান্তিতে পূর্ণ করে দিতে পারবে।

দিগন্ত সোম সচেতন হয়ে উঠেছে, তার পাশে বসে যে দর্শক প্রশ্ন করছিল সে আর কেউ নয়, মিঃ তরফদার স্বয়ং।

দিগন্ত বলল, মেয়েটি গ্রীষ্ম দিনের আইস ক্রিমের মত। যেমন ঠাণ্ডা তেমনি উপাদেয়।

মিঃ তরফদার বললেন, যে ও মেয়েকে ঘরে আনবে তার তপ্ত বুকখানা জুড়িয়ে যাবে। শ্রুতি আমাদের সোসাইটির মেয়ে নয় দিগন্ত, ও একেবারে স্বতন্ত্র।

আমি আপনার সঙ্গে একমত অনিমেষদা।

অনিমেষ তরফদার বললেন, ও আমাদের সমাজের কারু ঘরে এলে ওকে কেউ আমাদের আচার আচরণে দীক্ষা দিতে পারবে না, বরং ও তার শান্ত সুন্দর সংযত পার্সনালিটির শক্তিতে সেই সংসারের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দেবে।

দিগন্ত হঠাৎ মুখ ফস্কে বলে ফেলল, ওকে ঘরে এনে তোলা মানেই তো পানের অভ্যেস ত্যাগ। স্রেফ সরবৎ খেতে পারবনা দাদা, মরে যাব।

মিঃ তরফদার ধমকে বললেন, তুই কি মনে করছিস তোর আইবুড়ো দশা ঘোচাবার জন্যে তোর ব্যাচিলার্স ডেনে ও আসবে।

দিগন্ত সোম ধমক খেয়ে চুপ করে গেল। মিঃ তরফদার আবার বললেন, ও সব মেয়ে সহজলভ্য নয় ব্রাদার যে দাম দিলেই বা গ্লাসের লোভ দেখালেই কাছে টানা যাবে। দেহের ভঙ্গী দেখিয়ে বা কথার চালে ফেলে ওদের জালে জড়িয়ে ঘরে তোলা যাবে না। ওরা সহজ তাই ওদের দৃষ্টিও স্বচ্ছ, আসল আর মেকী ওদের চোখে মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ওরা ধরা দেবে তার কাছে যার ভেতর সামান্য কোন ছলনা নেই।

একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন অনিমেষ তরফদার, ব্রাদার জেনে রাখ খেয়ালের উত্তেজনায় জীবনকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ছড়িয়ে ভোগ করার মত তথাকথিত সোসাইটি গার্ল অনেক মিলবে কিন্তু জীবনকে তিলে তিলে সুন্দর করে গড়ে তোলার মত মেয়ে লাখে একটি মেলা ভার। শ্রুতি সেই সুদুর্লভদের ভেতর একটি। জানিনা ওর ভাগ্য কোথায় বাঁধা আছে।

ওঁরা একসময় এসে পৌঁছলেন দিগন্তের আস্তানায়। দিগন্ত গাড়ি থেকে নামার আগে বলল, অনিমেষদা, এত রাতে একা গাড়ি চালিয়ে বাংলোয় ফেরার কোন মানে হয় না। আপনি আমার এখানে থেকে যান।

অনিমেষ তরফদার বললেন, আমাকে কি তোর মত পেগের পর পেগ গলায় ঢেলে বেসামাল হতে দেখেছিস কখনো? নাম তাড়াতাড়ি, অনেকটা পথ যেতে হবে। থাকলে তো বাসবীর ওখানেই দুজনে থেকে যেতে পারতাম। যখন ওর অনুরোধ ঠেলে বেরিয়ে এসেছি তখন কোথাও থাকবনা। একেবারে বাংলোতে পৌঁছেই ফ্ল্যাট হব।

দিগন্ত নেমে দাঁড়িয়ে কাতর গলায় বলল, তাহলে আমার কোন আশা নেই অনিমেষদা?

কিসের আশা ব্রাদার?

দিগন্ত বলল, ঐ যে আপনার টিউলিপ্ ফুলটিকে ঘরে তুলে আনার।

হা-হা করে হেসে উঠে বললেন মিঃ তরফদার, সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে তপস্যায় বস, যদি বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে। পুরানের যুগে একটি ওল্ডম্যানকে পাবার জন্যে সুন্দরী এক তরুণী পাতাটি পর্যন্ত না খেয়ে তপস্যা করেছিল। যে কারণে তার নাম হয়েছিল অপর্ণা। আর এই কলিযুগে দিগন্ত সোম নামে একটি যুবক না হয় পানীয় ত্যাগ করে তপস্যা করুক একটি তরুণী কন্যার জন্যে। যা, এখন মাথা সাফ্ করে ঘুমোতে যা।

গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন অনিমেষ তরফদার।

চার

প্ল্যানটার্স অ্যাসোসিয়েশানের ক্লাব ঘরের সামনের লনে সারি সারি চেয়ারে বসে দর্শকেরা 'ওথেলো' অভিনয় দেখছে। যতদূর সম্ভব বিশ্বাসযোগ্যভাবে তৈরী করা হয়েছে প্রাচীন ভেনিসের কাউন্সিল চেম্বার। ডিউক বসে রয়েছেন একটা প্ল্যাটফর্মের ওপর উচ্চাসনে। সাদা সাটিনের একটা আলখাল্লা ঝুলছে কাঁধ থেকে হাঁটুর নীচ অবধি। সোনালী কোমরবন্ধে বাঁধা আছে কোমর। বাঁধনের শেষপ্রান্ত দুটি ঝুলে আছে নীচে। পায়ে সাদা রঙের স্ট্র্যাপ বাঁধা জুতো। পাশে বসে আছেন কাউন্সিলের অন্যান্য দু'চারজন সদস্য। নীচে ওথেলো, আর ডেসডেমোনার পিতা ব্রাবানসিও দাঁড়িয়ে।

ডিউকের কাছে ওথেলো মর্মস্পর্শী ভাষায় তার ভালবাসার কাহিনী অকপটে বর্ণনা করে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় ইয়াগোর সঙ্গে কাউন্সিল রুমে এসে ঢুকল ডেসডেমোনা। ডিউক ওথেলোর বর্ণনা শুনে তখনও অভিভূত হয়ে আছেন। তিনি ব্রাবানসিওর দিকে চেয়ে বললেন, 'I think this tale would win my daughter too.'

ঈষৎ আনত মুখে দাঁড়িয়ে আছে ডেসডেমোনা। পিঙ্ক রঙের একটা ম্যাক্সিতে তার সুঠাম দেহশ্রী আবৃত। সবার দৃষ্টি এখন ডেসডেমোনার ওপর নিবদ্ধ।

পিতা ব্রাবানসিও ডেসডেমোনার দিকে তাকিয়ে বললেন, Come hither, gentle mistress. Do you perceive in all this noble company where most you owe obedience ?

দৃঢ় অথচ বিনীত কণ্ঠে উত্তর করল ডেসডেমোনা, My noble father, I do perceive here a divided duty : To you I am bound for life and education ; my life and education both do learn me how to respect you, you are the lord of duty—

I am hitter to your daughter ; but here's my husband, and so much duty as my mother show'd to you, preferring you before her father, so much I challenge that I may profess due to the Moor, my lord'.

বাসবীর বলার ভঙ্গীতে সমস্ত দর্শক সপ্রশংস অভিনন্দন জানাতে লাগল। অভিনয় জমে উঠল পর পর।

পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে মুখোমুখি হয়েছে ওথেলো আর ডেসডেমোনা। সমস্ত মঞ্চ জুড়ে আশ্চর্য

এক মৃত্যুর প্রতিচ্ছবি। ডেসডেমোনার শেষ মুহূর্তে কাতর প্রার্থনা, 'Kill me to-morrow, let me live to-night'.

ওথেলোর দুটো বলিষ্ঠ হাতের আঙুল সাঁড়াশীর মত বেষ্টন করে আছে ডেসডেমোনার কোমল কণ্ঠ। ওথেলো বলছে, 'Nay, an you strive—'

ডেসডেমোনা ঃ 'But half an hour !'

ওথেলো ঃ 'Being done, there is no pause.'

ডেসডেমোনা ঃ 'But while I say one prayer !'

ওথেলো ঃ 'It is too late.'

বলতে বলতেই ওথেলো ডেসডেমোনার কণ্ঠ চেপে ধরল আক্রোশে।

ডেসডেমোনা ঃ 'O lord, lord, lord !'

নাটকের যবনিকা নেমে আসার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে নিজের ক্ষমাহীন ভুলের কথা বুঝতে পেরে ওথেলো মৃতা স্ত্রীর কাছে নতজানু হয়ে বলছে ঃ 'I Kiss'd thee ere I kill'd thee. No way but this—killing myself, to die upon a kiss.'

কথা কটি বলে ডেসডেমোনার ওষ্ঠে গভীর চুম্বন চিহ্ন এঁকে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রিয়তমা পত্নীর বুকে ঢলে পড়ল ওথেলোর প্রাণহীন দেহ।

নাটক শেষে করতালি ধ্বনি যেন আর থামতেই চায়না। গ্রীনরুমের ভেতর ঢুকে এসে ডেসডেমোনা আর ওথেলোর করমর্দন করতে লাগল উৎসাহী দর্শকেরা। তাঁদের মতে সমস্ত পাত্রপাত্রীর টিমওয়ার্ক উচ্চ পর্যায়ের হয়েছে। তবে অভিনয়ের সিংহভাগ-প্রশংসা দাবী করতে পারে ডেসডেমোনা আর ওথেলো। ডেসডেমোনার ভেতর ভালবাসা, পবিত্রতা আর সরলতার যে মিশ্রণ, তাকে যেন প্রতিটি আচরণ,প্রতিটি পদক্ষেপ আর প্রত্যেকটি দৃষ্টিপাতে ফুটিয়ে তুলেছে বাসবী। স্টেজে তার উপস্থিতির জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করে থেকেছে দর্শকেরা। আর ওথেলো! তার চরিত্র দ্বিধা বিভক্ত। একদিকে স্ত্রীর ওপর তার অগাধ ভালবাসা, অন্যদিকে মিথ্যা সন্দেহ। দুটি পরস্পরবিরোধী ভাবকে অনায়াস দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছে দিগন্ত। বাহবা তার যথার্থই প্রাপ্য।

কিছুক্ষণ আগে দর্শকদের চোখের সামনে মৃত ওথেলো আর ডেসডেমোনা এখন দর্শকদের উত্তপ্ত অভিনন্দন দারুণভাবে উপভোগ করছে।

উইংসের পাশ থেকে অনেকক্ষণ ধরে হাতছানি দিচ্ছিলেন মিসেস ঝুমুর সেন। কিন্তু লক্ষ্যবিদ্ধ করতে পারছিলেন না। এইমাত্র দিগন্তের নজর কাড়তে পেরে আঙুলের আন্দোলনকে তীব্রতর করলেন।

দিগন্ত একা উইংসের কাছে এগিয়ে আসতে মিসেস তার আস্ত মুণ্ডুখানা বাহু ডোরে বেঁধে কানের কাছে মুখ ঠেকিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, Splendid দিগন্ত, Splendid. তোমার ধারে কাছেও কেউ দাঁড়াতে পারেনি, নিমন্ত্রিত অতিথিদের ভেতর ডি, এফ, ও বসেছিলেন আমার পাশে। তিনি বললেন, ওথেলোর ফুটন্ত অভিনয়ের কাছে ডেসডেমোনা যেন মিয়োনো মুড়ি। মেক আপে মানিয়ে গেছে কিন্তু একেবারে উত্তাপ নেই।

মিসেস সেন দিগন্তকে ছাড়লেন নিজের বুকের এক ঝলক উত্তপ্ত নিশ্বাস ওথেলোর মুখে মাখিয়ে দিয়ে।

লনে নামতেই দেখা হল নাগরওয়ালার সঙ্গে। নাগরওয়ালা বললেন, আচ্ছা, মিটারকে তো দেখলাম নাই। ভয়টিলক আসল নাই কেন?

মিসেস সেন বললেন, একটা যুবক যদি আপনার বউ-এর ঠোঁট চেপে চুমু খায় তাহলে কি আপনি সে দৃশ্য তারিয়ে তারিয়ে দেখবেন?

নাগরওয়ালা হাসতে লাগলেন হে হেঁ হে হে, ঠিক বাত, সাচ বাত।

ওদিকে গ্রীনরুমে ডিউক অনিমেষ তরফদারের গলা শোনা যাচ্ছে। মিঃ তরফদার হেঁকে বলছেন, তোমরা যে সব এক চোখো বিচার শুরু করে দিলে হে! ভেবে দেখ, আমি যদি ডেসডেমোনার বাবা

ব্রাবানসিওর কথা শুনে ঐ পক্ষীমিথুনকে খাঁচায় পুরতাম তাহলে ভেনিস থেকে সাইপ্রাসে গিয়ে ওদের এই রসলীলাটা কি আদপে জমবার সুযোগ পেত। সুতরাং ওদের প্রশংসার পনেরো আনাই আমার প্রাপ্য।

সবাই হো হো করে হেসে উঠতেই অনিমেষ তরফদার বলে উঠলেন, এ বৃদ্ধকে কেবল হাসি দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করনা।

বাসবী এগিয়ে গিয়ে বলল, দাদা, আপনি যখন ওথেলোর গালগপ্পো শুনে বললেন, 'ওথেলোর এই কাহিনী আমার হৃদয়কেও জয় করে নিত', তখন বিশ্বাস করুন, আপনার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে আমার বুকখানা ধড়াস্ ধড়াস্ করছিল। ভাবছিলাম, ডিউকের মেয়ে এসে যদি ওথেলোকে চেয়ে বসে, তাহলে আমি গেছি আরকি। পরে অবশ্য মনে পড়ল, আমি অনিমেষদার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, আর অনিমেষদার মেয়ে তো মেয়ে, বউই নেই।

মিঃ তরফদার বললেন, আইবুড়ো অনিমেষদার কথা ভেবে ডেসডেমোনার বুকের ধড়ফড়ানিটা কমল, তাই না?

হেসে মাথা দোলাতে লাগল বাসবী।

সে রাতে নিজের বাংলোতে আর ফেরা হল না বাসবীর। ক্লাব হাউসে রাতের ডিনার সেরে সে ফিরছিল দিগন্তকে নিয়ে। দিগন্তের বাংলোতে তাকে রেখে নিজের বাংলোতে ফেরার কথা। কিন্তু দিগন্ত সোমের বাংলোর কাছে এসে মত বদলে গেল। হঠাৎ দিগন্তের বাংলোর কম্পাউন্ডে গাড়ি ঢুকিয়ে বলল, বড় ক্লান্ত লাগছে, আর একটুও ইচ্ছে করছে না ড্রাইভ করতে।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে আলস্যের আড়মোড়া ভেঙে দাঁড়াল বাসবী।

দিগন্ত বলল, এটা তোমার কৌতুক নয় তো?

বিশ্বাস কর দারুণ ঘুম পেয়েছে। টায়ার্ড, এক্সট্রিমলি টায়ার্ড দিগন্ত। তোমার একটা সোফায় বসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ব।

দিগন্ত বলল, এ অবস্থায় আমিও তোমাকে একখানা গাড়িতে চড়িয়ে ছেড়ে দিতে পারিনা।

অলরাইট, আজ রাতে তাহলে ডেসডেমোনা থাকবে ওথেলোর কাছে।

দিগন্ত বলল, ব্রাবানসিওর সুন্দরী মেয়েকে জয় করে ওথেলো আজ পৃথিবীর সম্রাট।

বাসবী বলল, কিন্তু উদ্বোধন সংগীতের পর শ্রুতিকে বাংলোতে পৌঁছে দেবার জন্যে যে তোমার গাড়িখানা গেল, সে তো কই ফিরে এলনা তোমার এখানে?

বুঝতে পারছিনা, মিঃ মিত্রের বাবার অসুখটা কোনরকম খারাপ টার্ন নিল কিনা!

বাসবী বলল, তোমার অনুমান মিথ্যে নাও হতে পারে। দেখলেনা, শ্রুতি নাটক দেখার জন্যে বসে রইলনা। উদ্বোধন সংগীতটা শেষ করেই তোমাকে তাগাদা দিয়ে গাড়িখানা বের করল। তারপর ড্রাইভারকে নিয়ে যেন উড়ে চলে গেল। আমার মনে হয় জয়ের বাবার কণ্ডিশনটা খুব ভাল মনে করছিলনা, তাই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে চলে গেল। ওপেনিং সঙ নেহাৎ গাইবার কথা ছিল, না হলে ও আসতই না। আর যা হোক্ মেয়েটা খুবই ডিউটিফুল। ওর ওপর বেশ ডিপেণ্ড করা চলে।

দিগন্ত সোম বাসবীর হাত ধরে ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বলল, একটা ফোন করে খবর দাও।

কি খবর দেব। শ্বশুর ওখানে হাফ্ কনসাস আর তাঁর পুত্রবধূ এখানে দিগন্ত সোমের শয্যায় ঘুমে অচেতন।

না, তা নয়, তবে রাতে যে ফিরতে পারছ না, তার সম্ভাব্য একটা কারণ দেখিয়ে ফোন কর।

বাসবী ফোনটা তুলে নিয়ে ডায়াল করল। ওপারে ধরল বাহাদুর।

হ্যালো।

বাসবী বলল, সাহেব কোথা?

পিতাজীর বেমারি বেড়েছে মেমসাব। গাড়ি গিয়েছে দাওয়াই আনতে দার্জিলিং। সাহেব এখন আউট হাউসে রয়েছেন।

সাহেবকে বল বাহাদুর, আমার গাড়ি বিগড়েছে। আজ রাতে তাই বাংলোতে ফেরা সম্ভব হচ্ছে না। কাল ভোর বেলা সারাই টারাই করে যদ্দুর সম্ভব তাড়াতাড়ি ফিরব।

বহুৎ আচ্ছা, মেমসাব।

বাসবী ফোন রেখে দিয়ে আঙুল চালিয়ে মাথার চুলটা ঠিক করল। তারপর মাথাটা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল। যেন সেই মুহূর্তে ঝেড়ে ফেলে দিল সব ভাবনা।

দিগন্ত একটা সোফায় বসে বাসবীকে দেখছিল। শুনছিল তার ফোনের কথাবার্তাগুলো। বাসবী উঠে দাঁড়াতেই দিগন্ত বলল, বাথরুমে যাও, শোবার আগে তো চান করবে তুমি,

অফকোর্স। তুমি তো একটা ব্যাচিলার, ঠিক জায়গায় ঠিক জিনিস আছে তো?

মুখে হাসি ফুটিয়ে দিগন্ত বলল, ঢুকে দেখইনা বাবা। বাথরুমের সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ট ড্রেসিংরুমে পাট করা নতুন তোয়ালে থেকে সবকিছু পাবে।

বাসবী বলল, শাড়ি পরে তো শুতে পারব না, নাইটিও নিয়ে আসিনি, এখন উপায়?

একটা উপায় হতে পারে, অবশ্য তুমি যদি ছেলে সাজতে পার।

আমার একটুও আপত্তি নেই।

ড্রেসিংরুমে সবচেয়ে বড় সুটকেশটা খুললেই প্যান্ট আর শার্টের তলায় কাচান একখানা পাজামা আর চিকনের কাজ করা পাঞ্জাবী পাবে। পরলে দিব্যি তরুণ বনে যাবে।

ধ্যাৎ, তোমার পাজামাটা না হয় কোনরকমে ম্যানেজ দেওয়া গেল, কিন্তু পাঞ্জাবিটা।

ভয় নেই, ভয় নেই। ও দুটোই আমার স্কুল লাইফের জিনিস। বড়দি ভালবাসত তাই ভাইফোঁটাতে দিয়েছিল। বড়দি মারা গেছে, তাই তার স্মৃতিটুকু আজও রেখে দিয়েছি আমার কাছে। স্কুল-জীবনে বেশ রোগা ছিলাম, তোমার গায়ে এখন দিব্যি মানিয়ে যাবে।

বাসবী খুশি খুশি মেজাজে বাথরুমে ঢুকল। দিগন্ত সোম তার বেডরুমের সংলগ্ন ঘরখানাতে ঢুকে গিয়ে ডিভানের ওপর কাচান সুন্দর বেড কভার পেতে রাখল। গোলাপ ফুলের ডিজাইন আঁকা বালিশের ঢাকায় মাখিয়ে দিল গোলাপী আতর। দারুণ খেয়ালী মেয়ে বাসবী। দীঘার হোটেলে কতদিন একই বিছানায় বসে জ্যোৎস্না রাতের সমুদ্রের দিকে চেয়ে গল্প করে গেছে কিন্তু ঘুমুতে গেছে তার নিজের বিছানাটিতে। হাতে হাত রেখেছে, নিবিড় হয়েছে, কিন্তু নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার মুহূর্তে সরে চলে গেছে কি এক অলৌকিক শক্তির বলে। এইখানেই বাসবীর সঙ্গে অন্য যে কোন মেয়ের তফাৎ আর এটাই হল বাসবীর আকর্ষণের মূল চাবিকাঠি।

বাসবী তখনও বাথরুমে, ফোন বাজল দিগন্তের ঘরে। তাড়াতাড়ি এসে ফোন তুলে জানতে পারল ওপার থেকে জয়তিলক কথা বলছে।

মিঃ সোম, একটু আগে বাসবী বাংলোতে ফোন করে জানিয়েছিল তার গাড়ির কিছু গোলমাল হয়েছে, তাই সে রাতে ফিরতে পারছে না। আমি বুঝতে পারছি না ও কোথায় আছে।

দিগন্ত এপার থেকে বলল, ও কোথায় আপনি তা ওর কাছ থেকে জেনে নেননি?

ফোনটা বাহাদুর ধরেছিল, আমি তখন আউট হাউসে বাবার কাছে ছিলাম। বাবা খুবই অসুস্থ।

গলায় বিস্ময়ের সুর তুলে বলল দিগন্ত, অসুস্থ শুনেছিলাম, কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি জানতে পারিনি। অবশ্য আমার গাড়ি নিয়ে শ্রুতি নাটক না দেখে তাড়াতাড়ি করে চলে যাওয়াতে কিছুটা সন্দেহ হয়েছিল।

জয়তিলক বলল, খুবই দুঃখিত মিঃ সোম, আপনার গাড়ি আর ড্রাইভারকে আটকে রাখতে হল। বড় বিপদ। চার্চের ফাদার নিজেই বড় ডাক্তার। বাবার কাছে মাঝে মাঝে আসেন। তিনি খবর শুনে এসেছিলেন। আমাকে আড়ালে বলে গেছেন, অবস্থা মোটেই ভাল নয়। প্রেসক্রিপ্‌শনের ওষুধ পাওয়া গেলনা এখানে তাই দার্জিলিং-এ ফাদারের পরিচিত দোকানে আপনার ড্রাইভারকে ওষুধ আনতে পাঠিয়েছি। দোকানের মালিককে ঘুম থেকে জাগিয়ে ওষধ নিয়ে আসবে।

দিগন্ত বলল, তাতে কি, গাড়ি তো প্রয়োজনের জন্যেই। কিন্তু আমি ভাবছি বাসবী কোথায় গেল। মিসেস সেনকে তাঁর বাংলোতে পৌঁছে দিয়ে ফেরার কথা ছিল, হয়ত ওখানেই আটকে আছে।

মিসেস সেনের ফোন নাম্বারটা জানেন?

ওঁর ফোন নেই। যদি বাসবী ওখানে থেকে থাকে তাহলে একটু দূরে ফরেস্ট বাংলো থেকে ও আপনাদের ফোন করে খবর দিয়েছে।

আমাদের গাড়িটা নেই, আপনার গাড়িই এখন সম্বল, আমার খুব খারাপ লাগছে আপনার অসুবিধে সৃষ্টি করে।

একটুও না। আমি কাল বাংলোর বাইরেই বেরুব না। আপনি আমার গাড়ি আর ড্রাইভারকে দরকার মত ব্যবহার করুন।

ওপার থেকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিল জয়তিলক।

ইতিমধ্যে বাসবী এসে দাঁড়িয়েছে। দিগন্ত ফোন ছেড়ে দিতেই বাসবী বলল, দারুণ বুদ্ধি তো তোমার! এমন একটা জায়গায় আমি থাকতে পারি বললে, যেখানে ফোন নেই।

দিগন্ত সোফায় কাৎ হয়ে বসে তাকিয়ে রইল বাসবীর দিকে। সে কোন উত্তর করল না, শুধু দেখতে লাগল।

কি দেখছ অমন করে?

দেখছি তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ কতখানি।

কি মনে হয়?

না, পোশাকেও তোমার নারীত্বকে ঢাকা সম্ভব নয়। অবশ্য অজাতশ্মশ্রু তরুণ হিসেবে চালিয়ে দেওয়া যায়।

দিগন্তের সোফার একপাশে বসে পড়ে বাসবী বলল, তোমার পাজামা পাঞ্জাবি পরে কি মনে হচ্ছে জান?

কি?

আমি দিগন্ত সোম হয়ে গেছি।

দিগন্ত বাসবীকে কাছে টেনে এনে জড়িয়ে ধরতেই বাসবী বলল, বাঁদরামো করনা দিগন্ত। পোশাক পরিবর্তন করলেই মেয়েরা কিছু ছেলে হয়ে যায়না।

তুমি নিজের মুখেই তো তাই বললে।

সব কথাকেই সত্য বলে বুদ্ধিমানেরা মেনে নেয় না।

দিগন্ত বাসবীকে ছেড়ে দিতেই বাসবী দিগন্তের মাথার চুলগুলোকে এলোমেলো করে দিয়ে বলল, যত দুষ্টু বুদ্ধির বাসা এখানে। বাসাটা তাই ভেঙে দিলাম।

দিগন্ত স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, ঘুম পেয়েছিল তোমার, বিছানা তৈরী, শুয়ে পড় গিয়ে।

অমনি রাগ হয়ে গেল। একা থাকার ইচ্ছেটা চাগিয়ে উঠল।

তুমি আমার অতিথি বাসবী। তোমার ইচ্ছার বাইরে কোন কিছু করা শোভনও নয়, সম্ভবও নয়।

আমি তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু দিগন্ত। আমি তোমাকে কতখানি ভালবাসি তা তোমার অজানা নয়। জীবনে শুধু চলাতেই আমার বিশ্বাস, থেমে থাকাতে নয়। তোমার ভেতর যে প্রচণ্ড একটা গতি আমি দেখেছি সেটাই আমাকে প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছে।

একটু থেমে বলল বাসবী, একজন পুরুষ কিংবা নারীর দেহে উত্তেজনা সৃষ্টির অনেক উপাদান আছে কিন্তু সেটুকুই তার সব নয়। মনে করনা দিগন্ত যে আমি সন্ন্যেসী হয়ে গেছি। পুরুষের দেহ আমার কাছে এখনও উত্তেজনা আর রোমাঞ্চের বস্তু, কিন্তু ওটাই সব নয়, এ ধারণা প্রথম থেকেই আমার মনে কাজ করে আসছে। এটা সব মেয়ে বা ছেলের ভেতর নেই বলেই আমার বিশ্বাস। কারু কারু ভেতর থাকতে পারে, তবে তাদের সংখ্যা যে অনেক কম সেটা অনুমান করতে অসুবিধে হয় না।

দিগন্ত, উপভোগের স্রোতে দেহটাকে ভাসিয়ে দিতে কোন চেষ্টা বা শক্তির দরকার হয়না, কিন্তু উপভোগকে দীর্ঘস্থায়ী করতে গেলে কব্জির জোরে হয়না, ইচ্ছাকে নিজের তীব্র মনের জোরে বাগ মানান চাই। এতগুলো কথা তোমার কাছে গীতার বাণী বলে মনে হতে পারে কিন্তু আমার অনুভূতিতে ওগুলো ভীষণভাবে সত্য। শুধু সত্য নয়, খুব সহজ আর স্বাভাবিক।

দিগন্ত বলল, দেখ বাসবী, আমারও একটা সত্য আছে। সে সত্যটি হল, আমি বুভুক্ষু একটি ব্যাচিলার, দেহ উপভোগে আমার তীব্র আকর্ষণ। আমি সুযোগ পেলে তার সদ্‌ব্যবহার করতে সামান্যমাত্র দেরী বা দ্বিধা করিনা।

বিয়ে কর। তাহলে দেহভোগের জন্যে আর দৌড়তে হবে না।

দিগন্ত বলল, বিয়ে মানে, যৌবনের আগুনে জল ঢেলে দেওয়া। কিছু কালের ভেতরেই ভোগের ইচ্ছার সমাধি।

দেখ দিগন্ত, বিয়ে করেও ভোগের ইচ্ছার বাতিটাকে দীর্ঘকাল জ্বালিয়ে রাখা যায়, সেটা নির্ভর করে বিবাহিতের চিন্তা আর কৌশলের ওপর।

দিগন্ত প্রশ্ন করে বসল, একই শাড়ি তোমার বার বার পরতে ইচ্ছে করে?

তোমার ইংগিতটা একটুও অস্পষ্ট নয় দিগন্ত। কিন্তু যে শাড়ি আমার একান্ত নিজস্ব পছন্দের তাকে বার বার পরে পুরোনো করে তুলিনা। তাকে রয়ে সয়ে ব্যবহার করি।

একটু চুপ করে থেকে দিগন্ত হেসে বলল, ডেসডেমোনা স্বামীর ওপর তোমার অচলা ভক্তির পরিচয় আজ নাটকেই পেয়েছি। তার এক্‌শান এখনও চলছে। কিন্তু ভুলে যেওনা আজ রাতে ডেসডেমোনার স্বামী ওথেলো ছাড়া আর কেউ নয়।

বাসবীও হেসে উত্তর করল, ভুলে যায়নি বলেই তো সংসার, কর্তব্য ভুলে আজ তোমার কাছে এ রাতে থেকে গেছি।

দিগন্ত হাতখানা বাড়িয়ে দিল। বাসবী সে হাতে হাত রেখে বলল, সন্ধি।

বাসবীর হাত নিজের হাতের মুঠোয় ভরে নিয়ে দিগন্ত বলল, ওথেলোর মত আমাকেও অনেক নীচের থেকে যুদ্ধ করতে করতে ওপরে উঠতে হয়েছে বাসবী। ব্রাবানসিওর মত প্রতিপত্তিশালী বাবার মেয়ে তুমি। গোটা পরিস্থিতির কি আশ্চর্য মিল।

ঘূর্ণির মত তোমার এই ঘুরে ঘুরে ছোটা আর ওপরে ওঠার শক্তিকে প্রথম থেকেই আমি বিস্ময়ের চোখে দেখেছি আর সেই শক্তির কাছে আমি সমর্পণ করেছি আমার সব ভালবাসা দিগন্ত।

বাসবীকে হাত ধরে তুলে দিগন্ত বলল, চলো ঘরে যাই, রাত গভীর হল।

ড্রইং রুমের কার্পেটে ওদের চলে যাওয়ার পদধ্বনি বেজে উঠল না।

শোবার ঘরে ঢুকে দিগন্ত বাসবীকে তার ছোট্ট রুমখানা দেখিয়ে দিয়ে বলল, ওখানে ডিভানের ওপর আশাকরি ঘুমুতে তোমার কষ্ট হবে না।

বাসবী ঘুরে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত হাসি হেসে বলল, আজ আমাকে গোলাপ দিলেনা দিগন্ত?

ডেসডেমোনা নিজেই আজ একটি ফুটন্ত গোলাপ, তার কাছে বাগানের সব গোলাপই হার মানবে।

একটু থেমে আবাব বলল দিগন্ত, মাঝের দরজাটা বন্ধ করে নিও বাসবী।

হেসে বলল বাসবী, ডাকাতের কাছে দরজা খুলে রাখাই নিরাপদ। গৃহ মূল্যহীন ভেবে ফিরে যেতে পারে। বন্ধ কবে রাখলেই বিপদ ঘনিয়ে ওঠার সম্ভাবনা।

পাঞ্জাবি পরা সুন্দর হাতখানা তুলে শুভরাত্রি জানিয়ে বিছানায় চলে গেল বাসবী। মাঝের দরজা হাট করে খোলা পড়ে রইল।

বালিশে মুখ গুঁজেই বাসবী বুঝতে পারল দিগন্ত তাকে শুধু একটি গোলাপই উপহার দেয়নি, হাজার গোলাপের বুকের নির্যাস ছড়িয়ে দিয়ে তাকে সুন্দর একটি স্বপ্ন দেখার সুযোগ করে দিয়ে গেছে।

আজ চার পাঁচদিন ঝড় উঠছে ভোর রাতের দিকে। পাইনবনে ঝড়ো মেঘের দাপাদাপি হাঁকাহাকি শুরু হয়ে যায়। শেষে অনেকখানি জল ঝরিয়ে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সরে পড়ে মেঘের দল।

দু'দিন ধরে টেম্পারেচার। রাধামোহন তার ওপর সকাল সন্ধ্যে নিয়ম মত বাইরে গিয়ে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত দেখার জন্যে বায়না ধরেছেন। সস্নেহ অনুযোগ করেছে শ্রুতি, কিন্তু শোনেননি শ্রুতির কথা। বলেছেন, ও কিছুনা, দুদিনেই জ্বর সেরে যাবে। এমন কিছু কষ্ট হচ্ছে না আমার, বরং নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই কষ্ট পাব।

তৃতীয় দিন সকালে সূর্যোদয় দেখলেন, কিন্তু বিকেলে আর উঠতে পারলেন না বিছানা থেকে। কাশি ছিল, তার সঙ্গে হঠাৎ শ্বাস কষ্ট এসে যোগ দিল।

শ্রুতি দ্বিতীয় দিনেই একজন ডাক্তার এনেছিল। তিনি কাশির সাধারণ ওষুধ আর জ্বরের জন্যে একটা মিক্সচার দিয়ে শ্রুতিকে ওয়াচ করতে বলে চলে গিয়েছিলেন। শ্রুতির কিন্তু ভাল লাগছিল না রাধামোহনের সিম্পটমগুলো।

তৃতীয় দিনে ওথেলো নাটকের অভিনয়-মঞ্চে উদ্বোধন সংগীত। সকালে সূর্যপ্রণাম সেরে ফিরে আসার পর রাধামোহনের কাশির ধরণ আর চোখমুখের অবস্থা দেখে শ্রুতির একটুও ভাল লাগল না। বিকেল থেকে শুরু হল শ্বাসকষ্ট। ক্লাবে যাবে কি যাবে না, দোটানার ভেতর পড়ে গেল শ্রুতি। চার্চের ফাদার দু'চারদিন বাদে বাদেই এসে বসতেন রাধামোহনের কাছে। রাধামোহন জীবনে অজস্র পড়েছেন। যীশু সম্বন্ধে কথা উঠলে উনি বলতেন, যীশুখ্রীষ্ট ভারতের মাটিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কাশ্মীরে তিনি দেহ রেখেছেন।

বাদ প্রতিবাদ চলত দুই বৃদ্ধে। দু'জনেই পক্ষে বিপক্ষে অকাট্য সব যুক্তি দেখাতেন। কেউই কোন সমাধানে এসে পৌঁছতে পারতেন না। শেষে সন্ধি হত দুজনের ভেতর এই শর্তে, মহাপুরুষদের নিজস্ব কোন দেশ নেই। তাঁদের দেহ বাণীময়। সেই বাণীদেহ নিয়ে তাঁরা যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করে বেড়ান।

বৃদ্ধ ফাদার এসেই বুঝলেন রোগীর অবস্থা। শ্রুতিকে বললেন, কণ্ডিশন খুব ভাল নয়। আমি চার্চে যাচ্ছি, এখুনি ফিরে আসব। ভাল করে পরীক্ষা না করে কিছু বলা ঠিক নয়।

জয়তিলক আজ সারাদিন বাবার কাছে। সকাল থেকে ফোন করে বাসবী দিগন্তের গাড়িখানা আনিয়ে নিয়ে তাতে রওনা হয়ে গেছে। রেখে গেছে নিজের গাড়ি। শ্রুতিকে নিয়ে যাবে সে গাড়ি ক্লাব হাউসে উদ্বোধন সংগীত গাওয়ার জন্যে। ভোর থেকে শ্রুতিকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কোন কাজ নেই। তাছাড়া শ্বশুরের অসুখ। একবার এসে দেখে গেছে বাসবী। তখন সূর্যপ্রণাম শেষ করে অন্তরের গভীর থেকে তাকিয়েছিলেন চরাচরের দিকে রাধামোহন। বাসবী এসে কাছে দাঁড়িয়ে বলেছিল, কেমন আছেন? মুখ দেখে ভাল বলেই তো মনে হচ্ছে।

রাধামোহন প্রসন্ন হাসি হেসে শুধু মাথা নেড়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি ভালই আছেন।

যে কয়েক মিনিট বাসবী ছিল, একগাদা জরুরী কাজের ফিরিস্তি অকারণে শুনিয়ে যাচ্ছিল রাধামোহনের কাছে। তারপর চলে যাবার সময় রাধামোহনের সামনে শ্রুতিকে ডেকে ভাল করে লক্ষ্য নজর রাখার জন্য বলে গেল। অবশ্য একটি কথা বারবার মনে করিয়ে দিয়ে গেল, শ্রুতি যেন যথাসময়ে ক্লাবে গিয়ে পৌঁছয়। কারণ তার গান নইলে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হবেনা।

বিকেলে ফাদারের উঠে যাবার পর জয়তিলককে ডেকে শ্রুতি বলল, আমি কিছুতেই যেতে পারবনা ক্লাবের অনুষ্ঠানে। এ অবস্থায় বাবাকে ফেলে রেখে যাওয়া অসম্ভব।

কথা বলতে বলতে তার ঠোঁট কাঁপছিল। চোখ ভরে উঠছিল জলে।

জয়তিলক বলল, অধীর হয়োনা শ্রুতি। ফাদার তো এখুনি ফিরে আসছেন। তাছাড়া তুমি না গেলে চারদিক থেকে একটা অনর্থ বাঁধবে। ওরা ফাংসান আরম্ভই করতে পারবেনা। বাসবী সকাল থেকে চলে গেছে কিন্তু গাড়িখানা রেখে গেছে তোমার জন্যেই। সে একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে যাবে। তার উৎসাহেই তোমাকে দিয়ে এই উদ্বোধন গান গাওয়াবার ব্যবস্থা। আমি বলছি তুমি যাও, আমি তো রইলাম।

শ্রুতি বলল, তুমি বলছ তাই যাচ্ছি, কিন্তু আমার মন পড়ে থাকবে এখানে। আমি ভাবতেও পারছিনা, বাবা কষ্ট পাবেন আর আমি থাকব গান নিয়ে।

জয়তিলক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে বলল, তোমার মত সবাই যদি কর্তব্যে এতখানি সচেতন হত তাহলে প্রতিটি সংসার সুখের নীড় হয়ে উঠত শ্রুতি।

জয়তিলক মুখে বলল, এখন তোমার যাবার সময় হয়ে গেছে, ড্রাইভার অপেক্ষা করছে বাংলোতে। তুমি অশান্ত হয়োনা শ্রুতি। যে কাজে যাচ্ছ তা যেন সুন্দর করে করতে পার।

শ্রুতি শাড়িখানা কোন রকমে পাল্টে নিয়ে আবার রাধামোহনের ঘরে এসে ঢুকল। রাধামোহনের মুখখানা বড় ম্লান আর ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। শ্রুতি রাধামোহনের মুখের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। দাদা রইলেন আপনার কাছে, এখুনি ফাদার আসছেন চার্চ থেকে। আপনার এখন কিছু চাই বাবা?

খুব আস্তে শ্বাস টেনে টেনে বললেন রাধামোহন. আমার কাছে বিবেকানন্দের রচনাবলীর একটা খণ্ড রেখে যাওত মা।

আপনি তো এখন বই পড়তে পারবেন না বাবা।

রাধামোহন আর কথা বললেন না, হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি বইখানা হাতের কাছে রাখতে চান।

শ্রুতি বচনাবলী থেকে একখণ্ড এনে রাধামোহনের বিছানায় রাখল। রাধামোহন রচনাবলীখানা ডান হাতে তুলে বুকের ওপর রাখতে গিয়ে পারলেন না। পাশে রেখে তার ওপর ডান হাতখানা চাপা দিলেন।

শ্রুতি বিচলিত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। জয়তিলক তার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে বলল, অনেক বিশিষ্ট লোক ওখানে আজ জড়ো হবে শ্রুতি, তুমি আরও একটু ভাল করে সেজে নিতে পারতে।

এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে শ্রুতি জয়তিলকের দিকে তাকিয়ে বলল, আজ তোমার অবাধ্য হব না বলেই যাচ্ছি, কিন্তু দোহাই তোমার, তুমি আমাকে আর কোনরকম আদেশ করনা।

বলতে বলতে শ্রুতির চোখের জল টপ্ টপ্ করে ঝরে পড়ল মাটিতে।

জয়তিলক তাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি যে আমাদের কতখানি শ্রুতি, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

শ্রুতি ফিরে এসে রাধামোহনকে আর সজ্ঞানে দেখতে পায়নি। ফাদার প্রেসক্রিপ্শন করে দিয়েছিলেন, জয়তিলক বাহাদুরকে পাঠিয়ে নীচের মেডিকেল স্টোর থেকে ওষুধ সংগ্রহ করতে পারেনি। তাই শ্রুতি আসার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি নিয়ে ড্রাইভারকে ছোটান হয়েছে দার্জিলিং।

শেষ রাতের ঝড় শুরু হয়েছে, রোগীর দিকে চেয়ে বসে আছে জয়তিলক আর শ্রুতি। টকসিমিয়া শুরু হয়ে গেছে। শ্রুতির অভিজ্ঞ চোখ বুঝতে পেরেছে রোগীর অবস্থা শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। জয়তিলককে ফাদার বলে গেছেন টারমিনাল নিউমোনিয়া। কঠিন অসুখ। তবু ওষুধ আনতে পাঠিয়েছেন তিনি। রোগীর আপনজনদের কাছে একটু সান্ত্বনা, এখনও চিকিৎসার বাইরে চলে যায়নি রোগী। কিন্তু শ্রুতি অসুখের নাম শুনেই বুঝেছে, ওষুধে এ রোগের কিছু হবার নয়।

ভোর হল। ঝড় থামল প্রতিদিনের মত। কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার চূড়া রাঙিয়ে সূর্য উঠল। কিন্তু দুটি হাত জোড় করে আজ আর বারান্দায় সূর্য-বন্দনার জন্য বসে রইলেন না রাধামোহন।

পাঁচ

অনিমেষ তরফদারের ঐকান্তিক চেষ্টায় প্লেনটার্স অ্যাসোসিয়েশানের সেন্ট্রাল হস্‌পিট্যালে নার্সের কাজ নিয়ে ঢুকল শ্রুতি। সে রাধামোহনের মৃত্যুর পর কলকাতা ফিরে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল, কিন্তু শ্রাদ্ধের কটা দিন বিশেষ অনুরোধ করে জয়তিলক আটকে রেখেছিল তাকে। এরই ভেতর একদিন জয়তিলকের সঙ্গে দেখা করতে এলেন অনিমেষ তরফদার। কথায় কথায় জানতে পারলেন শ্রুতি চলে যাচ্ছে গ্রীন-ভ্যালি-টি-গার্ডেন ছেড়ে। যে মানুষের জন্যে তাকে রাখা হয়েছিল তাঁর চলে যাওয়ার পর তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। অনুরোধে কয়েকদিন থেকে গেলেও অনুগ্রহে একটি দিনও থাকতে পারবে না শ্রুতি।

বাসবীর ব্যবহার শ্রুতির সঙ্গে এমপ্লয়ার এমপ্লয়ীর মত। হেসে কথা বলছে, শ্রাদ্ধের কাজকর্মের ভেতর তাকে জড়িয়ে ফেলছে, কিন্তু এমন উত্তাপ তার হৃদয়ের কাছ থেকে আসছেনা যাতে শ্রুতি নিজের আত্মসম্মান বজায় রেখে টি-গার্ডেনের কোন কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখতে পারে।

অনিমেষ তরফদার শ্রুতিকে এক ফাঁকে দেখতে পেয়ে কাছে ডাকলেন। বাসবী জরুরী কতকগুলো শ্রাদ্ধের ফর্দ নিয়ে গেছে দার্জিলিং-এর মার্কেটে। জয়তিলক কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসে কথা বলে যাচ্ছিল মিঃ তরফদারের সঙ্গে।

শ্রুতি অনিমেষ তরফদারের ডাক শুনে কাছে এসে দাঁড়াল। শান্ত করুণ মুখ।

মিঃ তরফদার বললেন, কতদিন তোমাকে দেখিনি শ্রুতি। সেদিন নাটকের ফাংশানে বড় ভাল গান তুমি গেয়েছিলে। কিন্তু নাটকের শেষে তোমার খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলাম, তুমি অনেক আগেই চলে গেছ। কে যেন বললে, জয়ের বাবার অসুখ, তাই তুমি থাকতে পারনি। কথাটা শুনে বড় ভাল লেগেছিল। এই অল্প বয়সে তোমার এতখানি কর্তব্যবোধ! সেদিন তোমাকে মনে মনে অনেক শুভেচ্ছা জানিয়েছিলাম শ্রুতি।

হঠাৎ অনিমেষ তরফদারের পায়ের কাছে নত হয়ে শ্রুতি বলল, আজ বাধা দেবেন না দাদা। ক'দিন পরেই চলে যাচ্ছি। আপনার আশীর্বাদটুকু আমি মাথায় করে নিয়ে যাব।

কোথায় যাবে তুমি?

কলকাতায় ফিরে যাব দাদা।

সেখানে কি তোমার কাজের কিছু ব্যবস্থা হয়েছে?

না, একেবারেই না। এক বান্ধবীর কাছে আপাততঃ উঠব, তারপর কাজের চেষ্টা করব। নার্সের কাজ না পাই আয়ার কাজ পেতে অসুবিধে হবে না। কোন কাজই আমার কাছে ছোট নয় দাদা।

তুমি আছ কতদিন?

এই বাংলোতে থাকার কথা বলছেন? তা ছ'সাত দিন অন্তত থাকতে হবে।

তুমি কি আউট হাউসে থাকছ, না এই বাংলোতে?

আমি আউটহাউসেই থাকি বেশির ভাগ সময়, কাজের ব্যাপারে এখানে আসি।

তিন-চারদিন পরে যে কোন জায়গা থেকে আমাকে একটা ফোন করতে পারবে?

নিশ্চয় করব দাদা, আপনার নাম্বার?

মিঃ তরফদার পকেট থেকে পেন আর একটুকরো কাগজ বের করে ফোন নাম্বার লিখে দিলেন। বললেন, সব ব্যাপারটাই কিন্তু গোপনীয়।

শ্রুতি মাথা নেড়ে জানাল অনিমেষদার ইঙ্গিত সে ধরতে পেরেছে এবং তা যথাযথ পালিত হবে।

ঠিক চারদিন বাদ দিয়ে পঞ্চম দিন শ্রুতি বাংলো থেকেই ফোন করল অনিমেষ তরফদারকে।

মিঃ তরফদার জানতে চাইলেন, কোত্থেকে ফোন করছ?

বাংলো থেকেই।

সে কি, ওরা কেউ বাংলোতে নেই?

বাসবীদি আর জয়তিলকদা দুজনেই গাড়ি করে বেরিয়ে গেছেন। আমি একা বাড়ি আগলাচ্ছি।

সোজা জিজ্ঞেস করলেন মিঃ তরফদার, আমাদের ছেড়ে চলে যেতে তোমার কষ্ট হবে না শ্রুতি ?

বেশ কিছু সময় ফোনের এপারে নীরবতা।

ওপার থেকে আবার প্রশ্ন, চুপ করে রইলে কেন? আমার জন্যে তোমার কষ্ট হবার কথা বলছি না। এই ধর বাসবী মিত্র, দিগন্ত সোমদের ছেড়ে চলে যেতে ?

এপারে এবার মিষ্টি করে হাসল শ্রুতি। সে অনিমেষ তরফদারের রসিকতার সুরটুকু ধরতে পেরেছে। বলল, আপনি ভীষণ দুষ্টুমি করছেন অনিমেষদা। ওদের কথা নিশ্চয়ই মনে পড়বে।

এবার সত্যিকরে দাদাকে একটা কথার উত্তর দেবে? অবশ্য আমি প্রমিস করছি উত্তরটা গোপনীয় থাকবে।

বলুন। আপনাকে আমি নিজের দাদা বলেই মনের মধ্যে গ্রহণ করেছি। আপনার কাছে লুকোবার কিছু নেই।

চলে যাবার সময় জয়তিলকের জন্যে মন কেমন করবে না?

উত্তর দিতে গিয়ে প্রথমে একটুখানি সংকোচ আর দ্বিধায় পড়লো শ্রুতি। পরমুহূর্তে সব দ্বিধা সরিয়ে রেখে বলল, করবে দাদা।

ওপার থেকে অনিমেষ তরফদার বললেন, এত ভাল ছেলে এই জয়তিলক, ওর জন্যে আমারই মন কেমন করে। বেচারা ভাগ্যের ফেরে অস্থানে এসে পড়েছে। তুমি থাকায় ও মনে শান্তি পেয়েছিল শ্রুতি। সবটাই অবশ্য আমার অনুমান। মনে হয় তুমি এখান থেকে চলে গেলে ও বেচারা বড় অসহায় হয়ে পড়বে।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল শ্রুতি। সে ঠিক চুপ করে ছিলনা, জয়তিলকের জন্যে জমে ওঠা কান্না নিঃশেষে ঝরিয়ে চলেছিল।

ওপার থেকে একসময় মিঃ তরফদার বললেন, তোমার সুন্দর স্বভাব সকলকেই তোমার দিকে আকর্ষণ করবে। জয়তিলকের আহত মনটা তোমার কাছে আশ্রয় চাইবে এ তো স্বাভাবিক।

শ্রুতি বলল, আপনি আমাদের ভুল বুঝবেন না দাদা। এমন কোন কাজ আমরা করিনি যাতে নিজেদের বিবেকের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। বড় শান্ত আর সংযত মন জয়তিলকদার। উনি যখন কষ্ট পান তখন আমারও কষ্টের শেষ থাকে না। মনে হয় কোন রকমে যদি ওঁর মনের ভারটুকুও লঘু করে দিতে পারতাম। ভগবানের কাছে কতদিন প্রার্থনা জানিয়ে বলেছি, বাসবীদি যেন জয়তিলকদাকে চিনতে পারেন। ওঁরা যেন একদিন সব ভুলের পথ পেরিয়ে সুখী জীবনের পথটা খুঁজে পান।

মিঃ তরফদার বললেন, আমি তোমাদের কোনদিনই ভুল বুঝি নি বোন। দুটি সুন্দর তাজা মন পাশাপাশি থাকলে স্বাভাবিক ভাবেই মিলতে পারে, এই অনুমানের ওপর নির্ভর করেই কথাগুলো তোমাকে বলছি।

একটু থেমে মিঃ তরফদার আবার বললেন, ওসব কথা থাক্, তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি।

বলুন।

তুমি আমাদের এখানকার সেন্ট্রাল হস্পিট্যালে কাজ করবে?

যেখানে হোক আমাকে তো কাজ করতে হবে অনিমেষদা।

তুমি এ অঞ্চলে কাজ করতে পেলে খুশি হবে কি না, তাই বল।

খুশি হবনা বলার শক্তি কোথায় আমার।

তোমার ব্যবস্থা করে ফেলেছি, তুমি আমার হাত থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাবে। আমি শ্রাদ্ধের দিন ওখানে যাচ্ছি। এক ফাঁকে লেটারটা তোমাকে দিয়ে দেব। আর শোন, তুমি তোমার কোয়ালিফিকেশান উল্লেখ করে ঐদিনই আমার হাতে একটা অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে দেবে। ওটা আমি ফাইলে রেখে দেব।

কথা শুনে শ্রুতির গলাটা ভারী হয়ে উঠল আবেগে। সে বলল, আপনি আমার জন্যে এত ভেবেছেন অনিমেষদা!

তোমার জন্যে ভাবতে আমার ভারী বয়েই গেছে। আমি নিজের স্বার্থের কথা ভেবেই কাজটা করছি।

আপনার স্বার্থ। কি স্বার্থ দাদা?

স্রেফ গান শোনার স্বার্থ। এমন একটি গায়িকাকে কখনো ছেড়ে দিতে পারি, না ছেড়ে দেওয়া যায়। কলকাতা মহানগরী থাকুক তার কিন্নর-কিন্নরীদের সংগীত নিয়ে, আমরা আমাদের শ্রুতির গান শুনতে পেলেই খুশি।

শ্রাদ্ধের দুদিন আগে আউট হাউস থেকে বাংলোতে ঢোকার মুখে একটা কথা কাটাকাটি শুনতে পেল শ্রুতি। ঘরের ভেতর না ঢুকে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল সে।

জয়তিলকের গলায় উত্তেজনা, আমি আমার বাবার শ্রাদ্ধবাসরে ডেকেছি সবাইকে। বিয়ের ভোজে যোগ দেবার জন্যে ডাকিনি।

বাসবীর গলায় রুক্ষ সুর বাজল, আসছে আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধব, আর নিমন্ত্রিত বিশেষ সম্মানীয় অতিথির দল। তোমার এখানে তারা শ্রুতির মুখের পাঁচখানা ভক্তিগীতি শুনে, দুটো নিরামিষ সন্দেশ মুখে পুরে, ঢক্ ঢক্ করে এক গ্লাশ জল গলায় ঢেলে চলে যাবে আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখব।

আমি তো তা বলছি না বাসবী। তাঁদের খাওয়ানোর ভাল ব্যবস্থাই থাকবে, শুধু এদিনটা নিয়ম অনুযায়ী নিরিমিষ খাবার পরিবেশন করা হবে।

বাসবী বলল, পরের দিন তো মৎস মুখ। ওটা একদিন আগে হলে ক্ষতি কি?

দয়া করে তুমি শ্রাদ্ধের দিনটা আমাকে উত্তেজিত করনা। পরে যেদিন খুশি ওঁদের পার্টি দিও। আমিষ খাইও প্রাণ ভরে। মাছ মাংসের অঢেল আয়োজন, আমি একটি কথাও বলবনা। শুধু সেদিন জয়তিলকের বাবার শ্রাদ্ধের খাবার বলে দয়া করে ঘোষণা কর না।

এতখানি গোঁড়ামি যে আধুনিক কালের কোন ছেলের ভেতর থাকতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে।

দয়া করে বাসবী তুমি আমাকে এ কটা দিন আমার নিজের মত করে চলতে দাও। বাবা জীবনে কোন সময় হিন্দুশাস্ত্রের অনুশাসনকে অমান্য করেননি।

তুমি তাহলে শ্রাদ্ধের দিন তোমার ঐ গার্ডেনের কুলি কামিনদের খাওয়াও, আমি অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে আমার ইনভাইটেড গেস্টদের পার্টি দি। একবারও নিজের মুখে উচ্চারণ করব না, এটা তোমার বাবার শ্রাদ্ধের পার্টি দেওয়া হচ্ছে। ওরা যেমন খুশি ভেবে নিক।

জয়তিলক বলল, এসব বিষয় নিয়ে প্রতিবাদের প্রবৃত্তি আমার নেই। আমি দেহে মনে বড় ক্লান্ত বাসবী। তুমি তোমার খুশি মত কাজ কর। আমি আমাদের বাগানের কুলিকামিনদের ডেকেই বাবার কাজ শেষ করব।

বাসবীর গলা আর শোনা গেল না। শ্রুতি বাইরে দাঁড়িয়েছিল। তার সমস্ত শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। শ্রদ্ধার সঙ্গে যে কাজ করার কথা তাকে নিয়ে এমন একটা শ্রদ্ধাহীন বাগবিতণ্ডা শ্রুতির বুকে গিয়ে বাজল। ইচ্ছা থাকলেও সে ফিরে চলে যেতে পারলনা. স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল!

বাসবী বাইরের ঘরে এসে কাকে যেন ফোন করছে। শ্রুতি মোটামুটি বুঝল বাসবী গাড়ি নিয়ে এখুনি বেরুচ্ছে কোন কাজে। কথার টুকরো থেকে অনুমান করা গেল, শ্রাদ্ধবাসরের স্থান পরিবর্তন ও তদনুযায়ী আর একবার অবহিত করা। কথার শেষে বাসবী বলল, রেডি থেকো দিগন্ত, আমি এখুনি আসছি।

ফোন ছেড়ে দিয়ে বাসবী সম্ভবত ঘরে ঢুকল। শ্রুতি বারান্দা থেকে নেমে দাঁড়াল লনে। এই মুহূর্তে

সে কিছুতেই যেতে পারবে না ভেতরে। শ্রুতি এখন চলার শক্তি ফিরে পেয়েছে। সে লন পেরিয়ে ঢুকল পাইন ফরেস্টের ভেতর। রাস্তার ধারে অজস্র বুনো গোলাপের ফুল শেষ রাতের ঝড়ে পথের ওপর পাপড়ি বিছিয়ে রেখেছে। তার মনে হল, যেখানে শাখায় শাখায় ফুল ফুটে থাকার কথা সেখানে নিষ্ঠুর ঝড়ের দাপটে ফুলের কি নির্মম পরিণতি। জয়তিলক আর বাসবীর ছোট সংসার যেখানে ফুল ফোটাতে পারত সেখানে ফুলের বনে কেন এমন ঝড়ের তাণ্ডব চলে!

গাড়ির শব্দ শোনা গেল। শ্রুতি দেখল বাসবী গাড়ি করে বেরিয়ে গেল দিগন্ত সোমের বাংলোর দিকে। সে ধীরে ধীরে ঘরে এসে ঢুকল। যেন স্বামী-স্ত্রীর কলহের কোন কথাই তার কানে যায় নি, এইমাত্র সে বাংলোতে এসে পৌঁছেছে।

জয়তিলক ভোরের রোদের মত হেসে বলল, এসো, এসো শ্রুতি।

একটু আগে জয়তিলকের মনের ওপর দিয়ে যেন কোন ঝড়ই বয়ে যায় নি। শ্রুতি মনে মনে জয়তিলককে নমস্কার জানিয়ে বলল, তোমার সংযম দেখে অবাক হতে হয়, তুমি যেন এ জগতের মানুষই নও।

শ্রুতি জয়তিলকের মুখোমুখি নতজানু হয়ে বসাব ভঙ্গীতে বসল।

ফুলের কি ব্যবস্থা হয়েছে?

জয়তিলক বলল, এখনও সমস্যা মেটে নি। কিছু ম্যাগনোলিয়া পাওযা যাবে। কয়েক ঝুড়ি সাদা গোলাপ নিয়ে আসবে মালি। সাদা বন জুঁই-এর মালা গাঁথা হবে। তবে সবই সাদা ফুল কি না, তাই কতটা পরিমাণ পাব বুঝতে পারছি না।

ও তুমি কিছু ভেব না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমার ঐ ফুল নিয়ে বিশেষ কোন ভাবনা নেই শ্রুতি। গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়নের ব্যাপারে।

ওকে সমস্যা বলে ভেবনা, তাহলে কষ্ট পাবে। পরিস্থিতিটাকে সহজভাবে মানিয়ে নেবার চেষ্টা কর।

বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে শ্রুতির দিকে তাকিয়ে জয়তিলক বলল, সমস্যাটা তুমি জান?

আমি বাইরে থেকে সব শুনেছি জয়তিলকদা।

এখন তাহলে তুমি আমাকে কি করতে বল?

বাসবীদিকে তাঁর মত করে সব কিছু করতে দাও, আর তুমি সব সংস্কার, সব গ্লানি মুছে ফেল মন থেকে।

চোখ দুটো রুদ্ধ বেদনায় লাল হয়ে উঠল জয়তিলকের। ভাঙা গলায় বলল, তুমিও একথা বললে শ্রুতি!

বাসবীদির ভাবনায় এইসব শ্রাদ্ধ ইত্যাদির ব্যাপার ঘোরতর একটা সংস্কার ছাড়া কিছু নয়। তিনি তবু যে এটাকে মেনে নিয়েছেন তার কারণ বাংলোতে এই ব্যাপারটাকে উপলক্ষ করে বড় বড় মানুষেরা জড়ো হবেন, তাঁদের আপ্যায়ন করে নিজে কিছুটা আত্মপ্রসাদ লাভ করবেন। আমি কিন্তু আদপেই বাসবীদিকে দোষ দিচ্ছি না। এটা তাঁর আধুনিক মানসিকতা। তুমি, আমি এ মানসিকতার সঙ্গে একেবারে খাপ খাওয়াতে পারছি না বলেই ঠোকাঠুকিটা লাগছে। এটা ভাল কি মন্দ সে বিচার নয়। প্রত্যেককে নিজের ইচ্ছামত চলতে দেওয়াই একমাত্র শান্তির পথ। আমার সহজ বুদ্ধিতে তাই বুঝেছি জয়তিলকদা।

বেশ তাই হবে। তোমাদের দুজনের ইচ্ছার বাইরে আমি যাবনা।

বড় অসহায়ের মত শোনাল জয়তিলকের গলা।

শ্রুতির চোখে জল এসে গেল। সে দুটো হাত বাড়িয়ে জয়তিলকের বলিষ্ঠ হাতখানা ধরে বলল, তুমি দুঃখ পাও এ আমি চাই না জয়তিলকদা। কিন্তু তোমার দুঃখ ঘোচাই এমন শক্তি আমার নেই। বিশ্বাস কর, আমি জীবনে তোমার কাছ থেকে আর কিছুই চাই না, শুধু যদি তোমার পাশে পাশে থেকে

তোমার এই ছোট ছোট দুঃখের অংশ নিতে পারতাম, তাহলেই আমার জীবনের সব চেয়ে বড় শান্তি পেতাম।

একটু থেমে আবার বলল, তুমি দেহের দিক থেকে একজন বলিষ্ঠ পুরুষ কিন্তু মনের দিক থেকে এখনও একটি সরল অসহায় শিশুই রয়ে গেছ।

জয়তিলক বলল, বাসবী আর তার চারদিকের পরিবেশ নিয়ে আমি একরকম করে কাটাচ্ছিলাম। দুঃখের অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ এক সন্ধ্যায় তুমি সন্ধ্যাতারার স্নিগ্ধ সান্ত্বনাটুকু বয়ে নিয়ে এলে আমার জন্যে। তোমার সঙ্গ আমার ভুলে যাওয়া দুঃখগুলোকে আরও তীব্রতর করে তুলল।

শ্রুতি বলল, আমি চলে গেলে যদি তুমি দুঃখ ভুলতে পার, কিংবা তোমার চারদিকের পরিবেশকে মানিয়ে নিতে পার তাহলে এখুনি আমি এখান থেকে সরে চলে যেতে পারি। তোমাকে ভালবাসি বলেই তোমাকে একটুও দুঃখ দিতে চাই না জয়তিলকদা।

আমি যদি তোমাকে না ছেড়ে দি তাহলেও কি তুমি চলে যাবে শ্রুতি ?

হাসল শ্রুতি মাথা নীচু করে। মুখ তুলে বলল, এটা বাসবীদির এলাকা। এখানে তোমার ইচ্ছা নয়, তাঁর কথাই শেষ কথা। তবে ঈশ্বর কি চিন্তা করেন তা আমাদের সকলেরই অগোচর। তিনি ইচ্ছে করলে হয়ত আমার এই পাহাড় ছেড়ে চলে যাবার পরিকল্পনাই রদ হয়ে যাবে। আবার তাঁর ইচ্ছে হলে, দু'হাত দিয়ে পর্বতের চূড়াকে আঁকড়ে ধরলেও তিনি টেনে আমাকে দূরে সরিয়ে দেবেন।

তুমি খুব ঈশ্বরে বিশ্বাস কর শ্রুতি।

আমার রক্তে সে বিশ্বাস মিশে আছে জয়তিলকদা।

বাইরে একটা হৈ হৈ শব্দ শোনা গেল। বাহাদুরের সঙ্গে কার যেন কথা কাটাকাটি চলছে। এঁকসময় ওদের কানে ভেসে এল একটা শব্দ, —তিলক সাহেব—।

জয়তিলক মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। শ্রুতিও তাকে অনুসরণ করে লনে এসে নামল।

জয়তিলকের ইংগিতে বাহাদুর গেটের কাছ থেকে লোকটাকে ছেড়ে দিল। সে ছুটে এসে জয়তিলকের মুখোমুখি একটা লম্বা সেলাম জানিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

একি, শ্যামবাহাদুর, তুমি কোত্থেকে ?

আজ্ঞে হুজুর, আমার বরখাস্তের অর্ডার হইয়ে গেছে।

বিস্মিত জয়তিলক বলল, কি রকম? কে তোমাকে বরখাস্ত করল?

মেমসাব।

মেমসাব!

হাঁ হুজুর।

এরপর তার কথা থেকে যে রহস্য উদ্ঘাটিত হল তার মর্মার্থ এই, মোতিয়া ঝোরা থেকে জল আনতে গিয়েছিল। তখন সেও লক্ড়ির খোঁজে গিয়েছিল ঝোরার ধারের বনটাতে। একসময় সে মোতিয়ার গলায় গান শুনতে পেল। ভারী মিঠে গলায় গান গাইছিল মোতিয়া। সে কৌতূহলী হয়ে উঁকি দিতেই দেখতে পেল, স্টোর বাবু মোতিয়ার কোমর জড়িয়ে ধরে গান শুনছেন। আর যায় কোথা। বাঘের মত শ্যামবাহাদুর ঝাঁপিয়ে পড়ল স্টোর বাবুর ওপর। দুজনের সে কি ধস্তাধস্তি। মোতিয়া চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটল বস্তির দিকে। লোকজন ঝোরার কাছে এসে দেখে স্টোর বাবুর বিশাল বপুখানা পড়ে আছে ঝোরার ধারে। শ্যামবাহাদুরের ঘুষির ঘায়ে দাঁত ভেঙে রক্ত গড়াচ্ছে। শ্যাম দাঁড়িয়ে তখনও ফুঁসছে।

স্টোর বাবুকে তুলে আর শ্যামবাহাদুরকে ধরে বস্তিতে আনছিল সবাই, ঠিক সেই সময়ে রাস্তায় গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন মেমসাহেব। গাড়ি থামিয়ে সব কথা শুনে সুপারভাইজার বাবুকে স্টোরবাবুর

চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে বললেন। শ্যামবাহাদুরকে কাছে ডেকে ব্যাগ খুলে একশো টাকার পাঁচখানা নোট বের করে দিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, গ্রীন ভ্যালি টি-গার্ডেনের এলাকায় তাকে আর যদি দেখা যায় তাহলে খুনী বলে একেবারে পুলিশের বড়কর্তার কাছে চালান করে দেবেন। নোকরি ডিসমিস।

জয়তিলক বলল, তুমি এমন মার-দাঙ্গা করতে গেলে কেন শ্যাম?

হুজুর ও আমার পেয়ারের মোতিয়া। দোসরা আদমী ওকে পেয়ার করবে আর আমি দাঁড়ায়ে দেখব। আমি মরদ আছে না কি।

জয়তিলকের হঠাৎ মনে হল, শ্যামবাহাদুরের কাছে সে যেন অনেক ছোট হয়ে গেছে। যেখানে শ্যামবাহাদুর তার ভালবাসার অবমাননা দেখেছে, সেখানে সে কোন দিকে না তাকিয়ে বিচারের ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। কিন্তু জয়তিলক তা পারেনি। সে কাপুরুষের মত সব কিছু দেখে গেছে আর শুধু দুঃখ পেয়েছে।

জয়তিলক ভাবনায় ছেদ টেনে দিয়ে বলল, এখন কি বলতে চাও তুমি শ্যামবাহাদুর?

কুছু বলবার নেই হুজুর, আমি এখনি চলিয়ে যাচ্ছি। তবে আপনার কাছে এই পাঁচখানা নোট রাখিয়ে দিন। মেমসাবকো দিয়ে দেবেন। সাথ সাথ দিলাম নাই। হামার মনিব তো বটে।

না না, ও তুমি নিয়ে যাও শ্যামবাহাদুর।

জয়তিলকের পায়ের কাছে নোটগুলো রেখে দিয়ে শ্যাম বলল, হুজুর অনেক নিমক খেয়েছি, বেইমানি করব না। মালিককে সেলাম জানায়ে চললাম।

নোটগুলো পড়ে রইল মাটিতে। শ্যামবাহাদুর পেছন ফিরে গেট পেরিয়ে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছয়

তিন বছরের পরের একটি দুপুর। সেন্ট্রাল হস্‌পিট্যালের ফোনে ডাক পড়ল স্টাফ নার্স শ্রুতির। শ্রুতি এসে ফোন ধরতেই ওপার থেকে অনিমেষ তরফদারের গলা শোনা গেল।

কে শ্রুতি?

হ্যাঁ দাদা, আমি শ্রুতি কথা বলছি।

শোন, দিগন্ত খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমি ওর বাংলো থেকেই কথা বলছি। ডাক্তার বোস এখানেই রয়েছেন। ওঁর কোয়ার্টার থেকে সোজা এখানে চলে এসেছেন খবর পেয়ে।

কি অসুখ?

হার্ট অ্যাটাক। ডাক্তার বোস ওখানে ফোন করে দরকারী যা কিছু আনবার আনিয়ে নিচ্ছেন। ডাক্তার চোখানী ওসব নিয়ে আসবেন। কিন্তু তুমি চলে এস তাড়াতাড়ি। আমার গাড়ি এতক্ষণে হস্‌পিট্যালে পৌঁছে গেল বলে। শোন, তুমি ডাক্তার চোখানীর জন্যে অপেক্ষা কর না, আমার গাড়ি পৌঁছান মাত্র চলে এস। এখানে সবকিছুই আছে, কেবল সেবার জন্যে শিক্ষিত কোন লোক নেই।

ফোন ছেড়ে দিলেন মিঃ তরফদার।

কয়েক মিনিটের ভেতর মিঃ তরফদারের গাড়ি এসে পৌঁছল। শ্রুতি গাড়িতে উঠে বসল।

গাড়ি ছুটে চলেছে সেন্ট্রাল-টি-গার্ডেন হসপিট্যালের ক্রিম রঙের বাড়িখানা পেছনে ফেলে। সামনে পেছনে উঁচু নীচু পাহাড়। যেন সবুজের তরঙ্গ উঠছে, নামছে। মাইলের পর মাইল জুড়ে চায়ের বাগান। চোখ জুড়িয়ে যায় সবুজ সমুদ্রে। শরতের আকাশে একখানা সাদা মেঘ থমকে দাঁড়িয়ে আছে। নীল আকাশ থেকে পাহাড়ের সবুজে রোদ্দুরের সোনা ঝরছে।

শ্রুতি ভাবছে, কেন এমন হয়। প্রকৃতি যখন এতখানি প্রাণের সবুজে ভরা তখন মানুষের ঘরে প্রাণ নিয়ে টানাটানি কেন! এই অফুরন্ত প্রাণসম্পদে পূর্ণ প্রকৃতি কি মানুষের প্রয়োজনে একটুখানি প্রাণ দান করতে পারে না!

এই মুহূর্তে দিগন্তের জন্যে শ্রুতির বুকখানা কষ্টে ভরে উঠল। এমন একটি সুদর্শন বলিষ্ঠ পুরুষ, তার এ কি পরিণতি! কেন এমন দুর্বার উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের দিকে দিগন্তের প্রবল ঝোঁক। কেউ নেই তাকে বাধা দেবার। সবাই জুগিয়েছে তার যৌবনের আগুনে ইন্ধন। অতিরিক্ত মদে আসক্তি তার। নারী সঙ্গ তার সুঠাম শরীরটাকে তছনছ করে দিয়ে গেছে। সব অপগুণের আধার সে তবু এই মুহূর্তে ভয়ানক অসুস্থ মানুষটার ওপর রাগ হচ্ছে না শ্রুতির। সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে দিগন্তের দীর্ঘ জীবনের জন্য।

গাড়ি মিসেস সেনের বাংলোর পাশ দিয়ে চলে এল। শ্রুতি দেখল মিসেস সেন বারান্দায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে কোন একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছেন। গাড়ির শব্দে আড়চোখে একবার তাকালেন, কিন্তু ততক্ষণে বাংলোর সীমা ছাড়িয়ে গাড়ি বেরিয়ে এসেছে। শ্রুতি মিঃ তরফদারের মুখ থেকেই শুনেছে মিসেস সেনের দিগন্ত-প্রীতি। এত বয়সেও মানুষের সীমার বাইরের বস্তুতে এত ক্ষুধা কেন। বাসবীদির সঙ্গে দিগন্ত সোমের অবৈধ মেলামেশা অন্যায় হলেও অস্বাভাবিক নয়। তাদের বয়সের ধর্মে তারা পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু এই প্রৌঢ়ার বিকৃত ক্ষুধা তাকে বড় বেশি পীড়িত করে। জয়তিলকদার জন্যে তার দুঃখ হয়। এতখানি সততার পুঁজি যার তার ভাগ্যে এমন সংসার, এ যেন ভাবাই যায় না। হাসপাতালের কাজে যোগ দেবার পর তিনটি বছর তারা ফোনে কত সুখদুঃখের কথা বলেছে! সুযোগ সুবিধে হলেই সে চলে গেছে জয়তিলকদের বাংলোতে। বাসবী না থাকলে দুজনে ঘুরে বেড়িয়েছে পাইনের বনে। নিভৃত ঝর্ণাটার ধারে বসে গান গেয়েছে। কখনো বা হাতে হাত রেখেছে জয়তিলকের। সারা শরীর থর থর করে কেঁপেছে, তবু কোন সময়েই তার আবেগের ঢেউ বেলাভূমিকে ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে যায় নি। সে জানে, জয়তিলকদা তাকে ভালবাসলেও বাসবীদির জন্যে তার মনের গভীরে একটা আকর্ষণ থেকে গেছে। জয়তিলকদা একজন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর হতে চায়, যে ভাঙা মূর্তিগুলোকে দাগ মিলিয়ে নিখুঁত করে জুড়ে দিতে পারে। এইখানেই জয়তিলকদার চরিত্র অন্য যে কোন পুরুষের চেয়ে আলাদা। আর এ জন্যেই এই সরল অকৃত্রিম মানুষটির ওপর তার এতখানি টান।

জয়তিলকদা সারা মন উজাড় করে তাকে ভালবাসে, কিন্তু কোনদিন ক্ষুধা মেটাবার জন্যে বুকে টেনে নিয়ে পিষ্ট করে তাকে পরিত্যাগ করে না। তাই শ্রুতি তার ভালবাসার সঙ্গে যুক্ত করেছে এক ধরনের শ্রদ্ধা যা তার ভালবাসাকে একটা স্থায়ী মর্যাদা দিয়েছে।

সে তার ঈশ্বরের কাছে নিভৃতে প্রার্থনা জানায়, যেন বাসবীদি তার সব ভুল একদিন ঝেড়ে ফেলে দিয়ে জয়তিলকদার কাছে এসে দাঁড়ায়। তাকে খাঁটি সোনা বলে চিনে নিতে পারে।

একটি দিনের কথা মনে পড়ল শ্রুতির। তখনও রাধামোহনের শ্রাদ্ধের দু একটি দিন বাকী। হঠাৎ শ্যামবাহাদুরকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করে দিল বাসবীদি। সে এসে বাসবীদির দেওয়া পাঁচশো টাকা ফিরিয়ে দিয়ে গেল জয়তিলকদার কাছে।

শ্যামবাহাদুর চলে যাবার পর জয়তিলকদা বলল, জান শ্রুতি, ওর চাকরীটা না খেয়ে ওকে ঐ টাকাটা পুরস্কার দেওয়া উচিত ছিল। ওর গভীর ভালবাসার পুরস্কার।

পরক্ষণে কি ভেবে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, ঐ মোতিয়া মেয়েটা নাচে গায় ভাল কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল! একদিন চরম কোন ঘা খেলে ও কেঁদে মরবে শ্যামবাহাদুরের জন্যে।

আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী জয়তিলকদার। মাস দু'এক আগেই তা ফলে গেছে। বর্ষার শেষে প্রবল বিপর্যয় শুরু হয়েছিল এ অঞ্চলে। ধ্বস নেমে কয়েকটা বস্তি একেবারে তলিয়ে গিয়েছিল খাদে। গ্রীন-ভ্যালি-টি-গার্ডেনের কুলি বস্তি তলিয়ে না গেলেও ওপর থেকে অকস্মাৎ খসে পড়া কয়েক খণ্ড বড় বড় শিলার আঘাতে কয়েকটা বাড়ির কিছু ক্ষতি হয়। সেদিন কুলি কামিনেরা পাতা তোলার কাজে প্রায় সবাই বেরিয়ে গিয়েছিল। তাই কোন রকম আঘাতের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল। শরীর সুস্থ ছিল না বলে সেদিন কাজে যায় নি মোতিয়া। দুপুরের খাওয়ার খেয়ে দিবা নিদ্রা দিচ্ছিল সে, হঠাৎ অঘটনটা ঘটে গেল। শিলা বৃষ্টির মত পাথর গড়াতে লাগল। আওযাজে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, সে

বাইরে ছুটে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিশাল ছুটন্ত পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেল। পাথরটা মুহূর্তে বেরিয়ে গেল কিন্তু মোতিয়ার ডান পাখানা থেতলে দিয়ে চলে গেল। সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। বস্তির লোকেরা ফিরে এসে তাকে ঐ অবস্থায় দেখে হসপিট্যালে নিয়ে আসে। তার পাখানা অ্যাম্পুট করতে হয়। প্রাণটা কোন রকমে বেঁচে যায়।

এই সেদিন সে বস্তিতে ফিরে গেছে। যাবার আগে শ্রুতিকে ধরে বলেছিল, আমি শ্যামকে ঠকিয়েছি নার্স দিদি, তাই ভগবান আমাকে মারল। যে লাচ লিয়ে গুমর ছিলো সেই পাটা আমার কাড়িয়ে নিল।

শ্রুতি তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে। বলেছে, এখন থেকে শান্ত হয়ে নিজের জীবনটা কাটাবার চেষ্টা কর। যারা তোমার চারদিক ভীড় করে এসেছিল তারা কেউ আর আসবে না তোমার খোঁজ নিতে। দুঃখ কর না, এটা সংসারেব নিয়ম। তুমি কোম্পানী থেকে যতটুকু টাকা পাবে, কষ্ট হলেও তাই দিয়ে সৎভাবে জীবনটা কাটিয়ে দাও।

শ্রুতির মনে আছে, মোতিয়া চলে যাবার সময় গাড়িতে উঠেই ওকে নমস্কার করেছিল। স্পষ্ট দেখেছে মোতিয়ার চোখে জল।

মোতিয়া কি তার অতীতের ভুলের কথা ভেবেই কাঁদছিল!

হঠাৎ শ্রুতির ভাবনায় ছেদ পড়ে গেল। গাড়ি ব্রেক কষে দাঁড়াল। ওরা দিগন্ত সোমের বাংলোর লনে এসে পড়েছে।

পেথিড্রিন ইন্‌জেক্‌শান দিয়ে বুকের কষ্ট কমান হয়েছিল।

ডাক্তার বোস আর চোখানী প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার পর শ্রুতিকে কাজেব নির্দেশ দিয়ে চলে গেলেন। আট ঘণ্টা অন্তর হেপারিন ইন্‌জেক্‌শান শ্রুতিই দিয়ে দেবে। সবচেয়ে বড় কথা এ ধরনের রোগীর কাছে অতি সতর্কতার সঙ্গে কাজ করা। শুভানুধ্যায়ীদেব ভীড় করজোড়ে হঠিয়ে রোগীর ঘর থেকে দূরে তাদের বসার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা জায়গা থেকে ফোন আসবে, সে ফোন অ্যাটেণ্ড করে যেতে হবে। মৃদুভাবে সত্য মিথ্যা মিশিয়ে সমাচার দিতে হবে।

শ্রুতি প্রথমেই লোক আনিয়ে ফোনটাকে দিগন্তের শোবাব ঘর থেকে পাশের বক্স রুমে নিয়ে গিয়ে রাখল। দুটি ঘরের মাঝের দরজা ভেজিয়ে রাখা হল, ফোনের শব্দ যাতে না রোগীর কানে এসে বাজে।

অনিমেষ তরফদার বললেন, প্রথম ধাক্কাটা মনে হয় সামলেছে। এখন পরিচিতদের খবর নেবার আর তদারকীর হুড়োহুড়িতে না প্রাণটা যায়। তুমি কিন্তু এ ব্যাপাবে খুবই স্ট্রিক্ট থেকো শ্রুতি। রোগীর জীবন-মবণ সমস্যা যেখানে সেখানে কারুর খাতির নেই। আমি অবশ্য জনায় জনায় ফোন করে এ ব্যাপারে কিছুটা সাবধান করে দেব।

যদিও সাহায্যের জন্যে আরও একটি নার্স এল, তবু দিগন্তের পাশে বসে বিনিদ্র রাত্রি কাটাল শ্রুতি। আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে দিগন্ত। শ্রুতি চেয়ে আছে তার দিকে। একটি অসহায় শিশু যেন ঘুমিয়ে আছে বিছানার ওপর। শ্রুতি দিগন্তের মুখের দিকে চেয়ে ভাবছে, এ মানুষ কি করে পাপ করে। মাত্রাহীন মদ্যপান আর পরস্ত্রীর প্রতি অনুরাগের কোন চিহ্ন এই মুহূর্তে নেই দিগন্তের মুখের ছবিতে। যেন পরম নিশ্চিন্তে সমস্ত উত্তেজনার অবসানে বিশ্রাম নিচ্ছে দিগন্ত।

কয়েকবার অভিনয় হয়েছে প্ল্যানটার্স অ্যাসোসিয়েশনের ক্লাব ঘরে। ইংরাজী, বাংলা যে কোন নাটকেই নায়কের ভূমিকায় দিগন্ত সোম। অবশ্য নায়িকা প্রতি নাটকেই বাসবী। দুজনেই অভিনয়ে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছে। ওরা একসঙ্গে কোথাও দাঁড়িয়ে গল্প করলে, পাশ দিয়ে পরিচিতরা যাবার সময় মন্তব্য করে, এই যে নটনটী, আবার কি নাটকের মহড়া চলছে।

রক্তকরবী নাটকে জালের আড়াল থেকে রাজার ভূমিকায় নেমেছিল দিগন্ত। বাসবী হয়েছিল নন্দিনী। রাজার আশ্চর্য কণ্ঠস্বর যেন আজও কানে বাজছে শ্রুতির।

'সামনে তোমার মুখে চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালোচুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরণা। আমার এই হাত দুটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধুর্য

আর কখনো এমন করে ভাবিনি। সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের নিচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছে করছে। তুমি জান না, আমি কত শ্রান্ত।'

রাজার আশ্চর্য সুন্দর গলাখানা যেন ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে এল।

সেদিন ওদের অভিনয় উইংসের পাশে বসে দেখেছিল শ্রুতি। বার বার মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল সে। নন্দিনী বলছিল, —'তুমি কি কখনো ঘুমোও না?'

'ঘুমোতে ভয় করে।'

'তোমাকে আমার গানটা শেষ করে শুনিয়ে দিই—

'ভালোবাসি ভালোবাসি'।
এই সুরে কাছে দূরে জলে-স্থলে বাজায় বাঁশি।
আকাশে কার বুকের মাঝে
ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় গো ভাসি।'

বাসবীর হয়ে নেপথ্যে থেকে গানটা গেয়েছিল শ্রুতি। গান শেষে দারুণ করতালি পেয়েছিল।

ওর সেদিন মনে হয়েছিল, গানের ভেতর 'দিগন্ত' শব্দটা কি অদ্ভুতভাবে মিশে আছে।

আজ সত্যিই সোনার খনির রাজা দিগন্ত সোম বড় ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

শ্রুতি তার ঈশ্বরের কাছে বার বার প্রার্থনা জানিয়ে বলতে লাগল, ভগবান, বড় ক্লান্ত ও. ওকে শান্তিতে ঘুমুতে দাও। যেন সব অবসাদ. অবসন্নতা ওর নিঃশেষে মুছে যায়।

রাত কেটে গিয়ে ভোরের আলো ফুটেছে। দিগন্ত শুয়ে আছে। তার ডান হাতের ওপর এসে পড়েছে ভোরের একফালি নরম রোদ্দুর। কে যেন এক চিলতে হলুদ ছোপান কাপড় জড়িয়ে দিয়েছে ওর মণিবন্ধে। দিগন্ত চেয়ে আছে শ্রুতির মুখের দিকে।

কিছু কথা বলার চেষ্টা করতেই শ্রুতি নিজের ঠোঁটের ওপর হাত রেখে বারণ করল। কিন্তু শ্রুতির মুখখানাতে পরিস্থিতির গুরুত্বের কোন ছাব নেই, বরং সে মুখে সহজ প্রসন্নতার একটি ছবি ফুটে আছে। রোগীর কাছে যা আসন্ন নিরাময়ের প্রতিশ্রুতি।

ভোরবেলাতেই ডাক্তার বোস এসে খবর নিয়ে গেলেন। দরকাবী নির্দেশ দিয়ে গেলেন, আর যাবার সময় শ্রুতিকে ডেকে বললেন, যত অন্তরঙ্গ আত্মীয়ই হোক্, কেউ যেন বেশ কয়েক দিন ওঁর মুখোমুখি না হয়। এ বিষয়ে তোমাকে বেশি কিছু বলার দবকার মনে করছি না। তুমি সবই জানো।

শ্রুতি মাথা নাড়ল। কমাণ্ডারের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে, সৈনিকের চোখে মুখে সেই সংকল্প।

ডাক্তার চলে যাবার পর প্রথম যিনি এলেন, তিনি অনিমেষ তরফদার।

শ্রুতি বসার ঘরে উঠে গিয়ে মিঃ তরফদারকে বসিয়ে দিগন্তের খবর দিলে।

অনিমেষ বললেন, রোগীর আর কোন ভাবনা নেই।

একথা এখুনি কি করে বলছেন দাদা?

তোমাকে দেখে। তার মানে তোমার কাজের নমুনা দেখে।

কি রকম!

তুমি এগিয়ে এসে বসার ঘরে অনিমেষদাকে বসালে। কিন্তু রোগীর ঘরে যেতে দিলে না।

সঙ্কুচিত হয়ে শ্রুতি বলল, ডাক্তার বোসের নির্দেশ দাদা। সামান্য উত্তেজনাও যেন রোগীর মধ্যে না আসে।

অনিমেষ তরফদার বললেন, আমি জানি গো জানি, তাই তো এতবড় কমপ্লিমেন্টটা দিলাম। পথে ডাক্তার বোসের গাড়ির সঙ্গে আমার গাড়ির টুঁ-বিনিময় হয়েছে। ওঁর কাছে সব শুনেছি।

একটু থেমে বললেন, তুমি আমার গাড়ির আওয়াজ পেয়েছ?

না দাদা।

কিন্তু গাড়ি তো সোজা চলে আসে সোম সাহেবের বাংলোর অন্দর মহলে।

আপনি গাড়ি রেখে এসেছেন বাইরে, পাছে শব্দ হয়।

অনিমেষ তরফদার হা-হা করে হেসে উঠতে গিয়ে মুখে হাত চাপা দিলেন। একটু সামলে নিয়ে বললেন, খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে তুমি। যার ঘরে যাবে তার ঘর একেবারে বুদ্ধিতে ঝক্‌ঝক্ করবে।

শ্রুতি মিষ্টি করে হেসে বলল, আপাততঃ দাদা পরের ঘরে ঠাঁই পাবার ইচ্ছা অথবা সম্ভাবনা কোনটাই নেই। সুতরাং আপনার বোনের ঝক্‌ঝকে বুদ্ধির পরীক্ষা স্থগিত রইল। সকাল সকাল এসেছেন, নিশ্চয়ই এক কাপ চা খাবেন?

তোমার খাওয়া হয়ে গেলে আর হাঙ্গামার দরকার নেই।

হাঙ্গামা কিসের, রান্না ঘরে তো লোক হাজির। আমি এক্ষুনি আসছি।

শ্রুতি সঙ্গী নার্সটিকে দিগন্তের পাশে রেখে নিজে মুখ হাত ধুয়ে পোশাক পরিবর্তন করে হাতে চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকল ড্রইংরুমে।

দুজনে চা খেতে খেতে টুকরো টুকরো কথাবার্তায় কিছুটা সময় কাটল।

অনিমেষ তরফদার বললেন, দিগন্ত ছেলেটা বড় ভাল রে। মা বাপ নেই, হাতে অঢেল টাকা, তাই কিছুটা বয়ে গেছে। ওর নাকে দড়ি বাঁধার লোক যদি থাকত তাহলে কি আর ও বয়ে যেতে পারত, না এমন একটা অসুখে পড়ত।

শ্রুতি কোন মন্তব্য করল না।

অনিমেষ তরফদার আবার বললেন, দিগন্ত ছেলেটার জন্যে আমার একটা সফ্‌ট্ কর্ণার আছে। ও আমাকে বড় ভালবাসে।

আপনাকে সবাই ভালবাসে। আমি বুঝি কম ভালবাসি অনিমেষদা।

তোমাদের সকলের ভালবাসার জন্যেই তো নিজে আর আলাদা করে সংসার করতে পারলাম না সিস্টার।

ভেতর থেকে নার্সটি এসে বলল মিঃ সোম আপনার খোঁজ করছেন।

ওঁকে কথা বলতে দিলে কেন? তোমাকে সাবধান করে দিয়ে এলাম না।

নার্সটি ভেতরে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় অনিমেষ তরফদার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমার অনেক সময় নিলাম শ্রুতি। এখন আমি চলে যাচ্ছি, তুমি মাঝে মাঝে ফোন করে আমাকে খবরটা জানিও।

নিশ্চয়ই জানতে পারবেন দাদা।

অনিমেষ তরফদারকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল শ্রুতি। ফেরার সময় বাহাদুরকে কড়া ইন্সট্রাকশান দিয়ে এল, যিনিই দেখা করতে আসুন না কেন তাঁর গাড়ি যেন গেটের বাইরে নীচের রাস্তায় থাকে। বাংলোর কম্পাউণ্ডের ভেতর কোন গাড়িকে ঢুকতে দেবে না।

শ্রুতি গিয়ে ঢুকল দিগন্তের শোবার ঘরে। যে নার্সটি ওখানে বসেছিল তাকে ডেকে বলল, আমি এখন এখানে আছি। তুমি ব্রেকফাস্ট খেয়ে, স্নান সেরে তৈরী হয়ে নাও। সাড়ে আটটার ভেতর চলেএস এ ঘরে। আমি বাইরের ভিজিটার্সদের অ্যাটেণ্ড করব।

নার্সটি মাথা নেড়ে চলে গেলে শ্রুতি এসে বসল দিগন্তের কাছে। দিগন্তের পড়ে থাকা হাতখানার ওপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। মিষ্টি করে হেসে বলল, এই তো ভাল হয়ে গেছেন।

দিগন্ত, বিছানায় পড়ে থাকা হাতখানা একটুখানি তুলে শ্রুতির হাতটা ধরবার চেষ্টা করতেই শ্রুতি তার দুহাত দিয়ে দিগন্তের হাত ধরে বলল, একেবারে সুস্থ হয়ে গেছেন। তবে গাড়ি চালিয়ে অনেক ছুটোছুটি করেছেন তো, এখন তাই বেশ কিছুদিন বিছানায় শুয়ে কাটাতে হবে।

টেনে টেনে বলল দিগন্ত, বে-শ কিছু দি-ন!

একটুও কথা না বলে শুয়ে থাকুন, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি বিছানার বাইরে চলে আসতে পারবেন। কদিনের ভেতরেই ডাক্তার বোস আপনাকে লনে ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি দেবেন।

ম্লান হাসি ফুটল দিগন্তের মুখে। আস্তে বলল, তুমি কাছে বসে থাকলে আমি খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠব।

শ্রুতি নিজের হাতের দুটি আঙুল দিগন্তের ঠোঁটের ওপর রেখে মাথা দোলাতে লাগল। ইংগিতটা এই, না না আর একটুও কথা নয়।

ঠিক সাড়ে আটটায় শ্রুতির নির্দেশ মত নার্সটি এসে ঢুকল দিগন্তের ঘরে। শ্রুতি নিজের ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে দিগন্তকে আবার কথা বলতে বারণ করে বাইরে বেরিয়ে এল।

সারা রাতের ক্লান্তি ধুয়ে মুছে ফেলল শ্রুতি মুক্তোর দানার মত ঝরে পড়া শাওয়ারের ধারায় স্নান করে।

ড্রইংরুমে সে যখন ঢুকল তখন শুভ্র রজনীগন্ধার একটি বৃন্ত যেন। নার্সদের মত আঁটসাঁট পোশাক না পরলেও সাদা একখানা এমব্রয়ডারী করা শাড়ীতে তাকে পবিত্র সেবার একটি প্রতিমা বলে মনে হচ্ছিল।

সবুজ ঘাসের লনে সোনালী রোদ্দুরের পাতলা একখানা চাদর বিছান। পেনিলোপ গোলাপের ঝাড়ে কুচো কুচো নীল সাদা হলুদ কাগজের মত কয়েকটা প্রজাপতি গ্রুপ ডান্স করছে। ড্রইংরুমের একটা সোফায় নিজেকে প্রায় ডুবিয়ে রেখে অলস চোখে সেদিকে চেয়ে দেখছিল শ্রুতি।

হঠাৎ একটা চড়া গলার তীক্ষ্ণ আওয়াজে সে চমকে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

বাইরে বেরিয়ে এসেই দেখল, কম্পাউণ্ডের শেষ সীমায় লোহার গেট প্রায় বন্ধ করে রাস্তার দিকে চেয়ে মাথা আর হাত নেড়ে কাকে যেন কি বোঝাচ্ছে বাহাদুর। একখানা গাড়ি মনে হল বাইরে দাঁড়িয়ে।

তাড়াতাড়ি পা ফেলে গেটের কাছে গিয়ে শ্রুতি দেখে ওপারে গাড়িতে বসে বাসবী।

শ্রুতিকে দেখে গাড়ি থেকে নেমে এল বাসবী। তার চোখ মুখ দেখে মনে হল উত্তেজনায় সে কাঁপছে। কোমরে একখানা হাত রেখে অন্য হাতখানা উদ্যত বর্শার মতো সামনে প্রসারিত করে বলল, এই বুদ্ধুটা বলে কি, আমাকে গাড়িখানা নীচে রেখে আসতে হবে। গাড়ি নিয়ে ঐ ইডিয়েট দারোয়ানটা নাকি আমাকে বাংলোতে ঢুকতে দেবে না।

শ্রুতি শান্ত গলায় বাহাদুরকে বলল, তুমি নাস্তা করে এস জলদি, আমি এখানে আছি।

বাহাদুর চলে গেল। শ্রুতি গেটের বাইরে বেরিয়ে এসে দুটো হাত জোড় করে দাঁড়াল। খুব সংযত গলায় বলল, ডাক্তার বোস কঠিনভাবে বারণ করে গেছেন বাসবীদি, কোন গাড়ি বাংলোর কম্পাউন্ডে ঢুকবে না। বাহাদুর বেচারার কোন দোষ নেই।

রাগে লাল হয়ে গেছে বাসবীর মুখ। সে গাড়িখানা রাস্তার ধারে সাইড করে রেখে ঠক্ ঠক্ জুতোর আওয়াজ তুলে ঢুকে গেল বাংলোর কম্পাউন্ডে। মনে হল, সে শ্রুতির ওপরেও সন্তুষ্ট হতে পারেনি।

শ্রুতি তার পেছন পেছন দ্রুত পা চালিয়ে এসে ঢুকল বাংলোর ড্রইংরুমে।

বসুন বাসবীদি, এইখানে বসুন।

দিগন্ত কোথায়?

ওঁকে কমপ্লিট রেস্টে রাখা হয়েছে।

বাসবীর কণ্ঠ রুক্ষ হয়ে উঠল, আমি যা জানতে চাইছি সোজা সেই কথার উত্তর দাও শ্রুতি। দিগন্ত কোথায়?

শ্রুতি এগিয়ে গিয়ে দিগন্তের শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, এই ঘরে।

বাসবী থমথমে মুখ করে এগিয়ে যাচ্ছিল। ক্রোধে অপমানে সে নিজের পদক্ষেপটুকুও ঠিক রাখতে পারছিল না। হঠাৎ দরজার দিকে চোখ তুলে দেখল, শ্রুতি দরজার দুদিকে দুটো হাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে।

তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বলল বাসবী, তুমিও কি বাহাদুরের মতো গেট আগলাবে না কি ?

বাসবীদি, আমি নিরুপায়! পেসেন্টের উত্তেজনা বাড়তে পারে, এমন কিছু করা চলবে না। তাই ঘরে ঢোকা আপনার সত্যিই বারণ।

স্তম্ভিত বাসবী কিছুক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে রইল শ্রুতির মুখের দিকে। তারপর বিদ্রূপের হাসি ঠোঁটের কোণায় টেনে এনে বলল, মনে হচ্ছে শ্রুতি এ বাংলোটা তোমার ঐ বাহাদুরের।

কথাটা চাবুকের মত এসে লাগল শ্রুতির আত্মসম্মানে। 'তোমার ঐ বাহাদুরের' শব্দ তিনটি এমনভাবে উচ্চারিত হয়েছিল বাসবীর গলায় যাতে দারুণ রকম চমকে উঠেছিল শ্রুতি !

সে একটু স্থির হয়ে নিয়ে বলল, বাসবীদি আপনি আমার বড়। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

তখনও বাসবীর জিভে বিষ, সে তো বুঝতে পারছি, গেট থেকে তাব নমুনা শুরু হয়েছে।

শ্রুতি আবার বলল, দোষ হলে যত খুশি শাস্তি দেবেন কিন্তু এখন আমাকে আমার কর্তব্য করতে দিন। রোগী মোটামুটি সুস্থ আছেন তবে আরও দু তিনটে দিন তাঁকে একা থাকতে দিতে হবে। তারপর আমি নিজেই আপনাকে ডাক দিয়ে ঘরের ভেতর নিয়ে আসব।

অশেষ ধন্যবাদ। দিগন্ত তোমার সেবা পেয়ে মনে হচ্ছে কৃতার্থ হয়ে যাবে।

আর কোন কথা না বলে বাসবী ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘর ছেড়ে লনের দিকে পা বাড়াল। বাইরে উত্তেজিত জুতোর শব্দ শোনা গেল। এক সময় গাড়ির আওয়াজ কাছে থেকে দূরে সরে যেতেই শ্রুতি বুঝল, বাসবী চলে গেছে।

দুপুরের দিকে বক্স রুমটাতে শুয়েছিল শ্রুতি। সামনের রাত জাগার জন্যে খানিকটা ঘুমিয়ে নিচ্ছিল সে। তার সঙ্গী নার্সটি ততক্ষণ অ্যাটেণ্ড করছিল দিগন্তকে।

বক্স রুমের ভেতরে রাখা ফোনটা বেজে উঠল। শ্রুতি তাড়াতাড়ি ফোনটা ধরে জানতে পারল ওপারে অনিমেষদা রয়েছেন।

অনিমেষ তরফদার বললেন, তোমার ঘুমটা ভাঙালাম তো?

একটু ঘুম এসে গিয়েছিল অনিমেষদা।

খুব স্বাভাবিক। কাল হোল নাইট জেগেছ। আজও জাগতে হতে পারে।

হতে পারে নয় অনিমেষদা, হবে।

তাহলে তোমাকে এখন আর বিরক্ত করবো না, ঘুমোও। শুধু বল, তোমার পেসেন্ট কেমন আছে?

ভাল বলেই তো মনে হচ্ছে সব দিক থেকে, তবে আপনি তো বোঝেন এ অসুখে সেন্ট পারসেন্ট আশ্বাস কখনো দেওয়া সম্ভব নয়।

তবু তোমার মুখ থেকে ভাল শুনেছি, এটাই আমাদের অনেকখানি আশার কথা।

শ্রুতি বলল, জানেন অনিমেষদা আপনি চলে যাবার পর খুব বিশ্রি একটা ব্যাপার ঘটে গেছে।

সাপের ল্যাজে ঘা দিয়েছ, এই তো?

আপনি জানলেন কি করে?

ক্রুদ্ধা সর্পিণীর মুখ থেকে।

শ্রুতি বলল, সত্যি অনিমেষদা, আমি বাসবীদির সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করে মনে মনে খুব দুঃখ পেয়েছি, কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না। উনি রাগে ক্ষোভে উত্তেজনায় নিজেকে হারিয়ে ফেললেন।

মিঃ তরফদার বললেন, সেই রাগের ঢেউ আমার ওপর এসে আছড়ে পড়ল। আমি তোমাকে সেন্ট্রাল হস্‌পিট্যালে চাকরী দিয়েছি বলে আমার ওপর একহাত নিলে। বললে, যে ম্যানার্স জানে না সে আমাদের সেন্ট্রাল টি-গার্ডেন হস্‌পিট্যালে চাকরীর যোগ্য নয়। তখন আমি ওর সঙ্গে যোগ দিয়ে আমার দুঃখের কথা বললাম। তুমি যে আমাকেও হটিয়ে দিয়েছ তা জানালাম। তখন বাসবী আরও ক্ষেপে গিয়ে বলল, আপনাকেও দেখতে দেয়নি, এত বড় স্পর্ধা!

বললাম, স্পর্ধা কিনা জানি না তবে আমি কর্তব্যের প্রশংসা না করে পারছি না। ও আমাকে দিগন্তের সব খবরই দিল, কিন্তু ঢুকতে দিল না ভেতরে। বলল, আমি নার্স, আমার কাজ দয়া করে নির্বিঘ্নে করতে দিন।

শ্রুতি বলল, আমি বাসবীদিকে একটুও অসম্মান করতে চাই নি। মিঃ সোম ভাল হয়ে গেলে আমি আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে ক্ষমা চেয়ে নেব। অবশ্য বাসবীদি যদি ক্ষমা করেন।

মিঃ তরফদার বললেন, বড় ভাল মেয়ে বাসবী। তবে বড্ড জেদী আর ক্ষ্যাপাটে স্বভাবের। কালই ও মন থেকে এসব ঝেড়ে মুছে ফেলে দেবে। ওর অন্তরটা কিন্তু খুবই কোমল শ্রুতি।

শ্রুতি বলল, আমি ওঁর সহৃদয় ব্যবহারের অনেক পরিচয় পেয়েছি, আবার অনেক রূঢ় কঠিন আঘাতও উনি দিয়েছেন। তবে অনিমেষদা, আমি নার্স, আমার কাছে রোগীর সেবাই সব চেয়ে বড় কথা আর শেষ কথা। সেখানে মা, বাবা, ভাই বোন, বন্ধুবান্ধব প্রতিবন্ধক হলে, তাদের কথায় সায় দিয়ে আমি আমার রোগীর সর্বনাশ করতে পারব না। যতক্ষণ আমি নার্সের কাজ করি ততক্ষণ আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমার রোগী। কারণ আমার সমস্ত মন সে-ই আকর্ষণ করে নেয়।

অনিমেষ তরফদার বললেন, তোমার কর্তব্য তুমি করে যাও, কারু দিকে তাকাবার দরকার নেই। এখন আর আমি তোমার সময় নেবো না, তুমি একটু ঘুমোও।

অনিমেষ তরফদার ওপারে ফোন রেখে দিলেন। শ্রুতি চোখ বুজে চুপচাপ পড়ে রইল। তার ঘুম এল না। কতক্ষণ পরে তার এলোমেলো চিন্তার পথ ধরে যে এল, সে তার বিছানার এক প্রান্তে বসে বলল, এত শান্ত আর সুন্দর ব্যবহার তোমার, তুমি বাসবীকে জয় করে নিতে পারলে না?

শ্রুতি তার মুখোমুখি উঠে বসে বলল, জয়তিলকদা, সত্যিই আমি হেরে গেছি। তোমার মুখের দিকে চেয়ে অন্তত আমার জয়ী হওয়া উচিত ছিল। যতই হোক, অসহায় শ্রুতিকে একদিন তুমিই এখানে এনেছিলে। সেদিনের কথা মনে করে আজকের পরিস্থিতিটা আমার সামলে নেওয়া উচিত ছিল।

জয়তিলক বলল, আমি তোমার কতটুকু উপকার করেছি তা জানি না, তবে নির্জন পাইন বনে তুমি যে আমাকে সঙ্গ দিয়েছ তার মূল্য আমার জীবনে অনেক। আমি তোমার আর্থিক উপকারের পথ হয়ত কিছুটা প্রশস্ত করেছি, কিন্তু তুমি আমার অশান্ত হৃদয়ের ওপর তোমার সান্ত্বনার হাতখানা বুলিয়ে দিয়েছ।

শ্রুতি বলল, উপকারের কথা ছেড়ে দিলেও আমি তোমার কাছ থেকে কম পাইনি জয়তিলকদা। প্রথম সূর্যের রঙের মত ভালবাসার রঙ তোমার মুখের দিকে চেয়েই আমি চিনতে শিখেছি। একটি তরুণী মনের এ যে কত বড় পাওয়া তা তুমি বুঝবে না জয়তিলকদা। তোমাকে নিয়ে সংসার গড়ার কথা আমি ভাবি না, এবং সে ভাবনাটা যে অন্যায় তাও জানি, কিন্তু তুমি আমার জীবনের প্রথম পুরুষ, এ কথা ভুলতে পারব না জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। আজ তোমার দুঃখের জীবনে যদি আমি একটুখানি আলো কোথা থেকেও এনে দিতে পারতাম, তাহলে আমার শান্তির শেষ থাকত না।

জয়তিলক হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি ঘুমোও শ্রুতি, আবার দীর্ঘ রাত জাগার জন্যে তোমাকে তৈরী হতে হবে।

একটু হেসে আবার বলল, দিগন্ত বড় ভাগ্যবান। ওকে ঈর্ষা করতে ইচ্ছে হয়। ও তোমার বিনিদ্র রজনীর সেবা ভোগ করছে।

শ্রুতি বলল, আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন আমার হাতের এ ধরণের সেবা তোমাকে কোন দিনও না পেতে হয়।

জয়তিলক সরে গেল। নিবিড় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল শ্রুতি।

পরদিন ঠিক দুপুরে সত্যিকারের ফোন এল জয়তিলকের কাছ থেকে।

হ্যালো।

কে কথা বলছেন?

আমি শ্রুতি, আপনি কে ?

জয়তিলক। কেমন আছেন মিঃ সোম?

কালকের চেয়ে আজ আরও ভাল।

তুমি নার্সিং-এর কাজে দারুণ ব্যস্ত আছ। তাই তোমাকে বিরক্ত করতে চাই না শ্রুতি।

কথাটা তুলে নাও, নইলে শ্রুতি তোমার সঙ্গে আর একটিও কথা বলবে না।

শোন, রাগ করছ কেন? আমি সব খবরই তো পাচ্ছি অনিমেষদার কাছ থেকে।

আচ্ছা বাসবীদি তোমাকে কি বললেন?

কই কোন কথাই তো তার সঙ্গে আমার হয়নি।

সে কি ? আমার সম্বন্ধে কোন কথা?

একটু চুপ করে থেকে জয়তিলক বলল, সপ্তাহে নিতান্ত প্রয়োজনে দু'চারটে কথা হয় তোমার বাসবীদির সঙ্গে। তার বেশি অপ্রয়োজনের একটি বর্ণও নয়।

আমি বাসবীদিকে রোগীর ঘরে ঢুকতে দিইনি তাই দারুণ অসন্তুষ্ট হয়েছেন!

এর ভেতর আমার কি করণীয় আছে শ্রুতি। তার অসন্তোষ দূর করার ক্ষমতা আমার নেই, তার ওপর শ্রুতি সংক্রান্ত ব্যাপার হলে তো কথাই নেই।

আচ্ছা যাক্ সে কথা, তুমি কেমন আছ জয়তিলকদা?

এমনিতে সময় কেটে যাচ্ছে, শুধু নিঃসঙ্গতা বেড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। বাসবী প্রায়ই বাংলোতে থাকে না আজকাল। যেদিন থাকে, সেদিনও বড় একটা কথা হয় না। তবু ও থাকলে মনে হয়, নিঃসঙ্গতার পাষাণ ভারটা অনেক অনেক লঘু হয়ে গেছে। আমি মনে মনে খুশি হয়ে উঠি শ্রুতি।

কতদিন তোমাকে দেখিনি জয়তিলকদা, আর মনে হলেও তো দেখা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

আমি কিন্তু পাইন বনের ঐ ঝর্ণাটার ধারে মাঝে মাঝে গিয়ে বসি। তখন মিষ্টি একটি মেয়েকে চোখের সামনে দেখতে পাই। কখনো চুপচাপ বসে থেকে তার গান শুনতে পাই।

জয়তিলকদা, বিশ্বাস করবে, কাল ঠিক এই সময়ে তোমার সঙ্গে আমি কথা বলেছি।

সে কি, এ যে অলৌকিক ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে!

না, একেবারে না। আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছি, ঘুম আসছে না, তুমি আমার ভাবনার পথ ধরে বিছানার পাশে এসে বসলে। কত কথা হল মুখোমুখি বসে। কি যে ভাল লাগছিল কাল।

আজ বুঝি আমার কথা একটুও ভাল লাগছে না শ্রুতি।

আমার মনে হচ্ছে এটাও স্বপ্ন। তুমি ফোন ছেড়ে দিলে, বিশ্বাস কর, আমার তাই মনে হবে।

আমি এখন রাখছি শ্রুতি। তোমার আজকের রাত্রি নিরুদ্বেগে কাটুক। তোমার রোগী একেবারে আগের মত সুস্থ হয়ে উঠুক, এই কামনা।

শ্রুতি বলল, ছেড়ে দিও না জয়তিলকদা, ফোনে আমাকে শেষ কথাটা বলার সুযোগ দাও।

বল, আমি কান পেতে আছি।

তোমার মনে শান্তি আসুক। বাসবীদি তাঁর যথার্থ মানুষটিকে চিনে নিন, এই প্রার্থনা আমার ঈশ্বরের কাছে রোজ জানিয়ে যাব।

সাত

ঠিক দশ দিন পরে লনে ঘুরে বেড়াবার অনুমতি মিলল দিগন্ত সোমের। সকালের সোনালী রশ্মি গায়ে মেখে স্নান করল দিগন্ত। তার একখানা হাত শ্রুতির হাতের সঙ্গে বাঁধা। তারা দুজনে ধীরে ধীরে পা ফেলে ফেলে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

দিগন্ত বলল, তুমি আমার পুনর্জন্ম দিলে শ্রুতি।

আমি নার্স। রোগীকে সেবা দিয়ে সুস্থ করে তোলাই আমার কাজ।

দিগন্ত বলল, প্রতিটি রাতে ঘুম ভেঙে গেলে আমি তোমার দিকে চেয়ে দেখেছি শ্রুতি। তুমি পাশের চেয়ারটায় সিধে হয়ে বসে ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে চলেছ। চোখাচোখি হলেই আমার মুখের কাছে তোমার প্রশ্নে ভরা চোখ দুটো নামিয়ে এনে খোঁজ নিয়েছ, আমি কি চাইছি?কোন কষ্ট হচ্ছে কি না?

তারপর কত মমতায় বুকে হাত দিয়ে বলেছ, এখনও রাত আছে চুপটি করে ঘুমোন, আমি বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

শ্রুতি বলল কাজ শেষ হয়েছে আমার। এখন সেন্ট্রাল হস্‌পিট্যাল থেকে যেদিন ডাক আসবে সেদিনই চলে যেতে হবে। কিন্তু একটি অনুরোধ করব আপনাকে, রাখবেন, কথা দিন।

বল শ্রুতি, নিশ্চয়ই রাখব।

শ্রুতি হেসে বলল, না শুনেই কথা দিয়ে দিলেন! এ অনুরোধ রাখা কিন্তু সহজ নয়।

যত কঠিনই হোক, তোমাকে যখন কথা দিয়েছি তখন রাখবই।

শ্রুতি বলল, ড্রিংক করা আর ড্রাইভ করা দুটোই ছাড়তে হবে। এটা আপনার এই অসুখের পক্ষে একেবারেই বারণ।

শ্রুতির সঙ্গে পা ফেলে ফেলে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে একসময় শ্রুতির মুখোমুখি দাঁড়াল দিগন্ত। বলল, বড় কঠিন এ অনুরোধ। আমার অসুখের কথা ভেবেও আমি এ দুটো জিনিস ছাড়তে পারতাম না, কিন্তু কথা দিচ্ছি তোমার অনুরোধ আমি রাখব।

শ্রুতি বলল, আপনার নিশ্চয়ই এ সব ছাড়তে খুব কষ্ট হবে। আচ্ছা একটু একটু করে কমিয়ে আনলে কেমন হয়?

না শ্রুতি, একটু একটু করে ওসব কন্ট্রোল করা যায় বলে আমি মনে করি না। ছাড়লে একেবারেই ছেড়ে দিতে হবে।

শ্রুতি হেসে বলল, যখন এসবের জন্যে মনে মনে কষ্ট পাবেন তখন শ্রুতির ওপর এক হাত নেবেন, অবশ্য যদিও সেদিন সশরীরে শ্রুতি আপনার কাছে হাজির থাকবে না।

দিগন্ত হাতখানা ধরে ফেলল শ্রুতির। বলল, আমাকে কষ্টের ভেতর একা ফেলে পালাতে তোমার ইচ্ছে করবে? অসুস্থ দিগন্তের বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে তাকে তুমি সুস্থ করে তুলেছ, আর অশান্ত দিগন্তকে শান্ত করতে তার কাছে তুমি থাকবে না?

শ্রুতি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

বল, বল শ্রুতি! দোহাই তোমার, চুপ করে থেকোনা।

ছলছল চোখে শ্রুতি বলল, আজ সকালটা আমাকে ছুটি দিন। সন্ধ্যায় আমি এখানে এসে আপনার কথার উত্তর দেব।

প্রথম দিনের ভ্রমণ পর্ব শেষ করে শ্রুতি আর দিগন্ত বাংলোতে ফিরে এল।

দিগন্ত শোবার ঘরে ঢুকতেই শ্রুতি ফোন তুলে ডায়াল করল।

হ্যালো।

আমি শ্রুতি অনিমেষদা!

কি খবর? সকালে ঘুম ভাঙালে?

বড্ড বিপদে পড়েছি দাদা।

বিস্মিত অনিমেষ তরফদার প্রশ্ন করলেন কি বিপদ শ্রুতি? দিগন্ত ভাল তো?

হ্যাঁ, সে সব বিপদ আপাততঃ চুকে বুকে গেছে। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব সমস্যা, এবং খুব জটিল সমস্যা।

ও তোমার সমস্যা, তা তরুণী মেয়েদের সমস্যা না থাকাটাই অস্বাভাবিক।

আমি এখুনি আপনার কাছে আসছি, কাজ আছে বলে এড়িয়ে গেলে চলবে না।

এস, কিন্তু রোগীকে একা ফেলে [illegible]বে?

এখন উনি আর রোগী পদবাচ্য নন।

তাহলে ভোগী বলা যেতে পারে?

আমি জানি না। এখুনি আসছি।

ফোন ছেড়ে দিয়ে দিগন্তের ঘরে ঢুকল শ্রুতি। দিগন্ত চোখ বুজে শুয়ে আছে।

শ্রুতি বলল, একটু গাড়িটা নেব?

চোখ চেয়ে উঠে বসল দিগন্ত, গাড়ি ? নিশ্চয় নেবে। ও আবার জিজ্ঞেস করার কি আছে।

শ্রুতি একটুখানি হেসে বলল, আমার কিন্তু ফিরতে দেরী হতে পারে। আপনার সব ব্যবস্থা করে রেখে যাচ্ছি। রুটিন মত খাওয়া দাওয়া করবেন। একটুও এদিক ওদিক যেন না হয়।

যদি অবাধ্য হই? শাস্তি দেবে নাকি ?

আমি খুব কষ্ট পাব তাহলে।

দিগন্ত বলল, দেখো তোমার রুটিনের একটু নড়চড় হবে না।

কথা হচ্ছিল শ্রুতির সঙ্গে অনিমেষ তরফদারের।

তুমি সব জেনেও ওকে বিয়ে করবে শ্রুতি !

আমি ওর ব্যাক হিস্ট্রি সবই জানি, ওর অসুখের গুরুত্ব কতখানি তাও আমার অজানা নয়, তবু ওর প্রস্তাবে মত দিতে চাইছি।

অনিমেষ তরফদার বললেন, শ্রুতি সুন্দর একটি গোলাপ যদি কীটদষ্ট হয় কিংবা অসময়ে শুকিয়ে যায় তাহলে তার দিকে তাকিয়ে শুধু দীর্ঘশ্বাসই পড়ে।

শ্রুতির চোখে জল। সে বলল, আমি জানি দাদা, আপনি আমার কত বড় শুভানুধ্যায়ী আর কতখানি বোনকে ভালবাসেন। কিন্তু সেবাকে যখন ধর্ম বলে মেনে নিয়েছি তখন কি পেলাম তার হিসেব না করে সারাজীবন মানুষের সেবা করে যেতে দিন।

তোমার ভেতর এতবড় একখানা যে হৃদয় আছে তা ভাবতে পারিনি শ্রুতি।

না দাদা আমি বড় স্বার্থপর। একটা মানুষকে মনে প্রাণে ভালবেসেছিলাম জীবনে। তাঁকে সুখী করব, এই ছিল আমার জীবনের ব্রত। দিগন্তকে বিয়ে করলে হয়ত তার জীবনে সুখ ফিরে আসতে পারে। তাই দিগন্তের প্রস্তাবকে আমি মেনে নিতে চাইছি।

অনিমেষ তরফদার হঠাৎ তাঁর দুটো হাতে শ্রুতির মাথাটা চেপে ধরে বললেন, তোমাকে কি বলে আশীর্বাদ জানাব বোন তা ভেবে পাচ্ছি না। বাসবী আর জয়তিলকের সংসারে সুখ আসুক, এ আমি মনেপ্রাণে চাইতাম, কিন্তু দিগন্ত, বাসবীর গতির জোয়ার প্রতিহত করি, সে শক্তি আমার ছিলনা। তুমি বোন সে অসাধ্য সাধনই করতে চলেছ।

একটু থেমে বললেন, জয়তিলক যদি তোমাকে ভালবেসে থাকে তাহলে সে কি সুখী হতে পারবে তোমার বিয়েতে ?

জয়তিলকদা অসাধারণ সংযমী আর বিবেকবান মানুষ। তিনি এখনও বাসবীদির ফিরে আসার পথ চেয়ে আছেন, আমি শুধু তাঁর দুঃখের দিনে গান শুনিয়ে, সঙ্গ দিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছি।

অনিমেষ তরফদার বললেন, তোমার সিদ্ধান্তে আমার পুরোপুরি সমর্থন রইল জানবে। অন্তরের আশীর্বাদ তো আগেই জানিয়েছি।

উঠে দাঁড়িয়ে শ্রুতি বলল, জয়তিলকদাকে ভালবেসে এ কাজ করতে চলেছি বলে মনে করবেন না যে দিগন্ত আমার অনাদর পাবে। যে আমার স্বামী হতে চলেছে সে তার পরিপূর্ণ মর্যাদা আর ভালবাসা পাবে তার স্ত্রীর কাছ থেকে।

আউট হাউসের বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসে সূর্যাস্তের দিকে মুখ করে কবিতার বই পড়ছিল জয়তিলক। এ সময়টাতে জয়তিলক পাইন বনে ঘুরে ঘুরে এই আউট হাউসে এসে বসে। সারা দিনের কাজ কর্মের শেষে এই তার বিশ্রাম মুহূর্ত।

জয়তিলক সামনের পথে পায়ের সাড়া পেয়ে চোখ মেলে তাকাল। বইখানা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল সে। বাসবী উঠে আসছে ওপরের দিকে। একটা উত্তেজনায় তার চলার গতি বেড়ে গেছে। জয়তিলক বারান্দা থেকে নীচে নেমে যেতেই মুখোমুখি হল।

বাসবী উত্তেজনায় জোরে জোরে শ্বাস টানছিল। সে একটা হলুদ রঙের নিমন্ত্রণ কার্ড এগিয়ে দিল জয়তিলকের হাতে। জয়তিলক পড়ে দেখল। সামনের একটা বিশেষ তারিখে দিগন্ত আর শ্রুতি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। বৈদিক কোন অনুষ্ঠান কিংবা রেজিস্ট্রির মাধ্যমে বিবাহকে সিদ্ধ করার কোন ইচ্ছা উভয়ের নেই। তারা পরস্পরকে গ্রহণ করেছে বিশ্বাস আর ভালবাসায়। ঐ বিশেষ দিনের সান্ধ্য-অনুষ্ঠানে তারা চায় বন্ধুজনের শুভেচ্ছা, প্রীতি ও সান্নিধ্য।

জয়তিলকের মুখখানা শেষ বেলার আলো পড়ে বড় উজ্জ্বল দেখাল। জয়তিলক বলল, খুব খুশির খবর বাসবী। তোমার কি মনে হচ্ছে?

বাসবী কথা না বলে আর একখানা ছোট্ট চিঠি বের করে জয়তিলকের হাতে ধরিয়ে দিল।

জয়তিলক দেখল, শ্রুতির হাতের লেখা। লিখেছে বাসবীকে।

প্রিয় বাসবীদি,

কার্ডে আমাদের বিয়ের খবর পাবেন। জীবনের এই বিশেষ লগ্নে আপনার এবং জয়তিলকদার কথা আমাদের বার বার মনে পড়ছে। আমি আপনার কাছে অনেক অপরাধ করেছি। ছোট বোন বলে ক্ষমা চাইব, কিন্তু ক্ষমা পাব কিনা জানি না। আমি আপনাদের কাছে অনেক ঋণে ঋণী। জীবনে সে সব ঋণ কোনদিনও শোধ হবে না। আজ আপনাদের দুজনের শুভ কামনা আমরা চাই। অন্তরের গভীর থেকে বলছি বাসবীদি, আপনাদের শুভেচ্ছা আমাদের জীবনের পাথেয় বলে আমরা মনে করব।

শ্রুতি

পুনশ্চঃ ঐ দিনটিতে জয়তিলকদা আর আপনার আসার পথ চেয়ে থাকব আমরা।

চিঠিখানা জয়তিলক ফিরিয়ে দিল বাসবীর হাতে। বাসবী বলল, আমি অনিমেষদাকে ফোন করেছিলাম। ওঁর কাছ থেকে অনেক কথাই জানতে পারলাম। আসলে দিগন্ত আর স্বাভাবিক মানুষের মত ছুটোছুটি করতে পারবে না। তাকে দেখার জন্যে সব সময় একটি মানুষ চাই। সেদিক থেকে শ্রুতিকে নির্বাচন করে দিগন্ত ঠিক কাজই করেছে। জান জয়, প্রথম দিন দিগন্তকে দেখতে গিয়ে শ্রুতির ব্যবহারে আহত হয়েছিলাম। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি, ও তার কর্তব্যই করেছে। আমাকে আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্য ওর ছিল না। শ্রুতিকে পেয়ে দিগন্ত সত্যিই সুখী হবে।

সূর্য পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়েছে, কিন্তু আকাশের গায়ে ছুঁড়ে দিয়েছে এক রাশ লাল আবীর। এ যেন হোলির দিনে রঙ ছুঁড়ে ছুঁড়ে লুকোচুরি খেলা।

বাসবী আর জয়তিলক পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে অনেকদিন পরে একসঙ্গে রঙের খেলা দেখতে লাগল।

একসময় বাসবী বলল, জয়, কতদিন আমরা পাইন বনে বেড়াতে যাইনি। সেই যে বিয়ের পর ঠিক পড়ন্ত বেলায় বেরিয়ে পড়তাম!

জয়তিলক বাসবীর হাতটা নিজের হাতের ভেতর ধরে নিয়ে বলল চল, যাই।

বিয়ের পার্টি শেষ হয়ে গেছে। গেস্টরা একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেছে যে যার বাংলোর পথে। অনিমেষ তরফদার আর বাসবী দায়িত্ব নিয়েছিলেন পার্টির ব্যবস্থাপনার। ড্রিঙ্কের কোনরকম ব্যবস্থাই ছিল না পার্টিতে। এ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বাসবীর। দিগন্ত যখন মদ ছেড়ে দেবেই তখন এই অনুষ্ঠানেই হোক তার শুভ সূচনা।

সবাই বর-বধূকে শুভ কামনা জানিয়ে ফিরে গেছে। মূল্যবান উপহার আর ফুলের স্তবকে ভরে গেছে ঘর।

অনিমেষ তরফদার বললেন, দিগন্ত, এতদিন পরে আমাদের মায়া কাটিয়ে পাহাড় ছেড়ে সমতলে চললে। কিন্তু কোথায় যাবে ভেবেছ কি?

এখনও কিছু ভেবে উঠতে পারিনি অনিমেষদা। ডাক্তারের নির্দেশ, পাহাড় ছাড়তে হবে, নইলে আপনাদের সঙ্গ ছেড়ে কি নির্বান্ধব জায়গায় বাস করতে যেতাম।

তোমার গার্ডেনের কি ব্যবস্থা করবে ভেবেছ?

তাও কিছু ভাবিনি। তবে যখন থাকতেই পারবনা এখানে তখন বিক্রির চেষ্টাই করতে হবে।

হঠাৎ ঘরের একটা কোণ থেকে বেরিয়ে এল বাসবী। সে প্রেজেন্টেশানগুলো গুছিয়ে রাখছিল আর শুনছিল অনিমেষদার কথা।

ওদের সামনে এসে বাসবী সুন্দর কাজকরা লাল একখানা ব্যাগ শ্রুতির হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, এটা জয় আর আমার তরফ থেকে তোমাদের জন্যে উপহার।

শ্রুতি আগ্রহে ব্যাগখানা খুলতেই তার থেকে বেরুল রেজিস্ট্রি করা একখানা দানপত্র। অনিমেষ তরফদার সেই দানপত্র হাতে নিয়ে পড়তে লাগলেন।

বাসবী শ্রুতিকে তার দীঘার হোটেলটি দান করে দিয়েছে।

অনিমেষ তরফদার চেঁচিয়ে উঠলেন, তোফা।

শ্রুতি বিস্ময়ে নির্বাক।

দিগন্ত বলল, তাহলে তোমাকে আমার গার্ডেনটা নিতে হবে।

বাসবী বলল, আমি শ্রুতিকে দান করেছি, তোমাকে তো করিনি। আর দান দিয়ে দান নিতে নেই। তবে তুমি যদি তোমার গার্ডেন বিক্রি না কর তাহলে আমি সেটা চালাবার ভার নিতে পারি।

অনিমেষ তরফদার আর একবার চেঁচিয়ে উঠলেন, থ্রি-চিয়ার্স ফর বাসবী।

বাসবী বলল, দীঘার হোটেলটি দানের পরিকল্পনা কিন্তু আমার নয়। ওটি সম্পূর্ণ জয়ের মাথার থেকে বেরিয়েছে! অবশ্য তাতে আমার যে আন্তরিক সমর্থন রয়েছে তা নিশ্চয় বলার অপেক্ষা রাখে না।

অনিমেষ তরফদার আবার বললেন, তুমি সত্যিকারের 'মিত্র' তাই বার বার তোমার জয়ধ্বনি দিই জয়তিলক।

জয়তিলক আর বাসবী, দিগন্তদের এগিয়ে দিতে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশান অবধি এসেছিল। ফিরে যাবার সময় বাংলোতে ঢোকার আগে হঠাৎ ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করাল বাসবী। বেলা শেষের আবছা আলোয় কি যেন চোখে পড়ল তার।

জয়তিলক বলল, কি হল, থামলে যে?

বাসবী ততক্ষণে গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে। জয়তিলকও নেমে দাঁড়াল বাসবীর পাশে।

পথের ধারে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজোড়া নারী পুরুষ। গতিশীল গাড়ির থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়েছে আত্মরক্ষার তাগিদে।

বাসবী কাছে গিয়ে বলল, মোতিয়া না?

হাঁ, মেমসাব। মরদের সাথে ভিখ্ মাঙতে বাহির হইয়েছিলাম।

জয়তিলক দেখল পুরুষটা মুখে একটা হাত চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে গিয়ে জয়তিলক বলল, আরে শ্যামবাহাদুর যে!

জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল, শ্যাম গ্রীণ ভ্যালি টি-গার্ডেন থেকে উৎখাত হয়ে অন্যত্র চলে গেলেও মোতিয়ার খোঁজ-খবর রাখত। মোতিয়া পা ভেঙে হাসপাতালে গেলে সে দু'একবার লুকিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে এসেছে। তারপর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ঝোপড়িতে গেলে যখন খোঁড়া মোতিয়ার ভার আর কেউ নিতে চায়নি তখন শ্যামবাহাদুরই এগিয়ে এসে তাকে সঙ্গী করে নিয়ে গেছে। এখন

মোতিয়ার মরদ শ্যামবাহাদুর। মোতিয়া বসে বসে গান করে আর শ্যামবাহাদুর নাচে। এমনি করে সারাদিনের রোজগারে কষ্টে সৃষ্টে দুটি প্রাণীর চলে যায়।

শ্যামবাহাদুর বলল, খোঁড়া বোলে তো বাবুসাহেব আপনার পিয়ারীকে ভুখা মরতে দিতে পারি না।

বাসবী বলল, শ্যামবাহাদুর, যার জন্যে তোমাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, সে যখন তোমার ঘর করছে তখন তোমার সব দোষ চুকে বুকে গেছে। শোন, কাল থেকে তুমি আমাদের বাংলোর খাস বেয়ারার কাজ করবে, আর মোতিয়া থাকবে আউট হাউসে। সকাল সকাল চলে এস।

জী মেমসাব,—বলেই মস্ত একটা সেলাম ঠুকল শ্যামবাহাদুর।

গাড়ি চালিয়ে বাংলোর কম্পাউন্ডে ঢুকতে গিয়ে বাসবী বলল, কি ভাবছি বলত ?

জয়তিলক বলল, বিয়ের পর প্রথম যেদিন ঢুকেছিলাম এই বাংলোতে, সেদিনটির কথা মনে পড়ছে।

গাড়ি থামিয়ে বাসবী জয়তিলককে কাছে টেনে এনে তার মাথায় নিজের মুখখানা ঠেকিয়ে নিবিড় হয়ে বসে রইল।

●

নীল অপরাজিতা

প্রবল বর্ষণ, বিদ্যুতের ঝলক আর মেঘের গর্জনের ভেতর দিয়ে পাহাড়ী জঙ্গল চিরে নীচের দিকে নেমে চলেছে সে। পায়ের তলায় পিচ্ছল সাপের দেহের মত এঁকে বেঁকে বইছে ঘোলা জলের স্রোত। দিক দিশাহীন মধ্যরাতের অন্ধকার।

হোমের ঘড়িতে ঢং ঢং আওয়াজ তুলে বারোটা বাজার পর জয়িতা পথে মেনেছে কম্পাউণ্ডের পাঁচিল ডিঙিয়ে। তুমুল বর্ষণ আর হাড় কাঁপানো শীতে নাইট গার্ড তখন টহল ফেলে ঢুকে পড়েছিল গেটের লাগাও ওয়েটিং রুমটায়। হোমের মাথায় লাগানো হলুদ বিবর্ণ আলোটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল অঝোর বর্ষার ঝালরে।

গলাবন্ধ মোটা পুলোভারটার ওপর জড়িয়ে নিয়েছে জয়িতা তার অনেকদিন আগেকার পাওয়া ফুটোফাটা একখানা ওয়াটার প্রুফ।

পাহাড়ের পর পাহাড় ফাটিয়ে যেন গর্জে উঠছে ইন্দ্রের বজ্র। পিছল পথে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে সে। মাথা ঠুকে যাচ্ছে বর্ষাভেজা পাইনের কাণ্ডে। ভ্রূক্ষেপ নেই। ধরা পড়ে গিয়ে আবার হোমের বন্দী জীবনে ফিরে যাবার ভয় তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

অজানা পথ, প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গে অদম্য উত্তেজনায় লড়াই করে চলেছে এক অষ্টাদশী তরুণী। সে মুক্তি চায়, বিশাল পৃথিবীতে বাঁচতে চায় নিজের মত করে।

কোন্‌দিকে যাচ্ছে, কতকক্ষণ ছুটে চলেছে সে, তার কোন হদিস নেই। একটা ত্রাস তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। সেই ভয়টা এই রাতের হিমশীতল হাওয়া ও বৃষ্টি, এমনকি ঘন ঘন পাহাড় কাঁপানো বজ্রপাতের চেয়েও ভয়ংকর। তারই তাড়ায় সে নিজেকে নিয়ে পালাচ্ছে প্রাণের মায়া ছেড়ে।

কোথায় যাবে সে? এ দুনিয়ায় প্রায় সকলেরই একটা করে ঠিকানা আছে। এমনকি ভিখিরিরাও পথের ধারের ঝোপড়িতে কিংবা বিশেষ বিশেষ ফুটপাথে খোলা আকাশের নীচে মাথা গুঁজে থাকে। এমনকি সংসার বিবাগী সন্ন্যাসীদেরও থাকার একটা করে ডেরা আছে পাহাড়ী গুহায়, কিন্তু আজ থেকে তার আর কোন আশ্রয় নেই।

এতদিন আশ্রয় ভেবে দেহটাকে যেখানে সে ফেলে রেখেছিল, সেখানে কোনদিনই সে তার অবাধ্য মনটাকে বেঁধে রাখতে পারেনি। দিনে দিনে আক্রোশ জমেছে মনের ভেতর, সুযোগ খুঁজেছে বাঁধন ছেঁড়ার কিন্তু পায়নি মুক্তির দিশা। আজ বেরিয়ে এসেছে সব বাঁধন ছিঁড়ে। প্রকৃতি তার মুক্তির জন্য তার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে সাহয্যের দশ হাত। এ সুযোগ সে হারাবে কি করে।

লোকটাকে সে তাদের অনাথ-আশ্রমের জাঁদরেল সুপার অন্নপূর্ণা ঘিসিংয়ের কাছে কয়েকবার আসতে দেখেছে। ওর বেশ গালভরা একটা নাম আছে, তেগ বাহাদুর সিং। সুপারের কি রকম যেন পিসতুতো ভাই। মাঝ বয়সী গাঁট্টাগোঁট্টা একটা লোক। বাঁ গালে গভীর কাটা একটা দাগ।

লোকটা এলেই অন্নপূর্ণা ঘিসিং অফিস ঘরে ডেকে পাঠান তাকে। একথা সেকথার মাঝখানে ফিরে ফিরে শোনান তাঁর ঐ আত্মীয় ভাইটির গুণগান। তিস্তা ভ্যালি টি-গার্ডেনের শ্রমিক-সর্দার সে। তার একটা হাঁকে নাকি লেবারদের পিলে চমকে যায়।

লেটেস্ট খবর, বউ মরেছে কোন বাচ্চাকাচ্চা না রেখে। লোকটা এখন মনের মত একটা বউ খুঁজছে। নির্ঝঞ্ঝাট পয়সাওলা বিপত্নীকদের দিকে মেয়ের বাপেরা নাকি হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বরের ডিমাণ্ড থাকে না, তাই।

দিদির কথা শুনে চেরা চোখে কুৎ কুৎ করে হাসি ফোটায় সিং বাহাদুর।

সুপারের মতলবটা যেদিন পরিষ্কার ধরা পড়ল জয়িতার কাছে সেদিন সে মৃদু হেসে কাজের অছিলায় উঠে চলে গিয়েছিল। সুপার বলেছিলেন, মহামায়া আর তার বিয়ের পবিত্র দায়িত্ব নাকি তাঁরই।

হোমের পুব উত্তর কোণে একটা অতি ছোট্ট ঘরে থাকত সে আর মহামায়া থাপা। প্রায় সমবয়সী তারা। একই ঘরে থাকার জন্য, তাদের বন্ধুত্বও ছিল অটুট।

ঘরে ঢুকতেই মহামায়া বলে উঠল, কি ব্যাপার! তোর ওপর সুপারের খুব নজর পড়েছে দেখছি, ঘন ঘন ডাক!

জয়িতা বলল, মনে হচ্ছে সুপার তার ভাইয়ের জন্যে একটা বউ খুঁজছে।

কি রকম?

কথাবার্তায়, আভাসে ইঙ্গিতে বুঝলাম।

সঙ্গে সঙ্গে মহামায়া বলল, জানিস জয়িতা, আমার কিন্তু এই হোম থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজের মতো একটা সংসার গড়তে ভারী ইচ্ছা করে।

তুই সুপারের ভাইকে দেখেছিস?

অনেকেই তো আসে, ঠিক বলতে পারব না।

আমি দেখেছি। লোকটার অনেক বয়স হয়েছে, তবে চেহারাটা বেশ তাগড়াই। শুনেছি কোনও একটা টি-কোম্পানির কুলির সর্দার। বেশ রেস্ত আছে বলে মনে হল।

মজা করে মহামায়া বলল, হোক না বয়সের ফারাক, চান্স পেলে আমি ঝুলে পড়ি।

সত্যি!

সত্যি।

জয়িতা বলল, মনে হচ্ছে তোর ভাগ্যেই শিকেটা ছিঁড়বে।

তবে তুই প্রতিদ্বন্দ্বী হলে আমার হার ভাগ্যবিধাতাও ঠেকাতে পারবেন না।

জয়িতা বলল, এ ব্যাপারে তুই সেন্ট পার্সেন্ট নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস। তা ছাড়া এই হোমে মাত্র আমরা দুজনেই বিয়ের যুগ্যি, বাকিরা সব হাঁটুর বয়সী। এ দিকে আমার সংসার-বাসনা নেই, তাই তুই একমাত্র যোগ্যতম প্রার্থী।

সে রাতে দু-বন্ধুতে এইটুকু কথাই হয়েছিল। আর প্রকৃতি, দুর্যোগের ঘনঘটায় জয়িতার পালিয়ে যাওয়ার পথটা সুগম করে দিয়েছিল।

বেশ খানিক সময় ধরে একটা বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। জয়িতা দেখল, তার পায়ের তলায় চাওড়া একটা পিচ ঢালা পথ। পথটা সামনের দিকে যেমন এগিয়েছে, বাঁ দিকেও তেমনি গাছের ফাঁকে নীচের দিকে নেমে গেছে।

বিদ্যুতের চমক থেমে যেতেই চরাচর গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে গেল। এখন আকাশ, অরণ্য, পথ সব মুছে গেছে। আন্দাজে সোজা সামনের পথটা ধরে চলা প্রায় দুষ্কর। পথের বাঁদিকে গভীর গিরিখাদ।

হঠাৎ জয়িতাকে চমকে দিয়ে একটা জোরালো আলো ঝলসে উঠল। পথের ধারের একটা গাছে সে সিঁটিয়ে দাঁড়াল।

নীচের রাস্তা থেকে গোঙাতে গোঙাতে মেন রাস্তায় উঠে এল একটা গাড়ি। রাস্তায় উঠেই গাড়িটা ব্রেক করে দাঁড়াল। জয়িতা কিন্তু আলোর আওতায় এসে পড়েছে।

পরক্ষণেই সে শুনতে পেল গাড়ির ভেতর একটা গোঙানির আওয়াজ। ড্রাইভারের সিট থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একটি তরতাজা যুবক। ততক্ষণে পেছনের দরজা খুলে বাইরে বৃষ্টিতে বেরিয়ে এসেছেন এক বয়স্কা ভদ্রমহিলা। দু-হাতের পাতায় বুক চেপে তিনি জলে কাদায় একাকার পথের ওপর বসে পড়লেন। যুবকটি মা মা বলে জড়িয়ে ধরল ভদ্রমহিলাকে। তাঁকে টেনে গাড়ির ভেতর আবার তোলার চেষ্টা করতে লাগল।

হঠাৎ যুবকটির চোখ পড়ল জয়িতার দিকে। বিদ্যুতের আলোয় তাকে যেন দেবকন্যা বলে মনে হল তার।

সে করুণ গলায় বলল, দয়া করে আপনি যদি আমাকে একটু সাহয্য করেন, আমার মা বড় অসুস্থ।

ওই ডাকে এমন একটা আর্তি ছিল যাকে কোনও ভাবেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। জয়িতা ছুটে গেল যুবকটিকে সাহায্য করতে।

ওরা ধরাধরি করে প্রায় অচৈতন্য ভদ্রমহিলাকে গাড়িতে তুলল।

ভারী অসহায় মনে হচ্ছিল যুবকটিকে। সে তখন তার মাকে নিয়ে প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত।

এবার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে যুবকটি বলল, কিছু যদি মনে না করেন, এই দুর্যেগের রাতে আপনি একা কোথায় চলেছেন?

দার্জিলিঙের দিকেই আপাতত চলেছি।

হাতে যেন চাঁদ পেল যুবকটি। একরাশ কথা বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে, আমি অতনু বোস, একটা ইংরেজি কাগজের রিপোর্টার। মাকে গাড়িতে নিয়ে গ্যাংটক গিয়েছিলাম। ফেরার পথে তাগ্‌দায় অর্কিড ব্রিডিং সেন্টার দেখার জন্য নেমে যাই। ওখানে ফরেস্ট রেস্ট হাউসের একটা ঘরে ছিলাম। সেখানেই হঠাৎ মা হার্টের প্রবলেমে পড়ে গেছে। তাই এই অসময়ে আমি দার্জিলিঙে গাড়ি নিয়ে ছুটেছি। আপনি ঈশ্বর প্রেরিতের মতো আমার সাহয্যে এসে গেলেন।

জয়িতা বলল, আমি পেছনে আপনার মাকে ধরে বসছি। আপনি ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চলুন, ব্যস্ত হয়ে ভেজা রাস্তায় জোরে চালাতে যাবেন না। এখন কেবল রাস্তার দিকে লক্ষ্য রাখুন, অকারণে উদ্বিগ্ন হবেন না।

অতনু জয়িতার নির্দেশমতো বৃষ্টিভেজা রাস্তায় সাবধানে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চলল।

মাঝে শুধু একবার জিজ্ঞেস করল, কি রকম বুঝছেন?

আপনার মা আমার বুকের ওপর হেলান দিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আছেন। আমাকে জয়িতা বলে ডাকবেন।

বেশ কিছুটা পথ চলার পরে অতনু আবার জানতে চাইল, জয়িতা, মা এখন কেমন আছেন?

মনে হচ্ছে স্বাভাবিক ভাবে নিঃশ্বাস পড়ছে, আপনি চিন্তিত হবেন না।

এত রাতেও দূর থেকে নক্ষত্রপুঞ্জের মতো শহরের আলোগুলো দেখা যাচ্ছে।

শহরে ঢুকেই অতনু জিজ্ঞেস করল, এখানে কোনও হস্‌পিটাল অথবা নামকরা নার্সিং হোমের সন্ধান আপনি দিতে পারেন?

দার্জিলিং জয়িতার বিশেষ চেনা শহর। সে এখানে কনভেন্টে থেকে ক্লাস ফাইভ অবধি পড়েছিল। তারপর ভাগ্যবিপর্যয়ে তাকে দূরে একটা ডেস্টিটিউট হোমে চলে যেতে হয়।

বাঁ দিক, ডান দিক নির্দেশ করে জয়িতা অতনুর গাড়িটাকে নিয়ে এল সিটি হস্‌পিটালের সামনে। সেখানে আই. সি. ইউ-তে অ্যাডমিট করা হল অতনুর মাকে।

এখন আর পেসেন্টকে দেখার ব্যাপার নেই। ডাক্তার আর নার্সের কেয়াবে রোগিনীকে ছেড়ে দেওয়া হল।

করিডরে এসে অতনু বলল, অনেক রাত, কাছেপিঠে কোনও হোটেল পাওয়া যাবে কি?

জয়িতা অতনুকে নিয়ে এসে ওঠাল হিমালয়ান হোটেলে। রিসেপশনিস্ট সামনে বসেই ছিল। ঘরের চাবি হাতে দিয়ে রুম নাম্বার নির্দেশ করল।

অতনু তাকাল জয়িতার দিকে।

জয়িতা বলল, আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন, ঈশ্বরের কৃপায় আপনার মা সুস্থ হয়ে উঠবেন। এখন আমাকে যেতে হবে।

বিহ্বল হল অতনু, কিন্তু তার বলার কিছু ছিল না, সে শুধু তার হাতটা বাড়িয়ে দিল।

জয়িতা ধরল সে হাত, পরক্ষণেই পথের আলো আঁধারিতে মিশে গেল।

শহরে পৌঁছনোর পরেই থেমে গিয়েছিল বৃষ্টি। এখন কৃষ্ণা তৃতীয়ার উজ্জ্বল চাঁদটা ঝকঝক করছে

আকাশে। এত বড় দুর্যোগের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু এই চাঁদের আলোই ভয় পাইয়ে দিল পলাতকাকে। দুর্যোগই ছিল তার রক্ষাকবচ।

ও যখন হোম থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে তখন মহামায়া ঘুমোচ্ছিল অঘোরে। জয়িতা জানে, এমনিতেই ও একটু ঘুমকাতুরে। তারওপর ঝড়বৃষ্টিতে ও একেবারে ঘুমিয়ে কাদা।

কিন্তু যে কোন ভাবেই হোক মহামায়া জেগে উঠে যদি দেখে জয়িতা ঘরের আশপাশে কোথাও নেই তাহলে ভয় পেয়ে সে চেঁচামেচি জুড়ে দেবে। তখন জানাজানি হয়ে যাবে তার হোম ছেড়ে বেরিয়ে যাবার ব্যাপারটা। আর তাই নিয়ে তখন টেলিফোন তুলে সুপার থানা পুলিশ করবে। পুলিশ স্টেশান থেকে খবরটা ছড়িয়ে পড়বে অয়ারলেসে সর্বত্র। টহলদারি ভ্যান ছুটে চলবে তারই খোঁজে।

এসব ভেবে চাঁদের আলোধোয়া গাড়ির রাস্তা ছাড়ল সে। গাছপালার ভেতর দিয়ে ছোটবড় পাথর ডিঙিয়ে নামতে লাগল ওম্ পথ বেয়ে।

আত্মগোপন করে সে অতি দ্রুত নেমে যেতে চায় সমতলের দিকে।

বৃষ্টি নেই কিন্তু ঠাণ্ডা দ্বিগুণ হয়ে বিঁধছে। পাঁজরে কে যেন ঢুকিয়ে দিচ্ছে তীক্ষ্ণধার একটা ছোরা। গায়ের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে। অভ্যাসে পাথরের ওপর পড়ছে পা। আতঙ্ক তাকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে।

ফিনকি ফোটা জ্যোৎস্নায় ছবির মতো দেখা যাচ্ছে চরাচর। সে যে শৈলশিরা বেয়ে নীচের দিকে নামছে সেটি একেবারে নেমে গেছে নীচে উপত্যকা পর্যন্ত। সারি সারি বৃষ্টি ধোওয়া পাইন দাঁড়িয়ে আছে রাতজাগা প্রহরীর মতো, গায়ে জড়ানো কুয়াশার চাদর।

বেশ খানিকটা নীচে নেমে এসে একেবারে হাঁফ ধরে গেল জয়িতার। এই মুহূর্তে ভয় হার মেনে গেল তার কাছে। সে একটা মসৃণ শিলার ওপর এলিয়ে দিল অবসন্ন দেহটা। তার এই ক্লান্ত দেহটাকে এখন আর তাড়া করে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারল না আতঙ্ক।

সহসা মরীচিকার মতো একী দেখছে সে! ডান দিকে অল্প দূরে কয়েকটা গাছগাছালির ফাঁকে দপ্ দপ্ করে জ্বলছে একটা আগুন।

অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। শীতের কামড়ে অস্থির দেহটাকে টেনে তুলল সে। আগুন লক্ষ্য করে দ্রুত পা চালাল।

প্রায় মিনিট দশেক পথ চলার পর সে যেখানে এসে পৌঁছল সেখানে দেখা গেল পাথরের আলঘেরা ক্ষেতি। তার চারদিকে কমলা আর পাইন গাছের জটলা। ছোট্ট ক্ষেতিতে কোনও ফসল ছিল না, তবে ফসল কেটে নেওয়ার চিহ্ন ছিল।

অতি ক্ষুদ্র করোগেট সিটের ছাউনিওলা একটা ঘর, পাশে ফসল রাখার জন্য একটি মরাই, ব্যস।

আগুনটা জ্বলছিল ঘরের ভেতরে নয়, বাইরের দাওয়ার এক কোণে। জয়িতা দেখল, সারা মুখে বলি রেখা আঁকা এক বৃদ্ধ, আগুনের পাশে বসে হাত, পা সেঁকছে।

সকল দ্বিধা, সকল সংকোচ দূরে সরিয়ে রেখে একটু আগুন পাবার জন্যে ক্ষেতি পেরিয়ে জয়িতা ঘরের দাওয়ায় গিয়ে পৌঁছল।

অভাবনীয় ঘটনা। বৃদ্ধ অবাক চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল জয়িতাকে। তার চোখের চাহনিতে একটি প্রশ্ন : লোকালয় থেকে এতখানি দূরে এমন প্রচণ্ড শীতের রাতে এই মেয়েটা এল কোথা থেকে?

কাঁপা, কাঁপা গলায় জয়িতা বলল, বাবা আমি কি একটু আগুন পেতে পারি?

বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াল। মনে হল, দার্জিলিংবাসী গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষ। পরিষ্কার বাংলায় বলল, উঠে আয় বেটি।

বলেই ঘরের ভেতর থেকে বসার জন্যে একটা চৌকি জাতীয় আসন এনে দিল।

এখানে বস।

জয়িতা চৌকিতে বসল না। মেঝের ওপর যেমন করে বসেছিল বৃদ্ধটি, ঠিক সেইভাবে মেঝেতে বুসুতে বসতে বলল, এখানেই বসছি বাবা।

আগুনের জায়গায় বৃদ্ধ কতকগুলো কাঠের টুকরো ফেলে দিল। শুকনো কাঠ, সামান্য ধোঁয়া ছেড়ে জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। পাইনের কিছু পাতাও ফেলে দিল তার ওপর। চিড়চিড় করে একটা শব্দ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। পোড়া পাইনপাতা এক ধরনের সুবাস ছড়ায়।

এখন কারু মুখে কোনও কথা নেই। দুজনেই আগুনে গা হাত পা সেঁকে চলেছে।

জয়িতা অনুভব করল, ধীরে ধীরে ফিরে আসছে নিঃশেষিত প্রাণটা।

এরই মাঝে নিঃশব্দে ঘরের ভেতর উঠে গেল বৃদ্ধ। পরক্ষণেই বেরিয়ে এল একটা কম্বল নিয়ে। জয়িতার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, নে, এটা গায়ে জড়িয়ে নে।

লোকটির যেন কোন প্রশ্ন, কোন কৌতূহলই নেই।

জয়িতার মনে হল, বৃদ্ধ দয়ার এক প্রতিমূর্তি। সে কম্বলটা নেবার আগে বৃদ্ধের হাঁটু ছুঁয়ে প্রণাম করল। অমনি বৃদ্ধ কম্বলটা জড়িয়ে দিল তার গায়ে।

জয়িতার চোখ জলে ভরে উঠল, — প্রভুর কী করুণা।

বৃদ্ধ এবার চঞ্চল হয়ে উঠল, অজানা অতিথির জন্য কিছু করা দরকার।

ঘরে ঢুকতে গিয়েও ফিরে দাঁড়াল বৃদ্ধ। জয়িতার দিকে তাকিয়ে বলল, একটু গরম চা করি, এই ঠাণ্ডায় বেশ ভালই জমবে, কি বলিস?

জয়িতা শুধু তাকাল, মন ভরে উঠল তার কৃতজ্ঞতায়।

এবার বৃদ্ধ চায়ের যা সরঞ্জাম ছিল তা নিয়ে এল বাইরে। বলল, ছ্যাঁদা ছাদ থেকে জল চুইয়ে পড়ছে। কাল ভোরবেলায় ওটা সারাই করব। এখন তাই এই দাওয়াতেই রাতের আস্তানা পেতেছি।

বৃদ্ধ চা বানাতে যাচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে কেটলিটা ধরে নিল জয়িতা। বলল, তুমি ওই চৌকিতে বস বাবা, আমি চা তৈরি করে দিচ্ছি।

বৃদ্ধের চোখের চাহনি দেখে মনে হল, সে অভিভূত হয়েছে। নিঃসঙ্গ জীবনে এমন অভাবিত আবির্ভাব সে কল্পনাও করেনি।

চা করতে করতে জয়িতা বলল, হাঁ বাবা, বাড়িতে আর কেউ নেই?

কুঁচকে গেল বৃদ্ধের চোখ। আনন্দ বেদনায় মিশ্রিত এরূপ ছবি জয়িতা আগে কখনও কারু মুখে দেখেনি। বৃদ্ধ মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল, সে নিঃসঙ্গ। পরক্ষণেই বেজে উঠল তার গলা, স্রেফ একা আছি। বাল বাচ্চা কোই নেই। বহু দশ বরষ আগে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। তখন ইখানে ছিলাম না। কার্শিয়াং-এ থাকতাম। বহু চলে যাবার পর শিলিগুড়িতে এক ট্রাভেল এজেন্টের গাড়ি চালাতাম। বুড়া হয়ে আর কিছু ভাল লাগল না। সব ছেড়ে ছুড়ে মানুষ জনের কাছ থেকে বহুৎ তফাতে চলে এসে এখানে ডেরা বাঁধলাম।

দুটো গেলাসে চা ঢালতে ঢালতে জয়িতা বলল, হাঁ বাবা, একা এতদূরে থাকতে অসুবিধা হয় না?

কিসের অসুবিস্তা! ক্ষেতে গেঁউ ফলাই, কমলার গাছে কমলা ফললে পিঠে টুকরি বেঁধে শহরে বেচে দিয়ে আসি। তারবদলে চা, নিমক, মিরচা, যা দরকার হয় কিনে আনি।

তোমার কষ্ট হয় না?

অভ্যাস, অভ্যাসে সব সহজ হয়ে যায় রে বেটি। এই দিব্যি আছি। মরার সময় হলে এই কমলালেবু গাছের তলায় ক্ষেতিতে শুয়ে থাকব। মহাদেও বসে আছেন ওই বরফের চূড়ায়, সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁর চরণে ঠাঁই নেব।

বৃদ্ধের ভেতরে জয়িতা যেন এক অতি সৎ ঈশ্বরপ্রেমী মানুষের ছবি দেখতে পেল।

চার পাঁচ দিন বৃদ্ধের এই বাড়িতে একসঙ্গে কাটাল জয়িতা। ইতিমধ্যে জয়িতার মুখ থেকে তার সব খবরই বৃদ্ধের শোনা হয়ে গিয়েছিল।

কথায় কথায় বৃদ্ধ একদিন বলল, এখানে থাকলে কেউ তোর হদিশ পাবে না। তবে এই বুড়োকে আবার খাটো চোখে দেখিস না যেন। তোর সামনে এখন বহুৎ লম্বা জীবন পড়ে আছে। এখানে এই বুড়োটার কাছে পড়ে থাকলে তো তোর চলবে না। তোকে কাজ কাম করতে হবে। ঘর বাঁধতে হবে।

জয়িতা বলল, কাজ কাম আমাকে কে দেবে বাবা?

বৃদ্ধ একটু চুপ করে বসে থেকে কি ভাবল। তারপর একসময় মুখ তুলে বলল, তুই কাম কাজ কিছু করবি? তা হলে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।

জয়িতা বলল, কাজের জায়গায় গেলে তো সেখানেই থাকতে হবে, তোমাকে ছেড়ে কেমন করে থাকব বাবা।

এবার শব্দ করেই হাসল বৃদ্ধ।

জয়িতার মাথায় হাত রেখে বলল, এই বুড়োটার ওপরে এত টান তোর। তুই আসার আগে তো আমি একাই ছিলাম রে মা।

দু-দিন পরে বেরিয়ে গেল বৃদ্ধ জয়িতার কাজের খোঁজে। যাবার সময় বলে গেল, ফিরতে দু-এক রোজ দেরি হতে পারে, একা থাকতে কোনও ডর লাগবে না তো?

জয়িতা বলল, ভয় ডর আমার নেই বাবা, তাহলে রাতের দুর্যোগে আমি আর এতদূর একা চলে আসতে পারতাম না। হাঁ, ডর আছে, তবে ওই হোমে আবার ফিরে যাবার ডর।

বৃদ্ধ হেসে বলল, সেখানে আর তোকে যেতে হবে না রে বেটি।

বৃদ্ধ চলে গেলে দু-দিন নিঃসঙ্গ কাটল জয়িতার। কিন্তু একটুও ভয় ছিল না তার। প্রকৃতির এমন নিবিড় সান্নিধ্য সে আগে কখনও অনুভব করেনি।

ভ্যালির ওপারে পাহাড়ের পর পাহাড়। সবশেষে দিগন্ত ব্যাপ্ত হয়ে সেই তুষার চূড়া, মায়াময় কাঞ্চনজঙ্ঘা। ভোরের রক্তরাগ, সকালের সোনালি ঝিলিক, আবার সন্ধ্যার সূর্যাস্তের মহিমা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে অপরূপ করে রেখেছে।

এই দু-দিনের প্রায় প্রতিটা মুহূর্ত সে প্রকৃতির সুধাকে পান করেছে প্রাণ ভরে। তৃপ্ত হয়েছে রোদ্দুরের ছোঁয়ায়, মুগ্ধ হয়েছে পাইনের গান শুনে।

তৃতীয় দিনে বৃদ্ধকে দূর থেকে আসতে দেখে কেমন যেন সব-পাওয়ার আনন্দে অধীর হয়ে উঠল জয়িতা। সে দৌড়ে এগিয়ে গেল কিছু পথ।

কপালে বাঁধা দড়ি, পিঠে ঝুলছে সওদার বোঝা। পাকদণ্ডীর পথ বেয়ে নেমে আসছে বৃদ্ধ দাশরথী ছেত্রী।

হাঁ, ঐ নামটাই বৃদ্ধের। কথায় কথায় জানা হয়ে গেছে জয়িতার। আরও আশ্চর্য এক যোগ সে আবিষ্কার করেছে,— দাশরথীর বউ-এর নাম ছিল জানকী ছেত্রী।

কাছাকাছি এসে বৃদ্ধের দিকে তাকাল জয়িতা। হাত চারেক ওপরের পথে আসতে আসতে থমকে দাঁড়াল বৃদ্ধ।

তুই আবার ঘর ছেড়ে এতটা ওপরে উঠে এলি কেন বেটি?

চোখে জলছায়া দেখা গেল জয়িতার। সে কান্নাভেজা গলায় বলল, তুমি এত বড় একটা বোঝা কি করে বয়ে আনলে বাবা! কত কষ্ট হয়েছে তোমার।

কথা ক'টা শেষ হতে না হতেই সে উঠে গেল ওপরে। বৃদ্ধ দাশরথীর কোন বারণই না শুনে সে টানাটানি করে নিজের কাঁধেই তুলে নিল বোঝাটা।

ভারী আছে বইকি, তবু সে বৃদ্ধকে কোনকিছু বুঝতে না দিয়ে বোঝা নিয়ে ছুটল কোঠির দিকে।

বৃদ্ধ সাবধান করতে করতে চলল তার পিছে পিছে।

ডেরায় পৌঁছে জয়িতা আগে কখানা রুটি আর সব্জি বানিয়ে খেতে দিল বৃদ্ধকে। তারপর মধ্যাহ্নের খাবারটা নিজেও খেয়ে নিল বৃদ্ধের সঙ্গে।

খাওয়া শেষ হলে বাপবেটিতে বসল মেঝেতে। বৃদ্ধ বস্তা খুলে বের করতে লাগল সওদা। পাশে বসে সেগুলো একটি একটি করে গুছিয়ে তুলতে লাগল জয়িতা।

এবার একটা প্যাকেট বের করে জয়িতার হাতে তুলে দিয়ে নিজে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি কমলাগুলো তদারকি করে আসছি, তুই বেটি ততক্ষণে তোর পোশাকগুলো পরে দেখনে। আন্দাজে কেনা তো।

জয়িতা বলল, তুমি আমার জামা কাপড়ের জন্যে অনেক খরচ করেছ নিশ্চয়ই।

বৃদ্ধ দাশরথী অমনি ধমকের সুরে বলে উঠল, সে হিসেবে তোর দরকার কি। এক পোশাক পরে চলে এসেছিস, ওতে কি চলেরে বেটি।

কথা শেষ করে আর দাঁড়ালনা দাশরথী। ঘরের বাইরে বেরিয়ে চলে গেল লেবু বাগানের তদারকিতে।

জয়িতা দেখল, দু'সেট নতুন পোশাক প্যাকেটের ভেতরে রয়েছে।

সে খুব খুশি হয়ে উঠল। পোশাকগুলোর রং আর কাপড়ের কোয়ালিটি যেমন সুন্দর তেমনি দামি। অনাথ আশ্রমে এরকম পোশাক পরার সুযোগ তার কখনও হয়নি।

সে আগে লক্ষ্যই করেনি, বিরাট বোচকাটার এক কোনায় কি একটা যেন উঁচু হয়ে আছে। সে সেটাকে টেনে বার করল। এ কী! এ যে একটা নতুন সুটকেস।

সুটকেসটা কার জন্যে আনা হয়েছে তা সে বুঝতে পারল না। একবার মনে হল, বাবা তার নতুন পোশাকগুলো রাখবার জন্যে এ সুটকেসটা এনেছে। তবু না শোনা অবধি সে তার ভেতরে পোশাকগুলো রাখল না।

অদ্ভুত একটা আনন্দ ভোরের আলোর মতো তার মনের ভেতর এসে পড়ছিল। জীবনে জমে থাকা দুঃখের ছায়াগুলো ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছিল তার স্মৃতি থেকে। স্বাধীনতার যে কি সুখ সে বুঝতে পারল এতদিনে।

সুটকেসটার গায়েই ঝুলছিল দুটো চাবি। স্বাভাবিক কৌতূহলে সে সুটকেসটা খুলে ফেলল।

এবার অবাক হবার পালা তার! ভারী সুন্দর তিনটে পছন্দসই রঙের রিবন। তার সঙ্গে চুলের ক্লিপ আর একেবারে নতুন একটা আয়না ও চিরুনি। ওমা, একী! এককোনায় ছোট্ট কৌটোতে কতকগুলো টিপও রয়েছে। তার মন থেকে আনন্দ উপচে উঠতে চাইছিল কিন্তু তা বেরিয়ে আসতে লাগল চোখের জল হয়ে। সব পাওয়ার আনন্দে সে অধীর হয়ে উঠল।

বাইরে পায়ের সাড়া পেতেই চোখের জল মুছে ফেলল জয়িতা। উঠে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরতেই মুখোমুখি হল দাশরথী ছেত্রীর।

কোমরে দুটো হাত রেখে জয়িতা শাসনের ভঙ্গিতে অনুযোগ করল, এতগুলো টাকা খরচ করতে তোমাকে কে বলেছে বাবা?

বৃদ্ধ হাসতে হাসতে বলল, তোর জন্যে ক'ঘড়া মোহর খরচ করেছি বেটি?

সুটকেস থেকে রিবন, টিপ, আয়না, ক্লিপ সব একটি একটি করে তুলে বৃদ্ধকে দেখাতে লাগল জয়িতা। শেষে দুটো পোশাক তুলে নাড়তে নাড়তে বলল, এসব তোমাকে বিনি পয়সায় তোমার মহাদেও দিয়েছেন বুঝি?

ওসব নিয়ে তুই মাথা ঘামাস না তো।

এবার অন্যকথা পাড়ল দাশরথী ছেত্রী, জানিস, দারুণ কমলা ফলেছে এ বছর।

সেই আগাম আনন্দে তুমি তোমার মেয়েকে সাজিয়ে দিলে, কি বলো।

এখন বাইরে আয়, আসল কথাটা তো তোকে বলা হয়নি। ছোট্ট একটা খুশির খবর আছে।

ছেলেমানুষের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে বৃদ্ধের কাছে গিয়ে দাঁড়াল জয়িতা। দুটো চোখের দৃষ্টি বৃদ্ধের মুখের ওপর ফেলে বলল, কি খবর বাবা?

হয়তো তোর একটা চাকরির ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে।

সত্যি!

এখনও পাকা খবরটা দিতে পারছি না। তবে যোগাযোগটা ভাল হয়েছে।

তবু খুলে বলোই না বাবা ব্যাপারটা।

শিলিগুড়িতে আমি যে ট্রাভেল এজেন্টের গাড়ি চালাতাম, তাদের ব্যবসার এখন ভীষণ রমরমা। সে সময় আমার চোখ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, একটা চোখে ঝাপসা দেখতাম তাই গাড়ি চালান আর

সম্ভব হয়নি। বয়স হয়েছিল, চাকরিটাও নিজের থেকেই ছেড়ে দিলাম। মালিকেরও বয়স হয়েছে। তবে লোকটি ব্যবসা বোঝে, টাকার পাহাড়। সহসা হাত থেকে টাকা বের করতে চাননা। অনেকদিন ওঁর সঙ্গে দেখা নেই, তাই সোজাসুজি ওঁর কাছে চাকরির উমেদার হয়ে যেতে পারলাম না। ওঁদের কাজের জায়গার কাছাকাছি স্টেট ব্যাঙ্কের অফিস। ওই ব্যাঙ্কের সঙ্গে লেনদেন আছে ওঁদের। একটি বড় ভাল ছেলে ওখানকার সিনিয়ার অফিসার। তাকে অনেকদিন আমি আমার গাড়িতে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গেছি, অবশ্য মালিকের অনুমতি নিয়ে।

আমার ওপর ছেলেটির ভীষণ টান ছিল। সে আমাকে চাচাজি বলত। একবার গ্যাংটকে কাজের জন্যে নিয়ে গেলাম। দামি একটা হোটেলে উঠল ছেলেটা, কিন্তু আমাকেও ছাড়ল না। আরে ব্বাস্! তারই ঘরে আমাকে রাখল, খাওয়াল। দিলটা এই এত বড়।

বৃদ্ধ বুকে দুটো হাত ঠেকিয়ে আবার দুদিকে প্রসারিত করে হৃদয়ের মাপটা দেখিয়ে দিল।

জয়িতা প্রশংসার গলায় বলল, বাঃ! দারুণ ছেলে তো।

আমি তোর চাকরির কথা ওকেই বলেছি মা। পারলে ওই কুবের ট্রাভেল এজেন্ট বুড়োটাকে ধরে তোর একটা হিল্লে ও হয়ত করে দিতে পারবে। দিন সাতেক পরে ও আবার আমাকে যেতে বলেছে।

জয়িতা জানতে চাইল, এই ট্রাভেল এজেন্টের সঙ্গে ওঁর কি সম্পর্ক?

বৃদ্ধ চোখ বড় বড় করে বলল, সম্পর্ক আবার নেই! ওই ট্রাভেল এজেন্টের সঙ্গে মধুমঙ্গলের ব্যাঙ্কেরই তো কাজকারবার লেনদেনের সম্পর্ক রে।

জয়িতা এবার কৌতূহলী হয়ে উঠল, মধুমঙ্গল কে বাবা?

ওই যে ব্যাঙ্কের ছেলেটির কথা বলছিলাম, ওই তো মধুমঙ্গল।

বাঃ! বেশ নাম! উনি কি বাঙালি না নেপালি?

হেসে বলল দাশরথী ছেত্রী, ও দুটোর কোনওটাই নয়। ও গুজরাটি, বাড়ি ওর গুজরাটের ভুজ বলে একটা জায়গায়। গাড়িতে যেতে যেতে ও অনেক সময় ওর বাড়ির গল্প করত।

জয়িতা জানতে চাইল, ও কি তোমার মতো বাংলা বলতে পারে?

শুধু বাংলা নয়, গুজরাটি, ইংরাজি, হিন্দি সমানে বলতে পারে। একথা কেন জানতে চাইছিস?

এমনি কৌতূহল।

কয়েকদিন পরের কথা।

বৃদ্ধ দাশরথী ক্ষেত কোপাচ্ছিল, আর ঘরে বসে দিনের রান্নার আয়োজন করছিল জয়িতা।

বাইরে হঠাৎ পায়ের সাড়া পেয়ে জয়িতা ভেতর থেকে বলে উঠল, আজ কি রান্না হচ্ছে তার তদারকি করতে এলে বুঝি? ওর কথার কোনও উত্তর ভেতরে এল না।

কি হল, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

এবারও সাড়াশব্দ নেই।

হাতে ধরা একটা সবজি কাটার ছুরি, বাইরে বেরিয়ে এল জয়িতা। তার বিস্ময়ের সীমা নেই, সে এতক্ষণ তবে বৃদ্ধ দাশরথী ভেবে কার সঙ্গে কথা বলছিল! মিষ্টি গলায় জয়িতা এবার বলল, আপনি কি বাবার খোঁজে এসেছেন?

সামান্য ভাঙা ভাঙা বাংলায় যুবকটি বলল, আমি দাশরথীজির খোঁজে এসেছি।

বুদ্ধিমতী জয়িতা মুহূর্তেই বুঝে নিল, এই সেই ব্যাঙ্কের তরুণ অফিসার মধুমঙ্গল।

জয়িতা দ্রুত ঢুকে গেল ঘরের ভেতর। একপাশে দাঁড়করানো দড়ির খাটিয়াটা এনে বাইরের উঠোনে পেতে দিয়ে বলল, আপনি বসুন, আমি বাবাকে ডেকে আনছি।

জয়িতা কমলা বাগানের দিকে যেতে যেতে আপন মনে একবার জিভ কাটল। যাঃ, কি সব আজেবাজে কথা সে ঘরের ভেতর থেকে বলে ফেলেছে।

একটি পরিণত সুন্দর যুবকের মুখোমুখি হলে কোনও তরুণী কন্যার মনে প্রথম যে ভাবটি জেগে ওঠে তেমনি একটা সুখের হাওয়া জয়িতার সর্বাঙ্গ ছুঁয়ে চলে গেল।

জয়িতাকে দেখে মধুমঙ্গল একটু অবাক হল বই কী! তার মনে হল, এমনি একটি লাবণ্যময়ী মেয়ে কি করে অরফ্যান হাউসে কাটিয়েছিল। শ্রী এবং স্বাস্থ্য দুটো সম্পদই এই মুহূর্তে মেয়েটিকে মধুমঙ্গলের চোখে অপরূপা করে তুলেছিল।

মধুমঙ্গলের আসার খবর পেয়েই বৃদ্ধ দাশরথী হাতের খোন্তা ফেলে হন্তদন্ত হয়ে চলে এল ঘরের দিকে।

জয়িতা কিন্তু সঙ্গে গেল না। একটা পাইন গাছের আড়ালে সে ওদের অভিবাদন দৃশ্যটি দেখতে লাগল। বিনয়ে কে কতটা নত হয়ে নমস্কার নিবেদন করতে পারে তারই যেন প্রতিযোগিতা চলছিল।

এবার দুজনেই খাটিয়ার দুই প্রান্তে বসল। বৃদ্ধ অমনি বাগানের দিকে ঘুরে হাঁক পাড়লেন, কই রে জয়িতা বেটি, কোথায় গেলি? কে এসেছে দেখে যা।

জয়িতা পায়ে পায়ে এগিয়ে এল ওঁদের দিকে।

উচ্ছ্বাসে জয়িতাকে বৃদ্ধ বলল, কোনও দিনই মধুমঙ্গল বেটা আমার কাছে আসেনি। না জানি কত কষ্ট করে আজ পাহাড় ভেঙে এখানে এসে পৌঁছেছে।

মধুমঙ্গল সঙ্গে সঙ্গে বলল. তুমি তো ঘরের হদিশটা আগেই আমাকে দিয়ে দিয়েছিলে চাচাজি। তারপর বড় রাস্তায় বাস থেকে নেমে, এইটুকু খুঁজে চলে আসতে আমার কোনও অসুবিধেই হয়নি। তা ছাড়া খুব জরুরি একটা খবর দেবার দরকার ছিল তাই চলে এলাম।

সেই জরুরি কথাটি শোনার আগেই অতিথি-আপ্যায়নের জন্য মহাব্যস্ত হয়ে উঠল বৃদ্ধ দাশরথী।

কই রে মা চা কর, খাবার বানা। কত বড় মানুষ বেটা এসেছে গরিব চাচাজির বাড়িতে।

মধুমঙ্গল অমনি বলে উঠল, এরকম কথা বললে চাচাজি আমি আর বসব না, ফিরে যাব।

হাত দুটো মধুমঙ্গলের চেপে ধরল বৃদ্ধ, কোথায় পালাবি রে বেটা। এটা তোর আপনা ঘর আছে।

বৃদ্ধের আপ্যায়নে খুশিতে উদ্ভাসিত হল মধুমঙ্গলের মুখ।

জয়িতা আড়চোখে চেয়ে দেখল, মধুমঙ্গলের হাসিটিও মধুর। এবার সে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল।

ঘর থেকে যখন বেরোল তখন তার হাতে ধরা থালার ওপর দুগ্লাস ধোঁয়া ওঠা চা আর এক প্লেট পকোড়া।

ইতিমধ্যে জয়িতা যখন চা করায় ব্যস্ত ছিল, তখন বাইরে কথা হচ্ছিল অসমবয়সী দুই পরিচিত হৃদয়বান মানুষের।

চা করছিল জয়িতা কিন্তু কান দুটি তার সজাগ ছিল বাইরে ওদের কথাগুলো শোনার জন্য।

মধুমঙ্গল বলল, মিঃ ভাণ্ডারির সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে।

কি বললেন গোপাল ভাণ্ডারিজী?

রাজি, পোস্টটাও ভাল। দেশি, বিদেশি ট্যুরিস্টদের দেখভাল করতে হবে। তুমি তো বলেছিলে চাচাজি, তোমার মেয়ে জয়িতা ইংরেজিতে দিব্যি কথা বলতে পারে। ওকথা বলাতেই ভাণ্ডারিজী রাজি হয়ে গেছেন। তবে একটি কন্ডিশন আছে তাঁর।

বৃদ্ধ দাশরথী উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইল. কন্ডিশনটা কি?

ব্যাঙ্কের টাকাপয়সারও লেনদেন করতে হবে আপনার মেয়েটিকে। তাই তার অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে কোনও একজন বিশিষ্ট লোকের রেকমেন্ডেশন চাই।

তাই তো, একটা ঝঞ্ঝাটে ফেললে দেখছি।

ওই ঝঞ্ঝাট থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ তখন খুঁজছিল জয়িতা।

সেই ভাবনায় ইতি টেনে সে চা আর খাবার নিয়ে উঠে এসেছিল ওদের কাছে।

চা আর পকোড়ার খুব তারিফ করল মধুমঙ্গল। চাচাজির দিকে তাকিয়ে জয়িতার উদ্দেশ্যে প্রশংসা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, শিলিগুড়ির কোনও চাটের দোকানে এমন পকোড়া আমি খাইনি।

জয়িতা একমুখ হাসি ছড়িয়ে বলল, চাচাজিকে আপনি ভালবাসেন তাই তার বাড়ির তৈরি পকোড়াও আপনার ভাল লেগে গেছে।

না না তা নয়, সাচ বলছি।

জয়িতা খুশি হল মনে মনে। যাকে ভাল লাগে তার প্রতিটা কথাই মনে এসে বাজে। সে মনে মনে ভাবতে লাগল মধুমঙ্গল কি ম্যারেড। নিশ্চয়ই ওর রূপসী সুন্দরী বউ রয়েছে। যদিও বয়স তেমন কিছু নয় তবুও এসব ছেলে এতদিন নিঃসঙ্গ পড়ে থাকার নয়।

হঠাৎ তার আত্মসম্মানে বাধল। এসব ছাইপাশ কি ভাবছে সে।

এবার সোজা জয়িতার দিকে তাকিয়ে মধুমঙ্গল বলল, আপনাকে জানেন এমন কোনও বিশিষ্ট মানুষের কাছ থেকে একটা ক্যারেক্টর সার্টিফিকেট আনতে পারেন?

সহসা জয়িতার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা মুখ। দার্জিলিং কনভেন্টের মমতাময়ী মাদার সুপিরিয়র।

সঙ্গে সঙ্গে জয়িতা বলল, চেষ্টা করে দেখতে পারি। বেশ কিছুকাল আগে আমি দার্জিলিঙের এক কনভেন্টের ছাত্রী ছিলাম। নিচের ক্লাসে গুড বিহেভিয়ারের জন্য একটা প্রাইজও পেয়েছিলাম। মাদার সুপিরিয়র আমাকে খুব স্নেহ করতেন। তা বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। তাঁর কাছে গিয়ে একটা সার্টিফিকেট আনার চেষ্টা করতে পারি।

মধুমঙ্গল বলল, তা হলে তো খুব ভালই হয়।

জয়িতা এবার বৃদ্ধ দাশরথীর দিকে তাকিয়ে বলল, বাবা একদিন আমাদের কনভেন্টে যেতে হয়।

নিশ্চয়, তা হলে তো যেতেই হবে।

মধুমঙ্গল অমনি বলল, দরকার হলে আমিও যেতে পারি। ওখানকার কনভেন্টের কিছু অ্যাকাউন্ট আমাদের শিলিগুড়ির ব্যাঙ্কে রয়েছে। আমাকে না চিনলেও আমি ঠিক পরিচয় দিয়ে দেব।

বৃদ্ধ দাশরথী বলে উঠল, তাহলে অকারণে এই বুড়োটাকে নিয়ে টানাটানি কেন? তোমরা দুজনে চলে গিয়ে কাজটা হাসিল করে এস না বাপু।

মধুমঙ্গল সঙ্কোচে একবার তাকাল জয়িতার মুখের দিকে।

জয়িতা বলল, বাবা তোমাকে আর কষ্ট করে ওখানে যেতে হবে না। উনি সঙ্গে থাকলে মনে হচ্ছে আমার কাজ সহজ হয়ে যাবে।

মধুমঙ্গল বলল, আমি তাহলে কাল এসে আপনাকে নিয়ে যাব।

আকাশে সন্ধ্যার ছায়া নামছিল। চন্দ্রোদয়ের অনেক দেরি আছে।

বৃদ্ধ বলল, কথায় কথায় সাঁঝ নামল। বড় রাস্তা অবধি যেতে যেতে রাতের আঁধার ঘনিয়ে উঠবে। তোমার কি আজ রাতে শিলিগুড়ি না ফিরলেই নয়।

মধুমঙ্গল গা মোড়া দিয়ে বলল, না, ফেরার তেমন কোনও তাগাদা নেই। তবে এখানে থাকলে তোমাদেরই অসুবিধে।

বৃদ্ধ হেসে বলল, অসুবিধে হত যদি ওই ঝড় বৃষ্টির দিনে তুমি আমার এখানে এসে হাজির হতে। সেদিন ঘরের ভেতরেই ফুটো ছাদ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছিল।

আজ রাতে এখানে থাকলে কাল সকালেই আমরা দার্জিলিঙের পথে রওনা হতে পারব। কাজ শেষ করে তোমার কন্যাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যাব শিলিগুড়ি।

শিবজি তোমার মঙ্গল করুন, মানুষের জন্যে এত কষ্ট করছ তুমি।

তোমাকে ভালবাসি, তাই তোমার যদি কিছু উপকার করতে পারি।

বৃদ্ধ বলল, সংসারি হওয়ার পরও যদি তোমার এরকম মনোভাব থাকে তাহলে মহাদেওজির আশীর্বাদ চিরদিনই তোমার সঙ্গে থাকবে।

ওদের কথার ভেতর থেকে জয়িতা জানতে পারল, মধুমঙ্গল এখনও বিয়ের কথা ভাবেনি।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর চাঁদের দেখা মিলল। কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে বয়ে আসছিল ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়া।

মধুমঙ্গল বলল, খাবার পর আমি সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় চলে যাই না, ঘণ্টাখানেক ঘুরে বেড়াই। এখানেও এখন সহজে ঘুম আসবে না। আমি চারপাশটা একটু ঘুরে দেখতে চাই।

বৃদ্ধ দাওয়ায় আগুনের কুণ্ড তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অগত্যা অতিথিকে সঙ্গ দিতে বেরোল জয়িতা।

তারা ক্ষেতির পাশ দিয়ে পাশাপাশি নীরবে কমলা বনের দিকে এগোতে লাগল।

পাইনের পাতায় দমকা হাওয়া লেগে মিষ্টি একটা সুর বেজে বেজে উঠছিল।

মধুমঙ্গল বলল, কেমন লাগছে আপনার এই একচিলতে জায়গাটুকু।

দারুণ। এমন নির্জন একটুকরো প্রকৃতির বাগান আমি এর আগে কোথাও দেখিনি।

ওরা আলোছায়া মাখা কমলা বনের ভেতরে এসে থমকে দাঁড়াল।

মধুমঙ্গলের গলায় বিস্ময়, দারুণ কমলা ফলেছে তো!

বাবা নিজের হাতে একসময় গাছ পুঁতেছিলেন এখনও দিন রাত পরিচর্যা করেন।

মধুমঙ্গল এবার প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বলল, আপনার জীবনের সবটুকু ইতিহাসই চাচাজির কাছ থেকে আমার জানা হয়ে গেছে। আপনার দুঃসাহস আমাকে মুগ্ধ করেছে।

আপনি কি আমার দুর্যোগ মাথায় নিয়ে এখানে চলে আসার কথাটা বলছেন?

ঠিক তাই।

জয়িতা ম্লান হাসি হেসে বলল, না এসে আমার উপায় ছিল না, আমি ওই বন্দিজীবন থেকে মুক্তি চেয়েছিলাম। তাই দুঃসাহসে ভর করে দুর্যোগ মাথায় নিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছি।

মধুমঙ্গল বলল, আপনি পারবেন, নিজের জীবনটাকে নিজের মত করে গড়ে নিতে পারবেন।

জয়িতা বলল, আপনি এত সুন্দর বাংলা শিখলেন কি করে।

বাংলাদেশে থাকলে বাংলা শিখতে হবে বই কি। আমার বদলির চাকরি, যেখানে যাই সেটাই আমার দেশ হয়ে যায়।

কে কে আছেন আপনার বাড়িতে?

আপনি কি জানেন আমার বাড়ি কোথায়?

শুনেছি গুজরাটের আন্‌জার বলে একটা জায়গায়।

এও জানা হয়ে গেছে? নিশ্চয়ই চাচাজির কাছ থেকে জেনেছেন?

ও মৃদু হেসে মুখটা দুলিয়ে বলল, তাছাড়া আর কোত্থেকে জানব।

মধুমঙ্গল বলল, এবার আপনার মূল প্রশ্নের জবাবটা দি, আমরা এক ভাই, এক বোন। আট বছর হল বাবা মারা গেছেন। আমাদের বাড়ির কাছেই বোনের বিয়ে হয়েছে।

বোনের স্বামী একটা হীরের দোকানে সেটিং-এর কাজ করে। আমার ট্রান্সফারেবল জব বলে মার দেখাশোনা করে আমার বোন আর ভগ্নিপতি।

এবার জয়িতা বলল, আপনার একা একা থাকতে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়। মানে আমি বলতে চাইছি আপনার রান্নাবান্না, ঘরদুয়ার দেখাশোনার ব্যাপারে।

আমি নিজের হাতে রান্না করি, খেয়ে দেখবেন একদিন।

জয়িতা শব্দ করে হেসে উঠতে গিয়ে হাতে হাসি চাপল। তারপর বলল, অনেক গুণ আপনার। সংসারে যিনি আসবেন তাঁকে কোনও কাজই করতে হবে না।

হঠাৎ করে অকাজের মেয়ে যদি ঘরে এসে যায়, তাই বিয়ে করিনি এতদিন।

সত্যি বলছ? —বলেই জিভ কাটল জয়িতা।

কি হল?

আপনাকে বন্ধু ভেবে 'বলছ' বলে ফেললাম।

এতে আমি খুব খুশি হয়েছি জয়িতা। আমাদের ভেতর যখন পরিচয়ই হল তখন ব্যবধানটা না থাকাই ভাল।

আমিও তাই চাই, তাহলে এখন থেকে তোমাকেও আমার মতো সম্বোধন করতে হবে।

কমলা বনের আলোছায়া আঁকা পথে দুজনে দুজনের হাত ধরে বন্ধুত্বের বাঁধনে বাঁধা পড়ল।

মধুমঙ্গল বলল, আমার মনে হচ্ছে ঈশ্বর তোমার অনুকূল। তোমার চাকরি কেউ রুখতে পারবে না। এরপর শিলিগুড়িই হবে তোমার অ্যাড্রেস।

পারমানেন্ট অ্যাড্রেস?

মধুমঙ্গল বলল, সে তোমার অভিরুচি।

স্বপ্নলোকের চাবি :

স্বপ্নলোকের চাবি কি কেউ কখনও খুঁজে পায়? হয়তো পায় হয়তো বা পায়না।

জয়িতা আর মধুমঙ্গল ভোরবেলা বেরিয়ে গেল সেই চাবির খোঁজে। তরুণ সূর্যের ছোঁয়ালাগা কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন সোনার সিংহাসনটি পেতে রেখেছে কোন স্বপ্নসন্ধানীর আগমন প্রত্যাশায়। ঝাঁক ঝাঁক ভোরের পাখি কলরব করতে করতে দিকে দিকে বেরিয়ে পড়েছে তার সন্ধানে।

ওরা পাহাড়ি ঝর্নার জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে, সবুজ পাইনের গান শুনতে শুনতে, নিজের মনে স্বপ্নের জাল বুনতে বুনতে ওপরের দিকে উঠতে লাগল।

একসময় শিলিগুড়ি-দার্জিলিং ট্রেন রাস্তার ধারে একটা ছোট্ট স্টেশনে উঠে এল ওরা।

ট্রেন আসতে তখনও ঘণ্টাখানেক দেরি। স্টেশনে লোকজনের ভিড় নেই। ওরা কাছাকাছি একটা পাইনগাছের তলায় মসৃণ একখণ্ড পাথরের ওপর পাশাপাশি বসল।

জয়িতা তার ঝোলা থেকে বের করল একটা কৌটো।

মধুমঙ্গল কৌতুক করে বলল, কি রত্ন রয়েছে এর ভেতরে?

উদ্ভাসিত হাসি ছড়িয়ে পড়ল জয়িতার চোখে মুখে। সেও সকৌতুকে বলল, হীরে মুক্তো চুনি পান্না নয়, তার চেয়েও দামি, এবার অনুমান কর।

সাত পাঁচ ভেবেও যখন ঠাওর করতে পারল না মধুমঙ্গল তখন জয়িতা বলল, আর একটা ক্লু দিয়ে দিচ্ছি—বস্তুটি রত্নের চেয়েও দামি। আবার একেও দেহে ধারণ করতে হয়।

সামান্য সময় ভেবে মধুমঙ্গল বলল, হেরে গেলাম।

জয়িতা এবার কৌটোটা খুলে মধুমঙ্গলের সামনে তুলে ধরল।

চোখ ছোট হয়ে এল মধুমঙ্গলের। ধীরে ধীরে হাসি ফুটে উঠল মুখে।

এত খাবার কখন করলে?

আগে বল এটি রত্নের চেয়েও মূল্যবান কিনা। রত্ন নইলে প্রাণ বাঁচবে কিন্তু এছাড়া তো প্রাণ বাঁচে না। আবার একে রত্নের মত দেহেই ধারণ করতে হয়।

এবার হা হা করে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল মধুমঙ্গল। সঙ্গে সঙ্গে হাত পাতল।

জয়িতা খাবারগুলো তার হাতে না দিয়ে পুরো কৌটোটাই তার দিকে এগিয়ে দিল।

তোমার?

তুমি খাও, বাকি যা থাকবে সেটা আমার।

সে কী অরশিষ্ট তো অতি সামান্যই থাকবে। একে আমি পেটুক, তার ওপর তোমার হাতের রান্না।

কিন্তু আমি জানি খেতে খেতে তোমার মনে হবে, আহা মেয়েটা কত কষ্ট করে তৈরি করেছে, আমি সবটা খেয়ে নেব।

এবার একটা বৈপ্লবিক প্রস্তাব দিল মধুমঙ্গল, এস, আমরা একপাত্রে দুজনেই খাই। কোনও আপত্তি আছে?

চোখে হাসির ঝিলিক, মুখে কোন কথা না বলে শুধু মাথা নাড়তে লাগল জয়িতা।

একটা লাড্ডু জয়িতার দিকে এগিয়ে ধরল মধুমঙ্গল।

জয়িতা মাথা নেড়ে জানাল সে মিষ্টির ভক্ত নয়। মুখে বলল, ওটা তোমার জন্যে।

বুঝেছি মেয়েরা বড় একটা মিষ্টি পছন্দ করে না। তবে নোনতাই খাও। হাতে করে দিলে খাবে তো?

বলতে বলতে একটা পকোড়া তুলে জয়িতাকে খাবার আমন্ত্রণ জানাল মধুমঙ্গল। এবার দুজনে বিনিময় করল দুজনের পছন্দের খাবার।

জলের বোতলটিও এনেছে জয়িতা, ঝোলা থেকে সেটিও টেনে বের করে মধুমঙ্গলের দিকে এগিয়ে দিতে গিয়ে বলল, সবটুকু শেষ করে ফেল না যেন।

মিষ্টি একটা কৌতুকের হাসি হাসল মধুমঙ্গল।

হঠাৎ জয়িতা বলল, তোমাকে কি মধুমঙ্গলদা বলে ডাকব?

আমার নামটা একেই লম্বা, তার সঙ্গে আবার দাদা জুড়ে লেজটা বাড়িয়ে দিও না। খুব খুশি হব যদি আমার নাম ধরে ডাক।

তুমি যখন বলছ তবে তাই হবে।

দূর থেকে ট্রেনটা ঝিকঝিক আওয়াজ তুলে নিচের রাস্তা থেকে বাঁক নিয়ে ওপরে উঠে আসছিল।

ঝোলাতে তাড়াতাড়ি খালি কৌটোটা ভরে নিল জয়িতা। এবার প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ওরা।

মধুমঙ্গল ছুটল টিকিট ঘরের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে টিকিট পেয়ে গেল। হুস করে হাঁফ ছেড়ে গাড়িটাও এসে দাঁড়াল স্টেশনে।

প্রথমে গাড়িতে উঠল মধুমঙ্গল। তারপর ফিরে হাত বাড়িয়ে ভেতরে টেনে নিল জয়িতাকে।

দার্জিলিঙের টয় ট্রেন কখনও যেন পুরনো হয় না। পাহাড়ের ওপর কতকালের গাছগুলো যেন নবীন যুবার মত সবুজ সতেজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি তাদের গা ঘেষে চলেছে, যেন হাত বাড়ালেই ছুঁয়ে দেওয়া যায়।

ওপর থেকে লাফিয়ে নামছে ঝরনা। ওই তো ঝরনার ধারে পাথরে আছড়ে পোশাক কাচছে পাহাড়ি মেয়েরা। গাড়ির দিকে তাকিয়ে কেউ কেউ হাত নাড়ছে। যেন অন্তরঙ্গজন চলেছে গাড়িতে।

মধুমঙ্গল বলল, ওই দেখ, মা কেমন তার বাচ্চাটাকে পিঠে বেঁধে নিয়ে চলেছে।

মুহূর্তে খুশি ঝিলিক দিয়ে উঠল জয়িতার চোখেমুখে। সে বলল, ছোট্ট মিষ্টি মুখটা, পিটপিট করছে দুটো চোখ। মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে চটকে দিতে ইচ্ছে করছে।

সুন্দর ছবির মত বাড়ি। সামনের পাঁচিলটা ছেয়ে আছে লতানে গোলাপে।

একটা ঢালু পাহাড়ের গা ঘেঁষে একচিলতে ফুট তিনেক উঁচু পাঁচিল। মধুমঙ্গল বলল, দেখ দেখ, ঢালুর দিকে পা ঝুলিয়ে বসে আছে কতগুলো পুচকে বাচ্চা। একদম ভয়ডর নেই। ঘরের মানুষজনেরও তো কোনও খেয়াল আছে বলে মনে হচ্ছে না।

জয়িতা বলল, উদ্বেগের কোনও কারণ নেই, ওরা জন্ম থেকেই এমনি পাহাড়ে পাহাড়ে চলাফেরায় অভ্যস্ত। কখনও কাউকে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে শোনা যায়নি।

ওরা নির্দিষ্ট স্টেশনে এসে ট্রেন থেকে নেমে দাঁড়াল।

একটু ওপরে গাছগাছালির ফাঁকে কনভেন্টের সাদা বাড়িটা ঝকঝক করছিল।

জয়িতা বলল, জান মধুমঙ্গল, আমার কেমন যেন টেনশন হচ্ছে।

কেন?

প্রায় সাত, আট বছর দেখাশুনো নেই মাদারের সঙ্গে, তাই।

সব টেনশন ঝেড়ে ফেলে দাও, এখন ওঁরই ওপর নির্ভর করছে তোমার চাকরি।

ঠিক আছে, চল এগোই।

ওরা পায়ে পায়ে চড়াই ভেঙে উঠতে লাগল ওপরে। একসময় পৌছে গেল কনভেন্টের গেটের সামনে।

মুহূর্তে অতীতের স্মৃতিগুলো খেলার সাথীর মত চারদিক থেকে জড়িয়ে ধরল জয়িতাকে।

ঢং ঢং করে ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছিল, ক্লাস বসার সঙ্কেত।

ভেজানো গেট ঠেলে ওরা এগিয়ে গেল মাদার সুপিরিয়রের ঘরের দিকে।

যথারীতি অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢুকে জয়িতা হাঁটু গেড়ে বসে মাদার সুপিরিয়রকে নত হয়ে অভিবাদন জানাল।

জয়িতার দেখাদেখি মধুমঙ্গলও মাদারের উদ্দেশ্যে নিবেদন করল নত নমস্কার।

শুভ্র পোশাকে প্রশান্ত সৌম্য দৃষ্টিতে মাদার তাকিয়ে রইলেন ওদের দিকে।

হঠাৎ বহুদিন আগের দেখা একটা মুখ ভেসে উঠল মাদারের চোখের সামনে। তিনি দুজনকেই তাঁর সামনের আসনে বসতে বললেন।

এবার মৃদু হাসি ফুটল মায়ের মুখে।

এতদিন পরে তুমি এলে জয়িতা। প্রভু যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন, তিনিই তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন।

আমাকে ক্ষমা করুন মা, আমি আপনার কাছে এতদিন আসতে পারিনি, কিন্তু ভুলতে পারিনি আপনার স্নেহ আর মধুর ব্যবহার।

হঠাৎ মাদার প্রশ্ন করলেন, তুমি হোম থেকে কোথায় চলে গিয়েছিলে?

জয়িতা বুঝল, খবরটা সঙ্গে সঙ্গে মাদারের কাছে এসে গেছে। কারণ মাদারই হোমে তার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

সে কোনও কিছু গোপন না করে মাদারের কাছে হোম থেকে চলে যাওয়ার আনুপূর্বিক ঘটনা বর্ণনা করে গেল। প্রতিদিনের খুঁটিনাটি যন্ত্রণা ও অসম্মানের কথা বলতে ভুলল না।

কথা বলতে বলতে উত্তেজনায় কাঁপছিল জয়িতা, তার চোখে জল এসে যাচ্ছিল।

মাদার আসন ছেড়ে উঠলেন। জয়িতাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বললেন, মাই সন, প্রভু তোমার সামান্য ত্রুটিটুকু ক্ষমা করে দিয়েছেন। তুমি আমার কাছে এসে একটা বড় দায় থেকে আমাকে মুক্ত করলে।

এবার মাদার মধুমঙ্গলের দিকে ফিরে বললেন, তুমি কিছু সময়ের জন্য এখানে অপেক্ষা কর বাবা, আমি জয়িতাকে নিয়ে একটু ভেতরে যাচ্ছি।

যাবার সময় মাদার মধুমঙ্গলের দিকে ডেইলি পেপার আর দু'একখানা ম্যাগাজিন এগিয়ে দিলেন।

ভেতরে গিয়ে অতিথির জন্য চা আর স্যান্ডউইচ পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। জয়িতাকে খাওয়ালেন নিজের পাশে বসিয়ে।

এখন লাইব্রেরি ঘরে মাদার আর জয়িতা মুখোমুখি:

আগে বল, তুমি আজ আমার কাছে কেন এসেছ?

জয়িতা কোন ভণিতা না করেই বলল, মাদার, এখন থেকে আমাকে বাঁচার জন্য লড়াই করতে হবে। যে বন্ধুটির সঙ্গে আমি এখানে এসেছি তিনি আমাকে শিলিগুড়িতে একটা চাকরির সন্ধান দিয়েছেন। মালিকরা আমার পরিচয়পত্র চান, তাই আপনার কাছে চলে এসেছি।

মাদার বললেন, এই ইয়ং ম্যানটির সঙ্গে তোমার পরিচয় হল কোথায়?

দুর্যোগের রাতে কি ঘটেছিল, কোথায় আমি আশ্রয় পেয়েছিলাম, তা আপনাকে সবিস্তারে বলেছি। সেই বৃদ্ধ দাশরথী ছেত্রী আমার চাকরির জন্য শিলিগুড়িতে এই যুবকটির সঙ্গে দেখা করে। উনিই এক ট্রাভেল এজেন্টের অফিসে আমার চাকরির একটা ব্যবস্থা করেছেন। তাঁরা কোন বিশিষ্ট মানুষের কাছ থেকে আমার একটা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট চান। তাই আমি ওঁকে আপনার কাছে এনেছি।

এই ইয়ংম্যান কি ওই অফিসে কাজ করে?

না মাদার, উনি শিলিগুড়ি স্টেট ব্যাঙ্কের একজন অফিসার। ওই ট্রাভেল এজেন্টের অ্যাকাউন্ট আছে ঐ ব্যাঙ্কে।

তাই। আমাদেরও একটা অ্যাকাউন্ট আছে ওখানে। কি নাম ওই ইয়াং ম্যানের? কম বয়সে এত ওপরে উঠেছে, নিশ্চয়ই ব্রিলিয়েন্ট।

ওঁর নাম, মধুমঙ্গল ধর্মপাল। গুজরাটের মানুষ।

ছেলেটিকে দেখে আমার মনে হয়েছে ও খুব সিনসিয়ার আর পরপোকারী।

আপনার অনুমান ঠিক মাদার। ওঁর সঙ্গে আগে কখনও পরিচয় তো দূরের কথা, দেখাই হয়নি আমার। বুড়ো বাবা শিলিগুড়ি গিয়ে আমার চাকরির ব্যাপারে খোঁজখবর করতে ওঁকে বলে এসেছিল। পরে আবার কোনদিন গিয়ে খবর নেবে, এমনি কথা ছিল। কিন্তু দু'চারদিন কাটতে না কাটতেই আন্দাজে বড় রাস্তায় গাড়ি থেকে নেমে পাহাড় ভেঙে ছেত্রীজীর কোঠিতে হাজির। এত কষ্ট করে লোকের উপকার করতে বড় একটা তো দেখা যায় না মাদার।

অবশ্যই কাইন্ডহার্টেড।

মাদার কিছু সময় চুপ করে থেকে বললেন, তুমি একটু বস, আমি আসছি।

কিছুক্ষণ পরে আবার ঘরে ঢুকে একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন জয়িতার হাতে।

এটা তোমার পরিচয়পত্র। কেবল একটি কথা মনে রেখ, অন্যায়ের সঙ্গে কখনও কোনওভাবে আপোষ করবে না।

ও মাদারের হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, আপনার এই অমূল্য উপদেশ চিরদিনই আমি মনে রাখব মাদার।

জয়িতাকে দু'হাতে তুলে ধরে মস্তক চুম্বন করে আবার বসতে বললেন মাদার।

নিজে মুখোমুখি বসলেন।

তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ একটি প্রয়োজন ছিল। প্রভু কৃপা করে তোমাকে তাই আমার এখানে নিয়ে এসেছেন।

প্রয়োজনটুকু জানবার জন্য উৎসুক দৃষ্টি মেলে মাদারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল জয়িতা।

তোমার বাবা যখন তেমাকে আমার কাছে নিয়ে আসেন তখন তুমি বেশ ছোট। ফ্রক পরা ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটিকে দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল। তোমার কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলোতে সেদিন আমি হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করেছিলাম। একটা কাঠবেড়ালিকে গাছের ডালে লাফিয়ে চলে যেতে দেখে তুমি বেশ অবাক চোখে তাকিয়ে আমার কাছে জানতে চেয়েছিলে, ওটা কি পাখি মাদার?

আমি হেসে বলেছিলাম, ওটা যে পাখি তুমি জানলে কি করে?

ওই যে কেমন একটা ডাল থেকে আর একটা ডালে উড়ে চলে গেল।

আমি তোমাকে কাছে টেনে নিয়ে সেদিন বলেছিলাম, ওটা পাখি নয়, কাঠবেড়ালি। এসব কাঠবেড়ালি এত তাড়াতাড়ি লাফিয়ে যায় যে মনে হয় ওরা উড়ে চলে গেল।

সেদিন তোমার বড় বড় দুটো চোখে যে বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখেছিলাম তা আজও আমি ভুলিনি।

তোমার বাবা এস পি রায়চৌধুরি এয়ারফোর্সের পাইলট ছিলেন। তিনি তোমাকে এখানে আমার জিম্মায় রেখে দিয়ে কাশ্মীর চলে গিয়েছিলেন। প্রতি মাসে আমাদের কনভেন্টের নিয়ম অনুযায়ী টাকা পাঠিয়ে যেতেন। কালে ভদ্রে দেখা করতে আসতেন তোমার সঙ্গে। আসলে যে কাজে তিনি যুক্ত ছিলেন সেখান থেকে ঘন ঘন ছুটি নিয়ে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

তুমি বন্ধুদের নিয়ে খেলাধুলো আর পড়াশোনায় মত্ত থাকতে। তাই, বাবা এলেও তাঁর স্নেহ পাবার জন্য তুমি উৎসুক ছিলে না। তিনি তোমাকে ভিজিটরস রুমে কাছে ডেকে নিয়ে আদর করতেন। টুকিটাকি দু-একটা জিনিসও দিয়ে যেতেন। উনি চলে গেলে সেগুলো আমি তোমার কাছ থেকে নিয়ে আলাদা করে রেখে দিতাম। তোমার নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে তোমার বাবার দেওয়া বিলিতি খেলনাগুলো তোমাকে খেলতে না দিয়ে কেন আমি সরিয়ে রেখে দিতাম।

জয়িতা বলল, সব কটা দিনের কথা মনে না থাকলেও দু-একটা দিনের কথা আমার মনে আছে।

বাবা চলে যাওয়ার পর আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলাম। না, বাবার চলে যাবার জন্যে নয়, পুতুলগুলো নিয়ে খেলতে না পাওয়ার দুঃখে।

মাদার বললেন, সেটা খুব স্বাভাবিক। তবে সেদিন আমি তোমাকে ওই পুতুলগুলো নিয়ে খেলতে দিইনি কেন তা কি আজ বুঝতে পেরেছ?

হাঁ মাদার, আপনাব এই কনভেন্টে সবাই একভাবে কাটাবে, এটাই আপনি চেয়েছিলেন। পরস্পরের ভেতর কোনওরকম ভেদ থাকুক এ আপনি চাননি।

তোমার বাবার দেওয়া জিনিসগুলো আমি আজও সযত্নে রেখে দিয়েছি। তোমাকে হোমে পাঠিয়ে দিয়েও ওই একই কারণে তোমার সঙ্গে সেগুলো আমি দিইনি। এখন তোমাকে দিতে কোনও বাধা নেই। তোমার জিনিস তুমি আজই সঙ্গে নিয়ে যেতে পার।

জয়িতা এবার মাদারের দিকে তাকিয়ে বলল, মাদার আমার আজ বড় জানতে ইচ্ছে করছে, আমার বাবা কনভেন্টে টাকা পাঠানো বন্ধ করলেন কেন? যে কারণে আপনাদের নিয়ম অনুযায়ী এখান থেকে আমাকে একটি অনাথ আশ্রমে চলে যেতে হল।

একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করল, আমার বাবার অ্যাড্রেস কি আপনি জানতেন না?

উনি একটা অ্যাড্রেস দিয়ে গিয়েছিলেন আমি সেখানে দুটো চিঠিও পাঠিয়েছিলাম। দুটো চিঠিই ফেরৎ এসেছিল, একটি নোটসহ, তিনি শহীদ হয়েছেন।

বাবার প্রসঙ্গে জয়িতার চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দু'ফোঁটা জল।

সঙ্গে সঙ্গে মাদার তাকে জড়িয়ে ধরে চোখের জল মুছিয়ে দিলেন।

কিছু পরে জয়িতা শান্ত হলে মাদার বললেন, তোমার জন্যে একটা খবর আছে। তবে এখুনি তোমাকে আমি সে খবরটা জানাতে পারছি না।

আমার হিসেবমতো তোমার আঠারো বছর পূর্ণ হতে এখনও মাস সাতেক বাকি। তোমাকে আমি একটা সিল করা প্যাকেট দেব। সেটা তুমি খুলবে তোমার আঠারো বছর পূর্ণ হলে। শুধু একটা কথা বলি, যিনি আমাকে ওই প্যাকেটটা পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনিই তার সঙ্গে দিয়েছেন এক লক্ষ টাকার একটা হেভি অ্যামাউন্ট। তুমি এখুনি ড্রাফ্‌টটা নিয়ে গিয়ে ভাঙিয়ে নিতে পার, তবে প্যাকেটটা খুলবে আমার নির্দেশমতো। একটি কথা বলি, সত্যকে ঢেকে রাখার শক্তি কারু নেই। আগুনের মত সে সমস্ত আবরণকে ধ্বংস করে জেগে ওঠে। সে অসত্যকে দগ্ধ করে পবিত্র আলোকে ভরে দেয় অন্তর।

জয়িতার মনে অফুরন্ত জিজ্ঞাসা, মুখে চোখে অদম্য কৌতূহল। তবু সে নিজেকে সংযত রেখে বলল, মাদার, আমি আপনার দেওয়া প্যাকেটটা নিয়ে যাচ্ছি, অ্যামাউন্টটা আপনার কাছে রেখে দিন, পরে কোনও সময় নিয়ে যাব।

মাদার চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন, বেশ, তোমার যা ইচ্ছে তাই হবে।

এবার তিনি ভেতর থেকে ক্যানভাসের প্যাকেটে রাখা সিল করা একটা খাতা এনে জয়িতার হাতে তুলে দিলেন।

শেষে বললেন, এই খাতার ভেতর যা লেখা আছে তাব একটা জেরক্স কপি রয়েছে আমার কাছে। অরিজিনাল কপিটা সিল করে এই প্যাকেটের ভেতর তোমাকে দিয়ে দিলাম।

এবার মাদার জয়িতার সঙ্গে বাইরের ঘরে বেরিয়ে এসে মধুমঙ্গলকে বললেন, সরি, অনেকটা সময় তোমাকে একা বসে থাকতে হল। এখন লাঞ্চের সময়, তোমরা দুজনে এখানেই খেয়ে যাবে।

মধুমঙ্গল জয়িতাকে সঙ্গে নিয়ে শিলিগুড়িতে পৌঁছল।

তখন বেলা চারটে। নিজের অফিসেই বসেছিলেন হিমালয়ান ট্রাভেল এজেন্সির মালিক গোপাল ভাণ্ডারি মশায়। পাশের ঘরে জনা পাঁচেক কর্মচারি মাথা নীচু করে কাজ করছিল।

মধুমঙ্গল বলল, ভাণ্ডারিজী. যে মেয়েটির কথা আপনাকে বলেছিলাম তাকে নিয়ে এলাম।

দার্জিলিং কনভেন্টের মাদারের দেওয়া ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট ওর সঙ্গে রয়েছে। সব দেখে শুনে কথা বলে নিন, আমি একটু অফিস থেকে ঘুরে আসি।

মধুমঙ্গল চলে গেল।

মরা মাছের চোখের মত স্থির দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়েছিলেন ভাণ্ডারিমশায়। পাশে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে, সেদিকে যেন ভ্রূক্ষেপই নেই।

হঠাৎ মুখ থেকে বুলেটের মত কয়েকটা শব্দ বেরিয়ে এল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, নিজের জায়গা বুঝে নিয়ে বস।

জয়িতা পাশ থেকে ঘুরে গিয়ে টেবিলের অন্য প্রান্তে ভাণ্ডারি মশায়ের মুখোমুখি বসল।

স্বগতোক্তির মত গোপাল ভাণ্ডারী বললেন, বয়স অল্প, জগৎ সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও কম। তা হোক, আমার বেশি ধুরন্ধর লোক চাই না। সাচ্চা কাজের লোক চাই। শুনেছি তুমি ভাল ইংরিজি টিংরিজি বলতে পার, আমাদের এ ধরনের লোকই দরকার।

জয়িতা বলল, আপনি আমাকে পরীক্ষা করে নিতে পারেন। ইংলিশ মিডিয়ামে আমি বেশ কিছুকাল পড়াশোনা করেছি।

ভাণ্ডারী কপালে চোখ তুলে বলল, আমি নেব তোমার পরীক্ষা! নিজেই ইংরিজি-ফিংরিজি কিছুই বলতে পারি না।

জয়িতার খুব হাসি পেল লোকটির কথা শুনে কিন্তু পরিস্থিতি বুঝে সে হাসি চাপল।

একটা কাগজ হাতে তুলে ভাণ্ডারিমশায় বললেন, সরল বাংলায় লেখা এটা তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। আজ থেকে শুরু হবে তোমার চাকরি, একমাস পরে কাজ দেখে দেওয়া হবে কনফারমেশন লেটার। এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে পাবার আগে কয়েকটা কথা তোমার জেনে রাখা দরকার।

এক নম্বর, কোনও কারণে চাকরি গেলে এ বাজারে আর একটা কাজ খুঁজে পাওয়া শক্ত। আশা করি এ কথাটা সবসময় মাথায় রাখবে। সোজা কথা, মাথা গরম হয়ে উঠলেও দুম করে চাকরিটা ছাড়বে না।

দুই নম্বর, তোমাকে দেশি বিদেশি ট্যুরিস্টদের সঙ্গে নিয়ে বিশেষ বিশেষ সিজনে সাইট সিইং-এ যেতে হবে। তোমার চেহারায় আগুন আছে তাই পতঙ্গ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এবার তুমি ঠিক করবে ওই ধাক্কায় তুমি নিভে যাবে না পুড়িয়ে মারবে।

তিন নম্বর, তুমি ফ্রি পাবে থাকার একটা জায়গা আর রান্নাবান্নার জন্যে একটি কাজের মেয়ে। কাজের মেয়ের যোগান দেবে এই কোম্পানি কিন্তু তাকে মানিয়ে চলার দায়িত্ব তোমার। ঘরের ভেতর কালার টিভিও থাকবে। কাজের শেষে তুমি টিভি খুলে দেখতে পার অথবা পাবলিক লাইব্রেরি থেকে বই এনে পড়তে পার। মেম্বারসিপের খরচ কোম্পানি যোগাবে। তবে কোনওভাবেই ঘরের ভেতর উটকো বন্ধুবান্ধব ডেকে এনে আড্ডা জমাবে না।

চার নম্বর, তোমার ব্যক্তিগত জীবনের দিকে আমি লক্ষ্য রাখব না, অন্যদিকে আমার ক্রিয়াকর্ম নিয়ে তুমি কৌতূহল প্রকাশ করবে না এবং কোনওভাবেই নাক গলাবে না।

পাঁচ নম্বর, আমি কাজের মানুষ, বয়স্ক, ব্যাচেলার। আমি এমপ্লয়ার, তুমি এমপ্লয়ি—এটুকু মনে রাখলেই উভয়ের কাজের সুবিধে হবে।

'তুমি আমার মেয়ের মতো' বলে যেমন আমি আদিখ্যেতা দেখাব না, তেমনি আমি চাইব না তুমি আমাকে পিতৃবৎ কারণে অকারণে ভক্তি কর।

এই নাও তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার, বলেই জয়িতার হাতে কাগজখানা ধরিয়ে দিলেন। যেমন যেমন কাজ দেখাতে পারবে তেমন তেমন ইনক্রিমেন্ট হবে।

বেহুলা, বেহুলা বলে বার দুয়েক হাঁক পাড়লেন ভাণ্ডারীমশায়।

দরজার ওপারে যেন হাঁকের অপেক্ষায় ঠায় দাঁড়িয়েছিল বেহুলা। ডাক শোনামাত্রই ঢুকে পড়ল ভেতরে।

বয়েস পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের কাছাকাছি, সিঁথিতে সিঁদুর নেই।

ভাণ্ডারী বললেন, দক্ষিণের কোয়ার্টারে দিদিমণি থাকবেন। তুমি তাঁর রান্নাবান্না, দেখাশোনার কাজ করবে। মুখ বুজে ফাইফরমাশ খাটবে। প্রতিদিন আমার কাছে ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান করে কিছু লাগাবে না।

কাজ শুরু হয়ে গেল। অফিসের এক কর্মচারি ভাণ্ডারীমশায়ের নির্দেশে চারদিকটা ভাল করে ঘুরিয়ে দেখালেন জয়িতাকে।

একটা গ্যারেজে খান দুয়েক জিপ, টাটা সুমো আর মারুতি রয়েছে। এগুলো সবই ভাণ্ডারীমশায়ের নিজস্ব সম্পদ। ট্যুরিস্টদের নিয়ে বিভিন্ন স্পটে এগুলি আনাগোনা করে। কার্সিয়াং, দার্জিলিং, মিরিক, মংপু, তাগদা, কালিম্পং, গ্যাংটক—এই গাড়িগুলো চষে বেড়ায়।

ভদ্রলোকটি নিরীহ। বললেন, আমার নাম গণপতি পাণিগ্রাহী। আমি অ্যাকাউন্টসে কাজ করি। আপনি তো আমাদের নতুন দিদিমণি।

আমাকে জয়িতা বলে ডাকবেন।

জিভ কাটলেন প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি। বললেন, তাহলে আমার আর রক্ষে রাখবেন না ভাণ্ডারীমশায়।

জয়িতা একমুখ হাসি উপহার দিয়ে বলল, জয়িতা দিদিমণি বলে ডাকবেন অথবা শুধু দিদিমণি।

জয়িতার কথাটা মনে ধরল প্রৌঢ় মানুষটির। তিনি মাথা নাড়লেন।

হঠাৎ জয়িতার কেন জানি না মনে এল, মালিকের নামও 'গ' দিয়ে আবার কর্মচারির নামও 'গ' দিয়ে। সে, বলেই ফেলল কথাটা আপনার আর গোপালবাবুর নামের আদ্যক্ষরটা 'গ' দিয়ে, বেশ মিল আছে দেখছি।

গণপতিবাবু বললেন, ব্যাপারটা বেশ আপনার মাথায় এসেছে! কর্তার ওই এক খেয়াল। তাঁর অফিসে একেবারে হাতের কাছে বসে যে চারজন কাজ করেন অর্থাৎ ভেরি ভেরি কনফিডেন্সিয়েল, তাঁদের সকলের নামই 'গ' দিয়ে শুরু।

তাই! যেমন?

গোপীকান্ত বক্সী, গদাধর পান, গোলকপতি শর্মা।

আশ্চর্য! এসব নামের মানুষ উনি জোগাড় করলেন কি করে?

মানুষের কি অভাব আছে দিদিমণি, একটা বিজ্ঞাপন দিলে দরখাস্ত এসে যায় কয়েক হাজার। ওব ভেতর থেকে চারটি 'গ' বেছে নিতে আর কতক্ষণ।

তা যা বলেছেন।

জয়িতা দেখল মানুষটি বেশ সহজ সরল।

গণপতিবাবুর সঙ্গে জয়িতা মহানন্দা ব্রিজ অবধি চলে গেল।

হঠাৎ জয়িতার মাথায় একটা প্রশ্ন জেগে উঠল, আচ্ছা গণপতিবাবু শিলিগুড়ি নামটা এল কোথা থেকে? যেমন শুনেছি, দার্জিলং-দুর্জয়লিঙ্গ থেকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা-তিব্বতি ভাষায় 'কাঙ, ছেন, দজোং, গা' থেকে।

দশ এগার বছর বয়সে দার্জিলিং-এর কনভেন্ট স্কুল থেকে আমরা একবার বেড়াতে যাই। সে সময় গাইডের মুখ থেকে ওই কথা শুনেছিলাম। এখন শিলিগুড়ি নামটা কি করে হল তা জানতে ইচ্ছে করছে।

আজ্ঞে দিদিমণি, বড়বাবুর মুখ থেকে একসময় শিলিগুড়ি নামের মাহাত্ম্যটা জেনেছিলাম। শাল গাছের মোটা মোটা গুড়ি এখানে দেখা যায় বলে এর নাম হয়েছে শিলিগুড়ি। আবার কেউবা বলেন, 'শিলা' মানে 'নুড়ি' আর বোরো ভাষায় 'গুড়ি' মানে হাট বা অঞ্চল। তাই যে অঞ্চলে অজস্র নুড়ি ছড়ান থাকে তাকে বলে শিলাগুড়ি বা শিলিগুড়ি। আর একটি বেশ ইতিহাস ঘেঁষা অর্থ আছে।

কি রকম?

সিকিমের রাজা এক সময় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁর নিযুক্ত লেপচা সৈন্যরা ব্রিটিশ আর্মিকে পাহাড় থেকে সমতলে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। বহু ব্রিটিশ নিহত হয়। কিন্তু সমতলে নেমে ব্রিটিশরা আবার বীরবিক্রমে যুদ্ধ শুরু করে। অমনি লেপচাদের সেনাপতি চিৎকার করে তাঁর সৈন্যদের নির্দেশ দেন, 'শ্যালিগ্রি'। লেপচা ভাষায় এই শব্দটির অর্থ, 'ধনুকে ছিলা পরাও' অর্থাৎ বীরবিক্রমে ধনুঃশর নিয়ে যুদ্ধ শুরু কর।

ওই শ্যালিগ্রি শব্দটি নেপালিদের উচ্চারণে হয়ে যায় শিলিগিড়ি আর ব্রিটিশদের উচ্চারণে হল, শিলিগুড়ি।

জয়িতা বাহবা দিয়ে বলে উঠল, দারুণ! দারুণ কথা শোনালেন গণপতিবাবু।

নিজের প্রশংসায় লজ্জিত হলেন গণপতি পাণিগ্রাহী। বললেন, এ আমার শোনা কথা, প্রশংসা যদি কারু প্রাপ্য হয় তাহলে তা কর্তাবাবুর।

এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে গণপতি পাণিগ্রাহীর মুখ থেকে ভাণ্ডারীমশায় সম্পর্কে অনেক কথাই জানতে পারল জয়িতা। লোকটি রগচটা হলে কি হবে, দিল আছে।

ট্রাভেল এজেন্সি ছাড়া আরও বেশ কয়েকটা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছেন ভাণ্ডারী। হংকং মার্কেটে বিদেশি জিনিসের কারবারের সঙ্গে তিনি জড়িত। লোহা আর সিমেন্টের পারমিট লাইসেন্স আছে তাঁর। প্রমোটারদের সঙ্গে লাভের কিছু বখরাও আছে। দুটো শ'মিলের সঙ্গে আধাআধি ভাগ।

শেষে গণপতিবাবু বললেন, লোকে ওঁকে টাকার কুমির, কালোবাজারি, আরও কতকিছু বলে, কিন্তু মানুষটার হৃদয়ের খোঁজ কেউ রাখে না। কত টাকা যে কত ভাল কাজে বিলিয়ে দেন তার লেখাজোখা নেই।

কি রকম?

ক্লাব, লাইব্রেরি, ইস্কুল, এমনি আরও অনেক প্রতিষ্ঠানে মোটা টাকা ডোনেশান দেন, কিন্তু একটি শর্ত জুড়ে দেন ওই দানের সঙ্গে।

কৌতূহলী জয়িতা অমনি জানতে চাইল, কি শর্ত?

দাতার লিস্টে কোনভাবেই তাঁর নাম তোলা চলবে না। উৎসব অনুষ্ঠানে তাঁকে মঞ্চে তুলে আমড়াগাছি করা চলবে না।

গণপতিবাবু বললেন, কর্তামশায় এই 'আমড়াগাছি' শব্দটাই ব্যবহার করেন।

বেশ মানুষ তো।

গণপতিবাবু যেন আপন মনে বলে উঠলেন, যে বোঝে সে-ই বোঝে।

একটু থেমে আবার বললেন, সব দিকে নজর। কর্মচারিদের ফ্যামিলিতে কার কজন মেম্বার তা তাঁর নখদর্পণে। সবার খোঁজ খবর নেন, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, শরীর স্বাস্থ্য সবকিছু। এমনকি কার কত বয়স, ফর্সা না কালো, রোগা না মোটা, সব খবরই রাখেন তিনি।

পুজোর মরশুম আর শীতের মরশুমে বাড়িশুদ্ধ সকলেরই পোশাক দেন। বিশেষ একটি পোশাকের দোকানের সঙ্গে ওঁর কাজকারবার। তারাই ওনার কোয়ার্টারে সব ডাঁই করে রেখে যায়। কার গায়ে কি রঙের কতখানি লম্বা চওড়া পোশাক মানাবে তা ওঁর আন্দাজ আছে। সেই মত পোশাক আনেন অর্ডার দিয়ে।

জয়িতা জানতে চাইল, পোশাক বিলি হয় কি ভাবে? আপনাদের হাতেই কি ধরিয়ে দেন? ছোট বড় হলে তখন?

প্রত্যেকের ফ্যামিলিকে আলাদা আলাদা এক একদিন করে ডাকেন। সেখানে রঙ আর মাপ মিলিয়ে পোশাক বিতরণ হয়। বদলের প্রয়োজন হলে দোকানদার, কর্তার বাড়িতে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে যায়।

কারু ওপর বিশেষ ফেভার নেই ওঁর। সবাইকে যে যার প্রয়োজন মত ভাগ করে দেন সঠিকভাবে।

জয়িতা মন্তব্য করল, নিজের সংসার নেই তো, তাই সবার সঙ্গে একই পরিবারের কর্তা হিসেবে থাকতে চান।

পাণিগ্রাহী মশায় বললেন, আদপেই নয়। কারু ফ্যামিলিতে উনি নাক গলাতে চান না। ওঁর বিশেষ ফেভারও কোন বিশেষ ফ্যামিলি পায় না। উনি নিজের মত থাকেন, নিজের খাবার নিজেই তৈরি করেন।

সে কি!

হ্যাঁ, কারু সাহায্য পছন্দ করেন না।

যখন বয়স বাড়বে, অক্ষম হবেন, তখন?

ওঁর মুখ থেকে কখনও ভবিষ্যতে ব্যবসা বাণিজ্যের কি হবে, সে সব কথা শুনিনি। নিজের কথা তো নয়ই।

একবার এক কর্মচারি ওই ধরনের কি যেন একটা কথা তুলেছিল, উনি বলেছিলেন, তুমি আমি কি কর্তা, যাঁর কাজ তিনিই করিয়ে নেবেন। যেভাবে বুঝবেন সেভাবেই করাবেন, যাকে দিয়ে বুঝবেন তাকে দিয়েই করাবেন।

আর কেউ কথা তোলেনি, সবাই চুপ করে গিয়েছিল।

আমাদের মালিক ভগবানে খুবই বিশ্বাসী বলুন।

পাণিগ্রাহী বললেন, সেদিন ওই রকম একটা কথা বললেও ওঁর আচরণে কিন্তু কোনদিন আমি দেবদ্বিজে ভক্তি দেখিনি।

সেদিনের মত ভাণ্ডারীমশায়ের প্রসঙ্গে ইতি টানা হল।

বেহুলাদির রান্নার হাতটি বেশ। রাতে খাবার টেবিলে বসে টের পেল জয়িতা। আলাপও জমল। শান্ত ধীর স্বভাবের, সবসময় কেমন যেন তটস্থ হয়ে থাকে।

জয়িতা বলল, একেবারে এই টেবিলে তোমার খাবার থালা নিয়ে এস বেহুলাদি, খেতে খেতে বেশ গল্প করা যাবে।

বেহুলা বলল, দিদিমণি যে কি বলেন!

জয়িতা জোরের সঙ্গে বলল, কেন, তোমার আপত্তি কোথায়?

আপনি অসম্ভব ভালমানুষ দিদি, তাই এতবড় একটা কথা বলতে পারলেন। কিন্তু আমি যদি আজ আপনার ডাকে সাড়া দিই আর কিছুদিন পরে আপনি বিয়েসাদি করে চলে যান তখন আমার অবস্থাটা কি হবে ভাবুন।

কেন বেহুলাদি, আমি চলে গেলে আবার নতুন মানুষ আসবে।

ততদিনে যে আমার স্বভাবটা খারাপ হয়ে যাবে দিদিমণি।

কি রকম?

আপনার ডাকে আপনার সঙ্গে বসে খেলাম, আবার নতুন মানুষ এলে মনে হবে, এক টেবিলে বসে খাই। কিন্তু তারা তো আর আপনার মত আমাকে একই টেবিলে বসে খেতে বলবে না। তখন নিজেকে বড় ছোট মনে হবে দিদিমণি। আপনার কথা ভেবে মন কাঁদবে।

জয়িতা খাবার টেবিলে বসেছিল, হঠাৎ উঠে গিয়ে বেহুলাদির হাত ধরে ওর পাশের একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল, আমি যতদিন এখানে থাকব তুমি আমার সঙ্গে খাবে, আমার পাশের বিছানায় শোবে।

বেহুলা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল দেখে জয়িতা বলল, এ দুনিয়ায় আমার আপনার বলতে কেউ নেই বেহুলাদি, তাই আমার জন্যে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে, এমন মানুষও নেই। আমি চলে যাবার পর যদি আমার জন্যে কোনদিন তোমার মন কেমন করে তাহলে ভাবব, আমার নিজের একটি দিদি আছে যে আমার কথা ভেবে কষ্ট পায়।

জয়িতার কথা শুনে হঠাৎ জল এসে গেল বেহুলার চোখে। কিচেন থেকে থালা আনার অজুহাতে চোখের জল গোপন করতে গেল সে।

কথায় কথায় জানা গেল এই অঞ্চলের একটা টি-গার্ডেনে বেহুলার স্বামী কাজ করত। ওদের আদি বাড়ি ছিল বীরভূম জেলায়। কালেভদ্রে স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়িতে যেত। মোটামুটি সম্পন্ন গৃহস্থ ছিল ওরা। চার ভায়ের তিনজনই চাষ আবাদ করত, কেবল বেহুলার স্বামী ছিল চা বাগানে।

দেশের বাড়িতে কারুরই সুনজরে ছিল না তার স্বামী। সবার ধারণা ছিল, ও অনেক বেশি টাকা রোজগার করছে চা বাগানে। অন্যদিকে সংসারের উন্নতির জন্য কিছু করছে না।

একান্নবর্তী সংসারের আয় থেকে একটি কপর্দকও নিত না তার স্বামী। পুজোর সময় বছরে একবার মাত্র দুজনে দেশের বাড়িতে যেত। সঙ্গে নিয়ে যেত সকলের জন্য সারা বছরের কাপড়চোপড়। তবুও মন ভরত না বাড়ির কর্তা বেহুলার শ্বশুরমশায়ের। জমি কেনার জন্য টাকার তাগাদা দিয়ে প্রায়ই চিঠি লিখতেন।

চা বাগানে মালিকদের কোয়ার্টারগুলো প্রতিদিন ঝাড়মোছ করার কাজ ছিল বেহুলার স্বামীর। এতে সে যে টাকা পেত, তাতে দুজনের সংসার ভালভাবে চালিয়ে উদ্বৃত্ত বড় একটা কিছু থাকত না।

দিন সাতেক জ্বরে ভুগেছিল মাত্র। ডাক্তার ডায়গোনেসিস করতে পারলেন না। নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ হসপিটালে শিফ্‌ট করার পথেই রোগী মারা গেল।

অসহায় বেহুলার হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়েছিল মালিক পক্ষ। তাই সম্বল করে সে চলে গেল স্বামীর ভিটেতে।

পূর্ণ যৌবন তখন তার। চাবাগানের অনেকেরই চোখ পড়ছিল তার ওপর। স্বামী হারানোর শোকে তখন সে একেবারে মুহ্যমান। তার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে অনেকেই চাইছিল ঘনিষ্ঠ হতে। বেহুলা সমস্ত প্রলোভন সরিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যেতে মনস্থ করেছিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য তাকে ছাড়ল না। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তাকে ছাড়তে হল শ্বশুরবাড়ি। নির্যাতনের চূড়ান্ত হচ্ছিল, টাকা পয়সাও হাতিয়ে নিয়েছিল ইতিমধ্যে।

আবার সেই পথে নামা। মা বাবাও গত হয়েছিল। একমাত্র দাদারও কোমরে এমন জোর ছিল না যে কপর্দকহীন বোনের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিতে পারে।

প্রাণধারণের তাগিদে তাই নিঃস্ব হাতে ছুটে আসছিল তার স্বামীর পুরনো কাজের জায়গায়।

পথে একটা গাড়ি ডিরেল্‌ড হওয়ার ফলে সকালের গাড়ি এসে পৌঁছল সন্ধ্যায়।

শীত ঋতু, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। বরফ ছুঁয়ে বইছে হায়েনার কামড়ের মত হিমেল হাওয়া। গায়ে শীতবস্ত্রের অভাব। কুঁকড়ে সুঁকড়ে বসেছিল বেহুলা টিকিট ঘরের একপাশে।

সেই পথ দিয়ে পার হচ্ছিলেন ভাণ্ডারীমশায়। চোখ গিয়ে পড়ল যুবতী মেয়েটির ওপর।

একেবারে এক্স রে আই। ভেতর পর্যন্ত দেখে নিলেন। সুঠাম সুদর্শন, সহজ সরল মুখ চোখ। নিশাচরদের শিকার হতে পারে।

এগিয়ে গেলেন ভাণ্ডারীমশায়।

ও মেয়ে রাত ঘনাচ্ছে, এখানে বসে কেন? যাবে কোথায়, জায়গাটা তোমার মত মেয়ের পক্ষে নিরাপদ নয়।

লোকটির গলার স্বরে সমবেদনার ছোঁয়া বা মিষ্টত্ব ছিল না, কিন্তু নির্ভরতার ছাপ ছিল। সেটুকু বুঝে নিতে সাদাসিধে ভালমানুষ বেহুলার কোন অসুবিধেই হয়নি।

সে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সংক্ষেপে ভাণ্ডারীমশায়ের কাছে তার অসহায় অবস্থার কথা বলে গেল। শেষে গড় হয়ে প্রণাম করে ভাণ্ডারীমশায়কে বলল, বাবা আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

ভাণ্ডারী বললেন, শোন মেয়ে, আমি কারু বাবা অথবা রক্ষাকর্তা নই। আর প্যান প্যান করে কান্না আমার একেবারেই পছন্দ নয়। তুমি যদি আমার সঙ্গে যেতে চাও চটপট উঠে পড়, রাতের মত খাবার আর আস্তানা পাবে। আর ভোর হলে যেদিকে দুচোখ চায় চলে যেতে পার।

বেহুলাকে এনে সে রাতে এই খালি কোয়ার্টারেই তুলেছিলেন ভাণ্ডারীমশায়।

তারপর অনেকগুলো ভোর এল গেল, কিন্তু বেহুলা এখান থেকে আর অন্য কোথাও নড়ল না। ভাণ্ডারীমশায়ও মুখ ফুটে মেয়েটিকে চলে যেতে বললেন না।

বেহুলা নিজের থেকেই দুবেলা কর্তার দুধ আনে, কখনো সখনো বিছানার ভারি চাদরটাদরগুলো কেচেকুচে দেয়। অবশ্য প্রতিদিনের কাচাকুচি আজও নিজের হাতেই করে নেন ভাণ্ডারিমশায়। নিজের রান্না নিজেই করেন, নিজের বাসনকোসন নিজেই ধুয়ে নেন।

এখন একটি মেয়ের দেখাশোনার দায়িত্ব পেয়ে মনে মনে খুশি হয়ে উঠেছে বেহুলা।

কর্তামশায় দিদিমণির দেখাশোনার ভার বেহুলার ওপর তুলে দেবার সময় বলেছিলেন, 'মুখ বুজে ফাইফরমাশ খাটবে। প্রতিদিন আমার কাছে ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান করে কিছু লাগাবে না।'

কথাটা বেহুলার মত শান্ত ভদ্র কোন মেয়ের আত্মসম্মানে আঘাত দিতে পারে কিন্তু বেহুলা এতখানি অসম্মানজনক কথা একেবারেই গায়ে মাখেনি। সে জানে মানুষটি ওইরকমই। শক্ত শিলার আবরণের ভেতর নিরন্তর বইছে একটা ফল্গুধারা। সন্ধান যে জানে সেই জানে।

ফিনফিনে উত্তরীয় হাওয়ায় উড়িয়ে কুমারী কন্যার মত ঘুরতে লাগল শারদলক্ষ্মী পাহাড়ে পর্বতে, বনে উপবনে। পর্বত শিখরের শুভ্র-শিরে পরিয়ে দিল প্রভাত সূর্যের সুবর্ণ-ঝলসিত মুকুট। তার হাতের ছোঁয়ায় সবুজ বর্ণের শ্যামলিমায় শোভাময় হয়ে উঠল বনস্থলী। সারা আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে দিল ইন্দ্রনীল মণির আভা।

শারদলক্ষ্মীর চরণের ছোঁয়ায় রিনঝিন করে বেজে উঠছে ঝর্নার মঞ্জির।

এস এস বলে জগৎ জোড়া ভ্রাম্যমান অতিথিদের ডাক দিয়ে ফিরছে মোহন বীণায় আগমনীর ঝংকার তুলে।

এ ঋতু সোনার, এ ঋতু অমেয় শোভার। নীলে, সোনায়, সবুজে শুভ্রতায় মাখামাখি।

অতিথি সমাগমের অন্যতম ঋতু, তাই ভাণ্ডারীমশায় অফিসঘরটিকে সাফসুতরো করে সাজিয়ে তুলেছেন।

পোড়ামাটির গণেশের একটি দক্ষিন... ...ত্যশীল মূর্তি শোভা পাচ্ছে প্রবেশদ্বারের ওপরে।

প্রশস্ত ঘরের মেঝে জুড়ে ফুলতোলা রঙবাহারি কার্পেট। সুশোভন ঢাকা পরানো কৌচ সোফা।

উত্তরে হালকা নীলাভ দেওয়াল জুড়ে ফ্রেমে বাঁধানো ঝকঝকে শুভ্র ভোরের কাঞ্চনজঙ্ঘা। মাথায় সোনালি ছোঁয়া।

ঘরের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় একটি টেবিল। ওপরে মোটা গ্লাসের আবরণী। পাশে দরজার দিকে মুখ করে সাদা রঙের একটি চেয়ার, লাল গদি আঁটা।

রিসেপশনিস্ট কাম গাইড জয়িতা চৌধুরি অতিথিদের অপেক্ষায় বসে রয়েছে। টেবিলের ওপর তার ফাইল আর কলম। সাদা ফ্লাওয়ারভাসে একগুচ্ছ রঙিন ফুল।

বেলা দশটা, দরজার কাছে এসে যে দাঁড়াল সে বহু প্রত্যাশিত শারদ-অতিথি নয়। দাশরথী ছেত্রী দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মেয়ের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রয়েছে।

চেয়ার ছেড়ে প্রায় ছিটকে বেরিয়ে গেল জয়িতা। বৃদ্ধের গায়ে মাথাটা গুঁজে বলল, তুমি এতদিন আসনি কেন বাবা? আমি তোমার কথা কত ভেবেছি, কেঁদেছি। কি কষ্ট করেই না তুমি সব কাজ করছ একা! কমলালেবুগুলোতে নিশ্চয়ই এতদিনে রং ধরেছে। নতুন কাজ, তাই এখান থেকে আমি কোনরকমেই নড়তে পারছি না। মন কাঁদলেও একদিনের ছুটি নিতে সঙ্কোচ হয়। এখনও পর্যন্ত ভাণ্ডারী মশায়ের কোনও কাজেই আমি লাগতে পারিনি।

বৃদ্ধ সস্মিত হাসি হেসে বলল এই তো সবে সিজন শুরু রে বেটি, কাজ করতে করতে দম ছুট হয়ে যাবি।

আমি কাজকে ভয় পাই না বাবা।

তাহলে দেখবি কর্তামশাই কত খুশি হবেন। তবে মুখে তার খুশির প্রকাশ কখনও দেখতে পাবি না। কাজ ভাল হলে ইনক্রিমেন্টের সময় বুঝতে পারবি। এক একটা লম্বা ট্যুর থেকে ফিরে আসার পর আমাকে খামে ভরে একগোছা টাকা দিয়ে দিতেন। মুখে কিন্তু কোনও প্রশংসার কথা বলতেন না। কেবল বলতেন, পাহাড়ি পথ সামলে চলবে। ট্যুরিস্টদের জান প্রাণ আর আমার এজেন্সির মান তোমার দুটো হাতের ওপর নির্ভর করছে।

বাইরে তো কর্তামশাইকে দেখলাম না, কোথায় গেছেন?

জয়িতা বলল, তা তো বলতে পারব না বাবা। কলকাতা থেকে রকেট বাস পৌঁছনোর সময় হয়ে গেছে, হয়তো তিনি সেখানেই ট্যুরিস্টদের খোঁজে গেছেন।

এবার আবদারে মেয়ের মত বৃদ্ধের হাত ধরে জয়িতা বলল, বাবা কোনওদিন কাজ করিনি, কেমন ভয় ভয় করছে।

সে কিরে বেটি! আমি সারাটা জীবন ট্যুরিস্টদের নিয়ে পাহাড় চষে বেড়ালাম, একেবারে খাদের গা ঘেঁষে গাড়ি ছুটিয়ে নিয়ে গেলাম, একচুল এদিক ওদিক হলেই একদম খাদে পড়ে তালগোল পাকিয়ে যেতে হবে। আমি কিন্তু ভয় পাইনি। সবসময় ভাবতাম, শিবজি আমার সঙ্গে আছেন। আমার ওপর দেওয়া দায়িত্ব তিনিই পালন করবেন।

জয়িতা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তুমি আজ আমার কোয়ার্টারে থাকবে। কাল যেখানে খুশি যেও।

বৃদ্ধকে টানতে টানতে নিজের কোয়ার্টারের দিকে নিয়ে গেল জয়িতা।

চেঁচিয়ে বলল, বেহুলাদি, বেহুলাদি আমার বাবা এসেছে। রান্নাবান্না বসাও, ভাল কিছু বাজার করে আন। আমরা একসঙ্গে আজ খাব, থাকব।

হাসিমুখে বেহুলার আবির্ভাব।

বৃদ্ধ বলল, কেমন আছিস রে বেটি?

একা ছিলাম এতদিন, এখন দিদিমণিকে পেয়েছি, দিব্যি আছি।

বৃদ্ধ বলল, মিলেমিশে দু-বোনে থেকো। কারু মনে আর কোনও কষ্ট থাকবে না।

জয়িতা চঞ্চল হয়ে উঠে বলল, আমি এখন অফিসঘরে যাই বাবা, তুমি বিশ্রাম কর।

একটু দাঁড়া মা, তোর জন্যে একটা জিনিস এনেছি।

ছেলেমানুষের মত খুশি হয়ে উঠল জয়িতা, কি এনেছ বাবা?

নিজের ঝোলা থেকে একটা সুন্দর প্রমাণ সাইজ হাতে ঝোলানো লেডিস ব্যাগ টেনে বার করল দাশরথী ছেত্রী। বলল, ব্যাগটা খোল।

জয়িতা ব্যাগের চেন টেনে ভেতর থেকে বের করল একটা জিনিস, যার সম্বন্ধে সে কোনও ধারণাই করতে পারল না।

এটা কি বল তো?

জয়িতা মাথা নাড়তে লাগল, সে কিছুই বোঝেনি।

বেহুলা কিন্তু কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিল, সে এগিয়ে এসে ওটা হাতে নিল, এতে একটা কুক্‌রি আছে দেখছি।

বলতে বলতে সে কুক্‌রিটা খাপ থেকে টেনে বের করে ফেলল।

জয়িতা দেখল, নতুন, বাঁকানো ঝকঝকে একটা ছোরা।

বৃদ্ধ এবার রহস্য উদ্‌ঘাটন করে বলল, এটা একটা ভারি সুন্দর বেল্ট, মেয়েরা কোমরে বাঁধতে পারে। ওই বেল্টের সঙ্গে এই ছোরাটা খাপের ভেতর ঝুলবে। দরকারে ওটাকে পোশাকের আড়াল থেকে টেনে বের করা যাবে।

কিন্তু এটা নিয়ে আমি কি করব বাবা?

দরকার হবেই বলছি না, কিন্তু দরকার হতে পারে। তুই মেয়ে, তার ওপর গাইডের চাকরি, কত

রকমের মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে, সবাই তো সমান নয়, নিজেকে বাঁচাবার জন্য এটা সঙ্গে রাখা ভাল।

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল জয়িতা, দারুণ! এমন দরকারি আর চমৎকার জিনিসটা পেলে কোথা থেকে?

হংকং মার্কেট ঢুঁড়ে এটিকে জোগাড় করেছি।

সঙ্গে সঙ্গে জয়িতা পাশের একটা ছোট্ট কুঠুরিতে ঢুকে পড়ল। দরজা বন্ধ করে আলো জ্বালল, ছোরাটাকে খাপ থেকে খুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর পোশাকের ভেতরে বেল্টটাকে বেঁধে নিল। কোনও অসুবিধে নেই অথচ কেমন চমৎকার পোশাকের সঙ্গে ফিট করে গেছে।

বেরিয়ে এসে বলল, জান বেহুলাদি, বাবা একটা জিনিসের মত জিনিস এনেছে, যাতে জানও বাঁচবে মানও বাঁচবে।

এবার জয়িতা বৃদ্ধের পিঠে একটু হাতের ছোঁয়া দিয়ে ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সেদিন কোনও ট্যুরিস্ট এল না কিন্তু পরদিন ভাণ্ডারীমশায় সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ একজন ট্যুরিস্টকে ধরে আনলেন।

স্বাস্থ্যবান যুবক, কালো প্যান্ট, গায়ে হলুদ পুলওভার। পিঠে রুকস্যাক, পায়ে নর্থস্টার জুতো। সুদর্শন, হাসিখুশি।

সিভোক রোডের পাশে একটি হোটেলে ট্যুরিস্টটির থাকার ব্যবস্থা আছে। ওই ছিমছাম হোটেলটির অন্যতম অংশীদার ভাণ্ডারীমশায়।

যুবকটির নাম বার্নার্ড। সে নিজেই নিজের পরিচয় দিল।

জয়িতা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে সোফায় বসতে বলল।

ভাণ্ডারীমশাইও পাশের একটি সোফায় বসে দুজনের কথাবার্তা শুনতে লাগলেন।

জয়িতা গোপাল ভাণ্ডারীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, এঁর ট্যুর প্রোগ্রামটা কি এখুনি ওনার হাতে দিয়ে দেব, না কি হোটেল থেকে ফ্রেস হয়ে লাঞ্চ টাঞ্চ সেরে এলে তখন দেব?

ভাণ্ডারী বললেন, রকেট বাস নটার আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। আমি আগেই ওঁকে নিয়ে হোটেলে গিয়েছিলাম। সেখানে ফ্রেস হয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে এখানে এসেছেন, তুমি প্রোগ্রাম লিস্টটা এখুনি দিয়ে দিতে পার।

মিঃ বার্নার্ড-কে তাদের বিভিন্ন ট্যুর প্রোগ্রামের একটা গাইড বুক জয়িতা ধরিয়ে দিল। বলল, আপনি আপনার পছন্দমত এই লিস্ট থেকে ট্যুর প্রোগ্রামে টিক দিয়ে দিন।

মিঃ বার্নার্ড খানিকক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখলেন। তারপর নির্বাচন করলেন গ্যাংটক সফর, যার শেষ চমক ইয়ুমথাং—ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স।

জয়িতা বলল, আপনি কাল সাড়ে আটটার ভেতর ব্রেকফাস্ট সেরে রেডি হয়ে থাকবেন। আমি আপনাকে ঠিক সময়ে হোটেল থেকে জিপে তুলে নেব।

বাইরে মারুতির স্টিয়ারিং ধরে বসেছিল ড্রাইভার হরি সিং। ভাণ্ডারীমশায় মিঃ বার্নার্ডকে নিয়ে গাড়িতে উঠে গেলেন।

অল্প সময়ের ভেতর ফিরে এসে জয়িতাকে বললেন, দু-তিনদিনের মত খাবার-দাবার তুলে নিতে হবে জিপে। গ্যাংটকে তোমরা থাকবে হোটেল সাংগ্রিলাতে। আমি কিছুক্ষণ আগেই ফোনে বুক করে রেখেছি। ওখানে থেকেই তোমরা লোকাল সাইট সিইং করবে। রুমটেক মনস্টারি দর্শন আর ছাঙ্গু লেক ভ্রমণ হবে। ওখানে রয়েছে চোগিয়াল রাজপ্রাসাদ, ইনস্টিটিউট অব টিবেটোলজি, দোদ্রাল চোর্তেন ইত্যাদি। এ সবই তুমি আমাদের গাইড বুকে পাবে। তাছাড়া হরি সিং-ই জিপ চালিয়ে নিয়ে যাবে, সমস্ত স্পট তার নখদর্পণে। তুমি শুধু বিদেশি অতিথির প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখবে আর তাকে সঙ্গ দেবে।

পরের দিন ঠিক সকাল আটটায় বেহুলাদি টেবিলে ব্রেকফাস্ট সার্ভ করল।

খাওয়া শেষ করে জয়িতা বেহুলার একটা হাত ধরে বলল, আজ আমার চাকরির প্রথম পরীক্ষার দিন, আমি যেন সফল হই এই আশীর্বাদ কর।

বেহুলা জয়িতাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বলল, তোমার ভাল হবে দিদিমণি, কোনও ভাবনা কোরো না।

হোটেল থেকে ঠিক সাড়ে আটটায় মিঃ বার্নার্ডকে তুলে নিল জয়িতা।

জিপ ছুটে চলল মহানন্দা স্যাঙ্কচুয়ারির ভেতর দিয়ে। করোনেশন ব্রিজ, সেভক ব্রিজ একপাশে ফেলে গাড়ি এগিয়ে গেল। এখন পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কান্তিময়ী তিস্তা। চারপাশে মখমল সবুজ ঝোপঝাড়, কোথাও কোনও শব্দ নেই। কেবল জিপের একটানা শব্দ ঘুরে ঘুরে বাজছে।

একসময় পৌঁছে গেল রংপু। পশ্চিমবঙ্গ আর সিকিমের সীমান্ত চেক পোস্ট এখানে।

এরপর জিপ চলল সিংতামের পথে। সিংতাম থেকে যে পথটা রাবংলা, পেলিং, গেজিং হয়ে গ্যাংটকের দিকে গেছে সেই পথ ধরল জিপ।

ছোট ছোট নিসর্গ চিত্রগুলি যেন গান হয়ে প্রাণে বাজছে। ভেসে যাওয়া সাদা মেঘ, সবুজ ঝোপঝাড় অরণ্য, নুড়িতে শব্দ তুলে ছুটে চলা তিস্তা মনের ভেতর গুঞ্জন তুলতে লাগল বার বার।

গ্যাংটকে জিপ যখন এসে পৌঁছল তখন ঘড়িতে একটা।

সাংগ্রিলা হোটেলে লাঞ্চ সেরে ওরা বেরিয়ে পড়ল সাইট সিইং-এর উদ্দেশ্যে।

ছাঙ্গু লেকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল দুজনে। ডিমের আকারে জল টলটলে একটি হ্রদ। হ্রদের থেকে বেরিয়েছে ওয়াটার ফলস। দুষ্প্রাপ্য অর্কিড দেখা যায় ছাঙ্গু লেকের কাছে। রুমটেক গুম্‌ফা দেখতে গেল ওরা। এটি তৈরি হয়েছে তিব্বতের মূল গুম্‌ফাটির অনুকরণে। মাঝে বসে রয়েছেন ঝকঝকে সোনার বুদ্ধ মূর্তি। দেওয়ালে বড় বড় থাঙ্কা, অজস্র জপমন্ত্র আর আছে একটি জয়ঢাক। গুম্‌ফাটি তিনতলা। দোতলায় রয়েছেন কর্মাপা।

ওরা সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখল। পাশেই ইনস্টিটিউট অব হায়ার বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ। দেখার ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো কথা। দুজনে নিচ্ছে দুজনের দেশের খবর।

আকাশের দীপ নিভল। সন্ধ্যার আলোয় সুসজ্জিত গ্যাংটক, যেন দীপাবলির আলোকোৎসব। জিপ নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরতে ঘুরতে ওরা দেখতে লাগল সান্ধ্য গ্যাংটকের রূপবিচিত্রা।

একটি রাত্রি কাটল হোটেলে। কথায়, গল্পে বার্নার্ডের মন ভরিয়ে দিল জয়িতা।

বার্নার্ড বলল, তোমার ইংরিজি উচ্চারণ এত নিখুঁত হল কি করে?

হেসে বলল জয়িতা, আমি কনভেন্টের ছাত্রী ছিলাম।

তোমার সঙ্গে কথা বলে আমার প্রায়ই মনে হচ্ছে তুমি আমাদের ইউরোপের কোনও একটি দেশের মেয়ে।

হাসল জয়িতা, আমি ভারতীয় বার্নার্ড। আমার দেশ আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

বার্নাড হঠাৎ আর একটা প্রসঙ্গের উত্থাপন করল।

তোমার দেশের নাম কিন্তু আজ সারা বিশ্বের মানুষের কাছে ছড়িয়ে পড়েছে।

কি রকম!

বেশ কয়েক বছর তোমার দেশের মেয়েদের মাথায় মিস ইউনিভার্স আর মিস ওয়ার্ল্ডের মুকুট শোভা পাচ্ছে।

এই প্রশংসাটা কিন্তু জয়িতার প্রাণে বাজল না। কেন জানি না সে যখন হোমে ছিল তখন টিভিতে বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতার ছবি দেখেছে।

কত রকমের পোশাক, কত বাহার, কত আলোর ঝলকানি, কত আয়োজন। তার তখন মনে হয়েছিল, এই ডেস্টিটিউট হোমে যখন সব হারানোর দুঃখ তখন এই সব প্রলোভন দেখিয়ে লাভ কি।

তা ছাড়া এত স্বল্প পোশাক পরিচ্ছদে মেয়েদের প্রসেশান করে সবার লুব্ধ দৃষ্টির সামনে দিয়ে চলে যাওয়া তার ভাল লাগেনি।

হল ঘরে থাকত টি. ভি। কারু অনুমতি ছিল না টি. ভি. দেখার। সবাই যখন রাতের বিছানায় চলে যেত তখন সুপার দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বেশ রাত অবধি টি. ভি. খুলে দেখতেন।

দরজার ফাঁকে কোনও কোনওদিন তার চোখে পড়েছে সে দৃশ্য। কিন্তু বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতার দিন সুপারের দিলটা কেমন যেন দরাজ হয়ে গিয়েছিল। তিনি জীবনে বঞ্চিত মেয়েদের বিপুল ঐশ্বর্যের চেহারা দেখিয়েছিলেন।

সে কিন্তু বিছানায় শুয়ে চোখের জল ফেলেছিল সে রাতে।

জয়িতা লক্ষ্য করেছে, বার্নাড একটু বেশি মাত্রায় ড্রিংক করতে ভালবাসে কিন্তু ড্রিংক করে তাকে মাতাল হতে দেখেনি জয়িতা।

অনেক অনুরোধ করেও বার্নার্ড হাফ পেগ হুইস্কি খাওয়াতে পারেনি জয়িতাকে। জয়িতা সঙ্গ দিয়েছে মুখোমুখি বসে কিন্তু পানে যোগ দেয়নি।

খানিকটা অতিরিক্ত পান করার পর বার্নাড কেমন যেন চুপ করে যায়। তার মুখ দিয়ে তখন একটি কথাও বেরোয় না।

মাঝে মাঝে জয়িতা ওর পানীয় তৈরিতে সাহায্য করে। কিছু না বলে ওর দিকে তাকিয়ে সে সময় মৃদু মৃদু হাসে বার্নার্ড।

পুরো একদিন এক রাত্রির পরে ওরা ইয়ুংথাম বা ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্সের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল।

দু-তিনদিনের জন্য গরম কম্বল আর খাবার দাবার, স্টোভ ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে নিয়েছিল ওরা। তা ছাড়া সরকারি অনুমোদন পত্র ছিল ওদের সঙ্গে। রাত্রিবাস করতে হবে লাচুং-এ।

ওদের জিপযাত্রার শুরু ঠিক ভোর চারটেতে। একটানা প্রায় ছ সাড়ে ছ-ঘণ্টা আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথে ওদের যেতে হবে। যে করেই হোক দশ, সাড়ে দশটার ভেতরে ওদের পৌঁছে যেতে হবে চুংথাং। কেননা, এগারোটা বারোটা নাগাদ ডিনামাইট চার্জ করে শুরু হবে নতুন সড়ক তৈরির কাজ।

গাড়ি ছুটে চলেছে লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য। লংস্টক পেরিয়ে ফোদং-এর দিকে যেতে এক অপরূপ দৃশ্য চোখে পড়ল। লম্বা লম্বা কাঁচে গাঁথা সাদা ঝালর কে যেন ঝুলিয়ে দিয়েছে সারা পাহাড়টার গায়ে।

নামছে ঝরনা, পাহাড়ের গা বেয়ে অনেক অনেক নীচের দিকে। সে দৃশ্য ভোলার নয়।

পথের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে হরি সিং। সারা মানচিত্রটা তার মগজে আঁকা হয়ে আছে বহুদিন আগে থেকে।

জয়িতা এ যাত্রায় বার্নার্ডের মতোই শ্রোতা। সে শুধু বলছে, এদিকে দেখ কি সুন্দর দৃশ্য, ওদিকে দেখ ছবির মত সব ঘরবাড়ি। হরি সিং বলে উঠল, লংস্টকের ডানদিকে এক সারি পর্বত দেখতে পাচ্ছেন?

জয়িতা বলল, ওই তো।

ওটা চোলা পর্বতমালা। ওই পর্বতমালার অপরদিকে তিব্বত।

ফোদং-কে পেছনে রেখে গাড়ি পার হল রং রং ব্রিজ। হরি সিং জানাল, এটা এশিয়ার সেকেন্ড হাইয়েস্ট ব্রিজ। তিস্তার চারশো ফুট উঁচুতে এই ব্রিজের অবস্থান।

এবার জিপ চলল মঙ্গনের দিকে। ঝরনার জল ধুয়ে দিচ্ছে পাহাড়ি পথ। তারই ওপর দিয়ে জিপ চলেছে সাবধানে পতন বাঁচিয়ে।

পাহাড়ের গায়ে এখানে ওখানে টুকরো টুকরো জনবসতি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পাহাড়ি ওম্ পথ ধরে ইস্কুলে চলেছে। মাথায় পসরা নিয়ে বাজারে চলেছে পসারিনীরা। উপত্যকা জুড়ে পাইন দেবদারুর সারি। ঝকঝক করছে কাঞ্চনজঙ্ঘার শেষ শৃঙ্গ সিনিয়লচু।

একটি গ্লেসিয়ার থেকে জলধারা নেমে এসে মঙ্গনের পাশ দিয়ে নেমে গেছে অনেক নীচে। সেখানে ওই ধারা যুক্ত হয়েছে আর একটি ধারার সঙ্গে।

এইসব জলধারা পেরিয়ে একসময় ওদের জিপ এসে পৌঁছল চুংথাং। এখানে মিলনলীলায় মেতেছে দুটি উপনদী। লাচুংচু আরে লাচেনচু। এদের মিলনেই সৃষ্টি হয়েছে রূপবতী তিস্তার।

এই চুংথাং থেকেই যেতে হবে লাচুং। পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতা থেকে একেবারে উঠতে হবে, লাচুং-এর ন-হাজার ফুট উচ্চতায়। পথ তেইশ কিলোমিটার, তারই ভেতর কভার করতে হবে চার হাজার ফিট উচ্চতা।

প্রায় সোয়া-দশটা নাগাদ ওরা এসে পৌঁছল লাচুং। পাহাড়কে বেষ্টন করে পথ ঘুরে ঘুরে বাঁক নিয়েছে। পাহাড়ের অর্ধেক সবুজের ছোঁয়ায় মায়াময়। ওপর দিক আকাশ ছোঁয়া কঠিন পাথরে তৈরি। পথের নীচে নীচে অপরূপ শ্যামকান্তিময়ী উপত্যকা। এখানে ওখানে টালির ছাদওয়ালা নানা রঙের কাঠের বাড়ি। যেন হাতছানি দিয়ে পথিককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

পাহাড়ের গায়ে তৃণভোজন করছে সাদা সাদা ভেড়ার পাল। একে বারে নীচে বয়ে চলেছে লাচুংচু নদী। লাচুং-এর আকাশ ছোঁয়া পাহাড়ের মাথাটা তার জটাভার নিয়ে সামান্য নত হয়ে আছে। সেই জটা থেকে ঝাঁপিয়ে নেমে আসছে একটি প্রপাত। শিলাস্তূপে ধাক্কা খেতে খেতে যত সে নীচের দিকে নেমেছে ততই সে হয়েছে প্রশস্ত আর রূপবতী। ওরই গায়ে সিকিম গভর্নমেন্টের ভি. আই. পি. বাংলোটি আঁকা হয়ে আছে ছবির মতো।

জয়িতা বলল, আজ রাতে আমরা এই বাংলোতেই থাকব, জায়গাটা অপূর্ব সুন্দর।

সে বার্নার্ডের মুখ থেকে কিছু মন্তব্য শুনবে আশা করেছিল কিন্তু কোনও সাড়া মিলল না।

হরি সিং বলল, আমাদের লাঞ্চের ব্যবস্থা করতে হবে।

জয়িতা কয়েকটা পাইন গাছ দেখিয়ে বলল, ওর তলায় বসে আজ আমরা পিকনিক করব।

এবার হাসি আর কথা দুই ফুটল বার্নার্ডের মুখে।

দারুণ প্ল্যান! এবার একটা ইচ্ছের কথা তোমাকে জানাই, আজ রাতে গভর্ণমেন্ট বাংলোতে থাকতে ইচ্ছে করছেনা। পাহাড়ের কোলে একটা বাড়ি রাতের মতো ভাড়া করে থাকতে চাই, জায়গাটা একেবারে ড্রিমল্যান্ড। অবশ্য যদি পাওয়া যায়।

জয়িতা বলল, ঐ ছবির মত একটা কাঠের বাড়ি যোগাড়ের ভার কিন্তু আপনার ওপর রইল।

বেশ, পিকনিকের পর তোমরা সরকারি গেস্ট হাউসে রেস্ট নিও, সেই ফাঁকে আমি ভ্যালির বাড়িগুলো ঢুঁড়ে আসব। না পেলে ভি. আই. পি গেস্ট হাউস তো রয়েছেই।

বরাত আছে বটে বিদেশী ভ্রাম্যমানটির। ঘুরে ঘুরে লাল টালির ছাউনিওলা নীলাভ-সবুজ রঙের একটা কাঠের বাড়ি যোগাড় করেছে। সামনে ছোট্ট একচিলতে জমিতে দুটি পাইনগাছ দাঁড়িয়ে। তার তলায় সিজন ফ্লাওয়ারে ঘেরা সবুজ ঘাসের বেড। দুটো সাদা ফোল্ডিং চেয়ার আর একটি টিপয় রাখা আছে সেখানে।

বার্নার্ডের মুখে বাড়ির বর্ণনা শুনেই প্রলুব্ধ হল জয়িতা। ওপরে জিপ-রাস্তা থেকে নীচে বেশখানিকটা নেমে যেতে হবে ওম্-পথ ধরে। একটা ক্ষীণকায়া ঝোরা ডিঙিয়ে দুচারটে ছোটবড় পাথরের চাঁই-এর ওপর পা রেখে সারা শরীরের টাল সামলাতে সামলাতে নামতে হয়।

নেমে আসার পরে একেবারে শান্তির নীড়। বুক ভরে নিশ্বাস নাও। ইচ্ছে হলে বাড়ির গা ঘেঁষে বয়ে চলা ঝর্ণার অভ্র-কুচি জলে পা ডোবাও। ছোট্ট লনে দুজনে মুখোমুখি বসে টুকরো টুকরো কথার ফুলে মালা গাঁথ।

ওপরের রাস্তায় বার্নাড আর জয়িতাকে নামিয়ে দিয়ে হরি সিং-এর জিপ গভর্ণমেন্ট বাংলোর দিকে চলে গেল। ওখানেই কর্মচারী কোয়ার্টারে ওর রাত্রি বাসের ব্যবস্থা। ভোরবেলা ও আবার জয়িতাদের

পিকআপ করে নিয়ে পাড়ি দেবে ইয়ুমথাং-এর দিকে। চব্বিশ কিলোমিটার ভাঙাচোরা পাথুরে পথের শেষে স্বর্গের প্রস্ফুটিত নন্দনকানন ওদের বিস্ময়-দৃষ্টির সামনে তার বহু বর্ণময় পসরা মেলে ধরবে।

রাতের আশ্রয় লক্ষ্য করে ওরা নামছে দুজনে। ওদিকে সূর্যও নেমে যাচ্ছে পাহাড়ের আড়ালে। রোদের রঙ এখন গাঢ় মধুবিন্দুর মত।

সুঠাম সুন্দর দেহশ্রী বার্নার্ডের। তেজী ঘোড়ার মত স্প্যানিস রক্ত বইছে তার দেহে। যদিও দুপুরুষ তারা প্যারিসের বাসিন্দা।

ঘরখানা ছবির মত। পাহাড়ের উঁচু নীচু দুটো স্তর জুড়ে বাড়িটা। তাই মনে হয়, দেড়তলা একখানা বাড়ি।

সম্পন্ন এক সিকিমি পারিবারের সখের বাড়ি এটি। রিটায়ার্ড মানুষটি সস্ত্রীক থাকেন এখানে। ছেলে দুটি ভাল কাজ করে গভর্ণমেন্টের ইলেকট্রিসিটি আর কটেজ ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে। ওরা গ্যাংটকের তিন কিলোমিটার দূরে ওদের পৈতৃক বাড়িতে থাকে।

ওদের থাকতে দেওয়া হল নীচের ঘরখানাতে। চমৎকার ব্যবস্থা। এই দুর্গম পাহাড়ি জায়গাতেও অ্যাটাচড্ বাথ। পাশ দিয়ে বয়ে চলা ঝরণার সঙ্গে ওপরে বসানো ট্যাঙ্কের যোগ আছে। তাই চব্বিশ ঘণ্টা ট্যাপ খুললেই জল পাওয়া যায়। এ কটেজে বিদ্যুতের কোন ব্যবস্থা নেই। রাতের কাজ চলে লণ্ঠনে। ঘরের একদিকে ফায়ার প্লেস আছে। পাথরের বিটের ওপর রাখা আছে এক বান্ডিল শুকনো কাঠ। একটা বাতিদানে মোটা মোমবাতি গোঁজা আছে। পাশেই রাখা আছে একটি দেশলই।

বাড়ির মালিক সস্ত্রীক এই ঘরখানাতেই থাকেন। আজ অতিথিদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিয়ে ওপরের অপেক্ষাকৃত ছোট্ট ঘরটিতে আশ্রয় নিয়েছেন।

ঘরখানা ভালই আবিষ্কার করেছে বার্নার্ড। বাথরুম, ট্যাপ ওয়াটার, ফায়ার প্লেস, কাঠের পাটাতনের ওপর চাদর ঢাকা মোটা পুরু বিছানা। ছোট্ট একটি কাঁচের জানালা। পর্দা সরাতেই দিনান্তের আলোমাখা উপত্যকাটি স্বপ্নের সুসজ্জিতা সুন্দরীর রূপ নিয়ে দেখা দিল।

কিন্তু হঠাৎ বিছানার ওপর বসে পড়ে মনটা দমে গেল জয়িতার। একই বিছানায় বিদেশী যুবকটির সঙ্গে রাত কাটাতে হবে তাকে। ঘরে আর একটা যে বিছানা করবে তার জায়গাই নেই।

পাহাড়ি অঞ্চলে অতিদ্রুত নেমে এলো সন্ধ্যা। শুক্লা চতুর্দসীর চাঁদ নক্ষত্র-সভায় ঝলমল করে উঠল উর্বশীর মহিমায়। ওপর থেকে চঞ্চল চরণে নেমে আসা উপলাহত ঝরণার কলধ্বনিতে বেজে উঠল দেবনর্তকীর রূপোলি নূপুরের ধ্বনি।

এই মুহূর্তগুলো হেলায় হারাবার নয়। কলালক্ষ্মীর রজত কুম্ভ থেকে ঝরে পড়া এই রূপসুধা পান করতে হয় প্রাণভরে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জয়িতা দেখল, লনে একটি চেয়ারে গা এলিয়ে ভ্যালির গভীরে চোখ পেতে বসে আছে বার্নার্ড। একটি অভাবনীয় দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে সেখানে। লাচুং নদী বয়ে চলেছে উপত্যকার গভীরে। সেখানে এখন আলো আঁধারে মাখামাখি এক রহস্য মায়া। মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে উঠছে লাচুং-এর তরল তরঙ্গ। ওদিকে হরজটা থেকে ঝরে পড়া সুরধুনীর মত লাচুং-এর পবতশীর্ষ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া প্রপাত চন্দ্রালোকে বিগলিত করুণার মত জ্যোতির্ময় দিব্যদেহে নামতে লাগল মর্তলোকে।

বার্নার্ডের পাশে অন্য একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল জয়িতা।

বার্নার্ড ফিরে তাকিয়ে বলল, তোমার জন্যে কেমন একখানা আস্তানা আবিষ্কার করেছি বল?

তুমি খুশি তো?

বহুদিন মনে থাকবে। এমন দৃশ্য, এমন নির্জন আস্তানা, তার সঙ্গে এমন এক সঙ্গ।

একথার কোন জবাব দিলনা জয়িতা। কারণ শেষের পাঁচটি শব্দ উচ্চারণের সময় তার দিকে বড় বেশি ঝুঁকে পড়েছিল বার্নার্ড।

পরিস্থিতি রক্ষা করলেন গৃহস্বামী। তিনি লনে এলেন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে। ভদ্রমহিলার হাতে ট্রে। তাতে একপট চা, দুটো কাপ আর সামান্য কিছু ভাজাভুজি।

জয়িতা এবং বার্নার্ড দুজনেই উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ঝুঁকে অভিবাদন জানাল। বার্নার্ড উপরোক্ত হ্যান্ডসেক করলেন গৃহস্বামীর সঙ্গে। জয়িতা ভদ্রমহিলার হাত থেকে ট্রেটা নিয়ে টিপয়ের ওপর রাখার জন্য হাত বাড়াতেই ভদ্রমহিলা অনুচ্চে বললেন, মিসেস, এটুকু কাজ আমাকে করতে দিন। পরে আপনার হাজব্যান্ডকে নিজের হাতে চা পরিবেশন করবেন।

মুহূর্তে কান দুটো গরম হয়ে গেল জয়িতার। সে তাকিয়ে দেখল, বার্নার্ড পাহাড় চূড়ার দিকে হাত তুলে গৃহস্বামীকে কিছু বলছে।

ভদ্রমহিলা তার সঙ্গে কথা বলছিলেন হিন্দিতে। এভাষা বার্নার্ডের আয়ত্বের ভেতর না থাকাই সম্ভব।

আবার মনে হল, বাড়ি খুঁজতে এসে বার্নার্ড এ কাণ্ডটা বাধিয়ে বসেনি তো!

তাছাড়া এখন ভুল ভাঙাতে গেলে যদি হিতে বিপরীত হয়। এখুনি যদি অবৈধ কিছু ভেবে বাড়ি ছেড়ে দিতে বলে।

তারচেয়ে চোখ মুখ আর কান দুটো বন্ধ করে কাটিয়ে দেওয়া যাক রাতটা।

একমাত্র রক্ষে ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাটি কম কথা বলেন।

রাতের ডিনারের কথা তুলতে যাচ্ছিলেন ভদ্রমহিলা, তাঁকে বাঁধা দিয়ে জয়িতা বলল, রাতের জন্যে প্রচুর খাবার আমরা সঙ্গে করে এনেছি। এ নিয়ে আপনি একেবারেই বিব্রত হবেন না।

এরপর স্বামীস্ত্রী দুজনেই, ওদের বাধা সত্ত্বেও, কাপ প্লেট ইত্যাদি ট্রেতে তুলে নিয়ে নিজেদের দেড় তলার ঘরে চলে গেলেন।

যাবার আগে বলে গেলেন, বাইরে আর একদণ্ড বসবেন না। একটু পরেই প্রচণ্ড শীতে কেঁপে উঠবে উপত্যকা। পাথরের চেয়েও কঠিন সে শীত। ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বেলে বসুন, আরাম পাবেন।

ওরা উঠে এলো ঘরের ভেতর। উপযুক্ত গরম পোশাকও মনে হচ্ছিল অকিঞ্চিৎকর।

ঘর বন্ধ করে হাতে রাখা টর্চ টিপে প্রথমে বাতিদানে মোমবাতিটা জ্বালালো জয়িতা। ছোট্ট ঘর আলোয় ভরে উঠল। এবার ফায়ার প্লেসে কাঠ ফেলে আগুন ধরাল সে। হাতপাখা চালাতেই পাতলা কাঠ সহজে জ্বলে উঠল। এরপর মোটা কাঠ রাখল জায়গা মত, যেগুলো দীর্ঘক্ষণ জ্বলবে।

আগুনের কি মহিমা! কয়েক মিনিটের ভেতর আরামদায়ক উষ্ণতায় ভরে উঠল ঘর।

আরাম পাচ্ছ তো?

বার্নার্ড বলল, খুব। আমি কি তোমাকে কোনরকম সাহায্য করতে পারি?

কোন প্রয়োজন নেই। কাঠগুলো যেমন শুকনো তেমনি হাল্কা। সহজেই জ্বলে উঠছে, তার পেছনে আমার একটুও মেহনত করতে হচ্ছে না।

এবার বার্নার্ড বলল, ঘর বেশ গরম হয়ে উঠেছে, আমি কি ভ্যালির দিকের জানালাটা একটু খুলতে পারি?

খুলেই দেখনা। বেশি ঠাণ্ডা মনে হলে বন্ধ করে দেবে।

আমি রাতের ভ্যালিটাকে দেখতে চাই। চাঁদ পালিশ করা রূপোর মত ঝিলিক দিচ্ছে আকাশে। জয়িতার মনে হল, মানুষটি অনেক দূরের দেশ থেকে অনেক কষ্ট আর খরচ করে এ দেশটা দেখতে এসেছে, দেখুক না প্রাণ ভরে। ওর যেমন ইচ্ছে তেমন করে দেখুক।

ফায়ার প্লেসের দিকে তাকিয়েও জয়িতা বুঝতে পারল পেছনের জানালাটা খোলা হয়েছে। সারা উপত্যকা জুড়ে বইছে একটা মৃত্যু-শীতল হাওয়া।

এখনও গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায় শীতের ছোঁয়া লাগেনি। তবু উঁচু পর্বতের বেষ্টনিতে এরই ভেতর বইছে হাড়-কনকনে শীতের হাওয়া।

একটু পরেই বার্নার্ড নিঃশব্দে বন্ধ করল জানালা। আবহাওয়ার পরিবর্তন থেকে তা টের পেল জয়িতা।

বেশ কিছু সময় নীরবতা। ফায়ার প্লেস থেকে শুধু মাঝে মাঝে দগ্ধ কাঠের বুক ফাটা একটা আওয়াজ আর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছে।

জয়িতা বলল, এখনই কি তোমাকে ডিনার সার্ভ করব?

বার্নার্ড ঘড়ি দেখল, প্রায় সোয়া আটটা।

সে বলল, আমার আপত্তি নেই কারণ আমরা তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেতে অভ্যস্ত। তোমার যদি অসুবিধে না হয় তা হলে কাজটা সেরে ফেলা যাক।

ঘুরে বসল জয়িতা।

ব্যাগ থেকে প্রথমে দুটো প্লাস্টিকের প্লেট আর গ্লাস বের করল।

বেশ চমৎকার ফুল তোলা চিত্রিত প্লেটগুলো।

এবার বের করে আনল খাবার প্যাকেট।

ব্রেড, কেক, ডিমসেদ্ধ, তার ওপর দু-তিন রকমের ফল।

একটা ট্যাপের ওপর লেখা ছিল ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। জয়িতা উঠে ঘরের কোণে রাখা একটা স্টেনলেস স্টিলের জাগ তুলে নিয়ে তাতে জল ভরে নিল।

এখন জাগটাকে পাশাপাশি দুটো কাঠের ওপর বসিয়ে সুবিধে মতো রেখে দিল ফায়ার প্লেসের ভেতরে। কভার দেওয়া জাগের ভেতরে গরম হতে লাগল জল।

এবার ডিনারের প্লেট সাজিয়ে ফেলল জয়িতা।

মুখ তুলে বলল, এই অল্প আয়োজনে তোমার কি খুব অসুবিধে হবে বার্নার্ড?

কি বলছ তুমি! কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, মিনারেল, ভিটামিন— সবই আছে, কি নেই!

হেসে বলল জয়িতা, তবে হাই প্রোটিনের অভাব।

বার্নার্ডও সকৌতুকে মাথা দুলিয়ে বলল, দিব্যি চলে যাবে।

ওরা খেতে খেতে গল্প করতে লাগল।

বেশ দেরি হল জল গরম হতে।

খাবার শেষে বার্নার্ডের জন্য ড্রিঙ্কের আয়োজন করে দিল জয়িতা। নিজে কিন্তু প্লেন ওয়াটারই খেল। বার্নার্ডের বিশেষ অনুরোধেও এক চুমুক ঠোঁটে ছোঁওয়াল না। মুখে হাসি টেনে বলল, তুমি খাও, আমি দেখি।

পেগের পর পেগ খেয়ে গেল বার্নার্ড। এতক্ষণ ধরে এত পরিমাণ মদ যে কেউ গিলতে পারে তা ছিল জয়িতার ধারণার বাইরে।

কিন্তু আশ্চর্য, বার্নার্ডকে সে মাতাল হতে দেখল না। মাঝে মাঝে কেবল জয়িতার দিকে মুখ তুলে মৃদু মৃদু হাসছিল।

একসময় পান পর্ব শেষ হল।

জয়িতা বলল, তুমি কি এখুনি ঘুমোবে?

বাঃ! এখুনি ঘুম, রাতটা এনজয় করব বলেই তো এখানে এসেছি।

এখন, কি করতে চাও?

একটা বই সঙ্গে এনেছি, কিছু সময় সেটা পড়ব। তারপর আকাশ, রাতের ভ্যালি, লাচুং নদীর বয়ে চলা দেখব। জানালা খোলার আগে অবশ্যই তোমার পারমিশন নেব। কিন্তু তুমি কি করবে?

আমি ফায়ার প্লেসে টুকরো টুকরো কাঠ ছুঁড়ে আগুনটাকে জিইয়ে রাখব।

ব্যাগ থেকে বইখানা বের করে আধশোয়া অবস্থায় মোমবাতির আলোয় পড়তে লাগল বার্নার্ড। ওর দিকে পেছন ফিরে ফায়ার প্লেসে আগুন উসকে দিতে ব্যস্ত রইল জয়িতা।

কিছুক্ষণ পরে জয়িতার দিকে তাকিয়ে বার্নার্ড বলল, একটু কাছে আসবে কি?

জয়িতা বার্নার্ডের দিকে ফিরে বলল, কেন?

একটা ইনটারেস্টিং অটোবায়োগ্রাফি পড়ছি, শুনবে?

কার?

আমাদেরই দেশ, স্পেনের এক নোবল লরিয়েটের।

কি নাম?

পাবলো নেরুদা।

বেশ পড়ো, ইংরেজিতে লেখা?

না, স্প্যানিশ ভাষায়।—'confiesco quebc vivido : memoirs'

জয়িতা বলল, একজন বিখ্যাত লেখকের আত্মজীবনী, নিশ্চয়ই শুনব।

এবার বইটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটা বিশেষ জায়গায় চোখ রাখল বার্নার্ড।

খানিকটা পড়ে নিয়ে তাকাল জয়িতার মুখের দিকে। কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টি!

জয়িতা বলল, কই শোনাও।

তুমি কি আমাদের ভাষা বুঝতে পারবে।

না। তুমি বরং ইংরেজি করে আমাকে বুঝিয়ে দাও।

বার্নার্ড বলল, নেরুদা তাঁর আত্মজীবনী টুকরো টুকরো এপিসোডের ভেতর দিয়ে বলেছেন। তারই একটা অংশ আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলছি। এ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের একটুকরো সুখস্মৃতি।

গালে হাত দিয়ে উন্মুখ হয়ে বার্নার্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল জয়িতা।

হারনান্‌দেজরা এক অদ্ভুত জাতি। এক মাথা চুল, মুখভরা দাড়িগোঁফ। ওদের সবাইকে যেন একরকম দেখতে।

ওরা এমনিতে চুপ চাপ। সারাদিন খামারে ঝাড়াই মাড়াইয়ের কাজ করে চলে। যখন আমোদে মাতে তখন অফুরন্ত খিস্তি খেউড় বেরোতে থাকে মুখ দিয়ে। মাতাল হলেই নিজেদের ভেতর শুরু হয়ে যায় লড়াই। রাগের মাথায় যা কিছু সামনে পায় তাই ভেঙে গুড়িয়ে দিয়ে চলে যায়।

খাবার সময় একেবারে আনন্দে ডগমগ, তখন কোথায় চলে যায় রাগ। কোমরে বাঁধা পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে গিটার বাজিয়ে গান ধরে।

ভারি শক্ত মাংসল শরীর ওদের। অবিশ্বাস্য দেহের ক্ষমতা।

লেখক একবার ওদের খামারে গিয়ে পৌঁছেছিলেন, আর এক বিচিত্র, অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছিলেন।

এখানেই একটু থামল বার্নার্ড।

কৌতূহলী জয়িতা বলল, থামলে কেন?

হাঁ বলছি। লেখককে ওরা খুব খাতির করল। খাওয়া দাওয়া, নাচ গানে একেবারে মাতিয়ে তুলল আসর। মেয়েরা নাচতে নাচতে পাহাড়ি ঝরণার মত ঝাঁপিয়ে পড়ছে পুরুষদের বুকে। তারপর ঘূর্ণির মত পাক খাচ্ছে যুগলে।

সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি, তার ওপর নাচ গানের হুল্লোড়, এরপর না ঘুমিয়ে কি পারা যায়।

শোবার ব্যবস্থা হল অদ্ভুত। মেয়েরা রইল মোটা কাগজের তৈরি তাঁবুর ভেতর, আর পুরুষরা শুতে গেল খড়ের গাদার পাশে।

এদিক ওদিক ছড়ান পাহাড় প্রমাণ সোনালী খড়ের গাদা। তারই পাশে পাশে কিছুটা খড় বিছিয়ে ঘুমে ঢলে পড়ল মানুষগুলো।

অনভ্যস্ত লেখক কী আর করেন, তিনিও একটি গাদার আড়ালে খড় বিছিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। খড় জড়ানো জুতোজোড়াকে করলেন মাথার বালিশ।

ঘোর অন্ধকার, আকাশে চাঁদ নেই। কেবল নক্ষত্রগুলো মিটমিট করে উঁকি ঝুঁকি মারছে।

কিছুক্ষণের ভেতরেই ঘুমে অচেতন মানুষগুলোর নাক ডাকতে শুরু করল।

লেখকেরও একসময় ঘুম এসে গিয়েছিল। হঠাৎ সে ঘুম ভেঙে গেল। লেখকের মনে হল, একটা ছায়ামূর্তি তার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। লেখক কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলেন।

খড়ের ওপর মৃদু খস খস আওয়াজ উঠছিল।

চিৎকার করে উঠতে গিয়েও গলা দিয়ে লেখকের আওয়াজ বেরোল না। লেখক চুপ করে পড়ে রইলেন।

সেই ছায়ামূর্তি হাঁটুগেড়ে বসল লেখকের পাশে। তার মুখটা নেমে এলো ধীরে ধীরে। ভারী নিঃশ্বাস লেখকের কপালে এসে পড়তে লাগল।

এবার একটা হাত তাঁর দেহকে ছুঁলো। তাঁর সর্বাঙ্গ জুড়ে সে হাত চলতে লাগল গীটারের দ্রুতলয়ের বাজনার মত। তার পর দুটো বলিষ্ঠ বাহু জড়িয়ে ধরল লেখককে। নারী শরীরের গন্ধ, স্পর্শ অনুভব করল লেখক। অতি বলিষ্ঠ সুপুষ্ট এক নারীদেহ।

সে রাতে অপরিচিতা নারীটি তার সমস্ত দেহ উৎসর্গ করল লেখককে। দুর্বার আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ল দুজনে।

লীলা, শেষ করে এবার সেই রহস্যময়ী নারী উঠে গেল নিঃশব্দে।

পরের দিন দুপুরে খাবার টেবিলে বসে যখন সবাই খাচ্ছিল আর মেয়েরা পরিবেশন করছিল, তখন লেখক খুঁজে ফিরছিলেন তাঁর সেই রাতের মোহিনী নর্ম-সঙ্গিনীকে। কিন্তু অধিকাংশই যুবতী এবং বলিষ্ঠ দেহের অধিকারিনী। তাদের ভেতর থেকে অসম্ভব ছিল অপরিচিতা নারীটিকে চিনে নেওয়া।

এক সময় এক বিবাহিতা সুন্দরী সুঠাম যুবতী তার স্বামীর পাতে এক টুকরো মাংস পরিবেশন করে লেখকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ থমকে থেমে গিয়ে চোখ ছোট করে লেখককে রহস্যময় একটুকরো হাসি উপহার দিল।

খাবার পর খামার বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ফিরে আসার সময় লেখক আর পেছন দিকে তাকাননি। কিন্তু তিনি নিশ্চিত জানতেন, দুটি উৎসুক চোখের দৃষ্টি আড়ালে থেকে আছড়ে পড়ছে তাঁর চলার পথের ওপর।

থামল বার্নার্ড।

এ ধরনের একটা নাটকীয় দৃশ্য তার সামনে অভিনীত হবে তা ছিল জায়িতার বহু পল্লবিত কল্পনারও অতীত।

আগুনে কাঠ দেবার অছিলায় সে ঘুরে বসল ফায়ার প্লেসের দিকে। এই মুহূর্তে একজন বলিষ্ঠ পুরুষের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করার ব্যাপারটা ছিল জরুরী।

ঘরের একমাত্র জানালাটা কি খুলে দিয়েছে বার্নার্ড।

কাঠের বাড়ির রন্ধ্র পথ দিয়ে কোন শিকারী কি ছুঁড়ছে শীতেব সুতীক্ষ্ণ এক ঝাঁক শায়ক?

হিম হয়ে এলো জয়িতার সারা শরীর। তার মনে হল বাইরে বসে আছে একটা তুষার-চিতা। সে সুযোগ খুঁজছে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য।

হাত পাগুলো ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। সেকি ঘরের দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছে নাকি!

সামনের দরজার দিকে সে তীক্ষ্ণ চোখ মেলে চেয়ে রইল। যদি জানোয়ারটা হঠাৎ ঢুকে পড়ে তাকে আক্রমণ করে? অমনি তার যষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে সজাগ করে দিল। হাতটা মুহূর্তে চলে গেল কোমরে বাঁধা বেল্টে ঝোলানো তীক্ষ্ণধার কুক্‌রিতে।

তাকে একেবারে হতচকিত করে দিয়ে তুষার-চিতাটা আক্রমণ হানল পেছন থেকে। দুটো শক্ত থাবা সে তার বাহুমূলের ভেতর দিয়ে তত্ক্ষণে চালিয়ে দিয়েছে বুকের দুটো মাংস স্তূপের ওপর।

প্রাণপণ শক্তিতে শরীরটাকে মুচড়ে মুহূর্তে পেছনে ঘুরে গেল জয়িতা। তার লম্বা বিনুনিটা ক্রুদ্ধ একটা সাপের মত পিঠ থেকে ঘুরে আছড়ে পড়ল বুকের ওপর। মাথাভর্তি চুল যেন কালনাগিনীর উদ্যত ফণা। শক্ত মুঠোয় ধরা কুক্‌রির ফলাটা আগুনের কাঁপা কাঁপা আলোয় সাপের জিভের মত লক্ লক্ করে উঠল।

ছিটকে ঘরের এককোণে ভয়ে সিঁটিয়ে পড়ে আছে চিতাটা।

রক্তের স্বাদ নিতে এসে এমন বেকুব বনে যেতে হবে তা ভাবতে পারেনি বার্নার্ড।

একখানা ঘিয়ে রঙের নাইট ড্রেস তার পরণে। সবেমাত্র কম্বলটা সরিয়ে সে জয়িতার কাছ থেকে দেহের উত্তাপ পেতে গিয়েছিল, কিন্তু এমন একটি শীতল রক্তের নাগিনীর মুখোমুখি পড়ে যেতে হবে, তা ছিল তার কল্পনারও বাইরে।

সে শুধু মরা মাছের চোখের মত স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অসম সাহসী অষ্টাদশী মেয়েটির মুখের দিকে।

ততক্ষণে উদ্যত ছোরাখানা খাপের ভেতর পুরে ফেলেছে জয়িতা। ঘটনার আকস্মিকতার জের তখনও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি সে। তবু স্বল্পবাস পরা মানুষটির দিকে সে ছুঁড়ে দিল দু'দুটো কম্বল।

এবার জয়িতা ফায়ার প্লেসের দিকে ফিরে আগুনে কাঠের টুকরো ফেলতে লাগল।

কখন যে ঘুমে জড়িয়ে এলো তার চোখ সে বুঝতেই পারল না। একটা কম্বল টেনে নিয়ে, আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে ফায়ারপ্লেসের ধারে শুয়ে পড়ল সে।

টক্ টক্ টক্ টক্—টুকরো কয়েকটা আওয়াজে ঝাঁকি দিয়ে বিছানার ওপর উঠে বসল জয়িতা।

বাইরের দরজায় কেউ টোকা দিচ্ছে বলে মনে হল।

উঠে দাঁড়িয়ে জয়িতা দেখল, ধনুকের মতো বেঁকে কম্বল মুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে বার্নার্ড।

জয়িতা দরজা খুলতেই ভোরের আলোর সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকে পড়ল।

সামনে দাঁড়িয়ে আছেন গৃহস্বামিনী ধোঁয়া ওঠা চায়ের ট্রে-টি ধরে।

কৃতজ্ঞতায় মাথা নইয়ে চায়ের ট্রে-টা ধরে নিয়ে ঘরে ঢুকল জয়িতা। সিঁড়ি দিয়ে ওপরের ঘরে উঠে গেলেন ভদ্রমহিলা।

টিপয়ের ওপরে ট্রে-টা রেখে হাঁটুমুড়ে বসে দুহাতে বার্নার্ডকে ঠেলতে লাগল জয়িতা, ওঠ, ওঠ ভোর হয়ে গেছে, আর কত ঘুমোবে।

কাল রাতে যেন কিছুই হয়নি. আজ ভোরের আলো ঘরের আর মনের সব অন্ধকার যেন মুছে দিয়েছে।

আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল বার্নার্ড, সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে জয়িতা ধোঁয়া ওঠা গরম চায়ের কাপ ধরিয়ে দিলে।

চায়ে চুমুক দেবার আগে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল বার্নার্ড, সে মুখ ভোরের নরম আলোর মতো নির্মল।

মনে হল বার্নার্ড বুকে বল পেল। সে বলল, তোমার চা?

একমুখ হাসি ছড়িয়ে জয়িতা বলল. আমার না রেখে কি তোমাকে দিয়েছি।

এবার নিজের কাপটা তুলে নিয়ে ঠোঁটে ছোঁওয়াল জয়িতা।

আড়চোখে হাতঘড়িটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, হরি সিং এখুনি এসে যাবে।— বলতে বলতে ওপরের রাস্তায় হরি সিং-এর জিপের হর্ন বেজে উঠল।

ওরা তাড়াতাড়ি চা-টুকু শেষ করে কয়েক মিনিটের ভেতর তৈরি করে নিল নিজেদের।

ঘরের বাইরে এসে দেখল গৃহস্বামী সস্ত্রীক দাঁড়িয়ে আছেন।

পরস্পরে ভোরের অভিবাদন বিনিময় হল।

ভদ্রমহিলার কাছে এগিয়ে গিয়ে নীচু গলায় জয়িতা বলল, কি পেমেন্ট করতে হবে বলুন মাদার?

ভদ্রমহিলা হেসে জয়িতার হাত ধরে বললেন, আমার মেয়ে জামাই যদি একরাত এখানে এসে কাটাত তা হলে আমি কি তার কাছ থেকে কিছু নিতে পারতাম?

এর পর আর কথা চলে না। ভদ্রমহিলার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল জয়িতা,— কৃতজ্ঞতায় উদ্ভাসিত তার মুখ।

ভদ্রমহিলা, তার চিবুকে হাত ছুঁইয়ে বললেন, এই তো আমার উপহার,— তোমার মিষ্টি মুখের হাসিটুকু।

ওপরে এবার ঘন ঘন হর্ন বাজতে লাগল।

চব্বিশ কিলোমিটার পাথর ছড়ানো ভাঙাচোরা পথ পেরিয়ে ওরা এসে পৌঁছল ইয়ুমথাং চেক পোস্টে।

পারমিশান লেটার জমা দিয়ে ওরা ঢুকে পড়ল উপত্যকার ভেতর।

আশ্চর্য এক রূপলোকের দ্বার খুলে গেছে তাদের চোখের সামনে। চারদিকে তুষারাবৃত পাহাড়। মাঝের উপত্যকায় যেন শুরু হয়ে গেছে নন্দনলোকের জলসা। সারা ভ্যালি জুড়ে পাতা হয়েছে বহু বর্ণের চিত্রিত বিশাল একখানা কার্পেট।

সোনালি সূর্যের আলোয় শুরু হয়ে গেছে ফুলের জলসা। কত ফুল, কত রং তার লেখাজোখা নেই। একি তাহলে সত্যিকারের নন্দন কানন! দেবতারা সুবর্ণখচিত তুষার মুকুট পরে বসে আছেন চারদিকে। মুগ্ধ মগ্ন দর্শক।

জলসার ভেতর শুরু হয়ে গেছে লীলাবতী উর্বশীর নাচ। তুষার গলে নেমে আসছে হিমশীতল ধারা। এঁকে বেঁকে নাচতে নাচতে উপত্যকার বুকে আল্পনা আঁকতে আঁকতে এগিয়ে চলেছে দেব-নর্তকী উর্বশী। নৃত্যের তালে তালে অনন্ত যৌবনের সে কি উচ্ছ্বাস! কখন যে দুই রূপমুগ্ধ ভ্রাম্যমান হাতে হাত রেখে উপভোগ করছে সেই স্বর্গীয় দৃশ্য, তা নিজেরাই জানে না।

বার্নার্ড চলে যাবার পরদিন ভাণ্ডারীমশায় জয়িতাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন।

ট্যুরিস্টদের রিমার্ক লেখার জন্য একটা বাঁধান খাতা আছে তাঁর কাছে।

জয়িতা ঘরে ঢুকলে তিনি তাকে বসতে বলে ওই খাতাটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, পড়ে দেখ, সাহেব এতে তোমার সম্বন্ধে কি রিমার্ক করে গেছেন।

বেশ ভারী গলায় কথাগুলো বললেন ভাণ্ডারীমশায়, তাই কেমন যেন চমকে গেল জয়িতা। বার্নার্ড কি খাতায় তার ব্যাপারে কিছু বিরূপ মন্তব্য করে গেছে!

খাতাটা খুলে জয়িতা যথাস্থানে লেখা বার্নার্ডের রিমার্ক পড়তে লাগল।

'আমি বহু দেশ ঘুরেছি, বহু নারী পুরুষের সঙ্গ লাভ করেছি, কিন্তু ভারতবর্ষে এসে আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা হল। ভারতের আকাশে যেমন দীপ্ত রৌদ্রের জ্বালা আছে তেমনি তার জলে স্থলে রয়েছে প্রাণ জুড়ানো কোমলতা। এই দুটো রূপই আমি এক ভারতীয় নারীর ভেতর আবিষ্কার করে অভিভূত হয়েছি,— যে ছিল আমার সিকিম ভ্রমণের গাইড।

রিমার্ক পড়ে জয়িতা মুখ তুলে তাকাল ভাণ্ডারীমশায়ের দিকে।

আশ্চর্য! সেই মুহূর্তে একটা খাম তার দিকে এগিয়ে দিয়ে ভাণ্ডারীমশায় বললেন, কোম্পানীর তরফে এটা তোমার কাজের জন্য প্রথম পুরস্কার।

গণপতি পাণিগ্রাহী আড়ালে দেখা করে বললেন, কি করেছ মা, কর্তা তোমার কাজে একেবারে মুগ্ধ। আমাদের সবাইকে ডেকে বার্নার্ড সাহেবের রিমার্ক পড়ে শুনিয়েছেন।

মৃদু হেসে মাথাটা নীচু করে জয়িতা বলল, অসম্ভব আমুদে আর ভাল মানুষ এই বার্নার্ড সাহেব।

কবিতা লেখেন না তবু কবি। রাতে প্রচণ্ড শীতে ঘরের জানালা খুলে চাঁদের আলোয় ভ্যালির শোভা দেখেন। এমন একটি মানুষকে পায়ে পায়ে সামলে চলতে আমাকে হিমশিম খেতে হয়েছে।

নিজের ঘরে ঢুকে জয়িতা, বার্নার্ডের সঙ্গে তার শেষ বিদায়ের দৃশ্যটা দেখতে লাগল।

রকেট বাসে বার্নার্ডকে তুলে দিতে গিয়েছিল জয়িতা। বাস ছাড়ার সামান্য আগে জয়িতার হাতখানা ধরে বার্নর্ড বলেছিল, সংযমের সীমা ডিঙিয়ে আমি সে রাতে যে কাজ করতে গিয়েছিলাম, সেজনা আমি সত্যি অনুতপ্ত। তুমি আমাকে পারতো ক্ষমা করে দিও জিতা।

জয়িতা বার্নার্ডের হাতখানা জোরে চেপে ধরে বলেছিল, তুমি আমার বন্ধু বার্নার্ড। সে রাতে তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে পারিনি বলে আমিও দুঃখিত। ভারতীয় মেয়েদের কতকগুলো সংস্কার আছে। তা ভালই হোক আর মন্দই হোক, আমরা তা মেনে চলার চেষ্টা করি। তুমি দুঃখ পেয়েছ, আমি তোমাকে ওভাবে আঘাত দিতে গিয়ে কম দুঃখ পাইনি বার্নর্ড। প্রভুর কাছে প্রার্থনা, তোমার ভারত-ভ্রমণ আনন্দের হোক।

বিদায় মুহূর্তে বার্নার্ডের দিকে তাকিয়ে পতাকার মত হাত নেড়েছিল জয়িতা। তার মনটা সেই মুহূর্তে বিদেশী বন্ধুর জন্য ভারী হয়ে উঠেছিল।

রাতে বিছানায় শুতে যাবার আগে জয়িতা তার ব্যাগ থেকে ভাণ্ডারীমশায়ের দেওয়া খামখানা বের করল।

একটা অদ্ভুত সংযম আছে জয়িতার চরিত্রে। ভালখাবার সামনে এলেই খেতে হবে এরকম হাভাতে অভ্যেস তার কোনকালেই নেই। কনভেন্ট অথবা অনাথ-আশ্রমে যখন পিকনিক হত তখন পরিবেশনের দায়িত্বে থাকত সে। সবাইকে খাইয়ে তৃপ্ত করে সবশেষে সে খাবার মুখে তুলতো।

ছেলেবেলা থেকেই তার সেবাগুণ আর সংযমের প্রশংসা করতেন স্কুলের শিক্ষিকারা।

তাই আজ ভাণ্ডারীমশায়ের হাত থেকে পুরস্কারের খামখানা পেয়েও সে তাড়াতাড়ি খুলে দেখেনি। দিনের কাজের শেষে বিশ্রামের সময় সে দেখতে বসল খামের ভেতর কি আছে।

লম্বা খামখানার মুখ খুলে একটা চেক টেনে বের করল জয়িতা। এবার অবাক হওয়ার পালা তার। পাঁচ হাজার টাকার একখানা চেক। আশ্চর্য খেয়ালি এক মানুষ এই ভাণ্ডারীমশায়। ভারী মেজাজী। এই চেক নিয়ে তাঁর কাছে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে গেলেই ধমক খেতে হবে।

চেকটা স্টেট ব্যাঙ্কের। পরদিন ব্যাঙ্কে ছুটল জয়িতা, অ্যাকউন্ট খুলতে হবে।

মধুমঙ্গলকে খুঁজে বের করল সে। ব্যাঙ্কে কোনদিনই তার আসার সুযোগ হয়নি, এই প্রথম।

মধুমঙ্গল জয়িতার নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দিল ব্যাঙ্কে। হেসে বলল, তোমাকে ভাণ্ডারীমশায় চেকটি উপহার দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে যুক্ত করে দিলেন ব্যাঙ্কের কাজের সঙ্গে।

মধুমঙ্গলের অনুমানই সত্য হল। এবার থেকে ব্যাঙ্কের সঙ্গে সমস্ত লেনদেনের দায়িত্ব ভাণ্ডারীমশায় ছেড়ে দিলেন জয়িতার হাতে।

এই আসা যাওয়ার পথে, মধুর আলাপনের ভেতর দিয়ে জয়িতা কখন যে ধীরে ধীরে মধুমঙ্গলের কাছে সরে এল তা যেন সে নিজেও টের পেল না।

একটি অসহায় মেয়েকে চাকরি দিয়ে সুস্থ জীবনের স্বাদ যে এনে দিল তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল জয়িতার অন্তর।

ভারী পরিচ্ছন্ন মনের অধিকারী এই মধুমঙ্গল নামের যুবকটি। কখনও আভাসে ইঙ্গিতে কিংবা কোনওরকম আচরণে সে জয়িতাকে কাছে টানার চেষ্টা করে না। তবু জয়িতা বুঝতে পারে কোথায় যেন একটা অদৃশ্য আকর্ষণে তারা বাঁধা পড়েছে। আজকাল দিনান্তে অন্তত একবার পরস্পরের দেখা না হলে কেমন যেন নিঃসঙ্গ শূন্যতা দুজনের অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই অনুচ্চারিত আকর্ষণকে তারা কখনও প্রকাশের আলোকে টেনে আনে না।

যখন জয়িতা ব্যাঙ্কে বসে মধুমঙ্গলকে কাজ করতে দেখে তখন সে অন্য মানুষ। জয়িতা সে সময়

তার কাছে গেলে শুধু কাজের কথা ছাড়া অন্য কথা বলে না। এতে ক্ষুব্ধ হয় না জয়িতা, মধুমঙ্গলের ওপর তার আকর্ষণ আরও বেড়ে যায়।

এবার একটি আকস্মিক ঘটনায় সে মধুমঙ্গলের পরিপূর্ণ রূপটি দেখতে পেল। শ্রদ্ধা আর বিস্ময়ে ভরে উঠল তার মন।

সেদিন ছিল বাণীবন্দনার দিন। স্কুলে, কলেজে ছাত্রছাত্রীরা মেতে উঠেছিল বাগদেবীর অর্চনায়। আনন্দ কলরবে পূর্ণ ছিল শহরের প্রতিটি গৃহ।

চারদিকের উৎসব উপভোগ করতে করতে পথ চলছিল জয়িতা আর মধুমঙ্গল। হঠাৎ পথের ধারে একটা অফ-হোয়াইট রঙের মারুতিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। দুটো মানুষ গাড়ির কি সব পরীক্ষা করে দেখছিল। অন্যজন পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল গাড়ির একপাশে, তার সম্পূর্ণ মুখটা দেখা যাচ্ছিল না। একসময় কি যেন একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সে ঘুরে দাঁড়াল, অমনি তার পুরো মুখখানা দেখা গেল।

জয়িতা দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল তার দিকে।

আপনি এখানে! কেমন আছেন আপনার মা? তিনি কোথায়?

যুবকটি জয়িতার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। ধীরে ধীরে তার চোখের ওপর একটা ছবি ভেসে উঠল।

গভীর রাত, অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে, আকাশ চিরে ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ, গর্জে উঠছে মেঘ। অসুস্থ মাকে নিয়ে সে চলেছে দার্জিলিঙের পথে। একেবারে অসহায় অবস্থা। পেছনের সিটে বুকের ব্যথায় মা কাতর। সেইমুহূর্তে বিদ্যুতের আলোয় দেবতার আশীর্বাদের মতো এই মেয়েটিকে দেখেছিল পথের ধারে। ওরই সাহায্যে দার্জিলিঙের এক নার্সিংহোমে সে রাতে নিয়ে আসতে পেরেছিল তার মাকে।

আপনি জয়িতা না?

মাথা নাড়ল জয়িতা।

এখানে?

জয়িতা বলল, আপাতত আমি এখানেই আছি একটা ট্রাভেল এজেন্সির কাজ নিয়ে।

পাশে এসে দাঁড়াল মধুমঙ্গল। জয়িতা তার দিকে তাকিয়ে বলল, ইনি বিশিষ্ট রিপোর্টার অতনু বোস আর ইনি আমার বন্ধু মধুমঙ্গল ধর্মপাল, শিলিগুড়ি স্টেট ব্যাঙ্কের অফিসার।

দুজনে এবার নমস্কার বিনিময় করল।

লোক দুটি কিন্তু নিবিষ্ট মনে গাড়িটার আগাপাশতলা নেড়েচেড়ে দেখছিল। এদের দিকে তাদের বিশেষ একটা লক্ষ্য ছিল না।

জয়িতা জানতে চাইল, আপনি একা, মা কোথায়?

কাতর গলায় অতনু বলল, আর বলবেন না, দার্জিলিঙের নার্সিংহোম থেকে বড় কষ্টে নীচে নামিয়ে এনেছি। এখন নর্থবেঙ্গল মেডিকাল কলেজে কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টে ভর্তি আছেন।

মধুমঙ্গল হঠাৎ জানতে চাইল, আপনার গাড়ির কি প্রবলেম?

অতনু বলল, আমার গাড়ির কোনও প্রবলেম নেই, নিজেই এখন পড়েছি একটা কঠিন সমস্যায়।

জয়িতা অমনি বলে উঠল, আর কি সমস্যা মি. বোস?

বলছি,—গাড়ির কাছ থেকে ওদের একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল অতনু।

মধুমঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার জানাশোনা এমন কোনও ভদ্রলোক আছেন যিনি এই গাড়িটা কিনতে পারেন? একেবারে নতুনই বলতে পারেন, এক বছরও হয়নি।

জয়িতা উৎসুক হয়ে জানতে চাইল, আপনি গাড়ি বেচবেন! কেন?

হাতে খরচ চালাবার মতো একটিও টাকা নেই, এদিকে মাকে একা ফেলে কলকাতায়ও ফিরতে পারছি না।

মধুমঙ্গল জিজ্ঞেস করল, ওরা আপনার গাড়ি নিয়ে কি করছে? ওরাই কি কিনবে?

না, ওরা দালাল, ওরা গাড়িটা দেখছে। তারপর দরদাম মোটামুটি স্থির হলে খদ্দের নিয়ে আসবে।

মধুমঙ্গল এবার জয়িতার দিকে তাকিয়ে বলল, লোক দুটির সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হলে তুমি মি. বোসকে আমার কোয়ার্টারে নিয়ে এসো।

মধুমঙ্গল চলে গেল, জয়িতা অতনুর কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ির কাছে গিয়ে দালালদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে জয়িতার কাছে আবার ফিরে এল অতনু। বলল, এখন কোথায় যেতে হবে চলুন।

জয়িতার নির্দেশে গাড়ি এসে দাঁড়াল মধুমঙ্গলের কোয়ার্টারের সামনের রাস্তায়।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমে জয়িতা গিয়ে দোতলায় মধুমঙ্গলের দরজায় নক করল।

দরজা খুলে গেল। জয়িতা ভেতরে ঢুকল।

তোমার পরিচিত মানুষটি কোথায়?

রাস্তায় গাড়িতে বসে আছেন।

ওঁর সঙ্গে তোমার কেমন পরিচয়?

জয়িতা সেদিনের সেই দুর্যোগপূর্ণ রাতের ঘটনাটা সংক্ষেপে মধুমঙ্গলকে জানাল।

মধুমঙ্গল বলল, মায়ের জন্য ভদ্রলোক বড়ই অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছেন, কিছু একটা করা দরকার। তুমি ডেকে নিয়ে এসো ওঁকে।

ওরা এলে অতনুকে অভ্যর্থনা করে বসাল মধুমঙ্গল।

দুএক টুকরো কথার পর সোজাসুজি জানতে চাইল মধুমঙ্গল, এখন আপনার কত টাকা দরকার?

বেশ কিছুক্ষণ ভেবে অতনু বলল, এই মুহূর্তে তো হিসেব করে কিছু বলা যাবে না, তবে হাজার পঞ্চাশেক টাকা হাতে থাকলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারব।

তবে গাড়িটা বেচে কাজ নেই, আমি ব্যাঙ্ক থেকে টাকার একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

অতনু বলল, তা হলে গাড়িটা আপনার কাছেই থাক, টাকা ফেরৎ দিয়ে গাড়িটা নিয়ে যাব।

মধুমঙ্গল হেসে বলল, সে না হয় হবে, এখন আপনি নিজের দরকারে গাড়িটা ব্যবহার করুন।

অতনু অভিভূত হল। সত্যিই সে এমন অপ্রত্যাশিত সাহায্য আশা করেনি।

মধুমঙ্গলের হৃদয়ের আর একটা দ্বার যেন জয়িতার কাছে খুলে গেল। তার মনে হল, মধুমঙ্গলই তার জীবনের কাঙ্খিত পুরুষ।

স্বীকারোক্তি ঃ

সারা বিকেল শেষ বসন্তের মঞ্জরিত শাল অরণ্যে ঘুরে বেড়াল ওরা দুজন। ছায়া আলোর আল্পনায় পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে হাঁটল ওরা, কখনও গানের কলি ভাসিয়ে দিল বাতাসে, কখনও বা শিলাস্তূপের ওপরে গিয়ে বসল হাতে হাত রেখে। টুকরো কথায় মন জানাজানি, বসন্তের ডাল ভরা ফুলে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস।

মধুমঙ্গল জয়িতার হাতখানা নিজের হাতের ভেতর নিয়ে বলল, আজ তোমার জন্মদিনের এই সুন্দর মুহূর্তে আমি তোমাকে একটি ছোট উপহার দিতে চাই। তুমি গ্রহণ করলে আজ আমার চেয়ে সুখী আর কেউ হবে না।

মধুর হাসি ফুটে উঠল জয়িতার চোখে মুখে। চোখের ভাষাতেই ও জানিয়ে দিল ওর সম্মতির কথা।

পকেটে রাখা লাল রঙের ভেলভেটের কৌটো থেকে মধুমঙ্গল বের করল একটি আংটি।

জয়িতার আঙুলে পরিয়ে দিয়ে বলল, এটিকে শুধু একটি আংটি বলে ভাবলে আমার ওপর

অবিচার করা হবে। এর সঙ্গে মিশে আছে অকৃত্রিম যে হৃদয় তাকে তোমার জন্মদিনের উপহার হিসেবে গ্রহণ করলে আমি খুশি হব।

এই মুহূর্তে কেন জানি না জয়িতার চোখ টলটল করে উঠল জলে।

বিচলিত হল মধুমঙ্গল, আমার কথায় কি তোমাকে কোনও দুঃখ দিলাম জয়িতা।

মাথা নেড়ে জয়িতা জানাল, না। মুখে বলল, এ আনন্দের ভার আমি বইতে পারছি না মধুমঙ্গল।

সন্ধ্যায় জয়িতার কোয়ার্টারে ফিরে এল দুজনে।

জন্মদিন উপলক্ষে বেহুলাদি আজ বড় সুন্দর করে সাজিয়েছে ডাইনিং টেবিলটা। সারা দুপুর ধরে নিজের হাতে রান্না করেছে নানা ধরনের খাবার।

বেহুলাদির যত্ন করে তৈরি করা খাবারগুলো ওরা তারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগল আর ছোট ছোট মন্তব্য করতে লাগল।

ওদের দুজনের খাওয়া শেষ হলে বেহুলাদি ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, কেন জানি না আজ তোমাদের একসঙ্গে দেখে বড় ভাল লাগছে আমার।

জয়িতা অমনি বলল, আজ আমরা তোমার শুভেচ্ছা চাই বেহুলাদি।

বেহুলা জয়িতাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমরা যেখানেই থাক, দিদির ভালবাসা সব সময় তোমাদের সঙ্গে থাকবে।

সে রাতে মধুমঙ্গল চলে যাবার পর নিজের শোবার ঘরে ঢুকল জয়িতা।

আজ তার মন ভরে আছে এক অনাস্বাদিত আনন্দে। ভালবাসার প্রথম স্পর্শে তার দেহ মন রোমাঞ্চিত। সে অবাক হল এই ভেবে যে মধুমঙ্গল তার বাবা মা-র পরিচয় একবারও জানতে চাইল না।

বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে পাশের ড্রয়ার থেকে সে মাদারের দেওয়া প্যাকেটটা বের করল। তার মনে হল সে যেন বহু আকাঙ্ক্ষিত একটি গুপ্তধনের গুহায় ঢুকতে যাচ্ছে।

প্যাকেটের মুখটা খুলতে গিয়ে তার হাত কাঁপছিল। কি রহস্য লুকোনো আছে এর ভেতর।

প্রথমে বেরিয়ে এল একখানা চিঠি। ইংরাজিতে লেখা, তার বঙ্গানুবাদ করলে এই দাঁড়ায় ঃ

পরম শ্রদ্ধেয়া মা,

হৃদয়ের অজস্র জ্বালা জুড়োবার আশায় আমার লেখা ডায়েরির কিছু নির্বাচিত অংশ আমি আপনার পড়ার জন্য পাঠালাম। ওর ভেতর থেকেই আপনি আমার অভিশপ্ত জীবনের মোটামুটি একটা পরিচয় পাবেন।

এর ভেতর একলক্ষ টাকার একটি ড্রাফট রইল। আপনি সুযোগমতো আমার কন্যা জয়িতার হাতে এই অর্থটুকু তুলে দেবেন। তবে আমার এ ডায়েরী আপনি পড়লেও আমার কন্যা প্রাপ্তবয়স্কা না হওয়া পর্যন্ত যেন না দেখে।

আমার অন্তরের প্রণতি গ্রহণ করুন।

—সিলভিয়া।

চিঠিখানা পড়ার পরে জয়িতা কেমন যেন এক রহস্যের আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

সিলভিয়া নামের এই বিদেশিনী জয়িতাকে তাঁর কন্যা বলে দাবি করছেন।

ডায়েরির পাতা খোলার আগে এক বুক কান্না যেন তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। তার বাবা বাঙালি, মা কি তাহলে ইউরোপের কোনও দেশের মহিলা?

মাকে দেখার জন্য জয়িতা আকুল হয়ে উঠল। চিঠিতে মায়ের কোনও ঠিকানা দেওয়া নেই। সে এবার ডায়েরি খুলে পাতার পর পাতা ওল্টাতে লাগল, কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আবিষ্কার করতে পারল না মায়ের ঠিকানা।

ঝর ঝর করে জয়িতার চোখ ভাসিয়ে জল ঝরতে লাগল।

কতক্ষণ পরে চোখের জল মুছে সে স্থির হয়ে বসে ডায়েরির প্রথম পাতাটি মেলে ধরল। তারিখবিহীন ডায়েরি।

বন্ধনহীন গ্রন্থি

অপরাহ্নের আলো যখন আরব সাগরের নীল জলে সোনা ছড়ায়, দীর্ঘ নারকেল গাছের সারি থেকে পিছলে পড়া হলুদ আলো যখন বালুতীরে চাইনিজ সিল্কের বিভ্রম জাগায়, তখন আমি বালির ওপর পায়ের ছাপ ফেলতে ফেলতে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

এটাই আমার সমুদ্র-স্নানের সময়। সমস্ত দেহ আমার দিনান্তের এই স্নানটুকুর জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে।

নারকেল বাগড়া আর পাতায় তৈরি আমদের ঘরগুলো সমুদ্র তীর বরাবর চলে গেছে। এখানে আমরা মাথাগুণতি একশো তিনজন থাকি। তার ভেতর গোটা কয়েক বাচ্চাও আছে। যদিও আমরা সন্তান সন্ততি বাড়ানোর বিপক্ষে, তবু অনভিপ্রেত দুচার জন এসে যায়। তখন তাদের ফেলতে পারিনা। তারা সকলের কোলে কাঁধে চড়ে বড় হয়।

আমরা কারু স্বামী অথবা স্ত্রী নই। দেহের প্রয়োজনে আমরা স্ত্রী পুরুষ মিলিত হই। রোজকার রান্নাবান্না করি, বই পড়ি, নাচে গানে মেতে উঠি।

আমাদের নারকেল-কুঞ্জের বাইরের রাস্তায় কিছু দোকানপাট আছে। আমরা দরকার মত ওখান থেকে খাবার জিনিস কিনে আনি। বড় বড় কেটলি ভরে চা নিয়ে আসা হয়। সে সময় ছেলেরা ছোট্ট একটা লাল কিংবা কালো হাফ্ প্যান্টে শুধু নিম্নাঙ্গ ঢাকে। মেয়েদের বেলায় উর্ধাঙ্গ ঢাকার জন্য থাকে অতিরিক্ত একখানা চোলি।

নিজেদের ভেতর আমরা সারাক্ষণ নগ্ন দেহে ঘুরে বেড়াই।

স্বাভাবিক নিয়মে ভোরের আলো ফোটে, সন্ধ্যার ছায়া নামে। কেউ বসে থেকে প্রয়োজন মত সুইচ অফ অন করেনা। হাওয়া ওঠে হাওয়া থামে প্রকৃতির নির্দিষ্ট নিয়মে। কারুর ব্যক্তিগত ভাললাগা মন্দ লাগার ওপর তা নির্ভর করেনা।

এক একটা সমাজ তৈরির জন্য মানুষ যুগ যুগ ধরে অনেক নিয়মের সৃষ্টি করেছে। ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, সেই কঠিন বাঁধনে বাঁধা পড়ে আছে মানুষ।

আমরা এখানে পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে এসে মিলিত হয়েছি একটা বাঁধন হীন মুক্ত সমাজের মধ্যে। যেখানে অপ্রয়োজনীয় বোধে বস্ত্রের বন্ধন আমরা ছিন্ন করেছি। উলঙ্গ জলচর প্রাণী, পশুপক্ষী, পতঙ্গ প্রজাপতি কি পোশাকের অভাবে কুৎসিৎ-দর্শন? তারা স্বাভাবিক, তাই সুন্দর। তাদের সৌন্দর্য ফোটাতে পোশাকের প্রয়োজন হয়না। আমরা প্রকৃতির সেই স্বভাব-ধর্মে বিশ্বাসী।

যে যার দেশ থেকে টাকা আসার একটা ব্যবস্থা আছে। আমরা সব টাকাই একসঙ্গে জমিয়ে রাখি, কারু আলাদা কোন অ্যাকাউন্ট নেই। যেমন হরিণের দল বনের ভেতর যে যার প্রয়োজন মত পাতাপত্র ছিঁড়ে খায়, ঠিক তেমনি আমরাও ভেদ ভাবনা না করে প্রয়োজন মেটাই। এক দলভুক্ত হয়ে একই রকম জীবন কাটাই।

এক এক সময় মনে হয়, একঝাঁক পাখির মত বাতাসে ডানা ভাসিয়ে নীলাকাশের বুকে উড়ে চলেছি। পরিযায়ী পাখিদের মত আসা যাওয়ার চক্রে যেন আমাদের আবর্তন না হয়। আমরা যেন গতির আবেগে নীড় বাঁধার কথা ভুলে ভেসে যাই, শুধু ভেসে যাই। শোক নেই দুঃখ নেই, বিচ্ছেদের ব্যথা নেই, কেবল পথের সাথীদের নিয়ে উদ্দাম আনন্দে মেতে ওঠা।

বড় বিস্ময় লাগে

স্নান সেরে নগ্নদেহে বালির জমিনে পদচিহ্ন এঁকে অপরাহ্নের আলো সারা শরীরে মাখতে মাখতে আমি এগিয়ে চলেছিলাম। নিজের সুঠাম সুন্দর দেহটাকে নার্সিসাসের মত বড় ভালবেসে ফেলেছিলাম আমি।

আমার দলে সকলে কিন্তু প্রায় ভুলে গিয়েছিল আমার আসল নামটি। ওরা আমার নাম দিয়েছিল ভেনাস। প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী।

দূর থেকে চোখে পড়ল, এক পুরুষ-মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রের জলে আধ ডোবা একটা শিলাস্তূপেব ওপর।

গোয়ার আঞ্জুনা বীচে দর্শক সমাগম হয। তাদের প্রধান আকর্ষণ, আমাদের সৃষ্টিছাড়া জীবনযাপন প্রণালীকে দেখা। বিশেষ করে আমাদের দেহগুলো তাদের লালসাকে উদ্দীপ্ত করে।

আজ ভোরে দোকানে বাজার আনতে গিয়ে আমাদেরই এক বন্ধু জেনে এসেছিল, কি কারণে যেন বাস কর্মচারী ইউনিয়ান স্ট্রাইক ডেকেছে। ট্যুরিস্টরা আজ আর আসবেনা।

আমি আরও এগিয়ে যেতে লাগলাম। মানুষটিও ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে লাগল।

প্রায় কাছাকাছি গিয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এমন এক ভাস্কর্য-মূর্তি দেখতে পাব তা ছিল আমার কল্পনারও অতীত।

আমি মিকেলাঞ্জেলোর ডেভিড মূর্তিটি দেখেছিলাম। মনুষ্যদেহের এমন সৌন্দর্য ও লাবণ্য আমি প্রস্তরে দেখতে পাব তা কখনো ভাবিনি। আজ রক্তমাংসের মানুষের ভেতর সেই ডেভিডেরই যেন এক অবিকল প্রতিকৃতি দেখতে পেলাম।

ফুলস্লিভ সাদা গেঞ্জি আর সাদা ফুল প্যান্টে মানুষটিকে যেন শ্বেত পাথরের তৈরি ডেভিড বলেই মনে হচ্ছিল।

হাত থেকে ঝুলছিল টেলিফটো লেন্সযুক্ত একটি ক্যামেরা। আমি নিশ্চিত ছিলাম, ওই প্রিয়দর্শন মানুষটি দূর থেকে আমারই ছবি তুলছিল। কারণ সে সময় সমুদ্রের জলে অথবা তীরে আর কেউ ছিল না।

মনে হচ্ছিল, অনন্তকাল ধরে ওই মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকলেও তৃষ্ণা মিটবে না, কিন্তু শোভনতা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে ভেবে ফিরে দাঁড়ালাম।

সঙ্গে সঙ্গে ওই মূর্তির মুখে ভাষা ফুটল, আমি কৃতজ্ঞ, তোমার স্নানলীলার ছবিগুলো তোলার সুযোগ পেলাম বলে।

আমি সোনালি চুলে ভরা মাথাটা ঘুরিয়ে ওকে উপহার দিলাম একমুখ হাসি।

আর দাঁড়ালাম না। ছন্দিত চরণে সারা অঙ্গে ফিরে চলা ঢেউয়ের মত তরঙ্গ তুলে আমার নারিকেল বীথির আবাসের দিকে অগ্রসর হলাম।

আমি জানতাম, ও আমার দেহ-ছন্দকে নানা অ্যাঙ্গেল থেকে ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

রাতে স্বপ্ন দেখলাম, আমি সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে বহুদূর চলে গেছি।

বিউগলের মত একটা আওয়াজ ভেসে এল আমার কানে।

ফিরে তাকাতেই তীরমুখী একটা ঢেউ আমাকে শূন্যে তুলে মুক্তাখচিত সুনীল সিংহাসনে বসিয়ে দিলে। আর সেই সিংহাসন, হিন্দু নারীদের মত শঙ্খধ্বনি তুলে, বহন করে নিয়ে চলল জলপরীরা।

বাতাসে আন্দোলিত সারি সারি নারকেল তরু সুপুষ্ট ফলভার বক্ষে ধারণ করে, পত্রবাহু ঊর্ধ্বে তুলে লীলাবতী নর্তকীর মত কটিদেশ দুলিয়ে নাচছিল তখন।

আজ সিল্কের একখানা গুরু পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে, সাদা চোস্ত পরে সমুদ্রতীরে এসেছে ও। হাতে উদ্যত ক্যামেরা।

সমস্ত অন্তর থেকে ধ্বনিত হল, 'বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে'।

তুমি অনন্ত চির বসন্ত

সত্যি, এমন বিস্ময়ের ক্ষণ আমার জীবনে আর কখনও আসেনি। দ্বিতীয় দিন সেই শিলাস্তূপের কাছে গিয়ে দেখলাম, আমার স্বপ্নে দেখা পোশাক পরে সে ক্যামেরা তাক করে দাঁড়িয়ে আছে।

তার খুশিতে যুক্ত হল আমার হাসি। ক্লিক করল তার ক্যামেরা।

আমি আজ তার আকুল আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলাম না। সেই শিলাস্তূপের ওপর তারই পায়ের তলায় সিঁড়ির মত একটা খাজে উঠে বসলাম। আমার একখানা পা ছুঁয়ে রইল আরব সাগরের উছলে পড়া জল।

ওপরে বসে ও বলল, তোমার হাতে হাত মেলাতে আমার ভয় করে।

সবিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, কেন?

আমার মনে হয় তুমি সাগরবাসিনী এক জলপরী। তোমাকে মর্তভূমির কোন মানুষের হাত স্পর্শ করলেই তুমি অদৃশ্য হয়ে যাবে।

আমি মর্তের মানবীর কণ্ঠেই হেসে উঠলাম, হাত বাড়িয়ে বললাম, ছুঁয়ে দেখ।

ও আমার হাতে হাত মেলাল। ওর স্পর্শে যে এত রোমাঞ্চ তা বুঝতে পারিনি।

এবার ওর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। বেশ পৌরুষদীপ্ত অথচ রূঢ় নয় লাবণ্যময়।

আমি আঞ্জুনা বীচের বিশেষ এক সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে বন্ধুদের মুখে অনেক কথা শুনেছিলাম। এবার নিজেই এসেছি তা স্বচক্ষে দেখতে।

কেমন দেখলে বন্ধু?

দুদিন ধরে তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে ওই রাস্তার ধারে দোকানে বসে আমি কথা বলেছি। তার ভেতর থেকে সংগ্রহ করেছি নানা তথ্য। অনেক ছবি তুলেছি, তার ভেতর তোমাকে পাইনি। তুমি একেবারে স্বতন্ত্র, অনন্যা। অপরাহ্নের আলোক-দূতী। তোমাকে নিয়ে আমি ছবিতে কতকগুলো কবিতাই সৃষ্টি করে ফেলেছি। দিনান্তের আলোয় দেখা অপরূপা।

কৌতূহলকে সংযত করে বললাম, তাই!

আজ নয়, কাল এমন সময় এখানেই দেখতে পাবে। পানাজিতে প্রিন্ট করতে দিয়েছি।

তুমি কি ফটোগ্রাফার?

বলতে পার। তবে সখের ফটোগ্রাফার।

তুমি কি গোয়াতেই থাক, না বেড়াতে এসেছ?

আমি ট্যুরে এসেছি। আমার একটা পৈতৃক ডেরা আছে, ওয়েস্ট বেঙ্গলে সমুদ্র-সৈকত দীঘার কাছাকাছি।

সেখানেই তোমার ফ্যামিলির মানুষজন থাকেন?

আমার জন্মের এক বছর পরে আমার পিতৃদেব সাধু হয়ে একটি আশ্রমে চলে যান। আমার মা ছিলেন বিশেষ শিক্ষিতা আর ব্যক্তিত্বময়ী এক মহিলা। তাঁরই স্নেহ আর শাসনের ভেতর আমি বড় হয়েছি। গত বছরই মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

এখন তোমার বাড়ি আগলাচ্ছেন কে?

কেয়ারটেকার।

সে কি! তুমি বাড়িতে থাক না?

এয়ারফোর্সে কাজ করি, তাই যেখানে ডাক পড়ে সেখানেই আমার আস্তানা।

এখন কোথায় রয়েছ?

রাজস্থানে।

আমার আর একটি জিজ্ঞাসা আছে, যদি কিছু মনে না কর!

আমি ম্যারেড কিনা জানতে চাও তো?

আশ্চর্য! এমন অব্যর্থ অনুমান তোমার!

যা জানতে চেয়েছ তার উত্তরে জানাই ··নও বিয়ের সময় করে উঠতে পারিনি আমি।

সে কি! বিয়ের সময় পাওনি, না মনের মত মেয়ে পাওনি?

ও আমার কথা শুনে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

সন্ধ্যা নামছিল, পশ্চিম সাগরে সূর্যাস্তের সমারোহ।

আমি সাগর জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্য, সাঁতার কেটে যত দ্রুত সম্ভব ডেরার দিকে এগিয়ে যাওয়া।

ও চেঁচিয়ে বলল, কাল আসছ তো?

আমিও চেঁচিয়ে উত্তর দিলাম, কাল একজন আসবে, পছন্দ হলে তাকে তোমার পার্টনারও করে নিতে পার।

সমুদ্র-হাওয়া আমার মুখের শব্দগুলো উড়িয়ে নিয়ে গেল। জানিনা ওর কানে গিয়ে পৌঁছল কিনা।

রাতে আমি আমার অন্তরঙ্গ বান্ধবী ফ্লোরাকে সবকিছু জানালাম। এও বললাম, যদি ওই মানুষটি আমাকে গ্রহণ করে তাহলে কালই আমি ওর সঙ্গে চলে যাব।

কথাটা শুনে সম্ভবত ফ্লোরার খুব কষ্ট হচ্ছিল, সে সহসা কোনরকম মন্তব্য করতে পারছিল না।

একসময় ওর মুখে কথা ফুটল।

দেখ সিলভিয়া, আমরা সমস্ত সামাজিক বন্ধন ছিঁড়ে ফেলার জন্যেই এখানে মিলিত হয়েছি। তুমি যদি নতুন কোনও বাঁধনে নিজেকে জড়াতে চাও তাহলে কারু কিছু বলার থাকে না। কারণ আমাদের এখানে সকলেই স্বাধীন। চিন্তা, ভাবনা, কর্ম সব দিক দিয়ে। তুমি যা করতে যাচ্ছ, তার ভাল, মন্দ সবরকম ফলই তোমাকে পেতে হবে। তুমি চলে গেলে হয়ত আমার দিন রাত্রি ব্যথায়, শূন্যতায় ভরে উঠবে, তবু প্রার্থনা করব তোমার নতুন জীবন যেন সুখের হয়, পরিপূর্ণ হয়।

আমি ওকে জড়িয়ে ধরলাম, ও আমার বুকে চোখের জল ঝরাল।

সমুদ্রের অশান্ত হাওয়ায় কান্নার সুর, নারকেল পাতার শ্বননে দীর্ঘশ্বাস। বালির নরম গদিতে শুয়ে আছি দুজনে হাতে হাত রেখে, কারু মুখে কথা নেই, কারু চোখে ঘুম নেই।

ভোরের আলোর ছোঁওয়ায় জেগে উঠছে সমুদ্রের নীল রং। কয়েকটা জেলে-নৌকো ইতিমধ্যে বেরিয়ে পড়েছে সমুদ্রের রূপোলি ফসলের সন্ধানে।

ফ্লোরা বলল, আমি আজ আর সবার সঙ্গে ভোরের স্নানে কিংবা রাস্তার ধারে দোকানে যাব না।

কেন ফ্লোরা, সবকিছুকে স্বাভাবিকভাবে নিতে বাধা কোথায়? আমার মনের ভেতর তোর যে ছবিটা আঁকা আছে, তা আমি যেখানে যাই না কেন মুছে যাবে না।

সে আমি জানি সিলভিয়া। তোকে আজ আমি নিজের হাতে সাজিয়ে দেব বলে বাইরের কাজে বেরোব না।

এখানে সাধারণত কেউ কারও খোঁজ রাখে না। সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়ায় আর হাওয়া থেকে, আলো থেকে, জল থেকে, রঙ থেকে আনন্দ কুড়োয়।

কাজ সব ভাগ করা রয়েছে। এক এক গ্রুপ দু'মাস অন্তর রান্নার দায়িত্বে থাকে। তারাই বাজার, রান্না, পরিবেশন সবই করে।

এখন বসন্ত ঋতু, আমাদের গ্রুপের পূর্ণ অবকাশ। উতল হৃদয়ে বসন্তের হিন্দোল।

অবস্থাপন্ন পরিবারের একমাত্র কন্যা আমি। বাবা মা গত হয়েছেন অপরিণত বয়সে।

গ্র্যাজুয়েশন করে আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম বিশ্বভ্রমণে। এখানে এসে আমি বাঁধা পড়ে যাই মুক্ত জীবনের আকর্ষণে। আমার নির্দেশে একটা মোটা টাকার অঙ্ক প্রতি মাসে চলে আসে আমার দেশ থেকে। এত পরিমাণ অর্থ আর কারু দেশ থেকেই আসে না, কিন্তু সে হিসেব রাখতাম না আমি

কখনই। পৃথিবীর সব সম্পদই সকলে সমানভাবে ভোগ করুক এই নীতিতেই আমরা বিশ্বাসী ছিলাম।

প্রথম ভারতে আসার সময় আমি যে কটি মূল্যবান পোশাক সঙ্গে এনেছিলাম আঞ্জুনা বীচের জীবনে সেগুলোর আর কোনও প্রয়োজন হয়নি। তা তোলা ছিল একটা দামি ব্যাগের মধ্যে।

আজ আমাকে সাজিয়ে দেবার জন্যে ফ্লোরা সেই ব্যাগ থেকে পোশাকগুলো টেনে বার করতে লাগল।

একটা সী-গ্রীন রঙের সাদা ফুল তোলা গাউন বের করে ফ্লোরা বলল, এটা তোকে দারুণ মানাবে। মনে হবে বিশ্ববিমোহিনী ভেনাস সদ্য সমুদ্র স্নান করে উঠে এসেছে।

আমি বললাম, এটা আমার খুব প্রিয় পোশাক কিন্তু যার কাছে যাচ্ছি তার দৃষ্টি কি আকর্ষণ করবে।

ফ্লোরা অদ্ভুত একটা কথা বলল, তোর রূপের কাছে যে কোনও আবরণই অর্থহীন। আচ্ছা, সত্যি করে বল তো, তুই কি সঠিক ওর মনের কথাটা জানতে পেরেছিস?

আমি বললাম, বসন্তের হাওয়ায় আর হাসিতে যতটুকু বোঝা যায়। আসলে আমরা কেউ কারো মন বুঝি ন। আভাসে, ইঙ্গিতে যতটুকু ধরা যায়।

তোর জয় হোক সিলভিয়া, বন্ধু হয়ে আমি শুধু এইটুকুই কামনা করছি।

অপরাহ্নে নারকেল বীথিব ভেতরের পথ ধরে এগিয়ে গেলাম আমি। আমার পেছনে ফ্লোরা। সে বসন্তের কিছু ফুল সংগ্রহ করে একটি চমৎকার তোড়া তৈরি করেছে। এই তোড়াটি আমি উপহার দেব আমার অজানা বন্ধুকে।

সবার দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে আমি পোশাকটা পরে নিলাম।

এ এক অদ্ভুত বিপরীত বিধান! নগ্নতাকে ঢাকার জন্যে যে আড়ালের প্রয়োজন হয় তাই আজ আবরণকে আড়াল করার জন্য প্রয়োজন হল।

কিছুদূর আমাকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে এল ফ্লোরা। ফেরার সময় ফুলের তোড়াটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, এটা তোর বিজয় বৈজয়ন্তী।

নারকেল বীথির শেষে শুরু হয়েছে বড় ছোট কতকগুলো গাছের জটলা। তারই আড়াল থেকে আমি দেখলাম, পাথরের স্তূপের ওপব রোজকার মত দাঁড়িয়ে আছে আমার অজানা বন্ধু। তার দৃষ্টি কিন্তু প্রসারিত সমুদ্র তীরের সেই বালুপথটির দিকে, যার ওপর দিয়ে আমি স্নানশেষে রোজ হেঁটে আসি।

আজ আমি চুপি চুপি গিয়ে ওকে পেছন থেকে চমকে দিলাম।

ও অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে। এ রূপ ওর সম্পূর্ণ অভাবিত আর অচেনা!

আমি হেসে ফুলের তোড়াটা ওর দিকে এগিয়ে দিলাম।

ও বলল, ওটা হাতে নিয়ে এমনি দাঁড়িয়ে থাক, তুমি মূর্তিমতী বসন্তের দূতী। বলেই ক্যামেরায় ক্লিক ক্লিক করে আমার কতকগুলো ছবি তুলল। সব কটা ছবিতেই হাসিতে উদ্ভাসিত এক যুবতীর মুখ।

ছবি তোলা শেষ করে ও বলল, আজ তোমাকে নিয়ে আমার ছবির কাজ সম্পূর্ণ হল। আবরণ আর নিরাবরণে তুমি অনন্যা।

আমি বললাম, এবার কি তুমি আমার এই ক্ষুদ্র উপহারটুকু গ্রহণ করবে? একে শুধুমাত্র একগুচ্ছ ফুল বলে ভাবলে আমি দুঃখ পাব।

সঙ্গে সঙ্গে ও ফুলসহ আমার হাত দুটো ধরল। আমরা দুজন পাশাপাশি বসলাম।

ও একটা কথা বলে আমাকে চমকে দিল, তুমি আমাকে আজ ফুলের উপহার দিয়েছ আর সমুদ্রের কাছ থেকেও আমি একটি উপহার পেয়েছি।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, সমুদ্র কি উপহার দিয়েছে?

ও স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাকে।

সেই মুহূর্তে খুশির খবর নিয়ে শিলাস্তূপের গায়ে আছড়ে পড়ল কতকগুলো ঢেউ।

সী-গালগুলো করতালি ধ্বনি তুলে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল।

ও বলল, এবার দেখ তো দেখি নিজেকে চিনতে পার কিনা?

প্যাকেট খুলে একরাশ ছবি সে ফেলে দিল আমার কোলের ওপর।

আমি একটি একটি করে দেখছি আর ভাবছি, এই মেয়েটিই কি সিলভিয়া। কিছুতেই যেন নিজেকে মেলাতে পারছি না এই ছবিগুলোর সঙ্গে।

সব ছবি দেখা হলে ওকে বললাম, তুমি ফোটোগ্রাফার না যাদুকর?

তোমার যেমন অভিরুচি সেইভাবেই আমাকে গ্রহণ কর।

সেই সন্ধ্যালগ্নে আঞ্জুনা বীচের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মনে মনে বন্ধুদের উদ্দেশ্যে শুভকামনা জানিয়ে অজানা জীবনে পাড়ি দিলাম।

এলেম নতুন দেশে

এক নির্বাসিত জীবনের ভেতর কেটে গেল আমার পাঁচ পাঁচটা বছর। যে উন্মাদনা নিয়ে, গৃহ রচনার যে স্বপ্ন নিয়ে আমি সূর্যপ্রকাশ রায়চৌধুরীর হাত ধরে এতদূরে সম্পূর্ণ অচেনা একটা জায়গায় চলে এসেছিলাম আজ তা শূন্যে মিলিয়ে গেল।

যে কাজ নিয়ে সূর্যপ্রকাশ জীবনপথে চলেছিল সে কাজে একটা উত্তপ্ত সুখনীড় রচনা করা কোনওভাবেই সম্ভব ছিল না।

দীর্ঘ ছুটি সে কোনওদিনই পেত না। দু-চারদিন আসতে না আসতেই ওপর থেকে ডাক পড়ত তার। অমনি তাড়া খাওয়া একটা পাখির মত সে ঝড়ের বেগে উড়ে চলে যেত। তখন আমার বেদনা, আমার নিঃসঙ্গতা সম্বন্ধে তার ভাববার কোন অবকাশই থাকত না।

আমি মাঝে মাঝে আমার নিঃসঙ্গ জীবনের কথা উত্থাপন করলেই ও বলত, তোমার কাছে তোমার মেয়ে জয়িতা রয়েছে কিন্তু আমার কাছে তো কেউ নেই। মেয়ের সঙ্গে সারাদিন খেলা করে, তার পরিচর্যা করে দিব্যি তোমার দিন কেটে যেতে পারে, কিন্তু আমার ওখানে শুধু নির্মম বাস্তব, গুরুদায়িত্ব আর কঠিন কর্তব্য।

নারিকেল গাছ বেষ্টিত পুকুরের পাড়ে একটা টিনের ছাউনির ভেতর আমাকে মেয়ে নিয়ে কাটাতে হয়। একজন বৃদ্ধা পরিচারিকা আমার মেয়ের পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল। রান্নাবান্না সব কাজই সে করত, অবশ্য আমি তাকে নানাভাবে সাহায্য করতাম।

প্রায় চার কিলোমিটার দূরে দীঘার সমুদ্র। যখন পুকুরটাকে কূপের জল বলে মনে হত আর তার চারপাশের পরিবেশটাকে অসহ্য লাগত তখন আমি চলে যেতাম দীঘার সমুদ্র সৈকতে। ওটাই ছিল আমার শ্বাস নেবার একমাত্র জায়গা।

আমি ঝাউবনের ভেতর ঘুরে বেড়াতাম। বালির জমিনে বসে চোখ বন্ধ করে সমুদ্রের লবণাক্ত জলের ঘ্রাণ নিতাম। আমার মনে হত, আমি আরব সাগরের তীরে নারকেল বীথির তলায় আঞ্জুনা বীচে বসে আছি।

যদিও চোখ মেললেই তফাতটা বুকে এসে বাজত। সেই নীল জলের কোনও চিহ্নই সামনের সমুদ্রের জলে পেতাম না।

ইদানিং সূর্য দেশে এলেই অশান্তি বাড়ত। শুধু অভিযোগ, অভিযোগ। মেয়ের দিকে আমি ঠিকমত লক্ষ্য দিচ্ছি না, এই অনুযোগ।

আমার কান্না, আমার আক্ষেপে ও অস্থির হয়ে উঠত। মুখে বলত, এরকম পরিস্থিতিতে আমি আর আসছি না।

আমি বলতাম, পাখির মতো আকাশের বুকে তুমি উড়ে বেড়াও, ক্লাব, বন্ধুবান্ধব নিয়ে তুমি মত্ত হয়ে থাক, আমার একাকীত্ব যে কত দুঃসহ তা তুমি কোনওদিনই বুঝতে পারবে না।

আমাদের বিয়ের ন'দশ মাসের মধ্যেই আমার কোলে এসেছিল জয়িতা। আমি সে সময় সূর্যের চোখে সন্দেহের তীর উদ্যত হতে দেখেছিলাম। হয়ত সে ভেবেছিল আমরা যে ধরনের মুক্ত জীবনের ভেতর কাটিয়ে এসেছি তাতে সন্তান সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই ওর মনে জমে ওঠা মেঘের ছায়াটা ধীরে ধীরে সরে গেল। ও দেশে এলেই জয়িতার জন্যে নানা ধরনের খেলনা আনতে লাগল।

এতে আমার বিষণ্ণতা কিন্তু কাটল না।

মাঝ রাতে বিছানায় শুয়ে বঙ্গোপসাগরের গর্জন শুনতে পেতাম। আমার মনে হত যেন আরব সাগরের ঢেউ বুকের তটে এসে আছড়ে পড়ছে।

কোনও কোনও জ্যোৎস্না রাতে আঞ্জুনা বীচের বন্ধুরা সবাই মিলে সমুদ্র-স্নানে মেতে উঠতাম। সে সময় অফুরন্ত আনন্দের স্রোতে আমরা ভেসে যেতাম।

সন্তান স্নেহের বন্ধনের চেয়ে আমার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগল।

সূর্যের সঙ্গে আমার সম্পর্ক দিনে দিনে শিথিল হয়ে আসছিল। জয়িতাকে কেন্দ্র করে অশান্তি একদিন চরমে পৌঁছল।

আমি বললাম, জয়িতার দায়িত্ব তোমাকেও নিতে হবে, আমি একা এর ভার বইতে পারব না।

সেইদিনই সূর্য স্থির করে ফেলল, জয়িতাকে দার্জিলিঙের একটা কনভেন্টে রেখে দেওয়া হবে।

এক ছুটিতে এসে ও নিজেই জয়িতাকে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিয়ে এল দার্জিলিঙের এক কনভেন্টে।

বাড়িতে ফিরে এসে সে একটিও কথা বলল না আমার সঙ্গে। আমিও উপযাচক হয়ে তার কাছ থেকে মেয়ের কোনও খবরই নিলাম না। ও চলে যাবার পর আমি আর ওই কারাগারে একমুহূর্তও থাকতে চাইলাম না। ফিরে এলাম আমার ফেলে যাওয়া আরব সাগর তীরের আস্তানায়।

আমাকে ফিরে পেয়ে সকলের সে কি উল্লাস! আমার মনে যে দ্বিধা ছিল তা নিমেষে কেটে গেল।

রাতে ফ্লোরা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল। এটা তার আনন্দের অশ্রু।

আমাদের দলপতি যে ছিল, যে টাকা পয়সার হিসেব নিকেশ করত, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট-এর সঙ্গে যার সরাসরি যোগাযোগ ছিল, সেই পিটার আমার ফিরে আসা উপলক্ষে একটা ভোজই দিয়ে দিলে।

আমি না বলে চলে যাওয়ার জন্য যে অস্বস্তি বোধ করছিলাম তা আমার মন থেকে দূর হয়ে গেল।

আমি ভাবতে লাগলাম সূর্যের সঙ্গে আমার বছর পাঁচেকের জীবন একটা স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়।

এইভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে আরও ছ'বছর কাটিয়ে দিলাম। সেই উন্মাদনায় ভেসে চলা, জীবনের স্বাদ নিতে নিতে এগিয়ে যাওয়া, একই বৃক্ষের আশ্রয়ে থাকা পাখিদের মত কলরবে মেতে ওঠা, এমনি একটা কল্পিত সুখের স্বর্গে আমি কতদিন বাঁধা পড়ে রইলাম।

একসময় আমার মনে হল, এখানকার জীবন সুখের হলেও কোথায় যেন বৈচিত্র্যের অভাব আছে। একই আবর্তনে, একই স্থানে ঘুরছে জীবন।

একদিন পৃথিবী ভ্রমণের যে স্বপ্ন নিয়ে আমি বেরিয়েছিলাম সে স্বপ্ন আমার পূর্ণ হয়নি। ইদানিং এই জীবনটাও আমার কাছে একঘেয়ে মনে হচ্ছে, আগের মত আর আনন্দ দিতে পারছে না।

আল্‌পসের সংলগ্ন একটা পাহাড়ের কোলে ছিল আমার বাড়ি। তার সামনে ছবির মত লেক, সূর্যস্নাত পাইনের সারি, মাঝে মাঝে বরফ ছুঁয়ে বয়ে আসা হিমশীতল হাওয়া, আমার মনটাকে বিপুল আকর্ষণে টানতে লাগল।

আমার দিন, আমার রাত্রি উন্মুখ হয়ে উঠল, আমার সেই ফেলে আসা দেশে ফিরে যাবার জন্য।

যেই ফিরে যেতে মনস্থ করলাম অমনি জয়িতার জন্য আকুল হয়ে উঠল আমার প্রাণ। এ কি

নাড়ির টান? যাকে সরিয়ে রাখতে চাইলেও সরানো যায় না, ভুলে থাকতে চাইলেও ভোলা যায় না, তাকে কাছে পাবার জন্য মনে মনে পাগল হয়ে উঠলাম।

ফ্লোরাকে জানালাম আমার দেশে ফেরার আকুলতার কথা। দুজনে মিলে যুক্তি করতে লাগলাম কি করে জয়িতাকে পাওয়া যায়।

অবশেষে একটা উপায় বের করলাম। সূর্যকে লিখলাম একটা চিঠি।

প্রিয় সূর্য,

বিবেকের তাড়নায় এত বছর পরেও একটি সত্য তোমার কাছে প্রকাশ করতে চলেছি। তুমি কিভাবে একে নেবে তা আমি জানি না।

যে সময় তোমাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম, আমার গোষ্ঠীর সমস্ত মানুষকে পেছনে ফেলে তোমার হাত ধরে চলে গিয়েছিলাম, সে সময় জয়িতাকে আমি কনসিভ করেছিলাম। যদিও অল্পদিনমাত্র। সে সত্য সেদিন আমি তোমাকে মুখ ফুটে বলতে পারিনি, কিন্তু সেই অন্যায়বোধ আমাকে তিলে তিলে দগ্ধ করছে।

তুমি ইচ্ছে করলে ডাক্তারি পরীক্ষায় এ সত্য আবিষ্কার করতে পার।

আমি তোমার কাছে একটি প্রস্তাব রাখছি, তুমি যদি অবৈধ সন্তান জেনে জয়িতাকে পরিত্যাগ করতে চাও তাহলে আমি তার সমস্ত দায়িত্ব নিতে রাজি আছি।

এ বিষয়ে তোমার সম্মতি-পত্র পেলে আমি নিজেই কনভেন্টে গিয়ে ওকে নিয়ে চলে আসব, অথবা ওখানে রেখেই পড়াব।

তোমার পত্রের প্রতীক্ষায় রইলাম।

—সিলভিয়া

সূর্যের পত্র আর এল না। কিন্তু আমি কিছুদিন অপেক্ষা করার পর আমাদের গোষ্ঠীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্‌পসের কোলে ফিরে গেলাম।

দেশে ফেরার পর কেটে গেল আরও সাত সাতটা বছর। ধীরে ধীরে আমার মন থেকে মুছে গিয়েছিল আরব সাগরের সেই নির্বাধ উদ্দাম জীবন।

কিন্তু হঠাৎ একটা চিঠি এসে আমার মনের মধ্যে দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি করল।

চিঠিখানা এসেছিল প্রায় ভুলে যাওয়া বন্ধু ফ্লোরার কাছ থেকে।

খামের ভেতরে ছিল দু'খানা চিঠি। একটি ফ্লোরা লিখেছে, অন্যটি সূর্যপ্রকাশ।

ফ্লোরার চিঠিতে রয়েছে কয়েকদিন আগেকার তারিখ কিন্তু সূর্যর চিঠির তারিখ সাত বছরেরও আগেকার।

আমি প্রথমে ফ্লোরার সংক্ষিপ্ত চিঠিখানা পড়লাম। ফ্লোরা লিখেছে—

প্রাণের বন্ধু সিলভিয়া,

সপ্তাহ দুয়েক আগে আমি পিটারের ব্যাগ থেকে একটি চিঠি আবিষ্কার করেছি। সেই চিঠিখানা এই খামে ভরে পাঠালাম।

তুমি এখানে থাকতে থাকতেই চিঠিখানা এসেছিল কিন্তু পিটার সে চিঠি তোমার হাতে দেয়নি, লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল তার ব্যাগের মধ্যে। এতে তার একটা স্বার্থ নিহিত ছিল। যে হেভি অ্যামাউন্ট প্রতি মাসে তোমার দেশ থেকে আসত, সেটার একটা ভাগ কনভেন্টে চলে গেলে তার অসুবিধে ছিল। তাই চিঠির কথাটা বেমালুম চেপে গিয়েছিল সে।

এখন মিঃ রায়চৌধুরির চিঠি পড়লে তোমার কাছে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।

তোমার চিরদিনের বন্ধু ফ্লোরা।

সাত বছর আগে আমার চিঠি পাবার পর সূর্য লিখেছিল, জয়িতা আমার কন্যা কিনা তা ডাক্তারি পরীক্ষার দ্বারা সাব্যস্ত করতে লিখেছ। আমি তোমার কথাকেই সত্য বলে মেনে নিলাম, যদিও আমার দৃষ্টিতে সবটাই প্রতারণার।

তোমার কথামতো আমি জয়িতার ওপর সমস্ত অধিকার ত্যাগ করলাম। এখন থেকে তার পূর্ণ দায় দায়িত্ব তোমার। কনভেন্টে অর্থ খরচ করে পড়াবে কিনা, সে বিচার তোমার।

তুমি যে আমাকে স্বেচ্ছায় মুক্তি দিয়ে চলে গেছ সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার নেই।

—এক নির্বোধ প্রেমিক।

এখন আর কোনও উপায় আমার হাতে নেই। কেবল কিছু টাকা কনভেন্টের ঠিকানায় আমি জয়িতার জন্যে মাদারের কাছে পাঠিয়ে দেব। সঙ্গে দিয়ে দেব আমার এই স্বীকারোক্তির কয়েকটি পাতা।

প্রভুর কাছে প্রার্থনা, তিনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার নিরপরাধ কন্যা জয়িতাকে রক্ষা করুন সমস্ত অকল্যাণের হাত থেকে।

মায়ের খাতায় লেখা এই কটি পাতা রুদ্ধশ্বাসে শেষ করে জয়িতার বুক ঠেলে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস।

সে কি তাহলে সত্যই সূর্যপ্রকাশ রায়চৌধুরির সন্তান নয়! না কি, তাকে নিজের কাছে টেনে নেবার জন্য মায়ের সুকৌশল একটা পরিকল্পনা!

সব সূত্রই এখন ছিন্ন হয়ে উড়ে চলে গেছে মহাকালের ঘূর্ণি হাওয়ায়।

অশান্ত মন নিয়ে পরদিনই জয়িতা একটি নির্জন স্থানে মুখোমুখি হল মধুমঙ্গলের।

অনাবৃত করে দিল তার জন্মের সম্পূর্ণ ইতিহাস।

বলল, তুমি আমাকে মুক্তি দাও মধুমঙ্গল। এই কলঙ্কিত জীবন-রহস্যের সত্যটুকু জানার পরে আমি আর কোনভাবেই তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না।

মধুমঙ্গল ওর হাত ধরে বলল, তোমার সঙ্গে প্রথম দিনের পরিচয়ের পরে কতগুলো দিন কেটে গেছে। এর ভেতর আমি কি কোনদিন তোমার মা বাবার পরিচয় জানতে চেয়েছি জয়িতা?

না কিন্তু এখন তো সব জানলে।

দেখ জয়িতা, আমি কুলজি, ঠিকুজিতে আদপেই বিশ্বাসী নই। দেহ মনে সতেজ একজন তরুণী চিরদিনই পুরুষের কাম্য। তোমার ভেতর আমি সেই সম্পদ দেখেই আকর্ষণ বোধ করেছি।

জয়িতা বলল, তোমার সুন্দর সংস্কারমুক্ত একটা মন আছে, কিন্তু তোমাকে একটি পরিবার এবং সমাজের ভেতর বাস করতে হয়। সেখানে আমার মত সমাজ ছাড়া কোন মায়ের মেয়েকে তোমার আত্মীয়েরা মেনে নেবেন কি করে। না মানলে তাঁদের দোষ দিই বা কোন যুক্তিতে।

সে সব প্রশ্নের মীমাংসা নিশ্চিন্তে আমার ওপর ছেড়ে দাও জয়িতা। আমি আমার ফ্যামিলির মানুষজন, আত্মীয়স্বজনদের ভাল করেই চিনি। ওরা শুধু জানবে তোমার মা এক বিদেশিনী, আর তোমার বাবা কাশ্মীরের যুদ্ধে শহিদের মৃত্যু বরণ করেছেন।

আকুল হয়ে জয়িতা বলল, তুমি আমার বাবার মৃত্যুর খবর জানলে কি করে?

একটু আগেই তুমি তোমার ফ্যামিলি হিস্ট্রি আমাকে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছে। যদি ওই এয়ারফোর্সের মানুষটি তোমার বাবা হন তাহলে তাঁর মৃত্যুর খবর আমি কয়েক বছর আগে একখানা ইংরেজি পেপার থেকে জেনেছিলাম। তাঁর ছবিও ছাপা হয়েছিল। উড়ান শেষ করে নিজের ডেরায় ফেরার সময় জঙ্গিদের গুলিতে তিনি প্রাণ হারান।

ঠিক এইটুকু খবর হলে কয়েক বছর আগেকার ঘটনা আমার মনে থাকত না। কিন্তু খবরটা ছিল মৃত্যু-সংবাদের চেয়ে আর একটু বেশি।

গুলিবিদ্ধ মানুষটি মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও মাটিতে শোয়া অবস্থায় শেষবারের মত ঘুরে দ্রুত ধেয়ে আসা তিন তিনজন জঙ্গিকে গুলিতে ধরাশায়ী করেন। তাদের ভেতর দুজন মারা যায়। হাসপাতালে জখম তৃতীয় জনের জবানি থেকে জানা যায় ওঁর অসীম বীরত্বের কাহিনী।

চোখ দুটোতে হাত চাপা দিয়ে কতক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল জয়িতা।

একসময় শান্ত হয়ে চোখ মুছে বলল, এখন তুমি যা ভাল বোঝ তাই হবে।

ঠিক দুদিন পরেই মধুমঙ্গল এল জয়িতার অফিসে। তখন ছুটির সময় হয়ে গেছে।

জয়িতা বলল, কি খাবে বল।

খবর আছে।

আগে খাবার, তারপর খবর। চল কোয়ার্টারে যাই, গুজরাটিকে আজ মাদ্রাজি খানা খাওয়াব।

তাই!

বেহুলাদি বলেছে, আজ আমাকে ধোসা, সম্বর ডাল আর ওই বিশেষ চাটটা খাওয়াবে।

মধুমঙ্গল বলল, দারুণ জমবে। বাঙালি বানাবে মাদ্রাজি খানা আর তাকে খাবে গুজরাটি জেনানা।

জয়িতা অমনি বলল, তুমি কি জেনানা নাকি?

মুখ টিপে হাসল মধুমঙ্গল। বলল, আমি তোমার কথাই বলছি।

জয়িতা বলল, আমার পরিচয়টা হবে, গুজরাটি বরের বাঙালি বউ।

এবার দুজন খুশির মেজাজে অফিস থেকে উঠে চলে গেল অন্দরে।

খাবার টেবিলে খবরটা জানাল মধুমঙ্গল।

আমি গুজরাটে ট্রান্সফার নিয়ে চলে যাবার আবেদন জানিয়েছিলাম অনেক আগে, আজ চিঠি পেলাম, আবেদন মঞ্জুর, এখন তোমাকে নিয়েই ভাবনা। তোমার নতুন রোমাঞ্চকর চাকরিটা তুমি ছাড়তে পারবে?

আশ্চর্য! তুমি থাকবে গুজরাটে আর আমি থাকব শিলিগুড়িতে—এ কথা তুমি ভাবলে কি করে।

তাহলে ভাণ্ডারী মশায়ের কাছ থেকে তোমাকে সবকিছু জানিয়ে বিদায় নিতে হবে। তোমার কাজের প্রশংসায় উনি পঞ্চমুখ।

সেখানেই তো বিপদ। এই কিছুদিন আগে আমার কাজে খুশি হয়ে উনি পাঁচ হাজার টাকা দিলেন। আমি যদি যাবার আগে ওটা ফেরৎ দিতে যাই তাহলে হয়ত দারুণ একটা ধমক লাগাবেন। ওঁর মেজাজ মর্জি বোঝাই দুষ্কর।

সত্যিই তাই। সাহসে ভর করে মধুমঙ্গলকে জীবন-সঙ্গী নির্বাচনের কথা বলতেই ভাণ্ডারীমশায় উল্লাসে ফেটে পড়ে বললেন, হাঁ মেয়ে, এত বড় একটা খুশির খবর এতকাল চেপে রেখেছ কিভাবে!

মাথা নীচু করে জয়িতা বলল, আপনি কি জানেন, ও গুজরাটে ট্রান্সফারের জন্য চেষ্টা করছিল?

ভাণ্ডারীমশায় বললেন, আজই তো বলে গেল অর্ডার এসে গেছে।

জয়িতা মাথা চুলকে বলল, আমি তো ভেবে পাচ্ছি না কি করব। সবে আপনার চাকরিতে ঢুকেছি।

ধমকে উঠলেন ভাণ্ডারীমশায়, মধুমঙ্গল যাবে গুজরাটে আর তুমি থাকবে এখানে, ভেবেছটা কি? স্বামীস্ত্রী থাকবে দুজায়গায় এ আদর্শে আমি বিশ্বাসী নই।

ওদের চলে যাবার আগে ভারি ধুমধাম করে পার্টি দিলেন ভাণ্ডারীমশায়। নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল বৃদ্ধ দাশরথী ছেত্রী।

ভাণ্ডারীমশায় তাকে আর ফিরে যেতে দিলেন না। বললেন, বুড়ো হয়ে গাড়ি টানতে পারে না বলে কি ঘোড়াটাকে কেউ তাড়িয়ে দেয়। তুমি আজ থেকে থাকবে বেহুলার সঙ্গে।

মৃত্যুর পাত্রে অমৃতবিন্দু

আমেদাবাদ থেকে ভুজ হয়ে ওরা চলে এল আনজারে।

মধুমঙ্গলের পৈতৃক নিবাস আনজার। মা, বোন ভগ্নিপতি আর অন্তরঙ্গ প্রতিবেশীরা মিষ্টিমুখ করে বিদায় নিলেন। এতদূর জার্নিতে ক্লান্ত দুজনেই। মধুমঙ্গলের মা সরলাদেবী জয়িতাকে আগলে নিয়ে ঘরের একেবারে অন্দরে চলে গেলেন। ঠিক যেমন করে পক্ষিনী তার শাবকটিকে পক্ষছায়ায় আগলে রাখে।

প্রথম স্নেহ-অভিনন্দনে অভিভূত হল জয়িতা। মধুমঙ্গলের মা যখন তাকে আগলে নিয়ে চলেছিলেন তখন তাঁর হাতের চাপে প্রাণের উত্তাপটি অনুভব করেছিল সে।

এর পর এক শুভ দিনে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের আনন্দ কোলাহলের ভেতর মধুমঙ্গল আর জয়িতার বিয়ের অনুষ্ঠান হল বৈদিক মতে।

সে রাতটি ছিল আলোকোজ্জ্বল, আনন্দ মুখরিত। বিয়ের একাধিক গানে আসর মাত করল মেয়েরা। বৈদিক মন্ত্র পাঠ করে সম্পন্ন হল বিবাহ উৎসব।

এক অসাধারণ ছন্দিত নৃত্য গরবা। কোনও বিশেষ মঙ্গল উৎসবে গরবা দেওয়া গুজরাটিদের একটি রীতি।

কয়েকটা রাত ধরে বন্ধ ঘরে মধুমঙ্গল গরবা শিখিয়েছিল জয়িতাকে।

বিবাহ বাসরে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বরবধূও নাচল গরবা।

মেয়েরা পরেছে ঘাঘরা, চোলি, ওড়না। পুরুষরা পরেছে ধুতি মালকোচা এঁটে। গায়ে কোর্তা, মাথায় লাল, হলুদ পাগ। কাঠি বাজিয়ে ঘুরে ঘুরে সে কী অপূর্ব নৃত্য!

শেষমেশ ঘূর্ণির তালে মাতন লেগে গেল।

নাচ থামলে সবার মুখে প্রশংসা আর ধরে না। বাঙালি মেয়েটি কোথা থেকে শিখল এমন তাল, মান, লয় বজায় রেখে গরবা নাচ!

আনন্দে, উদ্দীপনায় কাটতে লাগল তাদের বিবাহিত জীবন।

যখন কাজে চলে যেত মধমঙ্গল তখন একলা বসে তার মনে হত, সে যেন সব পেয়েছির দেশে এসে পৌঁছেছে।

কেবলই সে ভাবত, তার এত দুর্ভাগ্যের জীবনে এতখানি প্রাপ্তি, এতখানি সম্পদ কি সে ধরে রাখতে পারবে!

কাজের শেষে মধুমঙ্গলের ফিরে আসার সময় হলে তার জন্যে প্রতীক্ষায় কাতর জয়িতার মনে হত সে তার বুকের মধ্যে আপনজনটির আসার-ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে।

বড়সড় একটি ফ্ল্যাট বাড়ির দোতলার ব্যালকনিওয়ালা এক স্যুইটে ওরা থাকত।

ব্যালকনিটি ছিল সাদা রং করা বেতের চেয়ার দিয়ে সাজান। ধারে ধারে ফুলের রঙবাহারি টব।

বাড়ির সামনে সবুজ ঘাসের লন। চারদিকে জাফরি কাটা কম্পাউণ্ড ওয়াল, তারই ভেতর দু-দিকে দুটো শাখা প্রশাখা ছড়ান পত্রবহুল গাছ। রোজ সকাল সন্ধ্যায় পাখিদের ওড়াউড়ি দেখা যায়, শোনা যায় তাদের মন মাতানো কলরব।

ভোরবেলায় দুধ নিয়ে আসে একটি মেয়ে। নির্দিষ্ট কাজ সেরে দিয়ে সে চলে যায়। নিজের হাতে ফ্ল্যাটটি সাজিয়ে গুজিয়ে রাখা, রান্নাবান্না করা, এসব করতে এখন বেশ আনন্দ পায় জয়িতা। দুজনের সংসার—প্রতীক্ষা, সেবা আর মধুর আলাপন নিয়ে একটি আনন্দময় সুখনীড় হয়ে উঠেছে।

মধুমঙ্গলের মা তাঁর মেয়ের বাড়িতেই থাকতেন। এখানে মধুমঙ্গলের চলে আসার পরও কন্যাটি তার মাকে কাছছাড়া করেনি।

জয়িতা তার শাশুড়িকে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি বধূকে অনেক আদর করে বলেছিলেন, সংসারে যেদিন একটি শিশু আসবে সেদিনই আমি তোমাদের কাছে চলে আসব।

সে সাধ আর কোনওদিনই পূর্ণ হয়নি মধুমঙ্গলের মায়ের।

সন্তানধারণের সংবাদটুকুই মাত্র পেয়েছিলেন, নাতি ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

নবজাতকের অন্নপ্রাশনের সময় তার নামকরণ করা হল বাবার নামের সঙ্গে মিল রেখে জয়মঙ্গল। এটি তার পিসিরই অবদান।

ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে লাগল জয়মঙ্গল। মুখখানার আদল একেবারে মায়ের মতো আর হাবভাব, চলাফেরা সব কিছুই যেন ছোট্ট মধুমঙ্গল।

এতদিনে জয়িতা যেন পেল তার সম্পূর্ণতার স্বাদ।

প্রতিদিন সকালে সে ছেলেটির হাত ধরে নিয়ে যায় অল্প দূরে একটি নার্সারি স্কুলে। আবার ছুটির ঘণ্টা পড়লে দ্রুত পায়ে সে চলে যায় ছেলেটিকে আনার জন্যে। জয় যেটুকু সময় ঘরে থাকে না জয়িতার মনে হয় সারা ঘরখানাই শূন্য হয়ে আছে। দৌড়, হাসি, খেলা কলরব নিয়েই শিশুর সঙ্গে মেতে থাকে সে।

পাশের ফ্ল্যাটে থাকে গৌরী বেন। জয়িতার থেকে বছরখানেকের ছোটই হবে। গরবা নাচ আর গানে সে একেবারে ওস্তাদ।

ভারী ভাব তার জয়িতার সঙ্গে। তারও ছোট পরিবার, সুখী পরিবার। দু'মাস হল তার কোলে এসেছে একটি কন্যাসন্তান।

আশ্চর্য! একরত্তি মেয়ে, যখন সে ককিয়ে কেঁদে ওঠে তখন একমাত্র জয়িতার কোলে এলেই শান্ত হয়ে যায়, আর কেউ তাকে থামাতে পারে না।

জয়িতা মাঝে মাঝে তাকে নিজের কাছে নিয়ে চলে আসে।

মায়ের কোলে ফুটফুটে বাচ্চাটাকে দেখলে ছোট্ট জয় কিন্তু একটুও রাগ করে না। সে তার নরম আঙুল দিয়ে ওর গালে আঁকিবুঁকি কাটে।

সে দৃশ্য দেখে দুই জননীর অন্তরে আনন্দ যেন আর ধরে না।

জয়িতা ভাবে, আলো, হাসি, গানে পূর্ণ তার পৃথিবী।

আজ ২৬শে জানুয়ারি, প্রজাতন্ত্র দিবস। স্কুল, কলেজ, অফিস সর্বত্র জাতীয় ছুটির দিন। এই দিনটিকে সার্থকভাবে বরণ করার জন্য চলেছে নানা ধরনের আনন্দ আয়োজন।

এই বিশেষ দিনটিই জয়িতার জন্মদিন। এদিনটি মধুমঙ্গলের উৎসাহে উদ্দীপনায় পালিত হয়।

প্রতি জন্মদিনে স্বামীর কাছ থেকে একটি করে পুরস্কার পায় জয়িতা।

এ বছর মধুমঙ্গল জয়িতার জন্যে হীরে বসান সোনার একটি ব্রোচ তৈরি করতে দিয়েছে।

সকালে জয়মঙ্গলকে তার স্কুলের উৎসবে যাবার জন্য সাজিয়ে দিয়েছে জয়িতা। মধুমঙ্গল ছেলের হাত ধরে তাকে দিয়ে এসেছে স্কুলে। আশপাশের ছোট বড় সব স্কুলগুলো মিলে প্রসেসন করে মাঠে যাবে এমনি ব্যবস্থা হয়ে আছে। জয়িতা ছেলের কপালে পরিয়ে দিয়েছে একটা চন্দনের টিপ। হাতে পতাকা নিয়ে এগোবে যে যার স্কুলের ছেলেরা। নার্সারি স্কুলের বাচ্চারা থাকবে সবার আগে। ওদের ইস্কুলের দিদিমণি বলেছে, জয়মঙ্গল বেশ বুদ্ধিমান ছেলে, ও ফ্ল্যাগ নিয়ে হাঁটবে সবার আগে।

এইটুকুতেই জয়িতা মনে মনে সমস্ত প্রসেসনটার ছবি দেখতে শুরু করেছে।

ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দিয়েই স্যাকরার দোকানে ছুটেছে মধুমঙ্গল। গতকাল দেবার কথা ছিল, হীরেটা বসান হয়ে ওঠেনি। রাতে কাজটা কমপ্লিট করে রাখবে বলেছে দোকানের মালিক।

সকাল ন'টাতেই একটা শুভলগ্ন আছে, ওই লগ্নেই জয়িতাকে একান্তে ব্রোচটা পরিয়ে দেবে মধুমঙ্গল।

ওদিকে প্রসেসন শুরু হয়ে গেছে মাঠের অভিমুখে। ব্রোচটা নিয়ে হনহন করে রাস্তা দিয়ে বাড়ির দিকে আসছিল মধুমঙ্গল।

দূর থেকে প্রসেসনটাকে এগিয়ে আসতে দেখে একটু থমকে দাঁড়াল। দু-দিকে সারি সারি বাড়ি, মাঝখানে অপরিসর গলিপথ। তার ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে প্রসেসন।

দু-দিকের ব্যালকনিতে ছাদে অজস্র মানুষ দাঁড়িয়ে ছাত্রদের প্রসেসন দেখছে। একসঙ্গে এগিয়ে আসছে তিন, চারশ ছাত্র।

এক দিদিমণি চলেছেন একটু তফাতে। সমস্ত প্রসেসনটির সামনে পতাকাটা হাতে নিয়ে দৃপ্ত পা ফেলতে ফেলতে চলেছে তার জয়।

মধুমঙ্গল একবার হাত নাড়ল। পরক্ষণেই সময় পেরিয়ে যায় ভেবেই ছুটে চলল ফ্ল্যাটের দিকে। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে মধুমঙ্গলকে আসতে দেখছিল জয়িতা। তার পাশে শিশু কন্যাকে বুকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল গৌরী বেন।

মধুমঙ্গল হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে পড়ল ফ্ল্যাট বাড়ির ভেতর। মঙ্গল লগ্নটি যে পেরিয়ে যায়।

কেঁপে উঠল ধরিত্রী। অবিশ্বাস্য এক দুলুনিতে টালমাটাল হয়ে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল বাড়িটা। শুধু ওদের বাড়িটাই নয়, মুহূর্তে আনজারের সমস্ত বাড়িঘর, তার মানুষজন সবাইকে নিয়ে এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেল।

প্রসেসনে এগিয়ে আসা প্রায় তিনশো পঞ্চাশ জন ছাত্রছাত্রী তলিয়ে গেল ইট, কাঠ, লোহা, পাথরের বিপুল ভগ্নস্তূপের মধ্যে।

মনে হল প্রাণের কোনও চিহ্ন কখনও যেন কোথাও ছিল না।

চারদিন পরে উদ্ধারকারী দলের সাউন্ড অ্যামপ্লিফায়ারে ধরা পড়ল স্তূপের ভেতরে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। কাটার যন্ত্র চালিয়ে একটু ফাঁক তৈবি করা হল। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দুটি নারী ও একটি শিশু। একটি নারী অনেক আগেই মৃত, তার দেহের বিভিন্ন স্থানে জমাটবাঁধা রক্তের চিহ্ন। বাচ্চাটা অক্ষত, সম্ভবত তার দেহে লেগেছে মায়ের রক্তের ছাপ। তার মুখেও রক্তের দাগ। সম্ভবত ক্ষুধায় সে মায়ের প্রবাহিত রক্তধারাকে চুষে চুষে খাচ্ছিল।

অন্য রমণীটি প্রায় অক্ষত। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় চারদিন অন্ধকার ভগ্নস্তূপের মধ্যে নিরাহারে কাটিয়ে প্রায় চেতনাহীন।

সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক গড়ে তোলা হাসপাতালে স্বেচ্ছাসেবকেরা দ্রুত ওদের সরিয়ে নিয়ে গেল।

আমেদাবাদকে সেন্টার করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছেন রিপোর্টারের দল। গুজরাটের এই অকল্পনীয় ভূমিকম্পের খবব ছড়িয়ে পড়েছে দুনিয়ার দিকে দিকে। কেবল রাষ্ট্রসংঘ, রেডক্রস নয়, পৃথিবীব নানা দেশ বাড়িয়ে দিয়েছে তাদেব সাহায্যের হাত। শত্রু মিত্র ভেদ নেই। ভারত-পাকিস্তান, ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন এক ঠাঁই। সত্যিই বিশ্ব এক নীড়।

গন্ধ শুঁকে জীবিত মানুষকে আবিষ্কারের জন্যে তুরস্ক থেকে এল একদল শিক্ষিত কুকুর। উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে তারা মানুষেব সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল ভগ্নস্তূপগুলির চারদিকে।

মৃত অথবা জীবিতের সন্ধান পেলেই তারা সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে ডাক দিতে থাকে।

এদিকে দেশ দেশান্তর থেকে আসছে খাদ্য, পানীয়, তাঁবু ও তার্পোলিন।

রাজনীতির বিভেদের গণ্ডি ভেঙে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সকলে। পশ্চিমের দেশের সঙ্গে এই সাহায্যের কাজে মিলিত হয়েছে পূবের দেশগুলোও। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, চীন, জাপানের সঙ্গে পাকিস্তানও পাঠিয়ে দিচ্ছে সাধ্যমতো তার সাহায্য।

এসব দেখে মনে হচ্ছে দেশে দেশে বিভেদের গণ্ডি টানে রাজনীতিব মানুষেরা। জাতিতে জাতিতে ভেদরেখার সৃষ্টি করে সমাজপতির দল।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে রিপোর্টার অতনু বোস মৃত্যুর ভেতর থেকে জীবনের ছবি দেখছে।

ধ্বংসস্তূপ থেকে টেন বের করা হল এক মা ও তার দুই সন্তানকে। বাড়ি দুলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মা দুহাতে জড়িয়ে ধরেছিলেন তাঁর সন্তানদের। সবাই মৃত, কিন্তু জননীর স্নেহ মৃত্যুঞ্জয়ী। তাঁর হাতের বন্ধন মৃত্যুতেও শিথিল হয়নি। তাঁর দুটি হাত রিগার মার্টিস হয়ে গিয়েছে। চিতায় তাদের দাহ করতে হল একই সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন অবস্থায়।

খারাপ হয়ে গেছে পোস্টম্যান মোতিলাল পাণ্ডিয়ার মাথাটা। সে বিয়ে করেনি, মায়ের হাতের রান্না খেয়ে সে কাজে বেরোয়। যখন ভূমিকম্প শুরু হল তখন সে পার হচ্ছিল একটা রাস্তা। তার মনে হল পায়ের তলা থেকে রাস্তাটা সরে চলে যাচ্ছে। পথের ওপর গাড়িগুলো কেমন যেন মাতালের মত নাচছে। নাচতে নাচতে কোনওটা বা উল্টে গড়িয়ে গেল। পাণ্ডিয়া টলতে টলতে এগিয়ে যেতে লাগল বাড়ির দিকে। চারদিকের বাড়িগুলো তখন মহাশ্মশান।

মোতিলাল চিৎকার করে তার মাকে ডাকতে লাগল। বিরাট স্তূপগুলির ভেতর থেকে যেন মন হল একটা প্রতিধ্বনি জেগে উঠছে। তার মায়ের একটা শাড়ি ঝুলছিল ব্যালকনি থেকে। ব্যালকনি ভেঙে পড়ায় সেই শাড়ি চাপা পড়েছিল সিমেন্ট আর রাবিশের স্তূপে। তার একটুখানি আঁচল বেরিয়েছিল বাইরে। সেটাকে ধরে প্রাণপণে টানতে লাগল মোতিলাল পাণ্ডিয়া। একখণ্ড ছেঁড়া টুকরো তার হাতে চলে এল। সে টুকরোটা পতাকার মত হাতে ওড়াতে ওড়াতে ধ্বংসস্তূপগুলোর পাশ দিয়ে ছুটছে আর হাঁকছে, 'চিট্‌ঠি আয়ি হ্যায়'।

হাজার হাজার মৃতদেহ জড় হচ্ছে ধ্বংসস্তূপের পাশে পাশে। আমেদাবাদ, ভুজ, বাচাউ, আনজার—যেখানেই ভগ্নস্তূপ সেখানেই দাউ দাউ করে জ্বলছে চিতা।

কাঠ আসছে বহুদূর থেকে। এখন এক একজনকে দাহ করা সম্ভব নয়। জ্বলছে গণচিতা। একসঙ্গে পোড়ান হচ্ছে আট দশটি মৃতদেহ।

পুত নামক নরক থেকে উদ্ধার করার জন্যে যে পুত্রের জন্ম সেই এখন পিতামাতার সঙ্গে আরোহণ করছে একই চিতায়।

পেশায় ডোম নন, তবু মানুষের মঙ্গলের জন্যে হরসুখনলাল ভাট রাতদিন সৎকার করে চলেছেন মৃতদেহ।

নীতিন হরসুখন দাহের কাজ করছেন আর মুখে উচ্চারণ করে চলেছেন গায়ত্রীমন্ত্র—ওঁ ভূর্ভুবস্ব তৎসবির্তুবরেণ্যম্...।

হরসুখন এখন সবার পুত্র হয়ে পারলৌকিক কাজ করে চলেছে।

মানুষের এত বিপর্যয়, এমন মৃত্যু-মিছিলের মাঝখানেও বৈরাগ্যের চিহ্নমাত্র নেই। জেগে উঠেছে অন্তরের আদিমতম প্রবৃত্তি।

সমস্ত ধ্বংসস্তূপ ঢুড়ে বেড়াচ্ছে লুটেরার দল। সরকার থেকে পুলিশ পাহারা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রাতে যখন ভগ্নস্তূপের ফাঁক ফোকরের ভেতর দিয়ে বোঁ বোঁ করে একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসতে থাকে তখন চমকে ওঠে প্রহরারত পুলিশ। মনে হয় যেন যক্ষপুরীর রাজা ভয়ঙ্কর নিঃশ্বাস ছেড়ে তস্করদের দূরে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

অন্যদিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মানুষের পার্থিব সম্পদের প্রতি তীব্র একটা আকর্ষণ।

ভূমিকম্পের সময় বাইরে ছিল বলে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল একটি মানুষ। ফিরে এসে দেখে, বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে দুমড়ে মুচড়ে। স্ট্রাকচারটি ছাড়া বাকি সব ধসে পড়ে গেছে। বাড়ির একজনও বাসিন্দা বেরিয়ে আসতে পারেনি বাইরে।

মানুষটিরও মা বাবা আর স্ত্রী হারিয়ে গেছে রাবিশের স্তূপে।

তবু বসে আছে সে।

অতনু জানতে চেয়েছিল, কি আশা বুকে বেঁধে আপনি বসে রয়েছেন এখানে? তাকিয়ে থাকলে তো ওঁরা আর ফিরে আসবে না দাদা। বড় দুঃখের হলেও এটি নির্মম সত্য।

লোকটি উত্তর করেছিল, সে আমি ভাল করেই জানি। কিন্তু আমার কয়েক গোছা নোট আছে আলমারির ভেতর। সেগুলোকে পাহারা দিয়ে বসে থাকতে হয়েছে, বুলডোজার এসে যখন সমস্ত সরিয়ে নেবে তখন আমার তোবড়ানো আলমারিটার ভেতর থেকে ওই নোটগুলো পেয়ে যাব। নইলে আমার হকের ধন বারভুতে লুটে নেবে।

বাচাউতে ঘুরতে ঘুরতে অতনু দেখল, অক্ষত নেই একটি বাড়িও। তবু একটা ভাঙা বাড়ির সামনে বসে আছেন বিবাহিতা এক মহিলা।

ওঁর সঙ্গে কথা বলে যা জানা গেল—নির্জলা উপবাস করে তিনদিন ঠায় বসে আছেন সাবিত্রী বেন। তিনি প্রতীক্ষা করছেন তাঁর স্বামীর জন্য। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি সতী সাবিত্রী, তাই তাঁর স্বামী উঠে আসবেন ওই মৃত্যুকুণ্ড থেকে।

ওঁরা ভূমিকম্পের কয়েক মুহূর্ত আগে বাজার করতে বেরিয়েছিলেন স্বামী স্ত্রী। ঘরে ছিলেন একমাত্র অশক্ত শ্বশুরমশায়।

রাস্তায় সবে পা রেখেছেন হঠাৎ দুলে উঠল সারা শরীর।

ফিরে তাকিয়ে দেখেন, তিনতলা বাড়িটা টলছে মাতালের মত।

ওঁর স্বামী বাবা, বাবা বলে চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে ছুটলেন বাড়ির দিকে। ঘরের ভেতরে ঢুকে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন পৃথিবীর অন্ধকার গহ্বর গ্রাস করে নিল বাড়িখানা।

সেই থেকে স্বামীর প্রতীক্ষায় বসে আছেন সাবিত্রী বেন।

অতনু প্রবোধ দিয়ে বলল, আপনার পিতৃভক্ত স্বামী চির অমর হয়ে গেছেন। তাঁর জন্যে শোক বা প্রতীক্ষা করবেন না। এ যুগে এমন পিতৃভক্তি দুর্লভ।

চোখ মুছে সাবিত্রী বেন বললেন, আমাকে আমার বাবা মা ছেড়ে সব দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছিলেন আমার শ্বশুরমশায়।

বলতেন, ছেলেদের কিছু ত্যাগ করতে হয় না, মেয়েরা সবকিছু ত্যাগ করে বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি চলে আসে। তাই তাদের মনে দুঃখ দিতে নেই, ভালবেসে আপন করে নিতে হয়।

অতনুর সান্ত্বনা আর সাহায্যে কমিউনিটি কিচেনে গিয়ে অনশন ভঙ্গ করলেন সাবিত্রী বেন।

জীবন থেমে থাকে না, চলার গতি কখনও স্তব্ধ হয় না। দৃষ্টির আড়ালে বুকের আঁধার সরোবরেই তো ফুটে ওঠে হৃদকমল।

মা বাবা আপনজনদের হারিয়ে শত শত শিশু ঠাঁই নিয়েছে একই আশ্রয়ে। তারা এখন একই সঙ্গে খায়, একই সঙ্গে খেলাধুলো করে আব একই আকাশের নীচে ঘুমোয়। আবেদ আর অসীম পাশাপাশি শুয়ে আছে পরস্পরের বুকে হাত রেখে।

ধ্বংসের ওপরে সৃষ্টির বীজ পড়ে, তার থেকেই জেগে ওঠে শত শত ফুল—শত সহস্র জীবন।

আমেদাবাদে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় গণবিবাহ, এবারও তার ব্যতিক্রম নেই। গুজরাটের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতি বছরই আসে বর বধূ এবং তাদের সঙ্গীরা। অত্যন্ত আনন্দ এবং উল্লাসের সঙ্গে বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়।

এবারও ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে উপেক্ষা করে পঞ্চাশের অধিক দম্পতি আবদ্ধ হয়েছে বিবাহ বন্ধনে। কেবল ব্যতিক্রম সোনার সাজে বধূকে সাজান যাবে না। সেই নিরলঙ্কার সজ্জাতেই তারা একে অপরের কাছে অপরূপ হয়ে উঠেছে।

অতনু ঘুরতে ঘুরতে দেখল, আমেদাবাদ স্টেশনে ট্রেন থেকে নামছেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষজন। তাঁদের পরিবারের যাঁরা কর্মসূত্রে গুজরাটে রয়েছে, তাদের খোঁজখবর নেবার জন্যে আসছেন এঁরা।

এক ভদ্রমহিলা এসেছেন হাওড়া থেকে, তাঁর ছেলেটি ভুজ শহরে একটি সোনার দোকানে কাজ করে। ছেলের কোনও খবর না পেয়ে তিনি কাতর হয়ে চলে এসেছেন। এমন কিছু শিক্ষাদীক্ষা নেই, পথঘাট কিছুই চেনেন না, তবুও এসেছেন প্রাণের তাগিদে।

হাতে ছেলের ঠিকানা লেখা ময়লা একটুকরো কাগজ। এখানে জানা না জানার কোনও প্রশ্নই নেই। সন্তানের খোঁজে সারা পৃথিবী পায়ে হেঁটে ঘুরতে পারেন একমাত্র তার মা।

অতনু আমেদাবাদ থেকে ট্রেকারে করে মহিলাকে নিয়ে চলল ভুজের দিকে। ভাঙা পথঘাট, ব্রিজ এখনও সম্পূর্ণ জোড়া লাগেনি। তবু তাঁরা একসময় ঠিকানায় লেখা বড় রাস্তার ধারে এসে পৌঁছলেন।

যেখানে সারি সারি দোকান ছিল সেখানে সব মাঠ হয়ে গেছে। বড় রাস্তার সঙ্গে এসে মিশেছে যে গলিপথ, যেখানে বিশেষ একটি বাড়িতে থাকত তার ছেলে সেখানে পথের কোনও চিহ্নমাত্র নেই, শুধু রাবিশের স্তূপ।

ভদ্রমহিলা বুক চাপড়ে, মাটিতে মাথা খুঁড়ে কাঁদতে লাগলেন।

অতনু তাঁকে কমিউনিটি কিচেনে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালো। তাঁর থাকার একটা ব্যবস্থা করে বলল, মা, দু-তিনদিন আপনি এখানে থাকুন, আমি খুঁজে দেখছি।

ঠিক দুদিনের মাথায় সরকারি ইনফরমেশন ব্যুরো থেকে ছেলেটির খোঁজ পেল। পায়ে চোট লেগে সে ভর্তি আছে তাঁবুর তৈরি ইমারজেন্সি হাসপাতালে।

খবর পেয়ে ভদ্রমহিলা আকুল হয়ে অতনুর সঙ্গে হাসপাতালে চলে এলেন ছেলেকে দেখতে।

মা ছেলের মিলন হল। ছেলে এখন প্রায় স্বাভাবিকভাবেই হাঁটছে।

ভদ্রমহিলার চোখে জল, ছেলের মাথাটা বুকের কাছে চেপে ধরে হাত বুলিয়ে দিলেন।

পরক্ষণেই ফিরে দাঁড়ালেন অতনুর দিকে। তার হাতটা ধরে বললেন, তুমি আমার আর এক ছেলে বাবা, তোমার জন্যে আমি আমার রঘুকে ফিরে পেলাম।

কিন্তু সেই হাসপাতালে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী ভাগ্যদেবীর এক আশ্চর্য লীলার রূপ দেখতে পেল অতনু।

এতগুলো বছর পরেও ঠিক তার চোখ চিনে নিতে পেরেছে বিশেষ চেনা একটি মুখকে। সে তার পূর্ব পরিচিতা মহিলাটির দিকে এগিয়ে গেল।

একেবারে কাছে গিয়ে বিস্ময় আর আবেগজড়িত গলায় বলল, তুমি এখানে জয়িতা!

দুটো বড় বড় চোখ মেলে অতনুর মুখের দিকে চেয়ে রইল জয়িতা। সে দৃষ্টির ভেতর কেমন যেন শূন্যতা। পলক পড়ে না চোখে।

একসময় ভাসা ভাসা চোখের কোণ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল জলের ধারা। ঠোঁটখানা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। পাশে শুয়ে আছে একেবারে বাচ্চা মেয়েটি। সে নিজের মনে খেলা করছিল আর অবোধ্য একটা ধ্বনি তুলছিল।

অতনু হাতটা বাড়িয়ে দিল জয়িতার দিকে। সে হাতখানা কপালের দিকে টেনে নিয়ে জয়িতা কান্না ঢাকার চেষ্টা করল।

মা তাঁর ছেলেটিকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে দেশে ফিরে গেলেন দু-একদিন পরে।

জয়িতার দেহে কোনও আঘাত ছিল না, মেন্টাল একটা শকে সে ভুগছিল। এ সময়ে সে একজন নিজের মানুষকে কাছে পেয়ে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

সে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানাল, আমি আমার ভায়ের সঙ্গে দেশে ফিরে যেতে চাই।

সম্মতিও মিলল। অতনুর সঙ্গে সে ওই শিশুটিকে বুকে নিয়ে ফিরে এল কলকাতায়।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই অতনু ডাক দিল, মা, মা, কোথায় তুমি?

সাড়া পেয়েই বলল, দেখ তো মা একে চিনতে পার কিনা?

অতনুর মা ওদের সামনে এসে দাঁড়ালেন, অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও চিনতে পারলেন না।

ছেলে বলল, চিনতে পারলে না তো! মনে করে দেখ দেখি সেদিনের কথা, যে দুর্যোগের রাতে একটি মেয়ে তোমাকে বুকে আগলে নিয়ে দার্জিলিঙের নার্সিংহোমে পৌঁছে দিয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে অতনুর মা শিশুটি সমেত বুকে জড়িয়ে ধরলেন জয়িতাকে। বললেন, তোমার জন্যে আজও আমি বেঁচে আছি মা।

এরপর কোনও এক সময়ে জয়িতার ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা শুনে ভদ্রমহিলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, দুঃখের স্মৃতি কখনও মুছে ফেলা যাবে না, এখন তুমি ভাববে, তুমি তোমার মায়ের কাছেই ফিরে এসেছ।

কলকাতায় কিছুদিন থাকল জয়িতা। গুজরাট আর শিলিগুড়ির স্মৃতি ঘুরে ঘুরে আসতে লাগল তার মনে।

হঠাৎ একদিন খবরের কাগজ থেকে জানতে পারল, শিলিগুড়িতে এক ধরনের অজানা ভাইরাসের আক্রমণে বহু মানুষ মারা যাচ্ছে। প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিকের স্ট্রং ডোজেও কোনওরকম কাজ হচ্ছে না। আক্রান্ত রোগীর কাছে যারা আসছে তারাও ওই মারাত্মক ভাইরাসের শিকার হচ্ছে।

হাসপাতাল এবং নার্সিংহোম থেকে ডাক্তার এবং নার্সরা সাময়িক ছুটি নিয়ে শিলিগুড়ি থেকে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন।

প্রাণটা অস্থির হয়ে উঠল জয়িতার। সে স্থির করল, শিলিগুড়ি সে যাবেই। কেমন আছেন গোপাল ভাণ্ডারী মশায়, গণপতি পাণিগ্রাহী, বেহুলাদি, আর বুড়ো বাবা দাশরথী ছেত্রী!

কথাটা সে জানাল অতনুকে।

অতনু সামান্য সময় ভেবে বলল, এই মুহূর্তে শিলিগুড়ির পরিবেশটা অনুকূল নয়। এখন ঠিক কর, তুমি যাবে কি না।

অবশেষে মনের তাগিদের কাছে রোগের ভয় হার মানল।

জয়িতা তার বাচ্চাটাকে সঙ্গে নিয়ে উঠে বসল দার্জিলিঙ মেলে।

অতনু সঙ্গে যেতে চেয়েছিল কিন্তু কিছুতেই তাকে সঙ্গে নিল না জয়িতা। শুধু বলল, তুমি চলে গেলে মাকে দেখবে কে। আমি আবার আসব, শুধু মায়ের ভালোবাসার টানে।

জয়িতা রিকসো থেকে যখন হিমালয়ান ট্রাভেল এজেন্সির অফিসের সামনে নামল তখন তাকে প্রথম দেখতে পেলেন গণপতি পাণিগ্রাহীমশায়।

মানুষটি ভারী সরল, হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বললেন, এতদিন কোথায় ছিলে মা, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

জয়িতা কাতর গলায় বলল, কি হয়েছে পাণিগ্রাহী মশায়?

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললেন পাণিগ্রাহী, কর্তামশায় নেই।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে জয়িতা বলল, কি বলছেন আপনি!

সবিস্তারে পাণিগ্রাহীমশায় শিলিগুড়ির এই মারণ জ্বরে কর্তামশাইয়ের প্রয়াণের কাহিনীটি বললেন। শেষে বললেন, বেহুলা তাঁর কাছে শেষ পর্যন্ত থেকে রাত্রি দিন প্রাণ দিয়ে সেবা করেছিল। ওঁর মৃত্যুর পরে বেহুলাও সেই জ্বরে আক্রান্ত হয়। ভাগ্য ভাল বেহুলা মা বেঁচে ফিরে এসেছে।

জয়িতা বলল, আমি নিউজ পেপারে শিলিগুড়িতে এই মারণ জ্বরের খবর পেয়ে চলে এসেছি। কর্তামশায় আর আপনারা সকলে কে কেমন আছেন সে সব জানার জন্যে ভারী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম, তাই চলে এসেছি।

পাণিগ্রাহী বললেন, এখন প্রকোপটা অনেক কমে এসেছে।

কিন্তু আপনি একা কেন? মি. ধর্মপাল কোথায়?

সংক্ষেপে জয়িতা বলে গেল তার দুর্ভাগ্যের কাহিনী।

শেষ হলে পাণিগ্রাহী বললেন, গুজরাটের ভূমিকম্পের কথা কাগজে পড়ে আমরাও আপনার জন্য ভারী চিন্তায় পড়েছিলাম। কর্তামশাই প্রায়ই বলতেন, মেয়েটার কি হল, কোনও ঠিকানাই রেখে যায়নি। বেহুলার কান্না তো এখনও থামেনি।

এবার ঘরের ভেতর ডেকে এনে পাণিগ্রাহী মশায় বসালেন জয়িতাকে। পাশের ঘর থেকে 'গ' নামাঙ্কিত বাকি তিনজনকেও নিয়ে এলেন। তাঁরাও জয়িতার বিপর্যয়ের কথা শুনে দারুণ দুঃখ প্রকাশ করলেন।

এরপর ওঁদের মুখ থেকে অদ্ভুত একটি কথা শুনতে পেল জয়িতা।

মৃত্যু আসন্ন জেনে নিজের অ্যাটর্নিকে ডেকে তাঁর এজেন্সির একটা ডিড তৈরি করলেন। তাঁর সমস্ত ব্যবসা এবং ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা তিনি দিয়ে গেলেন আমাদের পাঁচজন এবং বেহুলাদির নামে। তাঁর অবর্তমানে আমরাই হব এই প্রতিষ্ঠানের রক্ষক এবং পরিচালক। বর্তমান কর্মচারীরা যে যার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করে যাবেন। আর বৃদ্ধ দাশরথী ছেত্রীমশাই যতদিন জীবিত থাকবেন তাঁর সমস্ত খরচ বহন করবে এই এজেন্সি।

জয়িতা অন্দরে চলে গেল বেহুলাদির সঙ্গে দেখা করার জন্য।

জয়িতাকে পেয়ে বেহুলাদি আর তাকে ছাড়তে চাইল না। সব শোনার পর কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, আর কোনও দিন আমি তোমাকে আমার কাছ ছাড়া করব না।

বৃদ্ধ দাশরথী যেন নিজের মেয়েকে ফিরে পেল। তার শুকনো চোখ বেয়েও জল গড়াতে লাগল।

জয়িতার মেয়ে মিষ্টিকে বুকে টেনে নিলেন বেহুলাদি। ও আমার কাছে বড় হবে, আমার এখান থেকেই ইস্কুলে যাবে।

মেঘ ভাঙা রোদ্দুরের হাসি ফুটল জয়িতার চোখে মুখে।

পরের দিনের জন্যে আর একটা অভাবনীয় খবর অপেক্ষা করে ছিল।

পাণিগ্রাহীমশাই এসে অফিসঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন জয়িতাকে। সেখানে বসে ছিলেন পরিচালকমণ্ডলীর বাকি তিনজন।

তাঁদের মুখপাত্র হয়ে গণপতি পাণিগ্রাহী বললেন, আমরা চারজনে এজেন্সির উন্নতির জন্য একটা পরিকল্পনা নিয়েছি। এখন সমস্ত পরিকল্পনাটা নির্ভর করছে আপনার সম্মতির ওপর।

বিনয়ের সঙ্গে জয়িতা বলল, বলুন।

আপনি আমাদের সকলের হয়ে এই সংস্থার পরিচালনার দায়িত্ব নিন। আমরা জানি, এ কাজ আপনার দ্বারাই সম্ভব।

সব শুনে জয়িতা বলল, এই মুহূর্তে আমার চাকরির দরকার ছিল। আপনারাই আমাকে সে সুযোগ করে দিলেন।

জয়িতা মন প্রাণ দিয়ে এজেন্সির কাজ করতে লাগল। আর সারাদিন বেহুলাদি মেয়েকে নিয়ে মেতে রইল।

কোনও এক ছুটির দিনে বৃদ্ধ দাশরথী ছেত্রীকে নিয়ে জয়িতা চলল পাহাড়ের কোলে বাগান ঘেরা ছোট্ট কুটিরের উদ্দেশে।

সেখানে পৌঁছে কতদিন পরে বাগান আর ক্ষেত ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল জয়িতা।

বাগান থেকে চেঁচিয়ে বলল, সবই আগের মতো ঠিকঠাক রেখেছ বাবা।

বৃদ্ধ কুঠি থেকে বেরিয়ে এসে তোবড়ানো গালে হাসি ফুটিয়ে বলল, যতদিন আছি ততদিন তদারকি করে যাব। চোখ বুজলে যাঁর ক্ষেত সেই শিবজিই দেখবেন।

তাড়াতাড়ি শেষ হল দুপুরের খাওয়া। খাবার শেষে জয়িতা বলল, বাবা, কনভেন্টের মাদারের সঙ্গে আমি একবার দেখা করে আসি। সন্ধ্যায় এখানে ফিরে আসব। রাতটুকু কাটিয়ে ভোরবেলা তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে যাব শিলিগুড়ি।

বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছিলেন মাদার সুপিরিয়র, কিন্তু চিনতে ভুল হল না জয়িতাকে।

হাসিমুখে বললেন, সব কুশল তো?

জয়িতা তার ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা না জানিয়ে শুধু বলল, প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হচ্ছে আমার জীবনে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল মাদারের, তুমি তো কই তোমার মায়ের পাঠান টাকাটা নিয়ে গেলে না? সে তো এখন বেড়ে বেড়ে অনেক অ্যামাউন্টে দাঁড়িয়ে গেছে।

জয়িতা মাদারের মুখের দিকে তাকিয়ে সবিনয়ে বলল, ওই টাকাটা আমার উপার্জনের নয়, আমার মায়ের পাঠান। আমি একটি প্রস্তাব আপনার কাছে রাখছি।

একদিন এই টাকার অভাবেই আপনার স্নেহের আশ্রয় থেকে আমাকে চলে যেতে হয়েছিল। কনভেন্টে যদি কেউ এরকম অবস্থায় কোনওদিন পড়ে তাহলে তাদের জন্যই রইল মায়ের দেওয়া এই টাকাটা।

মাদার জয়িতার মাথায় হাত রেখে বললেন, প্রভুর কৃপায় পরদুঃখকাতর আর মহৎ হোক তোমার হৃদয়।

জয়িতা মাদার সুপরিয়রের আশীর্বাদ নিয়ে পথে নেমে এল। খানিকটা পথ বাসে এসে তারপর শৈলশিরা ধরে শুরু হল তার হাঁটা।

অপরাহ্নের আলো নিভে আসছিল, হালকা মেঘগুলি ভেসে ভেসে যাচ্ছিল বাতাসে ভর করে।

ওম পথ ধরে নীচে নামতে নামতে হঠাৎ একখণ্ড মেঘের ভেতর হারিয়ে গেল জয়িতা।

মেঘ সরে গেলে সে আবার নামতে লাগল।

দুটো পাইন গাছের কাছে এসে সে থামকে দাঁড়াল। এখানে চলার পথে একদিন মধুমঙ্গল তার হাত ধরে নীচ থেকে ওপরে টেনে তুলেছিল।

আজ সেদিনের সেই দুটো গাছ দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু সে নিঃসঙ্গ একা।

এখন আকাশ থেকে মেঘ সরে গেছে কিন্তু বুকের ভেতর জমে উঠেছে অদৃশ্য একটা মেঘ। সেই মেঘ তোলপাড় করে দিচ্ছে সমস্ত হৃদয়, অন্ধকারে ঢেকে দিচ্ছে বোধ, বুদ্ধি, চৈতন্য।

ছায়া নেমে এসেছে কখন, চোখের সামনে মুছে যাচ্ছে পথ। কনকনে হিমশীতল একটা হাওয়া বয়ে এল কাঞ্চনজঙ্ঘার দিক থেকে।

এখন থামলে চলবে না, আবছা আলোয় কঠিন পাথরের ওপর নির্ভীক পা ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চলল জয়িতা।

দূরে দেখা যাচ্ছে আগুনের শিখা। সেদিনের মতো আজও আগুন জ্বলছে বৃদ্ধ দাশরথীর কুঠিতে—ওখানেই উত্তাপ, ওখানেই বিশ্রাম, ওখানেই ক্ষতবিক্ষত অন্তরের শান্তি।

●

তুমি রবে নীরবে

প্রিয় সুপর্ণ,

এক মাসের ওপর তোমার কোন খবর পাইনি, নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ আমার মনের অবস্থা। ডুবন্ত একটা সংসারের ছবি আঁকার জন্য এ চিঠি লিখছি বলে যদি ভেবে বস তাহলে অবিচার করবে তোমার বন্ধবীর ওপর। প্রতিটি মুহূর্তে বিচলিত হচ্ছি তোমার শরীরের কথা ভেবে।

নৌকাডুবির পর তুমি আমার বাবামায়ের মৃতদেহ দুটি যেভাবে জল-পুলিশের সাহায্যে উদ্ধার করে এনে সৎকারের ব্যবস্থা করলে তাতে শুধু আমি নয় আমার ভাইবোন দুটিও সাময়িকভাবে তাদের নিদারুণ আঘাতের কথা ভুলে গিয়েছিল।

কিন্তু সুপর্ণ, সেদিন কি তুমি কেবলমাত্র তোমার বান্ধবীর জন্য এই কর্তব্যটুকু করেছিলে? তোমার পাশে সারাক্ষণ থেকে আমি কিন্তু অন্য একটি মানুষকে আবিষ্কার করেছিলাম তোমার ভেতর। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ এক যুবক, যে অসহায় কোন মানুষের কাছে তার বিশাল বুকখানা পেতে দাঁড়াতে মুহূর্তমাত্র দ্বিধা করে না। সেদিন আমার ভালবাসার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাটুকু।

কি দুঃসহ দিন গেছে আমাদের! ভাবতে গেলেই শিউরে উঠি। মা বাবা গঙ্গাসাগর মেলায় বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বাবা পেছন ফিরে বললেন, অমৃতা আর ইমন রইল, তুই দেখিস মা।

বাবার ঐ কথাটা বার বার আমার কানে এসে বাজছে। ভাগ্যের দেবতা কি সেদিন বাবার মুখ দিয়ে ঐ শব্দকটি উচ্চারণ করেছিলেন।

আমি ভাবি, বাবা মা কেন নৌকোয় করে ফিরতে গেলেন। ওঁরা স্টিমারে যাবেন, স্টিমারে ফিরবেন, এমনিই তো কথা ছিল, হঠাৎ ওঁদের পরিকল্পনা বদলে দিল কোন অদৃশ্য শক্তি!

বাবার অবর্তমানে তাঁর ব্যাঙ্কে যাতে আমি একটা চাকরি পাই সেজন্যে খুব চেষ্টায় আছি। তোমাকে এক সময় বলেছিলাম, বাবা প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা তুলে, চড়া সুদে একটা কোম্পানীর কাছ থেকে লোন নিয়ে আমাদের একতলা বাড়ীটা বানিয়েছিলেন। প্রতি মাসে সংসার চালিয়ে আর সুদের টাকা গুনে গুনে বাবার জমার ঘরে এক কপর্দকও নেই। সুতরাং এ সংসারের জন্য একটা চাকুরীর জরুরী প্রয়োজন।

সমস্ত দুশ্চিন্তার ভেতরে আমাকে সারাক্ষণ তাড়া করে ফিরছে একটা উদ্বেগ, তোমার কোন খবর নেই।

একবার মনে হয়েছিল তোমার মায়ের কাছে চলে যাই, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলাম। তোমার ওখানে যাবার আহ্বান পাইনি কোনদিন তাই প্রবল ইচ্ছাকে অঙ্কুরেই দমন করলাম। তোমার অনেকদিন আগের দেওয়া ঠিকানায় এ চিঠি পাঠাচ্ছি, জানিনা তুমি পাবে কিনা।

যেখানে যেভাবে থাক, সুস্থ থেকো, এই প্রার্থনা। চিঠি পেলে দু'চার ছত্রে শুধু জানিও, কেমন আছ।

দেবারতি

ঠিক তিন সপ্তাহ পার করে চিঠির জবাব এল। খামের ওপর চেনা হাতের অক্ষর দেখে যেমন উদ্বেগ কাটল দেবারতির তেমনি চিঠিখানা পড়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠল সে।

চিঠির ডান দিকের ওপরে সুপর্ণের ঠিকানা। হিমাচল প্রদেশের কিন্নর জেলার কোন এক মিলিটারী ক্যানটনমেন্ট।

প্রিয় দেবারতি,

তোমার চিঠি রি-ডাইরেক্টেড হয়ে এইমাত্র আমার ঠিকানায় এল। অতি সম্প্রতি মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্সে একটা চাকরি পেয়েছি। পোস্টিং কিন্নরের পূহতে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যোগ দিয়েছি। এই একমাস, ইন্টারভিউ থেকে চাকরি প্রাপ্তি পর্যন্ত এত ব্যস্ততায় কেটেছে যে এক টুকরো চিঠি মায়ের কাছে পাঠানোর সুযোগও পাইনি। আমি ক্ষমা চাইছি দেবারতি। তোমার বাবা মায়ের শেষ সৎকারের জন্য আমি যা কিছু করেছি তার বিনিময়ে তোমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা পাব, একথা তো কোনদিন ভাবিনি। আমি যেটুকু কাজ করি তাতে আমার প্রাণের ষোল আনা তাগিদই থাকে। তোমার ক্ষেত্র বলে আলাদা কোন প্রেরণা ছিল না আমার।

দেবারতি, আমি তো তোমার কাছে শ্রদ্ধা চাইনি। যা এতদিন পেয়ে এসেছি তা শ্রদ্ধা নয়, অন্য কিছু। তোমার সেই গভীর নিবিড় দানে আজও ভরে আছে আমার বুক। একজন যুবক এক তরুণীর হৃদয়ের ছোঁয়াটুকুকেই তার জীবনের শ্রেষ্ঠধন বলে মনে করে।

আমি এ সময় তোমার কাছে থাকতে পারলে হয়তো তোমার কোন সাহায্যে আসতে পারতাম কিন্তু সবে চাকরি পেয়েছি, তাই ছুটির প্রসঙ্গই অবান্তর। তবে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মত যদি সিমলা অথবা অন্য কোন জায়গায় বদলির সঙ্গে সঙ্গে একটা কোয়ার্টার পেয়ে যাই তাহলে দেশ থেকে মালপত্র আনার জন্য কয়েকদিনের ছুটি মিলে যেতে পারে। তখন দুদিন হলেও মুখোমুখি বসবার অবকাশ পাওয়া যাবে।

আমার মনে হয় ব্যাঙ্কের চাকরিটা তোমার প্রাপ্য। একটু চেষ্টা করলে পেয়ে যেতে পার। কিন্তু তোমার এম. এ. পড়াটা তো তাহলে স্থগিত রাখতে হবে। অনার্সে এত ভাল রেজাল্ট করে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকতে না ঢুকতেই পড়া ছেড়ে দিতে হবে, এটা কিছুতেই মন মেনে নিতে পারছে না।

এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে আমরা কাছাকাছি থাকলে দুজনে মিলে পরামর্শ করে একটা কিছু সিদ্ধান্তে আসা যেত।

আমি সামান্য সুযোগ পেলেই কলকাতা থেকে ঘুরে আসব।

বাবা মা নেই, সব দায়িত্ব এসে পড়েছে তোমার ওপর। আমি জানি, তোমার প্রকৃতি চঞ্চল নয়, তুমি সব রকম দুর্যোগের মুখোমুখি হতে পার অত্যন্ত স্থির বিবেচনার সঙ্গে। বাবা মার মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তোমার মনের যে শক্তির পরিচয় আমি পেয়েছি, তাতে আমার এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে। তুমি জানবে আমি দূরে থাকলেও তোমার কাছে আছি।

নিঃসঙ্গ জীবনে এত দূরে পড়ে থেকে চাকরি পাবার আনন্দ ঠিক উপভোগ করতে পারছি না। কফির কাপ হাতে নিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হয়, তোমার পায়ের সাড়া পাচ্ছি, এখুনি পর্দা ঠেলে তুমি ভেতরে ঢুকে পড়বে।

তোমার সুপর্ণ।

চিঠিখানার শেষ কয়েক ছত্রে বার বার চোখ বুলোতে বুলোতে দেবারতির সামনে ফুটে উঠতে লাগল সুপর্ণের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়ের ছবিগুলো।

কলেজ সোশ্যালে রাগাশ্রয়ী গান গেয়ে এক রাতেই সাড়া ফেলে দিয়েছিল দেবারতি। পরের দিন থেকে একাধিক বান্ধবী জুটে গিয়েছিল তার। কমনরুমে ওকে ঘিরে অফ পিরিয়ডে বসে যেত গানের আসর।

উচ্ছ্বাসের প্রথম ঢেউগুলো কেটে যাবার পর দুজন অন্তরঙ্গ বান্ধবীর সঙ্গে ও প্রায়ই যেতে শুরু করল কফি-হাউসে। পড়াশোনায় প্রথম থেকেই ভাল ছিল দেবারতি। তাই বান্ধবীদের সঙ্গে আড্ডার বদলে আলোচনায় মেতে উঠত সে। পড়ার বিষয় থেকে সাম্প্রতিক সাহিত্য পরিক্রমায় কাটত তাদের কফি-হাউসের সময়গুলো।

সেদিন ওরা উত্তর পশ্চিম কোণের টেবিলটা অধিকার করে আলোচনায় মেতে উঠেছিল, এমন

সময় ওদের সামনে এসে দাঁড়াল একটি যুবক। রঙ অনুজ্জ্বল, কিন্তু স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মুখখানা। সেই মুখে এক টুকরো হাসি ছড়িয়ে যুবকটি বলল, 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি' পাশেই একখানা খালি চেয়ার। অনুমতি পেলে বসি।

সঞ্চারী বলল, চারদিক চেয়ে দেখ, একটিও খালি পাবে কিনা সন্দেহ। এটি তোমার জন্যেই রাখা আছে কিন্তু।

পল্লবী ফোড়ন কাটল, দুটি পাতা একটি কুঁড়ির সুবাস কি তোমাকে টেনে আনল নাকি সুপর্ণদা?

চেয়ারে বসতে বসতে সুপর্ণ বলল, এটা কিন্তু কফি হাউস, দুটি পাতা একটি কুঁড়ির রাজ্য নয়।

আচ্ছা সুপর্ণদা, সঞ্চারী বলল, আমাদের ভেতর কোন দুটি পাতা আর কোনটি কুঁড়ি বলে তুমি মনে কর?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব সুপর্ণর, তিনটি তো পল্লব। আগে দুটি পল্লবের আগমন, তার ভেতর ধীরে ধীরে কুঁড়ি-পাতাটির জাগরণ। তোমাদের দুজনেই আমার চেনা তাই তোমরা সবুজ দুটি পাতা আর এই মেয়েটি ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে আলোয়, তাই তোমাদের এ বান্ধবীটিকে কুঁড়ি বলা যেতে পারে।

পল্লবী আর সঞ্চারী মাসতুতো বোন। সঞ্চারীর দাদা সুপর্ণর সতীর্থ, তাই ওদের অনেকদিনের চেনা। এদিক থেকে দেবারতি একবারে অপরিচিতা।

সুপর্ণ তখন যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। কিন্তু কফি হাউসকে সে ভোলেনি। প্রেসিডেন্সীতে পড়ার সময় রোজ অন্তত একবার করে ঢুকত কফি হাউসে। এখন যাদবপুর যাতায়াতের ফলে সে সুযোগ আর পাওয়া যাচ্ছে না। তবে ফাঁক পেলেই অভ্যেসের ঠেলায় ঢুকে পড়ে এখানে বুক ভরে দম টানার জন্যে।

পল্লবী বলল, অচেনা কুঁড়িটি কিন্তু এখন আর অচেনা নেই সুপর্ণদা। ইতিমধ্যেই সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে।

সঞ্চারী বলল, সারা কলেজ উত্তাল।

সুপর্ণ বলল, দারুণ খবর. কিন্তু আরও পরিষ্কার করে বল। ইঁট, সুরকি, সিমেন্টের কারবারীর মগজে এত সূক্ষ্ম ব্যাপার সহজে ধরা পড়ে না।

সোশ্যালে সংগীত পরিবেশন করে রাতারাতি খ্যাতির শিখরে।

দেবারতি এতক্ষণ চুপচাপ বসে ওদের আলাপ উপভোগ করছিল। এবার বলল, একেবারে বিশ্বাস করবেন না ওদের কথা। আমি গান গেয়েছি ঠিক. কারু কারু হয়তো ভালও লেগেছে, কিন্তু উত্তালটুত্তাল ভয়ঙ্কর বাড়িয়ে বলা। এটা আমার ওপর দারুণ অবিচার।

সুপর্ণ বলল, ঐ দুটি যমজ বোনের কথা আমি প্রমাণ না পেলে কখনো বিশ্বাস করব না। আপনি একদিন সঞ্চারীর বাড়িতে গান গেয়ে শোনান। প্রমাণ করে দিন ওরা কত বড় মিথ্যুক।

সঞ্চারীর বাড়ি কলেজের একেবারে কাছাকাছি। সে অমনি বলে উঠল, আগামী বুধবার কলেজ ছুটির পর আমার বাড়িতে চায়ের আসর বসবে। ওখানেই ওর গানের ভেতর দিয়ে আমাদের কথার সত্যতা যাচাই হবে।

সুপর্ণ বলল, এবার কিন্তু আপনার পিছিয়ে গেলে চলবে না।

দেবারতি দেখল মানুষটি বেশ মজার। কেমন সুন্দর একটা কথার প্যাঁচে ফেলে গান শোনার রাস্তাটা পাকা করে নিল। তা হোক, গান শিখেছে যখন, গাইতে আপত্তি কি। কিন্তু সুপর্ণের একটা কথা তার কাছে হেঁয়ালির মত মনে হল। পল্লবী আর সঞ্চারীকে যমজ বোন বলার অর্থ? ওরা দুজনে তো মাসতুতো বোন। থাকে যে যার আলাদা আস্তানায়।

দেবারতি সুপর্ণের কথার উত্তরে হেসে বলল, পরীক্ষা দিতে আমি সব সময়েই প্রস্তুত। তবে আপনাকে যে এবার একটা পরীক্ষা দিতে হবে।

ওরা তিনজনেই দেবারতির মুখের দিকে চেয়ে রইল।

দেবারতি একটু থেমে প্রশ্ন করল, পল্লবী আর সঞ্চারীকে আপনি একটু আগে যমজ বোন বললেন, প্রমাণ করুন।

সুপর্ণ হেসে বলল, তাহলে তো পারিবারিক কথা তুলতে হয়। পল্লবী সঞ্চারীর আপত্তি না থাকলে যমজ বোনের ব্যাখ্যাটা করে দিতে পারি।

দুবোন হৈ হৈ করে উঠল, আপত্তির কি আছে, বলেই ফেল।

সুপর্ণ বলল, এদের মায়েরা যমজ বোন। আর আশ্চর্য! এরা দুজনে জন্মেছে সাত দিনের ব্যবধানে কিন্তু একই বারে এবং প্রায় একই সময়ে। ফাল্গুনী রোববার প্রভাতকালে।

পল্লবী বলল, খুব কাব্য করে বলছ যে।

সুপর্ণ বলল, আরও আছে, শুনুন নবাগতা। এটা অবশ্য ভবিষ্যৎ বক্তার এক্তিয়ারে পড়ে।

দেবারতি খুশি হয়ে বলল, বলুন, বলুন।

ফাল্গুনের ছোঁয়ায় যাদের জন্ম সেই যমজদের চারজোড়া চোখের মিলনও হবে ফাল্গুনে এবং সেই রাজপুত্রেরাও হবে যমজ।

সঞ্চারী বলল, ও ধরনের বিয়েতে আমার ঘোরতর আপত্তি।

সুপর্ণ বলল, আমরা আপত্তি জানাবার কে, ভাগ্য পূর্বনির্দিষ্ট। সেই তমসাবৃত ভাগ্যলিপি উদ্ধার করতে পারেন একমাত্র আলোকপ্রাপ্ত জ্যোতিষী। গণনা, নিখুঁত গণনা। এই বিরাট মহাবিশ্বের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের মূলে রয়েছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গণনা। সুতরাং বালিকাদ্বয় তোমাদের ভাগ্য পরিবর্তনের কোন আশা নেই।

পল্লবী ফোঁস করে উঠল, মোটেই আমরা বালিকা নই সুপর্ণদা।

আশ্চর্য! আমি তো জানি মেয়েদের বয়স কিছু কমিয়ে বললেই তাঁরা খুশি হন।

সঞ্চারী বলল, তাবলে বালিকা। বেশ, এবার থেকে তরুণী বললে যদি খুশি হও তাই বলব।

'কোনো কালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকা বয়সী
হে অনন্ত যৌবনা উর্বশী।'

এমন মজার ভঙ্গীতে সেদিন সুপর্ণ উর্বশী কবিতার ঐ ছত্রটি উচ্চারণ করল যাতে দারুণ খুশিতে ফেটে পড়ল তিন বন্ধু।

পল্লবী বলল, নিরস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি না হয়ে তোমার আর্টস পড়া উচিত ছিল।

কি বললে, আমি ইঁট, পাথর, লোহা-লক্কড়ের কারবার করছি বলে রসের কারবারী হতে পারিনা? সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'পালামৌ' রচনাটির এক জায়গায় এমনি ধরনের একটি কথা বলেছিলেন, অশ্বত্থবৃক্ষ বড় রসিক, সে নীরস পাষাণের ভিতর হইতেও রস সংগ্রহ করে।

এই মজাদার যুবকটির সঙ্গ সেদিন উপভোগ্য মনে হয়েছিল দেবারতির। কফি হাউসের বিলও মিটিয়েছিল সুপর্ণ।

সঞ্চারী বলেছিল, সুপর্ণদা, তোমার পকেট কেটে তোমারই উপকার করলাম আমরা।

কি রকম?

নীতিবাক্যটি পড়নি? 'যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।'

পথে নেমেই এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা সুপর্ণর। সে অমনি বার দুয়েক হাত নেড়েই উধাও হয়ে গেল।

পল্লবী বলল, অদ্ভুত ছেলে সুপর্ণদা। আঠা নেই।

দেবারতি জানতে চাইল, তার মানে?

এই মুহূর্তে মেয়েদের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা মারছে, একটু পরে পথে দেখা হলে মুখের দিকে তাকাবি, কোনদিন যেন তোকে দেখেইনি। তবে আঠা আছে অন্য জায়গায়, কোন একটি জিনিস নিয়ে শুরু করলে তার শেষ না দেখে ছাড়বে না।

যেমন?

চা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করল। ব্যস, হাতে কলমে জ্ঞান অর্জনের জন্য চলে গেল টি-গার্ডেনে। পুরো ছুটিটা কাটিয়ে এল সেখানে। চায়ে কেমন করে গন্ধের যোগ হয়, কেমন করে চা টেস্ট করতে হয়, পৃথিবীর কোথাকার চা কি রকম, চায়ের বাজার, সব কিছু তখন সুপর্ণদার নখ-দর্পণে।

একবার ঘুড়ি তৈরি শুরু হল। আমাদের দেশের সব রকম ঘুড়িই সুপর্ণদার জানা। সুতরাং অজানা ঘুড়ির জগতে প্রবেশ করতে হবে। অভিজ্ঞ চীনেম্যান পাকড়াও করে তার কাছ থেকে কত রকম চীনে ঘুড়ির তালিম নেওয়া হল। আমাদের চিলে কোঠা রঙীন কাগজ, কাঠি, কাঁচি, ছুরি, আঠা, লাটাইতে বোঝাই। বিচিত্র সব ঘুড়ি বানান হচ্ছে আর পরীক্ষা চলছে আমাদেব বড় ছাদটায়। একমাস ধরে চলল সুপর্ণদার বিশ্বকর্মা-উৎসব।

এমনি হাজার খেয়ালের খেলায় মেতে থাকে মানুষটা. যখন যেটা নিয়ে পড়ল সেটাতেই তদ্‌গত।

দেবারতি বলল, ভাইবোন কটি?

সঞ্চারীর উত্তর, নাস্তি। একমেবাদ্বিতীয়ম্। পিতা প্রয়াত, মাতা ব্যক্তিত্বসম্পন্না, অবস্থা ভাল। আর কি জানতে চাও?

সঞ্চারীর কথার ধরনে লজ্জা পেল দেবারতি।

নির্দিষ্ট বুধবার কলেজ ছুটির পর সঞ্চারীর বাড়িতে বসল চায়ের আসর। যাদবপুর থেকে ঠিক তিনটেতে এসে গেল সুপর্ণ।

পল্লবী ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, এমন পাংচুয়েলিটি আগে তো কখনও দেখা যায়নি সুপর্ণদা! গান না গায়িকা, কোনটির টানে?

দুটোরই। একটির সঙ্গে অন্যটি জড়িয়ে রয়েছে অঙ্গাঙ্গী।

সঞ্চারী বলল, দেবারতির একটু সাজগোজ করে আসা উচিত ছিল আজ।

পল্লবী বলল, কবে আবার ওকে সাজসজ্জা করে কলেজে আসতে দেখেছিস? ও সোশ্যালের দিনেও তো কই সেজে আসেনি। আটপৌরেতে ওকে কিন্তু সেদিন দিব্যি মানিয়েছিল।

দেবারতি বলল, পোশাক নিয়ে রিসার্চ না করে ববং হারমোনিয়ামটা বের কর। ঘরে ফিরতে হবে যথা সময়ে, সে খেয়ালটা রাখিস।

সুপর্ণ বলল, কোথায় থাকেন আপনি?

দেবারতি একটুখানি মিষ্টি হেসে বলল, বাঙ্গুর এভিনিউতে।

কটায় বাড়ি পৌঁছলে চলবে?

দেবারতি একটু ভেবে নিয়ে বলল, সাড়ে পাঁচটার ভেতর অবশ্যই।

সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন।

হারমোনিয়াম নিয়ে এল সঞ্চারী। পল্লবী তার মাসির সঙ্গে ঢুকল খাবার নিয়ে।

সঞ্চারীর মা বললেন, গরম গরম কচুরী ভেজে আনলাম। আগে সবাই বসে খাও, তারপর গান। আমিও দেবারতির গান শুনব। সোশ্যালের পর থেকে মেয়ে দুটোর মুখে আর প্রশংসা ধরে না।

ওরা একই থালি থেকে কচুরী তুলে তুলে খেতে লাগল। আলুর দমের প্লেটগুলো কেবল আলাদা।

সঞ্চারীর মা বললেন, তোমরা খেতে থাক, আমি আরও ভেজে আনছি।

খেতে খেতে দেবারতি বলল, এটা ভারী অন্যায়, আমার খুব খারাপ লাগছে।

সঞ্চারী অমনি বলে উঠল, কেন কি হল আবার তোর?

'আপনি', 'আজ্ঞে' গুলোর ভার আর বইতে পারছি না।

পল্লবী বলল, তার মানে?

সুপর্ণ হা হা করে হেসে উঠে বলল, বুঝেছি, এবার থেকে ঐ ভারী পোশাকগুলো উড়িয়ে দিলাম হাওয়ায়। মধ্যম পুরুষের হাতে হাত রেখে চলা যাবে। অবশ্য উভয়ত।

দেবারতি বলল, রাজি। বেশ হালকা মনে হচ্ছে এখন।

সঞ্চারী পল্লবীকে ঠেলা দিয়ে বলল, কি রে হাঁদারাম এখনও বুঝলি না। দেবারতি আর সুপর্ণদা এখন থেকে দুজনে দুজনকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করবে।

পল্লবী হৈ হৈ করে ভেতরে ছুটল, সন্দেশ আনছি দাঁড়া।

সঞ্চারীর দাদা অরুণাভ আমেরিকায় আছে পড়াশোনার জন্য। তাই তার নির্দেশে এ বাড়িতে প্রায়ই হাজিরা দিতে হয় সুপর্ণকে। মাসীমারও সন্তান-বাৎসল্য সুপর্ণের ওপর। একটা নিকট আত্মীয়তা গড়ে ওঠা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু একমাত্র বাধা, দ্বিজত্বের উপবীত নেই সুপর্ণের বক্ষে। প্রাচীন জমিদার বংশের সন্তান অরুণাভর পিতামহ এখনও গ্রামে বর্তমান। কৌলিন্যের অনুশাসনকে মেনে চলা এখনও তিনি ধর্ম বলে মনে করেন। আবার পল্লবীদের পরিবারের ওপরেও তাঁর প্রভাব অনেকখানি। পল্লবীর বাবা বৈষয়িক বিষয়ে পরামর্শ নিতে প্রায়ই তাঁর দ্বারস্থ হন।

সুতরাং সুপর্ণের সঙ্গে প্রথম থেকেই ভ্রাতৃত্বের একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে দুই বোনের।

খেতে খেতে কথা উঠল নাম নিয়ে। আলোচনায় স্থির হলো উপস্থিত চারজনের নামই ভদ্রসমাজের শ্রবণ যন্ত্রের পক্ষে পীড়াদায়ক নয়। কিন্তু অর্থগুলো কার পক্ষে কতখানি জুতসই তা নিয়ে আবার আসর মেতে উঠল।

অবশেষে ব্যাখ্যাকারীর আসনে বসান হলো সুপর্ণকে। সে-ই নাম এবং নামধারীর মণিকাঞ্চন যোগটা নির্ণয় করবে।

প্রথমে উঠল পল্লবীর নাম।

সুপর্ণ ব্যাখ্যা করে বলল, ও পল্লবিত তরু। শাখা-প্রশাখা মেলে সংসারের মাটি ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর, মাটিতে মূল কিন্তু ওর আমন্ত্রণ আকাশকে। তাই আকাশ ওকে বৃষ্টির ধারাযন্ত্রে স্নান করিয়ে সোনালী উত্তরীয় একখানা গায়ে জড়িয়ে দেয়। মৃদু হাওয়ার ছোঁয়ায় ওকে রোমাঞ্চিত করে। ও স্বয়ং দাতা। মূল থেকে ফল পর্যন্ত ও সবই দান করে খাদ্য অথবা ঔষধরূপে। এমন কি অগ্নিতে নিজেকে দগ্ধ করেও কল্যাণ সাধন করে মানুষের।

সঞ্চারী কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমাদের জন্য কিন্তু অবশিষ্ট রইল না কিছুই।

পল্লবী অমনি তার রাজভোগের ছোট্ট প্লেটটা সুপর্ণের দিকে তুলে ধরে বলল, ভক্ত কৃতার্থ। দয়া করে এ নৈবেদ্যটুকু গ্রহণ কর।

সুপর্ণ বলল, দৃষ্টিভোগ করে দিলাম, এখন তুমি প্রসাদ গ্রহণ কর।

খেতে খেতেই সুপর্ণ বলল, সঞ্চারীর দেহে স্বয়ং বাগীশ্বরী বিরাজ করছেন। সরস্বতীর সংগীত অংশ দিয়ে গড়া ওর শরীর। অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ,—সংগীতের এই চারটি চরণের তৃতীয়টি হলো সঞ্চারী। আর কি মহিমা দেখ ওর নামের মধ্যে। বাবা মার তৃতীয় সন্তান হয়ে বিরাজ করছে। আত্রেয়ীদির পরে অরুণাভ, তার ঠিক পরেই সঞ্চারী। সবশেষে অগ্নিভ। ব্যস, এখানেই সম। গান সমাপন। চারটি চরণই কথায়, সুরে পূর্ণ। তবে সঞ্চারীর জবাব নেই। ওর ধর্ম হলো বিস্তার। সুরের ভুবনকে নিরন্তর ও প্রসারিত করে চলেছে।

পল্লবী বলল, গলির উল্টোদিকের বাড়িতে একটা কোকিল পুষেছিল। সে প্রতিদিন পঞ্চমে সুর তুলে মাতিয়ে দিত। তারই প্রেরণায় সঞ্চারী হারমোনিয়মটা কিনল। রোজ সকালে এমনি সা-রে-গা-মা সাধতে লাগল যে চেলার দাপটে গুরু গান বন্ধ করে দিলে।

সুপর্ণ বলল, গুরুর কাছ থেকে কেমন শিক্ষা পেয়েছে সঞ্চারী, সে পরীক্ষা ওকে একদিন দিতে হবে।

সঞ্চারী বলল, সে কথা একদিন ভেবে দেখা যাবে। এখন আমার নামের স্বপক্ষে এতগুলো কথা বলার জন্য তোমার ফিরতি ট্যাক্সি ফেয়ারটা আজ আমিই দিয়ে দেব। এবার তুমি তোমার নিজের নামের ব্যাখ্যাটা দাও তো শুনি।

পল্লবী বলল, এখনও কিন্তু আমাদের ভেতর একজনের নাম মাহাত্ম্য শোন হয়নি।

সঞ্চারী বলল, ও আজ আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি। সবার শেষে ওর নামগান করা যাবে। এখন সুপর্ণদার পালা।

আমি একাধারে রথ ও রথী। কেবল সুন্দর পাখাযুক্ত একটি স্বর্ণচূড় পাখি নয়, আমি পক্ষীরাজ গরুড়। বিষ্ণুর বাহন। আবার সুপর্ণের ভিন্ন এক অর্থ, বিষ্ণু। সুতরাং একাধারে আমি আরোহী, বিষ্ণু, অন্যদিকে বাহন, গরুড়। তাই বলছিলাম, রথ ও রথী, একাধারে দুই।

পল্লবী বলল, তুমি এত কথা জানলে কি করে সুপর্ণদা? তাছাড়া আমার তো মনে হচ্ছে, অভিজ্ঞ একজন বাংলার অধ্যাপকের মতো তুমি বেশ লাগসই ভাষায় গুছিয়ে বক্তব্যগুলো প্রকাশ করছ।

আমি তো মনে প্রাণে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হবার স্বপ্ন দেখেছিলাম!

তাহলে বাধাটা এল কোনদিক থেকে?

মাতৃ আজ্ঞা। ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে আমাকে। এ আদেশ লঙ্ঘনের সাধ্য ছিল না আমার।

পল্লবী এবার বলল, দেবারতি এখন নামগান শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছে।

সঞ্চারী বলল, ওটা আমাকেই করতে দাও। সুপর্ণদা কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠেছে।

তুই নাম কীর্তন করলে বান্ধবীর আমার মনে ধরবে তো?

যেমন করে বললে ও সবচেয়ে খুশি হবে তেমনি করেই বলব।

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই হাত-মুখ ধুয়ে এসে আসর জমিয়ে বসল ওরা।

সঞ্চারী বলল, আগে গান হোক, শেষে হবে নামগান।

দেবারতিকে এবার গান ধরতে হলো। আশ্চর্য! যে আধুনিক রাগপ্রধান গান গেয়ে ও সেদিন আসর মাতিয়েছিল, তার ধারে কাছেও গেল না। ও গাইল রবীন্দ্রনাথের গান:

'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে
তুমি জাননা, আমি তোমারে পেয়েছি অজানা সাধনে।
সে সাধনায় মিশিয়া যায় বকুল গন্ধ,
সে সাধনায় মিলিয়া যায় কবির ছন্দ---
তুমি জাননা ঢেকে রেখেছি তোমার নাম রঙিন ছায়ার আচ্ছাদনে।

গান শেষ হওয়ামাত্র হৈ হৈ করে উঠল পল্লবী, তুই রবীন্দ্রসংগীতও এত সুন্দর গাইতে পারিস! সত্যি জিনিয়াস। আধুনিক গানের গাইয়েদের গলায় যখন রবীন্দ্রসংগীত শুনি তখন সুরের খেলায় কান ভরলেও মন ভরে না। তুই আজ শুধু কান নয় মন প্রাণ সব ভরিয়ে দিলি।

সঞ্চারী বলল, গান কি আর এমনি উৎরেছে, প্রাণের সঙ্গে প্রাণ ইতিমধ্যেই বাঁধা পড়ে গেছে অদৃশ্য সুতোয়।

দেবারতি বলল, আমি কিন্তু আর গান গাইছি না।

আমি যে মা এতক্ষণ পরে কাজ গুছিয়ে এলাম তোমার গান শুনব বলে।

ঘরের ভেতর থেকে ওদের আসরের দিকে আসতে আসতে বললেন মাসীমা।

দেবারতি অমনি বলে উঠল, আসুন মাসীমা, বলুন কি গান শুনবেন?

তুমি যা গাইবে তাই শুনব মা।

আবার গান ধরল দেবারতি। সেই রবীন্দ্রনাথের গান।

'সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন ফুলহার,
তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার।
নীল অম্বর চুম্বন নত, চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত,
অঞ্চল ঘেরি সঙ্গীত যত গুঞ্জরে শতবার। .. ..

মাসীমা বললেন, মনটা ভরে গেল মা। গলায় যেমন সুর, মনে তেমনি ভাব। এমন নইলে কি গান প্রাণে বাজে।

সঞ্চারী বলল, ওর নাম দেবারতি মা। ও তো গান করে না, আরতি করে। ওর আরাধ্য দেবতাটি হচ্ছে বিষ্ণু। তাঁরই ধ্যান করতে করতে দেবারতি গান করে যায়। তাই ওর গানে এমন প্রাণের ছোঁয়া লাগে।

সেদিন সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ট্যাক্সি করে বাঙ্গুর এভিনিউর কাছাকাছি একটা রাস্তায় সুপর্ণ পৌঁছে দিয়েছিল দেবারতিকে।

ট্যাক্সিতে বসে মুখ ফুটে সেদিন দুজনে কেবল দুটি কথাই উচ্চারণ করতে পেরেছিল।

দেবারতি জানতে চেয়েছিল, গান কেমন লাগল বললেন না তো?

সুপর্ণ ওর হাতের মুঠোয় দেবারতির আঙুলগুলো ভরে নিয়ে বলেছিল, তোমার সঙ্গে আজ যতদূর যাব, তুমি আমাকে এ হাতখানা ধরে থাকতে দেবে তো?

দেবারতি মুখখানা ঈষৎ নিচু করেছিল, হাত সরিয়ে নেয়নি।

একসময় আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেয়েছিল, সন্ধ্যার পাখিরা পথচিহ্নহীন আকাশের বুক চিরে উড়ে চলেছে দিগন্তের দিকে। দেবারতি সেই মুহূর্তে ভেবেছিল, এ হাত দৃঢ়, বলিষ্ঠ, নির্ভরযোগ্য। এই হাত ধরে সে অনাগত দিনের দিকচিহ্নহীন পথে নির্ভয়ে চলে যেতে পারবে।

দুই

পুহর সামান্য দূরেই মিলিটারী ব্যারাক। সদা জাগ্রত প্রহরী। পাহাড়ের কোলে পথ। তার অনেকখানি নীচে শতদ্রু লাট খেতে খেতে বয়ে চলেছে। এ যেন সেই দুরন্ত ঘোড়া যে আদিম পৃথিবীর দুটি উত্তুঙ্গ পর্বতের মাঝখানে গিরিখাদ ধরে ছুটে চলেছে উদ্দাম গতিতে।

শতদ্রুর ওপারের পাহাড় চূড়ায় কয়েকটা ছোট ছোট মিলিটারী চৌকি আছে। ওদিকের পাহাড়ের গায়ে তেমন কোন গাছপালা অথবা লোকালয় নেই। পথ বলতে অতি সংকীর্ণ ওম পথ পাহাড়ের চূড়ার দিকে উঠে গেছে। ঐ পথ ধরে সপ্তাহে দুবার কয়েকটি খচ্চরের পিঠে খাদ্য-সামগ্রী পাহাড়চূড়ায় পাহারারত সৈনিকদের কাছে পৌঁছে যায়।

সুপর্ণ থাকে এপারে বিস্তীর্ণ মিলিটারী ব্যারাকে। এদিকে বেশ কয়েক ঘর পরিবারের বাস। বৃষ্টিপাত অল্প, ন্যাড়া পাহাড়ের গায়ে জল দাঁড়ায় না। তাই গাছপালার প্রায় কোন চিহ্ন নেই। যেটুকু বরফ জমে তাতে বৃক্ষরোপণের চেষ্টা চলে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। ফল তেমন আশাপ্রদ নয়। কিছু আঙুরের চাষ চলছে।

এখানকার বাসিন্দারা পি. ডব্লিউ. ডি. অথবা মিলিটারীর ঘর বাড়ি, পথঘাট, ঝুলা ব্রীজ ইত্যাদি তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকে।

কিন্নরের পথঘাট প্রায়ই ভাঙে, তাই মেরামতির লোকজনকে মজুত রাখতে হয় সারাক্ষণ। নদী, পাহাড় কাটতে কাটতে নেমে গেছে অনেক নীচে। ঐ পাহাড়ের ছোটবড় শিলাস্তূপ পলির সঙ্গে মিশে মূল পাহাড়ে সংলগ্ন হয়ে আছে। হঠাৎ হুহু শব্দে হাওয়া ছুটে এসে পাহাড়ের গায়ে নরম পলিতে তুরপুন চালাতে থাকে। তখন সাদা দুধের মত একটা মেঘের সৃষ্টি হয়। পলিমাটি সরে গেলেই ওপর থেকে সাজানো বোল্ডারগুলো হুড়মুড় করে নামতে থাকে। তখন পাহাড়ি পথ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ছোট বড় পাথরের টুকরোগুলো লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে শতদ্রুর জলে।

এই ধ্বংস-লীলার ভেতরে পড়ে গেলেই যানবাহন, মানুষজনের আর রক্ষা নেই।

সুপর্ণের কাজে যোগ দেবার মাস খানিক আগে একটা অঘটন ঘটে গিয়েছিল। চোদ্দখানা মিলিটারী জিপ বোঝাই রসদ আসছিল। হঠাৎ দু'কিলোমিটার জায়গা জুড়ে শুরু হয়ে গেল হাওয়ার তাণ্ডব। বিশাল বিশাল বোল্ডার গড়িয়ে এল ওপর থেকে নীচে। পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যে সব নিশ্চিহ্ন। বাতাস বন্ধ, ধুলোর মেঘ নেই, চোদ্দখানা জীপ উধাও। শতদ্রু তাদের উল্টেপাল্টে ভেঙে চুরে কোথায় নিয়ে চলে গেল কে জানে!

ধুলোর মেঘ উড়ে যাওয়া মাত্রই রাস্তা মেরামতির কাজে লেগে যায় কুলিকামিন। শত শত মেয়ে পুরুষ কোদাল গাঁইতি চালিয়ে ঝুড়ি ভরে সাফ করে পাথর। তারপর নতুন করে ড্রেস করা হয় রাস্তা। আবার যেমনকে তেমন। বোল্ডার যাতে না পড়ে তার ব্যবস্থা হয়েছে নানাভাবে। তবু ঠেকানো দায় হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যের সময় ঘন্টা দুয়েকের জন্য ছুটি পায় সুপর্ণ। দু'তিন জন বন্ধু মিলে ওরা যায় একটা গ্রাম্য দেবস্থানে। সেখানে দেবতার পূজারতি দেখে। প্রণামী দেয়, প্রসাদ পায়। তারপর অর্ধচন্দ্রাকার সঙ্ঘংয়ে নাচ শুরু হয়। পুরুষ রমণীরা হাতে হাত বেঁধে নাচে। কিন্নরীদের কণ্ঠের গান শুনলে মনে হয় সুরলোক থেকে দেবকন্যারা নেমে এসে স্বর্গীয় সংগীত শোনাচ্ছে।

এরপর ছোট ছোট ভাঁড়ে পরিবেশন করে অঙ্গুরী মদ। আঙুর থেকে তৈরি অতি উৎকৃষ্ট সুরা। কিন্তু আশ্চর্য! মেয়েরা পুরুষদের মদ পরিবেশন করলেও নিজেরা সুরাপান করে না। অন্তত সুপর্ণের চোখে কোন দিনই সে দৃশ্য ধরা পড়েনি।

কিন্নর পুরুষেরা সুদর্শন কিন্তু কিন্নরীদের অধিকাংশই যথার্থ অর্থে সুন্দরী।

শরৎকাল এল। নির্মল হয়ে গেল আকাশ। পালসরা (মেষচারক) দলে দলে ভেড়ার পাল নিয়ে পাহাড়ী বুগিয়ালের (চারণক্ষেত্র) খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

সুপর্ণ কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেখতে লাগল এসব দৃশ্য। বর্ষায় পথঘাট ভেঙে তছনছ হয়ে গিয়েছিল। সে সময় প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সারাইয়ের কাজ। এখন পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে পথ-মেরামতি। কুলিকামিন কাজ করছে, তাদের তদারকির দায়িত্বে আছে একদল সুপারভাইজার। একটা জিপে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে সুপর্ণ। নতুন কন্সট্রাকশানের কাজগুলো ঠিকমত এগোচ্ছে কিনা তাই লক্ষ্য করছে, আর মাঝে মাঝে সুপারভাইজারদের নির্দেশ দিচ্ছে।

এক রাতে জিপে করে ফিরছিল সুপর্ণ। মসৃণ খাড়া পাহাড়গুলোর কোলে আঁকাবাঁকা রাস্তা। গাছপালার চিহ্ন নেই। নদী যুগ যুগ ধরে পাহাড়ের গায়ে নক্সা কাটতে কাটতে অনেক নীচে নেমে গেছে। এই পাহাড়গুলো দেখলে মনে হবে, শ্রেষ্ঠ স্থপতিদের হাতে গড়া কোন মন্দির-নগরী। অথবা সুরলোকের কোন সুরম্য দুর্গপুরী।

জিপ চালিয়ে আসতে আসতে সুপর্ণ একটা গর্জন শুনতে পেল। আরও খানিকটা এগিয়ে সে বুঝতে পারল, দিনের বেলা যে জলস্রোতকে সে পথ ভাসিয়ে নীচে নামতে দেখেছিল, সেটা এখন ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে।

ওপরের পাহাড়ে অনেক সময় গুহাগর্তে বর্ষার জলধারা আটকে থাকে। মাঝে মাঝে ফাটলের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে পড়তে থাকে নীচে। হঠাৎ বড় রকমের একটা পাথর সরে গেলে ওপরের জমা জল তোড়ে নীচে নামতে থাকে। প্রপাতের আকারে সে তখন কোন একটা খাঁজ বেয়ে বোল্ডারের ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে নেমে আসে সিংহ-গর্জনে।

জিপটা পথের ওপর থামিয়ে বসে রইল সুপর্ণ। প্রবল প্রবাহ না কমলে পার হওয়া যাবে না।

হঠাৎ সুপর্ণের মনে হল, সে যেন কোন মায়াপুরীতে এসে পড়েছে। সামনের যে পাহাড়গুলোকে তার দুর্গ-সৌধ বলে মনে হচ্ছিল সেগুলোর একদিক কোমল মায়াময় আলোয় ভরে উঠল। অন্যদিক ছেয়ে গেল তরল অন্ধকারে। সৌধের পর সৌধে এমনি আলো অন্ধকারের খেলা চলল, কিন্তু কোন ভাবেই ধরা পড়ল না সেই আলোর উৎস। অদ্ভুত একটা রহস্যময়তায় ছেয়ে গেল চরাচর। কিছুক্ষণ পরে সুপর্ণ প্রপাতের কটিদেশের দিকে তাকিয়ে দেখল, রুপোলী চুমকিতে ঝলমল করছে কটিবাস। আঁচলে লেগেছে ইন্দ্রধনুর ছটা।

বাসর জাগানোতে দক্ষ কোন লীলাবতী যুবতী নিজেকে আড়ালে রেখে নানা ছলে মাতিয়ে তোলে আসর। তারপর এক সময় দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুধু কৌতুক-মধুর মুখখানা দেখায়। অমনি বাসর জুড়ে জেগে ওঠে আনন্দের ঢেউ। ঠিক তেমনি এতক্ষণ পরে পাষাণপুরীর এক ঝরোখার আড়াল থেকে উঁকি দিল একখানা মুখ। শুভ্র সুন্দর পূর্ণ বিকশিত, যৌবনদীপ্ত।

চাঁদের দিকে তাকিয়ে, তার আশ্চর্য আলোছায়ার লীলাকে প্রত্যেক্ষ করে সুপর্ণ বিস্ময় তাড়িতের মত বসে রইল।

প্রকৃতির রিজার্ভারের জল প্রায় নিঃশেষ হতে সময় গড়াল মাঝরাত অবধি। অমনি জিপে স্টার্ট দিল সুপর্ণ। তার মনে হল, এক একটা রাত্রি এমনি অবিস্মরণীয় হয়ে দেখা দেয়, স্মৃতির পাতায় তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর এঁকে রেখে যেতে।

সুপর্ণের ওপরওয়ালা চিন্তিত ছিলেন। এমন বিপর্যয়ে সাইটে ফিরে গিয়ে রাত কাটানো উচিত ছিল বলে মন্তব্য করলেন।

সুপর্ণ কি করে বোঝাবে যে কাজের জায়গায় ফিরে গেলে সে হয়ত রাতটা আরামেই কাটাতে পারত, কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির মায়াপুরীব এই মহোৎসবটি দেখা তার ভাগ্যে আর ঘটে উঠত না।

রাত্রে আর ঘুম এল না সুপর্ণের চোখে। সে আজকের অভিজ্ঞতা নিয়ে দীর্ঘ একখানা চিঠি লিখল দেবারতিকে। শেষ ছত্রে লিখল, আমি ঐ মায়ার জগতকে বাইরে থেকেই দেখেছি, ভেতরে প্রবেশ করতে পারিনি, কিন্তু তুমি যদি আমার পাশে থাকতে তাহলে নিশ্চয়ই তোমার অবাক করা দুটো চোখের ছোঁয়া লেগে খুলে যেত মায়ালোকের দ্বার, আর আমরা অবলীলায় প্রবেশ করতাম তার ভেতর।

সুপর্ণর চিঠির উত্তর এসেছিল কিছুদিন পরে। দেবারতি লিখেছিল, রূঢ় পৃথিবীটার সঙ্গে লড়াই করতে করতে যখন আমি প্রায় অবসন্ন হয়ে পড়েছি তখন এক পশলা জুঁইফুলি বৃষ্টির মত তোমার চিঠি এল। আমার মনে হল আমি কলকাতার ভ্যাপসা গরমে ভরা চারটে দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ নেই, তোমার সঙ্গেই ঘুরে বেড়াচ্ছি কান্তিময়ী কিন্নরের মায়া-জ্যোৎস্না ভরা পথের ওপর দিয়ে।

শেষে একটি সুসংবাদ দিয়েছে। আগামী পরশু সম্ভবত আমি ব্যাঙ্কের কাজে যোগ দিচ্ছি। ঐ দিনই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটাও নাকি আমার হাতে দিয়ে দেবে।

আরও আগের একখানা চিঠিতে সুপর্ণ সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল। কিন্তু দেবারতি সে প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। লিখেছিল, তোমার যা কিছু অর্জন তার ভাগ পাবেন তোমার মা। অবশিষ্ট যা থাকবে তা জমিয়ে রেখ আমাদের ভবিষ্যতের জন্য। ওতে আর কেউ ভাগ বসাক, এ আমি চাই না। এখনও আমাদের ভাইবোনের পথে দাঁড়াবার মত অবস্থা আসেনি। তবে এ কথা সত্যি যে এই মুহূর্তে একটা চাকরি না পেলে আর বেশি দিন সংসারটাকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

সুপর্ণ জানে, দেবারতি গভীর প্রকৃতি মেয়ে। তার আত্মসম্মানবোধ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও প্রবল। কিন্তু এমনভাবে তার দিক থেকে প্রত্যাখ্যানটি এল যাতে আহত হবার কোন পথ রইল না।

তবু আজকাল প্রায়ই একটা ছবি সুপর্ণের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দেবারতি চলেছে গানের টিউশনি করতে অথবা কোন পড়ুয়ার বাড়ি ছুটছে টিউশনি পড়াতে।

দেবারতিকে কেউ হয়ত পরমা সুন্দরী বলবে না, কিন্তু ব্যক্তিত্ব ও সৌন্দর্যের মিশ্রণে এমন এক আকর্ষণীয় শ্রী তার দেহকে কেন্দ্র করে ঘিরে আছে যা বিশিষ্ট রসগ্রাহীর দৃষ্টিকে এড়িয়ে যাবে না।

উ-খিয়াং উৎসব শুরু হয়ে গেছে কিন্নরে। এটি ফুলের উৎসব। 'উ' অর্থ ফুল। 'খিয়াং' অর্থ দেখ। অর্থাৎ ফুলের ভেতরে যে সৌন্দর্য তাকে গভীরভাবে উপলব্ধি কর।

তপোনাথ নেগী মিলিটারীতে কাজ করে। বাড়ি কিন্নরের সাংলা তহশিলে। দুর্গম পাহাড়ে জীপ চালিয়ে অবলীলায় ওঠা নামা করতে তার জুড়ি আছে কিনা সন্দেহ। সেই তপোনাথ সুপর্ণের সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেছে বন্ধুত্বের বাঁধনে। বহুদিন জীপ চালিয়ে সুপর্ণকে পৌঁছে দিয়েছে তার কর্মস্থানে। পরস্পর পরস্পরের প্রেমিকার কথা বলেছে কোন আবরণ না রেখে।

মিলিটারীর কঠিন শৃঙ্খলায় বাঁধা কর্তব্য কর্মের ভেতর দুজনের বন্ধুত্ব প্রবল গ্রীষ্মে একখণ্ড মেঘের মত। একটু সজল ছায়া, এক ঝলক হাওয়া, এক পশলা বর্ষণ।

উ-খিয়াং উৎসবে বাড়ি যাবার আবেদন মঞ্জুর হয়েছে তপোনাথের। সে চাইছে বন্ধু সুপর্ণকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। উ-খিয়াং উৎসবের মেজাজই আলাদা। এমন একটা উৎসবে প্রিয় বন্ধুর সঙ্গ বড় বেশি কাম্য।

সুপর্ণ তার ওপরওলার কাছে লুকোছাপা না রেখে নিজের মনোভাবটি সোজাসুজি প্রকাশ করল। আর তাতেই কাজ হয়ে গেল সহজে। মঞ্জুর হল তিনদিনের ছুটি।

উৎসবের আগের দিন দশটা নাগাদ সাংলার বাড়িতে বন্ধুকে নিয়ে পৌঁছল তপোনাথ। একদিকে দুধের মত সাদা আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে ধবলাধার গিরিশৃঙ্গ, অন্যদিকে সুউচ্চ কিন্নর কৈলাস। মাঝে নাতিউচ্চ কামরু পাহাড়। কিন্নর কৈলাসের কোন বার্তা নিয়ে সে যেন ছুটে আসছিল ধৌলাধারের দিকে কিন্তু 'তিষ্ঠ' বলে তাকে থামিয়ে দিল নীলবসনা বাস্‌পা নদী। সে তাকে গান শোনাল, নুড়ির নূপুর বাজিয়ে নাচ দেখাল, সাদা ফেনার তরঙ্গ তুলে হাসি ছড়াল। কামরু তাকে ডিঙিয়ে আর পৌঁছতে পারেনি ধৌলাধারের কাছে!

সাংলার পি. ডব্লিউ. ডি. বাংলো পেরিয়ে কামরুর দিকে যেতে যেতে তপোনাথ এইসব কথা বলছিল।

পাহাড়ের কোলে ক্ষেতি। ঝিব্‌ঝির্ করে ক্ষেতির মাঝ বরাবর বয়ে চলেছে একটা পাহাড়ী নালা। ডানদিকের বাগিচায় শেও, নাসপাতি আর তিত্‌রী গাছ। ফলে রঙ ধরেছে। বাগিচার একদিকে দাঁড়িয়ে আছে খরসু গাছের সারি। তপোনাথ বলল, এ গাছ জ্বালানি হিসেবে খুবই উৎকৃষ্ট।

সারা বাগিচাটি ঘিরে বসন্ত গাছের ঝোপ।

কামরু পাহাড়ে উঠতে উঠতেই তপোনাথ আঙুল দেখিয়ে বলল, ঐ যে শেও গাছের পাশে একটা ছট্‌কংয়ের (গৃহ মন্দির) চূড়া দেখা যাচ্ছে ওর পেছনের বাড়িটা পুনমের। বাড়িটার নাম দিয়েছে ধড়কন। এর পাশ দিয়ে যখনই যাই, আমার হার্ট বিট্‌টা ট্রেনের ইঞ্জিনকেও হার মানায়।

সুপর্ণ বলল, পুনমের সঙ্গে যাবার পথে তোমার দেখা হবে না?

হতেও পারে। মনে হয় ওর বাবা এতক্ষণে বেরিয়ে পড়েছেন।

কোথায়?

উনি তো সাহুকর (মহাজনী কারবারী)। রোজ সকালে একবার করে তাগাদায় বেরোন।

একটু এগিয়েই পথে দেখা গেল পুনমের বাবা সুরমঙ্গলজীকে। বয়স্ক, মোটাসোটা মানুষ। স্ত্রীবিয়োগের পর আর সংসার করেননি। পুনম এখন সপ্তদশী। পরঘর যাবার জন্য তৈরি। সেজন্যে নাকি সাহুকরজীর রাতে ভাল করে ঘুমই হয না। সুরমঙ্গলজী একটি ছোট খাট ঘুণ্টে (পাহাড়ী টাট্টু) চেপে তুড়ুং তুড়ুং করে নীচে নেমে আসছিলেন। কাছাকাছি হতেই একটা নমস্কার ঠুকল তপোনাথ।

দড়ির রাশ টেনে টাট্টুটিকে থামালেন সুরমঙ্গলজী।

কবে এলে?

এইমাত্র। এখনও ঘরে ঢোকা হয়নি।

তা ভাল। তোমার সঙ্গের ছেলেটি কে? এ দেশীয় বলে তো মনে হচ্ছে না।

ও ক্যালকাটার মানুষ, আমার সঙ্গে কাজ করে।

সুরমঙ্গলজী ভারী উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, কোলকেত্তা, শুনেছি, সে নাকি ভারী তাজ্জব শহর। হাওয়ায় নোট ওড়ে। যে ধরতে পারে সে লাখপতি বনে যায়।

সুপর্ণ বলল, আজ্ঞে ঠিক তা নয়, তবে বড় ব্যবসা বাণিজ্যের জায়গা। গুছিয়ে বসতে পারলে আখেরে লাভ হয় অনেক।

সুরমঙ্গলজী মনে হল একটু নিরাশ হলেন। তিনি নাকি অনেকদিন আগে এক পর্যটকের মুখ থেকে ঐ বিস্ময়কর কথাটি শুনেছিলেন এবং বিশ্বাসও করেছিলেন গভীরভাবে। তাঁর মনে হয়েছিল, শহরের লোকজন টাকার কুমীর। ছাদে শুকোবার জন্য মাদুরের ওপর রাশি রাশি নোট ছড়িয়ে দেয়। তারপর

মাঝে মাঝে যখন দমকা হাওয়া বয় তখন ঐসব নোটের কিছু কিছু উড়ে গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নীচে পড়ে। যার কপাল ভাল সে হাওয়ায় ভেসে আসা নোটগুলো ধরে নিয়ে থলিতে পোরে।

সুরমঙ্গলজী বললেন, তপোনাথ আছ তো কয়েকদিন?

তিন দিনের ছুটি। বাড়িতে এ তিন দিনই থাকব।

সুরমঙ্গলজীর মুখে কোন ভাব ফুটল না। তিনি টাট্টুর পেটে হাঁটুর গোঁত্তা মেরে সামনে এগিয়ে গেলেন।

সুপর্ণ পথ চলতে চলতে বলল, তোমার ব্যাপারটা উনি জানেন তো?

তপোনাথ বলল, সঠিক বলতে পারব না। কিছু হয়ত অনুমান করতে পারেন। এক সময় এক মধ্যস্থ কথা পেড়ে বলেছিল, তপোনাথ বড় ভাল ছেলে, সরকারের চাকরিতে ঢুকেছে, বলেন তো আপনার মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ের ঘটকালি করি।

সুরমঙ্গলজী জিভ কেটে বলেছিলেন, আরে রামো রামো, কথাটা ভেবে চিন্তে বলবে তো। মিলিটারীর কাজ, মানুষটা এই আছে তো এই নেই। তার হাতে জলজ্যান্ত মেয়েটাকে তুলে দি কি করে।

সুপর্ণ বলল, তাহালে এখনও তুমি পুনমের ব্যাপারে সংশয়মুক্ত হতে পারনি?

তপোনাথ বলল, বিশ্বাস, নির্ভরতা। আমরা দুজনকে দুজনে বিশ্বাস করেছি, এর চেয়ে বড় নিশ্চয়তা আর কিসে আসতে পারে।

সুপর্ণ আর কোন কথা বলল না। এই মুহূর্তে তপোনাথের ওপর তার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

সুরমঙ্গলজীর বাড়ির কাছে এসে তপোনাথ গলার স্বরটা একটু ভিন্ন রকম করে ডাক দিল, সাঙ্কুরজী আছেন?

ভেতর থেকে মিষ্টি একটা গলা বেজে উঠল, কে? কি চাইছেন?

তপোনাথ এবার বলল, রিখা (ভালুক) এসেছে, মধুর খোঁজে।

এবার গলার স্বরটা চিনতে পেরেছে অন্তরালবর্তিনী। সে ছুটে এল নরম পায়ের আওয়াজ তুলে।

বাইরে এসেই গলায় খুশির একটা ঢেউ তুলতে গিয়ে থেমে গেল পুনম। নতুন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে আপনজনের পাশে। চোখে সলাজ আনন্দের ঝলক।

কোন কথা না বলে পুনম ঘরের ভেতর থেকে দুটো আসন এনে দাওয়ায় পেতে দিল।

তপোনাথ আসনে বসতে বসতে বলল, আমার বন্ধু সুপর্ণের কাছে অনেক গল্প করেছি তোমার। এবার উ-খিয়াংয়ের মেলায় ওকে নিয়ে এলাম তোমাকে দেখাব বলে।

পুনম তপোনাথের চেয়ে বয়সে কেবল ছোট নয়, ভারি সহজ সরল আর লাজুক প্রকৃতির মেয়ে। সে তপোনাথের কথা শুনে লজ্জায় দুটো হাতের পাতা দিয়ে মুখ ঢাকল। তারপর দ্রুত পা চালিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল।

তপোনাথও ঢুকল ঘরের ভেতর। কিছুক্ষণ পরে হাতে একটা জলভরা আরবো (হাত ধোবার জলপাত্র) নিয়ে সুপর্ণের কাছে বসিয়ে দিয়ে পুনম বলল, আপনি মুখ হাত ধুয়ে নিন। সামান্য একটু চা খেয়ে তবে বন্ধুর বাড়ি যাবেন।

সুপর্ণ হেসে বলল, অবশ্যই চা খেয়ে যাব তোমার হাতে, কিন্তু আমার বন্ধুটিকে কোথায় লুকিয়ে রাখলে?

হাসিতে ভরে উঠল পুনমের মুখখানা। একেবারে ভোরের রোদের মিষ্টি হাসি।

এত নির্মলতা, এত সৌন্দর্য কি মানুষের দেহে সম্ভব! পুনমকে দেখে সুপর্ণের তাই মনে হচ্ছিল।

চা আর জলখাবার খেয়ে ওরা দুবন্ধুতে আরও ওপরে উঠতে লাগল। চলতে চলতে তপোনাথ বলল, এ তিনদিন সারা সাংলা জুড়ে আনন্দ উৎসব। মেয়ে পুরুষ কারুরই ঘরের বন্ধন নেই। পুনমেরও ছুটি। সারা দিনরাত্রি বান্ধবীরা এক সঙ্গে মিলে হৈ-হুল্লোড়ে কাটিয়ে দেবে। নিতান্ত দরকার না পড়লে ঘরে ঢুকবে না কেউ।

সুপর্ণ বলল, কিন্তু এ কদিন পুনমের বাবা কি করবেন?

তপোনাথ হেসে বলল, নিজের চরকায় নিজে তেল ঢালবেন। রান্নাবান্না নিজেই করে নেবেন। রাঁধুনিও তিনদিনের ছুটিতে থাকবে। কৃপা করে যদি কোন এক ফাঁকে রেঁধে দিয়ে যায় তো স্বর্গলাভ।

উনি মেলায় যাবেন না?

আমার জ্ঞান হওয়া অবধি ওঁকে প্রতিটি উৎসবে ঘরে বসে থাকতেই দেখেছি। চাচী ঠিক পুনমের মত ভারি খোসমেজাজের আনন্দময়ী মহিলা ছিলেন। যে বছর মারা গেলেন সে বছর মেলার সময় রোগে শয্যাশায়ী। পুনম কিছুতেই মাকে ছেড়ে মেলায় যাবে না। উনি মেয়েকে জোর করে ঠেলে ঠেলে পাঠালেন। পুনমের কাছে শুনেছি, মেলা-প্রাঙ্গণে বাজনা বেজে উঠলেই উনি ঘোরের ভেতর থেকে হঠাৎ জেগে উঠতেন। মুখে এত কষ্টের চিহ্নমাত্র থাকত না। আনন্দে ভরে উঠত মুখখানা।

সুপর্ণ বলল, মেয়ে নিশ্চয় মায়ের স্বভাবই পেয়েছে।

কামরূর মানুষজন প্রায়ই সে কথা বলে থাকেন। মায়ের রূপ, মায়ের স্বভাব নিয়েই যেন জন্মেছে পুনম। কোন বাড়ি থেকে অসুখ-বিসুখের গন্ধ পেলেই ছুটল রাত জেগে সেবা করতে। পুনমকে তাই আমার ছেলে বন্ধুরা বলে, 'লেডি উইথ দা ল্যাম্প।'

তুমি ভাগ্যবান তপোনাথ।

হাসতে হাসতে তপোনাথ বলল, ভাগ্য অঘটন ঘটন পটিয়সী। আগে ভাগ্যের শেষ পর্ব পর্যন্ত পৌঁছই তখন দেখা যাবে।

সন্ধ্যার খানিক আগে তপোনাথ বলল, আজ আমার নিশি-জাগরণ। আমি বাড়ি থাকব না। কাল ভোরে এসে তোমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে মেলায় নিয়ে যাব।

তুমি কি পুনমের সঙ্গে কোথাও যাবে?

এই উৎসবে প্রতিটি বাড়ির প্রতিটি যুবক সাজি হাতে ফুলের খোঁজে বেরুবে। কাল সকালে ওইসব ফুল জমা রাখতে হবে মেলা-প্রাঙ্গণের উদাব্রোতে। রাতে ফুলের খোঁজে অনেকেই বেরিয়ে যায়, আমিও যাব।

উদাব্রো কি?

মেলা-প্রান্তরের ওপরে একটি গুহা। ওখানে প্রত্যেকেই ফুলের সাজি তুলে রাখবে। তারপর মাহাসুর পুরোহিতের সঙ্গে উ-খিয়াংয়ের গান গাইতে গাইতে গ্রামের দিকে যাত্রা করবে। পর্বতের দেবতাকে পুজো দিয়ে সন্তুষ্ট করবে। মহাকালীর কাছে দেবে পাঁঠা বলি।

সুপর্ণ বলল, উদাব্রোতে রাখা ফুল দিয়ে কি হবে?

হেসে বলল তপোনাথ, কাল দেখবে।

সুপর্ণ বলল, আমি কি আজ তোমার সঙ্গে রাত জেগে ফুল সংগ্রহের কাজে লাগতে পারি।

সে তো দারুণ আনন্দের ব্যাপার। তবে তুমি আমার অতিথি, তোমার কোন কষ্ট হোক এ আমি চাইছিলাম না।

আমি তোমার বন্ধু নয়?

তা ঠিক।

তবে তুমি আমার কষ্টের কথা ভাবছ কেন? এটা হবে একটা চমকপ্রদ নতুন অভিজ্ঞতা।

তপোনাথ বলল, তাহলে মাকে বলে রাখছি দুজনকে সন্ধ্যায় একসঙ্গে খাইয়ে দিতে।

মেসোমশায়কে বলতে হবে না?

বাবা তো মেলা কমিটির সেক্রেটারি। আজ থেকে মেলাপ্রাঙ্গণে তাঁবুতে তাঁর রাত্রিবাস। তিন চারদিন ঘরমুখো হবেন না। তুমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পার।

তপোনাথের বছর ছয়েকের ছোট বোনটা ক্রমাগত দরজার আড়াল থেকে, জানালার ফাঁক দিয়ে নতুন আগন্তুকের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রথম দর্শনে অতিথির কাছাকাছি এসে সে

একটা বিপদে পড়ে গিয়েছিল। সুপর্ণ তাকে কোলে তুলে নিয়ে একটা আবদার জানিয়েছিল, আমার কালো রঙটা নিয়ে তোমার গায়ের ফর্সা রঙটা আমাকে দেবে?

সে প্রবল জোরে মাথা নেড়ে কোল থেকে নেমে পড়েছিল। তারপর উর্ধ্বশ্বাসে আত্মরক্ষার জন্য ছুটে পালিয়েছিল অন্দরে মায়ের কাছে।

তপোনাথের মা মেয়ের কাণ্ড দেখে হেসে গড়াগড়ি। শেষে তাকে নানাভাবে বোঝাতে লাগলেন, ওরে বোকা মেয়ে রঙ কখনও বদলাবদলি করা যায় না।

মায়ের কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছে ঝুমকি। সে এখন নতুন মানুষটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টায় ব্যস্ত।

আকাশে শুক্লা অষ্টমীর চাঁদ। শরতের প্রায় নির্মেঘ আকাশ। দুবন্ধুতে সাজি হাতে বেরিয়ে গেল। এদিক ওদিক থেকে অনেক যুবকই বেরিয়েছে। কিন্তু কেউ কারু গন্তব্যস্থানের উল্লেখ করছে না। এটা নাকি নিয়মও নয়।

তপোনাথ সুপর্ণকে নিয়ে কামরু পাহাড় থেকে নেমে বাগিচা বাঁ দিকে রেখে মেলা প্রাঙ্গণ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল। অনেকগুলো আলো জ্বলছে, কাজ চলছে পুরো দমে। কাল মেলার শুরু।

মেলা-প্রাঙ্গণ ডান দিকে ফেলে ওরা নেমে গেল বাস্পা নদীর পুলের দিকে। বোল্ডারে ধাক্কা লেগে নীল জলধারা কোথাও কোথাও ছড়িয়ে দিচ্ছিল রুপোর দানা। ওই অষ্টমীর চাঁদের আলোতেও দেখা যাচ্ছিল সেই খুশির ঝিলিক।

পুল পেরিয়ে ওরা ঢুকল পর্বতের পাদদেশের বনে। ঘন সবুজ অরণ্য। সরল পাইনের সারি। ওরই ফাঁকে ফাঁকে লতাগুল্মের ঝোপঝাড়। মাঝে মাঝে তপোনাথের হাতের টর্চ ঝলসে উঠছিল। বনের আঁধার কোণ থেকে হাসি ছড়াচ্ছিল ফুল। তপোনাথ তাদের তুলে এনে শুইয়ে দিচ্ছিল সাজিতে।

গিরিচূড়ায় চাঁদের আলো পড়ায় মনে হচ্ছিল মায়াময় অলকাপুরী।

তপোনাথ বলল, আরও ওপরে উঠব কিন্তু আমরা। যদি পাহাড়ে উঠতে তোমার অসুবিধে হয় তাহলে একটুখানি দূরে ফরেস্ট হাউস রয়েছে, সেখানে তোমাকে রেখে আসব। আমি ওপর থেকে ফুল তুলে নামার সময় তোমাকে ডেকে নেব।

একটুও কষ্ট হবে না তপোনাথ, তুমি মিথ্যে ভাবছ। তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব আমার শক্তির উৎস।

সুপর্ণ তপোনাথের পেছন পেছন অনেকখানি ওপরে উঠে গেল।

হাঁপ ধরছিল কিন্তু একটুখানি বিশ্রামের পর শরীরে ফিরে পাচ্ছিল বল।

আরও খানিকটা ওপরে উঠে একটা গিরিশিরার বাঁক ঘুরে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল একটা আলো। কাঠের টুকরো, ডালপালা জ্বালিয়ে আগুন ধরিয়েছে কেউ। আগুনে দেখা যাচ্ছিল একটা গুহা। দূর থেকে মনে হল কয়েকটা ভেড়া শুয়ে আছে।

একটা লোক ওই ভেড়ার দঙ্গলের ভেতর থেকে উঠে দাঁড়াল। সে এগিয়ে এল তপোনাথদের দিকে।

মাথাটাকে একটুখানি ঝুঁকিয়ে বলল, আপনারা গা হাত একটু সেঁকে নিন। তারপর আমিই আপনাদের নিয়ে যাব বিভিন্ন ফুলের রাজ্যে।

তুমি জানলে কি করে যে ফুলের জন্য আমরা এত ওপরে উঠে আসব?

নীচ থেকে যখন ভেড়া নিয়ে ওপরের বুগিয়ালে (চারণক্ষেত্রে) ওঠার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম তখন পুনম দিদির সঙ্গে দেখা। তার মুখেই আপনাদের ওপরে ওঠার খবর পেয়েছি। পুনম দিদি বলে দিয়েছিল, আমি যেন আপনাদের ভাল ভাল ফুলের খবর দি।

তপোনাথ আর সুপর্ণ আগুনের ধারে গিয়ে বসল। এতখানি ওপরে উঠে আসার জন্য শীতের প্রকোপ বোঝা যাচ্ছিল।

তপোনাথ বলল, আমি যে বাস্পা পেরিয়ে এই পাহাড়ে উঠব তা একমাত্র পুনমকেই বলেছিলাম।

সুপর্ণ বলল, এই ভেড়াওয়ালাটি মনে হয় পুনমের জানাশোনা লোক।

লোকটি পুনমের পূর্ব পরিচিত নিশ্চয়ই। ও কখন ওপরে উঠবে তা পুনম জানত। তাই যথাসময়ে ওকে আমাদের খবর জানিয়ে দিয়েছে।

মেষচারকটি বলল, আমার কাছে ভেড়ার দুধ আছে। মক্‌কির রুটি বানিয়ে দিতে বেশি সময় লাগবে না।

তপোনাথ বলল, আরে না না, এখুনি পেট ভরে খেয়ে এসেছি।

তাহলে সাহেব আপনারা এখুনি উঠুন। কে কখন এসে পড়ে, তার আগেই আমাদের কাজ সেরে নিতে হবে।

ফুলের যথার্থ সন্ধান রাখে এই পালসটি। দুটি ছোট ছোট জঙ্গল ঢুঁড়তেই বড় আকারের সাজিখানা একেবারে ভরে উঠল। গিয়ালচি, খাসবল, লোসকার্চ, রোঙ্গল, আরও কত নামের কত রঙের ফুল।

ভারি খুশি হয়ে উঠেছে তপোনাথ। সে পকেট থেকে দশ টাকার তিনখানা নোট বের করে ভেড়াওলার দিকে তুলে ধরল।

ভেড়াওলা দু'পা পিছিয়ে গিয়ে জিভ কেটে কান মলল। মুখে বলল, আপনাদের কাছ থেকে টাকা নেব আমি! পুনম দিদি জানতে পারলে আমাকে কি আর আস্ত রাখবে। দিদির দৌলতেই তো আজ এতগুলো ভেড়ার মালিক হয়েছি আমি।

আমরা ওই পালসটিকে (মেষচারক) টাকা পয়সা নিয়ে আর কিছু বলতে পারলাম না।

ভোরবেলা সাজিভরা ফুল রাখা হল উদাব্রোতে।

ফুলসংগ্রহকারীরা একসঙ্গে জড়ো হলে মাহাসুর পুরোহিত তাদের নিয়ে গিয়ে পর্বত দেবতার সন্তুষ্টির জন্য পুজো দিলেন। মহাকালীর উদ্দেশ্যে একটি পাঁঠা বলি দেওয়া হল। এরপর সবাই যে যার গাঁয়ে ফিরল উ-খিয়াংয়ের গান গাইতে গাইতে।

পরের দিন সকাল থেকে শুরু হয়ে গেল রান্নার তোড়জোড়। গাঁয়ের সকলে তাদের মধ্যাহ্নভোজ প্যাক করে নিয়ে পাহাড়ের ওপরে যে যার ডোগরিতে (গ্রীষ্মাবাস) চলে যাবে। সেখানেই বসবে ভোজের আসর।

নিয়ম মত সব কাজই এগোলো। একটা ছোট্ট পাহাড়ি বনের ভেতর হয়তো চার পাঁচটা বাড়ি। পাশের বনে আরও কয়েকখানা। এমনি সব বাড়ি তৈরি করে রেখেছে প্রতিটি পরিবার। গ্রীষ্মকালে সমতল থেকে উঠে এসে এরা বাস করে এইসব ঘরে।

ইতিমধ্যে সুপর্ণ ঠেলে পাঠিয়েছে তপোনাথকে পুনমের ডোগরিতে। সে নিজে বহু সাধাসাধিতেও যেতে চায়নি বন্ধুর সঙ্গে। দুদণ্ড কথা বলুক ওরা একান্তে। এ সময় যত বড় বন্ধুই হোক সে বিঘ্নকারী ছাড়া আর কিছুই নয়।

মধ্যাহ্নভোজের কাছাকাছি সময়ে ফিরে এল তপোনাথ। মুখ দেখে বুঝল সুপর্ণ, প্রেমানন্দের জোয়ার বইছে।

একসময় সুপর্ণের কানের কাছে মুখ এনে বলল তপোনাথ, এবার কিন্তু না বললে শুনব না।

আগে তো আদেশটা শোনা যাক।

তপোনাথ বলল, মিলিটারিতে আদেশ এলেই বিনা প্রশ্নে প্রতিপালন করতে হয়। তুমি নির্বিচারে আমার আদেশ পালন করে যাবে।

যথা আজ্ঞা।

তপোনাথ বলল, আজ উদাব্রোর ফুল কিছুটা দেওয়া হবে দেবতাকে। তারপর প্রতিটি যুবক ওই ফুল উপহার দেবে তার একান্ত মনের মানুষকে। এটাই উ-খিয়াং বা ফুলেচ উৎসবের রীতি। কিছু পরে সবাই এখান থেকে চলে যাবে। রাতে আর কেউ ফিরবে না। আমরা কিন্তু রাতে আসব এখানে। পুনমকে ফুল দেব ওর ডোগরীতে।

আমি কেন থাকব?

তুমি থাকবে, এটাই আমার আদেশ। আমার ভালবাসার সাক্ষী হয়ে থাকতে হবে তোমাকে।

মধ্যাহ্নভোজের পর সবাই একসঙ্গে পাহাড় থেকে নেমে মিলিত হল মেলা-প্রাঙ্গণের খানিকটা দূরে। সেখানে বাজনা বাজাতে বাজাতে নিয়ে আসা হল বদরিনাথজীকে। এবার মাহাসু আর বদরিনাথজীর দুই মুখপাত্র এগিয়ে চললেন দেবতাদের নিয়ে প্রাঙ্গণের নির্দিষ্ট স্থানটির দিকে। পেছন পেছন মিছিল করে চলল মানুষজন।

যথাস্থানে পৌঁছানোর পর বদরিনাথজীর গ্রোকচ (দেবতার প্রত্যাদেশ যার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়) ফুল সংগ্রহকারীদের ভেতর থেকে দুজনকে নির্বাচন করলেন দেবতার প্রত্যাদেশ পাবার মত একটা ঘোরের ভেতর দিয়ে।

আশ্চর্য! দুজন নির্বাচিতের ভেতর একজন হল তপোনাথ।

নির্বাচিত দুজন এবার জনতার উল্লাসধ্বনির ভেতর দিয়ে উদাব্রো থেকে নিয়ে এল তাদের ফুলে ভরা সাজি।

অতীতে ওই দুটি সাজি থেকে দেবতাদের কিছু ফুল দেবার পর রামপুর বুশাহারের মহারাজ প্রথম ফুল গ্রহণ করতেন। এখন সম্মানীয় কোন ব্যক্তিকে ডেকে এনে ফুল দেওয়া হয়।

এই অনুষ্ঠান চুকে যাবার পর নাচ গানের আসর জমে উঠল। মেয়েদের কণ্ঠে যেন নন্দন থেকে ঝরে পড়া কোন ঝর্ণার সুমিষ্ট কলধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ঘুরে ঘুরে এগিয়ে পিছিয়ে চক্রাকারে নাচছে যুবক যুবতীরা। যেন একটি পদ্ম, কলি থেকে পাপড়ি মেলে ফুটে উঠছে, আবার রূপান্তরিত হচ্ছে কলিতে।

পুনম নাচিয়েদের ভেতর বয়সে কিছু ছোট কিন্তু তার হাসি, গান নাচ, মন কেড়ে নিল সকলের।

তপোনাথ যোগ দেয়নি নাচের দলে। সে আর সুপর্ণ সবার সঙ্গে মিশে বাহবা আর হাততালি দিচ্ছে।

নাচ ভাঙল এক সময় কিন্তু মনের মাতন থামল না।

গ্রোকচ সামনের ফসল এবং মানুষের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করার পর মেলার সমাপ্তি ঘোষিত হল।

যুবকরা ছুটল উদাব্রো লক্ষ্য করে। নিজের নিজের ফুলের সাজি তুলে নিয়ে দেবতার চরণে প্রথম নিবেদন করল কয়েকটি ফুল। তারপর যাত্রা করল যে যার পূর্ব নির্দিষ্ট নিভৃত স্থানটির দিকে। সেখানে তারা মিলিত হবে তাদের নিজ নিজ প্রিয়তমার সঙ্গে।

রাত্রি তখন প্রায় নটা। নির্মেঘ আকাশে উজ্জ্বল নবমীর চাঁদ। তপোনাথ আর সুপর্ণ তাকিয়ে আছে কিছুটা ওপরে পাহাড়ি বনের দিকে। জ্যোৎস্না ঝরছে পর্বতের তুষার চূড়ায়, অরণ্যের শাখা পল্লবে। পাইনের পাতায় বাতাস তুলেছে সেতারের মিঠি মিষ্টি সুর।

মনে হল নির্জন বনের পথ ধরে নেমে আসছে এক পরী। তার পালকের মত শরীরটাকে ঢেকে রেখেছে, 'তাপ্রু-সে-দোরি' (অপূর্ব নকশা তোলা স্থানীয় পোশাক)। রূপোর 'দিগ্‌রা' দিয়ে সে বুকের কাছে বেঁধে রেখেছে তার কাজ করা সাদা শালের দুই প্রান্ত।

ফুল, শুধু ফুল। বেশির ভাগ সাদা। কোরকে গোলাপি আভা হলুদ ফুল। লালফুলের ভেতর থেকে হলুদ কেশর বেরিয়ে এসেছে, রেণু রেণু পরাগ মাখা।

সবকটি ফুলেই জ্যোৎস্না-পরী নিপুণ হাতে তৈরি করেছে তার অলঙ্কার!

নিজের ডোগ্‌রী থেকে বনদেবীর মত ফুলের সাজে সেজে নেমে এল পুনম। মুখে সলজ্জ মিষ্টি হাসি।

সুপর্ণ বলল, নীল নির্জন থেকে জ্যোৎস্না-পরীর আবির্ভাব হল।

পুনম তার শ্বেত পদ্মের পাপড়ির মত চোখ থেকে তারার ভ্রমর উড়িয়ে বলল, প্রিয় বন্ধুর এই কথাটি আমার বহুদিন মনে থাকবে।

তপোনাথের পরণে চুড়িদার ছামু সুতান। পুরো শরীর ঢেকে ছুবা। তার ওপর বুক ঢাকা মাখন রঙের উলের বাস্কট। মাথায় উলের তৈরি থেপাং (টুপি), ভেলভেটের লাল পটি লাগানো।

সুদর্শন তপোনাথকে ওই পোশাকে দেবদূত বলে মনে হচ্ছিল।

সুপর্ণ বলল, আজ আমি তপোনাথের ডোগরীতে আরাম করে ঘুমবো। দরজা বন্ধ থাকবে। ভোর রাতের আগে তোমাদের কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। এ রাত কেবল তোমাদের দুজনের।

পুনম বলল, সে কি, আপনি আমাদের দুজনেরই বন্ধু, আপনি থাকবেন আমাদের মাঝখানে।

সুপর্ণ বলল, তোমাদের মাঝখানে আজ যদি একান্তই কাউকে থাকতে হয় তাহলে তিনি প্রেমের দেবতা পুষ্পধনু। তাঁকে এই চোখে দেখতে পাবে না, কিন্তু তিনি তোমাদের দুটি হৃদয়কে স্পর্শ করে থাকবেন।

তপোনাথকে বলল, ভাই তোমার আদেশ মেনে উঠে এসেছি ওপরে। না এলে এই বনবালাটিকে দেখতে পেতাম না। তবে দোহাই ভাই, আর আদেশটি কর না। আমি এখুনি তোমার বিছানাটি অধিকার করে শুয়ে পড়ব।

তপোনাথ হেসে হাত ধরল পুনমের। বলল, চল যাই, বন্ধুটিকে আজ আর নড়ানো যাবে না।

পুনম চলতে চলতে মাঝে মাঝে পেছন ফিরে হাত নাড়তে লাগল।

জ্যোৎস্নার আঁচলের দোলায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল বনকুসুমের সুবাস।

ভেতর থেকে একটা কুর্সি দাওয়ায় টেনে এনে বসল সুপর্ণ। ওরা নেমে চলেছে বনের পথ ধরে বাস্‌পা নদীর দিকে। ওদের আনন্দ-চঞ্চল গতি দেখে মনে হচ্ছে দুটো প্রজাপতি বনের গাছপালার ভেতর দিয়ে নাচতে নাচতে উড়ে চলে যাচ্ছে নদীর তীর লক্ষ্য করে।

এক ঝাঁক জোনাকি নীলাভ ঠাণ্ডা আলো ছড়াতে ছড়াতে নাচের ঢেউ তুলে উড়ে গেল। সুপর্ণের চোখের সামনে জোনাকির আলোর মত জ্বলতে লাগল টুকরো টুকরো ছবি।

দেবারতির সঙ্গে ওর বাড়িতে সেই প্রথম দেখা করতে যাবার দিনটির কথা মনে পড়ল। কি করে যাওয়া যায় ওর বাড়ি। একটা অজুহাত খাড়া করতে হয়। সঞ্চারির কাছ থেকে যোগাড় করা হল একতাড়া নোট। অধ্যাপকের হাতে লেখা নোটের জেরক্স কপি।

সঞ্চারির যেন নোটটি দেবার কথা ছিল দেবারতিকে; কিন্তু কয়েকদিন অসুস্থ থাকায় সে কলেজে যেতে পারেনি। তাই এতখানি খোঁজ-খাঁজ করে বাড়ি বয়ে সুপর্ণের আসা।

বেল বাজাতেই যে এসে দরজা খুলল সে দেবারতি নয়, অমৃতা। দেবারতির মুখে অমৃতার নামটুকুই মাত্র শুনেছিল। ছোট বোন, বছর তিনেকের ব্যবধান। সবার ছোট আর একটি ভাই আছে দেবারতির। একটা রাগিণীর নামে তার নাম, ইমন কল্যাণ।

এইসব অদেখা চরিত্র দেবারতির চোখ দিয়ে সে দেখেছে। কফি হাউসে গল্প করতে করতে অথবা বড়বাজারের ঘিঞ্জি ফুটপাথের ওপর দিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে হাঁটতে দেবারতির মুখে শুনেছে তার ভাইবোন, মা বাবার কথা।

সে জানত অমৃতা স্কুলের ছাত্রী। কিন্তু অমৃতা কখনও দিদির মুখ থেকে শোনেনি সুপর্ণের কথা।

অমৃতা সবে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের সোনালি সকালের দিকে দুচোখের দৃষ্টি মেলে দিয়েছে। সবাই তার চোখে আকর্ষণীয়। সব কথাই জাগিয়ে তুলছে তার কৌতূহল। অচেনা, অপরিচিত যুবক দেখলেই উৎসাহিত হয়ে উঠছে সে।

মনের এমন এক মুহূর্তে দরজা খুলেই দেখল অপরিচিত এক যুবক দাঁড়িয়ে। শ্যামলা রঙ, স্বাস্থ্যবান, জীবনের প্রাচুর্যে ভরপুর।

জিজ্ঞাসু চোখে অপরিচিতের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অমৃতা।

কাকে চাই, কথাটা উচ্চারণ করার আগেই সুপর্ণ বলল, এটা কি দেবারতি মিত্রের বাড়ি?

হ্যাঁ, কিন্তু দিদি তো বাড়ি নেই।

উনি কখন ফিরবেন?

রোজ কলেজ ছুটির পর এর অনেক আগেই ফিরে আসে কিন্তু আজ ওর বন্ধুদের সঙ্গে নিউ মার্কেটে যাবার কথা।

তাহলে আজ আমি আসি।

সে কি! দিদি নেই বলে কি ঘর খালি নাকি। আসুন ভেতরে, মায়ের সঙ্গে কথা বলবেন।

বেশ সপ্রতিভ বলে মনে হল অমৃতাকে। অতএব সুপর্ণ অমৃতাকে অনুসরণ করে ঢুকল ওদের বসার ঘরে।

ছিমছাম ঘর। সোফার বদলে একটি লম্বা সরু খাট পাতা দেওয়াল ঘেঁষে। তার ওপর মণিপুরী কাজ করা একটি চাদর পাতা। ঘরের অন্যদিকে শান্তিনিকেতনী তিনখানা মোড়া।

অমৃতা বলল, আপনি বসুন, আমি মাকে ডেকে আনছি।

অমৃতা চলে গেল। সুপর্ণ এই প্রথম অমৃতাকে দেখল। দেবারতির চলন, বলন, দৃষ্টির ভেতর যে গভীরতা তা অমৃতার ভেতর নেই, কিন্তু যা আছে তা এক কিশোরীর আন্তরিকতা। চঞ্চলতা তার চোখে মুখে কিন্তু প্রতিটি আচরণ হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়।

এক ধরনের সৌন্দর্য আছে যা মধ্যাহ্নের আলোর মত ঝকঝকে। সে উজ্জ্বল, কিন্তু তার এমন দাহিকাশক্তি আছে, যা চোখকে পীড়িত করে। অন্য এক সৌন্দর্য, ভোরবেলার আলোর মত। যার কাঁচা হলুদ রঙ দৃষ্টিকে স্নিগ্ধ করে, মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে। এই দুটি বোন সৌন্দর্যের সেই প্রভাতী আলো।

দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন এক মহিলা। মুখের আদলে বেশ বোঝা যাচ্ছিল দেবারতি আর অমৃতার মা। সুপর্ণ অমনি উঠে দাঁড়িয়ে নত হয়ে নমস্কার করল।

বস বাবা, আমি দেবারতির মা। পাঁচটা বাজল, যেখানেই যাক, ও এখুনি এসে পৌঁছবে।

সুপর্ণ বলল, আমার বন্ধুর একটি বোন ওর সঙ্গে পড়ে। ওদের প্রফেসারের দেওয়া একটা দরকারি নোট তার কাছে ছিল। সে কদিন কলেজ যাচ্ছে না, তাই নোটটাও দেবারতিকে দিতে পারছে না। আমি যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি। আজ এসেছিলাম বন্ধুর বাড়ি। ওর বোন সঞ্চারি দরকারি নোটটা আমার হাতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

তুমি বস বাবা, আমি চা করে আনছি। দেবারতি এল বলে।

ঘরে এখন সুপর্ণ আর অমৃতা।

সুপর্ণ বলল, অফিস থেকে বাবা কখন ফিরবেন?

ছ'টার পর।

তুমি কোন স্কুলে পড়?

আনন্দময়ী কন্যা বিদ্যাপীঠে।

কোন ক্লাশ?

নাইন।

লেখা পড়া ছাড়া আর কিসে আগ্রহ বেশি?

আমি নাচ শিখছি।

তুমি কোনারকে গেছ?

বাবা বেড়াতে ভীষণ ভালবাসেন। আমরা সবাই পুরী, ভুবনেশ্বর, চিল্কা আর কোনারক গেছি।

ওখানে মন্দিরের গায়ে নাচের মূর্তিগুলো দেখেছ?

খুব সুন্দর, পাথরে খোদাই বলে মনে হয় না, এত জীবন্ত।

তুমি কি ধরনের খাবার খেতে ভালবাস, নোনতা না মিষ্টি?

নোনতা, বলেই মুখে হাত চাপা দিয়ে হেসে উঠল অমৃতা।

হাসলে যে?

মনে হচ্ছে আপনি কনে দেখতে এসেছেন।

আবার একমুখ হাসি ছড়াল অমৃতা।

সুপর্ণ ভাবল, বেশ সহজ, সচ্ছন্দ, মধুর স্বভাবের মেয়েটি।

কিছুক্ষণের ভেতরেই চা এল, তার সঙ্গে ডিমভাজার কুচি আর লঙ্কা দিয়ে মুড়ি মাখা। একটা ছোট্ট প্লেটে দুটো মিষ্টি।

দেবারতির মা জলের গ্লাস আনতে ঘরে ঢুকলেন।

সুপর্ণ বলল, এ দুটো মিষ্টি তুমি খাবে।

কেন?

তুমি মিষ্টি ভালবাসনা বলে।

এবার দুজনেই খিলখিল করে হেসে উঠল। ওদের প্রাণ খোলা হাসির ভেতর ঘরে এসে ঢুকল দেবারতি।

প্রথমেই বিস্ময়ের চমক। পরক্ষণে একমুখ হাসি হেসে বলল, তুমি চা খেতে খেতে গল্প কর, আমি এখুনি আসছি।

দেবারতি চলে গেল ভেতরে।

অমৃতা বলল, দিদি কি আপনার চেনা?

কেন বল তো?

ওই যে আপনাকে 'তুমি' বলে বলল।

সুপর্ণ বুঝল, মেয়েটি বুদ্ধিমতী, সে অমনি বলল, তোমার দিদির দুটি বন্ধুই আমার চেনা। মাঝে মাঝে পথে ঘাটে ওদের তিনবন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। ওর বন্ধুরা আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে তাই তোমার দিদিও আমাকে তুমি বলতে শুরু করেছে।

অমৃতা বলল, আজকাল বড় একটা কেউ বয়সের সম্মান দেয় না।

কি রকম?

জানালার দিকে আঙুল তুলে অমৃতা বলল, ওই যে বাড়িটা দেখছেন ওটা পরমাদির বাপের বাড়ি। ছ'মাস আগে পরমাদির বিয়ে হয়েছে। সেদিন আমি আর দিদি ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম পরমাদিরা এসেছে শুনে। সেখানে গিয়ে যা শুনলাম না, কানে আঙুল দিতে হয়।

কি এমন শুনলে?

এত বড় বরকে পরমাদি প্রাণেশ, প্রাণেশ বলে ডাকছে, সবার সামনে।

সুপর্ণ বলল, প্রাণেশ নামটি তো বেশ।

আপনার বুঝি ও নামটি খুব পছন্দের।

ওটা আমাদের নয় মেয়েদের মুখে শোনায় ভাল।

কেন?

আগেকার দিনে মেয়েরা সবার আড়ালে স্বামীদের ওই নামে ডাকত। চিঠির প্রথমেও লিখত ওই নাম।

অমৃতা বলল, সে কি, যাঃ।

সত্যি বলছি, প্রাণেশ আর প্রাণেশ্বর তো একই কথা। তখন মেয়েরা ওই নামে স্বামীদের সম্বোধন করতে বড় ভালবাসত।

আপনি খুব মজা করে কথা বলেন।

সুপর্ণ বলল, পুরোপুরি বিশ্বাস হল না বুঝি? বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী পড়েছ? ওতে নবাবনন্দিনী আয়েষা বন্দী জগৎসিংহকে দেখিয়ে বলছে, 'এই বন্দি আমার প্রাণেশ্বর।'

দেবারতি ঘরে ঢুকে বলল, তোমাকে বকিয়ে মারছে তো? ও কথা বলতে খুব ভালবাসে।

ঠিক তোমার উল্টোটি। তুমি কথা খরচ করতে চাওনা, ও কিন্তু দ্রুত গৎ বাজানোর মত কথা বলে যায়। ওর খরচের হাত দরাজ।

অমৃতা দিদিকে কথা বলার সুযোগ দেবার জন্য উঠে দাঁড়াল। মুখে বলল, আপনি আবার কবে আসছেন?

দেবারতি বলল, এতক্ষণ কথার খই ফোটালি, নামটা জেনে নিতে পারলি না! সুপর্ণদা, নিজ মুখে তোমার নামটা শুনিয়ে দাও তো, ওর কানটা জুড়োক।

অমৃতা হাসিমুখে ঘাড় কাৎ করে বলল, আমার জানা হয়ে গেছে।

দেবারতি মজা করে বলল, এখনও সবটা জানা হয়নি। গাঁই গোত্র ঠিকুজি, কুলুজি।

সুপর্ণ উঠে দাঁড়িয়ে অমৃতার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি সুপর্ণ চৌধুরি।

দেবারতি হাসিমুখে বলল, এবার ঘোল খেয়ে গেলি তো। চৌধুরি এমন এক টাইটেল যা সব সমাজ সম্প্রদায়ের লোক বরণ করে নিয়েছে।

অমৃতা বলল, আমার সুপর্ণদা হলেই চলবে, ধড় ল্যাজার দরকার নেই।

তোমার বোন বেশ ইন্টেলিজেন্ট দেবারতি।

আমার তিন ভাইবোনের ভেতর বুদ্ধির স্রোত ওপর থেকে নীচের দিকেই প্রখর।

সুপর্ণ বলল, কেন, তোমার রেজাল্ট তো খুবই ভাল।

অমৃতার বয়সে আমি যে রেজাল্ট করেছি অমৃতা তার চেয়ে ভাল করছে, আমাদের ছোট ভাই ইমন আরও ভাল।

অমৃতা দিদির মুখে নিজের প্রশংসা শুনে শুধু একটি কথা বলল, বাবার মতে আমাদের ভেতর সেরা হল, দিদি। বাড়িতে যত চেঁচামেচি হোক দিদি একেবারে শান্ত। তাই সব তর্ক, সব ঝামেলার সমাধান দিদিই করে দেয়।

সেদিন সন্ধ্যে সাতটা বাজিয়ে দেবারতির বাড়ি থেকে উঠেছিল সুপর্ণ। দেবারতির মা বাবার সঙ্গে আলাপ করেও তার বড় ভাল লেগেছিল।

ছটি মাসও যায়নি বাড়ির ছেলে হয়ে গেল সুপর্ণ। নির্ভাবনায় তার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের বেড়াতে যেতে দিতেন দেবারতির মা বাবা।

পুজোর শাড়ি কিনতে গড়িয়াহাট গেল দেবারতি, যাদবপুর থেকে সুপর্ণ এসে মিলল তার সঙ্গে। কেনাকাটা শেষ করে দুজনে মশলা ধোসা খেয়ে কিছু সময় ঘুরল লেকের রাস্তা ধরে। বসল একটা শিরিষ গাছের ছায়ার তলায়। সামনের লেকে অপরাহ্নের রাঙা রোদ। কয়েকটা পানকৌড়ি ভাসতে ভাসতে হঠাৎ কি হল, তরাসে জলের ওপর দিয়ে পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে খানিকটা এগিয়ে আকাশে উড়ল। পাখার ঝাপটায় জলের কণাগুলো ভুট্টার দানার মত ছড়িয়ে পড়ছিল। জলের তরঙ্গে অপরাহ্নের সোনার ঝিলিক।

দেবারতির হাতের আঙুল ছুঁয়ে বলল সুপর্ণ, পানকৌড়িগুলো মুক্তোর ঝালর দেওয়া সোনার ঘরে বাস করছে।

দেবারতি বলল, খুব লোভ হচ্ছে বুঝি? সোনার সংসার রচনার স্বপ্ন দেখছ।

ওর হাতখানাতে চাপ দিয়ে বলল সুপর্ণ, স্বপ্ন কি স্বপ্নই থেকে যাবে আমাদের।

আমরা দুজনে কি বন্ধু নই? গভীর বিশ্বাসে হাতে হাত রাখিনি দুজনে? তবে সংশয় কেন সুপর্ণ?

মায়ের কাছে এখনও বলে উঠতে পারিনি আমাদের কথা। বড় রাশভারি। একবার কোন বিষয়ে না হলে আর হ্যাঁ করায় কার সাধ্যি।

নিজের ওপর বিশ্বাস রেখ, সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে একটি কথা জানবে, মায়ের মনে কষ্ট হয় এমন কাজ আমি তোমাকে করতে দেব না। আমি বরং সারা জীবন তোমার বন্ধু থেকে যাব কিন্তু তোমার মায়ের দুঃখের কারণ হব না।

তোমাকে ছাড়া আমি কোন কথা ভাবতেই পারি না দেবারতি।

তোমাকে একটা কথা বলি সুপর্ণ। একটি মেয়ে তার পূর্ণ মর্যাদা নিয়ে শ্বশুর বাড়ি যাবে। সে সব ছেড়ে আসছে। তাই শ্বশুরবাড়িরই দায়িত্ব তাকে পরিপূর্ণ ভালবাসা দিয়ে গ্রহণ করা। সমালোচনা নয়, আঘাত নয়, মনের উষ্ণ উত্তাপটুকুই তার ফেলে আসা জীবনের দুঃখকে ভুলিয়ে দিতে পারে। আমি এতগুলো কথা বললাম শুধু এইটুকু বোঝাবার জন্যে যে শুধু কারু স্ত্রী হয়ে শ্বশুরবাড়ি যাব, এ দুর্ভাগ্য যেন আমার না হয়। সবার ভালবাসার ভেতরে থেকে আমি একটি সংসারের বধূ হতে চাই।

তুমি বড় ভাবপ্রবণ দেবারতি, তাই তোমাকে নিয়ে আমার ভাবনার শেষ নেই। কখন কোনপথে যে নিজের অজ্ঞাতে তোমাকে আঘাত দিয়ে বসি তার জন্যে সংকোচে থাকি সারাক্ষণ।

একটুখানি হেসে সুপর্ণের হাতে চাপ দিয়ে দেবারতি বলেছিল, আমি তো শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান একজন যুবককে আমার সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করিনি, একজন হৃদয়বান মানুষকেই বেছে নিয়েছি।

মাঝে মাঝে অদ্ভুত খেয়াল চেপে বসে সুপর্ণের মাথায়। গঙ্গার ধার, গড়ের মাঠ কিংবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নয়, সে এমন এমন জায়গা নির্বাচন করে যেখানে নাকি ভালবাসার কথা ভালভাবে বলা যায়। সেসব জায়গার একটি, মনুমেন্টের চূড়া। অল্প সময় থাকা, দুচারটি কথা কিন্তু রোমাঞ্চ অনেকখানি। আবার কখনও কিছু ফুল কিনে নিয়ে কেয়ারটেকারের অনুমতি আদায় করে কবরখানায় ঢুকে পড়ে। কবরের ওপর ফুল ছড়ায় দুজনে। প্রতিজ্ঞা করে, আমৃত্যু দুজন দুজনকে স্মরণে রাখবে।

দুপুরে গঙ্গার ওপর ঘুরে বেড়ায় হয়ত একটা ডিঙি নৌকো ভাড়া করে। দু'ঘণ্টার ভ্রমণ, কথা হয় অনেকখানি, তবু মনে হয় সময় কোথা দিয়ে কেটে গেল, কত কথা বলার ছিল বলা হল না। বর্ষার দিনে এই নৌ-ভ্রমণ অবিস্মরণীয়। চরাচর ঢেকে যায় বৃষ্টিতে, দুজনে মুখোমুখি বসে কথা গান আর অকারণ পুলকে চেয়ে থাকা।

ট্রেনে উঠে পড়ে কোন কোন দিন। শহর ছাড়িয়ে কাছাকাছি গ্রামের ভেতর অখ্যাত স্টেশনে নেমে পড়ে। তারপর এগিয়ে যেতে থাকে মেঠো রাস্তা ধরে। একটি তালগাছে ঘেরা পুকুরের পাড় অথবা মাঠের মাঝখানে কোন পাতাভরা ঝাঁকড়া গাছ দেখলেই বসে পড়ে সেখানে।

সুপর্ণ বলে, এমনি কোন গাঁয়ের পরিবেশে আমি একটা ছোট্ট বাড়ি করতে চাই। স্টেশনের কাছাকাছি, যোগ থাকবে শহরের সঙ্গে।

দেবারতি বলে, তুমি তো স্থপতি, মাটির ঘর করলে কেমন হয়?

মাটির ঘর!

কেন, শান্তিনিকেতনে 'শ্যামলী' দেখনি? ঘন গাছের ছায়ায় এমন একটি ঘর হলে মন ভরে যায়।

সুপর্ণ বলে, মাটির ঘরকে একটু আধুনিক প্রয়োগ কৌশলে পাকাপোক্ত করে নিলে ভাবনার কিছু থাকবে না।

ঘরের বাইরের দেওয়ালে আমি সাঁওতালদের মত ছবি এঁকে রাখব। মধুবনীর অনুকরণে একটা প্যানেল তৈরি করে ভেতরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখলে বেশ দেখাবে।

ছাউনি কিসের করতে চাও?

কেন, খড়ের। ওপরে সুন্দর একটি ঝুঁটি বাঁধা থাকবে।

সুপর্ণ বলে, খড়ের ছাউনির দুটি অসুবিধে। অতর্কিতে অসাবধানে আগুন লাগার ভয়। দ্বিতীয়, ঘন ঘন ছাউনি মেরামতির মেহনৎ।

এত ভয় ভাবনা কেন। প্রাচীনকাল থেকেই এই খড়ের চালের নীচে কাটালো আমাদের পূর্বপুরুষরা। গরমের দিনে মাটির ঘর আর খড়ের ছাউনিতে ঠাণ্ডা অনেক।

বেশ তাই হবে। একেবারে খড়, মাটি, বাঁশ বাখারি দিয়ে তৈরি ঘর। দুজনে বসে নক্সা তৈরি করব।

ইলেকট্রিক কানেকশান থাকবে না।

সে কি!

মাটির ঘরে মাটির প্রদীপ জ্বলবে, বড় জোর গোটা দুয়েক হেরিকেন। টর্চ একটা রাখা যায়।

সে না হয় হল, কিন্তু প্রচণ্ড গরমের দিনে ফ্যান নইলে চলবে?

কেন, হাত পাখা থাকবে। আগেকার দিনে হাত পাখাতেই তো কাজ হয়ে যেত। হাত পাখার হাওয়া, তোমার ইলেকট্রিক ফ্যানের হাওয়ার চেয়ে অনেক ঠাণ্ডা।

সুপর্ণ বলে, পুকুরে সাঁতার কেটে, ডুব দিয়ে চান করার একটা আলাদা আনন্দ আছে।

শুধু আনন্দ বলছ কেন, শরীর জুড়িয়ে যাবে। তাছাড়া পাড়ে থাকবে আম নারকেলের গাছ।

কদম, কৃষ্ণচূড়াও থাকবে বাগানে।

তার সঙ্গে একটা কনকচাঁপার গাছ।

কাজের দিনে আমাকে সাড়ে আটটার ভেতর বেরিয়ে পড়তে হবে কিন্তু।

তারই ভেতর তোমাকে খাইয়ে আমি তোমার ব্যাগে টিফিন প্যাক করে দেব।

সুপর্ণ বলে, আমার তো সেই সূর্যদেবকে ছুটি দিয়ে তবে ফেরা, সারাদিন তুমি একলাটি মুখ বুজে বসে করবে কি?

আমার আবার কাজের অভাব। গান-বাজনা, লেখাপড়া, ঘর গোছানো, রান্নাবান্নায় কত সময় কটে যাবে। তাছাড়া...।

এখানে থেমে গেল দেখে সুপর্ণ বলে ওঠে, তাছাড়া কি?

গাঁয়ের অনেক মেয়েই সকাল থেকে কাজে কর্মে বাইরে বেরিয়ে যায়। তারা দুপুরের দিকে ঘরে ফিরে এসে নাওয়া খাওয়া সারে। তার পবের সময়টুকু ওদের নিয়ে কাটাব। চারটে অবধি গল্প শোনাব, দেশ-বিদেশের খবর জানাব। সময় সুযোগ মত লেখাপড়াও শেখাব।

গান শেখাবে না?

ওদের ছোট ছোট মেয়েগুলোকে গান শেখাব।

দেখছি সময় কাটানোর অভাব হবে না তোমার।

তারপবের সময়গুলো শুধু তোমার আমার জন্যে তোলা থাকবে। সে সময় নোটিশ টাঙানে থাকবে 'প্রবেশ নিষেধ'।

পল্লবী, সঞ্চারি কিংবা তাদের ববেদেরও প্রবেশ নিষেধ?

ওরা থোড়াই আমাদের বাধা মানবে। হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বে ভেতরে। ওতে কিন্তু আমাদের আনন্দের স্রোতে বান ডাকবে।

সুপর্ণ দেবারতির কথার ভেতর কথা যোগ করে বলে উঠল, এই যেমন কালবৈশাখি, হুড়দাঙ্গা করে ছুটে এল। গাছের ঝুঁটি ধবে নাড়া দিয়ে, চালের খড় এলোমেলো করে, ধুলো উড়িয়ে চলে গেল, ঠিক তেমনি। আসার সময় দারুণ উত্তেজনা, চলে যাবার পর হু হু করে নেমে গেল টেম্পারেচার, প্রকৃতি ঠাণ্ডা!

ভবিষ্যৎ সংসারের অনেক ছবি এমনি করে ওরা দুজনে একসঙ্গে বসে এঁকে যায়।

অমৃতা কিন্তু অন্য ধাতুতে গড়া। সে সুখ ছাড়া দুঃখ বোঝে না।

ইতিমধ্যে আশ্চর্য এক অনুভূতির ঘোরে রয়েছে সে। সুপর্ণকে একান্ত আপনার বলে ভেবে নিয়েছে একতরফা।

সুপর্ণদা, আজ কিন্তু আমি এক বন্ধুর বাড়ি যাব, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।

না বলে প্রত্যাখ্যান করার উপায় নেই, অনর্থ বাধাবে। বন্ধ হয়ে যাবে খাওয়া-দাওয়া, কথা বলা। সুপর্ণকেই অবশেষে নানা কৌশলে মানভঞ্জন করতে হবে অমৃতার।

এ ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে। এতে কৌতুক বোধ করেছে দেবারতি আর সুপর্ণ। ভাইবোন দুটোকে দেবারতি কেবল ভালবাসে না, বুক দিয়ে আগলে রাখতে চায়।

ইমনের কোন বাযনাক্কা নেই। সুপর্ণদা এলেই সে খুশি হয়ে ওঠে। যে জটিল অঙ্কগুলো সে

সমাধান করতে পারে না, সেগুলো জমান থাকে সুপর্ণদার জন্য। এমন সহজ করে জটিল অঙ্কের জট ছাড়াতে নাকি সুপর্ণদার জুড়ি নেই।

অঙ্কটুকু জানা হয়ে গেলেই ইমন খুশি। এবপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সে কিভাবে করবে ভেবে পায় না।

ভাইয়ের মনোভাবটি বুঝতে পারে দেবারতি। কানে কানে বলে, সুপর্ণদার দুটো শখ। প্রথমটা চা, ঠিক তার পরেই ধনে মৌরিভাজা দিয়ে মিঠে পাতার পান। তুই মোড়ের দোকান থেকে পানটা নিয়ে আয়। আমি ততক্ষণে চাটা করে রাখছি।

সব ঠিকঠাক। ট্রেতে কুচো নিমকি আব চা সাজিয়ে, তার পাশে পানটি রেখে রান্নাঘর থেকে ইমনের হাতে পাঠিয়ে দিল দেবারতি। বাইবের ঘরে বসে তখনও হয়তো অঙ্কের খেলা খেলে চলেছে সুপর্ণ। মাঝপথে ট্রেটা কেড়ে নিল অমৃতা।

দেখি কি নিয়ে যাচ্ছিস? এই খেতে দিচ্ছিস? মা বেরিয়ে যাবার সময় বলে গেছে, সুপর্ণদাকে যেন কড়া পাকের নারকেল নাড়ু দেওয়া হয়। থাম, আমি আনছি।

ট্রেতে নাড়ু যোগ হল, এবং পুরো ট্রেটি নিজের হাতে নিয়ে অমৃতা বলল, বোকা কাকে বলে, মেয়েরা ঘরে থাকতে ছেলেরা কখনও খাবার দেয়! তুই পড়ার ঘরে অঙ্ক কষগে যা।

বাধ্য ছেলের মত ইমন ঢুকল পড়ার ঘরে। সে তার ছোটদিকে একটু ভয়ের চোখেই দেখে।

বাইরের ঘরে ঢুকে খানিক সময় দাঁড়িয়ে রইল অমৃতা। অঙ্ক কষায় মগ্ন হয়ে আছে সুপর্ণ।

এবার পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, কি মশায়, নাওয়া খাওয়া ভুলে গেলে নাকি? সব কটাই তোমার খুশির জিনিস এসেছে।

মুখ তুলে ট্রের দিকে তাকাতে যাচ্ছিল সুপর্ণ, অমনি ট্রেখানা উঁচুতে তুলে ধরল অমৃতা।

চোখ বন্ধ কর চটপট।

তাই করল সুপর্ণ।

এবার হাঁ করত বাপু।

ছোট্ট করে মুখখানা একটু ফাঁক করল সে।

উঃ আর পারি না তোমাকে নিয়ে। বড় হাঁ।

এবার রাক্ষুসে হাঁ করল সুপর্ণ।

ওই একটা করেই নাড়ু পাবে, যত বড় হাঁ-ই কর। একটা ফুরোলে আব একটা। এমনি চারবার হাঁ করতে হবে।

সুপর্ণ বলে, অভ্যেসের দোষে যদি আর একবার হাঁ করি।

তাহলে আমার আস্ত মুণ্ডুটাই চিবুতে হবে।

ওরেব্বাস, হজম করতে পারব না। ওই মাথায় কি কম ঘিলু আছে। বুদ্ধি একেবারে গজগজ করছে।

নাও তো মশাই, খেয়ে আমাকে উদ্ধার কর।

যেই মুখে একটা নাড়ু ঢোকাতে গেছে, সুপর্ণ অমনি কৌতুকে আলতো করে মুখের ভেতর চেপে ধরেছে একখানা আঙুল।

অমৃতা কাতর গলায় বলে ওঠে, উঃ কি দুষ্টু তুমি সুপর্ণদা। ছেড়ে দাও, পাঁচটা নাড়ুই খাওয়াব তোমাকে।

সুপর্ণ আঙুলটা ছেড়ে দিতেই অমৃতা বলে, আমার বাড়িতে এক নাড়ুগোপাল আছেন যাঁর লোভের অন্ত নেই। কেবল নাড়ু খেয়েই তুষ্ট নন, আঙুলও চোষেন।

দেবারতির কানে গিয়েছিল অমৃতার শেষ কথাটি। সে বাইরের ঘরের দিকেই আসছিল।

কে রে? কে আঙুল চোষে। কাকে বলছিস?

অমৃতা চাপা গলায় আতঙ্ক প্রকাশ করে বলে, এবার ঠেলা সামলাও, আমি বাবা কিছু জানি না।

সুপর্ণ দেবারতির উদ্দেশ্যে বলল, মাসিমা আমার জন্যে কটা নাড়ু রেখে গিয়েছিলেন। ওই নাড়ু শেষ করে তোমার বোনের কাছে আরও চেয়েছিলাম। ও বলল, আর চাইলে আঙুল চুষতে হবে।

দেবারতি সরল বিশ্বাসে বলল, ওমা তা কেন, মা ঠাকুর ঘরের কৌটোয় অনেকগুলো নাড়ু রেখে গেছে, এনে দিচ্ছি।

দেবারতি চলে গেল। অমৃতা বলল, মিছে কথা বলে দিদিকে ছোটালে তো। বলব তোমার আঙুল কামড়ানোর কথা?

যাই বল, হাতে নাতেই আজ পরীক্ষা হয়ে গেল।

কি পরীক্ষা?

আঙুল কামড়ালেই নাড়ু পাওয়া যায়।

সুপর্ণের এক মাথা ঝাঁকড়া চুলে ঝাঁকি দিয়ে অমৃতা বলল, আর কোনদিন এস আমার আঙুল কামড়াতে তখন একেবারে দাঁতগুলো গুঁড়িয়ে ফোকলা করে দেব। জন্মের মত ঘুচে যাবে কটকটে নাড়ু খাবার সাধ।

কোন কোনদিন দিদির ভাল শাড়ি পরে সুপর্ণের সঙ্গে বেরিয়ে যায় অমৃতা ম্যাটিনি শোয় সিনেমা দেখতে। আগাম মায়ের অনুমতিটি পেলে দিদির অনুমতি নেবার আর দরকার হয় না। সুপর্ণ কিন্তু গোপনে দেবারতিকে জানিয়ে দেয় অমৃতার পরিকল্পনার কথা।

কিগো, কুঁড়ি থেকে ফুটে ওঠা বোনকে এক পরিণত যুবা পুরুষের সঙ্গে সিনেমা-দর্শনে পাঠাবে তো?

দেবারতি প্রশ্ন করে, কোথায় যাচ্ছ? কি বই?

যমুনাতে চলছে এক হাঙরের বই। ভয়াবহ রাক্ষসে হাঙর। তার ক্রিয়াকর্ম দেখতে দেখতে নাকি শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে দেবারতির মুখে।

তুমি হাসছ যে!

তোমার কথা শুনে।

কেন বিশ্বাস হচ্ছে না? তিন সখিতে দেখে এস একদিন। আমি যা শুনেছি তা যদি সত্যি হয় তাহলে দাঁতকপাটি লেগে যাবে। অতি ভয়ঙ্কর প্রাণী, দাপটে সমুদ্র তোলপাড়।

আবার হাসির আভা দেবারতির মুখে, আমার অতিপ্রিয় মানুষটির চেয়েও ভয়ঙ্কর?

তাকে বুঝি ভয়ঙ্কর বলেই মনে হয় তোমার?

দেবারতি এবার সুপর্ণের হাত ধরে বলল, আমার মানুষটি অন্তরে বাহিরে দুদিকেই সুন্দর, ভয়ঙ্কর সুন্দর। হিমালয়ে ভয়ঙ্কর অ্যাভালাঞ্চের পতনে কত মানুষ চাপা পড়েছে, আবার কত মানুষ হারিয়ে গেছে বরফে ঢাকা গভীর ফাটলে। তবু সেই ভয়ঙ্কর হিমালয়ের আকর্ষণ কেউ এড়াতে পারে না। তার সৌন্দর্য, তার শক্তি, তার আকর্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখে সমস্ত অন্তর।

সুপর্ণ অধীর গলায় বলল, দেবারতি, আমি কিন্তু কোনভাবেই যোগ্য নই তোমার এতখানি প্রশস্তির।

আমার মন যা বিশ্বাস করে তাই বললাম। আর তাছাড়া আমার ভালবাসার জনের ওপর যদি সন্দেহের ছায়া ঘনায় তাহলে আমার বিশ্বাসের পৃথিবীটাই যে অন্ধকারে ছেয়ে যাবে সুপর্ণ। আমি সামনের এতখানি পথ চলব কি করে।

সুপর্ণ শুধু বলল, বিশ্বাস রেখ। বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করতে গেলে আমি নিজেকেই ঠকাব।

সেদিন হাঙরের ভয়াবহ ক্রিয়াকাণ্ড দেখে আতঙ্কে, উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল সারা সিনেমা হল। অমৃতা সুপর্ণের একখানা হাত শক্ত করে জড়িয়ে ধরে সিঁটিয়ে বসেছিল!

তরতাজা মেয়েটা যখন একা সমুদ্র স্নান করতে গিয়ে হাঙরের কবলে পড়ল তখন সারা হাউস

আতঙ্কে বিহ্বল। সাক্ষাৎ শমনের সঙ্গে বলিষ্ঠ, দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী মেয়েটির জলের মধ্যে টাগ-অব-ওয়ার চলেছে। একবার সমস্ত শক্তি জড়ো করে সে তার আদ্দেকটা শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা ওপরে তুলছে। আতঙ্কের তীক্ষ্ণ প্রবল একটা শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে মেয়েটার মুখ থেকে। পরক্ষণেই সে তলিয়ে যাচ্ছে গভীর জলের তলায়।

পরে যখন মেয়েটির শক্ত, বিকৃত দেহটিকে দেখা গেল সমুদ্রতীরে পড়ে থাকতে তখন দু'হাতে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল অমৃতা।

ঠিক সেই মুহূর্তে অমৃতার মাথাটাকে অন্ধকারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সুপর্ণ চাপা গলায় বলল, দূর পাগলি, ও মেয়ে মরেনি। এটা সিনেমা, ফটোগ্রাফির কৌশল।

কে শোনে কার কথা, তখন অমৃতার শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে থরথর করে। তার চোখের জলে ভিজে গেছে সুপর্ণের জামা।

হল থেকে পথে বেরিয়েও অমৃতা হাতটি ধরে রেখেছিল সুপর্ণর।

ওরা একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে খাবার খেতে খেতে গল্প করতে লাগল।

সুপর্ণ বলল, ওই হাঙরটা মানুষেরই তৈরি বলে শুনেছি।

অসম্ভব। সমুদ্রের জল তোলপাড় করে তেড়ে আসছে জন্তুটা, সব মিথ্যে!

যান্ত্রিক যুগে সবই সম্ভব। কখনও যদি শুনি অমৃতা একটি যন্ত্র-মানবের গলায় মালা দিয়েছে তাহলে আশ্চর্য হব না।

টেবিলের তলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে সুপর্ণের হাঁটুতে খামচে দিল অমৃতা। আচমকা আঁচড় খেয়ে 'আউ' করে একটা শব্দ তুলল সুপর্ণ।

এবার অন্য এক প্রসঙ্গে চলে গেল অমৃতা। ওর মনের ভেতর এখন চলেছে মেঘ রৌদ্রের খেলা।

আচ্ছা সুপর্ণদা একটা সত্যি কথা বলবে?

বল কবে তোমার কাছে একটি মিথ্যে কথা বলে হাতে নাতে ধরা পড়েছি?

বিজ্ঞের মত গালে হাত ঠেকিয়ে বসে অমৃতা বলল, মনে পড়ে না।

এবার বল কি জানতে চাও?

আচ্ছা সুপর্ণদা বুকে হাত দিয়ে বলতো...

আবার বুকে হাত! তোমার প্রতিটি কথায় যদি বুকে হাত দিতে হয় তাহলে আমার পাখির মত বুকখানা একদিন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

প্লিজ সুপর্ণদা, ওগুলো কথার কথা।

বেশ বল।

ধর ওই মেয়েটা আমি। সমুদ্রে স্নান করতে নেমেছি। ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে কিছুটা এগিয়েও গেছি। নির্জন সমুদ্রতীর, কিন্তু তুমি বসে আছ তালপাতার একটা ছাউনির ভেতরে।

এমন সময় তোমাকে হাঙরে ধরল!

ঠিক তাই। আমি চিৎকার করে উঠলাম। তলিয়ে যাবার আগে তোমাকে ডাকছি।

বুঝেছি, তুমি জানতে চাইছ ওই অবস্থায় আমি কি করব।

অমৃতা অসহায়ের মত চোখ মেলে তাকিয়ে মাথা নাড়ল।

সুপর্ণ বলল, আমার সিদ্ধান্তে তুমি কি খুশি হবে অমৃতা?

বলই না।

যে কথা শুনলে তুমি খুশি হবে তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর সেটা হবে মিথ্যে বলা। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র এবং বাস্তববাদী। তাবলে আমাকে হৃদয়হীন মনে কর না। এবার সত্যটা শোন। তোমাকে ওই রকম একটা অবস্থায় দেখলে প্রথমে বিহ্বল হয়ে পড়ব। আমি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমার কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করব। কারণ তখনও আমি জানি না যে তোমাকে হাঙরে ধরেছে।

অমৃতা বলল, তুমি কি ভেবে তাহলে জলে নামতে যাচ্ছিলে?

চোরা স্রোতের টানে পড়ে গেছ মনে করে। আমি নুলিয়াদের কাছ থেকে কয়েকবার সমুদ্রস্নানের পাঠ নিয়েছিলাম। তাই তোমাকে উদ্ধার করতে পারব ভেবেই ঝাঁপ দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে যদি দেখতে পেতাম একটা হাঙর তোমার একখানা পা কামড়ে ডিগবাজি খাচ্ছে জলের ওপর তাহলে ভীষণ ভয় পেয়ে তোমাকে ফেলেই পালিয়ে আসতাম তীরের দিকে।

তারপর তীরে দাঁড়িয়ে অমৃতার মৃত্যু দৃশ্যটা দেখতে।

আদপেই না। চিৎকার করতে করতে ছুটে যেতাম লোকালয়ের দিকে। জানি, ওতে তোমার উদ্ধারের কানাকড়িও সুরাহা হবে না। তবু যে ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা আমার বোধশক্তিকে নষ্ট করে দিচ্ছিল তার হাত থেকে অন্তত রক্ষা পেতাম।

অমৃতা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি বাড়ি যাব।

সুপর্ণ তাকে কোন প্রশ্ন করল না। সে জানে এই মুহূর্তে ওর ইচ্ছাকে মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। ওকে আর কিছু বলতে গেলেই ও ক্ষেপে উঠবে।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। অমৃতার মুখে কথা নেই।

একটা ট্যাক্সি থামিয়ে ওতে উঠল ওরা।

কিছুক্ষণ পরে ক্ষোভের তীব্রতা কিছুটা কমেছে মনে করে সুপর্ণ বলল, তুমি আমার ওপর রাগ করলে অমৃতা?

কোন কথা নয়, সিধে মুখখানা ডানদিকে ঘুরে গেল।

বাড়ি পৌঁছতে দরজা খুলে দিল দেবারতি। অমৃতা দৌড়ে ভেতরে ঢুকে গেল। দেবারতি একবার মুখ ঘুরিয়ে তাকাল তার দিকে।

সুপর্ণ বলল, মাসিমারা কই?

বাবা অফিস থেকে ফিরে এইমাত্র মাকে নিয়ে বেরিয়েছেন।

অনেকখানি যেতে হবে, আমি এখন আসি।

চা না খেয়ে চলে যাবে, এ কি রকম!

সুপর্ণ বলল, সিনেমা থেকে বেরিয়েই একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকেছিলাম। ওখানে চাটা খেয়ে নিয়েছি।

তা বেশ করেছ, একটু বস, আমি এখুনি আসছি।

দেবারতি ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। বেরিয়ে এল একটু পরে, মুখে চিন্তার ছায়া।

কি হয়েছে সুপর্ণ?

এ প্রশ্ন কেন?

মেয়েটা বিছানায় মুখ চেপে কাঁদছে, কোন কথার উত্তরই দিচ্ছে না।

সুপর্ণ মুখে মৃদু হাসির রেখা টেনে বলল, ও আমার ওপর দারুণ রেগে গেছে।

দেবারতিও সহজভাবে বলল, কারণ?

সুপর্ণ আনুপূর্বিক সমস্ত কাহিনীটি বলে গেল।

দেবারতি বলল, মেয়েটা ভারী অভিমানী। তুমি না হয় ওর মনের মত করে দুটো মিছে কথাই বলতে।

এখন ভাবছি, ভুলটা আমারই হয়েছে। ও বেচারা অসহায়ের মত হাঙরের মুখ থেকে বেরুবার চেষ্টা করছে আর আমি তাকে সাহায্য না করে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসছি, ওটা ও ভাবতেই পারেনি।

দেবারতি বলল, ও ভীষণ সরল আর সেন্টিমেন্টাল। তাই আঘাতটা বেজেছে বড় বেশি।

আমি সত্যি অনুতপ্ত।

সুপর্ণ লক্ষ্য করেছে দেবারতিদের বাড়িতে এলেই অমৃতা তাকে নিজের কাছে যতক্ষণ পারে ধরে রাখার চেষ্টা করে। মায়ের কাছ থেকে খাবার এনে নিজের হাতে খেতে দেয়। দিদিকে সে ভালবাসে, দিদির ওপর গভীর শ্রদ্ধা তার। কিন্তু সে সুপর্ণকে ভাবে তার একান্ত আপনার মানুষটি।

দেবারতির বাবা মা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। সংসারে থেকেও সংসার-বিবাগী।

ব্যাঙ্কে কাজ করেন ভবানন্দবাবু কিন্তু বছরে মাস দুয়েক ছুটি নিয়ে বেরিয়ে যান তীর্থদর্শনে। সঙ্গে অবশ্যই থাকেন স্ত্রী চারুশীলা দেবী। আগে প্রচুর ঘুরেছেন পাহাড়ে পর্বতে। হিমালয়, বিন্ধ্য প্রায় চষে ফেলেছেন। সম্প্রতি চারুশীলা দেবী বাতের যন্ত্রণায় কিছু কাতর হয়ে পড়ায় হিমালয়-দর্শন আপাততঃ স্থগিত আছে। কিন্তু যাত্রা থেমে নেই। এখন পূর্বভারত আর দক্ষিণ ভারত জুড়ে যতগুলি প্রধান তীর্থ, তাই খুঁটিয়ে দেখছেন।

সুপর্ণ কিছুকাল এই পরিবারটির সঙ্গে মেলামেশা করতে করতে দেখেছে, দেবারতি এই গৃহের কেবলমাত্র একজন কন্যা নয়, সাংসারিক শুভাশুভের সদাজাগ্রত প্রহরী। বাবা মা বাইরে গেলেই দেবারতি এ গৃহের কাণ্ডারী। এখন প্রতিটি কাজে হাত দেবার আগে বাবা আর মা অন্তত একবার পরামর্শ করে নেন কন্যার সঙ্গে।

কৈশোরের শেষ লগ্নে মধুর চাঞ্চল্য আর সৌন্দর্যের পূর্ণতা নিয়ে বিরাজ করছে অমৃতা। তার নিজস্ব জগতে এখন চলেছে মান অভিমানের লীলা।

একদিন সুপর্ণের সঙ্গে অমৃতা গিয়েছিল সার্কাস দেখতে। অত্যন্ত উত্তেজনায় পূর্ণ একটি খেলা শুরু হল। ট্রাপিজের খেলা। স্যুইংবারের একদিকে একটি মেয়ে, অন্যদিক থেকে ছেলেটি ঝাঁপ দিল বার ধরে। হঠাৎ বার ছেড়ে দিয়ে মেয়েটি শূন্যে বার দুয়েক ভল্ট খেল।

দর্শকদের দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অমৃতা উত্তেজনায় সুপর্ণের হাতখানা চেপে ধরল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে শূন্য থেকে পড়ে যেতে যেতে মেয়েটি তার সঙ্গী খেলোয়াড়টির দিকে দুটো হাত বাড়িয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটির হাতের আঙুলগুলো সাঁড়াশির মত আঁকড়ে ধরল মেয়েটির দুটো হাত। ঐ দুলুনিতেই সঙ্গী মেয়েটিকে বাজের মত ছোঁ মেরে সে তুলে নিয়ে চলে গেল নিজের ডেরায়।

চারদিকে করতালি। অমৃতা সুপর্ণের হাত ছেড়ে দিয়ে দর্শকদের সঙ্গে আনন্দে হাততালি দিতে লাগল।

করতালির ধ্বনি থেমে গেলে অমৃতা আবার ধরল সুপর্ণের হাত। সে কি তার অবচেতন মনে ট্রাপিজের ঐ মেয়েটির মত নিজেকে একান্ত নির্ভরতায় সঁপে দিতে চাইছিল সুপর্ণের হাতে?

স্বপ্ন ভেঙে গেল তপোনাথের হাতের ছোঁয়ায়। সদ্য ফেলে আসা জীবনের স্বপ্ন দেখছিল সুপর্ণ।

তপোনাথ বলল, সারারাত বাইরে বসে কাটালে নাকি? ঘরে ঢোকার আগে জানালা দিয়ে দেখলাম, বিছানা যে কে সেই।

মৃদু হেসে উঠে দাঁড়াল সুপর্ণ। কখন ভোরের সোনালী স্রোত বইতে শুরু করেছে তা সে জানতেই পারেনি।

পুনম কোথায়?

সে শেষ রাতেই কামরু পাহাড়ের ডেরায় পালিয়েছে।

সুপর্ণ বিস্মিত হয়ে বলল, সে কি! শেষ রাতে তো চাঁদ নেই, ও গেল কি করে? একাই গেল?

তপোনাথ বলল, আমি ওকে প্রায় বাড়ির কাছ অবধি পৌঁছে দিয়ে এসেছি।

বাইরে রাত কাটিয়ে ভোর রাতে মেয়ে ফিরছে, বাবা কিছু বলবে না?

উৎসবের তিনটে দিন কারো কিছু ভাবার কিংবা বলার নেই। মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে, ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে, আবার ছেলে মেয়েরা এক-সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে, এ তো সবার জানা। তাই ও শেষ রাতে নিরুদ্বেগে ঘরে ফিরে গেছে।

একটু থেমে আবার বলল তপোনাথ, তুমি আলোর কথা বলছিলে না? আমাদের হাতে একটা টর্চ ছিল কিন্তু আমরা অনেকখানি পথই খারশুনার আলো পেয়েছিলাম।

খারশুনাটা কি?

ওটা এক রকমের আলো।

কিসের আলো?

এক ধরনের কীট, উদ্ভিদ, অথবা ফসফরাস যুক্ত ফাংগাস রাতে জ্বলতে থাকে। ছোট ছোট প্রদীপের জ্যোতির মত তারা পাহাড়ের যেখানে সেখানে আলো ছড়ায়। এখানকার পাহাড়ীরা বলে, ওগুলো পরীর হাতের প্রদীপ।

পুনঃ কাজের জায়গায় ফেরার জন্য পরের দিন ভোর চারটেতে তপোনাথের কোঠি থেকে রওনা দিলে দু'বন্ধুতে। আকাশে নক্ষত্র জ্বল জ্বল করছে। তখনও কামরু পাহাড় সুপ্ত।

পুনমের কোঠি বাঁ দিকে রেখে ওরা এগিয়ে গেল। এবার ওদের বাগান ঘেরা ছটকং (দেবমন্দির) দেখা যাচ্ছিল। তারার আলোয় কালো কালো স্তূপের মত দেখাচ্ছিল।

হঠাৎ একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। ওরা থেমে দাঁড়াল।

তপোনাথ অন্ধকারেই চিনে নিয়েছিল। পুনম তপোনাথের হাতে একটা পোঁটলা ধরিয়ে দিয়ে বলল, পথে দু'বন্ধুতে খেও।

এবার 'তোশিমিগে' বেশ কয়েকদিন ছুটি নিয়ে এসো। বন্ধুকেও সঙ্গে এনো। ওঁরও নিমন্ত্রণ রইল।

তপোনাথ বলল, আসব।

সুপর্ণ হাত তুলে নমস্কার জানাল। প্রতি নমস্কার করল পুনম।

বাবার ওঠার সময় হয়ে গেছে, আমি পালাই।

তপোনাথ আর সুপর্ণ হাত তুলল। পুনম হাত নাড়তে নাড়তে মন্দিরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আবার চলা শুরু। ওরা কামরু পাহাড় থেকে নামতে লাগল বাস্পা নদী লক্ষ্য করে। ওখানেই ওরা জিপে উঠবে।

সুপর্ণ বলল, পুনম যে 'তোশিমিগ'-এ নিমন্ত্রণ করল সেটা কি উৎসব তপোনাথ?

প্রেমের উৎসব।

রসিকতা করছ? প্রেমের আবার উৎসব হয় নাকি?

বিশ্বাস কর, নিছক প্রেম-পিয়াসীদের উৎসব।

কি রকম?

বেশ কয়েকজন কুমারী কন্যা একটি পার্টি তৈরি করে। ঐ দলটির নাম হয়, 'তোশিমিগ-কন্যা'। ওরা প্রথমে বেশ কয়েকদিনের জন্য একটা ঘর ভাড়া নিয়ে নেয়। বাড়ির মালিককে ভাড়ার টাকা না দিয়ে তার ক্ষেতিতে সবাই মিলে কাজ করে দেয়। অথবা প্রতিদিন রান্নাকরা খাবার পাঠিয়ে দেয় একজনের মত।

সুপর্ণ বলল, 'তোশিমিগ-কন্যা' তে রান্নার ব্যবস্থাও থাকে?

থাকে বৈকি। এ উৎসব কোথাও সাতদিন, কোথাও দেড়মাস অবধি চলে। কুমারী কন্যারা তাদের ভাড়া বাড়িতে রান্নাবান্না করেই খায়। শুধু তাই নয়, এ উৎসবে ওরা ডেকে আনে ওদের প্রেমিকদের। তারা দুবেলাই প্রেমিকদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করে। অবশ্য তারাও ভোজ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে আনে। সারাদিন চলে পিকনিকের আমেজ। প্রেমিক প্রেমিকারা অনেক রাত অবধি মেতে থাকে নাচ আর গানে। ঢোল, বাগজাল, বান, শোন্নাল বাজায় ছেলের দল। ছেলেমেয়েরা ঐ সুরে একসঙ্গে গান গায়, একসঙ্গে নাচে। রাতে একই পংক্তিতে বসে খাওয়া-দাওয়ার পর ছেলেরা সেদিনের মত বাড়ি ফিরে যায়। মেয়েরা তাদের সংগ্রহ করা ফাসুর (ফল থেকে তৈরি মদ) খাওয়ায় প্রেমিকদের।

বেশ কয়েকদিনের উৎসবের শেষে যখন খেলা ভাঙার বাঁশি বাজে তখন স্বাভাবিকভাবেই ওদের মন বিষণ্ণ আর ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। ছেলেরা প্রেমিকাদের কিছু অর্থ উপহার দেয়। মেয়েরা প্রেমিকদের দেয় একটি করে চম্পক পুষ্প।

তিন

একটা স্বপ্নের রাজ্য থেকে কাজের জগতে ফিরে এল সুপর্ণ। এসেই পেল অমৃতার চিঠি। সদ্য তারুণ্যের সীমা ছুঁয়েছে যে গরবিনী তার চিঠির প্রতিটি ছত্র কিন্তু এখনও কৈশোরের মধু গন্ধে ভরা।

শ্রীচরণেষু

সুপর্ণদা, দিদিকে দেখলে তোমার দুঃখ হবে। ভোরবেলা ঠিকে ঝি কাজ করে দিয়ে চলে গেলে দিদি রান্না আর জলখাবার তৈরির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমি সাহায্য করতে গেলে মুখে কোন কথা না বলে আমাকে টানতে টানতে পড়ার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেয়। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে রান্না ঘরে চলে যায়।

দিদিকে দেখলে তোমার মনে হবে একটা মেশিন চলছে। কিন্তু মেশিনের সঙ্গে তফাৎটা কোথায় জান, মেশিনে গোঁগানির একটা শব্দ হয় কিন্তু দিদি কাজ করে যায় নিঃশব্দে।

একা দু'দুটো মানুষের কাজ করছে দিদি। ঘরের কাজ করছে মায়ের মত পরিপাটি করে, আর বাবার মত দশটা পাঁচটা ব্যাঙ্কের কাজ করছে মাথা ঠুকে।

জান সুপর্ণদা, সেদিন রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। জানলার ফাঁকে বাইরের জ্যোৎস্না ঘরে এসে পড়েছে। দেখি কি দিদি, বাবা মার ফটোর সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছে।

আমি বিছানা থেকে উঠে দিদির পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। অমনি দিদি চোখ মুছে আমাকে ধরে নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে দিল। মুখে বলল, রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে অমু। সকালে উঠেই ইংরাজীর বাকী দুটো প্রশ্ন লিখে ফেলতে হবে।

আমি শুয়ে রইলাম আর দিদি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

আমি হঠাৎ বললাম, তুমি ওখানে দাঁড়িয়েছিলে কেন দিদি?

মা বাবার কাছে শক্তি ভিক্ষা করছিলাম।

কিসের জন্য?

দিদি বলল, যেন তোদের ঠিক ঠিক মানুষের মত গড়ে তুলতে পারি। আমরা ভাল রেজাল্ট করলে বাবা মা কত খুশি হত বলতো। আজ তোরা কেউ পরীক্ষায় খারাপ করলে আমি তাদের কাছে কি কৈফিয়ৎ দেব।

বললাম, আমি আর ভাই তো পড়ায় ফাঁকি দিই না দিদি।

আমি জানি। সুপর্ণদা থাকলে আমার কাজ অনেক সহজ হয়ে যেত। তোদের অঙ্ক আর ইংরাজী গ্রামার ও খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিতে পারত।

আমি বললাম, সুপর্ণদা কবে আসবে বলতে পার?

ওকি বলল জান, এখন ওর না আসাই ভাল। নতুন কাজ, একটুও ঢিলে দিলে চলবে না।

আমি কিন্তু পড়ার ঘরে বসে মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে পথের দিকে চেয়ে থাকি। হঠাৎ যদি দেখি, মিলিটারি পোশাক পরা কেউ আমাদের ঘরের দিকে আসছে তাহলে পড়ি কি মরি করে সদর দরজায় ছুটব। তুমি ঢুকতে গেলেই দরজা আটকাবো। ঐ পোশাকে কেউ নিজের মানুষের কাছে আসে! তুমিই বল না সুপর্ণদা?

তুমি সেই জামাটা পরে আসবে, যেটা পরে 'অগ্নিপরীক্ষা' দেখতে গিয়েছিলে। আমি মজা করে তোমার বুক পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম খানিকটা পটেটো চিপ। পরের দিন আমার পড়ার ঘরে ঢুকে আমার হাতটা টেনে নিয়ে তোমার বুকের ওপর ছুঁইয়ে দিয়ে বলেছিলে, এটা কিসের দাগ?

আমি অমনি বলেছিলাম, আমার দুষ্টুমির।

তুমি কি বলেছিলে বলতো? ভুলে গেছ? তুমি বলেছিলে, তেলের দাগটা সাফ করিয়ে নিতে এসেছিলাম, কিন্তু দুষ্টুমির দাগটা সাফ করাব কি করে। ওটা বরং থাক।

সত্যি সুপর্ণদা, তুমি কি সেই দাগওয়ালা জামাটা এখনও রেখে দিয়েছ?

আমি কিন্তু তোমার একটি জিনিস রেখে দিয়েছি। তুমি একবার পিঙ্ক রঙের একটা ফিতেতে বো তৈরি করে ক্লিপ দিয়ে আটকে দিয়েছিলে আমার চুলে। মনে পড়ে সে কথা? যেবার মেলায় গিয়ে নগারদোলায় চড়েছিলাম।

বাড়ি ফিরে এসে আমার ট্রাংকে সেটা যত্ন করে তুলে রেখে দিয়েছিলাম, আজও সেটা একই জায়গাতেই রয়েছে। মাঝে মাঝে বের করে দেখি।

তুমি কবে আসবে সুপর্ণদা? আমার বন্ধুরা বলে, কিন্নরীদের যেমন রূপ তেমনি গলা। বিদেশী পথিকরা নাকি তাদের দিকে তাকালেই ভেড়া বনে যায়। তুমি এখানে এলে বুঝতে পারব কথাটা ঠিক কিনা।

রাগ করলে না তো? আসলে কতদিন তোমাকে দেখিনি। আচ্ছা সুপর্ণদা কলকাতায় কি একটা কাজ জুটিয়ে নেওয়া যেত না?

ইমন পড়ছে, অমৃতা পড়ছে কিন্তু তাদের দিদি দেবারতি একাই লড়ছে।

আমার দুটো পাখা থাকলে কিন্নরে উড়ে গিয়ে তোমাকে দেখে আসতাম।

হায়, এ জন্মে আর সে সম্ভাবনা নেই, তাই এখানেই ইতি টানছি। প্রণাম নিও। তাড়াতাড়ি চিঠি চাই কিন্তু।

তোমার আদরের অমু।

পুনশ্চঃ দিদি ও ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলছে, রাত জেগে কি লিখছিস এত, শুয়ে পড়।

বলছি, লেটার রাইটিং রয়েছে বাংলা সিলেবাসে, প্র্যাকটিস করছি দিদি।

চিঠি পড়া শেষ হলে সুপর্ণের মনে হল, এই উঠতি বয়সের মেয়েরা একটু বেশি রকমের জেদি আর আবেগপ্রবণ হয়। ওদরে পছন্দ অপছন্দ অত্যন্ত তীব্র। অনেক সময় বিচার বিবেচনার ধার দিয়েই যায় না। তবে ওদের ভালবাসা অথবা কোন কিছুর ওপর আকর্ষণ একেবারে অকৃত্রিম। হঠাৎ বাদল মেঘের আবির্ভাব, পরক্ষণেই এক ঝলক রোদের হাসি ওদের লীলাবিলাসী চরিত্রের ধর্ম।

অমৃতা যে তার প্রতি আকৃষ্ট এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু এই দুর্নিবার আকর্ষণ অথবা নিবিড় আত্মসমর্পণ যখন ব্যর্থ হবে তখন ওকি সইতে পারবে তার প্রতিক্রিয়া!

কথাগুলো ভাবতে গিয়ে সুপর্ণ কেমন যেন অসহায় বোধ করল। সে ওকে কোনদিন ভাবেনি ওর চিরদিনের সঙ্গিনী হিসেবে। তবে দেবারতির সুবাদে ওর সঙ্গে কৌতুকে আনন্দে মেতে রয়েছে একটা স্বপ্নের আবর্তে। সে স্বপ্ন যখন ভেঙে যাবে তখন ওকি সইতে পারবে সে বিচ্ছেদ? ওর স্বপ্নের সুধায় ভরা বুকের পেয়ালাখানা যখন ভেঙে খান খান হয়ে যাবে তখন কি ও বোধ করবে না মরুভূমির রিক্ততা?

আজ কেন জানি না মনে মনে বড় অনুতপ্ত হল সুপর্ণ। এতদিন সে এ বিষয়ে কেন সচেতন হয়নি! কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে যে মেয়েটি বারে বারে তার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করেছে তাকে তো সে ফিরিয়ে দেয়নি। বরং প্রশ্রয় দিয়েছে তার ছোট বড় আকাঙ্ক্ষাকে, আজ তাকে এড়িয়ে যেতে চাইলেই কি সহজে যাওয়া যাবে?

সুপর্ণ জানে, দেবারতির ওপর তার যে আকর্ষণ তার গভীরতা অনেকখানি। সেখানে কৌতুকের খেলা কিংবা উচ্ছলতার কোন স্থান নেই। দেবারতির আহ্বান, অতল নিস্তরঙ্গ জলের আহ্বান। অমৃতার আমন্ত্রণ ঝর্ণার কলধ্বনিতে ভরা।

বছর খানিক পরে ছুটি পেয়েই দেবারতিদের বাড়িতে এল সুপর্ণ। সেদিন রোববার। ভাইবোনেরা সকলেই বাড়িতে।

সুপর্ণ ঢুকতেই হৈচৈ পড়ে গেল। মিলিটারীতে নিয়মের মধ্যে থেকে সুপর্ণের চেহারাই একেবারে বদলে গিয়েছিল। সুন্দর স্বাস্থ্য, উজ্জ্বল মুখশ্রী।

ইমন সুটকেসটা ধরে নিল। বিশাল সুটকেসখানা প্রায় হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে গেল ভেতরের ঘরে।

দেবারতি বলল, আগে চানটান সেরে নাও। বেরিয়ে এলেই আমরা একসঙ্গে ব্রেকফাস্টে বসব। ততক্ষণে আমি খাবারটা গুছিয়ে নি। তুমি অমুর ঘরে থাকবে। অমু এ ক'দিন আমার কাছেই শোবে। ঐ যে বাথরুমে সাবান, তোয়ালে রেখে এলো অমু। তুমি তোমার সুটকেস খুলে পোশাক-আশাক বের করে নাও?

সুপর্ণ বলল, ঘরে ঢোকার আগে সবার গলার আওয়াজ পাচ্ছিলাম কিন্তু ঘরে ঢুকে পড়ে দুজন ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

দেবারতি মুখ টিপে হাসল। গলা চড়িয়ে বলল, অমু কি আর সেই ছেলেমানুষটি আছে। সে এখন দস্তুর মত প্রিয়দর্শিনী এক লেডি। দেখব বলে মুখের কথা খসালেই কি দেখা পাওয়া যায়।

সুপর্ণ অমৃতাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, মনে করেছিলাম একজনকে কিন্নরী সাজাব, দেখছি সে সাধ মিটল না। চন্দ্রমালাং এনেছি।

দেবারতি বলল, সে বস্তুটি কি?

গলার হার। মোংগা, ফিরোজার ছোট ছোট বল আর রূপোর সিকি, আধুলি, টাকা গেঁথে তৈরি রূপোর হার। চাঁদের আলো যেন ঝলসে উঠছে হারে, তাই তো চন্দ্রমালাং নাম।

দেবারতি বলল, হারখানা দিয়ে দেখ মানিনীর মানভঞ্জন হয় কিনা।

শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে একেবারে ম্যাচ করা কানের ঝুমক। পায়ের আঙুলে পরার জন্যে বাংপোল।

নিজের পড়ার ঘর থেকে এবার হাসি হাসি মুখে বেরিয়ে এলো অমৃতা। সুপর্ণের দিকে তাকিয়ে বলল, কেন বাজে বকছ সুপর্ণদা। বাথরুমে চটপট ঢুকে পড়ে মাথা ঠাণ্ডা কর। সবকিছু দিয়ে এসেছি। তোমার এখানে রেখে যাওয়া একটা গেঞ্জি, পাজামাও পাবে। আমি তোমার ওসব গয়না পরে কোথাও যেতে পারব না কিন্তু।

আগে তো একবার পরে দেখ, তারপর না হয় বাতিল কর।

সুপর্ণ এবার স্নানের ঘরে ঢুকে গেল।

দেবারতি অমৃতাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলল, হাঁরে কোনদিন কি একটু সুবুদ্ধি হবে না তোর!

কেন দিদি, আমি কি করেছি.

দেখ, সুপর্ণদা কতদূর থেকে তোকে ভালবেসে তোর জন্যে গয়নাগুলো আনল। তুই এক কথায় খারিজ করে দিলি।

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল অমৃতা।

দেবারতি বলল, সামান্য জিনিসও অসামান্য হয়ে ওঠে, যে দিচ্ছে তার দেবার আন্তরিকতায়। আবার অনেক দামী জিনিসও প্রাণের ছোঁয়া নেই বলে তুচ্ছ হয়ে যায়।

অমৃতা মুখ তুলে বলল, আমি তো দিদি, দাম কম বেশি বলে সুপর্ণদার গয়না বাতিল করিনি। সিকি আধুলি টাকার হার গলায় পরে বাইরে যেতে পারব না বলে বলেছিলাম।

তবুও ওভাবে তোর বলা ঠিক হয়নি অমু। সুপর্ণদা যা দিক, খুশি হয়ে তা মাথায় ছুঁইয়ে নিতে হয়। পরা, না পরা সে তো পরের কথা।

আমার ভুল হয়ে গেছে দিদি।

জলখাবারের পর্ব শেষ হলে সবাইকে তার জন্যে নির্দিষ্ট ঘরটিতে ডেকে নিয়ে গেল সুপর্ণ। সুটকেসটি খুলে বলল, এবার কিন্তু সবাইকে কিছু সময়ের জন্য চোখ বন্ধ করতে হবে। আমি মুখে না বলা অবধি কেউ চোখ খুলতে পারবে না।

ভারী মজার একটা খেলা। সবাই চোখ বন্ধ করে বসে রইল।

সুপর্ণ একটা ছোট্ট, অতি সুন্দর রূপোর কাপ বের করে বলল, ইমন তোমার হাতে আমি যা দিচ্ছি তাকে কিন্নরে বলে কারগিউল। এটা ধর, কিন্তু এখুনি চোখ খুল না।

গয়নার সেটটা অমৃতার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, তোমাকে মানাবে ভেবেই এ ক'টি গয়না আমি নির্বাচন করে এনেছি। একবার অন্তত পরে দেখো, পছন্দ না হলে কাউকে দিয়ে দিও।

অমৃতা বলল, সুপর্ণদা, তুমি কিছু মনে কর না, তোমার দেওয়া জিনিস আমি প্রাণ থাকতে কাউকে দিতে পারব না।

বলতে বলতে আবেগে চোখে জল এসে গেল অমৃতার।

এবার কিন্নরের শিল্পীদের হাতে তৈরি একটা গরমের সুন্দর কাজ করা শাল দেবারতির হাতে তুলে দিয়ে বলল, সামনের শীতের জন্য তোমাকে দিলাম এই ক্ষুদ্র উপহার।

দেবারতি সঙ্গে সঙ্গে সেটি মাথায় ছুঁইয়ে নিল।

সুপর্ণ বলল, এখন সবাই চোখ খুলতে পার।

ইমন ঝকঝকে রূপোর বাটিটা হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচতে নাচতে বলল, এটাতে আমি জন্মদিনের পায়েস খাব দিদি।

অমৃতা বলল, তোমরা এখানে বস, আমি এখুনি আসছি। সুপর্ণদা উঠে যাবে না কিন্তু।

ইমন আর অমৃতা এখন নিজের নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

দেবারতি বলল, রোজগারের সব কটা পয়সা আমাদের জন্য খরচ করে ফেললে তো?

মানুষ রোজগার করে সুখের জন্য। তোমাদের এটুকু দিতে পেরে আমার সুখ। শালটা কেমন লাগল বললে না তো?

দেবারতি উল্টেপাল্টে দেখে বলল, এটা গায়ে দিয়ে যখন বাইরে যাব তখন এর জুড়ি দ্বিতীয় আর একটি কেউ দেখাতে পারবে না। তাছাড়া একেবারে খাঁটি উলের তৈরি। কিন্নরের নিজস্ব লোকশিল্পের ডিজাইনগুলোরও বিশেষ একধরনের আকর্ষণ আছে।

সুপর্ণ বলল, তপোনাথের কথা তোমাকে লিখেছিলাম। তার ভালবাসার পাত্রী পুনমের কথাও তোমাকে জানিয়েছি। ঐ পুনম একটি কাণ্ড করে বসে আছে।

কি?

আমি যখন উ-খিয়াং উৎসব দেখতে সাংলায় যাই তখন পুনম আমাকে কিছু না বলে তপোনাথের হাতে আমার প্রেমিকার জন্য একটি উপহার দিয়ে দেয়। তপোনাথ সেটি আমার হাতে তুলে দেয় পুহ্‌তে এসে।

তাই বুঝি?

হাঁ, সেটি অতি মূল্যবান এবং অতি সুন্দর একটি উপহার।

দেবারতি কোন কথা না বলে তাকিয়ে রইল।

সুটকেস থেকে উপহারটি বের করতে করতে সুপর্ণ বলল, এটি একটি সোনার হার। এর নাম 'ত্রমনি'।

দেবারতি দেখল, ঝকঝকে একটি সোনার চেন। তাতে গাঁথা হয়ে আছে গোলগোল তিনটি ছোট মার্বেলের আকারে হালকা সোনার বল।

দেবারতি বলল, চমৎকার। সত্যি রুচি আর মন দুটোই আছে পুনমের।

আমি তোমাকে এটা নিজের হাতে পরিয়ে দিতে চাই।

দেবারতি বলল, এখুনি হয়তো ওরা এসে পড়বে, তার চেয়ে কাজে ফেরার আগে কোন একটা সুযোগে পরিয়ে দিও।

সুপর্ণ ত্রমনিটি দেবারতির হাতে দিয়ে বলল, বেশ তাই হবে, রেখে দাও।

দরজার পাশে সলজ্জ মুখখানা নিয়ে আবির্ভূত হল অমৃতা। সে চন্দ্রমালাং, জুমকু আর পায়ের বুড়ো আঙুলে বাংপোলটি পরে এসেছে।

দেবারতি বলল, চমৎকার মানিয়েছে তোকে। খাঁটি রূপোর চাঁদধোয়া রঙটা ঝলসে উঠেছে। মাঝে মাঝে রঙীন স্টোন থাকায় বেশ বাহার খুলেছে।

অমৃতা এবার বলল, তুমি কিছু বলছ না কেন সুপর্ণদা, এখনও রাগ পড়েনি বুঝি?

কি বলব বল, আমার তো মাথা ঘুরে গেছে। দেবারতি তুমিই বল, ওগুলো পরে কি ও বাইরে যেতে পারবে না?

যে কোন ফাংসানে ওগুলো পরে গেলে সকলের নজরে পড়বে। তাছাড়া গয়নাগুলো একটুও জবড়জং নয়। বেশ রুচিসম্মত।

সুপর্ণ বলল, এখন যে সেজেছে তার কেমন লাগল জানতে চাই।

অমৃতা বলল, সে তো তোমরা বলবে, আমি কি জানি।

সুপর্ণ মজা করে বলল, খুব জান, এখানে আসার আগে আয়নাতে বার কয়েক রিহার্সেল দেওয়া হয়ে গেছে।

অমৃতা ঠিক আগের মত ছুটে এসে সুপর্ণের মাথায় ঝাঁকি দিয়ে তার পাট করা চুলগুলো এলোমেলো করে দিল।

দেবারতি ধমকে উঠল, কি হচ্ছে অমু?

সুপর্ণ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এতক্ষণে আমি কিন্তু আসল অমুকে খুঁজে পেলাম। তোমরা প্রিয়দর্শিনী লেডি অমৃতার প্রশংসা করছিলে, আমি কিন্তু এতক্ষণ রণরঙ্গিনী অমুকেই খুঁজে ফিরছিলাম। এখন দেখা মিলেছে।

পরের দিন ভাইবোনে স্কুল কলেজে বেরুলো কিন্তু দেবারতি অফিস গেল না। সে ঘুরে বেড়ানোর পরিকল্পনা করল সুপর্ণের সঙ্গে।

দেবারতি বলল, আজ যাবে এক জায়গায়?

যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাব।

না, তবু তোমাকে একটু জানিয়ে রাখা ভাল। আমার বাবা মা নরেন্দ্রপুরে এক আশ্রমে যেতেন। সেখানে অতি শান্ত আশ্রম পরিবেশে এক অশীতিপর বৃদ্ধ স্বামীজী থাকেন। তিনি যথার্থই এক সদানন্দময় পুরুষ। তাঁকে লোকে ডাকে আনন্দবাবাজী বলে। বাবা মা যখনই কোন সমস্যায় পড়তেন তখনই ছুটতেন আনন্দবাবাজীর কাছে পরামর্শের জন্য। আমিও দু'একবার ওঁদের সঙ্গে গেছি। তাঁর হাসি, তাঁর স্নেহভরা কথাবার্তা ভোলার নয়। এখন মাঝে মাঝে সময় পেলে চলে যাই ওঁর কাছে।

চার ছটি বৃদ্ধ মানুষকে প্রতিপালন করা হয় ওঁর আশ্রমে। কয়েকজন স্বার্থত্যাগী যুবক বৃদ্ধদের সেবার দায়িত্বে রয়েছে। তাছাড়া আরও একটি আশ্রম আছে ওঁর হৃষিকেশে। সেটি মাতৃআশ্রম। সেখানেও কয়েকজন সংসারত্যাগী কন্যা রয়েছেন পাঁচ সাত জন বৃদ্ধাকে সেবা করার জন্য।

সুপর্ণ উৎসাহিত হয়ে বলল, অবশ্যই যাব।

দেবারতি বলল, আমি কিন্তু তাঁকে আমাদের জীবনের সব কথাই বলেছি।

শুনে কি বললেন, তিনি?

একমুখ হাসি ছড়িয়ে বললেন, রাধামাধবের লীলা, শুনেও সুখ, দেখেও সুখ। রাধারাণী তদ্গত থেকো।

চল আনন্দবাবাজীকে দেখে আসি।

সত্যাই পরিবেশটি বড় মধুর। ওরা অপরাহ্নের কাছাকাছি ঢুকল আশ্রমে। রোদে তেজ নেই। সামনে একসারি কদম আর কৃষ্ণ চূড়ার গাছ। সেইসব ডালপল্লবে ছাওয়া গাছের ফাঁকে দেখা যাচ্ছিল একটি মন্দির।

মন্দিরটি রাধাকৃষ্ণের। কালো পাথরের কৃষ্ণ আর অষ্টধাতুর রাধা মূর্তি। চন্দন আর সাদা, হলুদ ফুলে মূর্তি দুটিকে অপরূপ করে সাজিয়েছেন কোন ব্রহ্মচারী।

মন্দিরের বিগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে দুজনে আরও ভেতরের দিকে চলতে লাগল। একটি ছোট অথচ নির্মল জলের পুষ্করিণী। বাঁধান ঘাট। চারদিকে ঘন সবুজ পাতায় ছাওয়া আমের গাছ। পুষ্করিণীর বাঁদিক ঘেঁষে দুটি কুটির। ওটাই বৃদ্ধাশ্রম। দুটি কুটিরের মাঝখানে একটি জামের গাছ। ফুলে ভরা মালতি লতা জামের কাণ্ড আর কয়েকটা শাখাকে জড়িয়ে ফেলেছে।

আশ্রমের শেষ প্রান্তে পল্লবঘন একটি বকুল গাছের তলায় আনন্দবাবাজীর কুটির। বৃদ্ধাশ্রম এবং ব্রহ্মচারীদের থাকার ঘরগুলি টালি দিয়ে ছাওয়া হলেও বাবাজীর কুটিরটি খড়ে ছাওড়া। কুটির ঘিরে ফুলের বাগান। মন্দিরের নিত্য পূজার ফুল এই বাগান থেকেই সংগ্রহ করা হয়।

ঘরের ভেতর ঢোকার আগে বকুলের মিষ্টি গন্ধটি নাকে এসে লাগে। এ যেন ভেতর থেকে বাইরের মানুষের জন্য বকুল গন্ধেব আমন্ত্রণ।

দরজার বাইরে থেকেই দেবারতি বলল, বাবা, আমি দেবারতি, সঙ্গে কাকে এনেছি দেখুন।

সামান্য সময়ের অপেক্ষা, দরজা খুলে গেল।

বার্ধক্য মানুষের দেহমনকে যে কত সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে তা আনন্দ বাবাজীর মত মানুষদের না দেখলে বোঝা যাবে না।

অনাবিল হাসিটি হেসে বাবাজী বললেন, একেবাবে মাধবকে পাকড়াও করে এনেছ দেখছি রাধারাণী। এসো ভেতরে বসা যাক।

দুজনে বাবাজীকে প্রণাম করল। দেবারতি ঘরের ভেতর ঢুকে গিয়ে একটা মাদুর বিছালো মেঝেতে। ছোট্ট একখানি তক্তপোশে বাবাজীর বিছানা। ধবধবে সাদা একখানা চাদর পাঁতা। তার ওপর খানচারেক বই পড়ে।

বাবা আপনি খাটের ওপর বসে কথা বলুন, আমরা মাদুরে বসে শুনি।

আবার সেই মনোহরণ হাসি।

অতিথিকে নীচে বসিয়ে বৈষ্ণবের উচ্চাসনে বসতে নেই মা। আমি তোমাদের পাশে মাদুরেই বসব।

আবার বললেন, তৃণ নীচে থাকে বলেই নারায়ণের চরণ-স্পর্শ লাভ করে। প্রতিটি মানুষ তার ওপর পদধূলি রেখে যায়। মানুষ তো মানুষ নয়, নররূপী নারায়ণ।

দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস বস।

সবাই মিলে মাদুরের ওপরেই বসা হল।

তুমি তো সুপর্ণ, স্বয়ং বিষ্ণুর অধিষ্ঠান তোমার মধ্যে।

একটি দামী কথা সুপর্ণের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কর্ম শুদ্ধ না হলে কেবল নামের মহিমাতে কতটুকু এসে যায় বাবা।

রত্নাকরের কর্ম শুদ্ধ ছিল না, কিন্তু রাম নামের মহিমাতে সে বাল্মীকি হয়ে গেল। তোমার ভেতর কি আছে এখনও সে চৈতন্য আসেনি, যখন আসবে তখন তুমি মহিমান্বিত হবে।

দেবারতি বলল, হৃষিকেশে আপনার মাতৃ-আশ্রমটি দেখাব ইচ্ছে আমার বহুদিনের। বাবা মা যাবার জন্য তৈরি হয়েও ঘটনা চক্রে যেতে পারল না। জানি না আমার ভাগ্যে কি আছে।

তুমি তো দেবারতি গো। রাধামাধবের ইচ্ছে হলে তোমাকে দিয়েই হৃষিকেশে তাঁদের আবতির কাজটি করিয়ে নেবেন।

একজন ব্রহ্মচারী এসে দাঁড়ালে বাবাজী তাঁকে কিছু প্রসাদ আনতে বললেন।

সুপর্ণ আর দেবারতি প্রসাদ পেল।

বাবাজী একটি প্যাকেটে কিছু প্রসাদ ভরে দিলেন বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য।

এরপর দুজনের সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে কথা বললেন বাবাজী। একবারে সাধারণ হাস্য পরিহাসের কথা।

আনন্দবাবাজী বললেন, সাহিত্য পড়ে একসময় জেনেছিলাম, কিন্নর-কিন্নরীদের মুখ নাকি ঘোড়ার মুখের মত লম্বাটে। তোমার অভিজ্ঞতা কি বলে সুপর্ণ?

বেশির ভাগ লম্বাটে গড়নের মুখ, তবে সুদর্শন। আর ওরা যখন গান গায় তখন মনে হয় যেন গন্ধর্বলোকে বসে কেউ গাইছে।

বাবাজী বললেন, নিজের মানুষটিকে মথুরায় মোহিনীমায়ায় ছেড়ে দিয়ে কেমন করে প্রাণ ধরে আছ রাধারাণী?

এমন কৌতুকের সঙ্গে বললেন কথটি যাতে ওরা দুজনেই হেসে উঠল।

দেবারতি কিন্তু জবাব দিল, যে থাকবার তাকে ছেড়ে দিলেও সে থাকবে, আর যে যাবার তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখলেও সে থাকবে না বাবা।

সাবাস বেটী, এই সত্যটাকে যে মনে প্রাণে জানে তাকে জাগতিক দুঃখ কখনো অভিভূত করতে পারে না।

সেদিন সন্ধ্যারতি দেখে মনে ভারী একটা আনন্দ নিয়ে ফিরল দুজনে।

পরদিন চুঁচুড়াতে মায়ের কাছে চলে গেল সুপর্ণ।

দিন সাতেক পরে ফিরে যখন এলো তখন তাকে দেখে বিস্মিত হল দেবারতি। কেমন যেন বিভ্রান্ত আর বিধ্বস্ত একটা মানুষ।

একান্তে কথা হল দুজনের।

কি হল তোমার সুপর্ণ? মুখে হাসি নেই, সবসময় কিসের চিন্তায় যেন আচ্ছন্ন।

আমি কিভাবে যে তোমার কাছে কথাটা তুলব তা ভেবে পাচ্ছি না দেবারতি।

কেন, কি এমন কথা যা আমার কাছে বলতেও তোমার সংকোচ!

সাতদিন আমি মায়ের কাছে ছিলাম, কিন্তু একটি দিনের জন্যেও তার চোখ শুকনো দেখিনি।

দেবারতি সবিস্ময়ে বলল, কেন, কি হল মায়ের? তোমার কাছে শুনেছি অসম্ভব মানসিক জোর তাঁর।

কথাটা মিথ্যে নয় তবে আমার ব্যাপারে মা মাঝে মাঝে বড় দুর্বল হয়ে পড়ে।

তুমি তাঁর একমাত্র ছেলে, তাঁর ব্যথার কারণটা তোমার অবশ্যই জানা দরকার।

আমি জানি দেবারতি, কিন্তু তার ইচ্ছাপূরণ আমার কাছে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাকে আর উদ্বেগের ভেতর রেখ না সুপর্ণ।

মা তার একমাত্র ছেলের বিয়ের ব্যাপারে অস্থির হয়ে পড়েছে দেবারতি।

খুবই স্বাভাবিক।

সুপর্ণ বলল, তাছাড়া মায়ের শরীরের অবস্থা দেখে আমারই চোখে জল এসে গিয়েছিল।

কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইল দুজনে। একসময় দেবারতি কথা বলল, এ নিয়ে কিছু ভেবেছ তুমি?

সুপর্ণ বলল, দেবারতি, এ সমস্যার সমাধান সহজেই হতে পারে। আমাদের মিলনে মা খুশি হবে। অত্যন্ত মুক্ত মনের মানুষ আমার মা। নিজের সেবার জন্য বন্দী করে রাখবে না ছেলের বউকে। ছেলে বউ আনন্দ করুক, সুখী সংসার গড়ে তুলুক, এই তার ইচ্ছে।

সুপর্ণ, তোমার মায়ের ইচ্ছাটুকু খুবই স্বাভাবিক এবং আমি তাঁর ইচ্ছাকে সম্মান করি। কিন্তু সুপর্ণ আমি যে নিরুপায়। আমার ভাইবোনের কোন সমস্যাই এখনো মেটেনি। এ অবস্থায় আমার বিয়ের কথা আমি ভাবি কি করে। আমার সামান্য চাকরীর ওপর সারা সংসারটা দাঁড়িয়ে আছে। অমুর বিয়ের জন্যে এই রোজগার থেকেই তিল তিল করে সঞ্চয় করছি টাকা। এ সবের সমাধান না হলে আমি নিজের সুখের কথা ভাবতেই পারছি না সুপর্ণ।

বিয়ের পরে আমিও তো তোমার সংসারের জন্য কিছু সাহায্য করতে পারি। দুজনের রোজগারে দুটো সংসার ভালভাবেই চলে যাবে।

তা তুমি পার সুপর্ণ কিন্তু এখানে আমার দুটো অসুবিধে আছে।

বল কি তোমার অসুবিধে?

আমার প্রথম অসুবিধে বিয়ের পর দুজনের অবস্থান নিয়ে। তুমি থাকবে এক জায়গায় আর আমি অন্যত্র. সে অসম্ভব। সুতরাং সংসার যদি করতে হয় তাহলে আমাকে চাকরী ছাড়তে হবে। এক ঘরে থেকে চাকরী করছি দুজনে সে একরকম মানিয়ে যায় কিন্তু তোমার বদলির চাকরী, তাই আমার চাকরী নিয়ে তোমার সঙ্গে তো ঘুরতে পারব না। তাছাড়া বিয়ে করার পব স্বামী, ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখী একটা পরিবার গড়ে তুলতে চাই।

একটু থামল দেবারতি। হাতের মুঠি গালে ঠেকিয়ে তার দিকে চেয়ে রইল সুপর্ণ।

এক সময় দেবারতি আবার কথা শুরু করল, আমার দ্বিতীয় অসুবিধের কথাটা বলার আগে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। স্ত্রী হিসেবে তোমার রোজগারের টাকা নিতে আমার আপত্তি থাকার কথা নয় কিন্তু আমার ভাইবোনের তাতে কোন অধিকার নেই। অধিকার ছাড়া যে অর্থ পাওয়া যায় তাকে দয়ার দান বলাই ভাল! এ অর্থ আমার ভাইবোনের জন্য খরচ করলে আমাদের পারিবারিক মর্যাদায় লাগবে সুপর্ণ। তুমি তো জান, বাবা সাগরমেলায় বেরিয়ে যাবার সময় বলে গিয়েছিল, 'অমৃতা আর ইমন রইল, তুই দেখিস মা।' আজও বাবার ঐ কাতর গলার কথাগুলো আমার কানে এসে বাজে।

সুপর্ণ বলল, অর্থের কথা না হয় বাদই দিলাম কিন্তু তোমাদের পরিবারের অন্য কিছু উপকারও তো আমি করতে পারি।

তুমি আমাদের সমস্ত পরিবারের বন্ধু সুপর্ণ। বাবা মাব জন্য তুমি যা করেছ আমি তাদের মেয়ে হয়েও তা করতে পারিনি। সে উপকারেব শোধ কোনদিনই আমরা দিতে পারব না।

সে কথা থাক দেবারতি। যে কোন বিবেকবান যুবকই সেদিন তোমার বাবা মার শবদেহ উদ্ধারেব ঐ কাজটুকু করত। আমি বলছিলাম, অন্য উপকারের কথা।

দেবারতি শোনার আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইল সুপর্ণের দিকে।

এই যেমন ধর, ইমনের ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তি হবার ব্যাপারে যদি ওকে কিছু সাহায্য করতে পারি।

দেবারতি বলল. তুমি ওকে সায়েন্স নেবার জন্য উৎসাহ দিয়েছ. নিজে পড়া দেখিয়ে দিয়েছ. সুতরাং ভর্তি হবার ব্যাপারে তোমার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারলে ওর উপকারই হবে।

আর একটা সাহায্যের হাত যদি বাড়াই? না, অর্থসাহায্যের ধৃষ্টতা আমি দেখাব না।

দেবারতি সুপর্ণের হাত ধরে বলল, তুমি আমার ওপব অভিমান করে এসব কথা বলছ না তো?

অভিমান, ক্ষোভ কোন কিছুই নয়। মনে আসছে কথাগুলো তাই বলে যাচ্ছি।

বল।

অমুর জন্যে একটি ভাল ছেলে সংগ্রহের দায়িত্ব নিজের হাতে নিতে পারি কি?

আমি বেঁচে যাই সুপর্ণ। রাতের ঘুম ভেঙে গেলে ওর বিয়ের চিন্তাই আমাকে পেয়ে বসে। এত সরল সুন্দর একটি মন কিন্তু বড় জেদি আর অভিমানী। তুমি ওকে ভাল করেই জান। যে ছেলেটিকে নির্বাচন করতে চাইবে তাকে আগে ভাগে ওর স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে একটা ফিরিস্তি দিয়ে দিও। পরে ও দুঃখ পেলে সে দুঃখ আমি আর সইতে পারব না।

বেশ তাই হবে। এখন বাকী রইল দুটো কাজ। অবশ্য একটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অন্যটা।

কি সে কাজ?

আমার বিয়ে এবং মায়ের আনন্দ।

সে তো যে কোন সময়েই হতে পারে সুপর্ণ।

না দেবারতি, তা হতে পারে না। যার জন্যে প্রতি মুহূর্তে প্রতীক্ষা করে চলেছি, তার জন্যে অনন্তকাল অপেক্ষা করতেও আমি রাজি।

তোমার মায়ের দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জলে কি আমাদের মিলন সুখের হবে?

এ প্রশ্নের উত্তর সময়ের হাতেই ছেড়ে দাও দেবারতি।

যেদিন কিন্নরে পাড়ি দিল সুপর্ণ সেদিন দেবারতি অমুকে সঙ্গে নিয়েই হাওড়া স্টেশানে গিয়েছিল। পথের জন্য অনেক রকমের খাবার প্যাক করে এনেছিল দুইবোনে।

অমৃতা বলল, সপ্তাহে একখানা করে চিঠি চাই কিন্তু। পুনমের খবর জানাতে ভুল না যেন।

সুপর্ণ বলল, পুনমকে অবশ্যই তার নতুন বন্ধুর খবর জানাব।

দিদির দিকে ফিরে অমৃতা বলল, এবার যখন সুপর্ণদা আসবে তখন দেখো সঙ্গে বেঁধে এনেছে এক কিন্নরী।

দেবারতি বলল, কিন্নর গিয়ে তো কিন্নরী দেখা কপালে জুটবে না, তোর সুপর্ণদার দৌলতে যদি তা জোটে।

সুপর্ণ বলল, কিন্নরীরা খুবই সুন্দরী কিন্তু আমার মন বলছে, তার চেয়েও সুন্দরীরা আছে আমার ধারে কাছে, কেবল খুঁজে নেবার অপেক্ষা।

ট্রেনের বাঁশি বেজে উঠল। দুবোন প্ল্যাটফর্মের কিনারে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়াল।

অমৃতার দুটো চোখ হঠাৎ জলে ভরে উঠল।

সুপর্ণের মনটা ভারী হয়ে উঠেছিল। সে জোর করেই বলল, বিদায়ের সময় চোখেব জল ফেলতে নেই। প্রিয়জনের অকল্যাণ হয়।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ মুছে ফেলে সারা মুখে বর্ষাধোয়া রোদের মত হাসি ছড়িয়ে দিল অমৃতা।

সুপর্ণ বলে উঠল, এই তো চাই, মোনালিসার মুখে হাসি নইলে মানায়।

গাড়ি ছেড়ে দিতেই দেবারতি মুখবন্ধ একটা খাম ধরিয়ে দিল সুপর্ণের হাতে।

একেবারে কিন্নরের কোয়ার্টারে বসে চিঠিখানা পড়ো। উত্তরের অপেক্ষায় থাকব।

সুপর্ণ দূরে সরে যেতে যেতে হাত নাড়তে লাগল। দেবারতিব দুচোখে নেমে এল হেমন্তের কুয়াশা।

চার

সুপর্ণ,

তোমাকে লেখা এটিই হয়ত আমার শেষ চিঠি। তোমার কলকাতা ছাড়ার আগের দুটো রাত আমি নীরবে আমার বিছানায় বসে কাটিয়েছি, দুচোখের পাতা মুহূর্তের জন্যেও এক করতে পারিনি।

প্রথম কফি হাউসে দেখা হবার দিনটি থেকে কত ঋতুপর্ব হাতে হাত বেঁধে চলেছি দুজনে। কত গ্রীষ্মে কাতর, কত বর্ষায় বিহ্বল আর কত বসন্তে উন্মত্ত হয়েছে আমাদের কামনা। দুটি মনকে একান্তে পাবার লোভে পৃথিবীর কত কোণ আমরা দুজনে খুঁজে বেড়িয়েছি। আমাদের বসার আসনটি পাতা হত অজানা কোন গাঁয়ের ঘাসে ভরা মাঠে, মাথার ওপর আচ্ছাদন তৈরী করে দিত পাতায় ভরা কোন গাছ। তুমি ছিলে বক্তা আমি শ্রোতা। তোমার কবিতার মত কথাগুলো আমি ক্রমাগত মনের মধ্যে জমিয়ে রাখতাম। শুধু ভাবতাম, কঠিন ইঁট পাথর, লোহালক্কড় নিয়ে যার কারবার তার মুখ থেকে এমন সব রূপকথা ঝরে পড়ে কি করে! পাছে আমি কথা বললে তোমার কথার মুখ বন্ধ হয়ে যায় তাই প্রায়ই চুপ করে থাকতাম। তুমি একদিন বলেছিলে, দেবারতি নীরবতাই তোমার ভাষা।

আর একদিন বলেছিলে, ঝড় যদি ওঠে তাহলে শান্ত প্রকৃতিও অনর্গল কথা বলে চলে। আমি নিশ্চয়ই তোমার ভেতর তেমন করে ঝড় তুলতে পারিনি দেবারতি।

আমি কি দেব এর উত্তর। আমার হয়ে সেদিন উত্তর দিয়েছিল বসন্তের একটা কোকিল। কৃষ্ণচূড়ার ফুলে ভরা ডালে বসে সে ক্রমাগত সুরেলা গলায় ডেকে গিয়েছিল।

আমি শুধু বলেছিলাম, দেখলে তো কে গান গায়। কোকিলা গান গায় না, তাকে গেয়ে শোনায় কোকিল।

এমনি কত কথা আমরা ছড়িয়ে দিয়েছি ঘাসে ভরা প্রান্তরে, কত দীর্ঘশ্বাস মিশে গেছে ঐ মহাশূন্যের বুকে। কত সুর আমরা ভাসিয়ে দিয়েছি গঙ্গার কলতানে।

সুপর্ণ আমার কাছে স্মৃতি সততই সুখের। দুঃখ, সুখ স্মৃতির মন্থনেই স্বাদু হয়ে ওঠে।

আজ আর স্মৃতির রোমন্থন নয়, আমার রাজার কাছে একটি ভিক্ষা। যদি একান্ত আপনজন ভেবে তুমি আমার প্রার্থনাটি পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দাও তাহলেই তুমি পড়ো আমার চিঠির অবশিষ্ট অংশটুকু, না হলে ছিঁড়ে ফেলে দাও কৃপা করে। আমি তাতে দুঃখ অথবা শোক কোন কিছুই অনুভব করব না।

কেন জানিনা তোমার মায়ের মুখখানা বারবার ভেসে উঠছে আমার চোখের ওপর। আশাহত, বড় ক্লান্ত আর বিষন্ন। স্বামী নেই যে শান্তি খুঁজবেন তাঁর আশ্রয়ে। একমাত্র সন্তান সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। সে ইঞ্জিনিয়ার এবং মিলিটারীতে চাকুরীরত। মার দুটি চোখ এখন স্বপ্নে জাগরণে ছুঁয়ে আছে তাঁর সন্তানকে।

উপযুক্ত ছেলে, বউ আনুক ঘরে এটা প্রতিটি মায়েরই অন্তরের ইচ্ছা। তোমার মা তোমাকে সেই ইচ্ছাটুকুই জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁর আকুল আকাঙ্ক্ষা আর তোমার সংসারী হবার মাঝখানে আমি এসে দাঁড়িয়েছি বাধার বিন্ধ্যাচল হয়ে।

তোমার মত একজন প্রতিষ্ঠিত হৃদয়বান যুবকের সঙ্গে কার না ইচ্ছে করে বান্ধবীদের সরস মন্তব্যের ভেতর দিয়ে বাসর ঘরে প্রবেশ করতে। কিন্তু আমি একটি সত্য ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছি, মানুষের চাওয়া আর পাওয়ার ভেতরে একটা অদৃশ্য হাতের খেলা আছে। সেই খেলায় আমাকে পরাজিতের দলে ফেলে দিয়েছে আমার ভাগ্য। আমি একটা সংসারের আবর্তে পড়ে গেছি। সেখান থেকে অদূর ভবিষ্যতে আমার মুক্তি নেই।

তুমি জান, চাঞ্চল্য আমার স্বভাবের ধর্ম নয়। তাই ভাগ্যের এই সিদ্ধান্তকে আমি স্থির চিত্তে মেনে নিয়েছি।

তোমার কাছে অনুরোধ, তুমি তোমার অসুস্থ মায়ের ইচ্ছাটুকুকে পূর্ণ কর। যদি তোমার মা তোমার বিয়ের আগেই ঈশ্বরের ডাকে চলে যান তাহলে তাঁর অতৃপ্ত ইচ্ছার দীর্ঘশ্বাস আমাদের সংসার জীবনকে ভারাক্রান্ত করে তুলবে। আমরা কখনো সুখী সংসার রচনা করতে পারব না।

এ সত্য আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি, একবার যদি কোন নারী পুরুষের সঙ্গে নিবিড় মিলন-বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে সে বন্ধন অটুট থাকে আমৃত্যু। একমাত্র নারী পুরুষের ব্যভিচারই ঘটাতে পারে ব্যতিক্রম। আমরা সেই নিবিড় গভীর বন্ধনে অনেক দিনই বাঁধা পড়েছি সুপর্ণ। তাই আজ সাময়িক কোন বিচ্ছেদ পারবে না আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে। আমি অনুভব করি এবং জীবনের অনাগত দিনগুলিতেও অনুভব করব, তুমি আমার নিত্যসঙ্গী, চিরসখা। আমি আমৃত্যু তোমার ছায়াসঙ্গিনী হয়ে থাকব।

আমার শেষ আর একটি অনুরোধ আছে, রক্ষা করা না করা তোমার ইচ্ছাধীন।

তুমি যদি মায়ের মুখ চেয়ে এবং আমার আন্তরিক সম্মতির কথা জেনে বিয়ের সিদ্ধান্ত নাও তাহলে আমি কি একটি মেয়ের প্রসঙ্গ তোমার কাছে তুলে ধরতে পারি?

সে মেয়েটি তোমার বিশেষ চেনা। শুধু চেনা নয়, ঘনিষ্ঠ পরিচয় রয়েছে তার সঙ্গে। সে যাতে একটি সুখী সংসার রচনা করতে পারে সেজন্যে একটি মনোমত পাত্রের সন্ধানে থাকবে এমন প্রতিশ্রুতিও দিয়ে গেছ। আচ্ছা সুপর্ণ, সঙ্গিনী হিসেবে সে মেয়েটির কথা কি একবার ভেবে দেখবে?

অমৃতা যদি তোমার ঘরে সংসার-লক্ষ্মী হয়ে যায় তাহলে আমরাও কি তারই ভেতর দিয়ে মিশে থাকব না, দুজনে দুজনের সঙ্গে।

এই মুহূর্তে আমার আনন্দবাবাজীর কথা মনে পড়েছে। তিনি আমাদের দু'জনকে রাধারাণী আর

মাধব নামে ডেকেছিলেন। সেদিন বুঝিনি কিন্তু আজ বুঝেছি তাঁর এই নামকরণের গূঢ় তত্ত্বটি। মহাপুরুষদের মুখ দিয়ে সাধাবণত পরম সত্যই উচ্চারিত হয়। রাধামাধবের প্রেম সমুদ্রের মত। তার বাইরে তরঙ্গ-লীলা কিন্তু ভেতরে গভীরতা। আর শ্রীকৃষ্ণ মাধবের জন্য রাধারাণীর প্রতীক্ষা, আকাশের মত অনন্ত। আমৃত্যু সেই আকুল প্রতীক্ষাই হবে আমার প্রেমের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার সুপর্ণ।

তোমার দেবারতি।

বিয়েব পর অমৃতাকে সঙ্গে নিয়ে সুপর্ণ বদলী হয়ে এল দেরাদুনে, তার কর্মস্থলে। নতুন কোয়ার্টার। দেবারতি কয়েকদিন পরে কলকাতা থেকে ছুটি নিয়ে এসে মনের মত করে সাজাতে লাগল বোনের সংসার।

একদিন ওরা তিনজনে জিপে করে এল হৃষিকেশে আনন্দবাবাজীর মাতৃ-আশ্রমে। বাবাজী দেবারতির হাতে পরিচয়পত্র দিয়ে দিয়েছিলেন। মাতৃ-আশ্রমের অধ্যক্ষা বাবাজীর চিঠি পেয়ে পরম আদরে গ্রহণ করলেন তিনজন অতিথিকে। সারাদিন অতিথি আপ্যায়ন হল মহাসমাদরে। কথায় কথায় শোনা গেল সুপর্ণের দেরাদুনের কোয়ার্টারের প্রায় কাছাকাছি এক রিটায়ার্ড মিলিটারী অফিসার বাড়ি কবে আছেন। তাঁর স্ত্রী মাতৃ-আশ্রমের পরিচালক সমিতির সদস্যা। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই আনন্দবাবাজীর পবমভক্ত। আশ্রমের দোতলা অতিথি-নিবাসটি তাঁরাই নির্মাণ করে দিয়েছেন নিজেদের অর্থে। তাঁদের সন্তান-সন্ততি নেই। দেরাদুনের বাড়িটিও তাঁরা মাতৃ-আশ্রমের নামে উইল করে দিয়েছেন। ওঁদের অবর্তমানে ওখানেও একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হবে এই সেবাশ্রমের।

সন্ধ্যার কিছু আগে গঙ্গার স্রোতে পুষ্প-প্রদীপ ভাসাবার জন্য জিপ নিয়ে হরিদ্বারে চলে গেল সুপর্ণ আর অমৃতা। সেখান থেকে ওরা দেরাদুনে ফিরে যাবে। মাত্র একদিনের ছুটি সুপর্ণের। কিন্তু মাতৃ আশ্রমেব অধ্যক্ষা কিছুতেই ছাড়লেন না দেবারতিকে। কথা রইল দুদিন পরে তাঁরা দেবারতিকে ছেড়ে দিয়ে আসবেন সুপর্ণের কোয়ার্টারে। সেখানে মেজর মালহোত্রার পরিবারের সঙ্গেও সুপর্ণদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসবেন তাঁরা।

ঠিক দুদিন পরে তিনজন আশ্রম কন্যার সঙ্গে দেবারতি চলে এল সুপর্ণের কোয়ার্টারে। মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করলেন সেদিন শ্রীমতী সুভদ্রা মালহোত্রা। একেবারে জননী-মূর্তিটি। নিজে পাশে বসে পরিবেশন করে খাওয়ালেন সবাইকে। মিঃ মালহোত্রা সুপর্ণের চাকরীর ব্যাপারে কিছু মূল্যবান উপদেশ দিয়ে বললেন, যখন সময় করতে পারবে তখন কোন রকম সংকোচ না করে চলে এসো। আমরা প্রতিবেশী, পরস্পরকে দেখাই আমাদের কাজ।

মিসেস মালহোত্রা অমৃতাকে বললেন, কদিন পরেই তোমার দিদি কোলকাতা চলে যাবে। তোমার বরও বেরিয়ে যাবে কাজে। সময় যদি না কাটে চলে এসো আমার কাছে। নানা আলোচনায় দুজনে সময়টা দিব্যি কাজে লাগাতে পারব।

দেবারতির আচার আচরণ, ব্যক্তিত্ব কেবল হৃষিকেশের মাতৃ-আশ্রমের সেবিকাদের ওপরেই প্রভাব ফেলেনি, মালহোত্রা পরিবারের মনেও গভীর রেখাপাত করেছিল।

কয়েকদিন পরে কলকাতা ফেরার আগের রাতটিতে মালহোত্রদের সঙ্গে দেখা করতে গেল দেবারতি আর অমৃতা।

মিসেস মালহোত্রা কথার মাঝেই বললেন, এবার দেবারতি যখন দেরাদুনে আসবে তখন অর্ধেক দিন থাকবে বোনের কাছে, বাকী অর্ধেক দিন কাটাবে তার আংকেলের এই বাড়িতে। দেবারতি তুমি চিঠি লিখতে ভুলো না যেন।

দেবারতি বলল, আমি অবশ্যই আসব। চিঠিতে যোগাযোগ রাখব আপনার সঙ্গে। বড় নিশ্চিন্ত হয়ে যাচ্ছি কলকাতায়। আপনার কাছে অমু থাকতে পারবে, এর চেয়ে বেশী স্বস্তি আমি আর কোন কিছুতেই পাব না।

দেবারতি চলে এল কলকাতায়। নিজের রিক্ততায় মাঝে মাঝে তোলপাড় করে ওঠে বুক।

যৌবনের অনিবার্ণ অগ্নি দেহকে দগ্ধ করতে থাকে। স্মৃতির পাখিগুলো বারণ মানে না, ক্রমাগত ফিরে এসে গান শুনিয়ে যায়।

তবু একটা সান্ত্বনা তার দেহমনের জ্বালাকে প্রশমিত করে রাখে। সে তার মা বাবার অতৃপ্ত ইচ্ছাকে পূর্ণ করে চলেছে। এর চেয়ে বড় সান্ত্বনা, বড় পরিতৃপ্তির কথা ভাবতে পারে না সে।

অক্লান্ত দুটো ডানার অধিকারিণী হয়েছে অমৃতা। স্বামীর সঙ্গে কখনো উড়ে চলেছে নীল দিগন্তে। কখনো সবুজ অরণ্যে, তুষার পর্বতে সহচারিণী হচ্ছে স্বামীর।

কেমটি ফলস-এর নীচে মসৃণ বোল্ডারগুলোর ওপর দিয়ে লাফিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে ওপরের দিকে তাকাল অমৃতা। তার মনে হল, এক রূপোলী নাগকন্যা নেমে আসছে পাহাড় বেয়ে। হঠাৎ মাথার একটু ওপরে থেমে গিয়ে সে বর্ষণ করতে লাগল রাশি রাশি মুক্তোর দানা। সেই অঢেল মুক্তোর বিন্দু ঢেউ তুলে বোল্ডারগুলোর ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে যেতে লাগল আরও নীচে সবুজ ছাওয়া উপত্যকার দিকে। অমৃতা তার সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে স্নান করতে লাগল সেই শ্বেত, শীতল মুক্তার প্লাবনে।

দূরে একটা শুকনো বোল্ডারের ওপর বসে বসে সুপর্ণ দেখছিল অমৃতার স্নানলীলা। কতক্ষণ সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখে ঘোর লেগে গেল তার। প্রথমে মনে হল, ফোয়ারার জলে স্নান করছে শ্বেত পাথরে গড়া অপরূপ নগ্ন এক নারীমূর্তি। পরক্ষণেই মনে হল, এ মূর্তি তার বহু যুগের চেনা এক নারীর, যে তার চিরজীবনের মানস-সঙ্গিনী। যে স্পর্শ, ঘ্রাণ, শব্দ, আস্বাদনের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে আপন মহিমায়। তাকে অধিকার করা যায় না, তাই তার আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য।

অমৃতার ডাকে বাস্তব বোধটুকু ফিরে এল সুপর্ণের।

তুমি স্নান করবে না?

তোমার স্নান দেখলেই আমার আনন্দ-স্নান।

খুব যে আমার দিদির কাছ তেকে ভাল ভাল বচনগুলো চুরি করেছ দেখছি?

চুরির অপবাদ আমি অস্বীকার করি না। তবে ভাষা নয়, অন্য কিছু।

কি?

দিল্।

কি বললে, কিল? তার মানে, তুমি কিল চুরি করেছ?

আরও একটু ব্যাখ্যা করে বল।

আমি দিদির মত বাংলার ছাত্রী নই।

সুপর্ণ বলল, দিদির হাওয়া তো এতকাল গায়ে লেগেছে।

অমৃতা বলল, ও কথাটির অর্থ, অপমানিত হয়েও প্রকাশ না করা। স্রেফ চেপে যাওয়া আর কি।

সুপর্ণ মৃদু হেসে কথান্তরে চলে গেল, তুমি যে দেখছি পাথরের ওপর চেপে বসে রইলে। বেশিক্ষণ ওভাবে স্নানলীলা চালালে বিপদ ঘটবে কিন্তু।

অমৃতার স্নানের ইচ্ছা শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে এবার মুখে হুহু হুহু আওয়াজ তুলে ভেজাবস্ত্রে সুপর্ণের দিকে ছুটে এল।

মরশুম কিংবা দিন, কোনটাই ছুটির চিহ্নে চিহ্নিত ছিল না। তাই সেদিন অ-তিথির যাত্রী ছিল কেবলমাত্র এরা দুজন, স্বামী স্ত্রী।

পোশাক বদলে সুপর্ণের হাত ধরে সরু রাস্তা বেয়ে ওপরে উঠল অমৃতা। জিপে বসে ফ্লাস্ক থেকে গরম কফি ঢেলে খেতে দিল সুপর্ণকে। নিজেও খেল।

স্নান করে কফি খেয়ে চনমনে হয়ে উঠল অমৃতা। গাড়িটাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতে ভাবছিল সুপর্ণ, কফির মেজাজ কি সব জায়গায় পাওয়া যায়। পল্লবী, সঞ্চারী আর দেবারতিকে নিয়ে কফি হাউসে আড্ডা দিতে দিতে কফি পানের যে আনন্দ তা ভূ-ভারতে কোথায় মিলবে।

অমৃতা ভাবছিল. এই যে দু'পাশের মন কেমন করা সুন্দর দৃশ্যগুলো পিছলে পিছু হটে যাচ্ছে, এমনি করে কি আমাদের আনন্দের দিনগুলোও হারিয়ে যাবে।

কত মেষচারক বর্ষা শুরু হবার আগে তাদের ভেড়ার পাল নিয়ে দুর্গম পর্বতের চারণক্ষেত্রগুলিতে চলে গেল। আবার শীতের পদধ্বনি শুনে নেমে এল উপত্যকায়। কত শুগাপাখি (টিয়ে) সোনালী রোদ্দুরে সবুজ শাড়ির ঝিলিক তুলে উড়ে গেল ফলকর বৃক্ষের সন্ধানে, আবার তারা ফিরে এল সন্ধ্যার কুলায়। পাখির গান, ফুলের গন্ধ, ঋতুর উৎসব বার বার হারিয়ে গিয়েও ফিরে এলো কিন্তু অমৃতার বিবাহিত জীবনের ইন্দ্রধনু ছবি আঁকা সাতটি বছর সেই যে হারিয়ে গেল আর ফিরে এলো না।

এই কটি বছর পেরিয়ে যেতে না যেতেই বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল দেবারতি। অমৃতা অনেক দিনই কাছে নেই, ইমনও সম্প্রতি স্কলারশিপ নিয়ে ডাক্তারী বিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য চলে গেছে লণ্ডনে। ব্যাঙ্কে কাজকর্মের কয়েকটা ঘণ্টা ছাড়া বাকী সমস্ত সময়টাই শূন্যতায় ভরা।

জীবনের এমন এক বিরস, বিষণ্ন দিনে ব্যাঙ্ক থেকে ফিরে এসে দেবারতি চিঠি পেল সুপর্ণের।

সমস্ত চিঠিখানাতেই বেজে উঠেছে একটা আক্ষেপের সুর। কোলে সন্তান আসেনি বলে আজকাল বড় বেশি উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে অমৃতা। অফিসার্স ক্লাবের আনন্দ অনুষ্ঠানে যে অমৃতা নাচে গানে মাতিয়ে তুলত আসর, সে আজকাল ফাংশানগুলো এড়িয়ে চলে নানা অজুহাতে।

এমনি সব অনুযোগ ভরা চিঠি। শেষে একটি সংবাদে আটকে গেল দেবারতির চোখ।

সুপর্ণ লিখেছে, মিসেস মালহোত্রের ভ্রাতৃবধূ ডাক্তার মিসেস ভার্মা আসছেন দেরাদুনে মালহোত্রাদের বাড়িতে। তিনি কেদার বদরীনাথ ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছেন। আমি তাঁর তীর্থদর্শনের সমস্ত ব্যবস্থাই করে রেখেছি। তিনি বোম্বের বিখ্যাত স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ। মিসেস মালহোত্রা আমাদের বিষয়ে তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন। তিনি কয়েকটা ব্যাপারে পরীক্ষা করে রাখতে বলেছেন। এলেই সব দেখবেন।

দেবারতি অমৃতাকে চিঠি দিল, সে যেন অস্থির হয়ে না পড়ে। শান্ত মনে সবকিছু গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে।

ডাক্তার ভার্মা অমৃতাকে পরীক্ষা করে এবং সুপর্ণের রিপোর্ট দেখে বললেন, সন্তানের জন্ম দেবার কোন বাধাই আপনাদের ভেতর নেই। কায়মনে আপনারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করুন, যে কোন সময় একটি শিশুর মুখ দেখতে পাবেন।

সুপর্ণ আর অমৃতা বেরিয়ে যাচ্ছিল, ডাক্তার মিসেস ভার্মা অমৃতাকে ডেকে বললেন, একটু বস আমার কাছে, কয়েকটা কথা আছে।

সুপর্ণ চলে গেল কোয়ার্টারের দিকে। এখন মুখোমুখি রইলেন ডাক্তার আর অমৃতা।

ডাক্তার ভার্মা বললেন, স্বামী তোমার ব্যবহারে খুশি তো? মানে তোমায় ভালবাসেন তো?

আমার মনে হয়, ওঁর ভালবাসায় কোন খাদ নেই। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন ডাক্তার ভার্মা?

অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর মনের ভেতর কোন ক্ষোভ বা গোপন যন্ত্রণা থাকলে সন্তানের জন্মে বাধা সৃষ্টি হতে পারে। সেদিকে সব সময় সতর্ক থেকো। আসলে এ ব্যাপারে দুজনের সমান ইনভলভমেন্ট চাই।

অমৃতা নমস্কার জানিয়ে বলল, আপনার পরামর্শের জন্য অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার।

রাতে কিন্তু ঘুম এল না অমৃতার চোখে। সে বিছানায় শুয়ে টুকরো টুকরো ভাবনার ভেতর ডুবে গেল।

সে কি সত্যিই তার স্বামীর ওপর সমস্ত কর্তব্য করেছে? কোনদিন কি তার মনে কোন আঘাত দেয়নি?

এক বিবাহ-বার্ষিকীর কথা মনে পড়ল অমৃতার। সুপর্ণ বলেছিল, কি চাও তুমি এ বছর?

আমি তো তোমার কাছে কিছু চাইনা কোনদিন, তুমিই না চাইতে তুলে দাও আমার হাতে। তাহলে এবার এ প্রশ্ন কেন?

সুপর্ণ নিজের ভুল বুঝতে পেরে চুপ করে গিয়েছিল।

অমৃতা পরিস্থিতিকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, তুমি যা দেবার দিও, কিন্তু সেদিন সপ্তধারায় নিয়ে গিয়ে আমাকে রামসীতার মন্দিরে সন্ধ্যারতি দেখিয়ে আনতে হবে।

সুপর্ণ বলেছিল, বেশ তাই হবে।

কিন্তু পরিস্থিতি অন্যদিকে গড়াল। ছুটির দিন, মধ্যাহ্ন ভোজের আমন্ত্রণ। বন্ধুরা সস্ত্রীক এসে খাওয়া-দাওয়া সারল। দুপুরে বিশ্রামের পর তারা বসাল গানের আসর। বন্ধুর স্ত্রীরা গান গাইছে, কেউবা কৌতুক নক্সা পরিবেশন করছে। সময় কিন্তু গড়িয়ে চলেছে দিনান্তের দিকে।

কেউ একটি গান শেষ করলে সবাই বাহবা দিচ্ছে। সুপর্ণ ফিরে ফিরে মহিলাটিকে গাইতে অনুরোধ করছে। এদিকে মনে মনে ফুঁসছে অমৃতা। মানুষটার কি কোন আক্কেল আছে! রামসীতার মন্দিরে সন্ধ্যারতি দেখতে হলে গাড়ি নিয়ে এখুনি বেরুতে হয়। দু'ঘণ্টার আগে পৌঁছানো যাবে না।

আসর থেকেই হাঁকল সুপর্ণ, জলদি, জলদি চায়ের ব্যবস্থা হোক। গলা না ভেজালে মিসেস চতুর্বেদীর গানের গলা খুলছে না।

কথা শুনে গা জ্বলে গেল অমৃতার। কিন্তু স্বামীর মান রাখতে মুখ বুজে পরিবেশন করল চা।

অবশ্য সেদিন শেষরক্ষাটুকু সে আর করে উঠতে পারেনি। নাচগানের জন্য বারংবার অনুরুদ্ধ হয়েও সে শরীর খারাপের মিথ্যা অজুহাত দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এতে গভীরভাবে মর্মাহত হয়ছিল সুপর্ণ। বন্ধুদের কাছে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল সে। ক্ষোভে, দুঃখে সুপর্ণ সেদিন রাতের খাবার স্পর্শ করেনি।

এমনি বহু দিনের বহু ক্ষুদ্র ঘটনা আজ বড় হয়ে দেখা দিতে লাগল অমৃতার চোখে। সে গোচরে অথবা অগোচরে অনেক আঘাত দিয়েছে সুপর্ণকে। তার চোখে হঠাৎ জল এল। পাশেই ঘুমোচ্ছিল সুপর্ণ, অমৃতা ঘুমন্ত স্বামীকে চুম্বন করল, আদরে আশ্লেষে ভরে দিল।

সুপর্ণ একবার চোখ মেলল, পরমুহূর্তে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

পরের কয়েকটি মাস সুপর্ণকে সে নানাভাবে তৃপ্ত রাখার চেষ্টা করেছে। নতুন বিয়ে করা বউয়ের মত প্রতিদিন স্বামীর প্রত্যাগমনের পথ চেয়ে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করেছে সে। এত বছরের জমানো ত্রুটি সাফ করে ফেলতে যেন উঠে পড়ে লেগেছে অমৃতা।

সেদিন মেজর জেনারেল আরোরা সাহেবের বিদায় সম্বর্ধনার পার্টিতে নিমন্ত্রিত ছিল সুপর্ণ। পার্টির আয়োজন হয়েছিল মুসৌরী পাহাড়ের ওপর একটি সরকারী বাগানে। সারাদিন পাহাড়ের ওপর কাটিয়ে সেই সন্ধ্যায় ফেরা।

সুপর্ণকে আজ বিয়ের স্যুটখানা বের করে দিল অমৃতা। এটা তোলা ছিল একটা সুটকেসে। বেশী পরা হয়নি।

সুপর্ণকে বেশ দেখাচ্ছিল স্যুটখানা পরে। অমৃতা ছেলেমানুষের মত ওকে বারবার এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে যাবার আগে বলল, একটু দাঁড়াও। তোমার জন্য গোলাপ গাছটা আধফোটা একটা ফুল ফুটিয়েছে।

অমৃতা ছুটে গিয়ে ফুলটা তুলে এনে সুপর্ণের বাটন হোলে এঁটে দিল। হাতটা ধরে দুষ্টুমি করে কড়ে আঙুলটা কুট করে একটুখানি কামড়ে দিয়ে বলল, আমার এই মানুষটার ওপর আর কোন ভাল মানুষের মেয়ের নজর যেন না পড়ে।

হো হো করে হেসে উঠল সুপর্ণ লীলাময়ী স্ত্রীর রসিকতায়।

কিছুক্ষণের ভেতরেই গাড়ির হর্ন বেজে উঠল। সুপর্ণ হাত নাড়তে নাড়তে উঠে বসল গাড়িতে।

অমৃতা আজ সারাদিন একা। সুপর্ণের বাইরে কাজ না থাকলে অফিস থেকে মাঝে মাঝে চলে আসত কোয়ার্টারে, এক কাপ চা খেয়ে অথবা অমৃতার সঙ্গে দু'দশটা রঙ্গরসিকতার কথা বলে আবার চলে যেত অফিসে। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। সেই কোয়ার্টারে ফিরতে ফিরতে রাত

আটটা নটা হয়ে যেতে পারে। অতএব আজ সারা দিন গৃহবন্দী। মুখ গুঁজে বাগান অথবা ঘরের কাজ করে যাওয়া।

অমৃতার হঠাৎ মনে হল, ওয়ার্ড রোবের একটা দিক বিয়ের পর থেকেই অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে। সেদিকে সুপর্ণের বিয়েব আগেকার বাতিল জামা প্যান্টগুলো ডাঁই করে রাখা। ওগুলোর আজ একটা হিল্লে কবে ফেলতে হবে। প্রথমে রোদ্দুরে দিয়ে তারপর ঝাড়াই বাছাই।

দু নম্বর প্যান্ট মেঝেতে ফেলে তিন নম্বরটিতে হাত দিতে গিয়েই অমৃতা দেখল, পকেট একেবারে পোস্ট অফিস হয়ে আছে।

এক পকেটে মানুষটা কত চিঠি পুরে রেখেছেরে বাবা।

টেনে বেব করে মেঝেতে ফেলে দিতে গিয়ে একখানা চিঠিতে চোখ আটকে গেল। এ কি! এ যে দিদির হাতের লেখা দীর্ঘ একখানা চিঠি। প্রথম সম্বোধনই 'সুপর্ণ'। শেষে 'তোমার দেবাবতি'।

এত অন্তরঙ্গ সম্বোধনে দিদি কি চিঠি লেখে তার স্বামীকে!

চিঠির তারিখে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল অমৃতা। এ চিঠি তাব বিয়ের আগে লেখা।

সে চিঠিখান অতি দ্রুত পড়ে যেতে লাগল বিশেষ কৌতূহল নিয়ে। তার বুকখানা কাঁপছিল। 'কত ঋতুপর্ব হাতে হাত রেখে চলেছি দুজনে'। কি বলতে চাইছে দিদি? 'কত বসন্তে উন্মত্ত হয়েছে কামনা'। ভাবতে গিয়ে দমটা যেন বন্ধ হয়ে আসছে। কত দীর্ঘশ্বাস তাহলে একদিন জড়িয়েছিল গভীর প্রেমের বাঁধনে। কি আশ্চর্য! আমার মত এই নির্বোধ মেয়েটা কিছুই বুঝতে পারেনি! 'একবার যদি কোন নারী কোন পুরুষের সঙ্গে নিবিড় মিলন-বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে সে বন্ধন অটুট থাকে আমৃত্যু'। 'তুমি আমার নিত্য সঙ্গী, চিবসখা। আমি আমৃত্যু তোমার ছায়াসঙ্গিনী হয়ে থাকব।' উঃ, এ আমার দিদির লেখা। ও তো আমার শুধু দিদি নয়, ও মায়ের মমতায় মানুষ করেছে আমাদের। সেই দিদি আমার সুখের দিকে চেয়ে তার এত গভীর প্রেমকে বলি দিয়েছে! আমার জন্য ভিক্ষা চেয়ে নিয়েছে সুপর্ণের করুণা!

নিজেকে বিক্ত করে এতখানি ত্যাগ কার জন্যে করলে দিদি? এই মুহূর্তে সেই অতি সরল আর বুদ্ধিহীন মেয়েটা বুঝতে পরেছে, আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের দৌলতে যে প্রাসাদটা একদিন গড়ে উঠেছিল, স্বপ্ন ভেঙে যাবার পর দেখা দেল, সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে সে প্রাসাদ অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কি করে বোঝাব দিদি আমি দিক দিশাহীন, একটা তপ্ত মরুভূমির বুকেব ওপর দাঁড়িয়ে আছি। মরুদ্যান বলে যাকে চোখের সামনে দেখে আশ্বাসে, আনন্দে বুক বেঁধে চলেছিলাম, সেটা মরীচিকা ছাড়া কিছু নয়। সুপর্ণ, তুমি আমার স্বামী। এই একান্ত বিশ্বস্ত মেয়েটাকে তুমি সাত সাতটা বছর কি যাদুতে ভুলিয়ে রেখে দিলে! তুমি তোমার ঐ চওড়া বুকখানাতে হাত বেখে বলতে পারবে কি, এই মেয়েটাকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে কোনদিন অন্য কোন দেহ তোমার কল্পনায় ভেসে ওঠেনি?

ভাবতে ভাবতে বুক চাপড়ে হা হা করে কেঁদে উঠল অমৃতা। হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে কখন যে মেঝেতে পড়ে গেল তার হুঁশ নেই।

জ্ঞান যখন ফিরল তখন বেলা অনেকখানি গড়িয়ে গেছে। সে উঠে বসল। সেই মুহূর্তে অদ্ভুত একটা ইচ্ছা হেমন্তের কুয়াশার মত সমস্ত বোধকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। অমৃতা নামের অতি উচ্ছল, আনন্দময়ী মেয়েটি হঠাৎ হারিয়ে ফেলল নিজেকে।

রাত্রি আটটায় ফেয়ারওয়েল পার্টি থেকে ফিরে এল সুপর্ণ। বেল বাজাল। কারু সাড়া পাওয়া গেল না। সামান্য সময় দাঁড়িয়ে থেকে দরজায় হাত লাগাতেই ভেজান দরজা খুলে গেল। অবশ্য এমনটা আগেও হয়েছে। চুরিহারির কোন প্রশ্ন নেই এখানে তাই সাবধানতাও কম।

সুপর্ণ বসার ঘর পেরিয়ে ঢুকে গেল স্টাডি রুমে। অমৃতা চেয়ারে বসে কাচ লাগানো টেবিলটার ওপর মাথা ঠেকিয়ে ঘুমোচ্ছে। একরাশ খোলা চুল ঢেকে ফেলেছিল তার মুখখানা। অমৃতার চুলের ঢাল দেখার মত। কোঁকড়া কালো চুলের রাশ যেন প্রপাতের মত নেমে গেছে।

আস্তে আস্তে পা টিপে সুপর্ণ অমৃতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তখনও অমৃতা ঘুমে অচেতন। সুপর্ণ প্রথমে ভাবল চমকে দেবে. কিন্তু পরক্ষণেই কেমন এক মায়ায় ভরে উঠল মন। সে কালো জলের ঢেউয়ের ভেতর আধডোবা পদ্মের মতো মুখখানাকে দুহাতের অঞ্জলিতে তুলে ধরল। অমনি কয়েকটা কাগজের পাতা ফ্যানের হাওয়ায় উড়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

একি! সুপর্ণের হাতের পাতায় গড়িয়ে পড়ল অমৃতার মুখ। কেঁপে উঠল সুপর্ণ। অমৃতা অ-মৃ-তা বলে চেঁচিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে ডাকতে লাগল। সযত্নে অমৃতার শরীরটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল বেড রুমের বিছানার ওপর। সবুজ বাল্‌বটা জ্বলছিল। রোজকার অভ্যেস মত বেড সাইড টিপয়ের ওপর অমৃতা ফুল সাজিয়ে রেখেছিল ফুলদানিতে।

না, অমৃতার দেহের কোথাও একবিন্দু প্রাণের চিহ্ন নেই।

হাহাকার করে মাথা চাপড়াতে লাগল সুপর্ণ, এ তুমি কি করলে অমৃতা, কেন একাজ করলে!

এ প্রশ্নের উত্তরগুলো তখন ছড়িয়ে পড়েছিল স্টাডি রুমের মেঝেতে।

সুপর্ণ পাগলের মত ছুটে যাচ্ছিল মিঃ মালহোত্রার বাড়ির দিকে। স্টাডি রুম পেরুতে গিয়েই চোখে পড়ল তার কাগজগুলো। সে পাতা কটা কুড়িয়ে নিয়েই চোখ বোলাতে লাগল।

একটুকরো ছোট্ট কাগজে লেখা ঃ— আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমার স্বামীকে যেন আমার মৃত্যুর ব্যাপারে কোনভাবেই বিব্রত করা না হয়।

এরপর পাতলা কাগজে ভাঁজকরা একখানা চিঠি পাওয়া গেল। চিঠিখানা খুলতেই দেখা গেল দুটো বড় বড় কাগজে চার পৃষ্ঠা ভরে লেখা।

এ যে দেবারতির হাতের লেখা! সুপর্ণ একটু চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারল, অমৃতার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব জানিয়ে যে চিঠি দেবারতি তাকে লিখেছিল, এটা সেই চিঠি। কিন্তু এ চিঠি কোথায় পেল অমৃতা!

চিঠির যেখানে যেখানে দেবারতি তাদের দুজনের গভীর ভালবাসার কথা লিখেছে ঠিক সেই লাইনগুলোর নীচে অমৃতা লাল পেন্সিলের জ্বলজ্বলে দাগ টেনে দিয়েছে। এ যেন চিঠি পড়তে পড়তে যে জায়গাগুলোতে অমৃতার বুকের রক্তক্ষরণ হয়েছে, সেই রক্ত তুলে নিয়ে সে দাগ দিয়েছে চিঠির বিশেষ বিশেষ লাইনগুলোতে।

এর পরে ছোট একটা প্যাডের কাগজে অমৃতার হাতে লেখা কয়েক ছত্র চিঠি। একই চিঠিতে সুপর্ণ আর দেবারতিকে জানিয়েছে তার অন্তরের দু'চারটি কথা।

আমি গভীর যন্ত্রণা নিয়ে এ পৃথিবী থেকে সরে যাচ্ছি, এ মিথ্যা ধারণা করে তোমরা দুঃখ পেওনা। দিদি, তুমি শুধু আমার দিদিই ছিলে না মায়ের মৃত্যুর পর আমাদের দুটি ভাইবোনকে তুমি মায়ের মমতা দিয়ে আগলে রেখেছিলে। প্রতিদিন প্রতিকাজে তোমার সাহায্য ছাড়া আমরা ভাবতেই পারতাম না। আমাদের সুখ দুঃখ, অভাব যন্ত্রণার দিনে তুমি নীরবে পাশে দাঁড়িয়ে তোমার অভয় হাত বাড়িয়ে আমাদের বুকের কাছে টেনে নিয়েছ। কিন্তু দিদি এ তুমি কি করলে! তোমার অন্তরের অন্তরতম মানুষটিকে তুমি শুধু আমার সুখের কথা ভেবে তুলে দিলে আমার হাতে! দিদি, তোমার একথা আজ যখন জানতে পারলাম তখন নিজের কথা ভেবে নয়, তোমার রিক্ত জীবনটার কথা ভেবে বুক আমার ভেঙে গেল। মনে হল, সময় পেরিয়ে যায়নি, এখনও আমি তোমাদের মিলনের পথটাকে মুক্ত করে দিয়ে যেতে পারি।

সুপর্ণ, আজ চলে যাবার সময় শুধু একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে। দিদি তার বোনকে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে তোমার হাতে তুলে দিল কিন্তু তুমি কি তাকে সমস্ত অন্তর উজাড় করে গ্রহণ করতে পেরেছিলে? এই সাত বছরের সংসার জীবনে চলার পথে কত ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছে আমার, তুমি মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছ, সে সময় কি মনে পড়েনি তোমার আর কোন একটি মুখ? যাকে কাছে পেলে পূর্ণ হত তোমার জীবন?

নিশ্চয়ই মনে পড়েছিল, আর মনে পড়াটাই তো স্বাভাবিক।

যাবার সময় কোন অভিমান মনে নিয়ে যাচ্ছি না আমি। একটা সত্যকে জেনে গেলাম এটাই আমার শান্তি। আমার বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে তোমাকে দিদি যে চিঠিখানা লিখেছিল সুপর্ণ, সেটা তুমি নষ্ট করে না ফেলে এতদিন গুছিয়ে রেখেছিলে, আর তাতেই সত্য আবিষ্কৃত হল, এ জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

অভিমান নয়, ক্ষোভ নয়, তবু একটা কথা যাবার সময় বলে যাই। সুপর্ণ, এ সাত বছর আমি একটা খেলার পুতুল হয়েই কাটালাম। তুমি আমাকে মনেব মত সাজিয়ে গুছিয়ে খেলা করেছ, নিশ্চয় কিছু তৃপ্তিও পেয়েছ। কিন্তু তুমি ভাল করেই জানতে আমার সঙ্গে তোমার যথার্থ প্রাণের যোগ সম্ভব নয়। কারণ তুমি বোধবুদ্ধি সম্পন্ন একজন মানুষ আর আমি নিছক নির্বোধ একটি পুতুল।

সবশেষে আমার এ চিরযাত্রার পথে আজ তোমাদের কাছ থেকে ক্ষমা, স্নেহ আর শুভকামনা চেয়ে নিচ্ছি। তোমরা অন্তরে কোন গ্লানি না রেখে মুক্ত মনে আমাকে বিদায় দাও, আমার যাত্রাপথ ভারমুক্ত কর।

তোমাদের চিরস্নেহের কাঙাল অমৃতা।

পাঁচ

মিসেস মালহোত্রার টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটে এল দেবারতি। বুকে পাষাণের ভার।

দরজা খোলা। বসার ঘর পেরিয়ে স্টাডিরুমে ঢুকে দেখল, কি একটা ফাইলের ওপর চোখ রেখে বসে আছে সুপর্ণ।

দেবারতির পায়ের সাড়া পেয়ে সে চোখ তুলল। চোখাচোখি হল কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না। স্তব্ধ মূক দেবারতি, বিধ্বস্ত সুপর্ণ।

দেবারতি বেডরুমে গিয়ে পালঙ্কের একটা বাজুতে হাত রাখল। এই পালঙ্কটি দেবারতির ঠাকুরমা পেয়েছিলেন তাঁর বিয়েতে। বাবা এটিকে খুলে প্যাক করে রেখে দিয়েছিলেন চিলে কোঠায়। অমৃতা বিয়ের সময় বায়না ধরল, মডার্ণ ডিজাইনের কোন খাট আমি চাই না। ঠাকুমার ঐ পুরানো পালঙ্কটা পালিশ করে দিও আমায়।

সেই পালঙ্ক আজ অমৃতার অকাঙ্ক্ষা নিয়ে তেমনি পড়ে আছে, কিন্তু পালঙ্কশায়িনী সেই কেশবতী কন্যাটি নেই। আর কোন দিনই দেখা যাবে না সেই ঘুমন্ত কন্যার রূপমাধুরী।

দেবারতির পাথরের মত স্থির দুটো চোখের কোণ উপচে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

অমৃতার ফেলে যাওয়া পোশাক-পরিচ্ছদের গন্ধ শুঁকতে লাগল আকুল আগ্রহে। বিয়ের বেনারসীখানা বের করে বুকে চেপে ধরল দেবারতি। দুজনে বিয়ের বেনারসী কিনতে বেরিয়ে কি হুজ্জোৎ। দেবারতি যত বলে, বিয়েতে লাল বেনারসী পরার রেওয়াজ আছে অমু। ও তত জেদ ধরে বলে, ঐ টিয়ে রঙের বেনারসী পরেই আমি বিয়ের পিঁড়িতে বসব।

কথা রইল অমৃতার। শেষে মাথার লজ্জাবস্ত্রটি কেনা হল লাল রঙের। সারা দেহজুড়ে সোনালী সুতোর কাজ।

একখানা চিঠি পালঙ্কের ওপর ফেলে দিয়ে সরে গেল সুপর্ণ। দেবারতি মেঝেতে বসেই হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা তুলে নিল। অমৃতা মৃত্যুর আগে ওদের দুজনকে যে চিঠি লিখে গিয়েছিল সেই চিঠি।

দেবারতি এতক্ষণ বোনের মৃত্যুর কারণটা জানতে চায়নি। যে ভালবাসার ধন চোখের সামনে থেকে চিরদিনের মত সরে গেল, যাকে আর কোন দিনই খুঁজে পাওয়া যাবে না, তার চলে যাবার কারণ খোঁজার কোন কৌতূহলই ছিল না দেবারতির। সে বোনের চিঠিখানার ওপর চোখ বুলিয়ে গেল। আশ্চর্য! এতদিন পরে সুপর্ণকে লেখা তার চিঠিখানা আবিষ্কৃত হল! সুপর্ণ এতকাল ঐ চিঠিখানাকে পুষে রেখেছিল!

বাইরে উঠে এল দেবারতি। সুপর্ণ বসেছে ড্রইংরুমে।

অত্যন্ত বেদনার্ত গলায় দেবারতি বলল, তুমি এতদিন আমার চিঠিখা৷ কাছে রেখে দিয়েছিলে!

সুপর্ণ বলল, তুমি কি আশা করেছিলে আমি বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তোমাকে মন থেকে মুছে ফেলব? কি দিয়েছ তুমি আমাকে? স্বপ্নের ইন্দ্রধনু আঁকা কয়েকখানা চিঠি বই তো কিছু নয়। না হয় সেই কখানাই রেখে দিয়েছিলাম, তাতেই অপরাধী হয়ে গেলাম।

দেবারতি শান্ত গলায় বলল, ক্ষমা কর সুপর্ণ, ওভাবে কথাটা বলা আমার অন্যায় হয়েছে।

সুপর্ণ আজ নিজেকে হারিয়ে ফেলল। সে বলতে লাগল, ভুল তুমি প্রথম থেকেই করেছ। স্বপ্ন রচনা করলে তুমি আবার তার সমাধিও রচনা করলে তুমি। আমি তোমার সেই লীলাই কেবল দেখে গেলাম। ঘুড়ি, লাটাই সবই তোমার, কেবল আনাড়ি মানুষটার হাতে সামান্য সময়ের জন্য ধরিয়ে দিয়েছিলে। তার পরিণতি যা হবার তাই হল। ঘুড়ি কেটে গেল শূন্যে।

কথাগুলো শেষ করে গালে হাত চেপে মুখ নীচু করে বসে রইল সুপর্ণ।

দেবারতি এবারও শান্ত গলায় বলল, তোমার মন এখন অশান্ত হয়ে আছে সুপর্ণ, তুমি কয়েকদিন একান্তে বিশ্রাম নাও। আমি হৃষিকেশে মাতৃ-আশ্রমে রয়েছি, কলকাতা ফিরে যাবার আগে আবার আসব।

ধীরে পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দেবারতি। তার চলে যাওয়া পথের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সুপর্ণ।

পনের দিন উত্তরাখণ্ডের কয়েকটি তীর্থ পর্যটন করে হৃষিকেশে ফিরে এল দেবারতি। দেরাদুন থেকে ফেরার টিকিট সে কেটে রেখেছিল। দু'একদিন হৃষিকেশের আশ্রমে থেকে চলে গেল দেরাদুন।

আবার মুখোমুখি হল সুপর্ণের। এবার দেবারতির মনে হল, সুপর্ণ নিজেকে অনেকখানি সামলে নিয়েছে।

তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করেছিলাম দেবারতি।

আমি আরও আগে আসতাম সুপর্ণ, কিন্তু আশ্রমের কয়েকজন ব্রহ্মচারিণী তীর্থ পরিক্রমায় যাচ্ছিলেন, আমাকেও সঙ্গী করে নিলেন। মনটা অশান্ত ছিল তাই ঘুরে এলাম।

এখন নিশ্চয়ই কিছুটা স্থির হয়েছে তোমার মন।

অমুর জন্যে হিমালয়ের তীর্থে প্রার্থনা জানিয়ে আসতে পেরে অনেকটা শান্তি পেয়েছি।

তুমি এখানে থাকছ তো?

আজ আসার পথেই মিসেস মালহোত্রার সঙ্গে দেখা। তিনি রাতে ওঁর ওখানে ডিনারের নেমন্তন্ন করে রেখেছেন। থাকার ব্যবস্থাও ওখানেই।

অন্তত ডিনার পর্যন্ত এখানে তুমি কাটাতে পারবে।

সুপর্ণের গলার স্বরে একটুখানি অভিমানের সুর বাজল মনে হল দেবারতির। সে সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে সুপর্ণের হাত স্পর্শ করল।

এমন করে কথা বল না সুপর্ণ। তুমি আমার বন্ধু ছিলে, আজও আছ, চিরদিনই থাকবে।

সুপর্ণ এবার দেবারতির হাতখানা মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলল, দুজনের এই বন্ধুত্ব কি প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না দেবারতি?

সুপর্ণের হাতের মুঠোয় একটুখানি যেন কেঁপে উঠল দেবারতির হাত। সে টেনে নিল না, শুধু বলল, ঐ নিষ্ঠুর মেয়েটার কাছে আমি হেরে যেতে পারব না সুপর্ণ।

এখানে হেরে যাবার প্রশ্ন কি করে আসে দেবারতি?

উত্তেজনায় হাতখানা টেনে নিয়ে দেবারতি বলল, আমার সর্বস্বধন আমি যে নিঃস্বার্থভাবে ত্যাগ করেছি, সে কথা, উল্লেখ সে করে গেছে তার চিঠিতে। তবু সে আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল কেন? আজ যদি তার মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে আমি তোমাকে গ্রহণ করি তাহলে আমার এই ত্যাগের কি মূল্য

রইল? বন্ধুত্বকে ভোগের ছোঁয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখব বলে আমি সাত সাতটা বছর নিজেকে শাসন করে এসেছি, সেটা কি প্রবৃত্তির টানে এক মুহূর্তে ভেসে চলে যাবে সুপর্ণ? আত্মা বলে যদি কোন কিছু থেকে থাকে তাহলে সেই মেয়েটার আত্মা আমাদের দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসবে না? তাই বলছিলাম, আমি ওর কাছে হেরে যেতে পারব না।

মনের ভেতর জমে থাক এতখানি কথা একসঙ্গে উজাড় করে দিতে পেরে অনেকখানি স্বস্তি বোধ করল দেবারতি। সুপর্ণ কিন্তু এরপর কোন কথা বলল না। সে খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে রইল।

দেবারতির ওঠার সময় হলে সুপর্ণ যেন স্বগতোক্তির মতে বলে উঠল, এখন আমি কি করি।।

দেবারতি আবার বাড়িয়ে দিল তার হাতখানা। সুপর্ণ হাতটা ধরলে দেবরতি বলল, শুধু তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বের ভাবনাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে সুপর্ণ। আমার সমস্ত কাজের শক্তি ঐ ভাবনাটুকু। তুমি কি পারবে না আমার বন্ধুত্বকে এমনিভাবে স্বীকার করে নিতে?

আমার মনের শক্তি তোমার মত নয় দেবারতি। আমি রক্তমাংসের সামান্য মানুষ। তবু আমি চেষ্টা করব তোমার বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখতে।

রুম্‌কি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, খানা তৈয়ার সাহেব। আমার খানা আমি নিয়ে গেলাম, তোমার ঢাকা রইল, খেয়ে নিও।

সুপর্ণ বলল, ঠিক আছে।

রুম্‌কি দেবারতির দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে চলে গেল। সম্ভবত অমৃতার চলে যাবার পর নতুন রাঁধুনি বহাল করেছে সুপর্ণ।

দেবারতি হাত নেড়ে বলল, আবার দেখা হবে।

সুপর্ণ ম্লান একটুখানি হেসে হাত নাড়ল। দেবারতি চলে গেল মিসেস মালহোত্রার বাড়ি।

তিন চার মাস কোন পক্ষই যোগাযোগ করল না কারু সঙ্গে। দেবারতি ভাবল, এখন চিঠিপত্রের যোগাযোগ বন্ধ থাকাই ভাল। সুপর্ণের মনটা কিছু শক্ত হোক। মামুলি শরীরের সংবাদ দেয়া নেয়ার যে চিঠি সে তো বন্ধুর কাছে বন্ধুর চিঠি নয়। বন্ধুর চিঠিতে থাকে হৃদয়ের ছোঁয়া আর উত্তাপ। ঐ ছোঁয়া লাগিয়ে এখন দেবারতি উত্তপ্ত করতে চাইল না সুপর্ণের মন। অন্যদিকে সুপর্ণের যোগাযোগ না রাখার কারণ অজ্ঞাত রইল দেবারতির কাছে।

কিন্তু কারণটা বেশি দিন অজ্ঞাত রইল না। দেবারতির হৃষিকেশ আশ্রম ছেড়ে চলে আসার পঞ্চম মাসে চিঠি এল মিসেস মালহোত্রার কাছ থেকে।

চিঠিতে নানা সংবাদ পরিবেশনের পর শেষ কয়েক ছত্রে লিখেছেন, তোমার বোনের মৃত্যুর ছটি মাসও পূর্ণ হয়নি, কিন্তু এরই ভেতর সুপর্ণের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। সন্ধ্যায় কোয়ার্টারে ফিরে অস্বাভাবিক মদ্যপান চলে গভীর রাত্রি পর্যন্ত। সামনের দরজাটাও বন্ধ রাখার প্রয়োজন বোধ করে না। কেবলমাত্র ভেজিয়ে রাখে।

এগুলো যদি স্বীকার করে নিই তাহলেও আর একটি বিষয় কিছুতেই মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। অমৃতার মারা যাবার পরে সুপর্ণ ওর বেয়ারার বউকে রান্নার কাজে ঢুকিয়েছে। তুমি রুম্‌কিকে দেখে গেছ কিনা জানি না। তবে ঐ মেয়েটাকে নিয়ে অশোভন অনেক কথার সৃষ্টি হয়েছে ইতিমধ্যে।

জানি না, এগুলো আমার অনধিকার চর্চা কিনা। তোমাকে মেয়ের মত ভালবাসি, অমৃতাকে বড় ভালবাসতাম, তাই এসব কথা তোমাকে না জানিয়ে পারলাম না। সুপর্ণ আবার সংসারী হলে হয়ত শুধরে যেতে পারত।

মিসেস মালহোত্রার চিঠি পড়ে বুকের ওপর আবার একটা পাষাণের ভার অনুভব করল দেবারতি। আনন্দ বাবাজী আশ্রমে থাকলে তখুনি তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে কিছুটা সান্ত্বনা পেত সে। কিন্তু বাবাজী এখন হৃষিকেশে মাতৃ-আশ্রমে রয়েছেন। নব্বুইয়ের ওপর বয়েস। মা গঙ্গার তীরে তীর্থভূমিতে দেহরক্ষার বাসনা।

অতএব ছুটি নিয়ে তখুনি সুপর্ণের কাছে চলে যাবার পরিকল্পনা করে ফেলল দেবারতি। যদি সুপর্ণকে যথার্থ বন্ধু বলে ভাবে তাহলে এ সময় অবশ্যই তার কাছে গিয়ে দাঁড়ান দরকার।

কয়েকদিনের ভেতরেই দেবারতি এসে পৌঁছল মাতৃ-আশ্রমে। সেই অনাবিল আনন্দময় হাসিটি হেসে তাকে কাছে টেনে নিলেন আনন্দ বাবাজী।

চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল দেবারতির।

বাবাজী চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললেন, না না, তোর চোখে জল মানায় না। চির আনন্দময়ী মায়ের বুকে আমার কিসের ব্যথা বাজল?

দেবারতি তার ছুটে আসার কারণটুকু ধীরে ধীরে জানাল আনন্দ বাবাজীকে।

সেই অম্লান মুখে এতটুকু ছায়া ঘনাল না। তেমনি হাসিতে উদ্ভাসিত মুখে বললেন, দেখিস না, সূর্য কত জ্যোতির্ময় কিন্তু সামান্য একটুকরো মেঘ তার সব আলোটুকু ঢেকে ফেলে। সুপর্ণের অন্তঃকরণে মহৎ একটা আলোর শিখা রয়েছে, তাকে শুধু গ্রাস করে ফেলেছে একটা ছায়া।

তবু অস্থিরতা ঘোচে না মনের। সে যাবে সুপর্ণের কাছে, বসবে তার মুখোমুখি। বলবে যে জীবনটাকে গড়ে তুলতে এত সময় নিয়েছ তাকে নিঃশেষে ভেঙে ফেলতে এতটুকু মায়া লাগছে না?

প্রথমে মিসেস মালহোত্রার সঙ্গে দেখা করল দেবারতি। মালহোত্রা বললেন, তুমি যদি ওর মুখোমুখি হতে কোনরকম ভয় না পাও অথবা সংকোচ বোধ না কর তাহলে একটু রাত করে যাওয়াই ভাল। ও যখন আপন মনে ড্রিংক করবে তখন ওর কাছে গিয়ে দাঁড়িও।

দেবারতি বলল, ও আমার বোনের স্বামীই শুধু নয়, ও আমাদের পরিবারের বহুদিনের বন্ধু। নিঃস্বার্থভাবে কত উপকার যে ও আমাদের করেছে, বলে বোঝানো যাবে না। তাই ও নিজেকে ধ্বংস করে ফেলুক এটা আমরা মন থেকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না।

দেবারতি সুপর্ণের দেখা হল। রাত তখন অনেকটাই গভীর। কিন্তু এই সাক্ষাৎকার যে এতখানি নাটকীয় হবে তা আগে থেকে কেউই অনুভব করতে পারেনি।

সত্যিই ভেজান ছিল দরজা। সন্তর্পণে সেটিকে খুলে ভেতরে ঢুকল দেবারতি। ধীরে ধীরে দরজাটা বন্ধও করে দিল। ড্রইং রুম থেকে ঢুকল স্টাডিতে। দুটো ঘরই প্রায় অন্ধকার। এক চিলতে সবুজ আলো বেড রুম থেকে এসে পড়েছিল পড়ার ঘরের একটা কোণে। বেডরুমে ঢোকার দরজাটা প্রায় খোলা। একটা পর্দা টাঙান ছিল দরজার ওপর থেকে নীচ অবধি। তার পাশ দিয়ে এক চিলতে সবুজ আলো বেরিয়ে আসছিল। এই বেড রুমের সবুজ বাল্বটা ভারী পছন্দ ছিল অমৃতার।

পর্দা একটুখানি হাত দিয়ে সরিয়েই শিউরে উঠল দেবারতি।

বেডরুমে একখানা চেয়ার, টেবিল ঢোকান হয়েছে। দরজার দিকে পেছন ফিরে খালি গায়ে শুধু একটা পাজামা পরে ড্রিংক করছে সুপর্ণ। আর ঐ রুমকি মেয়েটা, উর্ধ্ব অঙ্গ নগ্ন করে পালঙ্কে হেলান দিয়ে বসে তারিয়ে তারিয়ে দেখছে সুপর্ণের পানলীলা। সুপর্ণ হয়ত সামনে বসা রঙ্গিনীকে মাঝে মাঝে দেখছে এবং দারুণ উত্তেজনায় শূন্য করছে পানপাত্র।

রুমকির চোখ পড়ে গেল দরজার দিকে। চুরি করে খেতে আসা বেড়াল ঘরের ভেতর হঠাৎ কাউকে ঢুকতে দেখলে যেমন এদিক ওদিকে পাক দিয়ে আঁচড়ে কামড়ে বেরিয়ে যায়, ঠিক তেমনি কাপড়-জামাগুলো টেনে নিয়ে দেবারতির পাশ দিয়ে রুমকি গলে বেরিয়ে গেল। পানমত্ত সুপর্ণ ব্যাপারটা আন্দাজ করার আগেই দেবারতি সুপর্ণের ওপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল তার দেহ সংলগ্ন বেশবাস। ক্ষোভ, দুঃখ, ঘৃণা, ক্রোধে সে তখন অন্য এক নারীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

চিৎকার করে উঠল দেবারতি, সুপর্ণ আমি এসেছি, নাও, যেখান থেকে খুশি তোমার ঐ থাবার আঁচড়ে ছিঁড়ে তুলে নাও আমার মাংস। নারীদেহে এত লোভ তোমার!

বলতে বলতে শোকে, দুঃখে, উত্তেজনায় মেঝেতে হতচেতন দেবারতি ভেঙে গড়িয়ে পড়ল।

চিৎকারে কিছুটা হুঁশ ফিরে এসেছিল সুপর্ণর। সে ফিরে দাঁড়িয়েছিল পেছন দিকে। একি দেবারতি

তার বেশবাস খুলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল! যে দেবারতি তার পূর্ণ নারীত্বের মহিমা নিয়ে আজও তার দৃষ্টিতে উজ্জ্বল সেই দেবারতি আজ পণ্যা নারীর মত নগ্ন করে দিল নিজেকে!

লজ্জায়, গ্লানিতে মরে গেল সুপর্ণ। সে দুহাতে চোখ ঢেকে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল বাইরে।

ঘোর আর আচ্ছন্নতা কেটে গেলে ছড়িয়ে পড়া বেশবাসগুলো কুড়িয়ে নিয়ে নিজেকে সংযত করে নিল দেবারতি। ঘরে কেউ নেই। আলোটা জ্বলছে। দেবারতির চোখ গিয়ে পড়ল দেয়ালে বাঁধান একটা ছবির ওপর। মাল্যদানের সময় সুপর্ণকে মালা পরাচ্ছে অমৃতা। চোখে মুখে পরিতৃপ্তি আর আনন্দ যেন উপচে পড়ছে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল দেবারতি। কোন দিকে তাকানোর প্রয়োজনও সে বোধ করল না। ব্যভিচারের হাওয়া যেখানে বইছে সেখান থেকে সে সরে যাবে বহু বহু দূরে।

পরের দিনই অপরাহ্নে মাতৃ-আশ্রমে নিজের জিপখানা নিয়ে হাজির হল সুপর্ণ। সে একবার দেখা করতে চায় দেবারতির সঙ্গে।

দেবারতি এখন স্থির। ঝড় আর বর্ষণ থেমে গেলে প্রকৃতি যেমন স্তব্ধ নীরব হয়ে যায় ঠিক তেমনি এক প্রশান্ত নীরবতা বিরাজ করছে দেবারতিকে ঘিরে।

দেখা হল দুজনের। মুখ নীচু করে অতিথি ভবনের ভিজিটার্স রুমে দাঁড়িয়েছিল সুপর্ণ। পায়ের সাড়া পেয়ে মুখ তুলল। একদিনেই অনুতাপে দগ্ধ, বিধ্বস্ত হয়ে গেছে মুখখানা।

দেবারতি, আমি ক্ষমা চাইতে আসিনি, এসেছি তোমার কাছ থেকে শাস্তি চেয়ে নিতে। আমার ব্যভিচার, আমার আসক্তি, আমার নোংরা প্রবৃত্তিগুলোকে একমাত্র তুমিই পার নির্মম হাতে শাসন করতে।

কথাগুলো বলতে গিয়ে গলার স্বর প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসছিল সুপর্ণের। কথা শেষ করে সে মাথা নীচু করল।

দেবারতি শান্ত গলায় বলল, এসো আমার সঙ্গে, আনন্দবাবাজী এখানেই আছেন, তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে যাও।

দুজনকে একসঙ্গে দেখেই বাবাজী সহাস্যে বললেন, কি গো, মানিনীর মান ভাঙাতে এসেছ মাধব?

সুপর্ণ বাবাজীর চরণে প্রণাম জানাতে গিয়ে চোখের জলে ভাসল।

আনন্দ বাবাজী দু'হাত দিয়ে সুপর্ণের মুখখানা তুলে ধরে বললেন, অশ্রু হল যথার্থ সঞ্জীবনী ধারা। গঙ্গোদকের চেয়েও পবিত্র, অমৃতের চেয়েও প্রাণদায়িনী। শিশুর কান্নার জল দেখেই তো নেমে আসে করুণাময়ী মায়ের মমতা। অতি পাষণ্ডের চোখ ফেটে যখন জল নামে তখন সে পাষণ্ড নরোত্তমের মহিমা লাভ করে।

তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন মা। বস সুপর্ণের পাশে। দুঃখীকে, অনুতপ্তকে সাধ্যমত সঙ্গ দিতে হয়।

দেবারতি মাদুরের একপ্রান্তে বসতে বসতে বলল, বাবা গঙ্গায় আপনার সান্ধ্য স্নানে যাবার সময় পার হয়ে যায় যে।

সেই মধুর হাসিটি হেসে বললেন বাবাজী, স্নান তো আজ হয়ে গেছে মা। একেবারে পূর্ণকুম্ভ স্নান। সুপর্ণের চোখের জলেই আজ স্নান সারা হয়ে গেছে আমার।

একটু থেমে সুপর্ণের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেহভোগের আস্বাদ নিয়েছ, সুখকে জেনেছ, এখন আনন্দকে জগৎ থেকে লুটে নিতে হবে সুপর্ণ।

কেমন করে বাবা?

সবার জন্যে নিজেকে বিলিয়ে দাও, তবেই তো আনন্দ আপনি এসে তোমার কাছে ধরা দেবে। তুমি যে কাজে নিযুক্ত আছ তাতেই একেবারে সমর্পণ করে দাও নিজেকে। তীর্থদেবতার পথ গড়ে চলেছ তুমি,—এই ভাবনাটা প্রদীপের শিখার মত জ্বেলে রাখ তোমার অন্তরে। পথিকের যাত্রা সুগম হলে তুমি পাবে সার্থকতার পুরস্কার। সেই তোমার আনন্দ।

উনিশশো একানব্বই সালের অক্টোবর। পূজার ছুটিতে হিমালয়-দর্শনে বেরিয়ে পড়েছে ভ্রাম্যমানেরা। হরিদ্বার থেকে ছুটে চলেছে যাত্রীবোঝাই বাস। উত্তরকাশী, কেদারবদরী, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, গোমুখ।

অন্ত নেই উদ্দীপনার। সব বয়সের নারীপুরুষ বাসযাত্রার শেষে ঘোড়ায় অথবা পদব্রজে চলেছে তীর্থদেবতার মন্দিরে।

আনন্দের পাত্র যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে সেই মুহূর্তে কেঁপে উঠল ধরিত্রী। চূর্ণ হয়ে গেল আনন্দের অমৃত পাত্র।

ভেঙে গেল পথঘাট। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল জনপদ, মন্দির, নগরী। অবর্ণনীয় কষ্ট ও বিপদের মাঝে পড়ল তীর্থযাত্রীর দল। পাহাড়ের ওপর আস্তানা পাতল কোন দল। ভাগ্যবানেরা সন্ধান পেল গুহা গহ্বরের। যারা চটিতে, ডাকবাংলোয় অথবা কোন আশ্রম-গৃহে ঠাঁই নিয়েছিল তারাও বিপন্ন হয়ে পড়ল। দেয়াল ধ্বসে আহত হল বহুজন। আলো নেই, জল নেই, খাদ্য নেই। রাস্তা মেরামত না হওয়া পর্যন্ত খাদ্য পাওয়া, কিংবা ফিরে যাবার কোনও উপায়ও নেই।

বিভিন্ন দিকে নেমে পড়েছেন মিলিটারী ডিপার্টমেন্টের ইন্‌জিনিয়াররা। তাঁরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পথের সংযোগ ও মেরামতির কাজ করে চলেছেন।

কেদারের সুদীর্ঘ পথ মেরামতির দায়িত্বে রয়েছে সুপর্ণ। গৌরীকুণ্ডের কাছাকাছি অপেক্ষা করে আছে অজস্র বাস। হরিদ্বার থেকে পথ মেরামতির কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। এখন কেদারনাথ থেকে গৌরীকুণ্ড পর্যন্ত শুরু হয়েছে পথের সংস্কার। কাজ চলেছে অতি দ্রুতগতিতে। বিশাল আকারের ঝুলন্ত পাথরের সব স্তূপ মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে উঁকি দিচ্ছে। কখন ঝাঁপিয়ে পড়বে কে জানে! পথের মাঝে মাঝে অজস্র ফাটল। নীচে বয়ে যাচ্ছে সংক্ষুব্ধ মন্দাকিনী।

পাথরের ঝুলন্ত চাঁইগুলোতে বেঁধে দেওয়া হয়েছে ডিনামাইট। রামবাড়ার দিক থেকে সুপর্ণ সংকেত পাঠালেই গৌরীকুণ্ডের দিক থেকে চার্জ করা হবে।

ছোট ছোট অনেকগুলি দল মন্দিরের দিকে আটকে আছে। তারা অস্থির হয়ে উঠেছে গৌরীকুণ্ডে ফিরে বাস ধরে নীচে নেমে যাবার জন্য। কয়েকজন দুঃসাহসী যুবক বেরিয়ে গেছে পাহাড় ডিঙিয়ে। এক আহত ভদ্রলোক স্ত্রীর কাঁধে ভর রেখে এগিয়ে এলেন সুপর্ণের কাছে। সঙ্গে বছর সাতেকের এক দুরন্ত শিশু।

ভদ্রলোক সুপর্ণের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

বড় অসহায় হয়ে পড়েছি, চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই, খাবারও ফুরিয়েছে। কোন সময় নাগাদ আমরা পৌঁছতে পারব বলে আপনি মনে করেন?

সুপর্ণ বলল, আপনাদেরই জন্য আমরা পাহাড় ডিঙিয়ে এসেছি। প্রায় শেষ করে এনেছি কাজ। এখুনি ব্লাস্টের সংকেত দেওয়া হবে। বিপদজনক পাথরগুলো পড়ে গেলেই রাস্তা মেরামতির কাজ দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। এত কষ্ট করেছেন, আজ রাতটুকু কাটান। . . গৌরীকুণ্ডে গিয়ে অবশ্যই গাড়ি ধরতে পারবেন। আজ সারাদিন কাজ চললে সন্ধ্যে নাগাদ পথ ঠিক হয়ে যাবে।

করুণ মুখে বউটি বলল, দাদা অনেক ভরসা পেলাম। একেবারে মরে আছি এই খোঁড়া মানুষটিকে নিয়ে। গলা শুকিয়ে গেছে, একটু ভাল জলও পাচ্ছি না খেতে।

সুপর্ণ বলল, ঐ তো আমার টেন্ট। ওখানে কুঁজো আছে, আপনার ফ্লাস্কে জল ভবে নিন না।

মহিলাটি ছুটল সুপর্ণের তাঁবুর দিকে।

সুপর্ণ একটি লোককে বলল, ডিনামাইট চার্জের সংকেত পাঠাও।

মেয়েটি ফিরে এল। এসেই এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। স্বামীকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল, বাপী কোথায়, বাপীকে দেখছি না কেন?

সুপর্ণ চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, পথে নেমে যায়নি তো?

তা তো জানি না দাদা। বা-পী, বা-পী-ই।

মেয়েটি ছুটে যাচ্ছিল নীচের পথ ধরে। তাকে আটকালো সুপর্ণ, যাবেন না, এখুনি ডিনামাইট চার্জ হবে, পাথরের চাঁই ভেঙে পড়বে মাথায়।

মেয়েটি কান্নায় ভেঙে পড়ে চেঁচিয়ে উঠল, বাপী, আমার বাপী সোনা কোথায়...।

সুপর্ণ লাফিয়ে লাফিয়ে উঠল একটা টিলার ওপর। দেখল, ছেলেটি নীচের দিকেই ছুটতে ছুটতে নেমে চলেছে। একবার দাঁড়িয়ে পড়ল মনে হল, মায়ের কথা মনে পড়েছে, কিন্তু ফিরল না। সর্বনাশ! ছেলেটা ঝুলন্ত চাঁইগুলোর জোনের দিকে এগিয়ে চলেছে। যে কোন মুহূর্তে ডিনামাইট ফাটিয়ে দেবে পাথরগুলো!

টিলা থেকে নেমে পাগলের মতে ছুটে চলল সুপর্ণ। পেছনে মায়ের একটা আকুল কান্না তাড়া করে চলল তাকে।

অনেকটা নীচে দৌড়ে গিয়ে ছেলেটার নাগাল পেল সে। বুকে তুলে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে উঠে আসতে লাগল। তাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ঝুলন্ত রাক্ষুসে পাথারগুলো।

বুম্, বুম্, বুম্, বুম্। ডিনামাইট বিস্ফোরিত হল। খণ্ড খণ্ড হয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল বোল্ডারগুলো। ধুলোর মেঘে ঢেকে গেল চারদিক। সেই মেঘের মধ্যে অদৃশ্য হল সুপর্ণ।

আশ্চর্য যোগাযোগ! আনন্দবাবাজীর অসুস্থতার খবর পেয়ে পাঁচদিন আগে হৃষিকেশের আশ্রমে এসে পৌঁছেছিল দেবারতি। গঙ্গার ধার থেকে সন্ধ্যার কিছু পরে উঠে আসছিল সে। চতুর্দশীর চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ছিল চবাচরে।

একটি বাড়ির সামনে দিয়ে যখন আসছিল তখন টি. ভি. তে খবর চলছিল। আশ্রমে টি. ভি. ছিল না, তাই সে খবরটা শোনার জন্য দাঁড়িয়ে গেল। এ সময় সারা অঞ্চল জুড়ে ভূমিকম্পে আটকে পড়া যাত্রীদের জন্য উদ্বেগের অন্ত ছিল না মানুষজনের। তাছাড়া বিধ্বস্ত পাহাড়ী গ্রামগুলির অবস্থা জানার জন্যও উৎকণ্ঠিত ছিল সারা দেশের জনসাধারণ।

একি শুনল দেবারতি! সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না।

মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ার সুপর্ণ মিত্রের দুর্ঘটনায় জীবনাবসান। কেদারনাথের পথসংস্কারের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার মেজর মিত্র ডিনামাইট বিস্ফোরণের সময় একটি শিশুকে রক্ষা করতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। শিশুটি তাঁর কোলের মধ্যে থেকে বিস্ময়কর ভাবে রক্ষা পায়। তিনি কিন্তু শিলাখণ্ডের পতনের ফলে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। হৃদয়বান এই মানুষটি তাঁর অক্লান্ত কর্ম ও মানবসেবার জন্য অল্পকালের মধ্যেই গাড়োয়ালবাসী জনগণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন।

আগামীকাল হেলিকপ্টার যোগে তাঁর নশ্বরদেহ হৃষিকেশে আনা হবে। এখানে উত্তরপ্রদেশ সরকার ও নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হবে শ্রদ্ধার্ঘ্য।

সমস্ত দেহখানা দেবারতির মুহূর্তে পাষাণ হয়ে গেল। সে পথের ধারে দাঁড়িয়ে রইল মূক প্রতিমার মত।

পরদিন দ্বিপ্রহরে হেলিকপ্টারে এসে পৌঁছল সুপর্ণ মিত্রের নশ্বর দেহ। ফুলে ভরা সুসজ্জিত গাড়িতে তোলা হল তাঁকে। বিভিন্ন সংস্থা, জনগণ ও সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে পুষ্পার্ঘ্য ও মাল্যদান করা হল।

সুপর্ণের গুণমুগ্ধ দর্শনার্থী মানুষের ঢল নেমেছিল হৃষিকেশের পথে। মনে হচ্ছিল, এ যেন গঙ্গার আর এক প্রবাহ।

মাতৃ-আশ্রম থেকে দেবারতির হাতে পাঠান হয়েছিল পুষ্পস্তবক। দেবারতি প্রণাম করে পুষ্প-স্তবকটি রেখে দিল সুপর্ণের পায়ের কাছে। এবার একটু সরে এসে নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল মৃত্যুঞ্জয়ী সেই মুখখানার দিকে।

আশ্চর্য! অম্লান রয়েছে সেই মুখের দীপ্তি। জনতার জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস তরঙ্গিত।

দেবারতির সহসা মনে পড়ল সুপর্ণকে বলা আনন্দ বাবাজীর সেই কথাগুলি ঃ সবার জন্য নিজেকে

বিলিয়ে দাও তবেই তো আনন্দ আপনি এসে তোমার কাছে ধরা দেবে।

সুপর্ণের মুখ আজ সত্যিই আনন্দে উদ্ভাসিত। দেবারতির মনে হল সুপর্ণ তাকে বলছে, এ নশ্বর দেহের জন্য দুঃখ কিসের দেবারতি। আমি বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি, তোমার অক্ষয় স্মৃতিটুকু বুকের মধ্যে ভরে নিয়ে। চোখের সামনে থেকে এই সরে যাওয়া আমাদের বন্ধুত্বের অটুট বন্ধনকে কখনোই ছিন্ন করতে পারবে না। শুধু তোমার সঙ্গে চির বন্ধুত্বের ভাবনাই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে অনন্ত কাল।

'তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনী-সম।।
মম-জীবন যৌবন মম অখিল ভুবন
তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথিনী-সম।।
জাগিবে একাকী তব করুণ আঁখি,
তব অঞ্চল ছায়া মোরে রহিবে ঢাকি।
মম দুঃখ বেদন মম সফল স্বপন
তুমি ভরিবে সৌরভে নিশীথিনী-সম।।'